শুকতারা-র

১০১ ভূতের গল্প

ভূতের গল্প! নামটা শুনলেই যেন কেমন গা ছমছম করে ওঠে। যারা ভয়কাতুরে তাদের তো কথাই নেই, যারা মুখে খুব সাহস দেখায় তারাও যে ভূতের গল্প পড়তে বসলে কেমন ভয়ে কুঁকড়ে যায়, সে আমরা সবাই জানি। শুধু ছোটরাই বা কেন, যে-সব বড়োরা হাতে ভূতের গল্পের বই দেখলে ধমকান, তাঁরাও কিন্তু ছোটদের লুকিয়ে পড়ে নেন ভূতের গল্প। এ গল্পের আকর্ষণ এরকমই, বয়সের কোনো বাছবিচার নেই এখানে, বারো থেকে বাহাত্তর সকলেই এসব গল্পের ভক্ত।

সেই জন্যেই নানারকমের ভূতের গল্প জড়ো করা হয়েছে এখানে। শুকতারা পত্রিকায় এই তেষট্টি বছর ধরে ভূতের গল্প তো আর কম প্রকাশিত হয়নি। আর লিখেছেনও সব বাঘা বাঘা লেখক। এঁদের মধ্যে যেমন আছেন আগেকার দিনের হেমেন্দ্রকুমার রায়, সুধীন্দ্রনাথ রাহা, যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজকুমার রায়চৌধুরী, আশাপূর্ণা দেবী, স্বপনবুড়ো, বিশু মুখোপাধ্যায় কি ধীরেন্দ্রলাল ধরের মতো সেরা গল্পকার, তেমনি আছেন একালের মহাশ্বেতা দেবী, বিমল কর, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সমরেশ মজুমদার, প্রফুল্ল রায় বা সুচিত্রা ভট্টাচার্যের মতো পাকা গল্প-লিখিয়েরা। নাম যাঁদের করলাম না, ভূতের গল্প পড়ুয়াদের কাছে তাঁদের নামও দস্তুরমতো পরিচিত।

এইরকম একশো এক গল্পকে বন্দি করা হয়েছে এই বইয়ের দুই মলাটের মধ্যে। ভূতেরা সব তোমাদের সঙ্গে আলাপ করার জন্যে ছটফট করছে, কাজেই আর বিলম্ব নয়, পাতা ওলটাতে শুরু করো।

শুকতারার
১০১ ভূতের গল্প

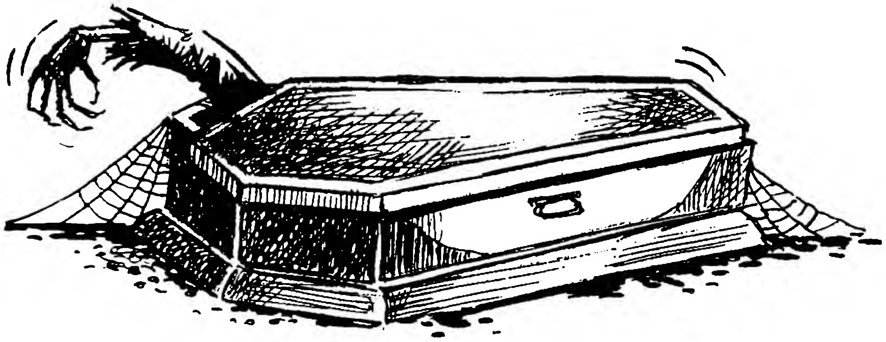

দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড

SUKHTARAR 101 BHUTER GALPA

(A Collection of 101 Ghost Stories)

CODE NO. : 47 S 27

Price : Rs. 200.00

Dev Sahitya Kutir Pvt. Ltd.

21, Jhamapukur Lane, Kolkata-700 009

Tel : 2350-4294/4295/7887

প্রথম প্রকাশ ঃ বইমেলা, জানুয়ারি ২০১১, মাঘ ১৪১৭

পুনর্মুদ্রণ ঃ অক্টোবর ২০১১, আশ্বিন ১৪১৮

পুনর্মুদ্রণ ঃ ডিসেম্বর ২০১২, পৌষ ১৪১৯

পুনর্মুদ্রণ ঃ এপ্রিল ২০১৩, বৈশাখ ১৪২০

দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ২১, ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯ থেকে শ্রী অরুণ চন্দ্র মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং বি. সি. মজুমদার কর্তৃক বি. পি এম'স প্রিন্টিং প্রেস, রঘুনাথপুর, দেশবন্ধুনগর উত্তর ২৪ পরগনা থেকে মুদ্রিত।

প্রচ্ছদ ঃ গৌতম দাশগুপ্ত

দাম ঃ ২০০.০০ টাকা

ভূমিকা

একটা শিশু-কিশোর পত্রিকার তেষট্টি বছর টিকে থাকা নেহাৎ কথার কথা নয়। 'শুকতারা' পত্রিকা শুধু যে এত বছর ধরে টিকে আছে তাই নয়, গৌরবের সঙ্গে টিকে আছে এবং এখনও তার যেরকম রমরমা পশার, আরো অনেক বছর ধরে টিকে থাকবে এটাও প্রায় নিশ্চিত ভাবেই বলা যায়।

'শুকতারা' যখন প্রথম প্রকাশিত হয় তখন তার সঙ্গে সত্যি সত্যি টেক্কা দেবার মতো পত্রিকা ছিল দু'টি—'শিশুসাথী' আর 'মৌচাক'। আজ প্রথমটির কোনো অস্তিত্বই নেই, দ্বিতীয়টিরও প্রায় তাই। এখন ছোটদের পত্রিকা আশেপাশে কিছু আছে বটে, কিন্তু 'শুকতারা' যে-জন্যে সকলের পছন্দ সেই জায়গাটা পূরণ করার ক্ষমতা তাদের তেমন আছে বলে মনে হয় না। কী সেই জায়গা যেখানে এই পত্রিকা দাপটের সঙ্গে দখল করে বসে আছে! সেটা হল ছোটদের মনের মতো বিভিন্ন স্বাদের প্রচুর গল্প। এই সব গল্প দিয়েই 'শুকতারা' মুগ্ধ করে এসেছে ছোটদের, তাদের অভিভাবকদের; এখনও তাই করছে।

নানা ধরনের গল্পের মধ্যে ভূতের গল্প বরাবরই 'শুকতারা' পত্রিকার অন্যতম প্রধান আকর্ষণ। তাই বছরে দু'বার বিশেষ ভৌতিক সংখ্যাও করা হয়। এতদিন ধরে প্রকাশিত এত রকমের ভূতের গল্পের মধ্যে একশো এক গল্পের নির্বাচন খুব সহজ ব্যাপার নয়, কারণ এযাবৎকাল 'শুকতারা' পত্রিকায় যাঁরা ভৌতিক গল্প লিখে এসেছেন তাঁরা এক-একজন দিকপাল মানুষ। তাঁদের প্রকাশিত বেশ কিছু গল্পের মধ্যে একটি গল্প বেছে নেওয়া খুবই কষ্টের কাজ, কোন গল্পটি নিলে ভালো হত, সে ব্যাপারে একটা অস্বস্তি থেকেই যায়। এঁদের পর থেকে আরো বেশ কিছু লেখক এসেছেন, ছোটদের গল্পেই বিশেষ করে যাঁদের মুন্সিয়ানা। আর আজকের যাঁরা নিয়মিত লেখক তাঁদের মধ্যে অনেকেও ছোটদের বিশেষ প্রিয় লেখক হয়ে উঠেছেন। কাজেই প্রায় তিন প্রজন্মের লেখকদের গল্প দিয়ে 'শুকতারা' পত্রিকার একটা শ্রেষ্ঠ ভূতের গল্পের সংকলন করতে গিয়ে আমরা বুঝতে পারছি কাজটা মোটেই সহজ নয়।

সহজ হবেই বা কী করে! একেবারে প্রথম দিকের এমন সব লেখক ছিলেন যাঁদের বলা যায় ভৌতিক গল্পের জাদুকর। আজকের প্রবীণরা নতুন কোনো সংকলন বেরুলে তাঁদের লেখার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েন। এই সব লেখক হলেন হেমেন্দ্রকুমার রায়, সুধীন্দ্রনাথ রাহা, যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, সরোজকুমার রায়চৌধুরী প্রমুখ। এরপর নতুন স্বাদের গল্প নিয়ে এলেন অখিল নিয়োগী (স্বপনবুড়ো), ধীরেন্দ্রলাল ধর, আশাপূর্ণা দেবী, মহাশ্বেতা দেবী, হাড়-হিম-করা বিদেশি গল্প নিয়ে এলেন বিশু মুখোপাধ্যায়। তারপর যাঁরা এলেন আজ অবশ্য তাঁরাও প্রবীণ—ছোটদের প্রিয় লেখক সৈয়দ মুস্তফা সিরাজ, প্রফুল্ল রায়, হিমানীশ গোস্বামী, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, নিমাই ভট্টাচার্য, সঙ্কর্ষণ রায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, অদ্রীশ বর্ধন এবং আরো অনেকে। এখন যাঁরা ছোটদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছেন তাঁদের সংখ্যাও কম নয়। এর মধ্যে একশো এক জন লেখককে বেছে নেওয়া এবং তাঁদের সেরা গল্পটি উপহার দেওয়া অত্যন্ত দুরূহ কাজ।

এই দুরূহ কাজ সুসম্পন্ন করার জন্য অনেকের সাহায্যই দরকার। সকলে মিলে এই কাজে এগিয়ে না এলে এরকম একটি সংকলন প্রকাশ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তবে এঁদের মধ্যে বিশেষ ভাবে যাঁর নাম করতেই হবে তিনি বিশিষ্ট ছড়ালেখক এবং ছোটগল্পকার শ্রীরূপক চট্টরাজ। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম ছাড়া আমাদের এই পরিকল্পনা সার্থক রূপ নিতে পারত না। সকলের সম্মিলিত সহযোগিতায় যে সংকলনটি প্রকাশিত হল সেটি ছোটদের মন জয় করতে পারলেই আমাদের উদ্যোগ এবং শ্রম সার্থক বলে মনে করব।

নিবেদন

'শুকতারা' পত্রিকার প্রধান আকর্ষণ তার বিভিন্ন ধরনের গল্প এবং কমিকস। দীর্ঘদিন সাফল্যের সঙ্গে এই পত্রিকা ছোট-বড়ো অনেক পত্রিকার পাশে দাপটের সঙ্গে টিকে আছে এবং ছোটদের মন জয় করছে। আজকেও তার আকর্ষণে কোনোরকম ভাটা পড়েনি।

বিভিন্ন ধরনের গল্পের মধ্যে প্রধান আকর্ষণ বোধহয় ভূতের গল্পগুলি। এরকম গল্প ছোটরাও যেমন ভালোবাসে, ছোটদের অভিভাবকরাও তাই। একসময় দিকপাল সব লেখকেরা এখানে হাড়-হিম-করা ছোটগল্প লিখেছেন। আজকের লেখকরাও কিছু কম যান না। তাই এই পত্রিকায় তেষট্টি বছর ধরে প্রকাশিত প্রচুর ভূতের গল্পের মধ্য থেকে একশো এক গল্প বেছে নিয়ে সেরা ভৌতিক গল্পের একটি সংকলন প্রকাশ করার পরিকল্পনা আমরা গ্রহণ করেছিলাম। এই গ্রন্থটি সেই পরিকল্পনারই ফসল।

এরকম একটি কষ্টসাধ্য পরিকল্পনা গ্রহণ করলে তা রূপায়িত করার জন্য অনেক মানুষের সক্রিয় সহায়তা প্রয়োজন হয়। এ কাজেও অনেকেই তাঁদের নিষ্ঠা ও সক্রিয় সহযোগিতা দিয়ে আমাদের সাহায্য করেছেন। তাঁদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। প্রচুর গল্পের মধ্য থেকে সীমিত আয়তনের গল্পগুলি নির্বাচন করা বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার, এটি সম্ভব হয়েছে সাহিত্যিক শ্রীরূপক চট্টরাজের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে। তাঁকে বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ।

যাদের জন্য এই সংকলন, তাদের ভালো লাগলেই আমাদের সম্মিলিত প্রয়াস সার্থক হয়ে উঠবে।

প্রকাশক

সূচীপত্র

হেমেন্দ্রকুমার রায়	বাড়ি, বুড়ো, বুট	৯
শিবরাম চক্রবর্তী	গোলদিঘির ভূত!	১৩
হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	ভৌতিক	১৭
ধীরেন্দ্রলাল ধর	ঐতিহাসিক প্রেতাত্মা	২১
আশাপূর্ণা দেবী	পরলোকের হাঁড়ির খবর	২৬
সরোজকুমার রায়চৌধুরী	একটি ভালোমানুষ ভূত	৩৭
বিশু মুখোপাধ্যায়	মরা বোন ও ভূতুড়ে পাইন	৪১
স্বপনবুড়ো	অশরীরীর স্বাক্ষর	৪৫
সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ	আম কুড়োতে সাবধান	৪৯
মহাশ্বেতা দেবী	ঠাকুমার পোষা ভূত	৫৩
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	বিপিনবাবুর চশমা	৫৫
প্রফুল্ল রায়	ভূত নেই, ভূত আছে	৫৯
বিমল কর	এক ভৌতিক মালগাড়ি আর গার্ডসাহেব	৬৬
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়	শিবেনবাবু ভালো আছেন তো!	৭২
হিমানীশ গোস্বামী	রতনদিয়ার ভূত	৭৫
বরেন গঙ্গোপাধ্যায়	লোকটা কে	৮১
মঞ্জিল সেন	কে হাসে?	৮৬
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়	মর্গান সাহেবের বাগান	৯২
অদ্রীশ বর্ধন	প্রেতাত্মার অট্টহাসি	৯৫
অজেয় রায়	ভূতুড়ে বাড়িতে ভূতের খোঁজে	১০২
রবিদাস সাহারায়	ভূতের খপ্পরে	১১৫
সুচিত্রা ভট্টাচার্য	বুড়ির ভূত	১১৯
সমরেশ মজুমদার	জলের দেবতা এবং ভূত	১২৪
সুধীন্দ্রনাথ রাহা	পাতালের মাতুল	১২৬
যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	প্রেতের কান্না	১৩৪
নিমাই ভট্টাচার্য	অবিশ্বাস্য	১৩৮
মানবেন্দ্র পাল	মড়ার খুলি ও মামা	১৪৪
বেলা দেবী	সেই রাতে	১৫১
আনন্দ বাগচী	গিরিধারীর গেরো	১৫৪
নীরোদচন্দ্র মজুমদার	সঙ্কেত	১৫৮
সঙ্কর্ষণ রায়	লগ্ বুকের ছেঁড়া পাতা	১৬৫
ময়ূখ চৌধুরী	আত্মা ও দুরাত্মা	১৬৯

আশা দেবী	যাদের দেখা যায় না	১৭৩
শিশিরকুমার মজুমদার	টোকোনের বন্ধু	১৭৫
পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য	আয়নার কুহক	১৭৯
কার্তিক মজুমদার	মামীমা	১৮৫
তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	ভূতেরা এখন	১৮৯
আবদুল জব্বার	'তেলেসমাতি' বাড়ি	১৯৩
পরেশ দত্ত	অলৌকিক জিপ	১৯৬
সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়	জয়ের দাদু	২০২
মায়া বসু	সিকান্দার বেগের প্রতিকৃতি	২০৬
হীরেন চট্টোপাধ্যায়	গভীর রাতের আতঙ্ক	২১৩
দেবল দেববর্মা	চশমা	২২০
অনীশ দেব	ঠিক দশটায় ট্রেন এসেছিল	২২৬
স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়	ভূতের যদি থাকে খুঁৎ	২৩৪
অসীম চৌধুরী	কানে কানে কথা কয়	২৩৮
গৌরী দে	২৫ বছর পরে	২৪৩
বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	রহস্যময় ঘোড়ার গাড়ি	২৪৬
কমল লাহিড়ী	কথার দাম	২৫০
জীবন ভৌমিক	হ্যাপি ভিলা	২৫৩
অশোক কুমার সেনগুপ্ত	শীতসন্ধ্যার ঝড়বৃষ্টি	২৫৭
শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়	নস্যির ডিবে	২৬২
মনোজ সেন	ভূত বলে কিছু নেই	২৬৪
সুকুমার ভট্টাচার্য	বাঁশি হাতে মানুষটি	২৬৮
তড়িৎ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	কাশিমপুরের তিন ভূত	২৭৫
মণিলাল মুখোপাধ্যায়	আত্মা মরে না	২৭৭
সুশীলকৃষ্ণ দাশগুপ্ত	মাতৃস্নেহ	২৮১
অমিতাভ ভট্টাচার্য	কাটা হাতের লোভে	২৮৭
জীবনময় গুহ	বেহ্মদৈত্য	২৯১
কণা সেন	প্রতিধ্বনি	২৯৪
শচীন দাশ	ভয়ংকর	৩০২
অসিতকুমার চৌধুরী	জবানবন্দী	৩০৭
বরুণ দত্ত	যমজ বোন	৩১০
মীরা বালসুব্রম্‌নিয়ন	অশরীরী নিবাসের কাহিনি	৩১৪
ডাঃ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী	ইম্ফলের ফৌজি গাড়ি এবং অনুপমদা	৩২১
নির্মলেন্দু গৌতম	নির্জন ফরেস্ট বাংলোয়	৩২৭
বামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	অশরীরিণী	৩৩৪
ধর্মদাস মুখোপাধ্যায়	সীতা বামনী	৩৩৮
শুভমানস ঘোষ	দেখা হবে মাঝরাতে	৩৪২
রমেন দাস	লঙ্‌সাহেবের ছায়া	৩৪৭
কাঞ্চনকুন্তলা মুখোপাধ্যায়	কালো বিভীষিকা	৩৫১
ধ্রুবজ্যোতি চৌধুরী	শয়তানের জাগরণ	৩৫৬

অনিন্দ্য গোস্বামী	মায়ার টানে	৩৫৯
রণেন বসু	আমাদের ভুবন স্যার	৩৬৩
কুমার মিত্র	রাজাপুরের দীঘি	৩৬৮
প্রলয় সেন	আমার বন্ধু বিল্ব	৩৭৬
ভূপতি ভট্টাচার্য	চচ্চড়ি-ভূত	৩৮৩
শৈলেশ ভড়	আজব দোকান	৩৮৭
অজিত কুমার হাইত	গল্প নয়	৩৯১
শৈলেন্দ্রনাথ গুঁই	জলার ভূত	৩৯৪
বিরাজ ভদ্র	রাঙাদিদা ও ফুলকুমারী	৩৯৭
প্রবোধ নাথ	অদ্ভুত ভূতের গল্প	৪০১
চন্দ্রভানু ভরদ্বাজ	ম্যাজিশিয়ান	৪০৯
ডাঃ অরুণ কুমার দত্ত	ভূত মানেই ভয়ঙ্কর নয়	৪১৪
প্রিয়রঞ্জন মৈত্র	জাতিস্মর ভূত	৪১৭
অজিত পূততুণ্ডু	একটা চাবির জন্য	৪২২
মুস্তাফা নাশাদ	আগুন লাঠি, সোনার মোহর ও কালো বেড়ালছানা	৪২৮
শ্যামলী বসু	হোইচির গল্প	৪৩২
কল্যাণ মৈত্র	ভূতুড়ে বিজ্ঞাপন	৪৩৫
মনতোষ মিশ্র	পাহাড়ী জোছন	৪৪০
রাহুল মজুমদার	বিরামপুরের ওয়েটিং রুমে	৪৪২
তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়	প্রাণদাতা	৪৪৫
সৈয়দ রেজাউল করিম	কথা রেখেছিল যুধিষ্ঠির	৪৪৮
শ্যামাপদ কর্মকার	সত্যিভূতের গল্প	৪৫২
সঞ্জীব কুমার দে	ছায়ায় মায়ায়	৪৫৬
শিশির বিশ্বাস	ভূতের চর	৪৬৪
অশোক সী	কালো কুকুর	৪৭৩
ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায়	অসীম সব জানে	৪৭৮
জাহান আরা সিদ্দিকী	প্রেতাত্মা	৪৮২
রূপক চট্টরাজ	গুপ্তবাড়ির গুপ্তরহস্য	৪৮৮
অমরেন্দ্রনাথ মুন্সী	বন-কলমীর বিলে	৪৯২

বাড়ি, বুড়ো, বুট

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

বাড়িখানি ভারী ভালো লাগল। চারিধারে বাগান—যদিও ফুলগাছের চেয়ে বড় বড় গাছই বেশি। টেনিস-খেলার জমি, মাঝে মাঝে শ্বেতপাথরের বেদি, একটি ছোট বাহারি ফোয়ারা, এখানে-ওখানে লাল কাঁকর-বিছানো পথ।

দোতলা বাড়ি—একেবারে হাল-ফ্যাশানের না হলেও সেকেলে নয়। বাড়ির জানলায় বা দেয়ালে প্রাচীনতার কোনো চিহ্নই নেই। কোথাও ফাট ধরেনি, কোথাও অশথ্-বট এসে জোর করে জুড়ে বসেনি।

কিন্তু তবু মনে হল, বাড়িখানি যেন রহস্যময়। ভাবলুম, বাড়ির মাথা ছাড়িয়ে উঠে মস্ত মস্ত গাছগুলো নিজেদের জন্যে একটি ছায়ার জগৎ সৃষ্টি করেছে বলেই হয়তো এখানে এমন রহস্যের আবহ গড়ে উঠেছে। আমার পক্ষে এও এক আকর্ষণ। আমি রহস্য ভালোবাসি। রহস্যের মধ্যে থাকে 'রোমান্সে'র গন্ধ।

সাঁওতাল পরগনার একটি জায়গা। স্ত্রী এবং ছেলে-মেয়েদের বায়ু-পরিবর্তনের দরকার। ডাক্তারের মতে এ-জায়গাটি নাকি অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর। বন্ধু প্রকাশের সঙ্গে এখানে এসেছি, মনের মতন একটি বাড়ি খুঁজে নিতে। আজকের ট্রেনেই কলকাতা ফিরব।

খানিক ডাকাডাকির পর বাগানের ভিতর থেকে একটি লোক বেরিয়ে এল—তার চেহারা না মালী, না দ্বারবান, না ভদ্র বা ইতর লোকের মতো। তার বয়স আশিও হতে পারে, একশোও হতে পারে! তার মাথায় ধবধবে সাদা, এলোমেলো লম্বা লম্বা চুল। তার কোমর এমন ভাঙা যে হাড়-জিরজিরে দেহের উপর-অংশ একেবারে দুমড়ে পড়েছে। কিন্তু হাতের লাঠি ঠক্‌ঠকিয়ে সে এত তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল যে, তার অসম্ভব ক্ষিপ্রতা দেখে বিস্মিত হলুম।

সে জিজ্ঞাসা করলে, "আপনারা কি চান?"

"বাড়ির ফটকের উপরে লেখা রয়েছে—'টু লেট'। আমরা এই বাড়িখানা ভাড়া নিতে চাই।"

লোকটা হঠাৎ মুখ তুলে তাকাল। সে এতক্ষণ মাথা হেঁট করে ছিল বলে তার চোখ দেখতে পাইনি। এখনো দেখতে পেলুম না, কারণ তার চোখ দুটো এমনি অস্বাভাবিকভাবে কোটরগত যে, প্রথম দৃষ্টিতে তাদের আবিষ্কার করাই যায় না! মনে হয়, লোকটা বুঝি অন্ধ। কিন্তু তারপর লক্ষ করে দেখলুম, দুই কোটরের ভিতর দিকে কি যেন চকচক করছে—দুই অন্ধকার গর্তের মধ্যে যেন দুই দীপশিখার ইঙ্গিত।

লোকটা আবার মুখ নামিয়ে ফেলে থেমে থেমে বললে, "ভাড়া নিতে চান? এই বাড়ি ভাড়া নিতে চান? বেশ!"

"বাড়িখানা আমাদের পছন্দ হয়েছে! এ বাড়ির মালিক কে?"

"বাড়ির এখনকার মালিক থাকেন বিলাতে। আগেকার মালিক কোথায় থাকেন, কেউ জানে না।"

"তাহলে ভাড়া দেব কাকে?"

"আমাকে।"

"কত ভাড়া?"

"সেটা ঠিক করবেন আপনারাই।"

রহস্যময় বাড়ি, রহস্যময় বৃদ্ধ এবং তার কথাগুলোও কম রহস্যময় নয়! মনে হল, রহস্যের মাত্রা যেন ছাড়িয়ে যাচ্ছে। এতটা ভালো নয়।

কি বলব ভাবছি, হঠাৎ গায়ে পড়ল এক ফোঁটা জল। চমকে মুখ তুলে দেখি, ইতিমধ্যে আমাদের অজান্তেই আকাশে হয়েছে মেঘের সঞ্চার!

বুড়ো বললে, "বৃষ্টি আসছে। আপনারা একটু ভিতরে গিয়ে দাঁড়াবেন চলুন।"

বুড়োর পিছনে পিছনে বাড়ির নীচের তালার বারান্দার তলায় গিয়ে দাঁড়ালুম।

ঝমঝম করে বৃষ্টি নামল।

প্রকাশ আমার দিকে ফিরে বললে, "বৃষ্টিতে এখানে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই। চল, আগে বাড়ির উপরকার ঘরগুলো একবার দেখে আসি।"

বুড়োর দিকে ফিরে দেখি, সে ঊর্ধ্বমুখে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। আমি তাকে ডাকলুম, সে যেন শুনতেই পেলে না। খানিক পরে হঠাৎ বললে, "ঘড়িতে ক'টা বেজেছে?"

হাত-ঘড়ির দিকে দৃষ্টিপাত করে বললুম, "এখন সাড়ে পাঁচটা।"

বুড়ো যেন শীতার্ত কণ্ঠে কাঁপতে কাঁপতে বললে, "আকাশে মেঘ আরো জমে উঠছে। অন্ধকারে সন্ধ্যা নামবে তাড়াতাড়ি। এ বৃষ্টি সন্ধ্যার পরেও পড়বে।"

"না পড়তেও পারে।"

"না, না, এ বৃষ্টি এখন থামবে না, হয়তো আজ সারা রাত ধরেই পড়বে। আমি মেঘ দেখেই বুঝতে পারি।"

প্রকাশ বললে, "কি সর্বনাশ, তাহলে আমরা স্টেশনে যাব কি করে? আজই তো আমাদের কলকাতায় ফেরবার কথা!"

বুড়ো ঘাড় নাড়তে নাড়তে বললে, "এ বৃষ্টি আজ আর থামবে না—আজ আর থামবে না! পাহাড়ে-নদী ফুলে উঠবে, মাঠ ভেসে যাবে, পথ ডুবে যাবে। পালাতে চান তো এখনি পালান! সন্ধ্যার পর রাত আসবে, ঝড় উঠবে, বন কাঁদবে—এ বৃষ্টি আজ আর থামবে না! এখনো সময় আছে, এখনো পালিয়ে যান!"

বুড়োর কথাবার্তার ধরন দেখে রাগ হল। বিরক্ত কণ্ঠে বললুম, "ঠাট্টা রাখো, শোনো! এ বাড়ি আজ থেকেই আমি ভাড়া নিচ্ছি। বৃষ্টি না থামে, আজ আমরা এইখানেই রাত কাটাব। কত টাকা দিতে হবে বল?"

বুড়ো আবার মুখ তুললে—আবার দেখলুম তার চক্ষুকোটরগত দুই দীপশিখার ঝিলিক! দন্তহীন মুখ ব্যাদান করে নীরব হাসি হেসে সে বললে, "আজ রাতে এখানে থাকবেন! থাকতে পারবেন?"

"কেন পারব না?"

"বাড়ির আগেকার মালিক আজ রাতে এখানে আসবেন। তিনি কোথায় থাকেন কেউ তা জানে না, কিন্তু বৃষ্টির রাতে ঠিক এখানে বেড়াতে আসেন। তাঁকে দেখলে মানুষ খুশি হয় না। দোতালার হলঘর তাঁর জন্যে খোলাই থাকে। এক বৃষ্টির রাতে ও-ঘরে একটি কাণ্ড হয়েছিল!"

"কি হয়েছিল?"

"রক্তাক্ত কাণ্ড! সন্ধ্যার সময় মালিক ফিরে এলেন—তখন ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টি পড়ছে। হাতে তাঁর বন্দুক, পরনে তাঁর শিকারের পোশাক। তারপর—না, না, সে-সব কথা আপনাদের আর শুনে কাজ নেই। কিন্তু সেইদিন থেকে এ বাড়ি খালি—এ বাড়ি কেউ ভাড়া নিতে চায় না!"

আমি হো-হো করে হেসে উঠে বললুম, "তুমি কি আমাদের ছেলেমানুষ পেয়েছ যে, যা তা বলে ভয় দেখাতে চাও?"

"বেশ, তবে তোমরা থাকো, আমি চললুম। কিন্তু সাবধান, সাবধান, সাবধান!" বলতে বলতে বুড়ো লাঠি ঠকঠকিয়ে অত্যন্ত ক্ষিপ্রপদে আবার বাগানে নেমে অদৃশ্য হয়ে গেল।

প্রকাশ বললে, "পাগল!"

আমি বললুম, "পাগল নয়, পাজি। বুড়োর হয়তো ইচ্ছা নয়, আর কেউ এ-বাড়ি ভাড়া নেয়। সে একলাই এখানে রাজত্ব করতে চায়। কিন্তু বাইরে যখন ভাড়াপত্র টাঙানো আছে, তখন আমাদের ভাবনা কি? চল, একবার দোতালার ঘরগুলো দেখে আসি।"

দোতালার বারান্দায় উঠে দাঁড়ালুম। সেখান থেকে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়।

আরো পুরু, আরো কালো হয়ে উঠেছে আকাশের মেঘ। আরো জোরে, আরো ঘন-ধারায় পড়ছে বৃষ্টি....ঝমঝম-ঝমঝম। সন্ধ্যার আগেই দ্রুত নেমে আসছে সন্ধ্যার অন্ধকার। দূরের ছোট ছোট পাহাড়গুলো ক্রমেই ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। দুই-কূল-ভাসানো নদীর-ছবি-আঁকা, জল-থই-থই-করা প্রান্তরের মাঝে মাঝে বড় বড় গাছগুলো মাতাল হয়ে টলমল করছে ঝোড়ো-বাতাসের দীর্ঘশ্বাসে।

প্রকাশ বিষণ্ণ স্বরে বললে, "বুড়োর একটা কথা কিন্তু ঠিক। আজ এইখানেই বন্দী হতে হবে।"

"উপায় নেই।"

"কিন্তু খাবে কি?"

"আকাশের জল।"

"শোবে কোথায়?"

"পিছন ফিরে ঐ হলঘরটা দেখ। ওর তিনটে দরজাই খোলা। এখনো যেটুকু আলো আছে তাইতেই দেখা যাচ্ছে, ঘরের ভিতরে রয়েছে বড় বড় সোফা, কৌচ আর চেয়ার। দেয়ালের গায়ে রয়েছে সোনালি ফ্রেমে বাঁধানো মস্ত মস্ত ছবি আর আয়না। মেঝের উপরে কার্পেট পাতা। আশ্চর্য এই, এমন সাজানো বাড়ি খালি পড়ে আছে!"

প্রকাশ সন্দেহ-ভরা কণ্ঠে বললে, "তবে কি বুড়োর কথা মিথ্যা নয়? এখানা কি—"

"ভূতের বাড়ি? ক্ষেপেছ? তা মানলে বলতে হয় এ বাড়ির আসল ভূত হচ্ছে ঐ বুড়োই!"

"বিচিত্র কি! বুড়োর মতন চেহারা আমি কোনো মানুষেরই দেখিনি!"

আচম্বিতে কানে এল অপূর্ব এক সঙ্গীত! হার্মোনিয়াম বাজিয়ে গান গাইছে যেন কোনো মেয়ে! রবীন্দ্রনাথের গান। গায়িকার গলা চমৎকার।

সবিস্ময়ে দুজনে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ ধরে সেই গান শুনলুম।

আকাশে বেড়ে উঠল বিদ্যুতের জীবন্ত অগ্নিচিত্র ও উন্মত্ত বজ্রের চিৎকার! ঘরে-বাইরে কোথাও আর চোখ চলে না।

আমি বললুম, "এ গান আসছে কোথা থেকে?"

প্রকাশ বললে, "ঐ হলঘরের ভিতর থেকে।"

বিদেশে আসছি বলে সঙ্গে 'টর্চ' আনতে ভুলিনি। 'টর্চ'টা জ্বেলে দুজনেই হলঘরের ভিতরে ঢুকলুম। সব আসন খালি। ঘরের ভিতরে একটি 'অর্গ্যান' রয়েছে, তার সামনেও কেউ নেই।

প্রকাশ তবু জোর করেই বললে, "যে গাইছে সে এই ঘরেই আছে।"

আমি বললুম, "অসম্ভব। অন্য কোনো ঘরে কেউ গান গাইছে।"

প্রকাশ অস্বস্তি-ভরা স্বরে বললে, "না, না, গান হচ্ছে এইখানেই! যে গাইছে তাকে দেখতে পাচ্ছি না বটে, কিন্তু আমি তার উপস্থিতি অনুভব করতে পারছি! আমার মনে হচ্ছে, এ ঘরটা যেন হিমালয়ের বরফ-দিয়ে-গড়া! উঃ, কী ঠান্ডা! এ মানুষের ঘর নয় বন্ধু, এ হচ্ছে মড়ার ঘর!"

আমরা তাড়াতাড়ি আবার বাইরে গিয়ে দাঁড়ালুম। প্রকাশের কথা মিথ্যা নয়। ঘরের চেয়ে বাহিরটা বেশ গরম—অথচ ঝোড়ো হাওয়ার তোড়ে সেখানে এসে পড়ছিল শীতল বৃষ্টিধারা!

অবাক হয়ে এর কারণ বোঝবার চেষ্টা করছি, এমন সময়ে কানে এল আর একটা নতুন শব্দ।

গট গট করে কার ভারী জুতোর আওয়াজ হচ্ছে।

প্রকাশ বিস্মিত স্বরে বললে, "সিঁড়ি দিয়ে কে উপরে উঠছে। এ বুড়োর পায়ের শব্দ নয়!"

আমি বললুম, "বুড়ো মিছে কথা বলেছে। এ বাড়ি নিশ্চয়ই খালি নয়। কে গান গায়? কে উপরে ওঠে?" সিঁড়ির দিকে 'টর্চে'র আলো ফেলে অপেক্ষা করতে লাগলুম।

সিঁড়ির ধাপগুলো শব্দিত করে উপরের বারান্দায় এসে স্থির হয়ে রইল একজোড়া শিকারি-বুট—যা পরলে লোকের হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা পড়ে।

নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারলুম না—মানুষ নেই অথচ একজোড়া শিকারি-বুট উপরে এসে উঠল, জ্যান্তো জীবের মতো!

মন বললে, ঐ দৃশ্যমান বুট পরে আছে কোনো অদৃশ্য দেহ এবং বারান্দায় হঠাৎ আজ দুই অনাহূত অতিথি দেখে সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে, সবিস্ময়ে!

প্রকাশ অস্ফুট স্বরে বললে, "শিকারি-বুট! বুড়োও বলেছিল, বৃষ্টির রাতে বাড়ির মালিক এসেছিল শিকারির পোশাক পরে!"

আমি উত্তর দেবার আগেই বুট-জুতোজোড়া যেন কোনো বেজায় ভারী দেহের চাপ নিয়ে আবার গট-গট শব্দে মাটি কাঁপিয়ে অগ্রসর হতে লাগল আমাদের দিকেই!

আমরা মহা আতঙ্কে পিছু হটতে লাগলুম পায়ে পায়ে। আমাদের দৃষ্টি স্তম্ভিত, হৃৎপিণ্ড করছে ধড়ফড়-ধড়ফড়।

হলঘরের তৃতীয় দরজার কাছে এসে বুট-জুতোজোড়া আবার থেমে পড়ল—ক্ষণিকের জন্যে। কিন্তু তারপরেই সবেগে প্রবেশ করল ঘরের ভিতরে! গানের স্বর থেমে গেল—সঙ্গে সঙ্গে শুনলুম গুড়ুম করে বন্দুকের শব্দ ও তীব্র এক আর্তনাদ!

আমরা পাগলের মতো দৌড়ে এক এক লাফে সিঁড়ির তিন-চারটে করে ধাপ পেরিয়ে নীচে নেমেই দেখি, সেখানে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেই অদ্ভুত বুড়োর ভাঙা দুমড়ে-পড়া মূর্তি! সে একবার মুখ তুলে আমাদের পানে তাকালে—'টর্চের' আলোতে তার চক্ষু কোটরের খুব ভিতরে জ্বলে উঠল দুটো আগুনের কণা!

খিল-খিল করে হেসে বুড়ো খনখনে গলায় বলে উঠল, "মালিকের সঙ্গে দেখা হল? মালিকের সঙ্গে দেখা হল? মালিক কি বললে? বাড়ি ভাড়া নেবে নাকি? হি হি হি হি হি!"

দৌড়তে দৌড়তে বাগান পার হয়ে যখন বাইরে এসে পড়লাম, তখনও সেই ভয়াবহ বুড়োর অপার্থিব হাসির শব্দ থামেনি!

—

ভাদ্র ১৩৫৭

গোলদিঘির ভূত!

শিবরাম চক্রবর্তী

ভূতের কথা বলতে গেলে এক অদ্ভুত ঘটনার কথা আমার মনে পড়ে। বছর কয়েক আগের কথা। তখন সবে এক দৈনিক পত্রিকার আপিসে সাংবাদিকের কাজে ঢুকেছি।

নামমাত্র কাজ। রবিবারের কাগজে একটুখানি লিখতে হয়—ফি হপ্তায়। আমার একটা আলাদা স্তম্ভ ছিল, তাইতেই লিখতাম।

লেখার কাজ এমন কিছু না, কিন্তু পড়ার কাজটাই ছিল ভারী! সপ্তাহে একবার ঐ একটুখানি লেখার জন্য এত বেশি আমাকে পড়তে হত—এত রকমের দৈনিক, সাপ্তাহিক আর সাময়িক পত্র ঘাঁটতে হত যে বলবার না। ভূত না হলেও, বলতে কি, সেই একটা বিভীষিকা ছিল।

এই রকম কাগজপত্র ঘাঁটবার কালে একদিন একটা খবর আমার চোখে পড়ল। দৈনিকটির প্রেরিত পত্রের স্তম্ভে একজনের একখানা চিঠি। চিঠিখানি স্তম্ভিত করবার মতোই!

পত্রদাতা লিখেছেন, "সম্পাদকমশাই, আমরা গোলদিঘি এলাকার বাসিন্দে। কিছুদিন থেকে ভূতের উপদ্রবে বড়ই উৎপীড়িত হচ্ছি। ব্যক্তিগতভাবে অশরীরী ভদ্রলোক তেমন কষ্টদায়ক না হলেও যখন-তখন যেখানে-সেখানে তাঁর অবাঞ্ছনীয় আবির্ভাব আর অন্তর্ধানে এ অঞ্চলের সকলেই আমরা বিশেষ কাহিল হয়ে পড়েছি। ব্যাপারটা আমাদের প্লীহার পক্ষে খুব হিতকর নয়, এমন কি, হার্টের পক্ষেও। হার্ট যদিও পিলের মতন সহজে চমকাবার ছেলে না, কিন্তু তাহলেও, ছেলের মতো ফেল করতে পারে তো!—যাই হোক, আপনাদের বিশ্ববিশ্রুত পত্রিকার সংখ্যাহীন পাঠক-পাঠিকার কারো যদি এই ভৌতিক দুর্যোগের কোনো প্রতিকার জানা থাকে, যদি দয়া করে আপনার পত্রিকার মারফতে তিনি জানান তাহলে আমরা অত্যন্ত বাধিত হবো। ইতি—ইত্যাদি।"

কলকাতার বুকের ওপর ভূত! একটু অভূতপূর্ব কাণ্ডই বই কি! এ কি কখনো সম্ভব হতে পারে?

"কী ভাবচেন মশাই অমন গালে হাত দিয়ে?"

আরেকজনের কথায় আমার চমক ভাঙল। এই কার্যালয়েরই, আমার এক সহযোগী। আমার মতোই আরেকজনা।

"এই, ভূতত্ব।" আমি বললাম—"ভূতত্ব নিয়েই ভাবছিলাম।"

"ও, ভূতত্ব? আজকের ভূমিকম্পের কথা বলছেন? জাপানের সমুদ্রকিনারের তিনটি শহর ধসে গেছে, কত ঘর-বাড়ি গেছে, মরেছে যে কত হাজার—ইয়ত্তা নেই তার। বাস্তবিক, এই ভূমিকম্পগুলো কেন যে হয়, তার রহস্য আবিষ্কার করা—"

"আজ্ঞে, সে ভূতত্ব নয়, আমি ভাবছি ভূতত্ব"—বাধা দিয়ে বলতে গেলাম।

"একই কথা। ভূতত্ব আর ভূমিকম্পের তত্ত্ব এক। একই সূত্রে গাঁথা। একটার যদি আমরা কিনারা করতে পারি—"

"আহা, তা নয়। তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাচ্ছিনে মশাই, আমি ভাবছি ভূত নিয়ে। ভূত আছে কি না, ভূতের অস্তিত্ব-নাস্তিত্ব এই সব নিয়ে। যেমন মহৎ থেকে মহত্ত্ব, আমসৎ থেকে আমসত্ব, তেমনি ভূত থেকে ভূতত্ব। ভূমিকম্পের সঙ্গে এর কোনোই সম্পর্ক নেই।"

ব্যাকরণমতে আরো উদাহরণমালা যোগাতে যাচ্ছিলাম, এমন সময়ে সম্পাদকের ঘর থেকে তলব এল।

যেতেই সেই কাগজটার ভূতপূর্ব অংশটা তিনি পড়তে দিলেন—"পড়ে দ্যাখো।"

"দেখেছি।"

সম্পাদক বল্লেন, "আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা আসেননি আজ, কেন কে জানে! তুমি একবার যাও দেখি। গোলদিঘির এই ভূতুড়ে ব্যাপারটার সবিশেষ জেনে এসো তো। খবরটা কালকের কাগজে সবিস্তারে ছাপাতে পারলে বেশ চাঞ্চল্যকর হবে। কাগজ কাটবে খুব।"

"আজ্ঞে, মাপ করবেন আমায়। ভূত আমি বিশ্বাস করিনে।" আমি জানালাম—"ভূতে আমার ভারী ভয়।"

"বিশ্বাস করো না তো ভয় কিসের আবার?" অবাক হলেন সম্পাদকমশাই।

"আজ্ঞে, সেই জন্যেই তো। ওদের মোটেই বিশ্বাস নেই, ভূত ভারী ভয়ঙ্কর জীব।"

"আহা, তোমাকে কি ভূতের সঙ্গে মুলাকাত করতে বলেছি? অমূলক ভয় তোমার। আরে, তাদের কি পাত্তা মেলে? যাদের বাড়ি উপদ্রব হচ্ছে সেখানে যাবে, পত্রদাতার সঙ্গে দেখা করবে। করে বিস্তারিত সব জেনে, ফলাও করে লিখে আনবে—কাজ তো এই!"

"কিন্তু পত্রদাতার ঠিকানা তো কাগজে দেয়নি।" আমি দেখালাম—"চিঠিতে লেখা নেই।"

"আসল চিঠিতে আলবৎ ছিল, নইলে এ-চিঠি ছাপত না। কিন্তু সে-ঠিকানা তো ঐ কাগজের দপ্তর থেকে জানা চলে না। তাহলে যে ব্যাপারটা ওরা টের পেয়ে যাবে। আমরা যা করতে যাচ্ছি, মালুম পেয়ে নিজেরাই করে বসবে আগে। সব মাটি হবে তাহলে।"

"তাহলে?" আমার প্রতিধ্বনি হয়।

"একটুখানি জায়গা তো গোলদিঘি। অঞ্চলটায় ঘোরো গে। যাকে দেখবে একটু ভীত, ভাবিত, সন্ত্রস্ত—পাকড়াবে অমনি। মুষড়ে-পড়া কি ম্রিয়মাণ কেউ যদি তোমার নজরে পড়ে, ছেড়ো না তাকে। যদি কাউকে দ্যাখো খুব বিচলিত, বুঝবে সেই তোমার এই পত্রদাতা, কিংবা এই পত্রদাতার মতোই অপর কেউ, ভূতের উৎপাতে প্রপীড়িত। বুঝেচো? আলাপ করে ভাব জমিয়ে আসল কথা আদায় করবে তার কাছ থেকে। এমন কি শক্ত কাজ?"

তিনি তো আমায় চাঙ্গা করতে চাইলেন, কিন্তু আমার প্রাণ ঠান্ডা হয়ে এল। 'নিজস্ব সংবাদদাতার' পরস্মৈপদী বেগার ঠেলতে—বিশেষত, যার পেছনে এত ঠ্যালা—মোটেই আমার ভালো লাগে না। তাছাড়া, ভূতের ব্যাপারে উৎসাহ—এক কথায় ভূৎসাহ—চিরকালই আমার কম। ভূতত্ত্বে আগ্রহ কোনোদিনই আমার নেই। ভূতের ত্রিসীমানায় আমি বিরল। আনাচে-কানাচে ভূতের গন্ধ পেলেই আমার ভোঁ-দৌড়!

"আমি কি পারব?" তবুও আমি গাঁইগুঁই করি।

"পারবে হে, পারবে। তুমি তুখোড় ছেলে—তাই তো তোমাকেই এই গুরুভার চাপাচ্ছি......"

"আজ্ঞে, আমার দ্বারা কি এই দুঃসাধ্য কাজ—"

"হবে হে, হবে। অবশ্যি, চালাক তুমি তেমন নও, কিন্তু তা না হলেও, তোমার লাক্ আছে। তোমার ভাষাতেই বল্লাম কথাটা। তোমার ভাষা সহজে তুমি বুঝতে পারবে। সাদা বাংলায় কথাটা এই, এধারে-ওধারে একটু ঘুরে-ফিরে দেখবে, চোখ-কান খোলা রেখে। চাই কি, দৈবক্রমে একটু চেষ্টা না করতেই, হয়তো তোমার সঙ্গে লোকটার দেখা হয়ে যেতে পারে। এই নাও...."

এই বলে তিনি পকেট হাতড়াতে লাগলেন। তাঁর নিজের পকেট। হাতড়ে-টাতড়ে খুচরো-খাচরায় যা মিলল আমার হাতে সমর্পণ করলেন—

"এই নাও টাকা দু-আড়াই হবে। কাজটা সারার পর কফি-হাউসে গিয়ে—গোলদিঘির কাছেই তো কফি-হাউস! কফি-টফি যা হয় খেয়ো প্রাণ ভরে।"

এতক্ষণে কাজটায় আমার গা লাগে। "যে আজ্ঞে" বলে বেরিয়ে পড়ি। বৌবাজার থেকে একেবারে বইয়ের বাজারে। কলেজ স্কোয়ারেই সটান!

অলিগলি ধরে ট্যাং ট্যাং করে তো পৌঁছলাম গোলদিঘি। দিঘিটার চার কোনায় দু' চক্কর মারা যাক একবার। দেখি কাউকে ভীত ভাবিত বিচলিত বিড়ম্বিত দেখা যায় কিনা!

বিকেল থেকেই মেঘলা লেগেছিল আজ। এখন আবার টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়তে লাগল। সন্ধে উৎরে গেছে কখন! গোলদিঘির গ্যাসবাতিগুলো টিম টিম করে জ্বলছে! আর আমি চক্কর মারছি তখনো গোলদিঘির চক্রান্তে।

একটা একটা করে বাদামের খোলা ভাঙছি, গালে ফেলছি, আর ভালো করে তাকাচ্ছি। না, বাদামের দিকে নয়, লোকগুলোর দিকে। কাউকে যদি আমার সম্মুখে ভূতগ্রস্ত দেখতে পাই!

কিন্তু দেখব কি, ভালো করে দেখতে না দেখতেই গোলদিঘি ফাঁকা হয়ে গেল। জলটাও একটু জোরে এল আবার। টিপ টিপ থেকে টপ টপ শুরু করল। এতক্ষণ যারা ঘুরপাক খাচ্ছিল এখানে, দেখতে দেখতে গেল কোথায়? জলের সঙ্গে হাওয়া হয়ে গেল নাকি? য়্যাঁ, ভূত নয় তো এরা সব? আমার গা ছমছম করে।

ভদ্রলোক বলেছিলেন কাজ সারা হলে কফি-হাউসে যেতে। আড়াই টাকা পকেটে নিয়ে আগেই আমি সেখানে পা বাড়ালাম। যদি সেখানেই সম্পাদক-কথিত, সম্প্রতি কফি-ত সেই ভদ্রলোকের পাত্তা মেলে আমার!

কফি-হাউসও ফাঁকা। বাদলার ধাক্কা এখানেও লেগেছে। এই বর্ষায় যে যার ঘরে বসে চা খেয়ে চাঙ্গা হচ্ছে, কফি-হাউসে হানা দেবার গরজ বোধ করেনি।

বসলাম গিয়ে কাফের এক কোণে। আর একজন মাত্র ছিল সেই টেবিলে। হাফশার্ট গায়ে, আধাবয়সী ভদ্রলোক। লোকটিকে কেমন যেন মুহ্যমান মনে হল!

মনে হল ইনি যেন ভূত-টূত দেখেছেন। অন্তত সেইরকম মুখের ভাবখানা। তাঁর কাছেই বসলাম তাই।

বয় আসতেই এক পেয়ালা গরম কফি আর এক প্লেট পটাটো-চিপের হুকুম দিয়েছি।

"হঠাৎ কী বিশ্রী বাদলা করল বলুন তো!" ভদ্রলোকের সাথে ভাব জমাবার চেষ্টা করি।

"ভারী বিচ্ছিরি সত্যিই।" ভদ্রলোক সায় দিলেন।

"এরকম আবহাওয়ায় চানাচুর আর ভূতের গল্প বেশ জমে, কী বলেন?" কায়দা করে লোকটাকে পথে আনবার প্রয়াস পাই।

"ভূতের গল্প? ভূতের আবার গল্প কি?" ওঁর তেমন উৎসাহ দেখা যায় না।

কফি আর চিপ্‌স এসে পড়লো আমার। চিপ্‌স-এর পাত্রটা এগিয়ে দিলাম ওঁর দিকে—যদি পটাটো দিয়ে পটানো যায় একটু।

চিপ্‌স উনি ছুঁলেন না, বয়কে বল্লেন আইসক্রিম আনতে! আইসক্রিমও এসে গেল দেখতে দেখতে।

"আপনি তো এই গোলদিঘির এলাকারই লোক, তাই না? এ অঞ্চলে আছেন অনেক দিন! প্রবীণ ব্যক্তি; দেখেছেন শুনেছেন অনেক। ভূত অদ্ভুত অনেক কিছুই আপনার চোখে পড়েছে—নয় কি?......"

"ভূত? গোলদিঘিতে ভূত? না, মশাই না, ভূত-টুত কিছু নেই এখেনে। সাতজন্মে না।" ভদ্রলোক আরেক পাত্র আইসক্রিমের হুকুম দিলেন।

আইসক্রিম খেতে পারে বটে লোকটা। এমন ক্রিমখোর জীবনে আমি দেখিনি। কৃমি হয়ে না মারা যায় শেষটায়।

আমি এক এক চুমুক কফি খাই, আর উনি গেলাসের পর গেলাস গেলেন। প্রায় সতেরো গেলাস আইসক্রিম সারলেন ভদ্রলোক, ততক্ষণে আমি মাত্র তিন পেয়ালা কফি টানতে পেরেছি—আর প্লেট

দুয়েক আলু-ভাজা, ব্যস! কিন্তু এতক্ষণ ধরে এত চেষ্টা করেও এক টুকরো ভূতের খবর ওঁর মুখ থেকে খসাতে পারলাম না! ওঁকে ভূৎসাহিত করার সমস্ত অধ্যবসায় আমার ব্যর্থ হল।

যতই আমি ভূতের কথা পাড়তে যাই ততই উনি ঘাড় নাড়তে থাকেন—"না না না! গোলদিঘিতে ভূত থাকে? এত গোলমালের মধ্যে? ভূত কখনো তিষ্ঠোতে পারে কলকাতায়? ভূত-টুত যা ছিল এখানে, সব ইহলোকপ্রাপ্ত হয়েছে। মরে মানুষ হয়ে গেছে সব! ক—বে!"

সতেরো গেলাস আইসক্রিম সাবাড় হল, কিন্তু ভূ—শব্দটি ওঁর মুখ থেকে বার করা গেল না।

অগত্যা উঠতে হল আমায়। কফি-হাউসের মায়া কাটাতে হল অবশেষে। কাফের দরজা বন্ধ হবার সময় হয়েছিল। উঠে কাউন্টারে দাম দিতে গেলাম।

কিন্তু বিল দেখে তো আমার চক্ষু চড়ক! পনেরো টাকার বিল!

"পনেরো টাকা কেন? আমি তো মোটে তিন পেয়ালা কফি আর দু'প্লেট চিপ্‌স খেয়েছি—তার জন্যে পনেরো টাকা?" প্রবল কণ্ঠে আমি প্রতিবাদ করি।

"আর সতেরো গ্লাস্ আইসক্রিম, সেটা খেল কে?" কফি-হাউসের কর্মকর্তা শুধোন।

"সে তো আরেক জন।" জানাই আমি।

"আমরা কি কানা? ঘাস বেচতে বসেছি? চালাকি পেয়েছেন নাকি? আপনার টেবিলে আপনি ছাড়া আর অন্য কোনো লোক ছিল না।"

"কেন, ঐ ভদ্রলোক?" আঙুল দিয়ে দেখাতে গিয়ে দেখলাম উনি নেই। উঠে গেছেন কখন! কিন্তু এর মধ্যেই সরে পড়লেন কোথায়?

ব্যাপারটা আমার ভালো ঠেক্‌ল না। আমি বল্লাম, "দেখুন মশাই, এইসব রসিকতা আমার ভালো লাগে না। পকেটে সম্বল আমার মোট আড়াই টাকা, সেই আন্দাজে আমি খেয়েছি। পনেরো টাকা আমি পাব কোথায়? আমাকে বাঁধা রাখলেও অত টাকা দিয়ে খালাস করতে আসবে না কেউ।"

"তাহলে তো পুলিশ ডাকতে হয়। বেওয়ারিশ মাল থানায় জমা দেওয়াই দস্তুর।"

ইঙ্গিতের অপেক্ষাই ছিল শুধু! তাঁর কথা না খসতেই বেয়ারাটা কোথ্‌থেকে একটা পাহারোলা এনে খাড়া করেছে! যদ্দূর বেয়াড়া কাজ হতে হয়।

ব্যাপারটা আমি আরো পরিষ্কার করে বোঝাতে যাচ্ছি, পাহারোলাটা আমায় বাধা দিল। বলল, "চলিয়ে থানামে।"

"থানামে? থানামে কেন যাব? কেয়া কিয়া? কফি খায়া, উস্‌কো দাম দেদিয়া, চুক্ গিয়া। ফিন্ থানা কাহে?"

কিন্তু কে শোনে! পাহারোলাটা আমার ঘাড় পাকড়াল। টেনে নিয়ে চল্লো আমায়।

এমন সময়ে দেখি সেই ভদ্রলোক! এগিয়ে আসছেন মাল্‌কোঁচা মেরে। আমাকে সাহায্য করতেই—এতক্ষণে!

কিন্তু আমাকে না, পাহারোলাকেই। পাহারোলাটা আমার গলদেশ ধরেছিল, তিনি এসে আমার তলদেশ ধরলেন। দুজনে মিলে চ্যাংদোলা করে সিঁড়ি দিয়ে নামাতে লাগলেন আমাকে।

"তুম্‌লোক্ কেয়া করতা বলতো? হাম্‌কো পা ছোড় দেও না! থানামে কি আমি নিজে হেঁটে যেতে জানিনে?" আপত্তির সুরে আমি বলি। রাষ্ট্র-বাংলায় জগাখিচুড়ি বানিয়ে একাকার করি।

"তুম্‌হারা পায়ের পাক্‌ড়া কৌন্ হো? হাম্ তো গর্দান লিয়া! দুসরে তো হিঁয়া কোই নেহি!"—পাহারোলার আওয়াজ কানে আসে।

কিন্তু ততক্ষণে আমি মূর্ছিত হয়ে পড়েছি!

—

বৈশাখ ১৩৫৭

ভৌতিক

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

ভূত আছে কি নেই এ তর্ক বহুদিনের। ভগবানের অস্তিত্ব নিয়েও এ ধরনের তর্ক আদিম যুগ থেকে চলে আসছে। দুটো তর্কেরই আজও নিষ্পত্তি হয়নি।

বিজ্ঞানের যুগে তোমরা হয়তো এসব মানতে চাইবে না।

অণুবীক্ষণ আর দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে যা দেখা যায় না, তার অস্তিত্বই নেই, এই তোমাদের মত।

ভূতের কথা তোমাদের মতন এতদিন আমিও বিশ্বাস করতাম না। অনেক জায়গায় ভূত দেখার আমন্ত্রণ পেয়েছি। পড়ো বাড়িতে রাত কাটিয়েছি, ঘোর অমাবস্যায় শ্মশানে ঘোরাফেরা করেছি। কিছু চামচিকে আর শেয়াল ছাড়া আর কিছু নজরে পড়েনি।

ভূত সম্বন্ধে আমিও ঘোরতর অবিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলাম, এমন সময় ব্যাপারটা ঘটল।

ঠিক আমাদের পাশের বাড়িতে থাকে সমর রায়। ছেলেটি দেখতে যেমন সুন্দর, লেখাপড়াতেও তেমনই উৎসাহী। বি. এ. পরীক্ষা দেবার আগে মাঝে মাঝে আমার কাছে পড়তে আসত। সেই সময়ে তার বিদ্যাবুদ্ধি পরখ করার সুযোগ আমার হয়েছিল। তাছাড়া একেবারে পাশের বাড়িতে থাকত, খুব ছোটবেলা থেকেই তাকে দেখেছি।

ইদানীং অনেকদিন সমরের সঙ্গে দেখা হয়নি। শুনেছিলাম পরীক্ষার পর সে বাইরে কোথায় বেড়াতে গেছে।

এক সন্ধ্যায় ঘরে বসে একটা বই পড়ছি। বাইরে ঝড়ের আভাস। জানলা, দরজার পর্দাগুলো দমকা বাতাসে উড়ছে। দু-এক ফোঁটা বৃষ্টিও যেন গায়ে এসে পড়ল, কিন্তু বইটা এত ভালো লাগছিল যে উঠে গিয়ে জানলাগুলো বন্ধ করতেও ইচ্ছা করছিল না।

হঠাৎ সশব্দে দরজাটা খুলে গেল। ভাবলাম ঝড়। চোখ ফিরিয়েই কিন্তু অবাক হলাম। সমর এসে দাঁড়িয়েছে। উশকোখুশকো চুল, পাংশু মুখ।

কি সমর কবে ফিরলে? বইটা মুড়ে প্রশ্ন করলাম।

সমর কৌচে, আমার পাশে বসে বলল, এই একটু আগে। জামাকাপড় ছেড়েই আপনার কাছে চলে আসছি।

কি ব্যাপার? মনে হল সমরের বোধহয় জরুরি কোনো কথা বলবার আছে।

আপনার সময় হবে এখন? আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে।

হাসলাম, অফুরন্ত সময়। বল কি তোমার কথা?

আপনি ভূত বিশ্বাস করেন মাস্টারমশাই?

এ প্রশ্ন হাজার বার হাজার জায়গায় শুনেছি। সোজাসুজি উত্তর না দিয়ে বললাম, কি বলতে চাইছ বল?

মৃত্যুর পরে মানুষ শেষ হয়ে যায় না মাস্টারমশাই। ভূত বলুন, আত্মা বলুন, তারা আছে। মাঝে মাঝে তারা দেখাও দেয়।

বুঝলাম কোনো কারণে সমর খুব উত্তেজিত হয়েছে। অনেকেরই রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়। আধো-অন্ধকারে গাছপালা দেখে ভূতপ্রেত কল্পনা করে, কিংবা বদমাইশ লোকের প্রতারণায় ভুলে মনে করে অশরীরী কিছু একটা দেখেছে।

সমরের পিঠে হাত রেখে বললাম, মাথা ঠান্ডা করে কি হয়েছে বল তো?

সমর কোঁচার খুঁট দিয়ে মুখ আর কপাল মুছে নিল তারপর একটু দম নিয়ে বলতে আরম্ভ করল।

লক্ষ্ণৌতে আমার এক পিসি আছেন আপনি জানেন বোধহয়?

হ্যাঁ, তোমার কাছেই শুনেছি। তিনি কোনো এক স্কুলের শিক্ষিকা, তাই না?

সমর ঘাড় নাড়ল, পিসি বৈজনাথ শিক্ষাসদনে পড়ান। তিনি অনেকদিন ধরে তাঁর কাছে আমাকে যেতে লিখছেন কিন্তু একটার পর একটা ঝঞ্ঝাটের জন্য যাওয়া আর হয়ে ওঠেনি। তাই পরীক্ষার পর ভাবলাম, এখন তো প্রচুর অবসর, এইবার ঘুরে আসি। মাসখানেক আগে দেরাদুন এক্সপ্রেসে রওনা হয়ে গেলাম।

তোমার বাবার কাছে শুনেছি। আমি কৌচের ওপর পা দুটো তুলে ভালো হয়ে বসলাম।

আপনি শুনলে হাসবেন, এই জীবনে আমার প্রথম রেলযাত্রা। কাজেই উৎসাহের অন্ত ছিল না। প্রত্যেক স্টেশনে, ট্রেন থামতেই আমিও নেমে প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করতে আরম্ভ করি। গার্ডের হুইসিলের সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসে কামরায় উঠি। কিন্তু এক স্টেশনে বিপদ ঘটল।

আমি সোজা হয়ে বসলাম, কি, ট্রেন ছেড়ে দিল তো?

সমর আমার প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়ে বলতে লাগল, এক স্টেশনে নেমে এদিক ওদিকে বেড়াচ্ছি, হঠাৎ দেখলাম একটি বছর আট-নয়েকের মেয়ে, বেশ ফুটফুটে চেহারা, কোঁকড়ানো চুল, পরনে নীলচে রংয়ের একটা ফ্রক, আমাকে হাত নেড়ে ডাকছে।

প্রথমে ভাবলাম আমারই ভুল হয়েছে। মেয়েটি বোধহয় অন্য কাউকে ডাকছে। এদিক-ওদিক চেয়ে দেখলাম, না, আর কেউ তো ধারে-কাছে নেই। মেয়েটিকে বাঙালি বলেই মনে হল। প্ল্যাটফর্মের ওপর বেশিরভাগই অন্য জাতের জটলা। মেয়েটির সঙ্গে চোখাচোখি হতেই আমায় সে হাতছানি দিয়ে ডাকল।

ভাবলাম, বিদেশে মেয়েটি নিশ্চয় কোনো বিপদে পড়েছে। আমাকে স্বজাতি দেখে সাহায্য চাইছে।

মেয়েটির দিকে এগিয়ে গেলাম। মেয়েটি দাঁড়িয়ে ছিল, আমি এগোতেই সে চলতে শুরু করল স্টেশনের বিশ্রামকক্ষের দিকে। বুঝতে পারলাম, সম্ভবত ওই বিশ্রামকক্ষে তার কোনো আত্মীয় বা আত্মীয়া বিপদে পড়েছেন কিংবা হঠাৎ অসুস্থ হয়েছেন। কিন্তু না, বিশ্রামকক্ষের সামনে একটু দাঁড়িয়ে মেয়েটি ঘাড় ফিরিয়ে আমাকে দেখে আবার হাত নেড়ে ডেকেই আরও এগিয়ে গেল।

এধারে একটা বকুলগাছ। অজস্র বকুল ঝরে পড়েছে পথের ওপর। পাশে স্টেশনের সীমানার রেলিং। মেয়েটি তার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

আমি জোরে জোরে হেঁটে মেয়েটির কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম, আর ঠিক সেই সময়—

আমি আর উৎকণ্ঠা দমন করতে পারলাম না। জিজ্ঞাসা করলাম, কি হল?

হুইসিল দিয়ে ট্রেন ছেড়ে দিল। এদিকে চেয়ে দেখি মেয়েটি উধাও। এক নিমেষে যেন মুছে গেল। আমি ট্রেনের দিকে ছুটলাম, কিন্তু ধরতে পারলাম না। দুরন্ত গতিতে ট্রেন যেন আমার চেষ্টাকে উপহাস করতে করতে বেরিয়ে গেল।

এতক্ষণ পরে আমি হাসলাম। এই তোমার ভৌতিক গল্প! মেয়েটি তোমায় বোকা বানিয়ে সরে পড়েছে। বয়স কম হলে হবে কি, মেয়েটি ভারী ওস্তাদ মনে হচ্ছে।

সমর আমার হাসিতে যোগ দিল না, গম্ভীর গলায় বলল, আমার কাহিনি এখনও শেষ হয়নি মাস্টারমশাই।

আমি একটু অপ্রস্তুত হলাম। বললাম, বেশ, বলে যাও।

আমি স্টেশন মাস্টারের সঙ্গে দেখা করে ট্রেন ফেল করার কথা বললাম। তিনি পরের স্টেশনে ফোন করে দিলেন, যাতে তারা আমার বিছানা আর সুটকেসটা নামিয়ে রাখতে পারে। এর পরের ট্রেন রাত সাড়ে ন'টায়। হাতে অঢেল সময়।

সমস্ত বিশ্রামকক্ষগুলো তন্নতন্ন করে খুঁজলাম। কয়েকজন দেহাতী যাত্রী বসে আছে। মেয়েটি

কোথাও নেই। স্টেশনের বাইরে এসে কয়েকটা টাঙ্গাওয়ালাকে মেয়েটির কথা জিজ্ঞাসা করলাম। তবে কেউ কিছু বলতে পারল না।

আশ্চর্য লাগল, চোখের সামনে থেকে মেয়েটি কি করে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, এই প্রচণ্ড দিনের আলোয় কোথায় সে সরে যেতে পারে!

আশ্চর্য হবার আমার আরও বাকি ছিল।

রাত সাতটা নাগাদ সারা স্টেশনে হইচই। সবাই খুব ব্যস্ত। গিয়ে খবর নিয়েই চমকে উঠলাম। দেরাদুন এক্সপ্রেসের সঙ্গে এক মালগাড়ির ভীষণ ধাক্কা লেগেছে। অনেক লোক আহত হয়েছে, মারা গেছে বেশ কয়েকজন।

আপাতত সব গাড়ি বন্ধ। দু-একটা রিলিফ ট্রেন সাহায্য নিয়ে ছোটাছুটি করছে। স্টেশন মাস্টারের কামরায় খুব ভিড়। অনেকেই আত্মীয়স্বজনের খবর নেবার জন্য ব্যাকুল।

ভিড় কমতে খবর পেলাম, দেরাদুন এক্সপ্রেসের সামনের চারখানা বগি একেবারে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে। সামনের তিন নম্বর বগিতে আমার থাকার কথা। সেই মুহূর্তে নতুন করে আবার মেয়েটির কথা মনে এল। মেয়েটি যদি হাতছানি দিয়ে আমাকে ডেকে না নিয়ে যেত, তাহলে আমার কি অবস্থা হত ভেবেই শিউরে উঠলাম।

সেই রাত্রেই দুটো টেলিগ্রাম করলাম। একটা কলকাতায় বাড়িতে, আর একটা লক্ষ্ণৌতে, পিসির কাছে। লিখে দিলাম যে ভাগ্যক্রমে দুর্ঘটনার হাত থেকে আমি বেঁচে গেছি। পথে এক স্টেশনে আমি নেমে পড়েছিলাম।

লাইন ঠিক হতে দিন দুয়েক লাগল। আবার একদিন লক্ষ্ণৌ রওনা হলাম। পিসিকে খবর দিয়ে।

সারা রাত সেই মেয়েটির কথা ভাবলাম। বিধাতার আশীর্বাদের মতন মেয়েটি যেন আমার প্রাণরক্ষা করতেই এসেছিল। কিন্তু কাজ শেষ করে মেয়েটি কোথায় মিলিয়ে গেল।

পরের দিন এগারোটা নাগাদ লক্ষ্ণৌ পৌঁছলাম। স্টেশনে পিসি এসেছিলেন। খুব ছেলেবেলায় ওঁকে দেখেছিলাম, তবু চিনতে অসুবিধা হল না। পিসির চেহারা প্রায় একই রকম আছে।

প্রণাম করতেই বুকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, খবরের কাগজে ট্রেন দুর্ঘটনার খবর পড়ে আমার যা অবস্থা হয়েছিল। কেবল মনে হচ্ছিল এর জন্য যেন আমিই দায়ী। আমি বার বার তোকে আসতে লিখেছিলাম। তারপর তোর টেলিগ্রামটা পেয়ে ধড়ে প্রাণ এল। কি ব্যাপার বল তো?

সব ব্যাপারটা বললে পিসি হয়তো বিশ্বাসই করতেন না। বিশেষ করে তিনি যখন স্কুলে বিজ্ঞান পড়ান। কাজেই মেয়েটির ব্যাপারটা বেমালুম চেপে গিয়ে বললাম, চা খেতে একটা স্টেশনে নামতে ট্রেন ছেড়ে দিল পিসি। ছুটে গিয়েও ট্রেন ধরতে পারলাম না।

পিসি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন, ভগবান তোকে বাঁচিয়েছে। জন্ম জন্ম যেন তোর চা খাওয়ার নেশাটা থাকে।

দুজনে টাঙ্গায় উঠলাম। প্রায় আধঘণ্টারও ওপর চলার পর একটা বাড়ির সামনে টাঙ্গা থামল। পিসির নির্দেশে।

পিসি নেমে চিৎকার করলেন, সুন্দর, সুন্দর।

একটি ছোকরা নেমে এল। আমার সুটকেস আর বিছানা নিয়ে আবার ওপরে উঠে গেল। পিসির পিছন পিছন আমিও ওপরে উঠলাম।

মাঝারি সাইজের একটা ঘরের দিকে আঙুল দেখিয়ে পিসি বললেন, ওই ঘরটা তোর। যা জামাকাপড় ছেড়ে নে। আমি জলখাবারের বন্দোবস্ত করি।

শরীর খুবই ক্লান্ত ছিল। ঘরের মধ্যে ঢুকে একটা চেয়ারের ওপর নিজেকে ছেড়ে দিলাম।

এক কোণে একটা টেবিল, তার ওপর বাতিদান। একটা আলনা, ছোট একটা খাট। দেয়ালে গোটা তিনেক ছবি। সামনের ছবিটার দিকে চাইতেই সমস্ত শরীর বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতন কেঁপে উঠল। উঠে দাঁড়িয়ে পড়লাম। মনে হল ভয়ের কালো একটা ছায়া আমাকে আবৃত করার চেষ্টা করছে।

তাড়াতাড়ি বাইরে এসে ডাকলাম, পিসি, পিসি।

পিসি বোধহয় নীচের রান্নাঘরে ছিলেন। কোনো সাড়া পেলাম না। কিন্তু পিসিকে আমার একান্ত প্রয়োজন। আমি তাড়াতাড়ি সিঁড়ির মাঝবরাবর নেমে আবার ডাকলাম, পিসি, ও পিসি।

এতক্ষণে আমার ডাক পিসির কানে পৌঁছাল।

হন্তদন্ত হয়ে পিসি সিঁড়ির কাছে এসে বললেন, কিরে, কী হয়েছে?

একটু এ ঘরে এসো তো।

আমি ছুটে ওপরের ঘরে এসে দাঁড়ালাম। হাঁপাতে হাঁপাতে পিসিও এলেন একটু পরে।

কি হল রে তোর? শরীর খারাপ হয়নি তো? এত ঘামছিস কেন?

জামার আস্তিন দিয়ে কপালের ঘামের বিন্দু মুছে ফেলে বললাম, না, শরীর আমার ঠিক আছে। কিন্তু এ ছবিটা কার? এই যে?

হাত দিয়ে সামনের ফটোটা দেখালাম।

পিসি বললেন, ওটা টুনুর ফটো। আমার মেয়ে টুনু।

তোমার মেয়ে?

হ্যাঁ, তাকে তুই দেখিসনি। তোর জন্মাবার বছর খানেক আগে টুনু মারা গেছে। টাইফয়েডে। বোধহয় বছর আটেক হয়েছিল বয়স।

শেষদিকে পিসির কণ্ঠস্বর একটু গাঢ় হয়ে এল।

কিন্তু—ঠোঁটটা কামড়ে থেমে গেলাম।

কিন্তু কিরে, কি বলবি বল? পিসি বললেন।

তুমি কি বিশ্বাস করবে পিসি? বিশ্বাস করবার কথা নয়।

কথাটা বল তবে তো বুঝব বিশ্বাস করার কথা কিনা। পিসি আমার ভাবভঙ্গি দেখে রীতিমতো বিস্মিত হলেন।

টুনুদির সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে পিসি।

আমার কথা শেষ হবার আগেই পিসি ধপাস করে চেয়ারে বসে পড়লেন। ভাবলেন, নির্ঘাৎ ছেলেটার মাথা খারাপ হয়েছে।

একটু একটু করে সব বললাম। যখন শেষ করলাম, পিসির চোখ দিয়ে টসটস করে জল পড়ছে। পিসি বিজ্ঞান পড়ান, কিন্তু একটি কথার প্রতিবাদ করলেন না, কিছু অবিশ্বাস করলেন না। শুধু বললেন, টুনুই তোর প্রাণ বাঁচিয়ে দিয়েছে।

এবার সমর আমার দিকে ঘুরে বসল।

বলুন মাস্টারমশাই কি করে এটা সম্ভব? মারা যাবার পরও কি আত্মার স্নেহ, দয়া, মায়ার আকর্ষণ থাকে? নিজের আত্মীয়দের বাঁচাবার জন্য তারা কি মানুষের দেহ ধরে আবার ফিরে আসতে পারে মরলোকে?

বাইরে ঝড়ের সঙ্গে প্রবল বৃষ্টি শুরু হয়েছে। আমগাছের একটা ডাল জানলার পাল্লায় মাথা ঠুকছে অনবরত। জলের ঝাপটায় ঘরের অনেকখানি ভিজে গিয়েছে।

সেই দিকে চেয়ে চুপ করে বসে রইলাম। কি উত্তর দেব সমরের প্রশ্নের!

চিরদিনের জন্য হারিয়ে যাওয়া মানুষ নিজের লোককে বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্য আবার পৃথিবীতে ফিরে আসে? তাও কি সম্ভব!

ফাল্গুন ১৩৭১

ঐতিহাসিক প্রেতাত্মা

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

ভূতের গল্প ছেলেবেলা থেকে শুনছি। কত জনের কত রকমের কাহিনি। কারো শোনা কথা আবার কারও-বা নিজের চোখে দেখা। কেউ অপঘাতে মরেছে তারপর ভূত হয়ে দেখা দিয়েছে, গয়ায় পিণ্ডদানের পর আর দেখা যায়নি। কেউ-বা খুন হয়েছে, তারপর হত্যাকারী ফাঁসিতে না ঝোলা পর্যন্ত তার বার বার আবির্ভাব ঘটেছে। কোথাও-বা অতর্কিতে প্রেতাত্মা কারও স্কন্ধে ভর করে অনেক গোপন কথা প্রকাশ করে দিচ্ছে। এমনি কত একক ভূতের কাহিনি। আবার দলবদ্ধ ভূতের আবির্ভাবের কথাও আছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ফ্রান্সের যুদ্ধক্ষেত্রে হাজার হাজার সৈনিকের ছায়া দেখা দিয়েছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আণবিক বোমায় নিহত হিরোশিমা শহরের সমস্ত নগরবাসীদের জীবন্ত ছায়া দেখা গেছে, ইত্যাদি। মৃত্যুর পরে যে একটা দুর্বোধ্য লোক আর তার রহস্যের প্রতি মানুষের ঔৎসুক্যের অভাব নেই, প্রেতাত্মার কাহিনি সেই রহস্যলোককে আরও রহস্যময় করে তোলে, মানুষ তাই ভূতের গল্প বলতে ও শুনতে ভালোবাসে।

সাধারণ ভূতের গল্প আমিও অনেক বলতে পারি, যে সব গল্প সারা রাত ধরে শুনলেও ফুরোবে না। তবে রাজা-বাদশার ভূত নিয়ে একটি গল্প আমি শুনেছি, সেই গল্পটিই বলি।

ঘটনাটা আজকের নয়, আঠারো শতকের ব্যাপার। মারাঠাদের তখন প্রচণ্ড প্রতাপ, ভারতের দক্ষিণ ও পশ্চিমপ্রান্ত থেকে তারা বার বার পূর্ব ও উত্তরাঞ্চলে হানা দিচ্ছে। দিল্লির বাদশা অবধি টাকা দিয়ে তাদের খুশি রাখতে উৎসুক। রাজস্থানের রাজপুতশক্তি ঘরোয়া বিবাদে নিঃস্ব ও শক্তিহীন। মধ্যভারত তখন রীতিমতো একটা অরাজক অঞ্চল। কোন রাজা যে কবে কোন রাজ্য আক্রমণ করবেন, কোন রাজা হেরে যাবেন ও তাঁর রাজধানী লুণ্ঠিত হবে তার কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই। লড়াই ও লুঠের একটা ঝড়ো হাওয়া শান্তি ও স্বস্তি দেশছাড়া করে দিয়েছে।

জয়পুরের মহারাজার সঙ্গে যোধপুরের মহারানার চলছিল বিবাদ। জয়পুরের মহারাজা ঈশ্বরী সিং কোনোমতেই সবদিক রক্ষা করতে পারছিলেন না। অনেকগুলি যুদ্ধে বার বার তিনি হেরে গেলেন, অনেক টাকার অপচয় হল, খানিকটা রাজ্যও ছেড়ে দিতে হল—মহারাজার মাথা গরম হয়ে গেল। ঈশ্বরী সিং কোনোদিনই খুব বুদ্ধিমান বিচক্ষণ ছিলেন না। বুদ্ধিহীন বলে তাঁর একটা অখ্যাতি ছিল। এখন সেই বুদ্ধিহীনতা রুক্ষ খামখেয়ালিতে রূপান্তরিত হল। কখন যে কি করে বসেন তার কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই।

রাজসভায় চিরদিনই ক্ষমতার লড়াই চলে। যে যতখানি উচ্চপদে উঠতে পারবে তার ক্ষমতা তত বেশি হবে এবং সুযোগ-সুবিধা পেলে রাজাকে হটিয়ে দিয়ে সে-ই রাজসিংহাসনে বসতে পারে। রাজ বিচক্ষণ হলে সবাইকেই আয়ত্তে রাখতে পারেন, কিন্তু ঈশ্বরী সিংয়ের সে তীক্ষ্ণ ধীশক্তি ছিল না। তাঁর রাজকার্য পরিচালনা করতেন প্রধান সামন্ত রাজা আয়ামল্ল ক্ষত্রী। আয়ামল্লের সমকক্ষ যোগ্য রাজনীতিজ্ঞ তখন জয়পুরে ছিল না। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে কেশবদাস ক্ষত্রী তাঁর স্থান অধিকার করলেন। কিন্তু বয়স কম, যত বিচক্ষণতাই কেশবদাসের থাক না কেন, দরবারে তাঁর যোগ্যতার সম্মান দেবার মতো স্থৈর্য মহারাজের ছিল না। সামন্ত হরগোবিন্দ মহারাজকে বুঝিয়ে দিলেন—কেশবদাস তার বাপের মতো নয়, যতটা বিশ্বস্ত বলে আপনি তাকে ভাবেন, সে সততা তার নেই। শত্রুপক্ষের সঙ্গে তার চিঠিপত্র চলছে, একটু সুযোগ পেলেই সে আপনাকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে দেবে।

তাতে তার লাভ?—মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন—সে কি রাজা হবে নাকি?

সে কি হবে তা আমি জানি না, তবে যথেষ্ট অর্থলাভ ঘটবে এ সম্পর্কে আমি নিঃসন্দেহ।

ঈশ্বরী সিংয়ের সব চেয়ে বেশি ভয় ছিল তার ভাইয়ের কাছ থেকে। ছোটভাই উম্মেদ সিং পৈতৃক রাজ্য আধাআধি ভাগ করে নিতে চেয়েছিলেন। ঈশ্বরী তাতে রাজি হননি। উম্মেদ মারাঠা ও যোধপুরের মহারানার সাহায্যে অর্ধেক রাজ্য কেড়ে নিতে চাইছিলেন। হরগোবিন্দ বললেন—বোধ হয় উম্মেদকেই বসাবে আপনার সিংহাসনে।

ঈশ্বরী সিং ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললেন—আমি না মরা অবধি তো আর তা সম্ভব নয়।

আপনাকে মারতে আর কতক্ষণ লাগবে! কোনোরকমে আপনার খাদ্যে একটু বিষ মিশিয়ে দিতে পারলেই তো হল। কোনো যুদ্ধ অবধি করতে হবে না।

মহারাজার ভ্রু কুঁচকে উঠল, বললেন—আমাকে বিষ দিয়ে মারবে, তার আগে আমিই ওকে বিষ খাইয়ে মারি না,—সব চুকে যাক।

আপনি ভাবতে ভাবতে সে কাজ হাসিল করে ফেলবে।

বটে! আমি আজই ব্যবস্থা করছি। শয়তানকে সিংহাসনের পাশে জিইয়ে রাখার কোনো মানে হয় না।

মহারাজার আদেশে সেই রাত্রেই কেশবদাসের খাদ্যে বিষপ্রয়োগ করা হল। কেশবদাস মারা গেলেন। হরগোবিন্দের মনস্কাম পূর্ণ হল। তিনিই এবার রাজ্যের সর্বময় কর্তা হলেন। রাজসরকারে কেশবদাস যাদের চাকরি করে দিয়েছিলেন, মহারাজ তাদের মাহিনা দিলেন না। তারা এসে ধরল কেশবদাসের বিধবা-পত্নীকে, বলল—আমরা কেশবদাসের অধীনে চাকরি করতাম, আমাদের মাহিনা আপনাকে দিতে হবে। মহারাজ আমাদের মাহিনা দেবেন না।

কেশবদাসের বিধবা কোনো বাদ-প্রতিবাদ করলেন না, তাদের মাহিনা দেবার জন্য সর্বস্ব বিক্রি করলেন, একেবারে নিঃস্ব হয়ে গেলেন।

গোলন্দাজ বাহিনীর অধিনায়ক প্রবীণ সামন্ত শিবনাথ ভায়ার কাছে ব্যাপারটা বড় খারাপ ঠেকল, তিনি বললেন—মহারাজ, কাজটা ভালো করলেন না।

কী, আমার সামন্ত হয়ে তুমি আমারই কাজের সমালোচনা করবে!

আমি রাজপুত, রাজপুতেরা অন্যায়কে কোনোদিন ন্যায় বলে মেনে নিতে পারবে না।

ঠিক আছে, রাজদরবারে তোমার আর স্থান নেই। তুমি কারাগারে যাও!

শিবনাথ ভায়ার কারাবাসের আদেশ হল।

দরবারে আর কেউ কোনো কথা বলল না। কিন্তু সবাই মনে মনে ক্ষুব্ধ হল। এ কী!

কিন্তু রাজারাজড়ার অত্যাচার তখন প্রজারা স্বাভাবিক বলেই মেনে নিত। সাধারণ মানুষ জানত রাজাকে মেনে নিলে তার অত্যাচারকেও মেনে নিতে হবে। তার উপর রাজা যদি অস্থিরমতি হন তা হলে তো কথাই নেই। ঈশ্বরী সিংয়ের এই অনাচার অনিবার্য বলেই সবাই ধরে নিলে। কিন্তু মারাঠা রাজা মলহর রাও হোলকার এগিয়ে এলেন সৈন্য নিয়ে। কেশবদাস তাঁর সঙ্গে সন্ধি করেছিলেন, সেই সন্ধির শর্ত অনুযায়ী কয়েক লক্ষ টাকা হোলকারের পাওনা। কেশবদাস থাকলে টাকাটা ধীরে ধীরে দেওয়া চলত, কিন্তু এখন টাকাটা একেবারে চাই।

হোলকার জয়পুর নগরের বাইরে এসে ছাউনি ফেললেন। ঈশ্বরী সিং তাঁকে খুশি করবার জন্য তাড়াতাড়ি দু'লাখ টাকা পাঠিয়ে দিলেন। হোলকার বললেন—দু'লাখ টাকায় কি হবে, সব টাকা চাই।

দূত বলল—মহারাজ পরে আরো পাঠাচ্ছেন।

মহারাজের কথায় আমরা বিশ্বাস করি না। যার কথায় বিশ্বাস করতে পারতাম মহারাজ তাকে বিষ খাইয়ে মেরেছে!

দূত ফিরে এল। হোলকার টাকা নিলেন না।

মহারাজ মন্ত্রীদের ডেকে পাঠালেন—কি করা যায়।

সন্ধ্যার পর প্রাসাদের এক প্রশস্ত কক্ষে মন্ত্রিসভার বৈঠক বসল। অনেক দিক থেকে অনেক প্রশ্নের আলোচনা হল। শেষে সিদ্ধান্ত হল, পাঁচ লাখ টাকা নিয়ে দূত যাক হোলকারের কাছে। হোলকার যদি টাকাটা নিয়ে ফিরে যায় তো ভালো কথা, কিন্তু যদি টাকা না নেয়, তাহলে মুখোমুখি লড়াই করার জন্য প্রস্তুত হতে হবে।

সহসা কেশবদাসের কণ্ঠস্বর শোনা গেল—হোলকার টাকা নেবেন না, যে টাকা নিয়ে যাবে মারাঠিরা তাকে হত্যা করবে!

উপস্থিত সকলে চমকে উঠল। দেখা গেল মহারাজের পিছনে দাঁড়িয়ে আছেন কেশবদাস। ছায়া নয়, এ একেবারে অতি স্পষ্ট। সেই সাদা পিরান, সূক্ষ্ম জরির কাজ করা সাদা উত্তরীয়, মাথায় সাদা পাগড়ি, কানে হীরক-কুণ্ডল। সেই চোখ, সেই মুখ! এ যে জীবন্ত কেশবদাস। সবাই বিস্মিত হল, ভয় পেল।

প্রবীণতম সামন্ত কেশবদাসের পিতৃবন্ধু বিদ্যাধর সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি কিন্তু আর সবাইকার মতো অতটা ভীত হননি, তিনিই প্রথম কথা বললেন—আমরা তাহলে লড়াই করার জন্যই প্রস্তুত হই।

লড়লে আপনারা হেরে যাবেন। মারাঠিদের সঙ্গে যুদ্ধ করে জিততে পারে এমন শক্তি হিন্দুস্থানের কোনো রাজার নেই। আপনারা যুদ্ধ করলে হেরে যাবেন!

রাজপুতেরা হেরে যাবে মারাঠিদের কাছে?

আগেকার দিন আর নেই—কেশবদাস বললেন—এখন সওয়ারে-সওয়ারে তলোয়ারে-তলোয়ারে লড়াই নয়, এখন কামানের লড়াই। একটা ভালো গোলন্দাজ এখন এক হাজার লোককে শেষ করে দিতে পারে।

আমাদেরও তো কামান রয়েছে।

থাকলেও আপনারা হেরে যাবেন।

কেন?

আমি আপনাদের জিততে দেব না। পুরুষানুক্রমে রাজবংশের সেবা করেছি, তার পুরস্কার আমি কি পেয়েছি? আমাকে বিষ খাওয়ানো হয়েছে, আমার বাড়িঘর, জিনিসপত্র বিক্রি করে সৈন্যদের মাইনে দিতে হয়েছে, আমার স্ত্রীপুত্র আজ পথের ভিখারী! এই অন্যায়ের আমি শেষ করব। মহারাজ ঈশ্বরী সিংকে আমি সিংহাসন থেকে নামিয়ে আনব সাধারণ মানুষে, আমার স্ত্রীপুত্রের সঙ্গে সমপর্যায়ে। যুদ্ধে আপনাদের পরাজয় অনিবার্য।

তাহলে এখন আমরা কি করব?

কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। যাঁকে প্রশ্ন করা হল, দেখা গেল তাঁর ছায়া মিলিয়ে গেছে। ভয়ে বিস্ময়ে সবাই বিমূঢ় হয়ে রইল কিছুক্ষণ।

এরপর আর আলোচনা জমল না। মহারাজ কেমন যেন বিমর্ষ হয়ে পড়লেন, তারপর সহসা আলোচনার মাঝে উঠে পড়ে বললেন—আপনারা আলোচনা করে স্থির করুন। আপনারা যা বলবেন, আমি তাই করব। কাল সকালে আপনারা আপনাদের সিদ্ধান্ত আমায় জানাবেন।

মহারাজ উঠে চলে এলেন প্রাসাদসংলগ্ন উদ্যানে। বাগানের চারিপাশে ছড়ানো শ্বেতপাথরের আসন। মহারাজ একেবারে একপ্রান্তে একটি আসনে গিয়ে বসলেন। সামনে একটা পুষ্পকুঞ্জ। কয়েকটা গোলাপ গাছ। আকাশে পূর্ণচন্দ্র। পৌষমাসের শীতের দমকা হাওয়া চারিপাশ শান্ত স্নিগ্ধ করে তুলেছে। কিন্তু মহারাজার মনে স্নিগ্ধতার কোনো আমেজ নেই। শূন্যদৃষ্টিতে তিনি সামনের পানে তাকিয়ে আছেন, সেখানে নক্ষত্রখচিত আকাশ ছাড়া আর কিছু নেই। সেই আকাশের পানে তাকিয়েই মহারাজ বসে আছেন, সামনের সুন্দর রক্তগোলাপগুলির পানেও তাঁর এতটুকু দৃষ্টি নেই। কেশবদাসের

প্রেতাত্মার আবির্ভাবে তিনি অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েছেন। প্রেতাত্মা যে এমনভাবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে, এমনভাবে কথা বলতে পারে, এ তো বিশ্বাস করতে মন চায় না। কিন্তু কেশবদাস তো সত্যই আজ এসেছিল, সবাই শুনেছে সবাই দেখেছে।

সহসা মহারাজ চমকে উঠলেন। বাগানের লাল পথ দিয়ে এগিয়ে আসছে, ও কে? কে ও? কেশবদাস?

ছায়া সামনে এসে দাঁড়াল, মহারাজও আসন ছেড়ে উঠে পড়লেন। তলোয়ারের হাতলটা চেপে ধরলেন।

কেশবদাস কিছু বলল না, চুপ করে তাকিয়ে রইল। মহারাজ খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে সহসা কেঁপে উঠলেন, চিৎকার করে উঠলেন—কি চাও?

মৃত্যু!

মৃত্যু?

আপনাকে মরতে হবে।

ছায়া এগিয়ে এল, মহারাজ তাড়াতাড়ি দু'পা পিছিয়ে গেলেন।

ছায়া আরো এগিয়ে এল, মহারাজ আরো দু'পা পিছিয়ে গেলেন।

ছায়া আরো এগিয়ে এল, মহারাজ চকিতে তলোয়ারখানি টেনে নিয়ে বাড়িয়ে ধরলেন। মুহূর্তমধ্যে ছায়াটি মিলিয়ে গেল। মহারাজ আর সেখানে দাঁড়ালেন না, দ্রুতপদে ফিরে এলেন প্রাসাদে।

বিদ্যাধর তাঁর জন্য বারান্দায় অপেক্ষা করছিলেন, বললেন—এইমাত্র সংবাদ পেলাম হোলকার সসৈন্যে এগিয়ে আসছেন। কাল প্রত্যূষেই তাঁরা নগর-তোরণে এসে পৌঁছাবেন। যুদ্ধ ছাড়া আমাদের আর কোনো গতি নেই। আমি সৈন্যদের প্রস্তুত থাকতে আদেশ দিয়েছি।

বেশ করেছেন—বলে আর কোনো কথা না শুনে মহারাজ অন্তঃপুরের দিকে চলে গেলেন। সামন্ত বিদ্যাধর স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। এতবড় গুরুতর বিষয়ে এমন সংক্ষিপ্ত ভাষণে তিনি ব্যথিত হলেন।

নিজের ঘরে গিয়ে মহারাজ শয্যায় শুয়ে পড়লেন। পরিচারককে ডেকে বললেন—রাত্রে আর কিছু খাব না, শরীর খারাপ।

মহারাজ চুপ করে শুয়ে রইলেন শয্যার উপর।

সহসা দেয়ালের গায়ে আবার সেই ছায়ামূর্তি। মহারাজ শয্যার উপর উঠে বসলেন। ছায়ামূর্তি বলল—যুদ্ধে তোমার পরাজয় অনিবার্য। হোলকার একবার তোমাকে ধরতে পারলে তোমার মাথা কেটে নেবেন। কেশবদাসের হত্যা তিনি ক্ষমা করবেন না। তার চেয়ে সসম্মানে বিষপানে আত্মহত্যা করা ভালো।

আমি বিষ খাব? না না, আমি বিষ খেতে পারব না।

ছায়ামূর্তি হাসল। সাদা দাঁতের পাটি চিক চিক করে উঠল।

ছায়ামূর্তি মিলিয়ে গেল। মহারাজ অস্থিরভাবে ঘরের মধ্যে পদচারণা করতে শুরু করলেন।

সহসা কোনো একসময় মহারাজ পরিচারককে ডাকলেন, বললেন—একটা কাজ করতে হবে, গোপনে, কেউ না জানে।

আদেশ করুন।

একটা কেউটে সাপ নিয়ে আসতে হবে।

এখনই?

এখনই আজ রাত্রেই। এই নাও আমার পাঞ্জা।

রাজা তাকে পাঞ্জা দিয়ে দিলেন। পরিচারক চলে গেল।

পরদিন প্রত্যুষেই হোলকার বাহিনী জয়পুর অবরোধ করল। নগরমধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দিল। সামন্তেরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে সমবেত হলেন রাজসভায়। কিন্তু মহারাজ কোথায়? অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও 'এই আসে' 'এই আসে' করে বেলা প্রথম প্রহর অতীত হল, তবু মহারাজের দেখা নেই। শেষে বিদ্যাধর সামন্ত মহারাজকে ডাকতে লোক পাঠালেন। লোক এসে খবর দিল—মহারাজ এখনও ঘুম থেকে ওঠেননি।

এখনও ঘুমুচ্ছেন? সে কি? তাঁকে ডাকতে বল, এখনই লড়াই বেধে যাবে আর তিনি এখনও ঘুমুচ্ছেন!

এবার দৌবারিক এসে খবর দিল,—মহারাজ আত্মহত্যা করেছেন। কাল রাত্রে কেউটে সাপের কামড়ে তিনি প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন।

সামন্তেরা সংবাদ শুনে স্তব্ধ হয়ে গেলেন।

যুদ্ধ আর হল না। দুজন প্রবীণ সামন্ত হরগোবিন্দ ও বিদ্যাধর তখনই ছুটলেন মলহর রাও হোলকারের শিবিরে। হোলকার সংবাদ শুনে বললেন—কেশবদাসের মৃত্যুর প্রতিশোধ হল।

বিনা বাধায় মারাঠারা জয়পুর অধিকার করল।*

---

* Fall of Mughal Empire—Jadunath Sarkar. (12th Dec., 1950)

কার্তিক ১৩৬৬

পরলোকের হাঁড়ির খবর

আশাপূর্ণা দেবী

লম্বা সাঁকোটার এপারে একপাশ ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল বটকেষ্ট। সময় পেলেই এরকম দাঁড়িয়ে থাকে সে। সাঁকোটা দিয়ে মানুষ পারাপার দেখে। এটা বটকেষ্টর একটা নেশা। কে আসছে কে যাচ্ছে, কে চেনা কে অচেনা তার হিসেব রাখা।

তা সাঁকো পারাপার তো করছে সবাই। হরদম। দিনদুপুর নেই, রাতদুপুর নেই, সকাল নেই, সন্ধে নেই। এই যে মাত্র খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে বটকেষ্ট, কতক্ষণ তা অবশ্য জানে না, হাতে তো ঘড়ি বাঁধা নেই কাজেই সময়ের হিসেবও নেই। তবে খুব বেশিক্ষণ নয়। এইটুকুর মধ্যেই কতজন এল গেল। আজ আর চেনা জানা কাউকে দেখল না। আর সবাই তো ঝড়ের বেগে ছুটছে, দাঁড়িয়ে একটা কথা বলবে, এমন সময় নেই।

যারা যায় তাদের তো কথাই নেই, দৌড়োনোর ঘটা কী? যেন ট্রেন ফেল হয়ে যাচ্ছে, না রাজ্য হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। যারা আসে, তারা বরং কখনো কখনো একটু দাঁড়িয়ে বটকেষ্টর কাছে খোঁজ-তল্লাশ নেয়, কতদিন এখানে আছে বটকেষ্ট, জায়গাটা কেমন, এইসব।

আজ আর তেমন কাউকে পায়নি। কথা বলতে না পেয়ে পেট ফুলছিল বটকেষ্টর। হঠাৎ দেখতে পেল ওই দূরে, সাঁকোটার একেবারে ওমাথায় কে যেন আসছে, হাঁটার ভঙ্গিটা যেন চেনা চেনা।

দৈবক্রমে এ-সময় সাঁকোটা একটু ফাঁকা রয়েছে। বটকেষ্ট চোখের ওপর দিকে হাত আড়াল করে নিরীক্ষণ করে দেখতে চেষ্টা করল লোকটা কে!

নদীটা বিশাল, সাঁকোটাও বিশাল লম্বা। পার হয়ে আসতে সময় লাগে।

ধৈর্য ধরে থাকতে থাকতেই লোকটা কাছাকাছি এসে গেল। চিনতে পারল বটকেষ্ট। আর চিনে চমকে গেল!

গজগোবিন্দ না?

ও না মিলিটারির চাকরি নিয়ে জলন্ধরে না কোথায় চলে গিয়েছিল। তাগড়া জোয়ান চেহারা, এক কথাতেই চাকরি হয়ে গিয়েছিল। অবিশ্যি যুদ্ধ করার চাকরি নয়। গজগোবিন্দ হচ্ছে ডাক্তার, সেই চাকরিই পেয়েছিল মিলিটারিতে। তো এক্ষুনি চলে এল মানে?

ভাবতে ভাবতেই লোকটা, মানে গজগোবিন্দ একদম সামনে এসে গেল, আর চেঁচিয়ে উঠল, কেঁ বঁটা নাঁ?

বটকেষ্ট শিউরে উঠল। চমকাল খানিকটা আহ্লাদে, খানিকটা দুঃখে। বলল, তুঁইও চঁলে এঁলি?

তাঁ তোঁ এঁলুম। যঁমের মুঁখে থাঁকা তোঁ? কিন্তু তুঁই কঁবে?

সেঁই তোঁ উঁল্টোরথেঁর দিন। তুঁই দেঁশে না থাঁকাতেই আঁমার এঁই বিঁপত্তি। তোঁর ওঁষুদ একদাঁগ পঁড়লেঁই ঠিঁক সেঁরে যেঁতুম।

গজগোবিন্দ বলে উঠল, হঁয়েছিঁল কীঁ?

আঁর বঁলিস ক্যাঁনো! ওঁই উঁল্টোরঁথের মেঁলা দেঁখতে গিঁয়ে খান আঁষ্টেক পাঁপড় ভাঁজা আঁর দুঁ-কুঁড়ি মাত্তর বেগুঁনি-ফুঁলুরি খেয়েছিঁলুম। ব্যাঁস। হঁয়ে গেঁল। ব্যাঁটা নিঘ্‌ঘাত কেঁরোসিনে পাঁপড় ভেঁজেছিল।

গজগোবিন্দ হো হো করে হেসে বলে উঠল, তুঁই দেখছি এঁকরঁকমই রঁয়ে গেঁলিঁ। মেলার বাঁজারের পাঁপড়ভাঁজা দেঁখলে আঁর কাঁণ্ডজ্ঞাঁন থাঁকেঁ না।

হাসতে হাসতে আহ্লাদের চোটে গজগোবিন্দ ভীমের গদার মতো দু'খানা হাত মেলে জড়িয়ে ধরল বটকেষ্টকে। সঙ্গে সঙ্গে বটকেষ্টও তার লিকলিকে হাত দুটো বাড়িয়ে জাপটে ধরল গজুকে। তা ফল দুজনের একই হল।

'খুস' করে একটু হাওয়া খেলে গেল দুজনের মধ্যে। দুজনেই তো একটু হাওয়াই জাপটে ধরেছে।

সাঁকো দিয়ে হুড়মুড়িয়ে অনেকগুলো লোক চলে এল। বটকেষ্ট আর গজগোবিন্দর ওপর দিয়ে বয়ে গেল। ধাক্কা অবিশ্যি লাগল না, তবে একটা ডিসটার্বেনস্ তো বটে!

বটকেষ্ট বলল, চঁ গঁজু, আঁমার ওঁখানে। নিঁরিবিঁলিতে।

গজগোবিন্দ তাজ্জব হয়ে বলল, অ্যাঁ। এঁখেনে তোঁর নিজোঁস্বো ঘঁরবাড়ি আঁছে?

বটকেষ্ট একটু রহস্যময় হাসি হেসে বলল, 'আঁছে বঁললে আঁছে, নাঁই বঁললে নাঁই। তোঁ নিঁরিবিঁলিঁটা আঁছে। নবকেঁষ্টর মা তোঁ সেখাঁনের। পৃঁথিবীর বাঁড়িতে।

গজগোবিন্দ একটু দুঃখিত হয়ে বলল, ওঁ। তাঁই তোঁ! আঁহা। তুঁই আঁসার আঁগে খুঁব কান্নাকাঁটি কঁরল তোঁর গিঁন্নী?

তাঁ কঁরছিল। শুঁনতে শুঁনতে চঁলে এঁইচি। বহুঁদূর অঁবধি সেঁই চেঁচানির আঁওয়াজ কাঁনে এঁসেছে।

দুজনে আসতে লাগল। তবে হাঁটার কষ্ট তো নেই। হাওয়ায় ভাসা ব্যাপার। অনেকখানিটা দূরে চলে এসে বটকেষ্ট বলল, আঁয়।

গজগোবিন্দ অবাক হয়ে বলল, এঁই বাঁড়িটা আঁগে দেঁখেঁছি মনে হঁচ্ছে।

তাঁ হঁতেই পাঁরে। এঁটা আঁমার বঁর্ধমানের দেঁশের বাঁড়িটার প্যাঁটার্নেরঁ। ওঁখানে যাঁরা ভঁদ্দর হঁয়ে কাঁটিয়ে এঁসেছে তাঁদেঁরকে এঁমনটা দেঁওয়া হয়। গুঁড্ 'কন্ডাঁকটেঁর' প্রাঁইজ আঁর কিঁ!

কিছু গাছপালার পাশ দিয়ে দরজায় চলে এল বটকেষ্ট বন্ধুকে নিয়ে।

[বিঃ দ্রঃ—দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, প্রেসের ভাঁড়ারে 'চন্দ্রবিন্দু' অক্ষরটির শর্ট পড়ে যাওয়ায়, এদের কথোপকথনে আর চন্দ্রবিন্দু দেওয়া সম্ভব হবে না।]

গজগোবিন্দ কলেজে পাঠকালে একবার বটকেষ্টর দেশের বাড়িতে গিয়েছিল। এখন দেখে অবাক হয়ে গেল, ঠিক যেমন যেমন দেখেছিল সেই রকমই ব্যবস্থা। উঠোনে কুয়ো, কুয়োয় কপিকল লাগানো, পাশে ঘটি-বালতি।

দাওয়ার ধারে একখানা বড় চৌকি আর খান দুই-তিন জলচৌকি পাতা। অর্থাৎ এটাই ড্রইংরুম।

বটকেষ্ট বলল, হাত-মুখ ধুবি?

গজগোবিন্দ বলল, নাঃ। আসার আগে এইসা চান করিয়েছে, সর্দি হয়ে গেছে। বসি আয়।

চৌকিটায় বসল দুজনে।

বটকেষ্ট বলল, খাবি কিছু?

গজগোবিন্দ বলল, তা পেলে মন্দ হয় না।

কী খাবি বল?

কী আছে তোর?

কিছুই নেই, আবার সবই আছে। যা চাইবি, পেয়ে যাবি।

গজগোবিন্দ যোশ হয়ে বসে বলল, ব্যাপারটা কী বল তো?

ব্যাপারটা এইই। যা চাই মনে করবি, সামনে এসে যাবে। তবে—

একটু দুঃখু দুঃখু আর মজা মজা হাসি হাসল বটকেষ্ট।

কী হল রে বটা? 'তবে' বলে হাসলি যে?

বটকেষ্ট বলল, হাসছি এই জন্যে খেলে তুই টের পাবি না। খাচ্ছিস, খেলি।

অ্যাঁ।

সেই তো। এই যে তখন তোতে-আমাতে কোলাকুলি হল। হাতে-বুকে টের পেয়েছিলি কিছু?

গজগোবিন্দ আস্তে মাথা নাড়ল।

হুঁ। ঠিক সেই রকমই। দেখ হাতে হাতেই। তা তুই তো মিষ্টির যম ছিলি, মিষ্টিরই অর্ডার দিই?

তাই দে।

বটকেষ্ট হাতটা একবার উঁচু করে হাতছানি দেওয়ার মতো ভঙ্গিতে বলল, এই যে শুনছেন? বড় এক থালায় নবীনের রসগোল্লা গাঙ্গুরামের চমচম গিরিশের কড়াপাক কল্পতরুর অমৃতি আর তিতু ময়রার রসমালাই পাঠিয়ে দিন তো। বেশ বড় সাইজের থালা নেবেন। আর সব জিনিস চারটে চারটে দেবেন।

গজ বলল, ইয়ে বটা, চিত্রকূট হবে না? আমাদের ঝামাপুকুর লেনের মোড়ে হলধরের দোকানে যে পেল্লায় সাইজের চিত্রকূট বানাত? অবিশ্যি দামটা একটু বেশি। বোধহয় দু'টাকা করে। তবে কী ফাস্ট ক্লাশ।

দামের জন্যে ভাবতে হবে না।

গলাটা একটু চড়িয়ে বলল বটকেষ্ট, ঝামাপুকুর লেনের হলধরের দোকানের চিত্রকূট চারখানা।

গজগোবিন্দ বলল, সবাই চারখানা করে বলছিস, তুই খাবি না?

আমার মিষ্টি খাওয়া বারণ জানিস না? ডায়াবেটিস।

গজ অবাক হয়ে বলল, এখনো, এখানে এসেও আছে সে সব?

থাকবে না? জানিস না স্বভাব যায় না মলে?

বাঃ, এটা কী স্বভাব? এটা তো রোগ!

ও দুই এক। দেখিস এই রোগ নিয়েই আবার জন্মাতে যাব।

ধ্যেৎ।

ধ্যেৎ মানে? দেখিসনি কেউ কেউ জন্ম পেটরোগা, কেউ কেউ জন্ম থেকেই লোহা খেয়ে হজম করে। কারুর বা জন্মকাল থেকেই বারোমাস কান কটকট মাথা ঝনঝন নাকে সর্দি। কারুর ওসবের বালাই মাত্র নেই। মানেটা কী?

মানে বলবার আগেই চোখের সামনে চৌকির ওপর এসে পড়ল বৃহৎ একখানা খাগড়াই কাঁসার থালা। তাতে পরিপাটি করে সাজানো অর্ডারি-মালগুলি।

গজগোবিন্দর চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

বলল, কতকাল যে এসব জিনিস চোখে দেখিনি রে। মিলিটারিতে তো রুটি আর মাংস, ডাল আর চাপাটি ছাড়া কিছুই নেই। কিন্তু তুই একেবারে খাবি না? একলা খাব?

বটকেষ্ট হেসে বলল, খাব না বলে অর্ডার দিইনি। তবে দে দু-একটা।

গজ বিপন্নভাবে বলল, দেবই বা কোথা থেকে? যা গুনেগুনে আনালি। তো যাকগে, ডায়াবেটিসের রুগি মিষ্টি না খাওয়াই ভালো। আমিই হা হা হা গপাগপ লপালপ! এ কী, আরে কী হল? গেল কোথায় খাবারগুলো?

তোর পেটের মধ্যে।

ধ্যাৎ। কখন? খেলাম কই?

গপাগপ মুখে পুরলি না?

গজ মনমরা ভাবে বলল, পুরলাম, তাই না? কিন্তু জিভ জানতে পারল কই?

পায় না!

বটকেষ্ট বলল, ওই দুঃখে খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি। শুধু হাওয়া খেয়ে থাকি। কী হবে মিথ্যে ঋণের বোঝা বাড়িয়ে?

ঋণের বোঝা মানে? এসব ধার করে নিলি না কি?

বটকেষ্ট হেসে বলল, তবে? এই ধার করে রাখলাম, পরের জন্মে শোধ করতে হবে!

গজগোবিন্দ এখানে নবাগত, এপারের হালচাল কিছু জানে না। অবাক হয়ে বলল, পরের জন্মে? কি করে শোধ করবি? এইসব দোকান থাকবে?

থাকবে না আবার? পরের জেনারেশান কি দোকানে মিষ্টি খাওয়া ছাড়বে? তার পরের জেনারেশান?

গজ বলল, কিন্তু এখনকার লোকগুলো কী বেঁচে থাকবে তোর ধার শোধ নিতে?

আরে সে তো নিশ্চয় থাকবে না। তবে ওর নাতি-পুতি গিন্নি-পুণ্যি কেউ তো থাকবেই, তাদের দেব।

গজর হাঁ বেড়ে যাচ্ছে। তারা তোকে চিনতে পারবে?

চিনবে না। তবে না পারলেও কিছু এসে যাবে না। একজন্মের পাওনাদার সাতজন্ম পিছনে ধাওয়া করে ফেরে। আদায় না করে ছাড়ে না।

বটা!

কী?

তুই এত শিখলি কী করে?

এই লোকমুখে শুনে শুনে। সবাই তাদের এক্সপিরিয়েন্সের ফল শোনাতে ব্যস্ত।

গজগোবিন্দ কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে থেকে হঠাৎ বলে উঠল, এটাই তাহলে পরলোক? আমরা মরে গেছি?

শুনে হোহো করে হেসে উঠল বটকেষ্ট।

এতক্ষণে বুঝলি? দশবছর মিলিটারিতে থেকে তোর বুদ্ধি-সুদ্ধি ভোতা মেরে গেছে।

গজগোবিন্দ বলল, তাই হবে। তবে চল তোর এই পরলোকটা একটু বেড়িয়ে দেখি।

দূর! কোনো চার্ম নেই। সবই তো মরা। বাগান-টাগানগুলোয় সেই যে কোন কালে ফুল-ফল ধরে আছে, সে আর ঝরেও না, শুকোয়ও না। নদীতে বান ডাকে না, পাহাড়ে ধস্ নামে না। শহরে লোডশেডিং হয় না, বর্ষায় রাস্তায় জল জমে না, কোথাও কোনো কলকব্জা বিগড়োয় না, জামা-জুতো ছেঁড়ে না—

গজ উল্লাসে লাফিয়ে উঠে বলে, আরে সাবাস! এ যে দারুণ সুখের জায়গা রে।

দু-দশদিন থাক, বুঝবি ঠ্যালা। সুখে অরুচি ধরে যাবে। তার চে' তুই সেখানের গপ্পো বল সদ্য এলি। সদ্যই দেখে এলি!

গজগোবিন্দ হতাশ হয়ে বলল, ওখানের আর কী গল্প! মরছি তা টের পেয়েছি? কোথায় কোনখানে একটা বোমা পড়ল, ধারে-কাছেই নয়। শব্দে বুকটা কেমন ধড়মড়িয়ে উঠল, জ্ঞান হারিয়ে গেল; কে জানে কতক্ষণ অজ্ঞান ছিলাম। জ্ঞান ফিরলে দেখলাম, চেনা জগৎটা কোথায় হারিয়ে গেছে; মস্ত একটা নদী, তাতে লম্বা সাঁকো। বোকার মতো সেই সাঁকোর মুখে দাঁড়িয়ে আছি।....তারপরই হঠাৎ তোকে দেখে যেন বেঁচে গেলাম।

বটকেষ্ট আবার হেসে অস্থির।

বেঁচেই গেলি বটে। তো পৃথিবীর জন্যে মন কেমন করছে না তোর? যেতে ইচ্ছে করছে না?

করছে রে, খুব করছে। হঠাৎ আচমকা চলে আসতে হল! বৌ-ছেলেমেয়েকে লিখেছিলাম সামনের মাসে ছুটি নিয়ে বাড়ি আসছি। হল না। তারা খুবই মনোকষ্টে আছে তো? একটিবার যদি ঘুরে আসতে পারতাম!

বটকেষ্ট বলে ওঠে, ঘুরে আসা যায়। তবে ভাবছিস তারা তাহলে আহ্লাদে ভাসবে, কেমন? ওই আনন্দেই থাকো। যাও না। গিয়ে দ্যাখোগে। গেলে দেখেই আঁ আঁ করে চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করবে, ওঝা ডাকবে, ভূত ছাড়ানোর মন্তর পড়ে বাড়িতে সর্ষে পড়া ছড়াবে, দরজায় দরজায় আমনাম লিখে রাখবে।

কে বলেছে তোকে এসব?

গজগোবিন্দ তার ভীমের গদার মতো হাতের থাবাটা দিয়ে চৌকিতে একটা ঘুষি মারল। শব্দ-টব্দ হল না, শুধু ঘুষিটা উঠে এল হুস করে।

বটকেষ্ট বলল, বলেছে আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতা। আমার যে গিন্নি আমার চলে আসার কালে ডাক ছেড়ে কেঁদে কেঁদে বলছিল, 'তোমায় না দেখে আমি কী করে থাকবো গো--কী করে বাঁচবো গো'—তিনিই যেই না ভরসন্ধ্যায় বাইরের জানলায় আমায় একটু দেখেছেন, সেই বিকট চিৎকার করতে করতে সে ঘর ছেড়ে চম্পট। ছেলেটার পড়ার ঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়ালাম, ছেলে বলে উঠল, 'বাবা! প্লিজ্। দয়া করে তুমি আমাদের মায়া ত্যাগ করো।'....বলেই ফটাফট ঘরের তিন তিনটে আলো জ্বেলে দিয়ে চেঁচিয়ে নামতা পড়া শুরু করে দিল, 'আম দুই সাড়ে তিন! অমাবস্যে ঘোড়ার ডিম।'

শুনে গজ তো হাঁ।

হঠাৎ এটা বলতে বসল কেন?

বুঝছিস না? ইয়াংম্যান। ফুটবলে চ্যাম্পিয়ান। প্রত্যক্ষে 'আম'নাম করতে লজ্জা! তাই ওই কান ঘুরিয়ে নাকে হাত।

গজ একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, তাহলে বলছিস গিয়ে কোনো লাভ নেই।

লাভ ওই অভিজ্ঞতা। যতক্ষণ তুমি মানুষ, ততক্ষণ সবাই তোমার 'আপন', যেই তুমি 'ভূত' কেউ তোমার নয়।

কী? আমরা এখন ভূত?

গজ মিলিটারি মেজাজে চড়ে উঠল।

বটকেষ্ট বলল, 'ভূত' বলতে দুঃখু হয়, বলতে পারিস প্রেতাত্মা।

গজগোবিন্দ হতাশ গলায় বলল, নাঃ। মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করছে। একটু ঘুমিয়ে নিই। দারুণ ঘুম পাচ্ছে।

বটকেষ্ট লবডঙ্কা নেড়ে বলল, ওই 'পাবে'। হবে না।

হবে না?

না। এখানে নিদ্রাজাগরণ বলে কিছু নেই। কিম্ভূতকিমাকার একটা অবস্থা রে গজু। ক্ষিধের জ্বালা নেই,—খাওয়ার সুখ নেই। রোগ-ব্যাধির যন্ত্রণা নেই, আবার সুস্থ স্বাস্থ্যের আরামও নেই। দেহ আছে দেহ নেই।

গজগোবিন্দ বলে উঠল—'ক্ষিধের জ্বালা নেই' সেটা তো একটা শান্তি রে বটু। ক্ষিধের জ্বালার বাড়া তো দুঃখ নেই।

কী যে বলিস গজু! ক্ষিধের জ্বালা না থাকলে, খাওয়ার সুখটা পাবি? যেটা জীবনের সবচে' সুখ।

তাহলে—

তাহলে বলে কিছু বলতে যাচ্ছিল গজু, হঠাৎ একটা কেলে কুচ্ছিৎ খ্যাঁকশেয়ালিমুখো লোক এসে দাঁত খিঁচিয়ে বলে উঠল, এই যে গজগোবিন্দ ডাক্তার কে?

এই তো।

নিজের বুকে হাত চাপড়াল গজ। মানে ভাবল হাতটা চাপড়েছে।

লোকটা বলল, তা এসেছ তো অনেকক্ষণ, এতক্ষণ ফ্রেন্ডের সঙ্গে আড্ডা মারা হচ্ছে যে! ডিউটি দিতে হবে না?

ডিউটি।

গজ মিলিটারি। চড়ে উঠে বলল, এখানে আবার ডিউটি কিসের?

অ্যাঁ ডিউটি নাই? ওরে আমার চাঁদুরে! গরমেন্টের রাজত্বে বাস করবে, ডিউটি দিতে হবে না?

গজ চেঁচিয়ে বলল, বটা। ঠিক?

বটকেষ্ট বলল, খুব ঠিক রে ভাই!

তো কাজটা কী?

লোকটা বলল, 'কী তা গিয়েই দেখতে পাবে। পিথিবীতে যে যা করেছে, করত, এখানেও তাই করতে হবে। ধোবাকে রাতদিন ধোবার পাটে কাপড় কাচতে হবে, নাপতেকে রাতদিন লোকের গোঁপদাড়ি চাঁচতে হবে। কুমোরকে রাতদিন চাক ঘোরাতে হবে। কলুকে রাতদিন ঘানি ঘোরাতে হবে। কামারকে রাতদিন লোহা পেটাতে হবে। ছুতোরকে—'

বুঝলাম। গজগোবিন্দ বলে উঠল। আর আমাকে?

তোমাকে?

লোকটা মিচকে হাসি হেসে বলল, তোমায় দিনভোর রুগির নাড়ি টিপতে হবে।

তো এখানে তো রোগ-ব্যাধিই নেই শুনলাম।

নাইবা থাকল। তা বলে ডিউটি ফাঁকি দেবে নাকি? বলি ভূতের 'ব্যাগার খাটা' বলে কথা শোনো নাই কখনো? 'ভুতো খাটুনি'? এই যে তোমার বন্ধুবাবু, রেল কোম্পানির মালবাবু ছিল না? তো ওনার ডিউটি রাতদিন মাল ওজন আর তার হিসেব রাখা। তবে লোকটা মহা ফাঁকিবাজ। একদণ্ডে কাজ সেরে ওই নদীর ধারে গিয়ে বসে থাকে।

ও, ওই যেখান দিয়ে এলাম? বিশাল নদী! তো নদীটার নাম কী হে?

লোকটা নিজের কপাল চাপড়ে বলল, হায় কপাল। তাও বোঝোনি? বেশি পণ্ডিতদের এই হয়। বৈতরণী গো। বৈতরণী।

হুঁ।

গজ যেন নতুন করে শক্ খেল। বৈতরণী পার হয়ে চলে এসেছি? তার মানে সত্যি মারা গেছি? সত্যি ভূত হয়ে গেছি।

লোকটা হ্যা হ্যা করে হাসতে হাসতে গজকে ধাক্কা দিয়ে বলল, চল চল। প্রেথমে 'স্বরূপ ঘরে' ধোলাই হবে চল। তবেই টের পাবে।

গজগোবিন্দ মুখ ফিরিয়ে বলল, 'স্বরূপ ঘর' কী রে বটা? কী হয় সেখানে?

বটকেষ্ট হঠাৎ মিচকি হেসে বলল, এই যে এই হয়। আঁ আঁ আঁ আঁক করে ছুট মারল গজগোবিন্দ।

'স্বরূপ ঘরে ধোলাই-এর' পরে কী হয়?

আসল চেহারাটি হয়।

মুলো মুলো দাঁত, কুলো কুলো কান, উল্টো উল্টো পা, জটা জটা চুল, আর কেলে কম্বুলে গায়ের রং।

ধোলাই একবার হতেই হবে, মেকআপটাও নিতে হবে। তবে সেটা প্রকাশ করা তোমার ইচ্ছে সাপেক্ষ।

লোকটার সঙ্গে যেতে যেতে গজগোবিন্দ বলল, আমার থাকার জায়গাটা কোথায়?

কেন, হসপিটাল এরিয়ায়।

লোকটার একটু ইংরিজি বুলি প্রবণতা আছে।

গজ চারদিক তাকিয়ে তাকিয়ে যেতে লাগল। ঘরবাড়ি-বাগান-পুকুর সবই সাধারণ, সবই যেন দেখা দেখা!

লোকটা এগিয়ে যাচ্ছিল, গজ ডাক্তার জোর পায়ে হেঁটে তাকে ধরে ফেলে বলল, এইসব জায়গা কী এরিয়া?

লোকটা অবজ্ঞায় নাক কুঁচকে বলল, এইসব মিডল ক্লাসের!

ওর অবজ্ঞার ভাবে রাগ এলেও গজ বুঝল, এর কাছ থেকেই সব তথ্য জানা যাবে। আস্তে বলল, তো ভাই শুনেছি—পরলোকে নাকি 'স্বর্গ' আছে 'নরক' আছে, সেসব কই?

লোকটা আরো অবজ্ঞায় বলল, আছেই তো। কে বলল নেই? তো তোমার চোখের সামনে ঝুলে থাকবে নাকি?

সে তো বটেই, সে তো বটেই। তো কোথায় কোন রাজ্যে আছে?

লোকটা গোঁফে তা দিয়ে বলল, এই রাজ্যেই আছে। চিত্রগুপ্তর রাজ্যে। স্বর্গটা হচ্ছে গিয়ে 'পশ এরিয়া'। মানে বড়মানুষদের পাড়া। সেখানে অভাব নেই, অসুবিধে নেই, জ্বালা নেই। শুধু ঐশ্বর্য জৌলুস, আরাম আয়েস, আর যা ইচ্ছে করার স্বাধীনতা।

ওঃ। আর নরক?

সে হচ্ছে গিয়ে বস্তি-ঝুপড়ি-নোংরা-কাদা-পচানালা-পেঁকো পুকুর, আর হতভাগা সব লোকেদের চেঁচামেচি। তো তোমার আবার স্বর্গ-নরকের খোঁজ কেন? তোমার পাসপোর্ট তো এই মিড্‌লম্যান এলাকায়। আছে নাকি কেউ আপনজন স্বর্গে কিংবা নরকে? তো আমায় যদি টুপাইস দিয়ে দাও একবার দেখা করিয়ে আনতে পারি।

গজ বলল, না আমার কেউ ওসব জায়গায় নেই। থাকলে এখানেই আছে। তো নাম বললে খুঁজে দিতে পারো?

ও তুমি নিজেই খুঁজে পাবে। মেলা বোকো না। যত্ত সব ঝামেলা। চলো চলো।

তো সেই গেল তো গেল।

বটকেষ্ট রোজ ভাবে, কোথায় নিয়ে গেল গজকে! আর কি কখনো দেখা হবে? এই যে কত আপনজন এসেছে, এ যাবৎ কাউকে কি দেখতে পেয়েছে? ঠাকুর্দাকে একবার দেখতে ইচ্ছে করে। বড় ভালোবাসতো বুড়ো বটুকে। তো কে জানে সে এখন আবার সেতু পার হয়ে চলে গিয়ে কারুর ঘরে 'নতুন খোকা' হয়ে জন্মে বসে আছে কিনা।

তা শুধু কি ঠাকুর্দা? আরো কতজনই তো এসেছে বটুর জীবনকালে। কাকেই বা দেখতে পেয়েছে? একবার সেজ পিসেকে দেখেছিল, একবার নতুন জ্যাঠাকে, আর একবার পাড়ার শশীবাবুকে। তো শশীবাবু তো চোখাচোখি হতেই অচেনার ভান করে কেটে পড়লেন। পড়তেই পারেন। এখানে আসার আগে বটকেষ্টর কাছে বেশ কিছু টাকা ধার করেছিলেন কিনা, বিজনেস করব বলে।

তো সে যাক। গজাটার কী হল?

দিন মাস বছরের হিসেব নেই, হঠাৎ একদিন দেখতে পেল গজগোবিন্দ আসছে দু'হাত তুলে নদের নিমাইয়ের ভঙ্গিতে।

বটা আছিস? ওঃ, কতদিন থেকে খুঁজছি। তোর এই ঘরও হারিয়ে মরেছিলাম। হঠাৎ আজ দূর থেকে দেখলাম তুই বসে আছিস। তো সে যাক—বটা স্কুল না গিয়ে তুই কবিতা লিখতিস না? আর কলেজ লাইফে নাটক?

বটকেষ্ট অবাক হয়ে বলল, লিখতাম তো। তা এখন কী?

বলছি—আবার লেখ। আমি তোকে মেটিরিয়ালস দেব।

বটকেষ্ট হা হা করে হেসে উঠল, এখানে বসে কাব্য নাটক লেখা হবে?

না হবার কী আছে? তুই যদি লেখা ছেড়ে রেলগুদামের মালবাবু বনে না যেতিস এখানে তো তোকে ওই লিখতেই হত রাতদিন। দেখলাম তো ঘাড় গুঁজে লিখেই চলেছে কত কতজন। বলল, এখন নাকি ভীষণ চাপ, যতসব শারদীয়া সংখ্যা বেরোনোর মুখ। তো তুই একবার পুরোনো অভ্যেসটা ঝালিয়ে নে। তখন তো তোর লেখাগুলো নিয়ে কাগজের সম্পাদকদের দোরে দোরে ঘুরতিস, আর মুখ শুকিয়ে ফিরে আসতিস। এখন দ্যাখ্।

বটকেষ্ট হতাশ গলায় বলল, এখনো তাই হবে।

হবে না।

গজগোবিন্দ শূন্যে একটা তুলোর ঘুষি মেরে বলল, শুনলাম, নরলোকে নাকি এখন 'পরলোক'-এর খবরের জন্যে খুব চাহিদা। চটপট লিখে ফেলতে পারলে এই সামনের পুজোতেই কোনো একখানা গাবদা-গোবদা পত্রিকায় লাগিয়ে দিতে পারা যাবে। দেখে-শুনে মনে হচ্ছে তুই এখানে এসে ওই মালই জন করেছিস, আর সেতুর লোক গুনেছিস। এখানের তথ্য-টত্য কিছুর ধার ধারিসনি। তো

একখানা ঘুঘু রিপোর্টারের সঙ্গে বেশ পটিয়ে নিয়ে, আর নিজে ঘুরে ঘুরে অনেক সব মালমশলা জোগাড় করে ফেলেছি। বইয়ের নামও ঠিক করে ফেলেছি। তবে আমার তো লেখার অভ্যেস নেই! তুই কলমটা ধর।

বটকেষ্টর প্রাণটা একটু হাহাকার করে উঠল। আহা! অভ্যেসটা যদি রাখত। তবে বলা যায় না। লোকে তো বলে, সাঁতার শিখলে আর সাইকেল চালাতে শিখলে লোকে নাকি জীবনে-মরণে ভোলে না। তা কলম চালানোটাও কি—

কাঁপা গলায় বলল, বলছিস পারব?

আলবৎ পারবি!

কিন্তু ছাপবে কে? পড়বে কে?

হ্যাঁ, সেটাই তো কথা।

গজ বলল, তার জন্যে অবশ্য আমাদের নরলোকে নামতে হবে। কোনো একটা গাবদা ম্যাগাজিনের এডিটারকে কায়দা করতে হবে। তো তার জন্যে ভাবনা নেই। হয়ে যাবে। তেমন বেকায়দা করে একবার স্বরূপটা দেখিয়ে দেওয়া যাবে। ওঃ একবার লাগাতে পারলে—একদম হট্ কেক!

বটকেষ্ট বলল, কী করে বুঝছিস?

আরে জানিস না জ্যান্ত মানুষদের চিরটাকালই এই মরে যাওয়াদের সম্বন্ধে অগাধ কৌতূহল। প্ল্যানচেটে আত্মা নামায়, খুঁজে খুঁজে 'পরলোক' তত্ত্বর বই পড়ে। চিরটিকাল! তোর মনে আছে, আমাদের ইস্কুলের হেডস্যার 'পরলোকের কথা' বলে একটা সিরিজ লিখতেন? কী তার ডিম্যান্ড! অথচ সবই অন্যের বই থেকে টুকলিফাই! গাদাগাদা বই জোগাড় করতেন—ইংরিজি-বাংলা—

খুব মনে আছে।

তবেই বোঝ? টুকে মেরে বাহাদুরি। আর আমাদের এ বই একদম প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ!!

কিন্তু গজু, লেখার সরঞ্জাম?

গজু মুচকি হেসে বলে, সে কি আর জোগাড় না করে বলছি? এই দ্যাখ্ একটা উঠতি কবির টেবিল থেকে বাগিয়ে আনলাম। দিস্তে দিস্তে কাগজ মজুত রেখেছে, গোছা গোছা ডট্‌পেন! এন্তার লিখছে আর ছিঁড়ে দলা পাকিয়ে ফেলে দিচ্ছে। লিখছে আর ছিঁড়ছে। ছিঁড়ছে আর লিখছে। ভ্রূক্ষেপও নেই যে টেবিল থেকে একদিস্তে কাগজ আর একগোছা ডট্‌পেন উপে গেল। এই নে। নাটকাকারে লেখ, ঝপাঝপ এগিয়ে যাবে।

বটকেষ্টকে ধরে দিল গজগোবিন্দ সেই বাগিয়ে আনা কাগজ-কলম।

গজু রে—

বটু বলে উঠল—ওরে আমার খাস্তাগজা, জিবেগজা, নোনতা গজা, মশলা গজা! তোকে আমি বলেছিলাম, বুদ্ধি ভোঁতা হয়ে গেছে। আয় একটু কোলাকুলি করি, যাক গে কাজ নেই। তো কী যেন বলছিলি, নামটা ঠিক করে ফেলেছিস!

ফেলেছি! নাম হবে 'পরলোকের হাঁড়ির খবর!! প্রত্যক্ষদর্শীর কলমে—'!

'পরলোকের' একটা গুণ ইচ্ছে মাত্রই কাজ হয়ে যায়। চটপট, ঝটপট।

কাজেই বই শেষ হতে দেরি হল না।

বটু বলল, তবে আর দেরি করা ঠিক নয়, অ্যাঁ। শারদীয়া সংখ্যার মরসুম তো এসেই গেল।

গজু বলল, তবে চল। কিন্তু নাটকের প্রথম দৃশ্যটা একটু দেখা হবে না? আমি গড়গড়িয়ে বলে গেলাম, তুই খসখসিয়ে লিখে গেলি। জিনিসটা কী দাঁড়াল—

বটকেষ্ট সেই দিস্তেভর্তি কাগজ বাগিয়ে মুড়ে ফেলেছে। আর খুলল না। বলল, গোড়াটা? মুখস্থই বলছি। প্রথম দৃশ্য—পরলোকের মহাফেজখানা!

ঘরে ঘরে মন্ত্রী-উপমন্ত্রী, আমলা-সামলা, এবং ঘরের বাইরে অপেক্ষারত যত হ্যাংলা ক্যাংলা

ন্যাংলা! তাদের আবেদন, পরলোকের পিওন চাপরাশি পাহারাদার ইত্যাদিরা সাধারণদের প্রতি বড়ই দুর্ব্যবহার করে। দুরছাই করে। নিজেদেরকে লাট সাহেব ভাবে—

গজু চঞ্চল হয়ে বলে, থাক রে বটা। শুনতে গেলে আঠা ধরে যাবে, নেশা লেগে যাবে। তাহলে আজ আর যাওয়া হবে না। উঠে পড়া যাক।

উঠে পড়া মানেই হাওয়ায় ভেসে সেই নদীতীরে সেতুর মুখে।

কিন্তু সেতুর মুখের সামনে এক বিপত্তি।

দুটো মুস্কো কালো লোক বুলডগের মতো মুখে বলে উঠল, থামো থামো! যাচ্ছ কোথায় হে জোড় মানিক? বলি যাবার পাসপোর্ট আছে?

বটকেষ্ট ভয়ে ভয়ে গজুর দিকে তাকাল, কিন্তু গজুর নির্ভীক ভঙ্গি।

পাসপোর্ট আবার কী হে? আসার সময় তো এসব ঝামেলা হয়নি। সরো সরো।

সরার বদলে লোক দুটো ক্যাঁক করে দুজনকে ধরে ফেলে বলল, আসা আর যাওয়া এক হল? আসার সময় ওখানকার অফিস থেকে রিলিজ অর্ডার হয়ে গিয়েছিল, আমাদের লোক সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল।

জানি। ডাণ্ডস মারতে মারতে। তা বলে ভেবো না এখানের আইনকানুন আমি জানি না। সব জেনে ফেলেছি। পাসপোর্ট লাগবে তখন আবার যখন দুধের খোকা হয়ে ট্যা ট্যা করতে যাব। সে অনেক কাগজপত্র।

লোক দুটো বলল, সে হবে না। ছাড়া হবে না।

তার মানে টু পাইস চাই? কেমন? নড়তে-চড়তে টু পাইস। পাবে-টাবে না। এই যাচ্ছি তোমাদের এখানকার কীর্তিকাহিনি কাগজে ছাপিয়ে দিতে।

লোক দুটো ফস করে ওদের হাত ছেড়ে দিয়ে বলে, কাগজের লোক? ও বাবা!

না, লেখক। বই লিখে নিয়ে যাচ্ছি ছাপাতে।

উরিব্বাস!

লোক দুটো হঠাৎ নরম হয়ে গিয়ে হাত কচলে বলে, তাহলে আমাদের 'কথা' একটু লিখে দেবেন স্যার।

তোমাদের আবার 'কথা' কিসের হে? দিব্যি যখন-তখন লোককে ডাণ্ডস মারতে মারতে সাঁকো পার করে করে নিয়ে আসছ আর 'মাসল' বাগাচ্ছ। তোফাই তো আছ।

লোক দুটো অসন্তুষ্ট গলায় বলল, ওই তো। ওই দুঃখেই তো মরে আছি। হুকুমের চাকর, হুকুম মতোই চলতে হয়। তো এই নিকৃষ্ট কাজটায় আর মন নাই। যদি কাগজে লেখালিখি করে পিথিবীতে একটা চাকরি মেলে—

আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। দেখা যাবে। এখন পথ ছাড়ো তো।

লোক দুটো তাড়াতাড়ি পথ ছেড়ে দেয়।

ওরা দুই বন্ধু সাঁকো পার হয়ে চলে আসে।

তারপর বলে ওঠে, এখন কোন দিকে?

বটকেষ্ট বলে, কোন দিকে আবার? সোজা 'রণডঙ্কা' অফিসে। ব্যাটা সম্পাদক জন্মজীবনে আমার একটা লেখা ছাপেনি। সব অমনোনীত বলে ফেরত দিয়েছে। আবার কতগুলো ফেরত দেয়ওনি। ওকে দিয়েই এখন এই বই ছাপিয়ে নিতে হবে।

গজগোবিন্দ বলল, নিয়েছিস তো গুছিয়ে?

সে আর বলতে।

বিকেল চারটে।

'রণডঙ্কা' সম্পাদক খগেন ঘোষাল যথারীতি চেয়ারটা টেনে টেবিলের ধারে বসে ডিশ ঢাকা

চায়ের কাপটা হাতে তুলে নিয়ে মুখে ঠেকিয়ে 'আঃ' বলে ওঠবার বদলে বিশাল হাঁক পাড়লেন, বনমালী! এই বনমালী! এ কী দিয়ে গেছিস আমায়? চা না নিমের পাচন? বনমালী!

বনমালীর সাড়া পাওয়া গেল না। তার বদলে কোথা থেকে যেন একটা 'খি-খি-খি-খি' হাসির শব্দ শুনতে পাওয়া গেল।

এর মানে? খগেন ঘোষালের চুল খাড়া হয়ে উঠল। এত সাহস হয়েছে ব্যাটার!

আবার হাঁক পাড়লেন, এই ব্যাটা বনমালী। বদমাশ শয়তান। আবার হাসি! চায়ে দুধ আর চিনি দিয়ে যা।

আবার হাসি। খি-খি-খি।

খগেন ঘোষাল এখন সচকিত হলেন। হঠাৎ এতটা দুঃসাহস হবে বনমালীর? শব্দটা যেন ঘরের মধ্যেই খেলে বেড়াচ্ছে। দেওয়াল থেকে সিলিঙে, সিলিং থেকে দেওয়ালে।...নাকি জানলার বাইরে থেকে?

তবু আবারও চেঁচিয়ে উঠলেন, বনমালী!

তখন সেই হাসিরাই জবাব দিল, বঁনমাঁলীর আঁশাঁ ছাঁড়ুঁন। সেঁ এখঁন চোঁখ উঁল্টে হাঁত-পাঁ খিঁচছে।

[বিঃ দ্রঃ—প্রেসে নতুন এক কেস 'চন্দ্রবিন্দু' এসে যাওয়ায় আর ঘাটতি পড়ছে না। যথাযথ কাজে লাগানো হচ্ছে।]

খগেন ঘোষাল সাহসী ব্যক্তি। তিনি কড়া গলায় বললেন, তোমরা কে হে? কোথা থেকে কথা বলছ?

আঁগ্যে এঁই আঁপনার সাঁমনে থেঁকেই। আঁপনি যঁদি চোঁখ থাঁকতেঁ অন্ধ হঁন আঁমরা নাচাঁর। এঁই আঁপনাঁর ডাঁন দিঁকে আঁমি কঁবি বঁটকিষ্ট পাঁল। আঁর আঁপনার বাঁদিঁকে আঁমার বঁন্ধু ডাঁক্তার গঁজগোঁবিন্দ খাঁসনবীশ!

খগেন ঘোষাল অনুভব করলেন তাঁর দুটো হাতের ওপর দিয়ে একটা হিমালয়ের হিমেল হাওয়া বয়ে গেল।

খগেন ঘোষাল কোনোমতে জামার মধ্যে থেকে পৈতেটা টেনে বার করে মনে মনে রামনাম জপ করতে করতে বললেন, কী উদ্দেশ্যে হঠাৎ আমার এখানে?

দুটো গলা থেকে বা দুটো নাক থেকে একসঙ্গে একটা কথা উচ্চারিত হল, উঁদ্দেশ্যঁ মহঁৎ। 'রণডঙ্কা'র শাঁরদীয়ার জঁন্যে এঁকখাঁনা বিঁশ্বের সেঁরা কৌঁতুক-নাট্য এঁনেছি, পঁরলোঁকের হাঁড়ির খঁবঁর। এঁটা এঁ বঁছর পুঁজো সংখ্যাঁ রঁণডঙ্কায় ছাঁপিঁয়ে দেঁবেঁন।

ছাঁপিঁয়ে দেঁবেঁন!

শুনেই খগেন ঘোষালের সম্পাদক সত্তাটি তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠে। স্থান-কাল-পাত্র ভুলে চেঁচিয়ে ওঠেন, ছাপিয়ে দেব? মামাবাড়ির আবদার? পুজো সংখ্যার সব কমপ্লিট হয়ে গেছে, বুঝলেন? কেটে পড়ুন! কেটে পড়ুন।

কীঁ! কেঁটে পঁড়ঁব? অঁত সঁস্তা নাঁ। তুঁমি বুঁড়ো খগেঁন ঘোঁষাঁল। একদাঁ আঁমায় অনেঁক কাঁট মাঁরিয়েঁছ। আঁর ছাঁড়ান না। দেঁখিঁস বুঁড়ো, এ লেঁখা বাঁজাঁরে পঁড়তে পাঁবে না। হঁট কেঁকেঁর মঁতন উঁঠে যাঁবে। শাঁরদীয় 'রণডঙ্কা' আঁবার ছাঁপাঁতে হঁবে।

'আপনি' থেকে 'তুমি', তুমি থেকে 'তুই'।

মানুষের সহ্যের একটা সীমা আছে তো?

খগেন ঘোষাল চেঁচিয়ে ওঠেন, পুলিশ। পুলিশ। কনস্টেবল, কনস্টেবল। পাহারোলা। পাহারোলা। ও. সি! ও. সি! মুখ্যমন্ত্রী! মুখ্যমন্ত্রী! রাজ্যপাল! রাজ্যপাল! জৈল সিং! জৈল সিং! রাজীব! রাজীব!

হেঁ হেঁ, খেঁ খেঁ হিঁক্ হিঁক্, হঠাৎ যেন অদৃশ্য শূন্যে দুটো গলা দুইয়ে শূন্য কুড়িটা হয়ে হাসির

বান ডাকিয়ে দেয়, ওঁ বঁটা! তোঁর এঁডিটাঁর দাঁদু অ্যাঁতো নার্ভাস? শুঁদু বাঁশী শুঁনেই এই। চোঁকে দেঁখলে তোঁ—তাঁ থাঁকগেঁ! আঁপনাঁকে আঁর ভিমিঁ খাঁওয়াবোঁ না। এঁই লেঁখাটা দিঁয়ে যাঁচ্ছি, ছাঁপা হঁওয়া চাঁই। দেঁ বঁটা, দিঁয়ে দেঁ। থঁলিটা উঁপুড় কঁরে দিঁয়ে চঁটপঁট চঁলে যাঁই।

ব্যস থলি উপুড় করে বটকেষ্ট! আর সেই 'লেখা'রা খগেন ঘোষালের গা-মাথা টেবিল-চেয়ারের ওপর ঝরঝরিয়ে ঝরে উপচে ছড়িয়ে পড়ে।

কী এ? কী এ? আ আ আ। এ সব কী?

চেয়ার ঠেলে টেবিল উল্টে চায়ের পেয়ালা ভেঙে কালির দোয়াত ছিটকিয়ে সারাঘরে দাপাদাপি করে বেড়ান খগেন ঘোষাল আর্তনাদ করতে করতে, বনমালী। বনমালী! তুই কি মরে গেছিস! ওরে বাবারে! এগুলো কিরে?

ক্যাঁনো? এঁই তোঁ আঁমাদের কাঁলজঁয়ী কৌঁতুক-নাঁটক 'পঁরলোকেঁর হাঁড়ির খঁবঁর-এর ম্যাঁনাঁসক্রিপট্' পিঁন কঁরা হঁয়নি, গুঁছিয়ে নেঁবেন। ছাঁপাবেন তোঁ দাঁদাঁ, অ্যাঁ—! না ছাঁপালেঁ কিন্তু—

না ছাপলে কী হবে তা আর শুনতে পান না খগেন ঘোষাল। কারণ? কারণ তখন—

চোখের সামনে ঝলসে উঠেছে একজোড়া 'স্বরূপ'। দু'প্রস্থ মুলোর সারিতে ফিক ফিক হাসি, আর দুখানা দুখানা চারখানা 'কুলো'র লটপটানি।

ভির্মি খেয়েই দমাস করে পড়ে যান খগেন ঘোষাল। ফেনা ওঠা মুখে একটি আওয়াজ বেরোয়, ফুঃ ফুঃ ফুঃ লিঃ শ্।

ওরা সাঁকোয় উঠে হাস্যবদনে বলে, নাঁটকটা যঁদি স্টেঁজে নাঁমায় খুঁব জম্পেঁস হঁবে, কী বঁলিস?

এদিকে নরলোকের হাঁড়ির খবর এই—

'পুলিশ কোনো কাজের নয়' একথা ভুল। ঘণ্টাকয়েক পরেই এসেছিল পুলিশ। যা করবার করেও ছিল। চটপট। পরদিনই কাগজে কাগজে খবর, 'রণডঙ্কা পত্রিকা' অফিসে লণ্ডভণ্ড কাণ্ড!!....গতকাল বিকালে দুইজন দুর্বৃত্ত 'ভূতের ছদ্মবেশে পত্রিকা অফিসে বলপূর্বক হানা দিয়া তাণ্ডব-নৃত্য শুরু করে। যথেচ্ছ ভাঙচুর ও মারপিটের পর সম্পাদককে শাসাইয়া রাশি রাশি হিজিবিজি আঁকিজুঁকি কাটা কাগজের টুকরা সর্বত্র নিক্ষিপ্ত করিয়া রহস্যজনকভাবে অন্তর্ধান করে।

কাগজগুলি দেখিয়া মনে হয় কোনো সাঙ্কেতিক ভাষায় লিখিত বিশেষ ইস্তাহার! দুর্বোধ্য ভাষায় লিখিত এই 'ইস্তাহারের কয়েকটি' নমুনা পাঠোদ্ধারের জন্য 'বিশেষজ্ঞ'দিগের কাছে পাঠানো হইয়াছে।

আততায়ীদিগের উদ্দেশ্য বোঝা যাইতেছে না। কেহ ধরা পড়ে নাই।

সম্পাদক খগেন ঘোষাল ও বেয়ারা বনমালী দাস এখন হাসপাতালে।'

—

আশ্বিন ১৩৯৩

একটি ভালোমানুষ ভূত

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

ভূত চোখে দেখা যায় না। হাত দিয়ে ছোঁয়াও যায় না। তাই তাকে ধরা যায় না। কিন্তু এক একটা ভালোমানুষ ভূত নিজের বোকামিতে ক্বচিৎ কখনও ধরা পড়ে যায়।

এইরকম একটা ঘটনা ঘটেছিল আমাদের বাগানবাড়িতে। সেই গল্পটা শোনাই ঃ

বাবার সাহিত্যের বাতিক ছেলেবেলায় ছিল। কিন্তু চাকরির তলায় এতদিন চাপা ছিল। এখন অবসর নিতে সেটা আবার চাগিয়ে উঠল। বললেন, আর কলকাতা শহরে ঘিঞ্জির মধ্যে নয়, বাইরে একটু খোলামেলায় থাকতে হবে।

কিন্তু ঠিক সে রকম জায়গা কলকাতার বাইরেও আজকাল মেলা ভার। সব বাড়িরই তিনদিক বন্ধ। সামনে রাস্তা। সেদিকে বাসের শব্দ।

অবশেষে পাতিপুকুরের দিকে একটা বাগানবাড়ির সন্ধান পাওয়া গেল। সামনের রাস্তায় বাস চলে বটে, কিন্তু রাস্তাটা এমন নির্জন এবং বড় বড় গাছের ছায়ায় ঢাকা যে, বাস না চললেই বিশ্রী লাগত।

বিঘে দশেক জায়গা। সামনে ফটক। সেখান থেকে একটা পুকুর ঘুরে বাড়িটা। পিছনে আম-জাম-কাঁঠাল-নারিকেলের বাগান। বাড়িটা অযত্নে নড়বড়ে হয়ে গেছে। কিন্তু মেরামত করতে চাঙ্গা হয়ে গেল।

মা বললেন, এই তেপান্তরের মাঠে আমি বাস করতে পারব না।

বাবা বললেন, তেপান্তরের মাঠ বটে, কিন্তু খুব নিরাপদ। বাড়ির ডাইনে-বাঁয়ে দু'দিকেই জলা। তার ওপর কচুরিপানার জঙ্গল। ওদিক দিয়ে চোর আসবার ভয় নেই। ফটকে দারোয়ান। পেছুনে মালীর ঘর। সীমানার বাইরে একটা উঁচু জায়গায় একটা মাটকোঠা। সেখানে, খবর নিয়েছি, যত কাঠের আর লোহার মিস্ত্রির বাস। সেই দেখেই তো জায়গাটা কিনলুম।

মায়ের মনটা খুঁত-খুঁত করছিল। আমাদেরও। কিন্তু বাবার যখন অত ইচ্ছা তখন সবাই মিলে একটা শুভদিন দেখে এসে পড়লাম।

কলকাতার ঘিঞ্জি এবং কোলাহল থেকে এই শান্ত নির্জন খোলামেলা বাড়িটায় এসে কী ভালো যে লাগল, সে আর বলবার নয়। পাখির ডাকে ভোরে ঘুম ভাঙে। সূর্যোদয়ের মুহূর্তে বাগানে ঘুরে বেড়াই। অযত্নে বাগানটা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। মালীকে নিয়ে বাবা সমস্ত বাগান ঘুরে বেড়ান।

মনে হল, কলকাতার চাপা বাড়ির মধ্যে বুকটাও যেন চুপসে ছিল। এখানে তা যেন রঙিন বেলুনের মতো ফুলে উঠেছে।

দুটো কি তিনটে দিন এমনি কাটল। তারপরে একদিন সকালে আমরা বাগানে আসতেই মালী শুষ্কমুখে এসে বাবাকে নমস্কার করে দাঁড়াল।

কি খবর মালী?

আজ্ঞে খবর ভালো নয়।

কেন?

আজ্ঞে বাগানটা ভালো নয়।

কেন? কি হয়েছে?

আজ্ঞে রাত্রে লালপাড় শাড়িপরা একটি ছোট মেয়ে বাগানময় যেন নেচে বেড়ায়।

কাদের বাড়ির মেয়ে?

শুষ্কমুখেও মালী এবার হাসলে ঃ আজ্ঞে কার বাড়ির মেয়ে আর সারারাত পোড়ো বাগানে নাচতে আসবে!

বাবার বুঝতে বিলম্ব হল না ব্যাপারটা কি। মেয়েটাই বা কে হতে পারে।

জিজ্ঞাসা করলেন, কি করে মেয়েটা?

ওই তো বললুম বাবু, বাগানময় নেচে বেড়ায়। প্রথম দিন আমিও ভেবেছিলাম, বুঝি কারও বাড়ির পাগলি মেয়ে পালিয়ে এসে অমনি করছে। তাড়া দোব ভেবে বেরিয়ে আসছি, দেখি বাঁশের ডগার মতো লম্বা একখানা হাত বের করে মগডালের আম পাড়ছে! আমি আর বেরুলুম না বাবু।

বাবা ভিতরে ভিতরে ভয় পেয়ে গেছেন। কিন্তু মুখে হো হো করে হেসে বললেন, ভূত-টুত সব বাজে কথা, বুঝলে মালী।

মালীর ভয়ার্ত মুখ দেখে মনে হল না বুঝলে।

আজ রাত্রে এক কাজ করো মালী।

আজ্ঞে করুন।

কালকের সেই মেয়েটা এলেই, তোমাকে একটা হুইস্‌ল দেব, সেইটে বাজাবে। আমি তৈরি থাকব...কিন্তু বন্দুকটা ছোঁড়া যায় কোত্থেকে? আমার ঘর থেকে সুবিধা নেই।

আজ্ঞে সুবিধা থাকলেও কিছু হত না বাবু। বন্দুকের গুলি তো ওদের বেঁধে না। মাঝে থেকে রেগে গিয়ে বিপদ ঘটান।

যুক্তিটা বাবাও যেন উপলব্ধি করলেন।

জিজ্ঞাসা করলেন, স্পষ্ট দেখলে হাত বাড়িয়ে মগডালের আম পাড়ছে?

স্পষ্ট দেখলুম বাবু। মাকালীর দিব্যি। বিশ্বেস না হয়, আজ রাত্রে আমার ঘরে এসে দেখবেন।

বাবা ভূত বিশ্বাস করেন না। কিন্তু মালীর ঘরে সারারাত বসে ভূতের আমপাড়া দেখার কৌতূহলও বোধ হয় নেই।

বড়দা গত বৎসর এম. এ. পাশ করে বসে আছেন। এখনও কোথাও কাজের সুবিধা করতে পারেননি। ঘুম থেকে উঠে বিকেলে চা খেয়ে তিনি বেরিয়ে যান, ফেরেন রাত দশটায়।

ভূতে তিনিও বিশ্বাস করেন না। মালীর কথা শুনে খুব একপ্রস্থ হাসলেন। বিকেলে তিনি বেরিয়েও গেলেন যথারীতি। কিন্তু ফিরলেন সন্ধ্যার আগেই।

বড়দা, এত সকালে ফিরে এলে?

শরীরটা ভালো লাগছে না রে।

সপ্তাহ কেটে গেল, কিন্তু তাঁর শরীর একদিনও ভালো লাগল না। রোজই বিকেলে বেরোন আর রোজই সন্ধের আগে ফেরেন।

ছোটকাকা এলেন একদিন বেড়াতে। মায়ের কাছে শুনে তিনি তো হেসেই অস্থির। বললেন, বয়স হয়েছে, এখনও ভূতের ভয় গেল না?

মা অকপটে স্বীকার করলেন, ভূতের ভয় তাঁর আছে।

ছোটকাকা বললেন, ভূত-টুত সব বাজে কথা বৌদি। ঝোপে-ঝাড়ে চাঁদের আলো-টালো পড়লে অনেক সময় ওরকম মনে হয়।

কিন্তু হাতখানা?

কি হাতখানা? আম পাড়ছে?—ছোটকাকা আর একপ্রস্থ হাসলেন।—ভয়ে অনেক সময় ওরকম মনে হয়। তাছাড়া কি জান? হয়তো সমস্তটা ওই বেটারই চালাকি।

চালাকি বলছ যে, তার মুখখানা তো দেখনি। সূয্যি ডুবতেই সে সুট সুট করে আমাদের বাড়িতে এসে ঢোকে।

তাই নাকি! ভয়ানক ভীতু তো। একটা শক্ত মালী রাখ বৌদি। ওকে দিয়ে হবে না।

ছোটকাকা উঠলেন।

মা বললেন, উঠছ কি? রাত্রে খাওয়া-দাওয়া করে যাবে।

সূর্য সবে ডুবেছে। রাস্তার আলো একটু পরেই জ্বলবে। ছোটকাকা শশব্যস্তে বললেন, আজ নয় বৌদি। আজ আরেক জায়গায় খুব জরুরি দরকার আছে। আরেক দিন হবে।

বলেই ছুটলেন। আর এক মুহূর্তও দাঁড়ালেন না।

আমাদের বাড়িতে সবাই সাহসী, আমি আর মা বাদে। তবু কি রকম একটা পরিবর্তন যেন আমাদের বাড়িতে এল। সন্ধের পরেই বাবা নীচের ঘরে বসা বন্ধ করলেন। বড়দার অমন যে তাসখেলার নেশা তাও আর রইল না।

মা বেলাবেলি রান্না সেরে হেঁসেল ওপরে নিয়ে আসেন। গল্প-গুজব যথারীতি অনেক রাত্রি অবধি হয়। তারপরে খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়া।

বড়দা ও-পাশের ঘরে একা শুতেন। এ-পাশের ঘরে মা আর আমি। মধ্যের বড় হলঘরে বাবা একা। মা ভীতু মানুষ। বললেন, খোকনকে নিয়ে তিনি একা পাশের ঘরে শুতে পারবেন না।

শুনে যত হাসলেন বাবা, তত বড়দা।

কিন্তু মা যখন জোর করে বড়দার খাটও মাঝের বড় হলঘরে নিয়ে এলেন, কেউ আপত্তি করলেন না। নিস্তব্ধ রাত্রে শুয়ে শুয়ে শুনতে লাগলাম বাগানে খুটখুট, টুপটাপ শব্দ। কিন্তু বাবা এবং বড়দা এমন ভাব দেখাতেন যেন ওসব শব্দ তাঁদের কারও কানে যাচ্ছে না। ও নিয়ে কোনো আলোচনাও হত না।

মালী তখন নীচের ঘরে দরজা-জানালা বন্ধ করে শুয়ে।

একদিন মালীকে জিগ্যেস করলাম, মালী, তুমি রাত্রে শব্দ শুনতে পাও না?

মালী বললে, শুধু শব্দ, হাসির আওয়াজও শুনতে পাই।

হাসি?

কি রকম একটা চাপা হাসি। সেই হাসি আমি দেখেছি।

কি করে?

বাগানের ঘরে থাকতে দেখেছি, গাছগুলোর ডালে-ডালে কে যেন টর্চের আলো বুলিয়ে গেল। টর্চের আলোর মতন। কিন্তু আসলে ওটা ওদের হাসি। ওরা ওই রকম করে হাসে!

কি সর্বনাশ!

কণ্টকিত দেহে মাকে গল্পটা বলতে গেলাম। একটু বলতেই মা হাত দিয়ে আমার মুখটা চাপা দিলেন। বললেন, থাক।

আমাদের কলকাতার বাড়িতে একজোড়া অ্যালসেশিয়ান কুকুর ছিল।

তার একটিকে ছোটকাকা একদিন নিয়ে এলেন।

বললেন, তোমাদের যে-রকম ভয় বৌদি, এটা তোমাদের কাছে থাক।

ম্লান হেসে মা বললেন, যা নিয়ে ভয় ঠাকুরপো, সেখানে কুকুর কি করবে?

তার হাসির গল্পটা ছোটকাকাকে শুনিয়ে দিলেন।

ছোটকাকা হেসে গড়াগড়ি দিলেন। কিন্তু সেদিন তাঁর আরও জরুরি কাজ ছিল। আরও সকাল-সকাল চলে গেলেন। চা পর্যন্তও অপেক্ষা করলেন না।

কুকুরটাকে রেখেই গেলেন।

তারপরের দিনই বোধহয়। কত রাত্রি হবে জানি না, হঠাৎ একটা চিৎকার শুনলাম। ছোট মেয়ের চিৎকার। তার সঙ্গে একটা ধস্তাধস্তির শব্দ। একটা ভয়ংকর অস্ফুট গর্জন।

মায়ের ঘুম ভেঙে গেল। আমারও।

মা বাবাকে ডাকলেন। বড়দাকেও।

শব্দটা ওঁরাও শুনেছেন বলে মনে হল। কিন্তু সাহসী লোক, গ্রাহ্য করলেন না। পাশ ফিরে শুয়ে বললেন, ও কিছু নয়। ঘুমোও।

এমন সময় মালীর গলার আওয়াজ পেলাম ঃ শিগ্‌গির বেরিয়ে আসুন, শিগ্‌গির বেরিয়ে আসুন।

বাবা এবং বড়দা দুজনেই সাহসী। এসব সামান্য ব্যাপার গ্রাহ্য করলেন না। কিন্তু মায়ের সাহস নেই। তিনি থাকতে পারলেন না। ছুটে বেরিয়ে গেলেন। তাঁর পিছু পিছু আমি।

আমাদের সাড়া পেয়ে মালী টর্চ হাতে ছুটল বাগানের দিকে।

কি হয়েছে? কি হয়েছে?

মালী সাড়া দেয় না, ছোটে। পিছু পিছু আমরাও। শুধু শুনতে পাচ্ছি আমাদের অ্যালসেশিয়ানটার গর্জন। তাকে বাগানে কে ছেড়ে দিয়েছিল জানি না। বোধহয় নিজেই গিয়েছিল।

আমাদের সাড়া পেয়ে সে একবার আমাদের দিকে ছুটে আসে, একবার বাগানের এক প্রান্তে।

মালীর টর্চ পড়ল যেদিকে কুকুরটা ছুটছিল সেই দিকে।

পাঁচিলের উপর ও কে?

লালপাড় শাড়িপরা একটা মেয়ে না? আমাদের দেখে দু'হাত আকাশে তুলে চিৎকার করে উঠল ঃ বাঁচান! আমাকে বাঁচান!

বাবার গর্জন শোনা গেল। তাঁর হাতে বন্দুক।

তাঁর পিছনে দাদা। তাঁর হাতে চাবুক।

ভালোমানুষ ভূতকে মই থেকে নামানো হল। গাছের ডাল থেকে আরও কয়েকজনকে। বাবার হাতে বন্দুক, দাদার হাতে চাবুক, সক্কলের উপরে ওই বাঘের মতো অ্যালসেশিয়ান। ভূতগুলো ভয়ে কাঁপছে।

চেনা ভূত। বাগানের পিছনে যে মাটকোঠা, ওইখানে থাকে। মেয়েটি তাদেরই। লোকগুলো আম পেড়ে দেয়, মেয়েটি কুড়োয়। কখনও মেয়েটি নিজেও টুসিতে করে আম পাড়ে। মালী সেইটেকেই ওর লম্বা হাত ভেবেছিল।

বাবা বললেন, পুলিশে খবর দাও।

দাদা বললেন, সে তো পরে। আগে নিজেদের হাতের সুখ মেটাই। এই চাবুকে ওদের পিঠের চামড়া তুলব।

মা বললেন, থাম। খুব বীরত্ব দেখানো হয়েছে!

ওদের জিগ্যেস করলেন, তোমাদের যেন চেনা-চেনা মনে হচ্ছে।

হ্যাঁ মা ঠাকরুন, আমরা ওই মাটকোঠায় থাকি। দিনে মিস্ত্রির কাজ করি। গরিব মানুষ, আমের সময় বরাবর এই বাগানের আম পেড়ে খাই, কখনো বিক্রি করি।

দাদা চাবুক আস্ফালন করে বললেন, বিক্রি করি! বেটা, তোমাদের বাবার বাগান!

মা বললেন, এবারে বাড়ি যাও। আর কখনও বাগানে ঢুকো না। যা কুকুর রয়েছে, ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দেবে।

আবার!

ভূতগুলো মাকে-বাবাকে প্রণাম করে চলে গেল।

পৌষ ১৩৬৮

মরা বোন ও ভূতুড়ে পাইন

শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়

ছেলেবেলার স্মৃতি-জড়ানো বিরাট পাইন গাছটার সামনে এসে দাঁড়াল হানস্। কী দশাই হয়েছে গাছটার! স্নিগ্ধ, সবুজ পত্র-পল্লবের কোনো ঐশ্বর্যই আজ আর নেই তার দেহে, শুধু একটা মৃত শুষ্ক কাণ্ড হাড়গোড় বার করে দাঁড়িয়ে আছে! গাছটার দিকে চেয়ে চেয়ে চোখে জল এল হানস্-এর। এই গাছের তলাতেই কবর দেওয়া হয়েছিল তার বাবা-মাকে। তাদের ছোট দুই ভাই-বোনকে রেখে মারা যান হানস্-এর বাবা ও মা—অল্পদিনের মধ্যেই, পর পর। বুড়ো দাদু ও দিদিমার কাছে মানুষ হয়েছিল হানস্ আর তার ছোট বোন লেনা। এই গাছের তলায় বসে দিনের-পর-দিন দাদু ও দিদিমা তাদের নিয়ে কত মজার মজার গল্পই না বলতেন! কিন্তু আজ সে দাদুও নেই, দিদিমাও নেই, আর আদরের সেই একমাত্র বোন লেনাও নেই—নেই মানে, বেঁচেই নেই নিশ্চয়! অতীতের শেষ স্মৃতি বহন করে দাঁড়িয়ে আছে শুধু ঐ হাড়-বারকরা পাইন আর প্রাসাদসংলগ্ন বাগানের কারুকার্য করা লোহার গেটটা। বোমার মারাত্মক ধ্বংসলীলা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে ঐ গেটটা যে কেমন করে এখনও দাঁড়িয়ে আছে সেও এক আশ্চর্য ব্যাপার!

হানস্ আর বেশিক্ষণ চেয়ে দেখতে পারল না এই ধ্বংসস্তূপ। একটা অসহ্য যন্ত্রণায় তার শরীর ঝিমঝিম করতে লাগল; মাথা, কপাল আর গাল বেয়ে ঘাম ঝরতে লাগল অনর্গল। এই যুদ্ধ—এই তার পরিণতি! মানুষের সংসার-সুখ, ঘর-বাড়ি যদি নষ্ট হয়ে গেল, আপনার জন আত্মীয়স্বজন যদি সবই মরে-হেজে গেল; তাহলে আর রইল কি?—যুদ্ধে জয়লাভ হল আর না-হল, কি এসে-গেল মানুষের তাতে!

যুদ্ধ-শেষে দেশের বাড়িতে ফিরে এসে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেল হানস্। অবাক-বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল তাদের ধ্বংসাবশেষ প্রাসাদ ও আদ্যিকালের ঐ পাইন গাছটার দিকে। বাড়ির চেয়ে ঐ গাছটাই যেন সব চেয়ে বেশি আজ আকর্ষণ করছে তাকে। এত দিনের যুদ্ধে পরিশ্রান্ত ক্লান্ত হানস্ চারিদিকের এই নিদারুণ দৃশ্য সত্যিই যেন আর সহ্য করতে পারল না—গাছটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার শরীর অবশ হয়ে আসতে লাগল, চোখের পাতা ভারী হয়ে এল। 'কোলোন'-এ থাকার সময়ই যদিও হানস্ শুনেছিল তাদের দেশে বোমা পড়ার কথা, কিন্তু এ দৃশ্য সে কল্পনা করেনি! নতুন করে এখানে ঘর বাঁধবার আর সম্ভাবনা নেই—তাছাড়া টাকাই বা কোথা! যা ছিল, সবই জ্বলে-পুড়ে ভেঙে-চুরে ধূলিসাৎ হয়ে গেছে—পড়ে আছে শুধু ইট-কাঠ-লোহার বিক্ষিপ্ত ছোট-বড়ো কতকগুলো স্তূপ!

আর দাঁড়িয়ে থাকতে না পেরে, বিধ্বস্ত বাড়ির একটা খোলা অংশে গিয়ে বসে পড়ল হানস্। এখন একটু বিশ্রাম না নিলে আর চলতে পারা, এমন কি দাঁড়িয়ে থাকাও সম্ভব নয় তার পক্ষে।

বেলা পড়ে এসেছিল। আকাশের গায়ে কে যেন ভুসোর কলি ফেরাতে আরম্ভ করেছে, সন্ধ্যা হয় হয়। হানস্ তার হাতের রেন-কোটটা মাথায় দিয়ে ঐ দাওয়ার উপরেই নিজেকে ছড়িয়ে দিল। এই নিরালায়, চারিদিকের এই অস্বস্তিকর পরিবেশের মধ্যেই কে যেন জোর করে শুইয়ে দিল তাকে।

বাল্যকাল থেকেই অসীম সাহসী ছিল হানস্, ভয় বলে কিছুই জানত না। এখানেও ভয় তার কিছুই করছিল না বটে, কিন্তু বাল্য, কৈশোর ও যৌবনের স্মৃতি-জড়ানো এই বাড়িটার দুর্নিবার একটা মায়া আস্তে আস্তে কেমন যেন তাকে অভিভূত করে ফেলছিল তন্দ্রার মধ্যে।

চোখ জুড়ে আসার মুখে, শুয়ে শুয়ে দাদু, দিদিমা ও লেনার কথা গভীরভাবে মনে পড়তেই হানস্ হঠাৎ দেখল, লেনা তার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে।

হানস্ লাফিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'একি, লেনা তুমি! বেঁচে আছ তাহলে?' বলে তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল সেকহ্যান্ড করার জন্যে, কিন্তু লেনা একটু ব্যবধান রেখে সরে গিয়ে বললে, 'হ্যাঁ, আমি, দাদু ও দিদিমা আমরা সবাই আছি, কিন্তু এখানে নয়, অন্য দেশে!'

হানস্ আশ্চর্য হয়ে বললে, 'দাদু-দিদিমাও বেঁচে তাহলে!—কোথায় তাঁরা, এখুনি নিয়ে চলো তাঁদের কাছে আমায়! কিন্তু অন্য দেশে তোমরা চলে গেছ তো এখানে এ-সময় তুমি এলে কি করে?'

'তুমি এখানে এসেছ জানতে পেরেই আমি এলুম। এখন আমি সব জানতে পারি, সব করতে পারি ইচ্ছে করলে।' লেনা বললে গম্ভীরভাবে।

এ-কথার তাৎপর্য তলিয়ে দেখার অবসর হল না হানস্-এর। সে তাড়াতাড়ি বললে, 'সে কি অনেক দূর দেশ?'

'যত দূরই হোক নিমেষে আমি তোমায় সেখানে নিয়ে যাব আবার নিমেষেই পৌঁছে দিয়ে যাব এখানে।' বললে লেনা।

এ-কথার উত্তরে হানস্ বিরক্তির সুরে বোকার মতো বললে, 'আবার পৌঁছে দিয়ে যাবে বলছ কেন? আমি আর যাব কোথায়, একসঙ্গেই তো থাকব আমরা সবাই?'

'তোমার সেখানে থাকা হবে না হানস্—তুমি শুধু দাদু-দিদিমাকে দেখেই চলে আসবে। তাড়াতাড়ি ঐ গাছটার উপরে উঠে বসবে চলো—আমার হাতে বেশি সময় নেই।' বলে লেনা সেই পাইন গাছটার দিকে দেখিয়ে দিল।

যন্ত্রচালিতের মতো লেনার সঙ্গে হানস্ শুকনো পাইন গাছটার উপর গিয়ে উঠে বসল।

ওরা গাছে চড়ে বসবার সঙ্গে সঙ্গেই এরোপ্লেনের মতো হুস হুস করে শূন্যে চলতে আরম্ভ করল গাছটা। তারপর কিছুক্ষণের মধ্যেই গাছটা এক জায়গায় এসে নাবতে আরম্ভ করল নীচের দিকে। নাববার মুখে লেনা বললে, 'ছেলেবেলা থেকেই তুমি তো খুব বীরপুরুষ, কিন্তু এখানকার সব দৃশ্য দেখে ভয় পেও না যেন!' তার কথা শেষ হতে-না-হতেই গাছটা ঝুপ্ করে এনে নাবিয়ে দিল তাদের এক বিস্ময়কর দেশে। শোঁ শোঁ শব্দে অনবরতই ঝড়ের বেগে হাওয়া বইছে এলোমেলো। চারিদিকে অস্বাভাবিক রকমের গাছপালা মাইলের পর মাইল জুড়ে অন্ধকার করে রেখেছে সারা দেশটা। মধ্যে মধ্যে তৃণাচ্ছাদিত জলাভূমিতে নানা ধরনের বীভৎস সব সরীসৃপ কিলবিল করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অসংখ্য রক্তপায়ী বাদুড় বিরাট বিরাট ডানা বিস্তার করে উড়ছে আর ঝটাপটি কামড়া-কামড়ি করছে পরস্পরে। ধোঁয়ার মতো এক ধরনের গ্যাস উঠছে চারিদিক থেকে। জলাভূমির মাঝে মাঝে জল ফুটছে টগবগ করে।...

যত বীরপুরুষই হোক না কেউ, এ-দৃশ্য দেখে ভয় না পেয়ে উপায় নেই। হানস্ জড়ানো গলায় বললে, 'একি ব্যাপার! এখানে না আছে মানুষজন, না আছে মানুষের ঘর-বাড়ি—এখানে, এ কোন নরকপুরীতে নিয়ে এলে তুমি আমায়! শিগগির দাদু-দিদিমার কাছে নিয়ে চলো—তাদের সঙ্গে দুটো কথা বলেই আমি চলে যাব।'

হানস্-এর কথার উত্তরে লেনা এক রকমের অদ্ভুত হাসি হেসে বললে, 'ঘর-বাড়ি, মানুষজন সবই আছে এখানে, তবে তুমি দেখতে পাবে না—দেখলে আরো ভয় পেতে!'

'আচ্ছা বেশ, এখন ওঁদের সঙ্গে তাড়াতাড়ি দেখাটা করিয়ে দাও—আর এক মুহূর্তও আমি থাকতে পাচ্ছি না এখানে!' তীব্র বিরক্তি হানস্-এর কথায়।

'এসো আমার সঙ্গে।' বলে একটা জলার পাড়ে হানস্‌কে নিয়ে গেল লেনা। দূর থেকে ইঙ্গিত করে বললে, 'ঐ দেখ দিদিমাকে।'

হানস্ দেখলে বুড়ি দিদিমা একটা লাঠির উপর ভর দিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। হানস্

সেদিকে যাবার জন্যে চেষ্টা করতেই লেনা ধমক দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'যেও না—যেও না ওদিকে, বিপদে পড়বে; তাছাড়া বুড়ি এখন মানুষও চিনতে পারে না, কথাও বন্ধ হয়ে গেছে!—দুজনেরই ঐ একই অবস্থা!'...

'দাদু, দাদু কোথায়?' বলে হানস্ মরিয়া হয়ে উঠল তাঁকে দেখবার জন্যে।

লেনা আর এক দিকে আঙুল দেখিয়ে বললে, 'ওই দেখ দাদু বসে বাইবেল পড়ছে এক মনে। ওরও 'শেল-শকে' কথা বন্ধ হয়ে গেছে, লোক চেনারও ক্ষমতা নেই, আর কান তো গিয়েছিল আগে থেকেই!'

'কী বলছ তুমি!' বলেই হানস্ লেনার কাছ থেকে ছুটে যেই বুড়োর দিকে যাবে, হঠাৎ দেখে বুড়ো-বুড়ি দুজনেই অন্তর্ধান! কেউ কোথাও নেই; শুধু দুটো রক্ত-চোষা বাদুড় ঝটপট করে উড়ে গেল সেখান থেকে।

'হা হা হা!' বিকট ভাবে হেসে উঠল লেনা।

'এ কী সব কাণ্ড তোমার—কোথায় নিয়ে এলে তুমি....!' কথাটা সম্পূর্ণ শেষ না করেই হানস্ যেন হাঁফাতে লাগল। তার দম যেন বন্ধ হয়ে আসছে!

হানস্-এর কাছ থেকে একটু দূরেই দাঁড়িয়ে ছিল লেনা। এই কথার পর সে হানস্-এর আরো কাছ ঘেঁষে এসে দাঁড়াল। ভারী বিশ্রী দেখাচ্ছে লেনাকে এখন। ক্রমশই তার স্বাভাবিক চেহারাটা বদলাতে বদলাতে এখন যেন কেমন একটা ভয়াবহ রূপ ধারণ করছে! রঙটা বদলাতে বদলাতে হয়ে আসছে যেন পোড়া কাঠের মতো! যুদ্ধ-ফেরত সাহসী জার্মান-সন্তান হানস্ মায়ের পেটের বোনের চেহারার এই ভয়াবহ পরিবর্তন দেখে ভয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল। দুটো হাত জোড় করে কাঁপতে কাঁপতে সে চিৎকার করে উঠল, 'লেনা তোমার দুটি পায়ে পড়ি, তুমি আমায় বাঁচাও—এ আমি সহ্য করতে পারছি না!'...

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পর লেনা কথা বললে। গলাটাও তখন তার অস্বাভাবিক রকম বদলে গেছে। সোজাসুজি লেনা বললে, 'শোন হানস্, তুমি ভয় পেও না, আমরা কেউই আজ আর বেঁচে নেই—সকলেই মৃত! যুদ্ধ যখন আমাদের দোরগোড়ায় এসে পড়ল, চারিদিকে যখন বোমা পড়ে লোক কুকুর-বেড়ালের মতো মরতে লাগল 'ডুরেনে', সব যখন ধ্বংসের মুখে, আত্মরক্ষার আর কোনো উপায়ই রইল না যখন, তখন বুড়ো দাদু ও দিদিমা নিরুপায় হয়ে আমায় অনুরোধ করলেন তাঁদের বিষ দিতে। কারণ তাঁরা দেখলেন, এ বয়সে তাঁরা বেঁচে থেকে যদি আমি মরে যাই তো তাঁদের আর দুর্গতির শেষ থাকবে না, আর সেটা হবে তাঁদের মৃত্যুর চেয়েও যন্ত্রণার। তাঁদের প্রস্তাবে শেষ পর্যন্ত আমি রাজি হই, এবং ঠিক করি, ওঁদের বিষ দেওয়ার পর আমি নিজেও বিষ খাব। এই ঠিক করে আমাদের যা পুরোনো মূল্যবান সোনাদানা ও জুয়েলারি ছিল, যার দাম হবে প্রায় পাঁচ-সাত লক্ষ টাকা, তা সবই বাগানের ঐ পাইন গাছের তলায় পুঁতে ফেলি। কিন্তু পুঁতে ফেলার আগে তার একটা লিস্ট খামের ভিতর পুরে সীল করে আমাদের পুরোনো মালী লিসেনভগ্‌কে দিয়ে দিই তুমি ফিরে এলে দেবার জন্যে। লিসেনভগ্ এখান থেকে পালিয়ে যায় আত্মরক্ষার জন্যে।

'তারপর যখন সত্যিই আর আমাদের বাঁচার কোনো উপায় নেই দেখি, তখন একদিন রাত্রে দাদু ও দিদিমাকে আমি নিজের হাতে বিষ তুলে দিই! কিন্তু সেই বিষ নিজে খেতে যাবার আগেই আমাদের বাগানের পাশে বোমা পড়ে এবং তারই ধাক্কায় আমাদের হাত থেকে বিষের গ্লাস পড়ে যায়। কিন্তু পাঁচ মিনিট না যেতে-যেতেই আবার বোমা পড়ে, এবং এবার ঠিক আমাদের বাড়ির উপরেই। সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি-ঘর হুড়মুড় করে সব ভেঙে পড়ে আগুন জ্বলে ওঠে চতুর্দিকে! আমি প্রাণ নিয়ে পালাতে গিয়ে দাদু-দিদিমার সঙ্গেই পুড়ে মরি এই বাড়িতে! উঃ, সে কী ভয়াবহ যন্ত্রণাদায়ক অবস্থা!

'এখন তুমি ফিরে এসেছ দেখে, ঐ মূল্যবান ধনরত্ন যাতে তোমার হাতে পড়ে সেই খবরটাই

দিতে এসেছি—থাকতে পারিনি!—আজ আমি মৃত! আমি মৃত! হানস্ আজ আমি মৃত!’ বলে শেষের দিকে বিকট চিৎকার করে কেঁদে উঠেই অদৃশ্য হয়ে গেল লেনা হানস্-এর চোখের সামনে। যেমন হঠাৎ তার আবির্ভাব হয়েছিল, তেমনি অকস্মাৎ সে মিলিয়ে গেল!

গাঢ় ঘুমের মধ্যেই ঐ চিৎকারে কর্ণপটহ যেন ছিঁড়ে যাবার উপক্রম হয়েছিল হানস্-এর। লাফিয়ে ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ল সে। একবার ভালো করে নিরীক্ষণ করে দেখল চারিদিক। সে যেখানে ছিল সেইখানেই আছে। সারা আকাশ কুয়াশায় ঢেকে থাকলেও তার বুঝতে বাকি রইল না যে ভোর হতে আর বেশি দেরি নেই। সারা গায়ে তখনও ভীতির কাঁটা। এটা যে স্বপ্ন তা কিছুতেই ভাবতে পারছিল না হানস্। এত স্পষ্ট, চাক্ষুষ দেখার মতো এত জীবন্ত কি কখনো স্বপ্ন হয়! পাইন গাছের তলায় লুকোনো ধনরত্নের কথা মনে হতেই সে চাইল বাগানের দিকে। এখান থেকে সোজাসুজিই গাছটাকে দেখা যাচ্ছিল। এতে চড়েই তো গিয়েছিল সে লেনার সঙ্গে। এখনও কিন্তু ঠিক তেমনিই দাঁড়িয়ে আছে শুকনো পাইনের কঙ্কালটা, যেমন ছিল আগের দিন বিকালের দিকে। লেনার কথা মতো ওরই তলায় যদি পোঁতা থাকে তাদের সমূহ ঐশ্বর্য তাহলে তো সবটাই সত্যি হয়ে যায়! একবার ভাবল হানস্।

এমনি সব ভাবতে ভাবতে হানস্ গাছটার দিকে যাবে বলে যেই উঠেছে, এমন সময় তার চোখের উপর ভেসে উঠল আর এক ভয়াবহ দৃশ্য। এই অদ্ভুত ভূতুড়ে গাছের কাণ্ড দেখে নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারে না হানস্। দেখে, তাদের সেই বিশ্বস্ত পুরোনো মালী লিসেনভগ্ উর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে, আর তার পিছু পিছু তাড়া করে ছুটছে ঐ শুকনো ভূতুড়ে পাইন! এক ভয়াবহ স্বপ্নকে সম্পূর্ণ সত্য বলে বিশ্বাস করে নেবার পূর্বেই আর এক সত্য স্বপ্নের মতোই ভেসে উঠল হানস্-এর চোখের সামনে!

দু’হাতে মাথাটা চেপে ধরে সাহসী হানস্ ভাবতে লাগল, তাহলে কি লিসেনভগ্ সেই খাম খুলে আজই ধনরত্ন আত্মসাৎ করার জন্যে পাইন গাছের তলা খুঁড়তে এসেছিল?

কার্তিক ১৩৬২

অশরীরীর স্বাক্ষর

স্বপনবুড়ো

সন্ধে অনেকক্ষণ পেরিয়ে গেছে।

পল্লি অঞ্চলের পথঘাট কাদায় মাখামাখি। একটি টিনের ঘরে ছোট্ট একটি চায়ের দোকান।

ঝম্ ঝম্ করে বৃষ্টি পড়ছে—আর টিনের ঘরে সেই শব্দ অদ্ভুতভাবে একটি ঝিম্ঝিমে আমেজ এনে দিচ্ছে।

চার বন্ধু বসে সেই বৃষ্টিভেজা রাতে একটু একটু করে চা খেতে খেতে সান্ধ্য-মজলিস জমিয়ে তুলেছে।

খেলার খবর, ভুখা মিছিলের বার্তা, ইলেকট্রিক ট্রেনের কাহিনি, সিনেমার নানাবিধ গল্প....অবশেষে আপনা থেকেই গল্পের মোড়টা যেন ভূতের কাহিনির দিকেই এগিয়ে গেল।

রক্ত যাদের গরম, জীবনটাকে যারা তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে দিতে ভালোবাসে—তারা চট করে ভূতকে বিশ্বাস করতে চায় না। ভূতটা যেন একটা রসিকতার ব্যাপার। চায়ের মজলিশে গরম পাঁপড়ের মতোই তা মুখরোচক। না হলেও ক্ষতি নেই, কিন্তু গরম গরম পেলে অতি সহজেই সান্ধ্য-মজলিশটা বেশ জমে ওঠে।

এমনিভাবেই চারটি তরুণ বন্ধু ভূতের গল্পে মশগুল হয়ে উঠল।

বাইরের দিকে ওদের তাকাবার ফুরসত ছিল না। কেননা বাইরেটা ছিল বড্ড অন্ধকার... তাকালেও চট করে কিছু চোখে পড়ে না! অনেকক্ষণ ধরে একঘেয়ে সুরে যে বৃষ্টি পড়ছিল—তাতে যে-কোনো মিয়োনো গল্পও দিব্যি জমে ওঠে! আর এ তো ছিল সান্ধ্য-মজলিশের সেরা অনুপান—ভূতুড়ে গল্প। কাজেই ছেলেরা নিজেদের মধ্যেই যেন মাকড়সার জাল বুনে একেবারে সমাধিস্থ হয়ে গিয়েছিল!

এমন সময়ে হঠাৎ ঘরে এসে ঢুকল একটা লোক। তার সারা অঙ্গ ঢেকে রয়েছে একটি বর্ষাতি। আর সেই বর্ষাতি থেকে ক্রমাগত জল ঝরে পড়ছে।

চার বন্ধু অবাক হয়ে সেই দিকে তাকাল। তাদের মনে হল—যেন কোনো ভূতের গল্পেরই একটি চরিত্র বাইরের ওই সূচীভেদ্য অন্ধকার ভেদ করে তাদের সামনে আত্মপ্রকাশ করল। ওদের বিস্ময় অবশ্য সেইখানেই কেটে যায়নি। কেননা আরো ভালো করে তাকিয়ে ওরা বুঝতে পারল যে, আগন্তুক তাদের পল্লি অঞ্চলের কেউ নয়—একেবারে খাঁটি সায়েব।

তখন ওদের বিস্ময়ের আর পরিসীমা রইল না!

সায়েবটি সরাসরি তাদের কাছেই চলে এল, তারপর ওদের দিকে চোখ রেখে অস্ফুট কণ্ঠে প্রশ্ন করল, এখানে Haunted House কোথায় আছে?

চার বন্ধুই কলেজের পড়ুয়া, তাই বিদেশি সায়েবের সঙ্গে কথাবার্তা চালাতে তাদের কোনো অসুবিধেই হল না!

বন্ধুদের মধ্যে প্রথমে রমেনই কথার উত্তর দিলে। বললে, এই গ্রামের ভেতর মাইলখানেক পথ চলে গেলে—একটি বিরাট জমিদার বাড়ি আছে। বহুদিনের পুরোনো বাড়ি। কেউ এখন বসবাস করে না সেখানে। তারই দোতলায় একটি কামরা আছে—কেন, সেখানে যেতে চাও নাকি?

শৈলেশ তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ফোড়ন কাটলে,—হ্যাঁ, সেই নির্জন ঘরে যদি একরাত কাটাতে পারো তা হলেই ভূতের ঠিকানা ঠিক পেয়ে যাবে সায়েব।

এই কথা শুনে সায়েব বিচ্ছিরি গলায় কেমন যেন হেসে উঠল। ক্রমাগত চিৎকার করার পর যে ভাবে মানুষের গলা ভেঙে যায়—অনেকটা সেই রকম তার গলার আওয়াজ।

সায়েব তারপর ওদের দিকে একবার বাঁকা চোখে তাকালে, আর নিজের কোমরে গুঁজে রাখা রিভলভারটি খুলে নিয়ে ডান হাতের চেটোয় ঘন-ঘন নাচাতে লাগল।

ওর ধরন-ধারণ দেখে চার বন্ধু বড্ড অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। কোত্থেকে এল এই সায়েব? ওর নিয়তিই কি ওকে এই জলঝরা রাত্রে এই অজ পাড়াগাঁয়ে হাতছানি দিয়ে ডেকে এনেছে নাকি?

বুদ্ধু রসিকতা করে প্রশ্ন করলে, তা সায়েব সেই ভূতুড়ে বাড়িতে তুমি একাই যেতে পারবে—না, লোক আর লণ্ঠন সঙ্গে জুটিয়ে দিতে হবে?

সায়েব আর একবার তার সেই রহস্যময় হাসি হেসে উঠল। তারপর পকেট থেকে নিজের টর্চটি বের করে বাইরের মিশকালো আঁধারের উদ্দেশ্যে যেন আলোর বুলেট ছেড়ে দিলে! সত্যি জোরদার টর্চ বলতে হবে! একটা গাছের মাথায় আলোটা গিয়ে পড়তে—কয়েকটি বাদুড় ডানা ঝটপট করে আকাশে উড়ে গেল।

যেমন আকস্মিকভাবে সায়েব ঘরে ঢুকেছিল—ঠিক তেমনি রহস্যজনকভাবে বৃষ্টির ভেতর সে বেরিয়ে গেল। অনেক দূর পর্যন্ত তার সেই টর্চটিকে জ্বলতে আর নিভতে দেখা গেল।

ঘরের ভেতর বন্ধু চারজন নির্বাক হয়ে বসে রইল। সায়েবকে পোড়ো জমিদার বাড়িতে পাঠানো ঠিক হল কিনা—সেই কথাই ওরা হয়তো ভাবতে লাগল। প্রতিবাদ করবার সময়ও যে সায়েব দিলে না! এই কথা মনে করে ওদের সবাইকার নিভৃত অন্তরে যেন একটা অজানিত আশঙ্কা ঘনীভূত হয়ে উঠল।

চার বন্ধুর বাড়ি ফিরবার তাড়া ছিল না।

কেননা তারা গ্রীষ্মের ছুটিতে দেশে ফিরে এসেছে। রাত যত গভীরই হোক, বাড়িতে ভাত ঢাকা পড়ে থাকবে—জানা কথা।

ওরা কিন্তু আরো খানিকক্ষণ বসে থেকে সায়েবের জন্যে অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। সত্যি, এই বিদেশি লোকটি যদি কোনো বিপদে পড়ে, তবে তো ওরা চারজনই নিমিত্তের ভাগী হয়ে পড়বে। বাইরের মিশকালো অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে আর ঝিমঝিম বৃষ্টির কথা ভেবে ওদের মন সত্যি ব্যাকুল হয়ে উঠল।

মানুষটাকে একটা খেয়ালের ঝোঁকে মরণের মুখে ঠেলে দেওয়া হল না তো?

চার বন্ধুরই বাইক ছিল। ওরা নিঃশব্দে চায়ের দোকানের পয়সা চুকিয়ে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। তারপর রওনা হল সেই পোড়ো বাড়ির উদ্দেশে। বহুকাল তারা ও অঞ্চলে যায়নি। তারপর সম্প্রতি কলেজ ছুটি হতে দেশে এসেছে। ওখানে পৌঁছে তো সবাই থমকে দাঁড়াল। সেই পোড়ো বাড়ির সামনে এমন আগাছা ও কাঁটা গাছ গজিয়েছে যে, ভেতরে ঢোকে কার সাধ্যি!

অনেকক্ষণ বৃথা চেষ্টা করে তারা জীর্ণপ্রায় ভবনটিতে ঢোকবার আশা একেবারে ত্যাগ করল। ভূত ছাড়া সাপের ভয়ও তো আছে! এই আঁধার রাতে পোড়ো বাড়িতে ঢোকা মানে নিজের জীবনটিকে যমের হাতে তুলে দেওয়া!

তাদের আগে যে আর কেউ এই বাড়িতে ঢুকেছে—এমন কোনো চিহ্নও তারা খুঁজে পেলে না। দূর থেকে তারা অপরিচিত সায়েবকে উদ্দেশ করে ডাকাডাকি করলে। সে-শব্দ ভাঙা দেয়ালে প্রতিহত হয়ে ফিরে এল। কোনো সাড়াই মিলল না।

শৈলেশ বললে, কাল ভোরে খবর নেয়া ছাড়া আর কোনো উপায় তো দেখতে পাচ্ছি নে!

জনার্দনের মাথায় একটা বুদ্ধি এল। সে বললে, আমরা বড় জোর গ্রামের চৌকিদারকে খবরটা দিয়ে যেতে পারি। সে যদি রাত্রে বাড়িটার ওপর একটু নজর রাখে!

এই পরামর্শে সবাই বেশ খুশি হল—আর যাওয়ার পথে চৌকিদারের কাছে খবরটা পৌঁছে দিয়ে তারা যে যার বাড়ি চলে গেল।

তখন জলটা একটু ধরেছে বটে—তবে পথের দু'পাশের বড় বড় গাছ থেকে টুপটাপ করে ফোঁটা পড়ছে।

রাত্তিরের খাওয়া-দাওয়া চুকিয়ে চার বন্ধু একটা বাড়িতে মিলিত হল। সেটা শৈলেশদের বাড়ি। ওদের বৈঠকখানা ঘরটা খালিই পড়ে থাকে। চার বন্ধু ঠিক করলে—সেই ঘরেই রাত্তিরটা কাটিয়ে দেবে। কেন যেন ওদের মনের কোণে বৃশ্চিক দংশন হতে লাগল যে, সায়েবের যদি কোনো অনিষ্ট হয়—তবে আইনের চক্ষে না হোক, পরোক্ষভাবে ওরাই কিন্তু দায়ী থাকবে।

জনার্দন মন্তব্য করলে, এসো, আমরা একটা রাত জেগেই কাটাই। কি জানি, যদি কোনো খারাপ খবর থাকে—তবে চৌকিদার এসে আমাদের ডেকে তুলবেই।

রাত জাগা ঠিক হল না। গল্প করতে করতে কখন যে ওরা ঘুমের কোলে ঢলে পড়েছে—সে কথা নিজেরাই জানতে পারেনি।

আচমকা সকলের ঘুম ভেঙে গেল শেষ রাত্তিরে—চৌকিদারের হাঁকডাকে। চৌকিদার ওই বাড়িটার ওপর দৃষ্টি রেখেছিল। তার শেষ টহলের সময় ওই বাড়ির ভেতর থেকে নাকি একটা বিচ্ছিরি খিলখিলে হাসি শুনে সে থমকে দাঁড়ায়। তারপর সে ক্রমাগত রাম-রাম চিৎকার করতে থাকে। একা সে-বাড়িতে ঢোকবার সাহস চৌকিদারের ছিল না, তাই কলেজের বাবুদের ডাকতে এসেছে।

চৌকিদারের সঙ্গে ওরা গিয়ে যখন জমিদারের ভাঙা বাড়িতে হাজির হল—তখন পুব আকাশটা প্রায় ফর্সা হয়ে এসেছে।

চৌকিদার লাঠি দিয়ে আগাছা সরিয়ে ওদের পথ করে দিলে। ওরা সবাই তার পেছন পেছন এগিয়ে চলল। মানুষের সাড়া পেয়ে একটা শেয়ালের বাচ্চা একবার মুখ বাড়িয়েই—একেবারে দে ছুট! একতলায় জায়গায় জায়গায় বেশ ভেঙে গেছে। দোতলায় উঠবার সিঁড়িটা খুঁজে নিয়ে ওরা যেই ওপরের দিকে রওনা হয়েছে অমনি একদল চামচিকে সবাইকার মাথার ওপর চক্কর দিয়ে ঘুরতে লাগল।

কিন্তু ওরা সে-সব কিছুই ভ্রূক্ষেপ করলে না! হাজির হল গিয়ে দোতলার বিরাট বারান্দায়।

সামনের একটা ঘর থেকে কেমন যেন গোঁ-গোঁ শব্দ শোনা যাচ্ছে। দরজাটা ধাক্কা মেরে খুলে ফেলে সবাই একসঙ্গে ঢুকে পড়ল সেই ঘরে।

কি আশ্চর্য ব্যাপার!

সেই সায়েবটাই তো!

লোকটার গোঁ আছে বলতে হবে। এই ভাঙা জঞ্জালে ভর্তি জনমানবহীন বাড়িতে ঢুকতে ওর এতটুকু ভয় করেনি! কিন্তু সায়েবটা যে অর্ধচেতন হয়ে পড়ে আছে—আর তারই মুখ থেকে ওই রকম একটা গোঁ-গোঁ শব্দ বেরুচ্ছে!

শৈলেশ বললে, কি আশ্চর্য! টর্চটা জ্বেলে সায়েব যেন কী লিখছিল!

বুদ্ধু নিচু হয়ে বসে পড়ে মন্তব্য করলে, ডায়েরি দেখছি যে! সায়েব ডায়েরি লিখছিল!

জনার্দন বললে, তাজ্জব ব্যাপার! ডায়েরিটা তাহলে পড়ে দেখতে হয়!

সেও নিচু হয়ে বসে পড়ল।

সবাই একসঙ্গে বলে উঠল, পড়—পড়। সায়েব কি লিখতে লিখতে অজ্ঞান হয়ে গেছে—সেটা আগে জানা দরকার।

জনার্দন তখন ডায়েরি দেখে পড়তে লাগল—

১২-১৫ মিঃ—অনেক কষ্টে ওপরে উঠে এসেছি। ভয়ের কিছুই নেই। শেয়াল আর চামচিকের আস্তানা হয়েছে বাড়িটা। ঠিক করেছি রাতটা এই ঘরেই কাটিয়ে দেব। বর্ষাতিটা ভালো করে মেঝেতে পেতে নিলাম। বেশ শীত করছে যেন! ঘরের জানালাগুলো বন্ধ করে দিলাম। টর্চটা জ্বালানোই থাকল।

১-২০ মিঃ—হয়তো একটু ঘুমই এসেছিল। হঠাৎ কিসের শব্দে চোখ মেলে তাকালাম। কি আশ্চর্য! ঘরের জানালাগুলো দড়াম-দড়াম করে খুলে যাচ্ছে। এর কারণ কি? জানালাগুলো আবার বন্ধ করলাম।

১-৩০ মিঃ—একটা পৈশাচিক হাস্যে আবার চমকে উঠলাম। তাকিয়ে দেখি—জানালাগুলো আবার ভীষণ শব্দ করে খুলে যাচ্ছে! এবার সত্যি আশ্চর্য হলাম। উঠে দাঁড়ালাম। বৃষ্টি অনেকক্ষণ থেমে গেছে। ক্ষীণ চাঁদের আলোতে বাইরেটা ভালো করে নজরে পড়ে না। পাশের ঘরে কি কেউ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে?

১-৪৫ মিঃ—হঠাৎ ভেসে এল একটা বুক-ফাটা কান্নার শব্দ। তাকিয়ে দেখি—বন্ধ দরজা ভেদ করে একটি কঙ্কাল আসছে। কঙ্কালটা যেন দু'হাত দিয়ে নিজের মুখ ঢাকছে। কি কর্কশ কান্না! তাড়াতাড়ি কোমর থেকে রিভলভার বের করে কয়েকটা গুলি ছুঁড়লাম। ধোঁয়ায় ঘরটা ভর্তি হয়ে গেল। টর্চ তুলে দেখি, কঙ্কালটা আর ঘরের ভেতর নেই!

২-৫ মিঃ—এবার আর কান্না নয়—প্রচণ্ড খিলখিলে হাসি। তাকিয়ে দেখি, মাথার ওপর অনেকগুলি কঙ্কাল ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের ঠান্ডা নিঃশ্বাস যেন আমার ঘাড়ে এসে লাগছে। মনে হচ্ছে, সেই জায়গাটা যেন জমে বরফ হয়ে গেল! তাড়াতাড়ি লাফিয়ে উঠলাম মেঝে থেকে। প্রচণ্ড চিৎকার করে উঠলাম আমি নিজে। সেটা ভয় থেকে—না, ওদের ভয় দেখানোর জন্যে—নিজেই বুঝতে পারলাম না! হঠাৎ ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখি—কঙ্কালগুলো যেন হাওয়ায় মিশে গেছে!

২-৩০ মিঃ—ঘুম চোখ থেকে একেবারে পালিয়ে গেছে! ভয়ানক শীত করছে আমার। মনে হচ্ছে, যেন দার্জিলিং কিংবা লন্ডনে আছি। গরমের কাল বলে সঙ্গে উলের কিংবা গরম জামা কিছু নেই। সবগুলো জানালা দিয়ে হু-হু করে শীতের হাওয়া আসতে লাগল। জানালাগুলো আবার বন্ধ করে দিলাম।

৩-১০ মিঃ—কিছুই বুঝতে পারছি না। আমি জেগে আছি, না—ঘুমিয়ে পড়েছি? মনে হল শ্বেত-শুভ্র কঙ্কালগুলো আস্তে আস্তে পা টিপে-টিপে এসে আমার গায়ের ওপর একটি বরফের চাদর বিছিয়ে দিলে! আমি শত চেষ্টা করেও গা থেকে সে চাদর খুলে ফেলতে পারলাম না।

..........কী কাল ঘুম যে এল আমার চক্ষে...কী প্রচণ্ড শীত...........

ডায়েরিতে এই পর্যন্তই লেখা আছে। চার বন্ধু অবাক হয়ে ডায়েরির দিকে তাকিয়ে রইল।

ওদিকে চৌকিদার এরই মধ্যে নীচে গিয়ে এক মগ জল সংগ্রহ করে এনেছে। সেই জল আঁজলা করে নিয়ে সায়েবটির মুখে-চোখে ছিটিয়ে দিতেই সে দু'চোখ মেলে তাকাল। চোখ দুটো জবা ফুলের মতো লাল। হা হা করে হেসে উঠল সেই সায়েব। সায়েবের গায়ে এত জোর যে ওরা চার বন্ধু মিলেও তাকে ধরে রাখতে পারছে না। তারপরই তার দেহটা একেবারে নেতিয়ে পড়ল!

কিছুক্ষণ বাদে এই বাড়িরই প্রাচীন বুড়ো দারোয়ান লাঠি ঠক্ ঠক্ করতে করতে এসে হাজির হল। সে এই ভূতুড়ে বাড়িটার কাছেই কোথায় যেন থাকে। এই বাড়িতে লোকজনের আনাগোনার শব্দ পেয়ে আর চিৎকার শুনে দেখতে এসেছে যে, আসল ব্যাপারটা কি!

দারোয়ানের বয়স নাকি ১০৮ বছর। তার কাছেই সব কথা জানা গেল। এই জমিদার পরিবারে তিন পুরুষ আগে একজন নাকি ছিল খুব অত্যাচারী। হেন অন্যায় কাজ নেই—যা করতে তার হাত কাঁপত! একবার একদল দুর্ভিক্ষ-পীড়িত প্রজাকে অতি সামান্য কারণে ধরে এনে খেতে না দিয়ে দিনের পর দিন শুকিয়ে রেখে মেরে ফেলে। তারপর থেকেই এ বাড়িতে ভূতের উপদ্রব। শোনা যায়, সেই জমিদার নিজেও নাকি ভূতের হাতেই মারা পড়েছিল!

কাহিনি শেষ করে সেই অতি বৃদ্ধ দারোয়ান আকাশের দিকে হাত তুলে বললে, নসিব! নসিব! সবই নসিব! নইলে এই পরদেশি সায়েব এখানে প্রেতাত্মার হাতে প্রাণ দিতে আসবে কেন?......

জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৫

আম কুড়োতে সাবধান

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

ফুটবলম্যাচ দেখতে যাব বলে সেজেগুজে তৈরি হচ্ছিলুম। হঠাৎ কোত্থেকে এসে বাধা দিল প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি। মুহুর্মুহু বিদ্যুতের ঝিলিক আর মেঘের গর্জন অবস্থাটা আরও সাংঘাতিক করে ফেলল। মনমরা হয়ে বসে রইলুম।

সন্ধ্যার দিকে ঝড়বৃষ্টির দাপট যখন কমে গেল, তখন দেখলুম ছোটমামা কাকভেজা হয়ে বাড়ি ফিরছেন। একটু পরে পোশাক বদলে একটা লণ্ঠন জ্বেলে ছোটমামা ঘরে ঢুকলেন। আমাকে দেখে বললেন, 'এ কী রে পুঁটু? তুই অন্ধকারে ভূতের মতো বসে আছিস যে?'

বললুম, 'ধুশ! ফুটবলম্যাচ পণ্ড হয়ে গেল।'

ছোটমামা টেবিলে লণ্ঠন রেখে বললেন, 'তাতে কী হয়েছে? যে আমার ঝাঁপুইতলা বনাম কাঁকুড়হাটির খেলা! ও খেলা কি দেখার যোগ্য?'

বলে উনি ফিক করে হাসলেন। চাপা স্বরে ফের বললেন, 'চল। বেরিয়ে পড়ি।'

একটু অবাক হয়ে বললুম, 'কোথায়?'

ছোটমামা আরও চাপা স্বরে বললেন, 'ফেরার সময় শর্টকাটে সিঙ্গিমশাইয়ের বাগানের পাশ দিয়ে এলুম। বললে বিশ্বাস করবিনে পুঁটু, ঝড়বৃষ্টির চোটে বাগানের সব আম পড়ে গেছে। এই জষ্টিমাসের আম। বুঝলি তো? সবই গাছপাকা।'

'অন্ধকারে কী করে দেখতে পেলেন ছোটমামা?'

'তুই একটা বোকার বোকা!' ছোটমামা একটু চটে গেলেন। 'বিদ্যুতের ছটায় দেখলুম না? সারা বাগানের তলায় পাকা আম ছড়িয়ে আছে। চল্। কুড়িয়ে আনি।'

'কিন্তু ছোটমামা, বাগানে ভোলা আছে যে! ভোলা সাংঘাতিক লোক। ভোঁদা বলছিল, সিঙ্গিমশাই ভোলাকে নাকি তাঁর বন্দুকটা দিয়েছেন। দেখতে পেলেই—'

আমার কথায় বাধা দিয়ে ছোটমামা বললেন, 'ভোঁদা তোর চেয়েও বোকা। সিঙ্গিমশাই বন্দুক দেবেন ভোলাকে? ভোলা বন্দুক ছুঁড়তে জানে? তা ছাড়া বন্দুকটা বাড়িতে না থাকলে সিঙ্গিমশাইয়ের বাড়িতে ডাকাত পড়বেই পড়বে তুই জানিস? ওঠ্। দেরি করা ঠিক নয়।'

দোনামনা করে বললুম, 'বন্দুক না পেলেও ভোলা খুব সাংঘাতিক লোক ছোটমামা! ওর গোঁফ আর চোখ দুটো দেখলেই ভয় করে।'

ছোটমামা আমার কথায় কান দিলেন না। কোত্থেকে একটা চটের থলে আর টর্চ নিয়ে এলেন। বললেন, 'ভোলা এতক্ষণ খেতে গেছে। চলে আয়। আর শোন্। জুতো খুলে ফ্যাল্। খালি পায়ে যাব।'

সিঙ্গিমশাইয়ের আমবাগানটা গ্রামের শেষে মাঠের ধারে। বাগানের মধ্যিখানে একটা মাচার ওপর ছোট্ট ছাউনি আছে। ভোলা সেখানে বসে বাগান পাহারা দেয়। সে দারুণ ধূর্ত লোক। বাগানের আনাচে-কানাচেয় কেউ পা বাড়ালে কী করে সে টের পেয়ে যায় কে জানে! টের পেলেই এমন হাঁক ছাড়ে যে পিলে চমকে যায়। গতমাসে কচি আম কুড়ুনোর জন্য ভোঁদার সঙ্গে গিয়ে কী বিপদে না পড়েছিলুম! আমি তো দিশেহারা হয়ে পালিয়ে বেঁচেছিলুম। ওদিকে ভোঁদা ওর হাতে ধরা পড়ে সে এক কেলেঙ্কারি! ভোঁদাকে শাস্তিটা অবশ্যি দিয়েছিলেন ভোঁদার বাবা হাবলবাবু! পাড়াসুদ্ধু লোকের সামনে কান ধরে ওঠবস করানোর শাস্তি—ছ্যা ছ্যা! ভোঁদা কিছুদিন বাড়ি থেকে লজ্জায় বেরুতে পারেনি। স্কুলে যাওয়া তো দূরের কথা।

সেই কথা ভেবে আমার খুব অস্বস্তি হচ্ছিল। কিন্তু ছোটমামার অবাধ্য হওয়ার সাহসও আমার নেই। তা ছাড়া ছোটমামা না থাকলে কে আমাকে শহরে কিংবা গঞ্জের মেলায় নিয়ে যাবে? পৃথিবীতে সবসময় কোথাও-না-কোথাও কত সুন্দর সব ঘটনা ঘটছে। ছোটমামা না নিয়ে গেলে আমি একা সে-সব দেখতেই যে পাব না।

সন্ধ্যার অন্ধকার আজ বেজায় গাঢ়। আকাশের কোনায় দূরে মাঝেমাঝে বিদ্যুতের ঝিলিক। চারদিকে ব্যাঙ, পোকামাকড় তুলকালাম গান জুড়ে দিয়েছে। সিঙ্গিমশাইয়ের আমবাগানের দিকে যত এগোচ্ছি, তত অস্বস্তিটা বেড়ে যাচ্ছে। ছোটমামা পায়ের কাছে সাবধানে টর্চের আলো ফেলে হাঁটছেন। তাঁর পেছনে থলে হাতে আমি হাঁটছি। কতক্ষণ পরে ছোটমামা থমকে দাঁড়িয়ে চাপা স্বরে বললেন, 'ভোলার কুঁড়েঘরটাতে লণ্ঠন জ্বলছে বটে, তবে বাজি রেখে বলতে পারি, ব্যাটাচ্ছেলে নেই।'

'কী করে বুঝলেন ছোটমামা?'

'দিঘির পাড়ে টর্চের আলো দেখলুম না? ভোলা ওখান দিয়েই তো খেতে যায়।'

'ভোলার টর্চ আছে বুঝি?'

'থাকবে না? তুই বড্ড বোকা পুঁটু! রাতবিরেতে টর্চ ছাড়া কেউ বাগান পাহারা দিতে পারে? তবে আর কথা নয়। আয়, তোকে বাগানের শেষ দিকটাতে একখানে বসিয়ে রাখব আর আমি আম কুড়িয়ে আনব। চুপচাপ বসে থাকবি কিন্তু!'

'ছোটমামা—' কথাটা বলতে গিয়ে পারলুম না। ভোঁদা বলেছিল, ওই বাগানের কোন গাছে কবে কে নাকি গলায় দড়ি দিয়ে মরেছিল। তার ভূতটা এখনও আছে। তবে সে ভোলার ভয়ে বেরুতে পারে না। ভোলা বাগানে না থাকলে তবেই সে বেরিয়ে এসে লোকেদের ভয় দেখায়।

তো ছোটমামা ধমক দিলেন চাপা গলায়। 'চুপ! খালি ছোটমামা আর ছোটমামা!' বলে এবার আমাকে প্রায় টানতে টানতে নিয়ে চললেন। জলকাদা জমে আছে ঘাসের ফাঁকে। পা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত শব্দ হচ্ছে। প্রতিবারই ধমক খাচ্ছি। 'টর্চের আলোর দিকে চোখ রেখে হাঁটতে কী হচ্ছে?'

ঠিক কথা। আসলে আমি সেই ভূতটার কথা ভেবে এদিকে-ওদিকে তাকাচ্ছিলুম। ভোলা যে এখন বাগানে নেই। কিছুক্ষণ পরে ছোটমামা আমাকে একখানে দাঁড় করিয়ে বললেন, 'তুই এইখানে বসে থাক। আমি গাছপাকা আম ছাড়া কুড়োব না। ওই দ্যাখ্, কত পাকা আম!'

টর্চের আলোয় হলুদ কয়েকটা আম দেখতে পেয়েই আমি ভূতের ভয়টা ভুলে গেলুম। এইসব আম নাকি সেরা জাতের আম। একটুও আঁশ নেই। একেবারে ক্ষীরের সন্দেশের মতো নাকি স্বাদ।

থলে নিয়ে ভিজে ঘাসে বসে থাকা যায় না। তাই উঠে দাঁড়ালুম। ছোটমামা এদিক-ওদিকে টর্চের আলো ফেলে পাকা আম কুড়িয়ে আনছেন। মিঠে গন্ধে আমার মুখে জল আসছে। কিন্তু এখন কি আম খাওয়ার সময়?

থলে প্রায় অর্ধেক ভরে গেল কিছুক্ষণের মধ্যেই। ছোটমামা বললেন, 'এবার আমি যাচ্ছি বাতাসাভোগ গাছটার কাছে। খাসা আম! বুঝলি পুঁটু? তুই চুপচাপ বসে থাক। তবে কান খাড়া রাখবি কিন্তু! ভোলা বাগানে আসার সময় গান গাইতে গাইতে আসে। শুনতে পেলেই তুই ডাকবি।'

ছোটমামা টর্চের আলো ফেলতে ফেলতে আমগাছের অজস্র গুঁড়ির আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। কোনো গাছের মাথায় পাখি ডানার জল ঝাড়ল। সেই শব্দেই আমার বুক ঝড়াস করে উঠেছিল। কিন্তু সুস্বাদু আমের মিঠে গন্ধ আমার ভয়-টয় ক্রমশ তাড়িয়ে দিচ্ছিল।

কতক্ষণ পরে ধুপধুপ শব্দে ছোটমামা এসে গেলেন। 'নাহ্। গাছটা খুঁজে পেলুম না। ওদিকে দিঘির পাড়ে টর্চের আলো দেখলুম। ভোলা আসছে।'

'ছোটমামা! বড্ড অন্ধকার যে!'

'হুঁ, টর্চ জ্বালি আর ভোলা দেখতে পাক! খালি বোকার মতো কথাবার্তা। থলেটা আমায় দে। আর আমার এই হাতটা ধরে থাক। ছাড়বিনে বলে দিচ্ছি।'

ছোটমামা আমভরতি থলেটা নিলেন। কিন্তু ওঁর একটা হাত ধরেই ছেড়ে দিলুম। উঃ! কী সাংঘাতিক ঠান্ডাহিম হাত!

ছোটমামা বললেন, 'কী হল? হাত ছাড়লি কেন?'

'আপনার হাত যে বিচ্ছিরি ঠান্ডা!'

'ধুর বোকা! জলকাদা ঘেঁটে আম কুড়িয়েছি। হাত ঠান্ডা হবে না? চলে আয় শীগগির!'

এই সময় সত্যিই ভোলার হেঁড়েগলার গান শুনতে পেলুম। ছোটমামার বরফের মতো ঠান্ডা হাতটা অগত্যা চেপে ধরে থাকতেই হল। ছোটমামা এবার প্রায় হন্তদন্ত হয়ে দৌড়ুচ্ছেন। আমিও দৌড়ুচ্ছি।

কতক্ষণ দৌড়েছি জানি না। আমি এবার হাঁপিয়ে পড়েছিলুম। কাঁদো-কাঁদো গলায় বললুম, 'ছোটমামা! আমার পা ব্যথা করছে যে!'

ছোটমামার মনে দয়া হল। বললেন, 'হুঁ। অনেকটা ঘুরপথে আসতে হল। কিন্তু কী আর করা যাবে? এবার আস্তেসুস্থে যাওয়া যাক।'

অন্ধকারে কিছু দেখা যাচ্ছে না। এখানে-ওখানে ঝাঁকেঝাঁকে জোনাকি জ্বলছে। কাছে কোথায় অনেক শেয়াল ডাকতে থাকল। একটু ভয় পেয়ে বললাম, 'আমরা কোথায় এসে পড়েছি ছোটমামা?'

'নদীর ধারে। বুঝলি না? ভোলার চোখ রাতবিরেতেও দেখতে পায়। তাই পুরো গ্রামটার পাশ দিয়ে ঘুরতে হল।' বলে ছোটমামা অদ্ভুত শব্দে হাসলেন। 'তা পুঁটু! এবার একটা আম টেস্ট করে দেখি। কী বলিস? সিঙ্গিমশাইয়ের বাগানের আমের এত নামডাক। দেখি, সত্যি কিনা।'

ছোটমামা সেখানেই বসে পড়লেন। তারপর তেমনি অদ্ভুত শব্দে আম খেতে শুরু করলেন। চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছি আর ভাবছি, এবার আমাকেও একটা আম খেতে দেবেন ছোটমামা। কিন্তু উনি যেন আমার কথা ভুলেই গেছেন। ক্রমাগত আম খাচ্ছেন আর আঁটিগুলো ছুড়ে ফেলছেন। শব্দ শুনে বুঝতে পারছি, ওগুলো জলেই পড়ছে।

কিছুক্ষণ পরে না বলে পারলুম না, 'কেমন আম ছোটমামা?'

জিভে একটা শব্দ করে ছোটমামা বললেন, 'ফাস্টো কেলাস! তুই খেলে টের পেতিস পুঁটু! কিন্তু কী আর করা যাবে? সবগুলোই যে আমি ঝোঁকের বশে খেয়ে ফেললুম!'

প্রায় ভ্যাঁ করে কেঁদে ওঠার মতো বললুম, 'স—ব?'

'হুঁ! তোর কথা মনেই ছিল না। বরং তার বদলে তোকে একটু আদর করি।' বলে ছোটমামা আমার মাথায় তারপর মুখে হাত বুলোতে থাকলেন। কী অসহ্য ঠান্ডা হাত! আমি চেঁচিয়ে উঠলুম, 'আর না ছোটমামা! বড্ড ঠান্ডা লাগছে যে!'

'আমের গন্ধ কেমন মিঠে টের পাচ্ছিস বল্ পুঁটু! এই নে। আমার হাত শোঁক্।'

ছোটমামার আঙুল আমার নাকে ঢুকতেই আঙুলটা চেপে ধরলুম। তারপরই টের পেলুম আঙুলটা বেজায় শক্তও বটে। আঙুল না হাড়? রাগে-দুঃখে কেঁদে ফেললুম। ছোটমামা আদুরে গলায় বললেন, 'কেঁদো না সোনা? কাল তোমায় আম খাওয়াব। এবার আমি নদীর জলে হাত ধুয়ে আসি।'

ছোটমামা যে এমন অদ্ভুত কাণ্ড করবেন, কল্পনাও করিনি। উনি উঠে গেলেন হাত ধুতে, তো গেলেনই। আর ফেরার নাম নেই। জলের ওপর এতক্ষণে তারা ঝিলমিল করছে দেখতে পেলুম। আবার একদল শেয়াল ডেকে উঠল। তখন ভয় পেয়ে ডাকলুম, 'ছোটমামা! ছোটমামা!'

কিন্তু কোনো সাড়া এল না। আমি এবার মরিয়া হয়ে আরও জোরে ওঁকে ডাকতে থাকলুম। কিছুক্ষণ পরে একটু দূরে টর্চের আলো ঝিলিক দিল। তারপর ছোটমামার গলা ভেসে এল, 'পুঁটু! পুঁটু!'

সাড়া দিলুম। ছোটমামা দৌড়ুতে দৌড়ুতে কাছে এলেন। তারপর টর্চের আলোয় খালি থলে দেখে প্রচণ্ড খাপ্পা হয়ে বললেন, 'বিশ্বাসঘাতক! এইটুকু ছেলের হাড়ে হাড়ে এত বুদ্ধি! নদীর ধারে শ্মশানের কাছে আম নিয়ে পালিয়ে এসেছে। তারপর—হায়! হায়! সবগুলো আম একা সাবাড় করেছে!'

অবাক হয়ে বললুম, 'ছোটমামা! আপনিই তো—'

উনি থাপ্পড় তুলে বললেন, 'আমিই তো মানে? মিথ্যুক কোথাকার!'

'না ছোটমামা! আপনিই তো আমাকে এখানে এনে আমগুলো একা খেয়ে তারপর নদীর জলে হাত ধুতে গেলেন!'

'শাট আপ! দেখি তোর মুখ শুঁকে!'

আমার মুখে আমের গন্ধ পেয়ে ছোটমামা আরও তর্জন-গর্জন জুড়ে দিলেন। ওঁকে কিছু বলার সুযোগ পাচ্ছিলুম না। একটু পরে উনি হতাশ হয়ে ভিজে ঘাসে বসে পড়লেন। 'বাতাসাভোগ আমগাছটা খুঁজে না পেয়ে ফিরে এসে দেখি, তুই নেই। ভাবলুম, ভোলা আসছে টের পেয়ে তুই বাড়ি চলে গেছিস। বাড়িতে তোকে পেলুম না। তারপর তোকে ডেকে ডেকে—ওঃ! পুঁটু রে! তুই এমন করবি ভাবতেও পারিনি!'

'বিশ্বাস করুন ছোটমামা! আমি আম খাইনি। আপনিই খেয়েছেন।'

'আবার মিথ্যে কথা? তোর মুখে আমের গন্ধ।'

'আপনিই তো আদর করছিলেন এঁটো হাতে। কী সাংঘাতিক ঠান্ডা আপনার হাত!'

'আমার হাত ঠান্ডা? বাজে কথা বলবিনে!' বলে ছোটমামা ওঁর একটা হাত আমার গলায় ঠেকালেন। 'বল্ এবার! আমার হাত ঠান্ডা না গরম?'

কী আশ্চর্য! ছোটমামার হাত তো মোটেও তেমন ঠান্ডা নয়। অমনি বুকটা ধড়াস করে উঠল! তাহলে কে ছোটমামা সেজে আমাকে নদীর ধারে শ্মশানে এনেছিল? তার আঙুলটা নিরেট হাড় কেন?

আর ভাবতে পারলুম না। কাঁদো-কাঁদো গলায় বললুম, 'ছোটমামা! তাহলে সিঙ্গিমশাইয়ের বাগানের সেই গলায়দড়ে ভূতটা আপনি সেজে আমাকে এখানে টেনে এনেছিল।'

'শাট আপ!' বলে ছোটমামা উঠে দাঁড়ালেন। 'খালি বাজে গপ্প! মিথ্যুক! লোভী! বিশ্বাসঘাতক! তোর শাস্তি পাওয়া উচিত। থাক্ তুই এই শ্মশানে পড়ে। আমি চললুম।'

ছোটমামা দৌড়ুতে থাকলেন। আমি মরিয়া হয়ে ওঁকে অনুসরণ করলুম। ভাগ্যিস, ওঁকে টর্চ জ্বেলে দৌড়ুতে হচ্ছিল। তাই ওঁর নাগাল পেতে অসুবিধে হচ্ছিল না।....

যাই হোক, বাড়ি ফিরে দু'জনেই ঘটনাটা চেপে গিয়েছিলুম। ছোটমামা বলে দিলে মা ওঁকে খুব বকাবকি করতেন। আমি বললে শুধু মা নন, বাবাও আমাকে মিথ্যুকের চূড়ামণি আর পেটুক সাব্যস্ত করে একটা জব্বর শাস্তি দিতেন।

ছোটমামার রাগ পড়তে তিন দিন লেগেছিল। তবে আমার কথা উনি কিছুতেই বিশ্বাস করেননি। আমার মনে এই দুঃখটা আজও থেকে গেছে। তবে ঠকে শিখেছি, আম কুড়োতে গেলে সাবধান থাকাই উচিত। আর হ্যাঁ, ভোঁদাকে ঘটনাটা চুপিচুপি বলতেই সে আমায় চিমটি কেটে বলেছিল, 'তুই সত্যি বড্ড বোকা পুঁটু। গলায়দড়ে ব্যাটাচ্ছেলে যখন আম সাবাড় করছিল, তুই রাম চাইলেই পারতিস! রাম নামে সব ভূত জব্দ। আমের বদলে রাম। মনে রাখিস।'

আশ্বিন ১৪০২

ঠাকুমার পোষা ভূত

মহাশ্বেতা দেবী

ঠাকুমা, এ কথা কি সত্যি, যে তোমার নাম ছিল শুকতারা?

ছিল রে ছিল। শুকতারা আর সন্ধ্যাতারা দুই বোন ছিলাম আমরা। আমার বাবা তো বাংলার মাস্টার ছিলেন! সুন্দর সুন্দর নাম পছন্দ করতেন।

তবে মা বলেন কেন, তোমার নাম নীলতারা?

তবে শোন। আমার বিয়ে তো হল আট বছর বয়সে। তা আমার ভাসুরের নাম ছিল শুককুমার।

আর ঠাকুরদার নাম লালমোহন?

হ্যাঁ রে হ্যাঁ, তা শাওড়ি বললেন, বউয়ের নাম শুকতারা, আর আমার বড় ছেলের নাম শুককুমার। এতে গ্রামে খুব নিন্দে হবে। ওর নাম থাক নীলতারা। তা নাম ধরে তো ডাকত না কেউ। মেজবউ, মেজ বউঠান, মেজকাকী—এ সব বলেই ডাকত।

মা বলেছে তুমি নাকি একবার বাঘ তাড়িয়েছিলে?

তুইও তোর মায়ের মতো হলি যে! বাঘ কি আমি তাড়িয়েছিলাম? তাড়িয়েছিল.....

তোমার পোষা ভূত!

তা, সবই তো জানিস।

তোমার মুখে শুনব।

এ কথাটি শুনলে ঠাকুমা বেজায় খুশি হতেন। আমার ঠাকুরদা চুরুট মুখে দিয়ে কাগজে 'শব্দ ধাঁধা' করতেন, বই পড়তেন, ছড়ি হাতে পদ্মার ধারে বেড়াতে যেতেন। রাজশাহী শহর ছিল পদ্মার ধারে।

ঠাকুমা সকালে তরকারি কুটতেন। কি রান্না হবে তা বলে দিতেন। ঠাকুমা বেজায় ভালো রান্না করতেন। তবে আমার বাবা, কাকারা জেদ করলে, অথবা আমরা বায়না করলে আশ্চর্য সব রান্না সেরে ফেলতেন।

তরকারি কুটেই স্নান করতেন। তারপর পেয়ারা গাছের নীচে বাঁধানো চাতালে বসে বাংলা কাগজ পড়তেন। কাগজটি পড়া হলে আমরা গল্প বলার জন্যে জেদ করতাম।

বাড়ির ভেতরে কত না গাছ! বাঁধানো চাতাল। রান্নাঘর, খাওয়ার দালান, ভাঁড়ার ঘর, সে একটা একতলা দালানে।

মুখোমুখি আমাদের থাকার ঘর। তারপর সিঁড়ির ঘর। সেখান দিয়ে সিঁড়ি উঠে গেছে ছাতে। ছাতে বসে থাকতে খুব ভালো লাগত।

এত বড় ছড়ানো বাড়ি! থাকেন দুই বুড়ো-বুড়ি। সবাই বলত, "আপনার ভয় করে না?"

ঠাকুমা হেসে বলতেন, আমার পোষা ভূতরা আছে না! তারা সব পাহারা দেয়।

ওঁর পোষা ভূতই নাকি বাঘ তাড়িয়েছিল। ঠাকুমার বিয়ে হয় আট বছর বয়সে। রাজশাহী শহরের মেয়ে, বিয়ে হল সুদূর গ্রামে। পদ্মানদীতে নৌকো চেপে যেতে হয়। ছোট্ট মেয়ে কাঁদবে বলে সঙ্গে গিয়েছিল ওঁর ঝি মনোরমা। তাকে সবাই মনা মা বলত।

দেশে তো সব অন্যরকম। বাড়ি থেকে অনেক দূরে বাঁশের তৈরি শৌচালয়। ঠাকুমা খুব ভয় পেতেন। তখন মনা মা বোঝালেন, দেখ্, তোকে দেখবে শুনবে বলে আমি কয়েকটা বাচ্চা ভূত এনেছি। না না, দেখলে ভয় পাবি না। সব ছোট ছোট ভূত। ওরা তোর কাছেই থাকবে। তোর সঙ্গে খেলবে, গাছ থেকে ফল পেড়ে দেবে, তুই ভয় পেলে তোকে দেখবে।

আমাকে ভয় দেখাবে না?

কখখোন না।

কোথায় তারা?

খড়ের চালে উঠে গেছে। খড়ের মধ্যে ঘুমোচ্ছে।

শুনতে শুনতে বললাম, অ ঠাকুমা! অত দূর দেশে যে গেলে, তুমি কাঁদতে না?

ঠাকুমা হেসে বললেন, আমার শাশুড়ি আমাকে কোলে বসিয়ে ভাত খাওয়াতেন, হাট থেকে খেলনা আনিয়ে দিতেন, পাড়ার ছোট মেয়েদের ডাকতেন। আমার সঙ্গে খেলা করত ওরা। মনখারাপ করার সময় কোথায়?

তোমার ভূতেরা?

দেখতাম গাছের কত উঁচুতে জাম, জামরুল, পেয়ারা, কত কি! মনে মনে বলতাম, তোমরা কোথায়? আমি কি ও সব পাড়তে পারি? আর অমনি গাছপালার ভেতর দিয়ে বাতাস বয়ে গেল, আর গাছের নীচে ফলের পাহাড়।

কি ভালো! সে সব ভূতেরা এখন কোথায়?

আমার কাছেই আছে। এতবড় বাড়ি, দালান, গাছপালা! ওরাই সব দেখেশুনে রাখে।

আমি তো দেখিনি?

ওরা তোদের দেখেশুনে রাখে।

যাক গে, বাঘের গল্প বলো।

সে আমার ছোটবেলায়.........

গ্রামের বাড়িতে ঠাকুমার আর খারাপ লাগছিল না। শাশুড়ির কোলের কাছে ঘুমোতেন। শাশুড়ি ভোরে পুজোর ফুল তুলতেন, চন্দন ঘষতেন, শাশুড়িকে পুজোর যোগাড় করে দিতেন। তারপর টুকটাক কাজ সেরে বন্ধুদের সঙ্গে খেলতেন। মনে জানেন, ভূতেরা সঙ্গে আছে, তাতেও খুব নিশ্চিন্ত।

তা একদিন সন্ধের মুখে বাইরে যাওয়া দরকার। একটি লণ্ঠন জ্বেলে নিয়ে ঠাকুমা তো চলেছেন। ভূতেদের আগেই ডেকে নিয়েছেন। তারপর পায়খানায় ঢুকতে যাবেন, দেখেন ইয়া বড় কেঁদো বাঘ একটা ছাগল নিয়ে বসে আছে।

ঠাকুমা বলছেন, ও বাবা! বাঘ!

বাঘ বলছে, ঘেঁয়াও!

ঠাকুমা ভাবছেন, এবার গেলাম!

বাঘ সবে ছাগল খাবে, খাওয়ার সময়ে বাঘ কি কোনো উৎপাত বরদাস্ত করে?

ও গো, তোমরা কোথায় গো!—বলেই ঠাকুমা মূর্ছা গেলেন। বাড়ির লোকজনও দৌড়ে আসছিল। বাঘের গর্জন শুনে তারাও থতমত। তারপর ওদের সামনেই বাঘকে চার পা ধরে কে যেন চিত করে দিল। ও মা! বাঘের চার পা ওপরপানে। বাঘ ভাসতে ভাসতে শূন্যে উঠছে।

বউ কোথায়? বউ কোথায়?

ঠাকুমা কেঁদে বললেন, এই তো এখানে!

শাশুড়ি বললেন, দেখ্ ওপরে চেয়ে দেখ্।

বাঘ চার পা তুলে শূন্যে ভেসে যাচ্ছে দেখে ঠাকুমা অবাক!

গ্রামসুদ্ধ সবাই অবাক। বাঘকে ওরা নাকি সুন্দরবনে পৌঁছে দিয়ে আসে।

গ্রামে ধন্য ধন্য পড়ে গেল। কাগজেও নাকি এ খবর বেরোয়। কেমন করে এটা সম্ভব হল, তা জানার জন্য ঠাকুমার শ্বশুরবাড়িতে লোকজনের ভিড়।

ঠাকুমা তাঁর শাশুড়ির আঁচলে মুখ গুঁজে থাকলেন। সবাই বলল, এ কোনো ভৌতিক ব্যাপার নয়। নিশ্চয় দেবদেবীর আশীর্বাদ। ঠাকুমার শাশুড়ি ধুমধামে কি যেন পুজো করলেন। অনেক খিচুড়ি, অনেক পায়েস। ওঁর ভূতরাও পেট পুরে খেয়েছিল।

আজ ভাবি, আমারও যদি কয়েকটা ভূত থাকত!

কার্তিক ১৪১১

বিপিনবাবুর চশমা

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

পলাশপুর রেল স্টেশানে রাত্তির দুটো দশ মিনিটে একটা ট্রেন থামে। অত রাতের ট্রেন বলেই তাতে পলাশপুর থেকে কোনো যাত্রী ওঠে না। কোনো কোনো দিন ট্রেনটা দু'তিন ঘণ্টা লেট করে, আসতে আসতে ভোর হয়ে যায়। কে সারারাত স্টেশানে বসে থাকতে চায়?

হঠাৎ বিশেষ প্রয়োজনে রতনকে কলকাতায় যেতেই হবে। তাই সে ঐ ট্রেনের টিকিট কিনেছে। বেশি রাত হয়ে গেলে সাইকেল রিকশা পাওয়া যায় না, তাই সে রাত বারোটার মধ্যে স্টেশানে চলে এল। ফার্স্ট ক্লাস ওয়েটিং রুমে আর কেউ নেই, বেশ হাত-পা ছড়িয়ে থাকা যায়, ইচ্ছে করলে বইও পড়া যায়।

এই সময় স্টেশানটাকে ঘুমন্ত মনে হয়। কুলি কিংবা পান-বিড়িওয়ালারাও ঘুমোয়। রতন একখানা বই খুলে পড়ছে। এই সময় দরজা ঠেলে একজন মাঝবয়সী লোক ঢুকল। পাজামা আর পাঞ্জাবি পরা, চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা, মাথায় অল্প টাক।

লোকটিকে একটু যেন চেনা চেনা মনে হল, কিন্তু কোথায় দেখেছে মনে করতে পারল না রতন। সে আবার বই পড়তে লাগল।

একটু পরে লোকটি গলা খাঁকারি দিয়ে রতনের কাছে এসে বসে পড়ে বলল, আমি কি আপনার কাছে একটু বসতে পারি?

রতন একটা চামড়ার ব্যাগ এনেছে, সেটা তার পায়ের কাছে রাখা। ব্যাগটার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে সে বলল, হ্যাঁ, বসুন না!

যদিও মনে মনে সে একটু অবাক হল। এত বড় ঘর, অনেকগুলি চেয়ার থাকতেও লোকটি তার কাছে এসে বসতে চায় কেন?

লোকটি বলল, রাত্তির বেলা একা একা থাকতে আমার ভয় করে। আমি বিপিন চৌধুরী, আগে মেমারি কোর্টের জজ ছিলাম।

এই লোকটি একজন জজসাহেব শুনে রতনের খানিকটা সম্ভ্রম হল। জজদের কত ক্ষমতা। ইচ্ছে করলেই মানুষকে জেলে ভরে দিতে, এমনকি ফাঁসিও দিতে পারে।

যেন রতনের মনের কথাটা বুঝতে পেরেই বিপিন চৌধুরী বললেন, জজের চাকরি বড় বিপদের চাকরি। সেইজন্য আমি তাড়াতাড়ি রিটায়ার করেছি। কিন্তু তবু বিপদ আমাকে ছাড়ছে না।

রতন কৌতূহলী হয়ে ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে রইল।

বিপিন চৌধুরী বলল, এ চাকরিতে মানুষকে কত রকম শাস্তি দিতে হয়। অনেক সময় নির্দোষ লোকও শাস্তি পায়, তা অস্বীকার করছি না। উকিলরা এমনভাবে মামলা সাজায় যে মাথা গুলিয়ে যায়। একবার কী হয়েছিল জানো?

বিপিনবাবু একটা সিগারেট ধরিয়ে প্যাকেটটা এগিয়ে দিয়ে বলল, খাবে?

রতন দু'দিকে মাথা নেড়ে বলল, আমি খাই না।

সিগারেটের ধোঁয়ার গন্ধও তার খারাপ লাগে। কিন্তু এখন গল্প শোনার লোভে ভদ্রলোকের দিকে চেয়ে রইল।

বিপিনবাবু বলল, একবার নকুল বিশ্বাস নামে একজন লোকের বিরুদ্ধে মামলা চলছিল। লোকটির খুব শক্তপোক্ত চেহারা। লম্বা। চোখ দুটো দেখলেই ভয় করে। ওর নামে খুনের মামলা। রাগের

মাথায় এক বন্ধুকে খুন করে ফেলেছে। তাও খুব বীভৎসভাবে। একটা পাথর দিয়ে ঠুকে মাথাটা একেবারে ছাতু করে দিয়েছে।

লোকটি অবশ্য অস্বীকার করেছে নিজের দোষ। বারবার বলেছে যে পুরো ব্যাপারটাই সাজানো। মেরেছে অন্য এক বন্ধু, ওর নামে দোষ চাপিয়েছে। এমন কথা তো অনেকেই বলে। সাত জন লোক সাক্ষী দিল নকুলের বিরুদ্ধে। ওর বাড়িতে একটা রক্তমাখা জামাও পাওয়া গেছে। নকুলকে ফাঁসির হুকুম দিতেই হল। তখন নকুল রাগের চোটে কাঠগড়া ধরে ঝাঁকাতে লাগল। আমার দিকে হিংস্রভাবে তাকিয়ে চেঁচিয়ে বলল, জজসাহেব, তুমি আমাকে বিনা দোষে ফাঁসিতে পাঠাচ্ছ? তোমায় আমি ছাড়ব না। একদিন না একদিন ঠিক এসে তোমায় গলা টিপে মারব। আমার হাতেই তুমি মরবে!

রতন জিগ্যেস করল, লোকটির কি সত্যি ফাঁসি হয়েছিল? অনেক ফাঁসির আসামী তো ছাড়াও পেয়ে যায়।

বিপিনবাবু বলল, নকুল ছাড়া পায়নি। আপিল করেছিল, সুবিধে হয়নি। এক বছর বাদে নকুলের ফাঁসি হয়ে গেল। কেউ তার ডেডবডি নিতে আসেনি, তাই জেলের লোকরাই পুড়িয়ে ফেলে। নকুল কিন্তু আমার পিছু ছাড়েনি। আমি চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে অন্য জায়গায় চলে এসেছি, তাও—

রতন বলল, তার মানে? সে মরে গেছে, তবু কী করে?

বিপিনবাবু বলল, তার আত্মা অন্য মানুষের রূপ ধরে আসে। দু'বার আমার গলা টিপে ধরেছে।

রতন এবার হেসে উঠে বলল, ভূতের গল্প? আপনি বুঝি ভূতে বিশ্বাস করেন?

বিপিনবাবু বিমর্ষভাবে বলল, আগে করতাম না। এখন তো বিশ্বাস না করে উপায় নেই। তিনবার সে আমায় আক্রমণ করেছে। অন্য লোকজন এসে পড়ায় বেঁচে গেছি। রাত্তিরে আমি একা একা কোথাও যাই না। নেহাৎ আমার মেয়ের অসুখের খবর পেয়ে—

রতন বলল, এখানে ভূত আসবে না। আপনার চিন্তার কিছু নেই।

বিপিনবাবু হাত দিয়ে পাশে কী যেন খুঁজতে লাগল। আপনমনে বলল, চশমাটা কোথায় গেল? চশমাটা কোথায় রাখলাম?

রতন বলল, ঐ তো পাশের চেয়ারে রেখেছেন।

বিপিনবাবু এবার চশমাটা পেয়ে চোখে লাগিয়ে বলল, চশমা ছাড়া কিচ্ছু দেখতে পাই না। একবার নকুল এসে গলা টিপে ধরার পর চোখ দুটো বেশি খারাপ হয়ে গেছে।

এই সময় আর একজন লোক ঢুকল। রোগা-পাতলা চেহারা। সঙ্গে কোনো মালপত্র নেই। বসল গিয়ে একটু দূরের চেয়ারে।

বিপিনবাবু ফিসফিস করে বলল, সাবধান! এ হতে পারে।

রতন জিগ্যেস করল, আপনার সেই নকুলের বয়স কত ছিল?

বিপিনবাবু বলল, বেয়াল্লিশ।

রতন বলল, এর তো অনেক কম বয়েস। তিরিশের বেশি না।

বিপিনবাবু বলল, তাতে কী! নকুলের আত্মা ওর শরীরে ঢুকে পড়তে পারে।

রতন অবিশ্বাসের হাসি দিয়ে নতুন লোকটির দিকে আড়চোখে তাকাল। নিতান্তই নিরীহ চেহারা। তবে ফার্স্ট ক্লাসের যাত্রী বলে মনে হয় না।

লোকটি ওদের উদ্দেশে বলল, ট্রেন বোধহয় লেট হবে। আপনারা ঘুমিয়ে নিতে পারেন।

রতনের অবশ্য ঘুমোবার একটুও ইচ্ছে নেই। সে আবার বই খুলল।

নতুন লোকটি একটু পরে বাথরুমে যাবার জন্য উঠে দাঁড়াল। সেদিকে কয়েক পা গিয়ে ঝপ করে পড়ে গেল মাটিতে। মুখ দিয়ে গোঁ গোঁ শব্দ করতে লাগল।

মৃগী রুগিদের এরকম হয়। রতন লোকটির কাছে গিয়ে জিগ্যেস করল, কী হল? কী হল আপনার?

উত্তর না দিয়ে সে তখনো একরকম শব্দই করে যেতে লাগল।

রতন বলল, মুখে-চোখে জল দিতে হবে।

সঙ্গে সঙ্গে লোকটির যেন জ্ঞান ফিরে এল। কটমট করছে চোখ দুটো। বিপিন চৌধুরীর দিকে তাকিয়ে বলল, তুই সেই জজসাহেবটা না? আজ তোকে শেষ করবই আমি। নকুল বিশ্বাস কথার খেলাপ করে না।

রতন কিছু বোঝার আগেই সে লাফিয়ে উঠে বিপিন চৌধুরীর গলা টিপে ধরল।

বিপিন চৌধুরী আর্তকণ্ঠে বলতে লাগল, বাঁচাও! ও ভাই বাঁচাও আমাকে। এ মেরে ফেলবে!

রতনের বিস্ময়ের ঘোর কাটতে খানিকটা সময় লাগল। সত্যি সত্যি এরকম হয়! এই নিরীহ চেহারার লোকটার শরীরে নকুল বিশ্বাস নামে একজন খুনির আত্মা ভর করেছে?

রতন পেছন দিক থেকে লোকটাকে টেনে ছাড়াবার চেষ্টা করল।

অমনি লোকটি বিপিন চৌধুরীকে ছেড়ে দিয়ে উল্টোদিকে ফিরে আচমকা এক ধাক্কা মারল রতনকে।

তাল সামলাতে না পেরে রতন পড়ে গেল মাটিতে। সেই লোকটি রতনের বুকে চড়ে গলা টিপে ধরল।

বিপিন চৌধুরী এই ফাঁকে দৌড়ে পালাল ঘর থেকে।

বুকের ভেতরটা ঢুকুপুকু করছে রতনের। এবার সে দারুণ ভয় পেয়ে গেছে। ভূতের সঙ্গে কী করে লড়াই করবে? সে কাতর গলায় বলল, আমায় কেন মারছ? আমি তো কোনো দোষ করিনি।

লোকটি অমনি হাত আলগা করে বলল, তাই তো! তোমায় কেন মারব? সে ব্যাটা পালাল কোথায়?

লোকটি রতনকে ছেড়ে দিয়ে তীরের মতন ছুটে গেল বিপিন চৌধুরীকে ধরতে।

মুক্তি পেয়ে রতন হাঁপাতে লাগল। বাপরে বাপ, খুব জোর বাঁচা গেছে! এ কী সব ভূতুড়ে কাণ্ড!

দারুণ তেষ্টা পেয়ে গেছে। চামড়ার ব্যাগটায় জলের বোতল আছে। সেই ব্যাগটার দিকে হাত বাড়াতেই আবার সে চমকে উঠল। ব্যাগটা নেই সেখানে। ঘরের মধ্যে কোথাও নেই। তারপর প্যান্টের পকেটে হাত দিয়ে দেখল, মানিব্যাগও নেই।

তার মানে সবটাই সাজানো, সবটাই অভিনয়। ভূত-টুত কিছু নয়। বিপিন চৌধুরী নামের লোকটা কালো ব্যাগটা তুলে নিয়ে পালিয়েছে। আর ধস্তাধস্তির সময় অন্য লোকটা পকেট থেকে তুলে নিয়েছে মানিব্যাগ।

মানিব্যাগে বেশি টাকা ছিল না। কালো ব্যাগটায় ছিল পঞ্চাশ হাজার টাকা। শিগগিরই তার দাদার মেয়ের বিয়ে। বাবা সেইজন্য টাকাটা ব্যাঙ্ক থেকে তুলিয়ে রতনের হাত দিয়ে পাঠাচ্ছিলেন। বিপিন চৌধুরী ব্যাঙ্কে ঘোরাঘুরি করে দেখে কে কত টাকা তোলে। রতন যে আজ এই ট্রেনে কলকাতায় যাবে, তাও কোনোরকমে জেনেছে।

এখন কী হবে? এখন তো ওদের ধরা অসম্ভব। নিশ্চয়ই মিলিয়ে গেছে বাইরের অন্ধকারে। পুলিশকে একটা খবর দিতে হবে। তাতেও কি লাভ আছে কিছু?

রতনের মনটা খুব ভেঙে গেল।

হঠাৎ নজরে পড়ল, মাটিতে বিপিন চৌধুরীর চশমাটা পড়ে আছে। যদি সেটা পুলিশের কোনো কাজে লাগে, সেই ভেবে তুলে নিল চশমাটা। তারপর দরজার কাছে এসে দাঁড়াল।

ট্রেন আসার আর দেরি নেই। তাই স্টেশান জেগে উঠেছে। রতন দেখল, এক জায়গায় একটা ছোটখাটো ভিড়। লোকেরা গোল হয়ে দাঁড়িয়ে, মাঝখানে যেন কিছু একটা রয়েছে।

সে দৌড়ে গেল সেদিকে। আবার চমকে উঠল।

মাটিতে পড়ে আছে বিপিন চৌধুরী নামের সেই লোকটি। পাশেই তার চামড়ার কালো ব্যাগটা। একজন বলল, এই লোকটি ব্যাগ হাতে নিয়ে ছুটে যাচ্ছিল, একটা পাথরে পা লেগে ছিটকে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেছে। মাথায় চোট লেগেছে খুব। দুজন লোক তার চোখে-মুখে জলের ছিটে দিচ্ছে।

রতন বুঝল, চশমার ব্যাপারে লোকটা সত্যি কথাই বলেছিল। চোখে ভালো দেখতে পায় না, তাই হোঁচট খেয়েছে।

একটু পরেই লোকটির জ্ঞান ফিরে এল, চোখ মেলে তাকাল।

ভিড় ঠেলে একেবারে সামনে গিয়ে রতন চশমাটা দোলাতে দোলাতে বলল, এই যে নকল জজসাহেব, তোমার সত্যিকারের নামটা কী বলো তো?

লোকটি হাউমাউ করে কেঁদে উঠে বলল, আমার নাম নকুল বিশ্বাস। আমাকে আর যাই শাস্তি দাও, ফাঁসি দিও না!

আশ্বিন ১৪০৫

ভূত নেই, ভূত আছে

প্রফুল্ল রায়

বাজু একসঙ্গে মাথা আর হাত নাড়তে নাড়তে বলে, 'না দাদাই, ভূত-টুত বলে কিস্‌সু নেই! স্রেফ গাঁজা।'

বাজুর বন্ধু বিট্টুও ঠোঁট উল্টে দিয়ে বলে, 'একদম বোগাস।'

ফি বছর বাজু পুজোর ছুটিতে মামাবাড়ি আসে। পুরো ছুটিটা কাটিয়ে একেবারে ভাইফোঁটার পর নিজেদের বাড়ি ফিরে যায়।

বাজুর অবশ্য আপন মামা নেই। তবে মাসি আছে, দাদাই আছেন, দিদন আছেন। বেড়িয়ে, গল্প করে, মজার মজার বই পড়ে ছুটিটা তোফা কেটে যায়।

এ বছর বাজুর সঙ্গে এসেছে তার প্রাণের বন্ধু বিট্টু। দুজনের গলায় গলায় ভাব। একই স্কুলে তারা ক্লাস ফোরে পড়ে। দুজনেরই বয়স দশ।

দুই বন্ধুই লেখাপড়ায় দারুণ। হাফ ইয়ারলিতে বাজু ফার্স্ট হলে, অ্যানুয়ালে বিট্টু। দুজনেরই দারুণ বুদ্ধি আর সাহস।

বাজু মামাবাড়িতে এলে সন্ধের পর রোজ ছাদে আলো নিভিয়ে শতরঞ্জিতে আরাম করে বসে গল্পের আসর জমানো হয়। গল্প বলেন অবশ্য দাদাই অর্থাৎ দাদামশাই। মামাবাড়িতে অজস্র বই, আট-দশটা আলমারি একেবারে বোঝাই। তবু প্রতি মাসেই দাদাই প্রচুর বই কেনেন। কত রকমের বই তার ঠিক নেই। দেশবিদেশের ইতিহাস, সায়েন্স ফিকশান, কল্পবিজ্ঞানের কাহিনি, রূপকথা, অ্যাডভেঞ্চার, প্রকৃতি বিজ্ঞান ইত্যাদি। এইসব বইয়ের প্রতিটি পাতা দাদাইয়ের মুখস্থ। ছুটিতে বাজু মামাবাড়ি এলে তিনি তাকে এই বইগুলোর গল্প শোনান।

গল্পের আসরে শ্রোতা শুধু একা বাজুই নয়—মাসি, দিদন এবং মামাবাড়ির চারপাশে যারা থাকে যেমন বুম্বা, পাপাই, বুবলা—এরাও। বুম্বাদের সঙ্গেও খুব বন্ধুত্ব হয়ে গেছে বাজুর।

দিন তিনেক আগে এবার পুজোর ছুটি পড়েছে আর আজই দুপুরে বাজু বিট্টুকে সঙ্গে করে মামাবাড়ি চলে এসেছে। বাজুর মা-ই তাদের পৌঁছে দিয়ে গেছেন।

দিনের বেলাটা হৈ হৈ করে কাটিয়ে এখন এই সন্ধেবেলায় ছাদে গল্পের আসর বসিয়েছে বাজুরা। এতদিন যারা গল্প শুনে আসছিল বিট্টু আসায় এবার তাদের সংখ্যাটি বেড়েছে।

এবার মামাবাড়িতে পা দিয়েই বাজু খবর পেয়েছে, ইদানিং কিছুদিন ধরে দাদাইকে ভূতে পেয়েছে। ইংরিজি আর বাংলায় ভূত-প্রেত নিয়ে যত বই বেরিয়েছে, সবই কিনে ফেলেছেন। এগুলো রাখার জন্য নতুন আলমারিও করতে হয়েছে।

কাজেই দাদাইয়ের গল্পে ভূত যে এসে পড়বে তাতে আর আশ্চর্য কী! বেশ জমিয়ে খাস বিলেতের এক ঢ্যাঙা সাহেব-ভূতের কীর্তিকলাপ যখন তিনি বলতে শুরু করেছেন সেই সময় বাজু আর বিট্টু প্রবল চেঁচামেচি জুড়ে দেয়।

তাদের দেখাদেখি শিয়ালের পালের মতো পাপাইরা কোরাসে বলে ওঠে, 'বাজে, বাজে, বাজে। আমরা ভূত বিশ্বাস করি না।'

দাদাই চোখ কুঁচকে সবাইকে দেখতে দেখতে জিগ্যেস করেন, 'কর না তো?'

'না, না, না।'

'কেন কর না?'

'আমরা কেউ ভূত দেখিনি, তাই।'

দাদাই কী একটু ভাবেন। তারপর বলেন, 'যদি তোমাদের ভূত দেখিয়ে দিতে পারি, তাহলে করবে?'

সবাই গলা মিলিয়ে বলে, 'করব, করব।'

এদের মধ্যে বাজু এবং বিট্টুর উৎসাহই সবচেয়ে বেশি। তারা বলে, 'কবে দেখাবে? কখন দেখাবে?' তাদের আর তর সইছে না যেন।

দাদাই বলেন, 'দু-একদিনের ভেতর দেখতে পাবে।'

'দিনের বেলা, না রাত্তিরে?'

'রাত্তিরে।'

'কোথায় দেখাবে?'

দাদাইদের বাড়ির পেছনে অনেকটা ফাঁকা মাঠ। মাঠটা ঝোপঝাড় আগাছায় ভর্তি। তারপর রেললাইন চলে গেছে। আর রেললাইনের ধারে একটা প্রকাণ্ড পুরোনো ভাঙাচোরা জমিদার বাড়ি কোনোরকমে দাঁড়িয়ে আছে। বাড়িটায় লোকজন থাকে না, আলো-টালো নেই। ঘুরঘুট্টি অন্ধকারে ওটাকে ভূতুড়ে দেখায়। বাড়িটার দিকে আঙুল বাড়িয়ে দাদাই বলেন, 'ঐ বাড়িটায় রাত বারোটার সময় দোতলার দক্ষিণের শেষ ঘরটায় পরশু যদি যাও, ভূত দেখতে পাবে।' তারপর ক্ষুদে শ্রোতাদের দিকে ফিরে পরপর সবাইকে দেখতে দেখতে চাপা গলায় ফিসফিসিয়ে বলেন, 'তোমাদের মধ্যে কে কে যেতে চাও, বল।'

পাপাই, বুম্বা আর বুবলার মুখ চুপসে গেছে। তাদের বুকের ভেতরটা ভীষণ ঢিব ঢিব করছিল।

বুম্বা ঢোক গিলে বলে, 'আমাদের বাড়ির গেটে রাত দশটায় তালা লাগানো হয়। আমি যে বেরুতে পারব না।'

পাপাই বলে, 'কাল সকালে চন্দননগরে পিসির বাড়ি যাচ্ছি। ফিরব চারদিন বাদে। পরশু ভূত দেখতে যাব কী করে?'

বুবলা বলে, 'ন'টা বাজলেই আমার ঘুম পেয়ে যায়। বারোটা পর্যন্ত আমি বাবা জেগে থাকতে পারব না।'

মুচকি হেসে দাদাই বলেন, 'বুঝেছি তোমরা কেমন বীরপুরুষ।' তারপর বাজুদের জিগ্যেস করেন, 'কী, তোমরাও বুবলাদের দলে নাকি?'

বাজু এবং বিট্টু লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। বুক ফুলিয়ে মোটা গলায় বলে, 'নেভার।'

নিতান্ত ভালোমানুষের মতোই দাদাই জিগ্যেস করেন, 'তাহলে তোমরা পরশু রাতে ওখানে যাচ্ছ?'

বাজু বলে, 'নিশ্চয়ই। কিন্তু—'

'কী?'

'পরশু রাত বারোটায় ওখানে গেলে ভূত দেখতে পাব, কী করে জানলে?'

'আমি জানি, পরশু হল বুধবার। প্রতি বুধবার রাত বারোটায় ওখানে গেলে তাকে দেখা যায়।'

বিট্টু বলে, 'তুমি দেখেছ দাদাই?'

দাদাই বলেন, 'নিশ্চয়ই। না হলে তোমাদের অত জোর দিয়ে বলছি কী করে?'

বাজু আর বিট্টু এবার ভীষণ উত্তেজিত হয়ে ওঠে। জ্বলজ্বলে চোখে তাকিয়ে এক নিঃশ্বাসে গাদা গাদা প্রশ্ন করে যায়। তাকে দেখতে কেমন? কথা-টথা বলেছে কিনা? বললে কী বলেছে? ইত্যাদি।

দাদাই বলেন, 'আমি কিছু বলব না। সাহস থাকলে নিজেরা গিয়ে দেখবে।'

'ঠিক আছে। আমরা পরশু যাচ্ছি।'

দিদন কিন্তু খুব রেগে যান। দাদাইকে বলেন, 'কেন বাচ্চা দুটোকে ঐ হানাবাড়িতে পাঠাচ্ছ? শেষে ভয়-টয় পেয়ে যদি কিছু হয়ে যায়?'

বাজু আর বিট্টুর ওপর দাদাইয়ের দারুণ বিশ্বাস। তিনি বলেন, 'ওরা ভয় পাবার

ছেলে নয়। তুমি ভেবো না। দুজনে ঠিক পরশু রাত বারোটায় গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করে আসতে পারবে।'

দিদনের দুশ্চিন্তা কাটে না। তিনি বলতে থাকেন, 'কী যে তোমার অলুক্ষুণে কাণ্ড বুঝতে পারি না। এই বাচ্চাদের কেউ অমন করে উসকে দেয়!'

দিদন এবং মাসির ঘোর আপত্তি সত্ত্বেও বুধবার রাত বারোটায় মাঠ পেরিয়ে দুই বন্ধু পোড়ো জমিদার বাড়িতে চলে আসে। তাদের দুজনের হাতে রয়েছে বড় টর্চ আর লাঠি। পিঠে বাঁধা আছে এয়ারগান।

বাড়িটার সামনে বাজুরা থমকে যায়। কেউ কোথাও নেই, চারিদিক একেবারে সুনসান। এধারে-ওধারে ঝিঁঝিরা একটানা ডেকে চলেছে। অনেক দূরে, রেললাইনের ওপারে কোথায় যেন মিহি, মোটা, নানা সুরে ঝাঁকে ঝাঁকে কুকুর ডেকে ওঠে। এছাড়া কোথাও আর কোনো শব্দ নেই।

এ লাইনে লাস্ট ট্রেন চলে যায় পৌনে বারোটায়। তারপর এদিকটা একেবারে নিঝুম হয়ে পড়ে।

সব দেখে-শুনে বিট্টু দমে একটু যায়। বলে, 'কি রে বাজু, ভেতরে যাবি?'

বাজু বলে, 'নিশ্চয়ই। এই পর্যন্ত এসে যদি ফিরে যাই, দাদাই ঠাট্টা করে করে আমাদের জ্বালিয়ে মারবে।' বলে টর্চ জ্বালে।

ওরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে দশ-বারো ফিট দূরে ভাঙা লোহার গেট। সেটার একটা পাল্লা নেই, অন্য পাল্লাটাও ভেঙে হেলে পড়েছে। গেটটাকে ঘিরে প্রচুর বুনো ঘাস আর কাঁটার ঝাড়।

বাজু বলে, 'চল, ভেতরে ঢুকি।'

টর্চ জ্বেলে রেখেই দুজনে ঘাস এবং ঝোপঝাড় ঠেলে বাড়ির ভেতর চলে আসে।

গেটের পর মস্ত বাঁধানো চাতাল। তারপর দশ ধাপ সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠলে মোটা মোটা থামের ভেতর টানা বারান্দা। থামে এবং বারান্দায় ফাটল ধরে ভেতরের ইট বেরিয়ে পড়েছে। ফাঁকে ফাঁকে বট-অশ্বত্থের চারা গজিয়ে উঠেছে।

দোতলায় উঠে দক্ষিণের শেষ ঘরখানায় যেতে হবে বাজুদের। অনেক খোঁজাখুঁজির পর সিঁড়িটা বের করে তারা ওপরে উঠতে থাকে। হঠাৎ নাকে ভক করে একটা বোঁটকা দুর্গন্ধ এসে লাগে। সঙ্গে সঙ্গে ফর ফর করে অগুনতি চামচিকে মাথার ওপর উড়তে থাকে। এদের দু-একটা আবার বাজু এবং বিট্টুর নাকে-মুখে নখের আঁচড় বসিয়ে যায়।

দু'হাতে লাঠি আর টর্চ ঘোরাতে ঘোরাতে চামচিকেদের আক্রমণ ঠেকিয়ে কোনোরকমে দোতলায় উঠে আসে বাজু আর বিট্টু। চারপাশে আলো ফেলে ফেলে দক্ষিণ দিকটা ঠিক করে নেয়। টানা একটা বারান্দা সোজা ওদিকে চলে গেছে, যার শেষ মাথার ঘরটায় যাবার কথা বলে দিয়েছেন দাদাই।

বাজুরা পা বাড়াতে যাবে, কোথায় কোন অদৃশ্য ঘুলঘুলির ভেতর থেকে আওয়াজ ওঠে, 'তক্‌খো-তক্‌খো—' অর্থাৎ তক্ষক ডাকছে।

তক্ষকটাকে ভেংচি কেটে বাঁ পাশের সিলিংয়ের কোণ থেকে কারা যেন ভারী গম্ভীর গলায় হুমকে ওঠে, 'ভূতুম—ভূতুম—ভূতুম—'

অমন যে দুর্জয় সাহসী বাজু, তার বুকের ভেতরটা পর্যন্ত ছমছম করে ওঠে। হাত-পা তার ভীষণ কাঁপছে। আরেকটু হলে তার হাত থেকে টর্চ আর লাঠি খসে পড়ত। কোনোরকমে নিজেকে সামলে নেয় সে।

বিট্টুর বুকটাও গুরগুর করছিল। বাজুর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে সে কাঁপা গলায় বলে, 'কী ব্যাপার রে?'

বাজু বলে, 'দাঁড়া দেখছি।'

সিলিংয়ের যেদিক থেকে আওয়াজটা আসছে, আন্দাজ করে মুখ তুলে সেখানে তাকায় বাজু। আর তখনই দেখতে পায় চারজোড়া জ্বলন্ত চোখ সেখানে স্থির হয়ে আছে। বিট্টু 'বাবা গো' বলেই দু'হাতে মুখ ঢেকে মেঝেতে বসে পড়ে। বাজুও পড়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ কী মনে পড়তে সেই চোখগুলোর ওপর টর্চের আলো ফেলে। তখনই দেখা যায়, সিলিংয়ের লোহার বিমের ওপর সারি সারি চারটে পেঁচা বসে আছে।

বাজু হাত ধরে বন্ধুকে টেনে তুলতে তুলতে বলে, 'ভয় নেই বিট্টু, ওগুলো পেঁচা রে। ওঠ।'

বিট্টু আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায়। পেঁচাগুলোকে দেখে তার ভয় অনেকটা কেটে যায়। বলে, 'আর দাঁড়াস না। চল—'

পা টিপে টিপে বারান্দা ধরে দুই বন্ধু এগিয়ে যায়। তাদের বাঁ পাশে সারি সারি ঘর। বেশিরভাগ ঘরেরই দরজা-জানালা লোপাট হয়ে গেছে। বিরাট বিরাট ফোকরগুলো দিয়ে বাইরের ঝাপসা আলো ভেতরে গিয়ে পড়েছে। সেদিকে তাকালে মনে হয়, কারা যেন ঘরগুলোর মধ্যে ওত পেতে বসে আছে, যে কোনো মুহূর্তে তারা ঘাড়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

শেষ পর্যন্ত দক্ষিণের শেষ ঘরটার সামনে এসে দাঁড়ায় বাজুরা। এ ঘরের দরজার পাল্লা নেই, তবে জানালাগুলো আস্তই আছে।

বিট্টু ফিসফিসিয়ে বলে, 'কি রে, ভেতরে ঢুকবি?'

বাজু কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই ঘরের ভেতর থেকে খোনা গলায় কেউ বলে ওঠে, 'ঢুঁকবে বৈঁকি, অ্যাদ্দুর এঁসে নাঁ ঢুঁকলে চঁলে? এঁসো, এঁসো, তোঁমাদের সঁঙ্গে এঁকটু গঁল্প-টঁপ্প কঁরি।'

দুই বন্ধুর হৃৎপিণ্ড বলের মতো লাফাতে থাকে। তারা কী করবে, ভেবে পায় না।

ঘর থেকে সেই গলাটা আবার ভেসে আসে, 'কী হঁল, দাঁড়িয়ে রঁইলে কেঁন? তোঁমাদের তোঁ দাঁরুণ সাঁহস। চঁলে এঁসো। আঁমি দেঁখতে পাঁচ্ছি, তোঁমাদের সঁঙ্গে টঁর্চ, লাঁঠি আঁর এঁয়ারগাঁন রঁয়েছে। ওঁগুলো বাঁইরে রেঁখে এঁসো।'

অন্ধকারে দুই বন্ধু মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। তারপর 'দেখাই যাক না, কী হয়'—এমন একখানা ভাব করে খুব সাবধানে পা ফেলে ফেলে ঘরে ঢুকে পড়ে।

বাইরে থেকে ঘরের ভেতরটা অনেক বেশি অন্ধকার। একটা দেওয়ালের কাছে সেই অন্ধকার যেন আরো জমাট বেঁধে আছে। মনে হয় লম্বা কালো কোট পরে বেজায় ঢ্যাঙা কেউ ওখানে দাঁড়িয়ে। কম করে সে আট-ন'ফিট লম্বা তো হবেই, মাথা প্রায় সিলিংয়ে গিয়ে ঠেলেছে। সেটার গায়ে দুটো জ্বলন্ত চোখ আটকানো। আর যা চোখে পড়ে তা হল দশ-বারো ইঞ্চি মাপের বিরাট বিরাট ধবধবে ক'টা দাঁত।

দাঁত এবং চোখ দেখে দুই বন্ধুর দাঁতকপাটি লেগে যাবার অবস্থা। তাদের গলার ভেতর থেকে 'আঁক' করে একটা আওয়াজ বেরিয়ে আসে।

সেই গলাটা আবার শোনা যায়, 'কী নাঁম তোঁমাদের?'

ম্যালেরিয়া হলে যেমন হয়, ভয়ে তেমনি ঠকঠক করে কাঁপছিল বাজুরা। তারই মধ্যে কোনোরকমে দুজনে নাম বলে।

'তোঁমরা কোঁথায় থাঁকো?'

বাজু বলে, 'সেলিমপুরে।' বিট্টু বলে, 'ট্রাঙ্গুলার পার্কের কাছে।'

'এঁখানে কোঁথায় এঁসেছিলে?'

কোথায় এসেছে, বাজুরা জানায়।

'ওঁ মাঁমাবাঁড়িতে বেঁড়াতে এঁসেছ?'

'হ্যাঁ।'

'রাঁত দুঁপুরে এঁই হাঁনাবাঁড়িতে ঢুঁকেছিলে কেঁন?'

'এই—মানে, মানে—'

'বুঁঝতে পেঁরেছি। ভূঁত দেঁখতে এঁসেছ। তোঁমাদের মঁতো সাঁহসী ছেঁলে আঁর দেঁখিনিঁ। আঁলাপ কঁরে ভাঁরী খুঁশি হঁলাম।'

কাঁপতে কাঁপতে বাজুরা বলে, 'আমরাও।'

সেই গলাটি শোনা যায়, 'তোঁমাদের সাঁহসের জঁন্যে কিঁছু উঁপহার দিঁচ্ছি। এঁই নাঁও।'

দুটো বেজায় লম্বা কালো হাত বাজু আর বিট্টুর দিকে এগিয়ে আসে। সেই হাতে কাজুবাদামের প্যাকেট, বড় চকোলেট বার ইত্যাদি রয়েছে।

বাজুরা নেবে কি নেবে না যখন ভাবছে, সেই সময় গলাটা ফের কানে আসে, 'নাঁও, নাঁও—'

কাঁপতে কাঁপতে বাজু আর বিট্টু কাজুবাদাম আর চকোলেট তুলে নিয়ে বলে, 'থ্যাঙ্ক ইউ।'

'থ্যাঁঙ্কস তোঁ আঁমার দেঁবার কঁথা। আঁচ্ছা, এঁবার তোঁমরা বাঁড়ি যাঁও। নঁইলে দাঁদাই দিঁদুন আঁর মাঁসি ভাঁববে।'

পোড়ো বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাজুরা আবার সেই ফাঁকা নির্জন মাঠের ওপর দিয়ে ফিরে আসে।

মাসি আর দিদন গেটের কাছের দুটো জোরালো আলো জ্বেলে বসেছিলেন। বাজুদের দেখে দৌড়ে আসেন। দুজনকে জড়িয়ে ধরে বাড়ির ভেতর নিয়ে গিয়ে বলেন, 'তোদের জন্যে ভেবে ভেবে আমাদের হাত-পা ঠান্ডা হয়ে গেছে। কিছু হয়নি তো তোদের?'

বাজু এবং বিট্টু একসঙ্গে জানায়, 'কী আবার হবে?'

মাসি বলে, 'ভয়-টয় পাসনি তো?'

ভয় যে যথেষ্টই পেয়েছে তা কি আর বাজুরা স্বীকার করে? তারা বলে, 'কিসের ভয়? ধুস—'

দারুণ কৌতূহল হচ্ছিল মাসির। সে জিগ্যেস করে, 'কী দেখলি ওখানে?'

দিদন চান না পোড়ো বাড়ির ব্যাপারে আজ কোনো কথা হোক। তিনি মাসিকে বলেন, 'যা শোনার কাল শুনিস। রাত দেড়টা বাজে। ওদের ঘুমনো দরকার। আয় বিট্টু, আয় বাজু—' দুজনকে তাদের ঘরে নিয়ে যান তিনি।

ওরা যখন হাত-পা ধুয়ে জামা-প্যান্ট পাল্টে শুয়ে পড়েছে আর দিদন ওদের মশারি গুঁজে দিচ্ছেন সেই সময় হন্তদন্ত হয়ে দাদাই এসে হাজির। তিনি বলেন, 'কি বাজুদাদা, বিট্টুদাদা—মোলাকাত হল?'

দুই বন্ধু বলে, 'তা হয়েছে। আমরা ভালো ভালো প্রেজেন্টও পেয়েছি। কিন্তু—'

'কিন্তু কী?'

'ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'কোনো খটকা লাগছে?'

'হুঁ।'

'কী?'

একটু চিন্তা করে বাজু বলে, 'কাল বলব।'

'ও. কে। কালই শুনব। গুড নাইট।'

'গুড নাইট।'

দাদাই দিদন আর মাসিকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যান।

ভোরবেলা, তখনও রোদ ওঠেনি, আকাশটা আবছা মতো, হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায় বাজুর। রাত্তিরে ভালো করে ঘুমোতে পারেনি সে। বার বার পোড়ো বাড়ির ঘটনাগুলো মনে পড়ে যাচ্ছিল তার। পোড়ো বাড়িতে তারা যা দেখেছে তার মধ্যে কোথায় যেন একটা গোলমাল আছে। গোলমালটা কী ধরনের সেটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

দুই বন্ধু একটা প্রকাণ্ড খাটে পাশাপাশি শুয়েছিল। আস্তে আস্তে বাজু বাঁদিকে কাত হতেই দেখতে পায় বিট্টু মশারির চালের দিকে অন্যমনস্কর মতো তাকিয়ে আছে। সে ডাকে, 'এই—'

বিট্টু সাড়া দেয়, 'কী বলছিস?'

তক্ষুনি উত্তর দেয় না বাজু। কী যেন ভেবে কিছুক্ষণ বাদে বলে, 'আচ্ছা, ভূতেরা তো শুনেছি দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে খালি ভয় দেখায়।'

'হুঁ।'

'কিন্তু কাল রাত্তিরে কী হল? আমাদের সঙ্গে ভালো ভালো কথা বলল, কাজু-চকোলেট দিল। জানিস, আমার কিরকম যেন মনে হচ্ছে।'

'আমারও তাই। রাত্তিরে ভালো ঘুম হয়নি, খালি এইসব কথা ভেবেছি।'

খানিকক্ষণ চুপচাপ।

ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে কিছু চিন্তা করে বাজু। তারপর বলে, 'এক কাজ করি চল—'

বিট্টু বলে, 'কী রে?'

'কাউকে না জানিয়ে চুপি চুপি এখন একবার ঐ পোড়ো বাড়িটায় যাই চল। আমার মনে হয় কোনো একটা ক্লু-টুলু পেয়ে যাব।'

দুই বন্ধু অজস্র ডিটেকটিভ গল্প পড়েছে। তাদের ধারণা, শার্লক হোমস, কিরীটী রায়, ফেলুদার মতো তারাও একেকটি দুর্ধর্ষ গোয়েন্দা। পোড়ো বাড়ির ভূতটিকে মেনে নিতে তাদের আটকাচ্ছে। নিশ্চয়ই এর ভেতর কোনো রহস্য আছে।

'আমিও তাই ভাবছিলাম। চল, এক্ষুনি বেরিয়ে পড়ি।' বিট্টু প্রায় লাফ দিয়ে উঠে পড়ে।

মামাবাড়িতে এখনও কেউ ওঠেনি।

বিট্টু আর বাজু নিঃশব্দে গেট খুলে বেরিয়ে পড়ে। পোড়ো বাড়ির দোতলায় সেই ঘরটিতে এসে দেখতে পায়, দেওয়ালের কাছে যেখানে কাল দুটো জ্বলন্ত চোখ আর লম্বা লম্বা সাদা দাঁত দেখেছিল সেখানে অনেকগুলো ইট থাকে থাকে সাজিয়ে উঁচু বেদির মতো করা হয়েছে। তার ওপর কালো কাপড়ের বিরাট এক আলখাল্লা পড়ে আছে। সেটা তুলে ধরতে দেখা যায়, দু'জায়গায় গোল করে কী যেন লাগানো রয়েছে। আবছা অন্ধকারে সে দুটো যেন জ্বলছে।

বাজু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে বলে, 'ফসফরাস। কাল রাত্তিরে এই দেখে মনে হয়েছিল ভূতের চোখ।'

এদিকে বিট্টু সাদা শোলার তৈরি দাঁতের পাটি আবিষ্কার করে ফেলে। বলে, 'এই দ্যাখ, ভূতের দাঁত। কাল এগুলো চোখের নীচে আটকে আমাদের ভয় দেখানো হয়েছিল।'

'হুঁ।' বাজু বলে, 'দ্যাখ তো আর কিছু ক্লু পাওয়া যায় কিনা।'

খোঁজাখুঁজি করতে করতে দু'বন্ধুর চোখে পড়ে ঘরের মেঝের ধুলোতে তাদের জুতোর ছাপ ছাড়াও বড় কেডসের দাগ পড়ে আছে।

দাগগুলোর পাশে বসে দুই বন্ধু অনেকক্ষণ ঝুঁকে দেখতে থাকে। তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে ভীষণ ব্যস্তভাবে বাজু বলে, 'তুই এখানে থাক, আমি দশ মিনিটের মধ্যে চলে আসছি।' বলে দৌড়তে দৌড়তে বেরিয়ে যায়।

দশ মিনিটও লাগে না, তার অনেক আগেই একজোড়া কেডস নিয়ে ফিরে আসে বাজু। তারপর পুরোনো দাগগুলোর পাশে কেডস রেখে চাপ দিতেই নতুন দাগ হয়ে যায়। আগের দাগ আর এই দাগ হুবহু এক। অর্থাৎ বাজু যে কেডস নিয়ে এসেছে সেটা পরে কাল কেউ এখানে এসেছিল।

বাজু দাগগুলো দেখিয়ে বলে, 'বুঝতে পারছিস তো?'

বিট্টু আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে। বলে, 'হুঁ।'

'চল, এবার ফেরা যাক।'

কালো আলখাল্লা, দাঁত, কেডস ইত্যাদি নিয়ে যখন বাজুরা মামাবাড়িতে ফিরে আসে, দাদাই আর

দিদন সামনের বারান্দায় বসে চা খাচ্ছেন। মাসিকে অবশ্য দেখা যায় না। সে একেবারে লেট লতিফ, সাড়ে আটটার আগে কোনোদিনই তার ঘুম ভাঙে না।

বাজুদের দেখে অবাক হয়ে যান দাদাই আর দিদন। দাদাই বলেন, 'এ কী, কোথায় গিয়েছিলে তোমরা?'

বিট্টু বলে, 'ভোরবেলা ঘুম ভেঙে গেল, তাই ভাবলাম ঐ পোড়ো বাড়িটায় একবার ঘুরে আসি।'

দাদাই চমকে ওঠেন, 'গিয়েছিলে নাকি?'

'হ্যাঁ গেলাম। ভাবলাম দেখি যদি কালকের সেই মক্কেলের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়।'

'কী সর্বনাশ!'

বাজু বলে, 'দেখা হল না। তবে তার জার্সিটা নিয়ে এসেছি।' বলে সেই আলখাল্লাটা এবং দাঁতগুলো তুলে ধরে

তারপর সেগুলো নামিয়ে রেখে সেই কেডস দুটো দেখিয়ে বলে, 'পোড়ো বাড়ির ঐ ঘরটায় ধুলোর ওপর এগুলোর অনেক ছাপ রয়েছে।' চোখের কোণ দিয়ে দাদাইকে দেখতে দেখতে বলে, 'তুমি নিশ্চয়ই স্বীকার করবে এই কেডস দুটো তোমার। এ দুটো পরে তুমি বিকেলে লেকের দিকে বেড়াতে যাও না?'

ঢোক গিলেই দাদাই বলেন, 'হ্যাঁ আমারই তো। কিন্তু—'

'আমরা কোত্থেকে নিয়ে এলাম, জানতে চাইছ কি?'

'হুঁ।'

'ছাপের সঙ্গে মেলাবার জন্যে বাড়ি থেকে নিয়ে গিয়েছিলাম।' আস্তে আস্তে মাথা নাড়তে নাড়তে বাজু বলতে থাকে, 'দিস ইজ ব্যাড দাদাই। আমাদের বিশ্বাস করাবার জন্যে শেষ পর্যন্ত তোমাকে ভূত সাজতে হল!'

দিদন হঠাৎ ভীষণ রেগে গিয়ে দাদাইকে বলেন, 'ছি ছি, এ কী করেছ তুমি! যদি কিছু একটা হয়ে যেত! তোমার কি আক্কেল নেই!'

দাদাই কাঁচুমাচু মুখে বলেন, 'ওদের সাহস কতখানি সেটাই পরখ করছিলাম। ওখানে গিয়ে তো ক্ষতি হয়নি, কাজুবাদাম পেয়েছে, চকোবার পেয়েছে।'

বাজু বলে, 'ভূত যে আছে, তা কিন্তু প্রমাণ করতে পারনি দাদাই। আমাদের স্রেফ ধাপ্পা দিয়েছ।'

দাদাই বলেন, 'তা হয়তো দিয়েছি। কিন্তু একটা কথার জবাব দাও তো দাদারা—'

'কী?'

'কাল জ্বলন্ত চোখ আর লম্বা লম্বা দাঁত দেখে তোমরা ভয় পাওনি?'

বাজু, বিট্টু দুজনেই হকচকিয়ে যায়। বলে, 'মিথ্যে কথা বলব না, সত্যি ভয় পেয়েছিলাম।'

দাদাই এবার হেসে হেসে বলেন, 'ভূত-টুত নেই, আবার আছেও। কোথায় আছে জানো? আমাদের মনের ভেতর। ভয় পেলেই সে তোমাকে চেপে ধরবে, যেমন কাল ধরেছিল। ভয় না পেলে তোমাদের একশ মাইলের ভেতর সে ঘেঁষবে না।'

আশ্বিন ১৩৯৭

এক ভৌতিক মালগাড়ি আর গার্ড সাহেব

বিমল কর

সে কী আজকের কথা! চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর আগের ঘটনা। আমার তখন কী বা বয়েস; বছর বাইশ। অনেক কষ্টে একটা চাকরি পেয়েছিলাম রেলের। তাও চাকরিটা জুটেছিল যুদ্ধের কল্যাণে। তখন জোর যুদ্ধ চলছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। আমাদের এখানে যুদ্ধ না হোক, তোড়জোড়ের অন্ত ছিল না। হাজারে হাজারে মিলিটারি, শয়ে শয়ে ক্যাম্প, যত্রতত্র প্লেনের চোরা ঘাঁটি, রাস্তাঘাটে হামেশাই মিলিটারি ট্রাক আর জিপ চোখে পড়ত।

ওই সময়ে সব জায়গাতেই লোকের চাহিদা হয়েছিল, কল-কারখানায়, অফিসে, রেলে। মিলিটারিতে তো বটেই।

চাকরিটা পাবার পর আমাদের মাস তিনেকের এক ট্রেনিং হল, তারপর আমায় পাঠিয়ে দিল মাকোড়া সাইডিং বলে একটা জায়গায়। সে যে কী ভীষণ জায়গা আজ আর বোঝাতে পারব না। বিহারেরই একটা জায়গা অবশ্য, মধ্যপ্রদেশের গা ঘেঁষে। কিন্তু জঙ্গলে আর ছোট ছোট পাহাড়ে ভর্তি। ওদিকে মিলিটারিদের এক ছাউনি পড়েছিল। শুনেছি গোলা-বারুদও মজুত থাকত। ছোট একটা লাইন পেতে মাকোড়া থেকে মাইল দেড়-দুই তফাতে ছাউনি গাড়া হয়েছিল।

স্টেশন বলতে দেড় কামরার এক ঘর। মাথার ওপর টিন। ইলেকট্রিক ছিল না। প্লাটফর্ম আর মাটি প্রায় একই সঙ্গে। অবশ্য প্লাটফর্মে মোরন ছড়ানো ছিল।

স্টেশনের পাশেই ছিল আমার কোয়ার্টার। মানে মাথা গোঁজার জায়গা। সঙ্গী বলতে এক পোর্টার। তার নাম ছিল হরিয়া। সে ছিল জোয়ান, তাগড়া, টাঙ্গি চালাতে পারত নির্বিবাদে। হরিয়া মানুষ বড় ভালো ছিল। রামভক্ত মানুষ। অবসরে সে আমায় রামজী হনুমানজীর গল্প শোনাত। যেন আমি কিছুই জানি না রাম-সীতার।

হরিয়াকে আমি খুব খাতির করতাম। কেননা সেই আমার ভরসা। হরিয়া না থাকলে খাওয়া বন্ধ। ভাত, রুটি, কচুর তরকারি, ভিন্ডির ঘেঁট, অড়হর ডাল, আমড়ার টক—সবই করত হরিয়া। আহা, তার কী স্বাদ! মাছ, মাংস, ডিম হরিয়া ছুঁত না। আমারও খাওয়া হত না। তাছাড়া পাবই বা কোথায়! হপ্তায় একদিন করে আমাদের রেশন আসত রেল থেকে। চাল, আটা, নুন, তেল, ঘি, আলু, পিঁয়াজ আর লঙ্কা। ব্যস্।

জায়গাটা যেমনই হোক আমাদের কাজকর্ম প্রায় ছিল না। সারাদিনে একটা কি দুটো মালগাড়ি আসত। এসে স্টেশনে থামত। তারপর তিন-চারটে করে ওয়াগন টেনে নিয়ে ছাউনির দিকে চলে যেত। একসঙ্গে পুরো মালগাড়ি টেনে নিয়ে যেত না কখনো। আর প্রত্যেকটা মালগাড়ির দরজা থাকত সিল্ করা। ওর মধ্যে কী থাকত জানার উপায় আমাদের ছিল না। বুঝতে পারতাম, গোলাগুলি ধরনের কিছু আছে। হরিয়া তাই বলত।

আমি অবশ্য অতটা ভাবতাম না। মালগাড়ির দরজা 'সিল্' করা থাকবে—এ আর নতুন কথা কী! তার ওপর মিলিটারির বরাদ্দ মালগাড়ি। খোলা মালগাড়িতে আমরা যে তারকাঁটা, লোহালক্কড় দেখেছি।

মালগাড়ি ছাড়া আসত অদ্ভুত এক প্যাসেঞ্জার ট্রেন। জানলাগুলো জাল দিয়ে ঘেরা। ভেতরের শার্সি ধোঁয়াটে রঙের। কিছু দেখা যেত না। দরজায় থাকত রাইফেলধারী মিলিটারি। হপ্তা-দু'হপ্তা

বাদে এইরকম গাড়ি আসত। দু'এক মিনিটের জন্যে দাঁড়াত। আমাকে দিয়ে কাগজ সই করাত। তারপর চলে যেত ছাউনির দিকে। গাড়িটা যতক্ষণ স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকত—ততক্ষণ কেমন এক গন্ধ বেরুতো। ওষুধ ওষুধ গন্ধ।

সঙ্গী নেই, সাথী নেই, লোক নেই কথা বলার। একমাত্র হরিয়াই আমার সাথী। দিন আমার বনবাসে কাটতে লাগল। এসেছিলাম গরমকালে, দেখতে দেখতে বর্ষা পেরিয়ে গেল, অতিষ্ঠ হয়ে উঠলাম। মনে হত পালিয়ে যাই। কিন্তু যাব কেমন করে। চাকরি পাবার লোভে বন্ড সই করে ফেলেছি। না করলে হয়তো চলত। কিন্তু সাহস হয়নি।

আমার সবচেয়ে খারাপ লাগত মালগাড়ির গার্ড সাহেবগুলোকে। ওরা কেউ মিলিটারি নয়, কিন্তু স্টেশনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে রেখে দু-চার ঘণ্টা সময় যা কাটাত, কেউ এসে গল্পগুজব পর্যন্ত করত না। ওরা কোন লাট-বেলাট বুঝতাম না। কাজের কথা ছাড়া কোনো কথাই বলত না। আর এটাও বড় আশ্চর্যের কথা, গার্ডগুলো যারা আসত—সবই হয় মাদ্রাজি, অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান, না-হয় গোয়ানিজ ধরনের।

একজন গার্ড শুধু আমায় বলেছিল, চুপি চুপি, "কখনো কোনো কথা জানতে চেয়ো না। আমরা মিলিটারি রেল সার্ভিসের লোক। তোমাদের রেলের নয়। আমরা আমাদের ওপরঅলার হুকুমে কাজ করি। আর কোনো কথা জিগ্যেস করবে না। কাউকে কিছু বলবে না।"

সেদিন থেকে আমি খুব সাবধান হয়ে গিয়েছিলাম।

সব জিনিসেরই একটা মাত্রা আছে। ওই জঙ্গলে, ওইভাবে একা পড়ে থাকতে থাকতে ছ'মাসের মধ্যেই আমি যেন কেমন হয়ে গেলাম। পাগল পাগল লাগত নিজেকে। হরিয়াকে বলতাম, "চল্ পালিয়ে যাই।"

হরিয়া বলত, "আরে বাপ রে বাপ।" বলত, "অমন কাজ করলে হয় ফাটকে ভরে দেবে, না হয়, ফাঁসিতে লটকে দেবে। অমন কাজ করবে না বাবু!"

ভয় আমার প্রাণেও ছিল। পালাব বললেই তো পালানো যায় না।

সময় কাটাবার জন্যে আমি প্রথমে অনেক বলে-কয়ে দু'প্যাকেট তাস আনাই। রেশনের চাল-ডালের সঙ্গে তাস পাঠিয়ে দেয় এক বন্ধু। পেশেন্স খেলা শুরু করি। তবে কত আর পেশেন্স খেলা যায়! তাসগুলোয় ময়লা ধরে গেল।

তারপর শুরু করলাম রেলের কাগজে পদ্য লেখা। এগুতে পারলাম না। পদ্য লেখা বড় মেহনতের ব্যাপার।

শেষে পেনসিল আর কাগজ নিয়ে ছবি আঁকতে বসলাম। স্কুলে আমি ছেলেবেলায় ড্রয়িং ক্লাসে 'কেটলি' এঁকেছিলাম, ড্রয়িং স্যার আমার আঁকা দেখে বেজায় খুশি হয়ে বলেছিলেন, 'বাঃ! বেশ লাউ এঁকেছিস তো! এক কাজ কর—এবার লাউ আঁকতে চেষ্টা কর, 'কেটলি' হয়ে যাবে।...তুই সব সময় উলটে নিবি। তোকে বলল, বেড়াল আঁকতে, তুই বাঘ আঁকা শুরু করবি, দেখবি বেড়াল হয়ে গেছে।'

লজ্জায় আমি মরে গিয়েছিলুম সেদিন। তারপর আর ড্রয়িং করতে হাত উঠত না। বন্ধুদের দিয়ে আঁকিয়ে নিতুম।

এতকাল পরে আবার ছবি আঁকতে বসে দেখলুম, ভূত-প্রেত দানব-দত্যিটা হাতে এসে যায়। গাছপালা মানুষ আর আসে না।

ছবি আঁকার চেষ্টাও ছেড়ে দিলুম। তবে হিজিবিজি ছাড়তে পারলাম না। কাগজ-পেনসিল হাতে থাকলেই কিম্ভূতকিমাকার আঁকা বেরিয়ে আসত।

এইভাবে শরৎকাল চলে এল। চলে এল না বলে বলা উচিত শরৎকালের মাঝামাঝি হয়ে গেল। ওখানে অবশ্য ধানের ক্ষেত, পুকুর, শিউলি গাছ নেই যে চট্ করে শরৎকালটা চোখে পড়বে। ধানের

ক্ষেতে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে কেউ ডাকার নেই, পুকুর নেই যে শালুকে শাপলায় পুকুর ভরে উঠবে, আর একটাও শিউলি গাছ নেই যে সন্ধে থেকে ফুলের গন্ধে মন আনচান করবে।

ওসব না থাকলেও, আকাশ আর মেঘ, আর রোদ বলে দিত—শরৎ এসেছে। একটা জায়গায় কিছু কাশফুলও ফুটেছিল।

এই সময় একদিন এক ঘটনা ঘটল।

তখন সন্ধে রাত কি সবেই রাত শুরু হয়েছে, এঞ্জিনের হুইসল শুনতে পেলাম। রাতের দিকে আমাদের ফ্ল্যাগ স্টেশনে ট্রেন আসত না। বারণ ছিল। একদিন শুধু এসেছিল।

কোয়ার্টারে বসে এঞ্জিনের হুইসল শুনে আমি হরিয়াকে বললাম, "তুই কচুর দম বানা; আমি দেখে আসছি।" বলে একটা জামা গায়ে চাপিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। কোয়ার্টার থেকে স্টেশন পঁচিশ-ত্রিশ পা।

বাইরে বেরিয়ে যেন চমক খেলাম। মনে হল, যেন সকাল হয়ে এসেছে। এমন ফরসা! আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি টলটল করছে চাঁদ। এমন মনোহর চাঁদ জীবনে দেখিনি। কী যে সুন্দর কেমন করে বোঝাই। মনে হচ্ছে, রুপোর মস্ত এক ঘড়ার মুখ থেকে কলকল করে চাঁদের আলো গড়িয়ে পড়ছে নীচে। জ্যোৎস্নায় আকাশ-বাতাস-মাটি—সবই যেন মাখামাখি হয়ে রয়েছে। এ-আলোর শেষ নেই, অন্ত নেই রূপের। আকাশের দু-এক টুকরো মেঘও সরে গেছে একপাশে, চাঁদের কাছাকাছি কিছু নেই, শুধু জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়ছে।

স্টেশনে এসে দরজা খুললাম। তার আগেই চোখে পড়েছে, অনেকটা দূরে এক মালগাড়ি দাঁড়িয়ে। এঞ্জিনের মাথার আলো জ্বলছে না। ড্রাইভারের পাশের আলোও নয়।

দরজা খুলে আমাদের লণ্ঠন বার করলাম। লাল-সবুজ লণ্ঠন। লণ্ঠনের মধ্যে ডিবি ভরে দিলাম জ্বালিয়ে।

বাইরে এসে হাত নেড়ে নেড়ে লণ্ঠনের সবুজ আলো দেখাতে লাগলাম। মানে, চলে এসো, স্টেশন ফাঁকা, লাইন ফাঁকা।

ট্রেনটা এগিয়ে এল না।

কিছুক্ষণ পরে দেখি মালগাড়ির দিক থেকে কে আসছে। হাতে আমার মতনই লাল-সবুজ লণ্ঠন। তার হাঁটার সঙ্গে লণ্ঠন দুলছিল।

আমি দাঁড়িয়ে থাকলাম। ব্যাপারটা বুঝতে পারছিলাম না। এরকম ঘটনা আগে কখনও ঘটেনি।

লোকটা কাছাকাছি আসতে চাঁদের আলোয় আমি তার পোশাকটা দেখতে পেলাম। সাদা পোশাক। গার্ড সাহেবের পোশাক।

দেখতে দেখতে গার্ড সাহেব একেবারে কাছে চলে এল। সামনে।

আমি অবাক হয়ে লোকটাকে দেখতে লাগলাম। লম্বা চেহারা, ফরসা, মাথায় কোঁকড়ানো চুল। বাঁ-হাতে এক টিফিন কেরিয়ার।

গার্ড সাহেব কাছে এসে দাঁড়াল। দেখল আমাকে। "তুমি এই ফ্ল্যাগ স্টেশনে আছ?"

"হ্যাঁ স্যার।"

"আমাদের এঞ্জিন বিগড়ে গেছে। মাইল চারেক আগে এঞ্জিনের কী হল কে জানে। থেমে গেল। ড্রাইভাররা চেষ্টা করেও চালাতে পারল না।"

"আচ্ছা!"

"বিকেল থেকে জঙ্গলের মধ্যে পড়ে আছি। কোনো সাহায্য নেই। পাবার আশাও নেই। সন্ধের আগে এঞ্জিন আবার চলতে শুরু করল। ধীরে ধীরে, চাকা ঘষটে। কোনোরকমে এই পর্যন্ত এসেছি। আর এগুনো গেল না।"

আমি বললাম, "তা হলে খবর দিতে হয়, স্যার!"

"হ্যাঁ, মেসেজ দিতে হয়। চলো মেসেজ দাও।"

স্টেশনের ঘরে এসে টরে-টক্কা যন্ত্র নিয়ে বসলাম। খবর দিতে লাগলাম। ভাগ্যিস টরে-টক্কা যন্ত্রটা ছিল। তিন জায়গায় খবর দিয়ে যখন মাথা তুলেছি—দেখি গার্ড সাহেব চেয়ারে বসে বসে ঝিমোচ্ছে।

"দিয়েছ খবর?"

"হ্যাঁ স্যার।"

"এবার তা হলে খাওয়া-দাওয়া যাক। তোমার এখানে নিশ্চয় জল আছে?"

"ওই কলসিতে আছে।"

"ধন্যবাদ।"

গার্ড সাহেব উঠে গিয়ে রেল কোম্পানির মগ আর অ্যালুমিনিয়ামের গ্লাসে করে জল নিয়ে বাইরে গেল।

লোকটা বাঙালি নয়। অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানও নয়। ভাঙা ভাঙা ইংরিজিতে কথা বলছিল। কোথাকার লোক আমি বুঝতে পারছিলাম না। তার হিন্দি বুলিও স্পষ্ট নয়।

হাত-মুখ ধুয়ে এসে লোকটা বলল, "আমি বড় হাংগরি। আমি খাচ্ছি। তুমি কিছু খাবে?"

"না স্যার। আপনি খান।"

"তুমি একটু খেতে পার। আমার যথেষ্ট খাবার আছে।"

"থ্যাংক ইউ স্যার। আমার কোয়ার্টার আছে। আমাদের রান্না হয়ে গেছে। আপনি খান, আপনার খিদে পেয়েছে। আগে যদি বলতেন—আপনাকে আমার কোয়ার্টারে নিয়ে যেতাম। খাবারগুলো গরম করে নিতে পারতেন।"

গার্ড সাহেব আমার দিকে চোখ তুলে কেমন করে যেন হাসল। বলল, "তোমার হাতটা বাড়াবে? বাড়াও না?"

আমি কিছু বুঝতে না পেরে হাত বাড়ালাম।

গার্ড সাহেব টিফিন কেরিয়ার থেকে এক টুকরো মাংস তুলে আমার হাতে ফেলে দিল। হাত আমার পুড়ে গেল যেন। মাটিতে ফেলে দিলাম।

হাসতে লাগল গার্ড সাহেব। হাসতে হাসতে খাওয়াও শুরু করল। আমি কাগজে হাত মুছতে লাগলাম। হাতে না ফোস্কা পড়ে যায় আমার।

খেতে খেতে গার্ড সাহেব বলল, "তোমার নাম কী ছোকরা?"

নাম বললাম।

"এখানে কতদিন আছ?"

"ছ'মাসের কাছাকাছি।"

"ভালো লাগে জায়গাটা?"

"না।"

"তা হলে আছ কেন?"

"কী করব! চাকরি স্যার!"

"চাকরি।" গার্ড সাহেব খেতে লাগল। দেখলাম সাহেব খুবই ক্ষুধার্ত। খেতে খেতে সাহেব বলল, "তোমাদের এখানে আজ কোনো ট্রেন এসেছে?"

"না স্যার। আজ কোনো গাড়ি আসেনি।"

"আমি বুঝতে পারছি না—আমার গাড়িটার কেন এরকম হল? ভালো গাড়ি, ঠিকই রান করছিল। হঠাৎ থেমে গেল কেন?"

"এঞ্জিন ব্রেক ডাউন?"

"কিন্তু কেন?...আমরা যখন ওই ছোট নদীটা পেরোচ্ছি, জাস্ট্ একটা কালভার্টের মতন ব্রিজ, তখন একটা শব্দ শুনলাম। এরোপ্লেন যাবার মতন শব্দ। কিন্তু শব্দটা জোর নয়, ভোমরা উড়ে

বেড়ালে যেমন শব্দ হয় সেইরকম। ব্রেকভ্যান থেকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলাম। আকাশে কিছু দেখতে পেলাম না।"

"নদীর শব্দ—?"

"না না; জলের শব্দ নয়।...আশ্চর্যের ব্যাপার কি জানো, দু-এক ফার্লং আসার পর এঞ্জিন বিগড়ে গেল।"

"হঠাৎ?"

"একেবারে হঠাৎ। আর একটা ব্যাপার দেখলাম। খুব গরম লাগতে লাগল। এই সময়টা গরমের নয়, জায়গাটাও পাহাড়ি। বিকেলও ফুরিয়ে আসছে। হঠাৎ অমন গরম লাগবে কেন? সেই গরম এত বাড়তে লাগল—মনে হল গা-হাত-পা পুড়ে যাবে। ড্রাইভাররা পাগলের মতন করতে লাগল। পুরো গাড়িটাও যেন আগুন হয়ে উঠল।"

অবাক হয়ে বললাম, "বলেন কি স্যার?"

"ঘণ্টাখানেক এই অবস্থায় কাটল। আমরা সবাই নীচে নেমে দাঁড়িয়ে থাকলাম।"

"তারপর?"

"তারপর গরম কমতে লাগল। কমতে কমতে প্রায় যখন স্বাভাবিক তখন দেখি এঞ্জিনটাও কোনোরকমে চলতে শুরু করেছে।"

"এ তো বড় অদ্ভুত ঘটনা।"

"খুবই অদ্ভুত।...আরও অদ্ভুত কী জানো! আমরা গাড়ি নিয়ে খানিকটা এগুবার পর কোথা থেকে মাছির ঝাঁক নামতে লাগল।"

"মাছির ঝাঁক?" আমার গলা দিয়ে অদ্ভুত শব্দ বেরুল।

"ও! সেই ঝাঁকের কথা বলো না। পঙ্গপাল নামা দেখেছ? তার চেয়েও বেশি। চারদিকে শুধু মাছি আর মাছি। আমাদের গাড়িও ছুটতে পারছিল না যে মাছির ঝাঁক পেছনে ফেলে পালিয়ে আসব। অনেক কষ্টে তাদের হাত থেকে রেহাই পেয়েছি। আমি তো ব্রেক-ভ্যানের জানলা-টানলা বন্ধ করে বসেছিলাম। ড্রাইভাররা মরেছে। জানি না, মাছিগুলো এঞ্জিনের কিছু গোলমাল করে দিয়ে গেল কিনা! তবে, আগেও তো এঞ্জিন খারাপ হয়েছিল।"

আমি চুপ। অনেকক্ষণ পরে বললাম, "এরকম কথা আমি আগে শুনিনি, স্যার।"

"আমারও ধারণা ছিল না।"

গার্ড সাহেবের খাওয়া শেষ। জল খেল। হাত ধুয়ে এল বাইরে থেকে।

"তুমি জানো, এখানের ক্যাম্পে কী হয়?" গার্ড সাহেব জিগ্যেস করল।

"না, স্যার। শুনি মালগাড়ি ভর্তি করে গুলিগোলা আসে।"

"ননসেন্স।...এখানে প্রিজনারস অফ্ ওয়ার রাখা হয়। যুদ্ধবন্দী। ক্যাম্প আছে। বিশাল ক্যাম্প।"

আমার মনে পড়ল প্যাসেঞ্জার ট্রেনের কথা। জানলায় জাল, ধোঁয়াটে কাচ। বললাম, "এখন বুঝতে পারছি, স্যার।"

"তাছাড়া, হাত-পা কাটা, উন্ডেড্ সোলজারদের চিকিৎসাও করা হয়। মরে গেলে গোর দেওয়া হয়। জান তুমি?"

চমকে উঠে বললাম, "আমি কিছুই জানি না। মালগাড়ি দেখে ভাবতাম..."

"মালগাড়িতে হাজাররকম জিনিস আসে। খাবার-দাবার, বিছানা, ওষুধপত্র, ক্যাম্পের নানান জিনিস।" টিফিন কেরিয়ার গোছানো হয়ে গিয়েছিল গার্ড সাহেবের। একটা সিগারেট ধরাল। আমাকেও দিল একটা। বলল, "থ্যাংক ইউ বাবু।...আমি আমার গাড়িতে ফিরে চললাম। ড্রাইভাররা কী অবস্থায় আছে দেখি গে।...কিন্তু তোমায় সাবধান করে দিয়ে যাচ্ছি, বাবু। বি কেয়ারফুল।...আমার মনে হচ্ছে, এদিকে কিছু একটা হয়েছে। কী হয়েছে—আমি বলতে পারব না। সামথিং পিকিউলিয়ার। ম্যাগনেটিক্

ডিস্টারবেন্স, না কেউ এসে নতুন ধরনের বোমা ফেলে গেল—কে জানে! আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। অত মাছি...হাজার হাজার...লাখ লাখ...।”

গার্ড সাহেব চলে গেল।

স্টেশন ঘরের দরজা বন্ধ করে আমি কোয়ার্টারের দিকে আসছিলাম। দূরে গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে। জ্যোৎস্নার আলোয় ধবধব করছে সব। হঠাৎ চোখে পড়ল, মালগাড়িটা কিসে যেন ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। তারপর দেখি মাছি। মাছির বন্যা আসছে যেন। দেখতে দেখতে আমার কাছে এসে পড়ল। বৃষ্টি পড়ার মতন মাছি পড়ছিল। ভয়ে ঘেন্নায় আমি ছুটতে শুরু করলাম।

ছুটতে ছুটতে এসে নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলাম। মরে যাবার অবস্থা।

ঘুম ভাঙল পরের দিন। হরিয়া ডাকছিল।

দরজা খুলে বাইরে আসতেই হরিয়া বলল, “বাবু, জলদি...গাড়ি আয়া।”

স্টেশনে গিয়ে দেখি একটা প্যাসেঞ্জার ট্রেন। সেই জানলায় জাল লাগানো, ধূসর কাচের আড়াল দেওয়া। ওষুধের গন্ধ ছড়াচ্ছে প্ল্যাটফর্মে।

গার্ড সাহেব কাগজ সই করাতে এগিয়ে এল।

তাকিয়ে দেখি, গতকালের সেই গার্ড সাহেব নয়, নতুন মানুষ। কিছু বলতে যাচ্ছিলাম আমি; গার্ড সাহেব এমন চোখ করে তাকাল—যেন আমাকে ধমক দিল। কথা বলতে বারণ করল। আমি চুপ করে গেলাম।

কাগজ সই করে ফেরত দিলাম গার্ডকে। কিন্তু বুঝতে পারলাম না, গতকালের মালগাড়ি, গার্ড সাহেব আর অত মাছি কোথায় গেল!

আশ্বিন ১৩৯৩

শিবেনবাবু ভালো আছেন তো!

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

হরসুন্দরবাবু একটু নাদুসনুদুস, ধীর-স্থির-শান্ত প্রকৃতির মানুষ। তিনি কোঁচা দুলিয়ে ধুতি পরেন, ফুলহাতা জামার গলা অবধি বোতাম আঁটেন, কখনও হাতা গোটান না। শীত-গ্রীষ্ম সব সময়ে তিনি হাঁটু অবধি মোজা আর পাম্পশু পরেন। তাঁর বেশ মোটা এক জোড়া গোঁফ আছে। চুলে পরিপাটি সিঁথি। হরসুন্দরবাবু খুব নিরীহ মানুষও বটে।

সেদিন মাসের পয়লা তারিখ। হরসুন্দরবাবু সেদিন বেতন পেয়েছেন। সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরছেন। যে গলিটায় তিনি থাকেন সেটা বেশ অন্ধকার, পাড়াটাও ভালো নয়। হরসুন্দরবাবু গলিতে ঢুকে কয়েক পা এগোতেই তিনটে ছোকরা তাঁকে ঘিরে ফেলল। একজন বুকে রিভলভার ঠেকাল, একজন পেটে আর অন্যজন পিঠে দুটো ছোরা ধরল। রিভলভারওলা বলল, চেঁচাবেন না। যা আছে দিয়ে দিন।

হরসুন্দরবাবু খুবই ভয় পেলেন। ভয়ে তাঁর গলা কাঁপতে লাগল। বললেন, প্রাণে মেরো না ভাই। দিচ্ছি।

মাইনের পুরো টাকাটা নিয়ে তিনজন হাপিস হয়ে গেল। হরসুন্দরবাবু ভয়ে চেঁচামেচি করলেন না। যদি তারা ফিরে আসে! বাড়িতে ফিরেও কারও কাছে ঘটনাটা প্রকাশ করলেন না। ভাবলেন, এ মাসটা ধারকর্জ করে চালিয়ে নিলেই হবে।

তা নিলেনও হরসুন্দরবাবু। একটা মাস দেখতে দেখতে চলে গেল। আবার পয়লা তারিখ এল। হরসুন্দরবাবু আবার বেতন পেলেন।

ফেরার সময় যখন গলির মধ্যে ঢুকলেন তখন আচমকা ফের তিনটে লোক ঘিরে ধরল। বুকে রিভলভার, পেটে-পিঠে ছোরা।

রিভলভারওলা বলল, যা আছে দিয়ে দিন। চেঁচাবেন না।

হরসুন্দরবাবু ফের ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, প্রাণে মেরো না ভাই। দিচ্ছি।

মাইনের টাকা নিয়ে লোক তিনটে হাপিস হয়ে গেল।

হরসুন্দরবাবু এবারও বাড়ি ফিরে কাউকে কিছু বললেন না। ভাবলেন, এ মাসটাও কোনওরকমে চালিয়ে নেবেন।

কষ্ট হল যদিও, কিন্তু হরসুন্দরবাবু চালিয়েও নিলেন। ফের পয়লা তারিখ এল। হরসুন্দরবাবু বেতন পেলেন।

বাড়ি ফেরার সময় অন্ধকার গলিতে ঠিক আগের মতোই তিনটে লোক ঘিরে ধরল তাঁকে। বুকে, পিঠে, পেটে ঠিক একই জায়গায় রিভলভার আর ছোরা ধরল। একই কথা বলল এবং বেতনের টাকাটা নিয়ে হাওয়া হল।

হরসুন্দরবাবুর আজ চোখে জল এল।

বাড়ি ফিরে তিনি গুম হয়ে রইলেন। রাতে ভালো করে খেলেন না। গভীর রাতে তিনি ছাদে উঠে চুপ করে আকাশের দিকে চেয়ে অসহায়ভাবে ভাবলেন, কী যে করব বুঝতে পারছি না।

কাছেপিঠে কে যেন একটা হাই তুলল, তারপর আঙুল মটকানোর শব্দ হল, তারপর বলল, "হরি, হরি"। হরসুন্দরবাবু চারদিকটা চেয়ে দেখলেন। ছাদ জনশূন্য, শীতকালের গভীর রাতে ছাদে আসবেই বা কে?

তিনি কাঁপা গলায় জিগ্যেস করলেন, আপনি কে?

ভেবে দেখতে হবে হে, ভেবে দেখতে হবে।

তার মানে?

কতবার জন্মেছি তার কি হিসেব আছে? কোন জন্মে কে ছিলুম তা যে গুবলেট হয়ে যায় বাপ। এ জন্মে বিশু তো ও জন্মে নিতাই, পরের জন্মে হয়তো চীনেম্যান চাঁই চুঁই।

আ-আপনি কোথায়? দে-দেখতে পাচ্ছি না তো!

গলার স্বরটা খিঁচিয়ে উঠে বলল, দেখার চোখ আছে কি তোমার যে দেখবে? সারাদিনই তো তোমার ধারে-কাছে ঘুরঘুর করি, দেখতে চেয়েছ কি কখনও?

আজ্ঞে, আমি যে কিছু বুঝতে পারছি না। ভয় পাচ্ছি, মাথা ঝিমঝিম করছে।

আ মোলো! এ যে ভালো করতে এসে বিপদ হল।

আ-আপনি কি চান?

তোমার মতো গবেটদের কান দুটো মলে দিতেই চাই হে। কিন্তু বিধি বাম, সে উপায় নেই।

আমি কী করেছি? আপনি আমার ওপর রাগ করছেন কেন?

রাগ করব না? তিনটে কাঁচা মাথার ছোঁড়া তিন তিনবার যে তোমাকে বোকা বানাল তা থেকে শিক্ষা পেয়েছ কি? কিছু করতে পারলে?

আজ্ঞে কী করব? তাদের হাতে যে ছোরা আর বন্দুক।

আর তোমার বুঝি কিছু নেই?

আজ্ঞে না।

কে বলল নেই?

ইয়ে, আমার বন্দুক, পিস্তল বা ছোরাছুরি নেই। তবে আমার গিন্নির একখানা বঁটি আছে, আর আমার ছেলে ভুতোর একটা পেন্সিল কাটা ছুরি আছে, আর আমার মায়ের বেড়াল তাড়ানোর জন্য একখানা ছোট লাঠি আছে।

আহা, ওসব জানতে চাইছে কে? বঁটি-লাঠির কথা জিগ্যেস করেছি কি তোমায়? বলি এসব ছাড়া তোমার আর কিছু নেই?

আজ্ঞে, মনে পড়ছে না। শুনেছি আমার ঠাকুর্দার একটা গাদা বন্দুক ছিল।

গবেট আর কাকে বলে? বলি বন্দুক-টন্দুক ছাড়া আর কিছু নেই তোমার?

আজ্ঞে না।

বলি, বুদ্ধি বলে একটা বস্তু আছে জানো তো!

জানি।

তোমার সেটাও নেই?

আজ্ঞে, ঠিক বুঝতে পারছি না।

একটা দীর্ঘশ্বাসের আওয়াজ হল। তারপর গলার স্বরটা বলল, শোনো, এবার যখন ওই মর্কটগুলো তোমাকে পাকড়াও করবে তখন একটুও ঘাবড়াবে না। হাসি-হাসি মুখ করে শুধু জিগ্যেস করবে, আচ্ছা, শিবেনবাবু ভালো আছেন তো!

শুধু এই কথা বললেই হবে?

বলেই দেখ না।

তৃতীয় মাসটাও কষ্টেসৃষ্টে কেটে গেল। আবার পয়লা তারিখ এল এবং হরসুন্দরবাবু আবার বেতন পেলেন।

বাড়ি ফেরার সময় বুকটা দুরুদুরু করছিল। যে-কথাটা বলতে হবে তা বারবার বিড়বিড় করে আওড়াচ্ছেন। হাত-পা কাঁপছে, গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। গলির মুখে এসে একটু থমকে দাঁড়ালেন। তারপর দুর্গা বলে অন্ধকারে পা বাড়ালেন।

কয়েক পা যেতে না যেতেই তিন মূর্তি ঘিরে ফেলল তাঁকে। বুকে পিস্তল, পেটে আর পিঠে ছোরা।

পিস্তলওলা বলল, চেঁচাবেন না। যা আছে দিয়ে দিন।

জীবনে কোনও সাহসের কাজ করেননি হরসুন্দরবাবু। আজই প্রথম করলেন। জোর করে মুখে একটু হাসি ফুটিয়ে তিনি জিগ্যেস করলেন, আচ্ছা, শিবেনবাবু ভালো আছেন তো?

ছেলে তিনটে হঠাৎ যেন থমকে গেল। আর তারপরেই দুড়দাড় দৌড়ে এমনভাবে পালাল যেন ভূত দেখেছে।

হরসুন্দরবাবু খুবই অবাক হয়ে গেলেন। এই সামান্য কথায় এত ভয় পাওয়ার কী আছে? যাক গে, এবার মাইনের টাকাটা তো বেঁচে গেল!

না, এরপর থেকে হরসুন্দরবাবুকে আর ওদের পাল্লায় পড়তে হয়নি বটে, কিন্তু তাঁর ধাঁধাটা গেল না। এই তো সেদিন তাঁর অফিসের বড়বাবু তাঁকে কাজের একটা ভুলের জন্য খুব বকাঝকা করে চার্জশিট দেন আর কি। হরসুন্দরবাবু শুধু হাসি-হাসি মুখ করে তাঁকে বলেছিলেন, আচ্ছা, শিবেনবাবু ভালো আছেন তো! তাইতে বড়বাবু এমন ঘাবড়ে গেলেন যে আর বলার নয়। তারপর থেকে খুবই ভালো ব্যবহার করে যাচ্ছেন।

সেদিন বাজার থেকে পচা মাছ এনেছিলেন বলে হরসুন্দরের গিন্নি তাঁকে খুবই তুলোধোনা করছিলেন। হরসুন্দরবাবু তাঁকেও বললেন, আচ্ছা, শিবেনবাবু ভালো আছেন তো! গিন্নি একেবারে জল।

হ্যাঁ, এখন হরসুন্দরবাবু খুবই ভালো আছেন। কোনও উদ্বেগ, অশান্তি নেই। বিপদ দেখা দিলেই তিনি শুধু বলেন, আচ্ছা, শিবেনবাবু ভালো আছেন তো! মন্ত্রের মতো কাজ হয়।

আশ্বিন ১৪০৪

রতনদিয়ার ভূত

হিমানীশ গোস্বামী

এই ঘটনাটা ষাট বছরেরও আগে ঘটেছিল—এখন এর অনেকটাই ভুলে গেছি। যেটুকু মনে আছে বলছি।

আমরা যখন গ্রামে থাকতাম তখন আমাদের রাজ্যটি এত ছোট ছিল না। এখন থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে দেশভাগের সঙ্গে সঙ্গে এক বাংলা দুটি বাংলা হয়ে যায়। আমাদের বাড়ি ছিল পূর্ববঙ্গের একটি ছোট গ্রামে। গ্রাম ছোট হলে হবে কি তখন ছোট ছোট গ্রামেই হাজারে হাজারে ভূত বাস করত।

আমাদের গ্রামের নাম ছিল রতনদিয়া। ঐ গ্রামে ভূতদের দমিয়ে রাখার জন্য অন্তত বারোজন গুণিন ছিলেন। ফলে ভূত প্রচুর থাকলেও তারা অত্যাচার করতে ভয় পেত। গুণিনরা দুষ্টু আর বদমাইশ ভূতদের কঠোর শাস্তি দিতেন—কোনও কোনও গুণিন ভূতদের ঝি-চাকর-দারোয়ান করে রাখতেন। খুব লজ্জার কথা হলেও দু'একজন গুণিন পেত্নিদের দিয়ে ঘরবাড়ি পরিষ্কার করানোর কাজ করাতেন। এছাড়া রান্নার কাজও করিয়ে নিতেন। এটা গুণিনদের করার কথা নয়। যাই হোক এক একজন ছোট গুণিন যোলটা করে ভূত-পেত্নিকে বেগার খাটাতে পারতেন। আরও বড় বড় গুণিনরা কেউ বত্রিশ কেউ চৌষট্টিটা করে ভূত রাখতেন বেগার খাটানোর জন্য। হিন্দু-মুসলমান দু'রকম ভূতই গ্রামের বাইরে একটা পোড়ো বাড়ির দখল নিয়ে থাকত। শোনা যায় এই ভূতদের মধ্যে দুজন খ্রিস্টান সাহেব ডাক্তার ভূতও ছিল! মোটামুটি ব্যাপারটা এই যে ভূত বেশি থাকলেও গুণিনদের ভয়ে তারা সভ্যভব্য হয়েই থাকত। আমরাও নিশ্চিন্ত মনে গ্রামে থাকতাম। প্রচুর ভূত আশেপাশে থাকলেও আমরা ভয়ংকর ভূতদের পাল্লায় কখনও পড়িনি।

ভয়টা কিন্তু ছিলই। তাছাড়া সব ভূত সব সময়েই যে শান্তশিষ্ট হয়ে থাকত তাও নয়। আমাদের গ্রামের এক জামাইকে পইপই করে বলা হয়েছিল সে যেন কক্ষনো রাতের গাড়িতে গ্রামে না আসে। সে জামাই ছিল বেপরোয়া, নাম শ্রীকান্ত চাটুজ্জে, বয়স পঁচিশ, বিজ্ঞান পড়ে পড়ে তার ধারণা হয়েছে ভূত মানুষের মনের সৃষ্টি, ভূত বলে কিছু নেই। তা যেহেতু তাকে বারণ করা হয়েছে রাতের ট্রেনে গ্রামে না আসতে, আসলেও যেন আগে সে খবর দেয় সেই জন্যই শ্রীকান্ত খবর না দিয়ে রাতের ট্রেনেই কলকাতা থেকে কালুখালি রেল স্টেশনে নেমে বেশি সাহস দেখানোর জন্য একাই ছোট সুটকেস একটা ঘাড়ে করে টর্চ জ্বালাতে জ্বালাতে গ্রামের পথ ধরে শ্বশুরবাড়ি চন্দনা নদীর ধারে রামহরি মুখুজ্জের বাড়িতে যাচ্ছিল। রাতটা ছিল আবার অমাবস্যা। অমাবস্যার রাতে ভূতেদের মন কি রকম যেন চনমনে হয়ে যায়। তখন তাদের কালো রক্তে ইয়ার্কি-ফাজলামো করার একটা প্রবণতা হয়। এমনিতে ভালোমানুষ ভূত অমাবস্যার রাত্রে হঠাৎ হয়তো হেসে উঠল খ্যাঁ খ্যাঁ করে। সম্পূর্ণ অকারণ হাসি। কোনও দরকার নেই তবু হাসি! অথবা ইনিয়ে-বিনিয়ে কান্না—যেন কেউ ভীষণ মেরেছে কাউকে। কখনও কুকুরের ডাক, কখনও শেয়ালের ডাক, কখনও ফেউয়ের ডাক। তাছাড়া খটাস বলে একরকম বেড়াল জাতের প্রাণী ছিল, ভীষণ হিংস্র, আর ছিল বাঘডাঁশা! বাঘডাঁশাও এক ধরনের বুনো বেড়াল, অনেকটা বাঘের মতো দেখতে—ভূতেরা বাঘডাঁশার ডাকও ভারী চমৎকার নকল করতে পারত। এ হচ্ছে ভূতদের একরকমের ইয়ার্কি। ডাকলে ভীতু মানুষেরা ভয় পায়, সাহসী মানুষরাও চমকে ওঠে, ছোটরা কেঁদে বাড়ি মাথায় করে, এতেই ভূতেদের আনন্দ! কোনও কোনও বাচ্চা ভয়ে না চেঁচিয়ে চুপ মেরে যায়, তাতে ভূতেরা ভারী রাগ করে। ঐ সব বাড়িতে ভূতেরা ঢিল ছোঁড়ে!

ঢিল ছুঁড়লে আর সেই সঙ্গে হাঁউ মাঁউ খাঁউ করলে যে-সব বাচ্চা ফুঁপিয়ে কাঁদে তারা পর্যন্ত গাঁ গাঁ করে চিৎকার করে। অন্য সব রাত্রে ভূতেরা গুণিনদের ভয়ে বিশেষ গোলমাল করে না, কিন্তু অমাবস্যার রাতগুলোতে ভূতদের আড্ডা ইয়ার্কির খানিকটা অনুমতি দেওয়া হয়। এটা ভূতদের অভিভাবক যাঁরা, যেমন ব্রহ্মদৈত্য এবং বড় বংশের ভূত-পেত্নি এঁরাও মেনে চলেন। ফলে বিচ্ছিরি রকম কাণ্ড বিশেষ ঘটে না।

যেদিনকার কথা বলছি সে দিনটা ছিল অন্যরকম। দিন না বলে রাত্তির বলাই ভালো। দিনের বেলা ভূতেরা ঘুমোয়, আবার কেউ কেউ দিনের বেলায় মানুষ সেজে গেরস্ত বাড়িতে কাজকর্ম করে কিছু উপরি রোজগারও করত বলে আমি শুনেছি। যাই হোক আমি যা বলছি সে সব সত্যিই আমাদের গ্রামেই ঘটেছিল, তবে আমি নিজের চোখে কিছুই দেখতে পাইনি। যখন ব্যাপারটা ঘটেছিল তখন আমি এমন ঘুমে অচেতন হয়ে ছিলাম যে কিছুই বুঝতে পারিনি। পরে সব শুনেছি। রাত্রেও অনেক নাকি হৈচৈ গোলমাল হয়েছিল, কিছু গোলমাল করেছিল ভূতে, কিছু আবার মানুষে! একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছি যে রাতের কথা বলছি সেটা ছিল একটা বিশেষ রাত। ঐ রাতের তিনদিন আগে থেকেই গ্রামের যত গুণিন ছিলেন তাঁরা চার-পাঁচ দিনের জন্য সারা বাংলা গুণিন সমাবেশে চলে যাচ্ছিলেন কলকাতার কাছেই উত্তরপাড়ায়। আমাদের গ্রামে সেই বিশেষ রাতটিতে তাই ভূতেদের ছিল মহা আনন্দের দিন। বড় বড় অভিভাবক শ্রেণির ভূত, ব্রহ্মদৈত্য এমনকি মামদোরা পর্যন্ত ভূতদের ইয়ার্কি-ফাজলামো একদম পছন্দ করেন না, তাই তাঁরাও খুব উদ্বিগ্ন এই রাতে কি হয় ভেবে। তাঁরা সব যে-যার নিজেদের বাড়ির ভূত ছানাদের আর যুবক ভূতদের সাবধানও করে দিয়েছিলেন যেন সবাই শান্তশিষ্ট থাকে, বেশি ঝামেলা না করে। বিশেষ করে যে-সব ভূত গুণিনদের বেগার খাটে, তাদের মেজাজ এমন তিরিক্ষে যে তাদের সঙ্গে ভদ্রভাবে কথা বলাও সম্ভব নয়। ইয়ার্কি-ফাজলামোয় তারাই ছিল সবিশেষ পটু।

।।২।।

যেদিনকার কথা বলছি, সেদিন বড় ভূতেরাও একটা মেলায় গিয়েছিলেন, ফলে ছোট ভূতদের সেদিন হয়েছিল ডবল মজা।

সন্ধের ট্রেনে গ্রামের শেষ গুণিন গ্রাম ছেড়ে চলে গেলেন শেয়ালদার গাড়িতে চড়ে উত্তরপাড়ার পথে, আর বেগার-খাটা ভূতের দল যেন একেবারে খেপে গেল। তারা সন্ধে থেকেই শুরু করল তাদের নানারকম তাণ্ডব। তারা হা হা হাঁ হাঁ করে কতরকম হাসল আর চিৎকার করল, বাড়িতে বাড়িতে ঢিল ছুঁড়ল—কিন্তু গ্রামের লোকেরাও খুব সাবধান হয়ে রইল। একটুও ভয় না পেয়ে তারা গুণিনদের দেওয়া নতুন পান পাতা তাতে রক্তচন্দনে রাম রাম লেখা, সঙ্গে ঘি মাখানো সলতে দিয়ে বাড়ির চারদিকে সাজিয়ে রেখেছিল বলে ভূতেরা কেউ বাড়িতে ঢুকতে পারল না। ভূতেরা এইসব দেখে রাগে গাঁ গাঁ করতে লাগল, বিচ্ছিরি রকম সব গালাগাল করতে লাগল মানুষের মতো গলায়, চন্দ্রবিন্দু ছাড়া উচ্চারণ করতে লাগল যাতে মানুষেরা রেগে গিয়ে বাড়ির সীমানার বাইরে চলে আসে, তাহলে ভারী ফুর্তি করা যায় তাদের নিয়ে। কিন্তু গুণিনরা সব কথা আগেই গ্রামের সকলকে বলে যাওয়ায় একটা মানুষও বাইরে বেরল না। এতে কার না রাগ হয়! ভূত বলে কি ওদের অনুভূতি নেই? ওদের মধ্যে যারা অণুভূত তারা গেল সবচেয়ে চটে! অণুভূত কি বুঝতে পারলে? একটু ভাবলেই বুঝতে পারবে অণুভূত অর্থাৎ ছোট ভূত। অণু মানে ছোট। কেউ কেউ অবশ্য উপভূতও বলেন ওদের।

রাত্তির তখন একটা হয়ে গেছে অথচ একটা মানুষ হাতের কাছে পাওয়া যাচ্ছে না, এটা তাদের কাছে খুব দুঃখের ব্যাপার বলে মনে হল। তারা মনের দুঃখে রাস্তার উপর নর্দমা থেকে গাদা গাদা কাদা নিয়ে এসে ছুঁড়তে লাগল এদিকে-ওদিকে, এর বাড়ি তার বাড়ি। লোকেরা ভয়ে দরজা-জানলা বন্ধ করে রইল। ভূতেরা দারুণ চিৎকার করে গান গাইতে লাগল—

একবার বেরিয়ে আয় না বাবুরা তোদের খাই
বিবিরা আয় না বাইরে আমরা তোদের ভাই।।

সকলে ভয়ে দরজা-জানালা আর খোলে না, গরমে অস্থির হয়। ছোটরা ভয় পেয়ে কেঁদে ওঠে, আর তাই শুনে ভূতদের বাঁদরামি আরও বাড়তে থাকে। কিন্তু ওদের তাতে সুখ নেই। মানুষদের ধরে নানারকম বীভৎস কাণ্ডকারখানা না করলে অণুভূত, মানে ছোট ভূতদের ফুর্তি ঠিক জমে না। তা তারা আস্ত মানুষ হাতে না পেয়ে বড়ই কষ্টে ছিল, এমন সময় রাতের ট্রেনটা কালুখালি স্টেশনে এসে থামল আর জনা বারো লোক ট্রেন থেকে নেমে যে যার বাড়ির দিকে চলল। ভূতের দল লক্ষ করল ওদের মধ্যে সকলেই চেনা লোক, অনেকেই ভূতেদের কেউ কাকু, কেউ বা পিসেমশাই। ওদের ভয় দেখিয়েও অত সুখ নেই। একজন অপরিচিত লোক পেলে তাদের সবচেয়ে ভালো লাগে। এমন সময় দেখা গেল শ্রীকান্ত চাটুজ্জে হাতে সুটকেস—কখনো কাঁধে তুলে নিচ্ছে, অন্য হাতে টর্চ জ্বেলে দিব্যি হনহনিয়ে আসছে!

হঠাৎ দেখা গেল শ্রীকান্ত চাটুজ্জের হাতের টর্চটা তিড়িং করে লাফিয়ে উঠল অন্তত দশ মিটার। আবার টর্চটা বাঁই করে বেঁকে গিয়ে রাস্তার ধারের একটা তালগাছে ক্রমাগত পাক খেতে লাগল। এই অসম্ভব কাণ্ড এত অকস্মাৎ ঘটে গেল যে শ্রীকান্ত প্রথমে হতভম্ব হয়ে গেল! তারপর মনটাকে একটু সুস্থির করার চেষ্টা করল। মনে মনে ভাবল এর নিশ্চয় একটা সঙ্গত কারণ আছে। জগতে তো অসম্ভব কত কাণ্ডই ঘটে, কিন্তু সেগুলোর কোনো না কোনো ব্যাখ্যা আছে। বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা। যেখানে চট করে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না সেখানে আরও ভালো করে দেখতে হয়। অলৌকিক বলে তো কিছু হয় না। যা হয় তা আপাতদৃষ্টিতে যতই আজগুবি এবং অস্বাভাবিক মনে হোক না কেন কোনোটাই অলৌকিক নন। ভাবতে ভাবতে টর্চটা উঠে গেল তালগাছটার মাথায়, সেখানে কিছুক্ষণ ঘুরপাক খেয়ে শোঁ করে নীচে নেমে এসে রাস্তার উপর ধেই ধেই নাচতে লাগল।

নাঃ, এর তো কোনও মাথামুন্ডু বোঝা যাচ্ছে না। শ্রীকান্ত চাটুজ্জের মনটা দুর্বল হতে শুরু করেছে। হঠাৎ তার কানের কাছে স্পষ্ট একটা খোনা খোনা কণ্ঠস্বর শুনতে পেল—

ওঁরে শ্রীকান্ত এঁই ভঁবে
কঁত অন্ধঁকার সেঁ কেঁ কঁবে
জঁমাট কাঁলোর রাঁজ্যে আঁমরা
তুঁলে নেঁব তোঁর গাঁয়ের চাঁমড়া!!

তারপর খিঁ খিঁ করা হাসি। সে হাসি শুনলে হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া প্রায় বন্ধ হয়ে যাবার জোগাড়! শ্রীকান্ত কিন্তু সামলে নিল। কিন্তু তারপর ফের শুরু হল আর এক বিচ্ছিরি করাতচেরা কণ্ঠের গান—

শ্বঁশুরবাঁড়িতে তুঁই এঁসেছিস রেঁ চাঁটুজ্জে শ্রীকান্ত
জাঁমাই আঁদরে রাঁখব তোঁকে এঁকখান গাঁন গাঁন তো!

শ্রীকান্ত নিজেও মাঝে মাঝে কবিতা লিখে থাকে, সে দেখল একবার বলছে 'তুঁই এঁসেছিস' আবার বলছে 'গাঁন তোঁ'! এর সংশোধন দরকার। শ্রীকান্ত নিজে এই অদ্ভুত অবস্থাতেও মাথা ঠান্ডা রেখে গাইল—

ওরে তোরা সব অশিক্ষিত, নেই কো তোদের শিক্ষা
গান বানানো নয়কো সহজ নিতে হবে যে রে দীক্ষা!

এবারে কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। খানিকক্ষণ সব চুপ। এদিকে ঝিঁঝির দল ডাকছে, দূরে ব্যাঙেরাও ঘ্যাঁ ঘ্যাঁ করছে। প্যাঁচারাও সুযোগ বুঝে বেশ মজাসে গান গাইছে। সে কি গান—কানের পোকারাও পর্যন্ত কান থেকে বেরিয়ে এসে কাঁধের উপর বসে নাচতে শুরু করেছে! এ তো এক মহা মুশকিল হল!

শ্রীকান্ত কিন্তু ভয় পেল না। সে দৃঢ়ভাবে নিজের মনকে শক্ত করে রাখল। কিন্তু একটু পরেই ভূতেদের দল ওর হাত থেকে ছোট সুটকেসটা নিয়ে তার ডালাটা খুলে ফেলল! অন্ধকারেও শ্রীকান্ত

বুঝতে পারল সুটকেস খুলে তছনছ করছে কারা! সে এও বুঝতে পারল তার শ্বশুরবাড়ির জন্য অনেক কষ্টে সংগ্রহ করা বিখ্যাত এক মিষ্টিওলার কাছ থেকে আনা কড়াপাকের সন্দেশগুলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। তার জামা-টামা টুথপেস্ট টুথব্রাশ দাড়ি কামানোর সরঞ্জাম তোয়ালে এসবও সব ছত্রখান হয়ে গেল। শ্রীকান্ত ভাবল এমন তো হওয়ার কথা নয়, সে নিশ্চয় স্বপ্ন দেখছে। স্বপ্নে তো কত রকম বিদকুটে জিনিস দেখা যায়, এ বোধহয় সেই রকম একটা কিছু হবে। কিন্তু সবটা স্বপ্ন নয়। সে বেশ বুঝতে পারল কিছু একটা ব্যাপার ঘটছে যা স্বাভাবিক নয়।

এরপরে চারদিকে কচমচ খচমচ আওয়াজ হতে লাগল। সর্বনাশ! মনে হল যেন কড়াপাকের সন্দেশগুলো কেউ কচর-মচর করে খাচ্ছে। এদিকে তার টর্চটা যেটা এতক্ষণ এদিক-ওদিক ঘুরছিল সেটাও স্থির হয়ে পড়ে আছে রাস্তায়। সে আলোতে কতই বা দেখা যায় কিন্তু তবু ঐটুকু আলোতেই সে দেখল তার সুটকেস খোলা, আর তার সব জিনিস কোথায় যে সব হাওয়া হয়ে গেছে!

তার কান্না পেতে লাগল। সে ভয়ংকরভাবে চিৎকার করে উঠল, ডাকাত ডাকাত! কিন্তু তার চিৎকার করাই সার হল। কে আসবে তাকে সাহায্য করতে? রতনদিয়া গ্রাম তখন চ্যাংড়া ভূতেদের কব্জায়। ভূতেদের তখন সন্দেশ খাওয়া শেষ হয়ে গেছে। তারা বলল—

ডঁাকাত তুই কাঁকে বঁলছিস ধূঁর্ত?
মঁজাটা দেঁখবি হঁয়ে উঁঠি যঁদি মূঁর্ত।
এঁলি কেঁথা থেঁকে কোঁন দেঁশ থেঁকে কোঁন দেঁশে
খুঁশি হঁনু মোঁরা তোঁর আঁনা কঁড়াপাঁক সঁন্দেশে।
মাঁরিব নাঁ তোঁরে ধঁরিব নাঁ তোঁরে কেঁবল তুঁলিব শূঁন্যে
ধঁপাস কঁরিয়া ফেঁলিব মাঁটিতে মঁরিবি বাঁপের পুঁণ্যে!

ওরে বাবা! এ যে সত্যি তাকে কারা যেন ধরে শূন্যে লোফালুফি খেলতে লাগল। সে একবার কাদের ঠান্ডা হাতে পড়ে যায়, আবার অন্য কারা ঠান্ডা হাতে লুফে নেয়। এ তো সাংঘাতিক খেলা এদের। ভূত তা হলে সত্যি আছে—সত্যি আছে! সে ভয়ে চিৎকার করতে লাগল আর বলতে লাগল, বাঁচাও বাঁচাও! ওরে বাবারে মরে গেলাম রে, মেরে ফেলল রে, বাঁচাও বাঁচাও!

এইরকম কতক্ষণ চলল সে শ্রীকান্তের খেয়াল নেই। হঠাৎ একসময় তার মনে হল ভূতেদের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য দেখা দিল। তারা তাকে প্রায় আকাশসমান উঁচু থেকে ছেড়ে দিল, আর শ্রীকান্ত মাটিতে পড়তে লাগল। এবার আর রক্ষা নেই। শ্রীকান্ত এত বিপদেও রামনাম করেনি। করলেও কী হত কে জানে, আজকালকার ছোকরা ভূতেরা রামনামের তোয়াক্কা করে না।

শ্রীকান্ত পড়তে লাগল—এর মধ্যে সে শুনতে পেল ইংরিজিতে কারা সব কথা বলছে। তাদেরও নাকি-সুর! বুঝতে না বুঝতে সে মাটির উপর আছড়ে পড়ল। সে বুঝতে পারল তার হাড়টাড় সব ভেঙে গেল। পরে তার আর জ্ঞানই রইল না।

একটু একটু জ্ঞান হলে সে দেখতে পেল সে একটা চমৎকার ঘরে শুয়ে আছে। আশেপাশে অনেকগুলো খাট। প্রত্যেক খাটের উপর গদির বিছানা। শ্রীকান্ত বুঝল সে কোনো হাসপাতালে শুয়ে আছে। ভালো হাসপাতাল। শ্রীকান্ত এ-রকম হাসপাতাল দেখেছে। সে দেখতে পেল সাদা রঙের ইউনিফর্ম পরা নার্সরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারা আবার মেমসাহেব! শ্রীকান্ত একটুখানি নড়াচড়া করতেই একটি নার্স এসে বলল, গুড মর্নিং সার! শ্রীকান্ত ইংরেজি জানত মোটামুটি। সে বলল, গুড মর্নিং মিস্। এমন সময় একজন মোটাসোটা লম্বা চেহারার সাহেব ডাক্তার এসে তার কাছে একটা ছোট টুল নিয়ে বসলেন। বললেন, কেমন বোধ করছ? শ্রীকান্ত বলল, ভালোই তো মনে হচ্ছে তবে গায়ে বেশ ব্যথা, মাথাতেও ব্যথা খুব। ডাক্তার বললেন, একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে। তুমি কোন দেশের লোক, তোমাকে কারা মেরেছিল? শ্রীকান্ত বলল, কোন দেশের লোক মানে? আমি এদেশেরই লোক! ডাক্তার বললেন, এদেশের কোথায় তোমার বাড়ি? শ্রীকান্ত বলল, কলকাতা আমার বাসস্থান। ডাক্তার বললেন, এই দেশটা হচ্ছে ইংল্যান্ড। তুমি লন্ডনের চেয়ারিং ক্রস হাসপাতালে রয়েছ। তাছাড়া

অনেকগুলো অদ্ভুত ব্যাপার হয়েছে। কেউ তোমার নাম জানে না কিছু না, তোমাকে কেউ ভর্তি করায়নি এই হাসপাতালে! একদিন রাত্রে হঠাৎ তোমাকে এই বিছানায় দেখে সকলে অবাক হয়ে যায়। সেও আজ প্রায় দশ দিন হয়ে গেল। তোমার জ্ঞান ছিল না। তোমার হাড়টাড় সব ভাঙা ছিল, কিন্তু কারা সব জোড়া দিয়েছিল, তারপর তারা এখানে এনে ফেলে গিয়েছিল। এই কাজ কারা করেছিল তুমি জান?

শ্রীকান্তর এবার মাথাটা ঘুরে উঠল। এ কি কথা—সে এখন লন্ডনের চেয়ারিং ক্রস হাসপাতালে? অসম্ভব! অসম্ভব! সে আর ভাবতে পারল না, কেমন যেন আচ্ছন্নের মতো হয়ে রইল। সাহেব ডাক্তার বললেন, না, এর সঙ্গে অত কথা বলা বোধহয় ঠিক হয়নি, পরে ভালো করে ভেবে-চিন্তে কথা বলতে হবে। কলকাতার লোক বলছে এ। নামটাও তো জানা যাচ্ছে না, তাহলে কলকাতায় একটা খবর পাঠিয়ে দেওয়া যেত। যাই হোক, এরপর ওর জ্ঞান হলে ওর নাম আর ঠিকানাটা জোগাড় করতে হবে। ডাক্তার নার্সকে কথাগুলো বলে ভ্রূ কুঁচকে কি ভাবতে ভাবতে বেরিয়ে গেলেন। ডাক্তারের নাম রিচার্ড রবিনসন।

শ্রীকান্তকে চেয়ারিং ক্রস হাসপাতালের রোগীদের জন্য নির্দিষ্ট করা খালি একটা খাটে পড়ে থাকতে দেখেন নাইট ডিউটির একজন সিনিয়র নার্স! রোগীর না ছিল পরিচয়, না ছিল কোনও রিপোর্ট। প্রথমে তিনি ভেবেছিলেন বোধহয় কোনও ইন্ডিয়ান উটকো লোক, থাকবার জায়গার অভাবে লুকিয়ে হাসপাতালে ঢুকেছে। পরে পরীক্ষা করে দেখেন লোকটির সারা গায়ে নানারকম আঘাতের চিহ্ন। লোকটি সম্পূর্ণ অজ্ঞান। তারপর নানা কৌশলে তার এক্স-রে করে দেখা যায় তার অসংখ্য হাড় ভাঙা, তবে সেগুলো সেট করা হয়েছে ঠিক ভাবেই। এটা ভারী আশ্চর্যজনক ব্যাপার বলে তাঁদের মনে হয়। চামড়া না কেটে, বাইরে থেকে এমন ভাবে হাড় জোড়া দেওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। বিশেষ করে যে-সব হাড় ভেঙে ছোট ছোট টুকরো হয়ে গেছে সেগুলোকে বাইরে থেকে সেট করা যায় না। এই নিয়ে চারদিকে হৈচৈ পড়ে যায়।

শ্রীকান্তকে বিশেষ রোগী হিসেবে চিহ্নিত করা হয় এবং তার জন্য একটা মেডিক্যাল টিমও গঠন করা হয়। অনেক বড় বড় বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শের পর যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয় তাতে সে দ্রুত সেরে উঠতে থাকে। দু'দিন আগে তাকে অজ্ঞান অবস্থাতেই দাঁড় করানোও হয়। খবরের কাগজের লোকেরাও এই বিস্ময়কর রোগীকে নিয়ে যথেষ্ট কৌতূহল দেখায়। কিন্তু লোকটির পরিচয় কেউই বার করতে পারে না। কলকাতায় বাড়ি এটা শুনে কলকাতায় খোঁজও করেছিল পুলিশ, কিন্তু পুলিশ ওপর ওপর খোঁজখবর নিয়ে জানিয়েছিল তারা ঠিক ধরতে পারছে না। লোকটির নাম জানলেও একটা চেষ্টা করা যেত। কলকাতা থেকে রোজ কম লোক তো নিরুদ্দেশ হয় না।

এরপর চলতে লাগল অপেক্ষা আর চিকিৎসা। আস্তে আস্তে শ্রীকান্ত প্রায় সম্পূর্ণই সুস্থ হয়ে উঠল। কিন্তু অসুবিধে তারও ছিল। সে তার নিজের নামটাই আর মনে আনতে পারল না! সে কেবল বলত আমার বাড়ি কলকাতা, বাস! এইভাবে চলল আরও দু'মাস। রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ। এক্স-রে করে দেখা হয়েছে তার হাড়গুলো সবই বেমালুম জুড়ে গেছে! চামড়ায় যে সব কাটাছেঁড়ার দাগ ছিল সেগুলো মেলাল না তবে অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে গেল।

এখন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সমস্যা হল একজন সুস্থ-সবল লোককে কোথায় পাঠানো হবে। হাসপাতালে রাখা চলবে না একেবারেই। সুস্থ লোককে হাসপাতালে রাখা যায় না। মানসিক রোগের হাসপাতালে পাঠানো হয়তো যায়, তার স্মৃতিশক্তি ফেরানোর চেষ্টা করা যায়। শ্রীকান্ত নিজেও কেমন যেন হয়ে পড়ল। তার নাম কি সে নিজেই জানে না! সে কেবল জানে তার বাড়ি কলকাতা। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ অবশেষে স্থির করলেন ওকে জাহাজে করে কলকাতায় পাঠিয়ে দেওয়া হবে। সেখানে ওকে নিয়ে গাড়িতে করে কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়ে আনলে তার হয়তো স্মৃতি ফিরে আসতেও পারে। অনেক টাকারও দরকার। সে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা হচ্ছে—সব ব্যবস্থা পাকা।

যে দিন সকালের ট্রেনে টিলবেরি ডকে যাওয়ার কথা, সঙ্গে একজন যাবে তার সঙ্গে, তার আগের রাত্রে হল এক অদ্ভুত কাণ্ড। হঠাৎ রাত দুটো নাগাদ কর্তব্যরত নার্স শ্রীকান্তর বেডে এসে দেখল রোগী উধাও! খোঁজ খোঁজ! রোগী কোথাও নেই। ভারী আশ্চর্য ব্যাপার! হাসপাতালের দরজা বন্ধ, মেইন গেট বন্ধ, রোগী গেল কোথায়? চাঞ্চল্য পড়ে গেল চারদিকে। পুলিশ নানা সম্ভাব্য এবং অসম্ভাব্য অনেক জায়গা খুঁজেও তার চিহ্ন পেল না!

।।৩।।

রতনদিয়ায় একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটল এরপরেই! শ্রীকান্তকে পাওয়া গেল তার শ্বশুরবাড়ির একটা ঘরের মধ্যে ভোরবেলায় ঘুমন্ত অবস্থায়। শ্রীকান্তকে ওখানে ঐ ভাবে ঘুমিয়ে থাকতে দেখে ফের চাঞ্চল্য! সমস্ত গ্রাম দেখতে এল শ্রীকান্তকে। কালুখালি স্টেশন থেকে তাকে নামতে দেখেছে কয়েকজন সেই তিন মাস আগের বিচ্ছিরি ঐ রাত্রে! তারপর পাওয়া গেছে তার ভাঙা সুটকেস, আর ছড়ানো সব জিনিসপত্র! রক্তের ছাপ। ধস্তাধস্তির চিহ্ন। কেবল মানুষটাই হয়ে গেল নিরুদ্দেশ। সর্বত্র নেমে এসেছিল শোকের কুয়াশা! তারপর দিনের পর দিন গেল অথচ শ্রীকান্তর হদিস পাওয়া গেল না তখন সকলে ধরেই নিল শ্রীকান্তকে ভূতে খেয়েছে! কেননা সে রাত্রে ভূতেদের নানা চিৎকার আর হল্লা শোনা গিয়েছিল, ভূতদের বিচ্ছিরি সব ছড়াও শুনেছিলেন বহু মানুষ। গুণিনরা ফিরে এসে গ্রামের সব ভূতদের জেরা করেও কোনো সদুত্তর পাননি। সকলে একবাক্যে বলেছে, জানি না— সত্যি বললে মহা শাস্তির বন্দোবস্ত হত ঠিকই, তাই যারা ছোট তারা ভয়ে কবুল করেনি।

একটা সত্যি কথা ছোট ভূতেরা সকলে বলেছে, তারা শ্রীকান্তকে দেখেছে কিন্তু তাকে কেউ মারেনি। এটা হতেই পারে তারা কেবল তাকে নিয়ে একটু লোফালুফি করেছিল, মারেনি। কিল না ঘুঁষি না লাঠির আঘাত না, কেবল উঁচু থেকে একবার ধপ করে ফেলে দিয়েছিল! সেটাকে মারা বলা যায় কি? তাছাড়া একটা ব্যাপার তারাও বুঝতে পারেনি, হঠাৎ কোত্থেকে একদল সাদা ধরনের ভূত (সঙ্গে একটু যেন নীল নীল ভাব) এসে মস্তানি করে তাদের হঠিয়ে দিয়েছিল আর মানুষটাকে কোথায় হাওয়া করে দিয়েছিল কেমন করে। ছোকরা ভূতদের ধারণা ঐ অদ্ভুত ভূতেরা লোকটিকে পুরোপুরি খেয়ে নিয়েছে। কিন্তু সে-কথা তারা কাউকে বলেনি।

বড় ভূতেরা ছোকরা ভূতদের আর বেশি ঘাঁটাননি। বড় বড় ভূতরাও সেদিন গ্রামে ছিলেন না। সে জন্য ছোকরা ভূতদের জঘন্য সব কীর্তিকলাপ দেখতে পাননি। পরে আন্দাজ করেছিলেন কিন্তু এ নিয়ে বেশি কিছু ঘাঁটাননি।

এদিকে আর একটা ব্যাপার ঘটেছিল—শ্রীকান্ত চাটুজ্জের সব ঘটনা প্রকাশ হবার পর তাকে নানাভাবে সম্মানিত করা হয়। ওর শ্বশুরবাড়িতে একটা বড় উৎসব হয় গ্রামের প্রথম বিলাতফেরত জামাই বলে। তার আগে ঐ গ্রামের কোনো জামাই বিলেত যায়নি! আর ঐ বিলাতফেরত হবার জন্যই তাকে বেশ বড় রকমের একটা কাজও দেওয়া হয়। শ্রীকান্ত ছিল একজন সামান্য কেরানি। মাসে মাইনে ছিল পঁয়তাল্লিশ টাকা। বড় পদে প্রতিষ্ঠিত করার পর তার মাইনে বেড়ে হল দুশো দশ টাকা! হবে না? বিলাতফেরত যে! তা ঐ সময়ে বিলাতফেরতদের ঐ রকমই সম্মান ছিল।

এখন সে গ্রামই বা কোথায়, আর ভূতেরাই বা কোথায়!

আষাঢ় ১৪০৫

লোকটা কে

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়

প্রাইভেট ডিটেকটিভ হিসেবে পরাশর সেনের তখন বেশ নামডাক। এই নাম ছড়াবার পেছনে রয়েছে একটা জোড়াখুনের রহস্য উদ্ধার। যেভাবে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পরাশর সেই দুর্ধর্ষ খুনিকে আবিষ্কার করেছিল, তাতে তাকে প্রশংসা না করে পারা যায় না। এই নিয়ে খবরের কাগজে খুব লেখালিখিও হয়েছিল একসময়।

অবশ্য এমনিতে পরাশরকে দেখলে মনে হবে ছাপোষা মানুষ। যেন ভাজা মাছটাও উল্টে খেতে জানে না। কিন্তু ডিটেকটিভ হিসেবে তদন্তের কাজে ওর বুদ্ধি যেন ক্ষুরধার হয়ে ওঠে। কোন পরিবেশে কখন কিভাবে টোপ ফেলে এগোতে হবে, সে ব্যাপারে ওর জুড়ি মেলা ভার।

গড়িয়ার কাছে বড় রাস্তার ওপরই পরাশরের অফিস। অফিস মানে ছোট্ট একটা ঘর। বেশ সাজানো-গোছানো। সেখানে হারু নামে একটা ছোকরা সারাদিন ঘর খুলে বসে কাটায়। প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে ফাই-ফরমাস খাটে, চা-ফা এনে দেয়। অফিসে কে এল না এল তা নোট করে রাখে। এছাড়া কখনও বা ব্যাঙ্কে যাওয়া, পোস্ট অফিসে যাওয়া, কাউকে কোনো চিঠি দিয়ে আসা ইত্যাদি সব কাজই হারুকে করতে হয়।

পরাশরকে গোয়েন্দাগিরির কাজে সারাক্ষণই ঘোরাঘুরি করতে হয়। যথাবিহিত সে দিনও ছুটোছুটির কাজ সেরে সন্ধ্যা নাগাদ পরাশর অফিস ঘরে এসে ঢুকল।

ঢুকেই দেখল, হারু একটা টুলের ওপর বসে ঝিমুচ্ছে।

কি রে হারু ঘুমুচ্ছিস?

কেমন যেন চমক ভেঙে লাফিয়ে ওঠে হারু, আজ্ঞে না স্যার। আসলে—, বোকার মতো একটু হাসে। আসলে স্যার সারাদিন একা একা বসে ঘুম পেয়ে গিয়েছিল।

তা অবশ্য ঠিক। তোকেও আর দোষ দিয়ে লাভ নেই। সারাদিন ওরকম বসে থাকলে ঘুম পাওয়ারই কথা। ঠিক আছে একটা কাজ কর দেখি। খাতাটা দে, কে কে এসেছিল একবার দেখে নিই।

আজ্ঞে স্যার, আজ কেউ আসেনি, একটা মাছিও না স্যার।

সে কি রে? কেউ না!

হারু আবার বোকার মতো তাকায়, মাথা চুলকোয়।

ঠিক আছে, তাহলে একটু চা-ই নিয়ে আয়। চা-টা খাইয়ে তুই বাড়িও চলে যেতে পারিস। মিছিমিছি বসে থেকে আর কি করবি।

হারু চায়ের কেটলিটা হাতে নিল। তারপর ছুটে গিয়ে চা নিয়ে এসে পরাশরকে একটা কাপে ঢেলে দিল। নিজেও একটু নিল। তারপর চা খাওয়া হয়ে গেলে বোকার মতো একটু হাসল আবার।

কি হল, হাসছিস যে? বললাম তো তুই যেতে পারিস। আমি বরং আর একটু বসেই যাই। চাবিটা এখানে রেখে যা।

হারু তাই করে। চাবিটা রেখে চলে গেল।

পরাশর ঘড়ি দেখল। সবে সাতটা। তার মানে এখনো সন্ধ্যাই বলা যেতে পারে। চেয়ারে হেলান দিয়ে পা দুটো সামনের দিকে টেনে লম্বা করে ছড়িয়ে বসে রইল খানিকক্ষণ। তারপর হঠাৎ কি খেয়াল হওয়ায় নতুন কেস হিস্ট্রির ফাইলটা পাশের র‍্যাক থেকে টানতে গিয়ে দরজার দিকে চোখ পড়ে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠল। পর্দার ওপাশে কেউ একজন যেন দাঁড়িয়ে।

কে? টান টান হয়ে বসে জিগ্যেস করে পরাশর।

বাইরে থেকে কেমন একটা মিনমিনে গলা, ভেতরে আসতে পারি স্যার?

আসুন। ওখানে দাঁড়িয়ে কি করছেন?

পর্দা সরিয়ে লোকটা দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়। কেমন যেন ইতস্তত ভাব। একটু কথা ছিল স্যার।

লোকটার আপাদমস্তক একবার ভালো করে দেখে নিল পরাশর। বছর পঞ্চাশেক বয়স। পরনে ময়লা ধুতি, গায়ে কলার ছেঁড়া শার্ট, পায়ে ছেঁড়া-ফাটা চপ্পল। কিন্তু এসব যেমন-তেমন, লোকটার কপালের পাশে একটা টিউমার। ছোটখাট একটা আপেল যেন ওখানে বসিয়ে রাখা হয়েছে। আর চোখ দুটোও কেমন যেন মিয়োন।

কি ব্যাপার, বসুন না, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?

বসবার জন্য একটা চেয়ার দেখিয়ে দেয় পরাশর।

লোকটা এগিয়ে এসে চেয়ারে বসে।

কি কথা বলুন এবার?

আগন্তুক ঘরের চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে নিল। তারপর পরাশরের দিকে সরাসরি তাকিয়ে বলল, একটা খুনের ঘটনা স্যার।

খুনের ঘটনা, মানে! পরাশর কেমন সোজা হয়ে বসে। কোথায় খুন, কে খুন করল?

খুন করে স্যার বডিটাকে লুকিয়ে রাখা হয়েছে।

পরাশর কেমন বোকার মতো তাকায়। তারপর নোট করার জন্য ডায়েরি বুকটা টেনে নেয়, একটু খুলে বলুন দেখি। কোথায় খুন, কাকে? কেমন যেন উত্তেজনা বোধ করতে থাকে পরাশর।

অথচ লোকটা নির্বিকার। শীতলভাবেই বলল, আপনি যদি বডিটা দেখতে চান স্যার দেখাতে পারি। তবে খুনি কিন্তু বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। তাই স্যার এই অসময়ে আপনাকে খবরটা দিতে এলাম।

পরাশর লোকটাকে আবার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল, লোকটার মাথায় কোনো গোলমাল নেই তো! কিন্তু না, তাও তো মনে হয় না। বলল, আচ্ছা দাঁড়ান, চা খাবেন?

না স্যার, আমি চা খাই না। তাছাড়া স্যার, এদিকে যদি দেরি করেন লোকটা কিন্তু পালিয়ে যাবে। আজ রাতের ট্রেনেই ও বোম্বাই পালাবে বলে ঠিক করেছে। টিকিটও কাটা হয়ে গেছে ওর।

পরাশর বলল, কিন্তু ব্যাপারটা একটু খুলে বলবেন তো। ঘটনাটা কোথায় ঘটেছে, কে সে?

বেশি দূরে নয় স্যার। এই গড়িয়াতেই, খালের ধারে। একটা বহুকালের পুরোনো বাড়িতে।

ঠিকানা বলুন?

ঠিকানা বলল লোকটা। পরাশর চটপট তা লিখে নিল।

বেশ, এবার বলুন, কে খুন হয়েছে আর কেই বা খুন করেছে? কি নাম তার?

যে খুন করেছে স্যার তার নাম সি দাস মানে চণ্ডী দাস। মহা ফেরেববাজ লোক, ডেঞ্জারাস।

বটে। কাকে খুন করেছে?

আজ্ঞে স্যার ওরই এক পার্টনার অম্বিকা রায়কে। টাকাপয়সা নিয়ে দুজনের মধ্যে অনেক দিন ধরেই ঝগড়া চলছিল। আজই স্যার সকালে নিজের বাড়িতে অম্বিকাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে মওকা বুঝে খুন করে।

আজ সকালে! কি ভাবে খুন করল?

বাড়িটা স্যার এমনিতেই খুব নির্জন। চণ্ডী ছাড়া আর কোনো লোক থাকে না ওখানে। দুজনে ঘরের ভিতর বসে কথা বলছিল। হঠাৎ সুযোগ বুঝে চণ্ডী একটা চপার দিয়ে ওর মাথায় একটা কোপ মারে। আর তাইতেই স্যার।...

বটে, তা আপনি জানলেন কি করে? আপনি কি দেখেছেন?

লোকটা কি যেন একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিল, আর ঠিক তখনই কেলেঙ্কারি। টুক করে আলো নিভে গেল। পরাশর জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বুঝল, লোডশেডিং।

লোকটা বলল, আমি তাহলে যাই স্যার। খুনের খবরটা আপনাকে দেওয়াই আমার উদ্দেশ্য ছিল। এবার আপনি যা ভালো বুঝবেন করবেন।

বলতে বলতে লোকটা উঠে দাঁড়িয়েছে টের পেল পরাশর। সে কি মশাই, কোথায় যাচ্ছেন? কথাই তো হল না? তাছাড়া স্পটটা দেখাবেন তো আমাকে?

সেখানে আমার যাওয়াটা ঠিক হবে না স্যার। আপনি একাই চলে যান। এখনই গেলে চণ্ডীবাবুকে পেয়ে যাবেন। ওকে জিগ্যেস করলেই সব জানতে পারবেন।

টুক করে ঘরের পর্দা সরিয়ে বেরিয়ে গেল আগন্তুক।

পরাশর কেমন বোকার মতো তাকিয়ে রইল। তারপর উঠে দাঁড়াল, ঘরের ভিতর এভাবে এখন বসে থাকারও মানে হয় না। একটু কি ভেবে জানালা বন্ধ করে দিল। তারপর বেরিয়ে এল ঘরের বাইরে। চারপাশে তাকাল, না, লোকটা উধাও।

অদ্ভুত ব্যাপার। পাগল না তো। হঠাৎ করে এসে একটা মার্ডারের কথা শুনিয়ে গেল, অথচ চোখে-মুখে ওর বিন্দুমাত্র উত্তেজনা নেই। নাকি আমাকে খানিকটা হ্যারাস করার জন্যই ব্যাপারটা করে গেল! কে জানে!

আবার ভাবল, নাহ্ একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। রাত তো এখন সবে সাড়ে সাত। দেখাই যাক না চণ্ডীবাবু নামে কাউকে পাওয়া যায় কি না।

ঘরে তালা লাগিয়ে ডায়েরিটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল পরাশর। আর রাস্তায় পা দিয়ে খানিকটা এগোতেই আবার আলো জ্বলে উঠল চারপাশে। যাক বাবা, বাঁচা গেল। অল্পের ওপর দিয়েই লোডশেডিং কাটল।

তারপর হাঁটতে শুরু করে পরাশর। এ-রাস্তা সে-রাস্তা করে শেষটায় নম্বর মিলিয়ে এসে হাজির হল চণ্ডীবাবুর বাড়ির সামনে। আবার ঘড়ির দিকে তাকাল, আটটা বাজতে মিনিট দশেক বাকি। কিন্তু এরই মধ্যে পাড়াটা কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়েছে। নিস্তব্ধ।

বাড়িটার দিকে তাকাল। বহু পুরোনো আমলের বাড়ি। দেয়াল ফুঁড়ে গাছ গজিয়ে আছে। সামনের দিকে বাগান মতো অনেকখানি জায়গা। ঝোপজঙ্গলে ভরে রয়েছে। কেউ যে এরকম একটা ভাঙাচোরা বাড়িতে বাস করে ভাবাই যায় না।

পরাশর দেখল, বাড়ির সব ক'টা দরজা-জানালাই বন্ধ। তবে পাশের দিকে একটা ঘরে যে আলো জ্বলছে সেটাও বোঝা যাচ্ছে।

ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে কলিং বেল টিপল পরাশর।

আর, কিছুক্ষণের মধ্যেই দরজা খুলে গেল। কে?

পরাশর দেখল, মধ্যবয়সী একজন লোক। পরনে প্যান্ট-শার্ট। পায়ে শু। একটু যেন ব্যস্তসমস্ত ভাব।

আমি একটু চণ্ডীবাবুর সঙ্গে কথা বলতে চাই।

বলুন কি দরকার। আমার কিন্তু একদম সময় নেই। ট্রেন ধরতে হবে।

পরাশর বলল, আপনি যে বোম্বে মেল ধরবেন সেটা আমি জানি। ট্রেন ক'টায়?

ভদ্রলোক কেমন যেন একটু চমকে উঠলেন, তার মানে, কে আপনি? আপনি কি করে জানলেন আমি বোম্বাই যাচ্ছি!

পরাশর মাথা ঠান্ডা রাখে। না দেখুন, বোম্বেতে আপনি ক'দিন থাকবেন? কোথায় উঠবেন? এ সবও আমার জানা দরকার।

চণ্ডীবাবুর চোখ-মুখের চেহারাই যেন পাল্টে গেছে। এক পলক ভ্রূ বাঁকা করে পরাশরের দিকে তাকালেন, এসব আপনি জিগ্যেস করার কে? কে আপনি?

এরকম পরিস্থিতিতে কিভাবে কথা বলতে হয় পরাশরের জানা। বলল, দেখুন চণ্ডীবাবু, আপনাকে একবার আমার সঙ্গে থানায় যেতে হবে। সেখানেই জানতে পারবেন আমি কে?

হোয়াট ডু ইউ মিন? থানায় কেন? কি করেছি আমি? যান যান মশাই, থানা দেখাবেন না। আমার এখন সময় নেই। যান।

বলতে বলতে ভদ্রলোক আবার ঘরে ঢুকে পড়লেন।

পরাশর কেমন বোকার মতো তাকিয়ে রইল। সন্দেহটা মাথার মধ্যে বেশ দানা বেঁধে উঠল। কিছুতেই লোকটাকে এখন হাতের বাইরে যেতে দেওয়া ঠিক হবে না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার মনে হল, ও তো একদম খালি হাত-পা। আবার লোকটা তো খুনি আসামী, ও না পারে হেন কাজ নেই।

টুক করে ঘরের আলোটা নিভে গেল। নিভে যেতেই চমকে উঠেছিল পরাশর। চণ্ডীবাবু একটা স্যুটকেস হাতে ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন, ও কী, এখনো আপনি দাঁড়িয়ে আছেন! বললাম, জরুরি কাজে আমাকে বাইরে যেতে হচ্ছে। এখনই না বেরুলে ট্রেন ধরতে পারব না।

বলতে বলতেই ভদ্রলোক ঘরে তালা লাগিয়ে স্যুটকেস হাতে সদরের দিকে এগিয়ে গেলেন।

পরাশর কি করবে বুঝতে পারে না। লোকটাকে কি ফলো করা উচিত? আবার মনে হল, ফলো করে কি লাভ, তার চেয়ে থানাতেই যাই, থানাকেই ব্যাপারটা আগে জানানো দরকার।

হঠাৎ পেছন থেকে কার একটা গলার আওয়াজ, স্পটটা একটু দেখে যাবেন না স্যার?

কে? পরাশর চমকে উঠে পিছনে তাকিয়ে দেখে, আরে এ তো সেই লোকটাই। খানিকক্ষণ আগে ওর চেম্বারে গিয়ে খুনের খবরটা ওকে দিয়ে এসেছিল।

আপনি!

হ্যাঁ স্যার আমি। চণ্ডী তো আপনাকে পাত্তাই দিল না দেখলাম। ও তো একটা ট্যাক্সি চেপে সটান হাওড়ার দিকে চলে গেল।

আপনি কোথায় ছিলেন এতক্ষণ?

লোকটার সেই মিয়োন চোখ, আসুন না, জায়গাটা আপনাকে দেখিয়ে দিই। খুন করে কোথায় মাটি চাপা দিয়েছে দেখে যান।

বাড়ির পেছন দিকে এগিয়ে যেতে থাকে লোকটা। পরাশরও ওর পিছু নেয়। এককালে এদিকেও বাগান ছিল বোঝা যায়। এখন বাগানের বদলে জংলা গাছে ঠাসা। বাউন্ডারি ওয়ালটা এদিকে বেশ উঁচু।

এই বাউন্ডারি ওয়ালের ওপাশেই স্যার খাল।

তাই বুঝি!

আর ওই কোণের দিকে দেখুন স্যার। লোকটা আঙুল তুলে দেখায়।

পরাশর দেখে দেওয়ালের এক পাশে ময়লা জঞ্জালের স্তূপ। তারই ওপর একটা ভাঙাচোরা ড্রাম বসানো।

ওই যে স্যার ময়লা ফেলার ড্রামটা দেখা যাচ্ছে, ওটা একটু সরালেই দেখা যাবে, গর্ত খোঁড়া হয়েছিল। বডিটাকে একটা বস্তায় ভরে ওখানে পুঁতে রাখা হয়েছে।

পরাশর এগিয়ে গেল ড্রামটার কাছে। ড্রামটা সরাবার জন্য হাত বাড়াতেই লোকটা হাঁ হাঁ করে উঠল, না স্যার, আপনি হাত দেবেন না। আগে পুলিশকে আসতে দিন। পুলিশের সামনেই বডিটা বার করা ভালো।

পরাশর হাত সরিয়ে নিয়ে পিছিয়ে এল। পুলিশকে তাহলে এখনই খবরটা দিতে হয়।

পুলিশ এখনই এসে পড়বে স্যার। ওই তো জিপের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে।

হ্যাঁ, একটা গাড়ি আসার শব্দই যেন পাচ্ছে পরাশর। সদর গেটের দিকে এগিয়ে গেল। সত্যিই একটা পুলিশ ভ্যানই এগিয়ে আসছে। আশ্চর্য পুলিশও জেনে গেছে তাহলে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই গাড়িটা এসে গেটের সামনে দাঁড়াল। ভ্যান থেকে নেমে এলেন ওসি।

এই যে পরাশরবাবু, কি ব্যাপার, তলব করেছেন কেন?

পরাশর একটু অবাক হয়, তলব করেছি, কই আমি না তো! তবে আপনারা এসে পড়ায় খুব ভালো হয়েছে।

সে কি মশাই, খানিকক্ষণ আগে তাহলে কে ফোন করল আমাদের! খুব জরুরি দরকার, আপনি অপেক্ষা করছেন, ফোর্স নিয়ে এখনি এই ঠিকানায় চলে আসতে বলেছেন আপনি!

কেমন রহস্যময় লাগে পরাশরের। কিন্তু তখন আর ওসব কচকচি বাড়িয়ে লাভ নেই। বলল, এ বাড়িতে ভীষণ একটা গোলমেলে ব্যাপার ঘটে গেছে। বাড়ির পেছন দিকে মাটির নীচে দারুণ এক রহস্য লুকোনো রয়েছে বলে মনে হচ্ছে।

তাই নাকি! কি রহস্য? চলুন তো দেখি।

খোঁড়াখুঁড়ি শুরু হয়ে গেল। ড্রামটা সরিয়ে খানিকটা মাটি খুঁড়তেই বেরিয়ে পড়ল বস্তাবন্দি একটা মৃতদেহ।

টেনে উপরে তুলে আনা হল বডিটাকে। তারপর টর্চের আলোর মধ্যে বস্তাটা কেটে সরাতেই চমকে ওঠে পরাশর। আরে এ কি করে সম্ভব! পরনে ধুতি, গায়ে শার্ট। আরও আশ্চর্য লোকটার কপালের পাশে সেই আপেলের মতো টিউমারটাও।

কি হল?

পরাশর চারপাশে তাকায়। কিন্তু এতক্ষণ যে লোকটার সঙ্গে ও কথা বলল, সে কোথায়?

কে কোথায়, কার কথা বলছেন?

পরাশর এবার ভয়ে ভয়ে তাকায়। জানেন ওসি, অবিকল এরকম চেহারারই একটা লোক আমার চেম্বারে খুনের ঘটনার খবরটা দিতে গিয়েছিল। আবার কিছুক্ষণ আগেও লোকটা এখানে এসে আমার সঙ্গে কথা বলে গেছে। অবিকল এই চেহারা। এ রকম ধুতি-শার্ট, কপালের টিউমারটাও।

তার মানে আপনি বলছেন—

বিশ্বাস করুন ওসি, আমার মনে হচ্ছে এই লোকটার আত্মাই আমাকে এখানে টেনে এনেছে। থানায় যে ফোনটা গিয়েছিল সেটাও বোধহয় ওরই কীর্তি।

তাই নাকি! পুলিশ অফিসারও কেমন বোকার মতো হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন।

তারপর সোজা হাওড়া স্টেশনে। বম্বে মেলেই পাওয়া গেল চণ্ডীকে। তাকে ধরে নিয়ে যাওয়া হল থানায়। পুলিশের কাছে চণ্ডী স্বীকার করল, বন্ধুকে সেই হত্যা করেছে।

আশ্বিন ১৪০১

কে হাসে?

মঞ্জিল সেন

সেদিন ছিল কোজাগরী পূর্ণিমা। ঘরে ঘরে লক্ষ্মীপূজা। বারোয়ারি পূজা তো আছেই। চাঁদের আলো আর কৃত্রিম আলোকসজ্জায় ঝলমল করছে শহর।

এই প্রথম আমি উত্তরবঙ্গে বেড়াতে এসেছি। খুব ভালো লাগছিল কলকাতা থেকে অনেক দূরে এই ছোট্ট শহরের উৎসবমুখর রাতটি।

আমি উঠেছিলাম ধর্মশালায়। দু'বেলা বাইরেই খেয়ে নিতাম। সেদিনও রাত ন'টার পর একটা হোটেলে ঢুকেছিলাম। হোটেলের রান্না ভালো, রকমারি পদ পাওয়া যায়। শুক্তো থেকে শুরু করে মাছের মাথা দেওয়া মুগ ডাল, পুঁইডাঁটার চচ্চড়ি, কপির তরকারি, রুই, পার্শে, ভেটকি নানারকম মাছ, ডিমের ডালনা, মাংস কোনো কিছুই বাদ নেই।

আমি এক কোনায় জানালার ধারে একটা ছোট টেবিলের সামনে বসলাম। মুখোমুখি দুটো চেয়ার, দুজন বসে খেতে পারে। আমি জানলার দিকে পিঠ রেখে বসেছিলাম। হোটেলের একটা ছেলেকে ডেকে ভাত, তরকারি আর পাব্‌দা মাছের ঝোল দিতে বললাম। ছেলেটি বলল, একটু দেরি হবে, ভাত ফুরিয়ে গেছে, উনুনে আবার হাঁড়ি চাপানো হয়েছে। খদ্দেরের বেশ ভিড়, আমার আগে এসেও অনেকেই ভাতের আশায় বসে আছে।

ঠিক তখুনি একজন ঢ্যাঙা মতো লোক আমার টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ালেন। ফ্যাকাশে মুখ, দু'চোখের তলায় কালি পড়েছে, অথচ শরীরের কাঠামো দেখে মনে হয় একসময় বেশ জোয়ান পুরুষ ছিলেন। বয়স তিরিশের মাঝামাঝি, কি তার একটু বেশি হবে। কুণ্ঠিত ভাবে তিনি বললেন, আমি এখানে বসলে আপনার অসুবিধে হবে কি?

আমি বলে উঠলাম, না, না, এটা তো দুজনেরই টেবিল। যদিও একটা পুরো টেবিল দখল করে খাবার সুযোগটা হাতছাড়া হল বলে মনে মনে আমি একটু ক্ষুণ্ণ হলাম।

ভদ্রলোক আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে চেয়ার টেনে বসলেন। তারপর একটু ইতস্তত করে বললেন, আপনাকে আগে কখনও এখানে দেখিনি তো, বেড়াতে এসেছেন?

হ্যাঁ, আমি জবাব দিলাম।

কলকাতা থেকে?

আমি ঘাড় দোলালাম।

আমার বাড়িও কলকাতায়, ভদ্রলোক দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বললেন, গত সাত বছরে একবারও যাওয়া হয়ে ওঠেনি।

কলকাতায় কোথায় আপনার বাড়ি? আমি ভদ্রতার খাতিরে জিগ্যেস করলাম।

ভবানীপুরে...কালীমোহন ব্যানার্জি লেনে, ওই যেখানে ইন্দিরা সিনেমা আছে....

আরে আমিও তো ওখানেই থাকি, প্রিয়নাথ মল্লিক রোডে। আপনার কোন বাড়ি?

দেশ-গাঁয়ের লোকের সঙ্গে বাইরে কোথাও দেখা হলে খুব তাড়াতাড়ি যেমন সঙ্কোচ কেটে যায়, ব্যক্তিগত প্রশ্ন এসে পড়ে, আমাদেরও তাই হল। কথায় কথায় দুজনের পরিচিত কয়েকজনের নামও বেরিয়ে পড়ল। ভদ্রলোকের নাম বীরেশ্বর রায়।

আমি জিগ্যেস করলাম, আপনি কলকাতা ছেড়েছেন সাত বছর, তাই বললেন না?

হ্যাঁ, বীরেশ্বরবাবু জবাব দিলেন, এখানে আছি দু'বছর। তার আগে একবছর আমি একটা চা-বাগানের ম্যানেজার ছিলাম।

সে তো খুব ভালো চাকরি, আমি না বলে পারলাম না, শুনেছি রাজার হালে থাকা যায়। তা সেই চা-বাগান কি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল?

না, বীরেশ্বরবাবু দু'পাশে মাথা নাড়লেন, আমিই ছেড়ে দিয়েছি।

সেকি! কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মনোমালিন্য হয়েছিল বুঝি?

তাও না। ভদ্রলোক কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন, তারপর বললেন, আপনাকে সব খুলে বলছি...মানে কাউকে না বললে আমার মন হালকা হবে না। সবাইকে সব কিছু বলা যায় না। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আপনি আর সবার মতো নন, সহানুভূতিশীল মানুষ। বিশেষ করে আপনি আমার পাড়ার লোক। আপনাকে বলতে আমার আপত্তি নেই, অবিশ্যি আপনার যদি শুনতে আপত্তি না থাকে।

মোটেই না, আমি হেসে বললাম, হাঁড়িতে চাল ফুটছে, ভাত না হওয়া পর্যন্ত গল্প করে কাটানো যাবে।

আমি যা বলব তা কিন্তু একটি ঘটনা। যাকে আপনারা বলেন অলৌকিক, তেমন কিছু।

আমি কিছু বলার আগেই একটি ছোকরা এসে ভদ্রলোকের খাবার অর্ডার নিয়ে গেল। তিনি শুধু ভাত আর মাংসের কথা বলে দিলেন।

এখান থেকে মাইল তিরিশ দূরে একটা চায়ের বাগানে আমি ম্যানেজারের চাকরি পেয়েছিলাম। ভদ্রলোক শুরু করলেন, আমার স্বাস্থ্য খুব ভালো ছিল, একসময় খুব মার-দাঙ্গা করতাম, সাহসের অভাব ছিল না। সেটাই ছিল আমার ফার্স্ট কোয়ালিফিকেশন। চায়ের বাগানে কুলি-মজুরদের নিয়ে কত, ম্যানেজারকে অনেক রকম সমস্যার মোকাবিলা করতে হয়। আপনি যা ভাবছেন তেমন পায়ে পা দিয়ে সুখের চাকরি নয়, শক্ত মানুষ না হলে টিকতেই পারবে না। অবিশ্যি অন্য যোগ্যতাও যে আমার ছিল না এমন নয়, কৃষিবিজ্ঞানের আমি একজন স্নাতক।

আমার বাংলোটা ছিল বেশ বড়। সেখান থেকে মাইলখানেক দূরে কুলি-কামিনদের বস্তি। বাড়ির কাজকর্মের জন্য এক পাহাড়ি ছোকরাকে আমি রেখে দিয়েছিলাম। সে জুতো পালিশ থেকে রান্না-বান্না সবই করত, চৌকস ছেলে।

আমার বাংলোর কাছাকাছি আর কোনো বাড়ি ছিল না, শুধু একটা পোড়োবাড়ি ছাড়া। পোড়োবাড়ি বলছি এইজন্য যে, বাড়িটার চুন-পলস্তারা খসে পড়ে ইটগুলো যেন দাঁত বার করা, কার্নিশের এখানে-ওখানে বট-অশ্বত্থের চারা। বাড়িটা দোতলা, আমার কোয়ার্টারের মতো বাংলো ধাঁচের নয়। দরজা-জানালা সব সময় বন্ধ থাকত। বাড়িতে যে কেউ বাস করে না তা বলে দিতে হয় না।

চারদিকে সবুজ আর সবুজ। কলকাতা থেকে এসে জায়গাটাকে আমার খুব ভালো লেগে গেল। কয়েকটা ঘটনায় আমার শক্তি আর সাহসের পরিচয় পেয়ে কুলি-কামিনরা আমাকে বেশ সমীহ করে চলছিল। বেশ ভালোই কাটছিল দিনগুলো। রাত্রে ময়দার রুটি আর হাঁস, মুর্গি কিংবা হরিণের মাংস—খাসা রান্না করত ছেলেটা।

প্রায় এক মাস কেটে গেল। সেদিন ছিল পূর্ণিমার রাত। চা-বাগানের আকাশে পূর্ণিমার চাঁদের রূপই আলাদা। বড় বড় আকাশছোঁয়া বাড়ি নেই, শুধু বাগান আর বাগান। তাই চাঁদের আলো এমন ছড়িয়ে পড়ে যে তার রূপালি সুধায় মনের মধ্যে একটা মাদকতার সৃষ্টি না হয়ে পারে না।

চা-বাগানে সন্ধের পরেই রাত নামে। কুলিদের বস্তিতে বেশি রাত পর্যন্ত হৈ-হুল্লোড় চললেও আমার বাংলোর চৌহদ্দির মধ্যে জন-মনিষ্যির সাড়া পাওয়া যেত না। নিস্তব্ধ, নিঃঝুম পরিবেশ। রাত আটটার মধ্যেই আমি শুয়ে পড়তাম। সারাদিনের খাটা-খাটুনির পর গাঢ় ঘুমে ডুবে যেতাম।

সেদিন হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। বাইরে থেকে কার যেন হাসি ভেসে আসছে। আমি অবাক হলাম।

এত রাত্রে কে হাসে! এখানে লোকজন নেই, তাছাড়া এ জায়গাটা চা-বাগানের সম্পত্তি, বিনা অনুমতিতে বাইরের লোকের এখানে আসা নিষেধ। আমি বিছানা ছেড়ে উঠলাম। টর্চটা হাতে নিয়ে বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। বাইরে চাঁদের আলোর যেন বন্যা বয়ে যাচ্ছে। তখুনি আবার সেই হাসিটা ভেসে এল।

কে? কে? আমি বারান্দা থেকে নেমে পড়লাম। চারদিকে খুঁজলাম কিন্তু কাউকে দেখতে পেলাম না। হাসিটা যেমন হঠাৎ শুরু হয়েছিল তেমন হঠাৎই বন্ধ হয়ে গেল। আমি চিন্তিত মনে ঘরে ফিরে গেলাম। ঘড়িতে দেখলাম সোয়া দশ।

পরদিন আমার কাজের ছেলেটাকে জিগ্যেস করলাম রাত্রে সে কারও হাসি শুনেছে কিনা। সে বলল, শোনেনি। আমি ভাবলাম কুলি-মজুরদের কেউ হয়তো নেশা করে কাছাকাছি কোথাও এসেছিল, তার হাসিই শুনেছি। ব্যাপারটা আমি মন থেকে মুছে ফেললাম।

আমার কাজকর্মে মালিকপক্ষ খুব খুশি; একটা চিঠিতে সে কথা জানাতে তাঁরা কার্পণ্য করলেন না। আমার ভবিষ্যৎ যে উজ্জ্বল সেটা বুঝতে আমারও বাকি রইল না।

আরও একমাস কেটে গেল, আবার এল পূর্ণিমা। সেদিন রাত্রেও আমার ঘুম ভেঙে গেল। বিছানায় শুয়ে শুনতে পেলাম সেই হাসির শব্দ। বিকট সে হাসি। প্রকৃতিস্থ মানুষের যে নয় তা বুঝতে কষ্ট হয় না। সাধারণ কেউ হলে হয়তো ভয়ে সিঁটিয়ে যেত কিন্তু আমি ছিলাম অন্য ধাতুতে গড়া। ঘড়িতে দেখলাম রাত দশটা। একটা মোটা লাঠি আর টর্চ নিয়ে আমি বেরিয়ে পড়লাম। কিন্তু কাউকে খুঁজে পেলাম না। আগের বারের মতো এবারও হাসিটা হঠাৎই বন্ধ হয়ে গেল। ব্যাপারটার কোনো ব্যাখ্যাই আমার মাথায় এল না, শুধু বুঝলাম পূর্ণিমায় রাত ছাড়া ওই হাসি শোনা যায় না।

পরদিন ছোকরাকে জিগ্যেস করে জানলাম সে কোনো হাসির শব্দ শোনেনি। আমার কথার জবাব দেবার সময় সে অদ্ভুতভাবে আমার মুখের দিকে তাকাচ্ছিল। বুঝতে পারলাম ও মনে করছে আমার মাথায় কিছু গণ্ডগোল হয়েছে, তাই ওকে আর ঘাঁটালাম না।

পরের পূর্ণিমার রাতেও সেই একই ঘটনা ঘটল। এবার আমি কান চেপে শুয়ে রইলাম। আর কেউ ওই বিদকুটে হাসি শুনতে পায় না কেন তা আমার বোধগম্য হল না। একবার মনে হল আমি কি স্নায়বিক পীড়ায় ভুগছি! কিন্তু সে চিন্তা আমি মন থেকে উড়িয়ে দিলাম।

পরের পূর্ণিমায় আমি আর শুয়ে থাকতে পারলাম না। হাসির রহস্যটা আমাকে জানতেই হবে নইলে আমি হয়তো পাগল হয়ে যাব। সেদিন রাতে ইচ্ছে করেই আমি জেগেছিলাম, তাই হাসি শুরু হতে বিছানা ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম। হাসির শব্দটা যেদিক থেকে আসছিল সেদিক লক্ষ করে আমি ছুটলাম। হাসিটা হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। ততক্ষণে আমি পৌঁছে গেছি সেই পোড়োবাড়িটার কাছে। এবার বুঝতে পারলাম হাসিটা আসে ওই বাড়ি থেকে। কিন্তু ওটা পরিত্যক্ত, কেউ থাকে বলে শুনিনি, কাউকে চোখেও পড়েনি। তবে কি রাতে দুষ্টু লোকেরা ওখানে এসে জড়ো হয়! চোরাই কারবারীদের একটা গোপন আড্ডা!

বাড়ির সব দরজা-জানালা বন্ধ, সদর দরজায় বড় এক তালা, ভেতর থেকে ক্ষীণ আলোর রেখাও চোখে পড়ছে না। আমি কি করব মনস্থির করতে না পেরে ফিরে এলাম।

পরদিন আপিসে একজন পুরোনো কর্মচারীকে জিগ্যেস করলাম ওই বাড়িটা সম্বন্ধে কিছু জানেন কি না। তিনি এক চমকপ্রদ ঘটনা শোনালেন। বছর চল্লিশ আগে ওই বাড়িতে দুই ভাই থাকত। তাদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায়নি, লোকজনের সঙ্গে মেলামেশাও তারা করত না। ওই বাড়িটা ছিল টি-এস্টেটের মালিকানার বাইরে। শোনা যায় ছোট ভাই নাকি ছিল বদ্ধ উন্মাদ, তাকে দোতলার একটা ঘরে শেকল বেঁধে রাখা হত। তাকে দেখাশোনার জন্য একজন লোক ছিল। সেই উন্মাদ ভাই মাঝে মাঝে হিংস্র হয়ে উঠত, বিশেষ করে পূর্ণিমার রাতে বেড়ে যেত তার পাগলামি, তখন তাকে চাবুক মারতে হত। চাবুক খেত আর অট্টহাসি হাসত সেই ভাই,

ভয়ঙ্কর ছিল সেই হাসি। ওই ভাইয়ের জন্যই নাকি দাদা লোকালয় ছেড়ে এই নির্জন অঞ্চলে বাসা নিয়েছিল। তারপর একদিন পূর্ণিমার রাত্রে সেই উন্মাদ ভাই তাকে যে দেখাশোনা করত তাকে আক্রমণ করে, সে তখন ঘুমিয়েছিল। আচমকা আক্রমণে সে প্রথমে কাবু হয়ে পড়েছিল কিন্তু সেও ছিল খুব বলিষ্ঠ। সেদিন রাত্রে আবার দাদা ওখানে ছিল না, দরকারি কাজে শহরে গিয়েছিল। পাগল সেই লোকটির গলা চেপে ধরেছিল, আত্মরক্ষার জন্য সেও পাগলের গলা চেপে ধরে। পরদিন সকালে দাদা ফিরে এসে দেখে দুজন দুজনের গলা টিপে মাটিতে পড়ে আছে, দুজনেই মৃত। তারপর থেকেই বাড়িটা ওভাবে পড়ে আছে। দাদা সেই যে চলে গিয়েছিল আর ফিরে আসেনি। এই হল বাড়ির ইতিহাস।

পরের পূর্ণিমায় আমি শহরের এক চা-ব্যবসায়ীকে নেমন্তন্ন করলাম। রাত্রে খাওয়া-দাওয়া করবেন, থাকবেন। খানাপিনার আয়োজনটা আমি ভালোই করেছিলাম। ইচ্ছে করেই সেদিন দেরিতে খেতে বসলাম। খেতে খেতে গল্প করছিলাম। ভদ্রলোক গুজরাতি। কেমন করে কপর্দকহীন অবস্থা থেকে বিরাট ব্যবসার মালিক হয়েছেন সেই গল্প করছিলেন। আমি তাঁর কথা শুনছিলাম আর হাতঘড়ির দিকে তাকাচ্ছিলাম। মনে মনে একটা উত্তেজনা অনুভব না করে পারছিলাম না।

ঠিক দশটার সময় ভেসে এল সেই বিকট হাসি। আমি গুজরাতি ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকালাম। তিনি কিন্তু নির্বিকার, খাচ্ছেন আর তাঁর জীবনী বলে যাচ্ছেন।

আমি একটু উত্তেজিত হয়েই বললাম, শুনতে পাচ্ছেন?

কি? ভদ্রলোক অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকালেন।

একটা হাসি!

হাসি! কার হাসি! ভদ্রলোক এদিক-ওদিক তাকালেন, কই, আমি তো কারও হাসি শুনতে পাচ্ছি না।

একটু কান পেতে শুনুন, আমি অসহিষ্ণু গলায় বললাম, আমি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি।

ভদ্রলোক ভুরু কুঁচকে মনঃসংযোগ করার চেষ্টা করলেন, তারপর ঘাড় নেড়ে বললেন, আপনি বোধহয় ভুল শুনেছেন, কেউ হাসেনি, আপনার মনের ভুল।

ভুল শুনেছি! আমার এবার ধৈর্যচ্যুতি ঘটল, প্রায় চিৎকার করে বললাম, প্রত্যেক পূর্ণিমার রাত্রে আমি এই হাসি শুনছি আর আপনি বলছেন আমার মনের ভুল!

ভদ্রলোক কেমন অদ্ভুত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। আমি বুঝতে পারলাম তিনি আমার মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে পড়েছেন, চোখে-মুখে ভয়ের চিহ্নও ফুটে উঠেছে। বোধহয় ভাবছেন পাগলের পাল্লায় পড়েছেন।

আমি অতি কষ্টে নিজেকে সংযত করে ভদ্রলোকের কাছে ক্ষমা চাইলাম। বাকি সময়টুকু আমরা চুপচাপ খেলাম। পরদিন সকালেই ভদ্রলোক বিদায় নিলেন, মনে হল তিনি যেন পালিয়ে বাঁচলেন। জানি না ওই ভদ্রলোকের জন্যই কিনা, এ কথাটা চাউর হয়ে গেল যে আমার মাথায় গণ্ডগোল দেখা দিয়েছে। হেড আপিস থেকেও এ ব্যাপারে একজন খোঁজ-খবর করতে এলেন। তিনি অবিশ্যি আমার আচরণে অস্বাভাবিক কিছু দেখলেন না, ফলে চাকরিটা রয়ে গেল। একটা কথা কিন্তু আমার কাছে পরিষ্কার হল, আমি ছাড়া আর কেউ ওই হাসি শুনতে পায় না।

পরের পূর্ণিমায় আমি ঠিক করলাম একটা হেস্তনেস্ত করতেই হবে। সেই রাতে আমি প্রস্তুত হয়েই ছিলাম, হাসি শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে ওই বাড়ির দিকে দৌড়লাম। আমার বাঁ-হাতে পাঁচ ব্যাটারির একটা বড় টর্চ আর ডান হাতে রিভলভার।

বাড়িটার সামনে আসতেই হাসি থেমে গেল। আমি এক মুহূর্ত বোধহয় ইতস্তত করেছিলাম তারপর সদর দরজায় এক লাথি মারলাম। পুরোনো দরজা আর আমার প্রচণ্ড পদাঘাতে, দরজার একটা পাল্লা ভেঙে গেল। আমি ভেতরে ঢুকলাম। চারদিকে টর্চের আলো ফেলতে

লাগলাম। বহুদিন অব্যবহৃত হয়ে পড়ে থাকায় ধুলোর স্তর জমেছে মেঝের ওপর, কোনাগুলি থেকে কালো কালো ঝুল ঝুলছে। দীর্ঘকাল পরে ঘরে বাতাস ঢোকায় টর্চের আলোয় অসংখ্য ধূলিকণা উড়তে দেখলাম। তারপরই হঠাৎ দোতলার একটা ঘর থেকে কেউ যেন হেসে উঠল—যেন আমাকে ব্যঙ্গ করে হাসল।

আগেই বলেছি আমার ছিল দুর্জয় সাহস। এতটুকু দ্বিধা না করে আমি লাফ দিয়ে দু'তিনটা সিঁড়ি টপকে দোতলায় উঠলাম, তারপর যে ঘর থেকে হাসির শব্দ এসেছিল সেই ঘরের বন্ধ দরজায় এক লাথি মারলাম। দরজাটা ভেজানো ছিল, দড়াম করে খুলে গেল। আমি টর্চ জ্বালিয়ে আর রিভলভার উঁচিয়ে ঘরে ঢুকে পড়লাম। সমস্ত ব্যাপারটা যদি কোনো দুষ্টু লোক বা দলের চক্রান্ত হয়, মানুষকে ভয় দেখিয়ে ওই বাড়ি থেকে দূরে সরিয়ে রাখাই হয়ে থাকে তাদের আসল মতলব, তবে তা আমি ভেঙে দেব এই ছিল আমার সঙ্কল্প।

কিন্তু ঘরে ঢুকে আমি তাজ্জব বনে গেলাম। ঘরে কেউ নেই—এমনকি একটা আসবাব পর্যন্ত নেই। ফাঁকা, শূন্য ঘর। আমি চারদিকে টর্চের আলো বুলোচ্ছিলাম, হঠাৎ একটা অশরীরী অনুভূতিতে আমার সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠল। মনে হতে লাগল কে বা কারা আমার প্রতিটি নড়া-চড়া লক্ষ করছে। আমি কাউকে দেখতে পাচ্ছি না অথচ অদৃশ্য কারও উপস্থিতি অনুভব করছি। সে যে কি ভয়ঙ্কর অনুভূতি তা আপনাকে বলে বোঝাতে পারব না।

বীরেশ্বরবাবু একটু থেমে টেবিল থেকে জলের গেলাসটা তুলে এক ঢোঁক জল খেলেন, তারপর গেলাসটা নামিয়ে রেখে আবার বলতে লাগলেন, বোধহয় দু-তিন সেকেন্ড আমি ওই ঘরে ছিলাম কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল যেন সময়ের আর শেষ নেই। তারপরই আমি ছিটকে ঘর থেকে বেরিয়ে দুদ্দাড় সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলাম আর তখুনি আবার শুরু হল সেই হাসি—শরীরের রক্ত হিম করা বীভৎস হাসি। আমার মতো সাহসী পুরুষেরও শিরদাঁড়া বেয়ে যেন বরফগলা জলের ধারা নেমে এল। কোনোরকমে বাড়িতে এসে শুয়ে পড়লাম, সারা রাত ঘুমুতে পারলাম না।

এরপর প্রত্যেক পূর্ণিমার রাত্রে ওই হাসি আমাকে যেন চুম্বকের মতো আকর্ষণ করত আর আমি দু'কান চেপে বিছানায় ছটফট করতাম। ক্রমে আমার শরীর ভাঙতে শুরু করল, হয়তো চোখে-মুখেও এমন কিছু ফুটে উঠত যার জন্য সবাই আমার দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাত, আমার সম্বন্ধে আড়ালে ফিসফাস করত।

এক বছর কোনোরকমে সেই ভয়াবহ নরক যন্ত্রণা সহ্য করেও আমি টিকে ছিলাম কিন্তু আর পারলাম না, চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে এখানে চলে এলাম, একটা চাকরি জুটিয়ে নিলাম, সেই থেকে এখানে আছি।

কিন্তু আপনি কলকাতায় ফিরে গেলেন না কেন? আমি জিগ্যেস করলাম, আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে থাকলে আপনার শরীর ও মন দুই-ই ভালো হত।

সেখানেই তো মুশকিল, বীরেশ্বরবাবু ম্লান হাসলেন, আমার আত্মীয়-স্বজনরাও যদি আমাকে পাগল ভাবে সেটা আমি সইতে পারব না।

কিন্তু তাঁরা কেন তা ভাববেন! আমি অবাক হয়েই বললাম, আর তো আপনি সেই হাসি শুনছেন না। ওখান থেকে আপনি চলে এসেছেন।

সেটাই তো হচ্ছে কথা, ভদ্রলোক বললেন, এখানে এসেও আমি সেই হাসির হাত থেকে নিস্তার পাইনি। পূর্ণিমার রাত দশটায় এখানে বসেও সে হাসি আমি শুনতে পাই। পৃথিবীর যেখানেই আমি যাই না কেন, ওই হাসি আমাকে মুক্তি দেবে না।

সেকি! আমি স্তম্ভিতের মতো বললাম।

ভদ্রলোক জানালার দিকে মুখ করে বসেছিলেন, হঠাৎ বলে উঠলেন, ওই দেখুন...পেছন ফিরে আকাশের দিকে দেখুন....

আমি ফিরে দেখলাম আকাশে ঝলমল করছে রুপোলি থালার মতো কোজাগরী পূর্ণিমার চাঁদ। তারপরই ভদ্রলোকের ব্যাকুল কণ্ঠে আমি তাঁর মুখের দিকে ফিরে তাকালাম। তাঁর মুখটা ছাইয়ের মতো সাদা হয়ে গেছে, কোটর থেকে চোখ দুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। তিনি আর্ত কণ্ঠে বললেন, শুনতে পাচ্ছেন...শুনতে পাচ্ছেন সেই হাসি! তিনি দু'হাত দিয়ে দু'কান চেপে ধরলেন।

আমি হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম রাত দশটা।

শান্ত হোন, আমি বললাম, আমার মনে হয় আপনি কোনো সাইকিয়াট্রিস্টকে দেখালে ভালো হয়ে যাবেন, এটা আপনার মনের রোগে দাঁড়িয়েছে।

ভদ্রলোক আমার দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকালেন তারপর বললেন, আপনিও বোধহয় আমাকে পাগল ভাবছেন...কিন্তু আমি এই ঘটনার কি ব্যাখ্যা করেছি জানেন?

কি? আমি জানতে চাইলাম।

বীরেশ্বরবাবুর দু'চোখে ফুটে উঠল কেমন একটা ঘোলাটে দৃষ্টি, তিনি বললেন, ওই ঘটনার সময় আমার জন্মই হয়নি। আমার নিশ্চিত ধারণা আগের জন্মে আমিই ছিলাম সেই পাগল...

হোটেলের ছোকরা এসে আমাদের সামনে দু'থালা ভাত নামিয়ে দিয়ে গেল। গরম ভাত, ধোঁয়া উঠছে।

আশ্বিন ১৪০১

মর্গান সাহেবের বাগান

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

কি আশ্চর্য!

শোবার আগে বিছানায় বসে ঢক ঢক করে এক গেলাস জল খেয়ে বালিশে মাথা। সঙ্গে সঙ্গে গভীর ঘুম। শেষ রাতে সুন্দর একটা স্বপ্ন। ঠিক পাঁচটায় চোখ মেলে তাকানো। জানলায় লেগে আছে ভোর। প্রথম পাখির ডাক। রোজ, রোজ, এই আমার অভ্যাস।

কিন্তু, কি আশ্চর্য!

কাল আমি গেলাসটা মাথার কাছের ছোট্ট টেবিলটায় রেখেছিলুম, সেটা পুবের জানলার প্যারাপেটে চলে গেল কি করে! ঘরের দরজা বন্ধ। টেবিল থেকে জানলার দূরত্ব অবশ্যই ষোল ফুট। কি জানি বাবা! ভোরের আলোয় পাতলা কাচের গেলাসটায় অদ্ভুত একটা গোলাপী রঙের আভা।

বিছানা থেকে নেমে দরজাটা পরীক্ষা করলুম। না, ছিটকিনি ভেতর থেকে বন্ধ। আমি না খুলে দিলে ভেতরে কারো আসার সাধ্যি নেই। এইবার গেলাসটার কাছে গেলুম। তলায় মিহি সাদা গুঁড়োর মতো কি সব পড়ে আছে। পরিষ্কার কলের জল খেয়েছিলুম। খাওয়ার আগে অভ্যাস মতো আলোর দিকে তুলে দেখে নিয়েছিলুম। পরিষ্কার জল। কিচ্ছু ছিল না। গেলাসটা যেখানে আছে থাক। হাত দিতে সাহস হচ্ছে না। বরং মনোজকে ডাকি।

মনোজ আমার শাগরেদ। বয়েস কম, কিন্তু তুখোড় ছেলে। মনোজ আমার সঙ্গে থাকলে, আই ডোন্ট কেয়ার। দরজা খুলে বাইরের দালানে বেরিয়ে অবাক। অজস্র তুলো, রাশি রাশি তুলো ভোরের বাতাসে মেঝেতে ওড়াউড়ি করছে। কাল খুব গরম ছিল। মনোজ গাড়িবারান্দার ছাতে শুয়েছিল। সেই দিকে যেতে যেতে ভাবছি, নিশ্চয় বিরাট বিরাট গেছো ইঁদুর আছে, এসব তাদেরই কাজ। দুটো ইঁদুরে গেলাসটাকে জানলার কাছে বয়ে নিয়ে গেছে। ইঁদুরের অসাধ্য কিছু নেই।

মনোজ একটা মাদুরে থান ইট মাথায় দিয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। কাণ্ড দেখ ছেলের! বালিশ কি ছিল না! ধাক্কাধাক্কি করে তুললুম। মনোজ অবাক। বালিশে মাথা দিয়েই শুয়েছিল। থান ইট এল কোথা থেকে! তার মানে, কেউ বালিশটা টেনে নিয়ে মাথার তলায় ইট গুঁজে দিয়েছে। বালিশটাকে ছিঁড়ে ফর্দাফাঁই করে সব তুলো দালানে ছড়িয়ে দিয়েছে।

কে? কে সেই শয়তান!

এই অদ্ভুত সুন্দর বাগানবাড়িটা আমার বাবা কিনেছেন। একপাশে ইছামতী নদী। দূরে রেলব্রিজ। এদিকে পাশাপাশি আরো কয়েকটা বাগানবাড়ি। প্রায় সারা বছর বন্ধই পড়ে থাকে। মালিকরা সব ইউরোপ, আমেরিকায়। ওপাশে বিরাট এক শিবমন্দির। মন্দির চূড়ায় রুপোর ধ্বজা বাতাসে ঘুরপাক খায়। অসাধারণ জায়গা।

কাল গৃহপ্রবেশ হয়ে গেল। নিয়ম অনুযায়ী তিন রাত কাটাতে হয়। আমি আর মনোজ এই তিন দিন থাকব। প্রথম রাতের অভিজ্ঞতা তো এই। কোনো মাথামুণ্ডু নেই। ভয় পেলে পাওয়া যায়, কিন্তু কেন পাব! বদমাইশ লোকের কাজ হলে, আজ রাতে তার বরাতে পেটাই। ভূত হলে, আমরা দুজনেই ভূত বিশ্বাস করি না। বিজ্ঞান আর ভূত একসঙ্গে থাকতে পারে না, যেমন, আলো আর অন্ধকার!

মনোজ বললে, 'চা খেলে সব ঠিক হয়ে যাবে।'

কালই আমরা দেখেছি, শিবমন্দিরের কাছে ভালো একটা দোকান আছে।

সকালে দারুণ আকর্ষণীয় গরম জিলিপি করে, আর লোভনীয় পাঞ্জাবি চা। আমাদের সঙ্গে নতুন একটা মটোর সাইকেল আছে। মনোজ বললে, 'চাবিটা দাও।'

মনোজ চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে নীচে থেকে চিৎকার, 'এ কি গো এক ফোঁটা তেল নেই! তেল কোথায় গেল?'

গাড়িটা তালাবন্ধ গ্যারেজে ছিল। কাল বিকেলে আমরা ফুলট্যাঙ্ক তেল ভরেছি। চলেছে মাত্র সাত কিলোমিটার। এইবার মনোজই বললে, 'ভৌতিক ব্যাপার। এ ছাড়া আর কোনো ব্যাখ্যা নেই। তোমার বিজ্ঞান ফেল মেরে যাবে।'

আমরা হাঁটতে হাঁটতে শিবমন্দিরের দিকেই চললুম। বাঙালির ছেলে, সকালে চা না খেলে দিন শুরু করা যায়! মন্দিরের পাশ দিয়ে বইছে ইছামতী। ভারী সুন্দর। এই সব বিচ্ছিরি ব্যাপার না ঘটলে, এমন সুন্দর জায়গায়, এই সুন্দর সকালে আমি আর মনোজ দুজনে গলা মিলিয়ে রবীন্দ্রনাথের গান গাইতুম। গতবার দুর্গাপুজোর ফাংশানে আমরা দুজনে গান গেয়ে দুটো ওয়াটার বট্‌ল পুরস্কার পেয়েছিলুম। সেই বট্‌ল দুটো আমরা এখানে এনেছি।

মন্দিরে প্রণাম করে, প্রচুর জিলিপি আর চা খেয়ে ঠিক করলুম একেবারে বাজার করে ফিরব। দোকান থেকে একটা ব্যাগ কিনে, যাবতীয় বাজার করে, আবার এক গেলাস করে চা খেয়ে আমরা বাগানে ফিরে এসে হতভম্ব। বিশাল গেটে বিরাট একটা মরচে ধরা তালা লাগানো। দেখলেই মনে হয় তালাটা কমসে কম শ'খানেক বছরের পুরোনো।

হাতে বাজারের ব্যাগ। ভেতরে সব জিনিসপত্র আমাদের। বিশাল পাঁচিল ঘেরা এই বাগান। বাইরে থেকে বাড়িটা চোখে পড়ার উপায় নেই। মনোজ বললে, 'এই বদমাইশিটা আমাদের সঙ্গে কে করলে? নিশ্চয় তৃতীয় আর একজন কেউ আছে!'

আমি বললুম, 'ছিল। সারারাত ঘাপটি মেরে ছিল, এখন আর নেই। তালা ঝুলিয়ে দিয়ে চলে গেছে।'

মনোজ বললে, 'আমি পাঁচিল টপকে ভেতরে নামছি।'

'পড়ে গিয়ে হাত-পা ভাঙবি! ভেতরে পড়লে আমি তোকে বার করব কি করে? পাঁচিলটা কত উঁচু দেখেছিস?'

'তাহলে সারাদিন হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকি!'

ভয়ঙ্কর কাশতে কাশতে সাইকেলে চেপে মধ্যবয়সী এক ভদ্রলোক আসছেন। খুব ধীর গতিতে সাইকেল চালাচ্ছেন। আমাদের বোকার মতো দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে, তিনি নেমে পড়লেন। আমরা কিছু বলার আগেই বললেন, 'কি তালা?'

আশ্চর্য হয়ে বললুম, 'হ্যাঁ তালা! আপনি কি করে জানলেন?'

'এই অঞ্চলের সবাই জানে ভাই। মর্গান সাহেবের তালা। ভালো করে দেখ, তালার গায়ে লেখা আছে, চাবস, মেড ইন ইংল্যান্ড, নাইনটিন হান্ড্রেড ওয়ান।'

'ও তো মরচে ধরা ভূতুড়ে তালা!'

'অ্যায়, এই যে শব্দটি বললে ভূতুড়ে, ওইটাই ঠিক। শ্যামবাবুকে...'

'শ্যামবাবু তো আমার বাবার নাম, আপনি চেনেন?'

'তাঁকে কে না চেনে, অত বড় উকিল! শ্যামবাবুকে জেলা আদালতের আমরা সবাই বারণ করেছিলুম। শুনলেন না। বড্ড কড়া ধাতের মানুষ। তোমরা শোনো। মর্গান সায়েবের বাবা ছিলেন নীল কুঠিয়াল। জানো নিশ্চয়, ঊনবিংশ শতাব্দীর সায়েবরা নীলের চাষ করত। মর্গান একটা চটকল করেছিল আরো অনেক সায়েবকে নিয়ে। মর্গান প্রথম বিশ্বযুদ্ধে লড়াই করেছিল। বীর। মর্গানের

বউটার চরিত্র ছিল ব্যাড। ভেরি ব্যাড। একদিন রাত্তিরে ফিকে গোলাপী রঙের একটা গেলাসে মদের সঙ্গে সেঁকো বিষ খাইয়েছিল। বদমাইশ মেয়ে। এদের জ্যান্ত কবর দেওয়া উচিত। মেম যদি সুন্দরী হয়, জানবে ডেন্‌জারাস! আজ ডেন্‌জারাস অ্যাজ এ সারপেন্ট।'

ভদ্রলোক সাইকেলে উঠতে যাচ্ছেন, আমরা বললুম, 'এ কি, আপনি চলে যাচ্ছেন!'

'আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে বাবা! আমার ইস্কুল বসে গেছে। কাশীর জন্যে দেরি হয়ে গেল।'

'ওষুধ খাচ্ছেন?'

'ওষুধ খাব কেন?'

'এই যে বললেন কাশি!'

'আরে ধুর বাপু! কাশী আমার বড় ছেলের নাম। আমার তিন ছেলে, তিনটেই তীর্থ—কাশী, বৃন্দাবন, মথুরা।'

'তাহলে বলে যান আমরা কি করব!'

'কি আবার করবে! আর সবাই যা করেছে! এই তালা ভাঙার সাহস কারো নেই। বংশ নির্বংশ হয়ে যাবে। কে এক খেম্‌কা এই বাগানটা কিনেছিল। তারও এই এক অবস্থা। পয়সার গরমে নিজে লোহা ঢুকিয়ে তালা ভেঙেছিল। সব মরে গেল। তাদের বাড়ির বেড়ালটা পর্যন্ত ডেড।'

'ভাঙা তালাটা আবার এল কি করে!'

'বোকার মতো কোশ্চেন কোরো না। ভূত আর ভগবান, দুটো জগতেই সম্ভব-অসম্ভব বলে কিছু নেই। সবই সম্ভব। যাই হোক, তোমাদের খুব পছন্দ হয়েছে আমার, তাই তালা খোলার উপায়টা বলে যাই। ইছামতীর তীরে, এখান থেকে তিন মাইল দূরে একটা ভাঙা চিমনি দেখতে পাবে। অনেক দূর থেকেই দেখা যাবে। সেটা লক্ষ করে নদীর কূলে গিয়ে দেখবে গাছপালার মধ্যে নির্জন এক সমাধি। পাথরের গায়ে অস্পষ্ট লেখা, জেমস মর্গান। সেই সমাধিতে মোমবাতি দিয়ে, ফুল ছড়িয়ে, প্রার্থনা করবে ভক্তি ভরে—প্লিজ ওপ্‌ন দি লক। বলবে, আপনার বাগানে থাকার আর চেষ্টা করব না! মার্জনা চাইছি, মার্জনা। ফিরে এসে দেখবে, গেট ইজ ওপ্‌ন।'

ভদ্রলোক সাইকেলে উঠে একটু এগোতেই আমরা অবাক। কোথায় সেই ভদ্রলোক! সাইকেলের আরোহী শোলার হ্যাট পরা ধবধবে সাদা এক সাহেব। আরোহী সমেত সাইকেল নিমেষে অদৃশ্য।

মনোজ আবার সেই কথাটা বললে, 'ভৌতিক'।

আশ্বিন ১৪০৬

প্রেতাত্মার অট্টহাসি

অদ্রীশ বর্ধন

আপনি বিশ্বাস করেন? বললে ইন্দ্রনাথ।

শুনলে গায়ে কাঁটা দেবে আপনারও। ওরাই তো ছেলেটার মাথায় পাথর ফেলেছিল, দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন রামধন চক্রবর্তী।

ভদ্রলোক যেমন লম্বা, তেমনি রোগা। ফর্সা। চোখে সোনার চশমা। গায়ে আদ্দির পাঞ্জাবি আর ধুতি। শৌখিন পুরুষ। বয়স ষাটের উর্ধ্বে। গোটা মুখখানায় দাম্ভিকতা মাখানো। যেন, ধরাকে সরাজ্ঞান করছেন। ছোট ছোট দুই চোখ বেশ কুটিল। জগৎটাকে সোজাভাবে দেখতে অভ্যস্ত নন।

কথা হচ্ছে ইন্দ্রনাথের সুভাষ সরোবরের বাড়িতে। সকালের রোদ জানলা দিয়ে এসে পড়েছে বামধনবাবুর পিঠে। মাথা নেড়ে কথা বলার সময়ে পেছনের রোদ মাথার পাশ দিয়ে চশমার পুরু লেন্সে পড়ে ঝিলিক দিচ্ছে। কুটিল চোখ দুটোর ওপর যেন ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ ঝলসাচ্ছে।

রৌদ্র-ঝলকিত চোখ দুটোর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল ইন্দ্রনাথ। বললে, জায়গাটা পাহাড়-ঘেরা?

হ্যাঁ।

প্রেতাত্মার অট্টহাসি পাহাড়ে পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে দূরে মিলিয়ে যায়?

আকাশে উঠে যায়। কামান গর্জন শোনা যায়। ফটফট করে গাদা বন্দুক ছোঁড়ার আওয়াজ হয়।

আপনি বলছেন, সিপাইরা মরে গিয়েও মহড়া দিচ্ছে—লড়ছে ইংরেজদের সঙ্গে?

ওখানকার লোকেই বলে। সিপাই বিদ্রোহ খতম হয়ে যাওয়ার পর যারা পালিয়ে এসে লুকিয়েছিল পাহাড়ে, ইংরেজরা তাদের পিটিয়ে মেরে ফেলে। ভূত হয়ে তারা আজও—

হাসছে। শুনেছি। এই ভূতেরাই আপনার ছেলের মাথায় মস্ত পাথর ছুঁড়ে ফেলেছিল?

আজ্ঞে। মা-মরা একমাত্র ছেলে আমার। তাই বড় জেদি। নিশুতি রাতে বেরিয়েছিল প্রেতাত্মার খোঁজে। সারারাত বাড়ি ফেরেনি। সকালে ফিরে এল ওর ঘোড়া।

ঘোড়া চড়তে জানে আপনার ছেলে?

ভালোরকম। আমিও জানি। পুরুষোচিত সব খেলা ওকে আমি শিখিয়েছি। রাইফেল ছোঁড়া, ঘোড়া ছোটানো, সাঁতার। ছেলের চেহারাও সেইরকম। আমার মতন লম্বা তবে রোগা নয়। জান শক্ত বলেই আজও বেঁচে রয়েছে—মরে থাকারই সমান।

ঘোড়াই পথ চিনিয়ে নিয়ে গেল আপনাকে?

বড় প্রভুভক্ত ঘোড়া। পিঠে বন্দুক ঝুলছে, হ্যাভারস্যাক ঝুলছে, নেই শুধু আমার ছেলে আর দড়িদড়া। চেপে বসলাম পিঠে, টগবগিয়ে নিয়ে গেল ভীষণ ঘন জঙ্গলের মধ্যে। খোঁচা খোঁচা পাহাড় ঠেলে উঠেছে যেখানে, সেইখানে একটা পাহাড়ের তলায় পড়েছিল ছেলে।

ছেলেকে ঘোড়ায় তুলে যখন ফিরে আসছেন, তখন আবার প্রেতাত্মারা ব্যঙ্গের অট্টহাসি হেসেছিল?

দিনের বেলায়। গা ছমছম করে উঠেছিল আমার।

দড়িদড়া যা সঙ্গে নিয়ে গেছিল আপনার ছেলে?

ওই অবস্থায় দড়ির খোঁজ করা যায়? রামধনবাবু ঝলকিত চক্ষু যেন জ্বলে উঠল, একনজরে আশেপাশেও দেখিনি। মাটি কাঁপছে তখন থরথর করে।

মাটি কাঁপছে?

প্রেতাত্মারা যখন হাসে, মাটি পর্যন্ত কাঁপে। আমার তো পুরোনো বাড়ি, তার নড়বড়ে দরজা-জানলাও খটখট করে।

জেনে-শুনে অমন বাড়ি কিনলেন কেন?

সস্তায় পেলাম বলে। ইংরেজের অত্যাচারে যে-রাজা লুকিয়ে থাকবার জন্যে ওই বাড়ি বানিয়েছিলেন, তিনি হয়েছেন নির্বংশ। বন-জঙ্গলে প্রেতাত্মার অট্টহাসি শুনতে কে আর যাবে বলুন! তার ওপর যাযাবর জংলিদের অত্যাচার। ভয়ানক নৃশংস। শুনেছি, খিদে পেলে তারা মানুষের মাংসও কাঁচা খায়।

এরকম এক আদিবাসীর কথা আমিও শুনেছি। কখনও দেখিনি। আপনি দেখেছেন?

হ্যাঁ।

সিধে হয়ে বসল ইন্দ্রনাথ, বলেন কী! কোথায়?

আমার বাড়িতেই।

আপনার মাংস খেয়ে যায়নি?

কেন খাবে? ওদের দেবতা যে রয়েছে আমার বাগানে।

বলুন, বলুন, খুলে বলুন।

যে-রাজা এই বাড়ি বানিয়েছিলেন, তিনি ছিলেন মহা খলিফা। স্থানীয় আদিবাসীদের কব্জায় রাখবার জন্যে ওদের জঙ্গুলে দেবতার মতন দেখতে একটা পাথরের দেবতা বানিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন বাগানের মন্দিরে। ওদিককার পাঁচিলের ফটকও আলাদা। সোজা জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে, পুজো দিয়ে জঙ্গলেই ফিরে যায় নরখাদকরা। আমি বারান্দায় বসে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখেছি।

মন্দিরের দেবতাও দেখেছেন?

সে এক আশ্চর্য দেবতা, মশায়। চোখ কপালে তুলে যখন-তখন কাঁদে!

এতক্ষণে একটিপ নস্যি নিল ইন্দ্রনাথ। বললে, পাথরের, না, ধাতুর বিগ্রহ?

পাথরের।

দেখতে কি রকম?

অনেকটা শিবঠাকুরের মতন, আবক্ষ মূর্তি। একটা পাথরের বেদির ওপর বসানো। মাথায় জটার মধ্যে সাপ। গলা পেঁচিয়ে রয়েছে সাপ। ড্যাবা ড্যাবা চোখ দেখলে ভয় হয়।

যখন-তখন কাঁদে?

প্রেতাত্মাদের অট্টহাসি শেষ হলেই কাঁদে। দরজা-জানলা যখন খটখট করে, মাটি থরথর করে, তখন সে চোখ উল্টে কাঁদে। যাকে বলে শিবনেত্র হওয়া, ঠিক সেইরকম। ফোঁটা ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে গাল বেয়ে।

কেন কাঁদে, জানেন? বোকার মতন প্রশ্ন, কিছু মনে করবেন না।

সিপাইদের শোকে—যাদের নৃশংসভাবে খুন করেছিল ইংরেজরা।

কার কাছে শুনলেন?

আদিবাসীরাই অঙ্গভঙ্গি করে বলেছে। ওরা আমাকে মানে, আমার ছেলেকেও ভালোবাসে।

ছেলে আজও নার্সিংহোমে?

ক্যালকাটা হসপিট্যাল ফর নিউরো-ডিসঅ্যাবিলিটি-তে।

দু'বছর?

হ্যাঁ। 'কোমা' স্টেজে। জ্ঞান-ট্যান কিছু নেই, সবজির মতন বেঁচে থাকা।

আঙুল নাড়ছে তো?

গত মাস থেকে।

চোখ খুলেছে?

হ্যাঁ।

কথা বলছে?

না।

তবে আপনি আমার কাছে এসেছেন কেন?

রামধনবাবুর লম্বা শিরদাঁড়ায় বোধহয় কোনো দোষ আছে। কোমরের কাছ থেকে শিরদাঁড়া সামনে ঝুঁকিয়ে বসেন। ঘরেও ঢুকেছেন সেইভাবে—সামনে কোমর ঝুঁকিয়ে। হতে পারে এটা একটা দেমাকি স্টাইল।

বোধহয় তাই। ইন্দ্রনাথের সটাসট প্রশ্নটা শুনে তিনি শিরদাঁড়া সিধে করে ফেললেন। নতুন করে রোদ্দুর ঝিলিক মেরে গেল তাঁর পুরু লেন্সে। বললেন, এক কমপিউটার টেকনিশিয়ান ওই আঙুলটার সঙ্গে একটা 'বাজার' লাগিয়ে দিয়েছিল। চোখের সামনে রেখেছিল হরফ সঙ্কেত। সেই দেখে আঙুল ঠুকেছে আমার ছেলে।

মর্স কোড-এর মতন?

হ্যাঁ। একটা-একটা অক্ষর কমপিউটার মনিটরে ফুটে উঠেছে।

কি জানিয়েছে সবশেষে?

মোগল-মোহর...মোগল-মোহর।

রামধনবাবু চুপ করলেন। ইন্দ্রনাথ আবার নস্যি নিল। বললে, বুঝেছি। পাথরটা প্রেতাত্মা ছোঁড়েনি এইরকম এক ধারণা আপনার মাথায় এসেছে?

ঠিক তাই।

মোগল আমলের মোহরের সন্ধান পেয়েছিল আপনার ছেলে, তাই কেউ তাকে পিটিয়ে মারতে চেয়েছিল?

হ্যাঁ।

আপনার আদিবাসী প্রতিবেশীদের জিগ্যেস করেছিলেন?

আমার ছেলেকে ওরা ভালোবাসে। এ কাজ ওদের নয়। মোহরের লোভও ওদের নেই।

ছেলে আর কিছু জানিয়েছে?

না। ওইটুকু জানাতেই অনেক এনার্জি খরচ করে ফেলেছিল, আবার 'কোমা'র স্টেজে চলে গেছে। মরে আছে কি বেঁচে আছে বোঝাই মুশকিল।

চলুন।

কোথায়?

আপনার বাড়ি?

পাহাড়-বন-বাড়ি কাঁপিয়ে প্রেতাত্মার অট্টহাসির অট্ট-অট্ট রোল বিষম শোরগোল সৃষ্টি করে মিলিয়ে গেল দূর হতে দূরে। চওড়া বারান্দায় নিঃসীম অন্ধকারে বসে সেই শব্দ শুনল ইন্দ্রনাথ। একটু পরেই পুরোনো প্রাসাদের নড়বড়ে দরজা-জানলা নড়ে উঠল খটখট শব্দে। অতিকায় প্রেত যেন গোটা বাড়িটাকে ধরে ঝাঁকাচ্ছে।

শুনলেন? অন্ধকারে ধ্বনিত হল রামধন চক্রবর্তীর ভয়লেশহীন কণ্ঠস্বর।

এ সবই আপনার গা-সওয়া হয়ে গেছে দেখছি।

তা হয়েছে। আপনি ভয় পেয়েছেন?

অন্ধকারেই শোনা গেল ইন্দ্রনাথের অস্ফুট হাসি, মজা পেয়েছি। আপনার অনুগত প্রজারা কি এখন দেবদর্শনে আসে?

আদিবাসীরা? না।

উঠুন।

কোথায় যাবেন?

বিগ্রহ দর্শনে।

বাগান তো নয়, জঙ্গল। টর্চের আলোয় পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলেন রামধনবাবু। দেমাকি স্টাইলে তিনি এখন হাঁটছেন শিরদাঁড়া সামনে ঝুঁকিয়ে। দেউলের সামনে এসে টর্চ ঘুরিয়ে দেখালেন। বললেন, শিবমন্দির বলে মনে হচ্ছে না?

ইন্দ্রনাথ বললে, ভেতরে চলুন।

পাথর-বাঁধাই চত্বর পেরিয়ে, নিচু খিলেনের তলা দিয়ে, রামধনবাবুর পেছন পেছন বিগ্রহের সামনে গিয়ে দাঁড়াল ইন্দ্রনাথ।

আবক্ষ শিবমূর্তি। জংলিদের হাতে বিকট চেহারা নিয়েছে। যে বেদিতে বসানো, সেটা লম্বায়-চওড়ায় প্রায় দশ ফুট—চতুষ্কোণ। পাথর দিয়ে তৈরি।

রামধনবাবু সটান টর্চ মেরেছিলেন বিগ্রহের চোখের ওপর। বললেন, দেখেছেন?

দেখছি।

বিগ্রহের ড্যাবা ড্যাবা চোখের মণি একটু একটু করে ওপরে উঠে যাচ্ছে...একেবারেই উঠে গেল... চোখের সাদা অংশ ছাড়া কিছু দেখা যাচ্ছে না...

লাফিয়ে বেদির ওপর উঠে পড়ল ইন্দ্রনাথ, পকেট থেকে বের করল কম্পাস। ছুঁচলো মুখ দুটো দিয়ে চোখের সাদা অংশ মেপে বললে, প্রায় আধ ইঞ্চি।

গুরুগম্ভীর গলায় পেছন থেকে রামধনবাবু বললেন, কাজটা ভালো করলেন না। পবিত্র বেদিতে পা দিয়েছেন, আদিবাসীরা যদি জানতে পারে—

চোখের তারা নামছে, বললে ইন্দ্রনাথ।

টর্চের জোরালো ফোকাসে দেখা গেল সেই অভাবনীয় দৃশ্য। আস্তে আস্তে কালো পাথরের মনিকা নামছে নীচে। আধ ইঞ্চিটাক সাদা অংশ মিলিয়ে যাচ্ছে একটু একটু করে। এক ফোঁটা করে জল উপচে পড়ল প্রতি চোখে। গড়িয়ে নেমে এল পাথরের গাল বেয়ে।

আবেগহীন গলায় বললেন রামধনবাবু, নিহত সিপাইদের শোকে আজও কেঁদে চলেছে পাথরের দেবতা।

সেই সঙ্গে বাতলে দিচ্ছে মোগল-মোহরের হদিস।

এই পাহাড়-জঙ্গলে নদী কোথাও নেই? অন্ধকার বারান্দায় ফিরে এসে বললে ইন্দ্রনাথ, কিন্তু একটা ঝর্না আছে?

পাহাড়ের গুহা থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে এসে, নীচে নেমে পাতালে ঢুকে গেছে। বললেন রামধনবাবু।

ফল্গু নদী হয়ে গেছে?

হ্যাঁ।

ঝর্নার জল পাহাড়ের গুহা থেকে বেরোচ্ছে? কোত্থেকে বেরোচ্ছে? নিশ্চয় আর একটা ফল্গু নদীর জল?

নিশ্চয়। এখানকার পাহাড়-জঙ্গল এমন কিছু উঁচু নয় যে সেখানকার জমা জল গড়িয়ে এসে নদী বানাবে।

ফল্গু নদী পাহাড়ের অত উঁচুতে উঠে তোড়ে গুহা দিয়ে বেরোচ্ছে কি করে, তা নিয়ে কিছু ভাবেননি?

না। কেন, ইন্দ্রনাথবাবু?

আপনার ছেলে ভেবেছিল। তাই মোগল-মোহরের সন্ধান পেয়েছিল। বিগ্রহের কান্না তার

মনে প্রশ্ন জাগিয়েছিল। বিজ্ঞান-জানা মন নিয়ে সে-প্রশ্নের সমাধানও করেছিল। রামধনবাবু, আপনার ছেলে একটি রত্ন।

অন্ধকারে শোনা গেল রামধন চক্রবর্তীর পাঁজর-খালি-করা নিশ্বাস। তালে তাল দিয়ে প্রেতাত্মারা অট্টহাসি হাসল ঠিক এই সময়ে। প্রাসাদের দরজা-জানলাও কাঁপল ঠকঠকিয়ে।

আওয়াজ-টাওয়াজ থেমে যেতেই ইন্দ্রনাথ বললে, বরিশাল কামান নির্ঘোষের ঘটনা জানেন?

সেটা আবার কী?

গোটা পৃথিবী জানে। যার নাম চালভাজা, তার নাম মুড়ি। বরিশাল কামান, মিস্টপোফার্স আর বাতাস-কম্প—একই জিনিস।

ব্যাখ্যা করুন।

অদ্ভুত বিস্ফোরণের শব্দ পৃথিবীর নানা জায়গায় শোনা যায় আজও। ভূমিকম্প বা বাজ পড়ার সঙ্গে সে-সব আওয়াজের কোনো সম্পর্ক আছে বলে মনে হয় না। ডিনামাইট আবিষ্কারের আগে, অথবা শব্দের চেয়ে বেশি স্পিডে এরোপ্লেন উড়ে গেলে বাতাস ফেটে পড়ার অনেক আগে থেকে এ-আওয়াজ শোনা গেছে। উত্তর সমুদ্রের নাবিকরা শুনেছে ঠিক যেন গুরুগুরু গুমগুম শব্দ গড়িয়ে যাচ্ছে দূর হতে দূরে। ওরা তার নাম দিয়েছিল মিস্টপোফার্স। ১৮৯৬ সালে বিলেতের 'নেচার' কাগজে বেরোল অবিশ্বাস্য সেই খবর—ধুবড়ির উত্তরে দিনে অথবা রাতে শোনা যাচ্ছে কামান দাগার অথবা বন্দুক ছোঁড়ার আওয়াজ। এই আওয়াজের নাম দেওয়া হয়েছিল 'বরিশাল কামান'। ১৯৩৪ সালে 'সায়েন্স' ম্যাগাজিনে বেরোলো 'সেনকা হ্রদ কামান রহস্য'। নির্ঘোষ শোনা যায় যেন সব দিক থেকেই। ইতালিতে এই শব্দকেই বলে 'ম্যারিনা' অথবা 'ব্রনটিডি', হাইতিয়ানরা বলে 'গুফরে'। কানেকটিকাট নদীর উপত্যকায় প্রথম যারা উপনিবেশ গড়েছিল, তারাও শুনেছিল এই আওয়াজ, ইংরেজ দেবতাদের ধমকাচ্ছে যেন রেড ইন্ডিয়ান উপদেবতা। ওখানে এই আওয়াজের নামকরণ হয়েছিল 'মুডাস'। বাড়ি কাঁপিয়ে ছাড়ত। রামধনবাবু, বুঝলেন কিছু?

না।

তার জন্যে লজ্জা পাবেন না। আপনার ছেলে নিশ্চয় বেলজিয়ান ভদ্রলোকের বৈজ্ঞানিক রিপোর্টটা পড়েছিল। আইসল্যান্ড থেকে বিস্কে উপসাগর পর্যন্ত যেখানে যত ভূতুড়ে আওয়াজ, সব কিছু নিয়ে ইনি গবেষণা করেন ১৮৯০-তে। যোগাযোগ করেন চার্লস ডারউইনের ছেলে স্যার জর্জ ডারউইনের সঙ্গে। ব্যাখ্যা দাঁড়িয়েছিল অনেকরকম।

যথা? এই প্রথম উৎসুক মনে হল রামধন চক্রবর্তীকে।

কেউ বলেছে, আবহমণ্ডলের বিদ্যুৎ সৃষ্টিছাড়া আওয়াজ ঘটাচ্ছে। কেউ বলেছিল, ভূগর্ভে গলিত লাভার সংঘাতের আওয়াজ বোমার মতন ফেটে পড়ছে বাইরে। কারও মতে, 'সুনামি' টাইডাল ওয়েভ অথবা সমুদ্রের পর্বতসমান ঢেউ সৈকতে আছড়ে পড়ায় বহুদূরে ভেসে যাচ্ছে কামান নির্ঘোষের মতন শব্দ। যেমন ঘটে ফিলিপাইনে। টাইফুন ঝড় আসবার অনেক আগে হাজার মাইল দূর থেকে শোনা যায় আকাশে বোমা ফাটার আওয়াজ।

কী সর্বনাশ! আকাশে-বাতাস অট্টহাসি ভেসে আসছে পাতাল থেকে, সমুদ্র থেকে—

বাতাসের স্তরে স্তরে ঘষটানি থেকেও। রামধনবাবু, আপনার এখানে হচ্ছে অন্য কারণে। এ যে ফল্গু নদীর দেশ। তাই এখানে শিবঠাকুর কাঁদে, পাহাড়ের মাথায় ঝর্না জাগে, আকাশে-বাতাসে ভূতেরা হাসে। যা বলব, তা করতে পারবেন? সাহস আছে?

অন্ধকারে চেয়ার সরে যাওয়ার আওয়াজ হল। উঠে দাঁড়িয়েছেন রামধন চক্রবর্তী।

প্রেতাত্মারা অট্ট-অট্ট হেসে উঠল ঠিক এই সময়ে।

দরকার ছিল একটা শাবল আর একটা কোদালের। জোগাড় করে দিলেন রামধনবাবু। পাথরের

খাঁজে চাড় মেরে শিবমূর্তিকে উল্টে ফেলে দিল ইন্দ্রনাথ, খুব সহজে অবশ্য নয়। ইন্দ্রনাথ বলেই পেরেছিল, কিন্তু ঘেমে নেয়ে গেছিল। মুচকি হেসে বলেছিল, কি বুঝলেন?

ঢোক গিললেন রামধনবাবু, মনে হচ্ছে, বিগ্রহ আগেই উলটোনো হয়েছিল। পাথরের জোড়ে শাবল মারার স্পষ্ট দাগ দেখলাম।

ঠিকই দেখেছেন। সিমেন্ট দিয়ে দাগ বুজিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আপনার ছেলের কীর্তি।

রামধনবাবু নিশ্চুপ।

ইন্দ্র বললে, টর্চটা আমাকে দিন। পাশে এসে দাঁড়ান। কি দেখছেন?

টর্চের ফোকাস আলোকিত করে তুলেছে ভেতরের কুয়ো। জল বেশি নীচে নেই। টর্চ ঘুরিয়ে বিগ্রহের চোখে ফোকাস করল ইন্দ্রনাথ। চোখে আঙুল দিতেই চোখ সরে গেল ওপরের দিকে। মার্বেল গুলিতে আঁকা চোখে। ফাঁপা গুলি।

টর্চ এনে এবার উলটোনো বিগ্রহের তলদেশে ফোকাস করতেই চক্ষুস্থির হয়ে গেল রামধনবাবুর। ভেতরটা বিলকুল ফোঁপরা। শ্যাওলা ভর্তি। জল চুঁয়ে পড়ছে শ্যাওলা থেকে।

প্রেতাত্মারা হেসে উঠল আকাশে। কুয়োর জল দমক মেরে মেরে উঠতে লাগল ওপরে। গম্ভীর নিনাদের ওপর গলা চড়িয়ে ইন্দ্রনাথ বললে, ওই জল নীচ থেকে উঠে এসে ফোঁপরা শিবঠাকুরের মধ্যে ঢুকে ঘুরিয়ে দিত চোখের গুলি। জল গড়াত চোখে কুয়োর জল নেমে গেলেই।

প্রায় আর্তকণ্ঠে বললেন রামধনবাবু, কুয়োর জল যে উঠে এল!

দমাস করে শিবঠাকুরকে যথাস্থানে বসিয়ে দিল ইন্দ্রনাথ। হুউস আওয়াজ শোনা গেল বিগ্রহের মধ্যে। উল্টে গেল চোখের তারা। নেমে এল ক্ষণপরেই। জল গড়িয়ে পড়ল গাল বেয়ে।

ফল্গু নদীর জল, বাগানে বেরিয়ে এসে বললে ইন্দ্রনাথ, এখানে যেমন কুয়ো দিয়ে উঠছে, পাহাড়ের গায়ে তেমনি গুহা দিয়ে ঝর্না হয়ে ঝরছে।

আর হাসির আওয়াজ?

হাসি বলে মনে করলেই হল। বুমবুম শব্দের ধ্বনি আর প্রতিধ্বনিকে প্রেতাত্মার অট্টহাসি বললে খাপ খেয়ে যায় নিহত সেপাইদের কাহিনির সঙ্গে। সমুদ্র এখান থেকে বেশি দূরে নয়। সৈকতের পাহাড়ি গুহা বেয়ে ঢেউ আছড়ে ঢুকছে, বাঁকে বাঁকে ধাক্কা খেয়ে আওয়াজ সৃষ্টি করছে, ফল্গু নদীর জল বাড়ছে, শিবঠাকুরের চোখ নড়ছে, ঝর্না সৃষ্টি হচ্ছে—

মোগল-মোহর?

আপনার ঘোড়া পথ চিনিয়ে নিয়ে যেতে পারবে?

কোথায়?

যেখানে আপনার ছেলে পড়েছিল?

পারবে।

খোঁচা খোঁচা পাহাড়ের চুড়োগুলো বল্লমের মতন মাথা উঁচিয়ে রয়েছে আকাশের দিকে। জঙ্গল এখানে এমনই ঘন যে ভাষা দিয়ে বর্ণনা করা যায় না।

সবে ভোর হয়েছে। ঘোড়া চিহি চিহি ডাক ছাড়ল একটা পাহাড়ের পাশে দাঁড়িয়ে। অদ্ভুত পাহাড়। ছুরি দিয়ে মাখন কাটার মতন লম্বালম্বিভাবে কেটে আধখানা করা হয়েছে যেন।

ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে পাথুরে দেওয়ালের গা ঘেঁষে। পা দিয়ে ঠুকছে একটা পাথর।

চিৎকার করে উঠলেন রামধনবাবু, ওই...ওই সেই পাথর! ওই পাথর খুলি চুরমার করেছিল আমার ছেলের।

হেঁট হয়ে পাথরটার চেহারা দেখে ইন্দ্র বললে, এ তো খসে পড়া পাথর।

খসে পড়া!

আকাশ থেকে নয়, এই পাহাড়ের মাথা থেকে।

কি বলছেন!

রামধনবাবু, আপনার হিরের টুকরো ছেলে যেকোনোভাবেই হোক জেনেছিল এই পাহাড়ের কোথাও মোগল-মোহর আছে। দড়িদড়া নিয়ে উঠেছিল পাহাড়ে। আলগা পাথরে পা রাখতেই আছড়ে পড়েছে নীচে আর পাথর পড়েছে মাথায়!

ও মাই গড! এই প্রথম ইংরিজি ভাষণ ছাড়লেন রামধন চক্রবর্তী, যা তাঁর পরিপূর্ণ বঙ্গসজ্জায় নিতান্তই বেমানান। তারপরেই অবশ্য বললেন খাঁটি বাংলায়, পাহাড়ে উঠেছিল? কেন? কেন? কেন?

গুহার মধ্যে দড়ি ঝুলিয়ে নামবে বলে। নেমেও ছিল নিশ্চয়। দড়িদড়া নিয়ে এসেছিল ঘোড়ার পিঠে. কিন্তু মনে হয় কিছু পায়নি।

পেলেও সে কি আর আছে? ঘোড়া যা জোরে ছুটে ফিরে গিয়েছিল, হয়তো বনে-জঙ্গলেই পড়ে গেছে।

বন্দুক আর হ্যাভারস্যাক তো পড়েনি। রামধনবাবু, পাহাড়ের মাথায় নিশ্চয় গুহা আছে। খাড়াই গুহা, কুয়োর মতন। যার মধ্যে দিয়ে ফল্গু নদীর জলোচ্ছ্বাস প্রেতাত্মার অট্টহাসি হয়ে ঠিকরে বেরোয়।

ইন্দ্রনাথের কথা যে কতটা সত্যি তা প্রমাণ করতেই বুঝি ঠিক সেই মুহূর্তে ভয়াল প্রেত-অট্টহাসি শোনা গেল পর্বতচুড়োয়। সঙ্গে সঙ্গে ওপরে চোখ তুলল ইন্দ্র। দেখল, জলকণা ছিটকে যাচ্ছে চুড়োয়, যেন মেঘ। বললে, আসুন, মোগল-মোহর দেখবেন আসুন।

ওরা এখন দাঁড়িয়ে পাতালগর্ভে। পর্বতচুড়োয় সত্যিই পাওয়া গেছে খাড়া কুয়োর মতন গর্ত। দড়ি ঝুলছে তার মধ্যে। সেই দড়ি বেয়ে একে একে নেমে এসেছে দুইজনে।

বেশিদূর নামতে হয়নি। কুয়োর গা থেকে একটা গুহা চলে গেছে নীচের দিকে। এ গর্তে জল নেই। গর্তের শেষে একটা গর্ভগৃহ।

টর্চের আলোয় দেখা যাচ্ছে ঘরভর্তি সুবর্ণপেটিকা। প্রতিটা পেটিকার মধ্যে থরে থরে সাজানো মোহর।

অভিশপ্ত মোহর, বলেছিল ইন্দ্রনাথ।

আর কিছু বলেনি। কাউকে নয়। আমাকে ছাড়া। তাই লিখলাম এই কাহিনি।

আশ্বিন ১৪০৩

ভূতুড়ে বাড়িতে ভূতের খোঁজ

অজেয় রায়

বোলপুর শহর। ভবানী প্রেস। দুপুর দুটো নাগাদ।

শ্রীনিকেতন রোডের ওপর ভবানী প্রেসের লম্বা একতলা ঘরখানায় খটাখট করে ছাপাখানার কাজ চলছে। ঘরের একদিকে চেয়ারে বসে নিজের লেখার প্রুফ দেখছিল দীপক।

ঘরের এক কোণে কাঠের পার্টিশান ঘেরা একখানা ছোট্ট কামরা। তার দরজায় লেখা—সম্পাদক ঃ বঙ্গবার্তা।

দুজন ভদ্রলোক এসে প্রেসের দরজার সামনে দাঁড়াল। দুজনেই ফুলপ্যান্ট শার্ট পরা। ফিটফাট। একজন বেশ লম্বা-চওড়া। ময়লা রং।

দ্বিতীয় জনের রং ফর্সা। মাঝারি হাইট। ঢেউ খেলানো চুল। কাটা কাটা মুখে হাসি হাসি ভাব।

দুজনেরই কাঁধে ঝুলছে একটা করে কিট্‌ব্যাগ। দশাসই লোকটির কাঁধে আবার একটা ক্যামেরা।

দীপক তাদের এক নজরে দেখে বুঝল যে এরা বোলপুরের বাসিন্দা নয়। দুজনেই দীপকের বয়সি বা সামান্য বড় হতে পারে। এই বছর ত্রিশ হবে।

লোক দুটি ইতি-উতি চায়। লম্বাজন প্রেসের পিয়ন হারুকে জিগ্যেস করে, 'আচ্ছা, এটা তো ভবানী প্রেস?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ', জানায় হারু।

'এখানেই তো সাপ্তাহিক বঙ্গবার্তা কাগজের অফিস?'

'হ্যাঁ।' হারু ঘাড় নাড়ে।

'আচ্ছা কুঞ্জবিহারীবাবু আছেন?'

'আছেন।' হারু জানায়।

ফর্সা লোকটি বলে, 'আমরা একবার দেখা করতে চাই। দরকার আছে।'

হারু ঢুকে যায় পার্টিশান ঘেরা কামরায়। ভবানী প্রেসের মালিক এবং বঙ্গবার্তা কাগজের সম্পাদক শ্রীকুঞ্জবিহারী মাইতির অফিস ঘর। একটু বাদে বেরিয়ে এসে হারু ডাকল, 'আসুন।'

লোক দুটি ঢুকে যায় স্যুইংডোর ঠেলে কুঞ্জবাবুর কামরায়।

দীপক আড়চোখে লক্ষ করছিল লোক দুটিকে। কাস্টমার? প্রেসে ছাপানোর কাজে এসেছে নাকি? না, বঙ্গবার্তায় কোনো খবর ছাপাতে?

কুঞ্জবাবুর হেঁড়ে গড়া শোনা যাচ্ছে। তবে সব কথা বোঝা যাচ্ছে না। টুকরো টুকরো কথা ভেসে আসে, 'নমস্কার। নমস্কার...ও আচ্ছা আচ্ছা...ও বেশ বেশ...হ্যাঁ, তারপর কি কচ্চে?...ওঃ অনেকদিন হল।....'

আগন্তুক দুজনের কথা কিন্তু কিছুই ধরা যায় না। তারা বেশ নিচু সুরে কথা বলে।

'অ্যাঁ, ভেরি ভেরি ইন্টারেস্টিং। বলেন কি...হ্যাঁ হ্যাঁ শুনি'....বলতে বলতে কুঞ্জবিহারীর গমগমে গলা হঠাৎ খাদে নেমে যায়। দু'পক্ষে কিসব কথা চলে। মাঝে মাঝে কুঞ্জবাবুর গলা চড়লেও গোটা বাক্য বোঝা যায় না। প্রথমে কৌতূহলী হলেও পরে দীপক নিজের কাজে মন দেয়।

দু'কাপ চা গেল সম্পাদকের কামরায়।

মিনিট দশেক বাদে দীপকের চটক ভাঙে কুঞ্জবাবুর হুংকারে, 'দীপক, দীপক, শুনে যাও।'

দীপক কাগজপত্র টেবিলে রেখে উঠে পড়ে। সম্পাদকের কামরায় ঢোকে।

কুঞ্জবিহারী মাইতি মাঝবয়সি, গাঁট্টাগোট্টা, মাঝারি লম্বা শ্যামবর্ণ পুরুষ। ভারিক্কি মুখে আশু মুখুজ্যে প্যাটার্নের পুরুষ্টু ঝোলা গোঁফ। মোটা ভুরু। পরনে যথারীতি ধুতি ও শার্ট। গোল গোল চোখ দুটি জ্বলজ্বল করছে। মনে হয় কোনও কারণে উত্তেজিত। তিনি বলে উঠলেন, 'বস দীপক। আলাপ করিয়ে দিই। ভেরি ভেরি ইন্টারেস্টিং পার্টি।'

সম্পাদকের টেবিলের সামনে বসেছিল সেই দুই ভদ্রলোক। দীপক পাশের দিকে একটা চেয়ারে বসে।

কুঞ্জবাবু লম্বা-চওড়া লোকটিকে দেখিয়ে বললেন, 'ইনি হচ্ছেন শ্রীগোলকপতি দাস' এবং ফর্সাজনকে দেখিয়ে বললেন, 'এঁর নাম শ্রীঅলোকনাথ দত্ত। কলকাতা থেকে আসছেন। আর এ হচ্ছে দীপক রায়। বঙ্গবার্তার একজন রিপোর্টার। গ্রাজুয়েট। এই লাইনে ভেরি প্রমিসিং ইয়ংম্যান।'

দীপক জোড়হাত করে নমস্কার জানায়। আগন্তুকরাও প্রতি-নমস্কার করে।

কুঞ্জবিহারী বললেন, 'এই অলোক দত্তর কাকা বন্ধু আমার বিশেষ পরিচিত। বন্ধুর কাছে আমার নাম-ঠিকানা জেনে এখানে এসেছেন। একটা দরকারে আমার হেল্প চান। ভেরি ইন্টারেস্টিং ব্যাপার। এঁদের একটা অদ্ভুত শখ আছে।'

কুঞ্জবাবু হঠাৎ কথা থামিয়ে, গোঁফ ভুরু নাচিয়ে, চোখ ছোট করে, গলার স্বর নামিয়ে রহস্যময় হেসে বললেন, 'কি শখ জান? এঁদের শখ হচ্ছে ভূত খোঁজা।'

দীপক চমকে তাকায় দুই আগন্তুকের পানে। তারা মিটিমিটি হাসে।

কুঞ্জবাবু বলে চলেন, 'হ্যাঁ শখটা অদ্ভুত। কি বল? সেই উদ্দেশেই আগমন। ভেদিয়ায় এক গ্রামে একটা পোড়োবাড়ির সন্ধান পেয়েছেন, সেটায় নাকি ভূত আছে। তাই পরখ করতে এয়েছেন।

'গ্রামটার ডিরেকশন নিয়ে এসেছেন। কিন্তু ভেদিয়া তো যাননি আগে। তাই আমার কাছে এসেছেন ভালো করে বুঝে নিতে। কি নাম জানি বললেন গ্রামটার?'

'নন্দনপুর।' উত্তর যোগায় গোলকপতি।

'হুঁ, নন্দনপুর। চেন গ্রামটা? তোমার তো প্রচুর জায়গায় ঘোরাঘুরি।'

নন্দনপুর? খানিক ভাবে দীপক। তারপর বলে, 'হুঁ, ওই নামে একটা গ্রাম আছে বটে ভেদিয়ায়। অজয় নদের ধারে। স্টেশন থেকে মাইল চারেক দূরে।'

'রাইট, নদীর ধারে। অজয় নদের ধারে। তাই বলেছে।' গোলকপতি সায় দেয়, 'ওখানে নাকি একটা মস্ত বাড়ি আছে। রায়বাড়ি। পরিত্যক্ত। ফাঁকা পড়ে আছে বহুকাল। ওই অঞ্চলের জমিদারদের বাড়ি ছিল ওটা। বাড়িটা নাকি হন্টেড। ভূতুড়ে।'

'আমি নন্দনপুর গেছি একবার', দীপক জানায়, 'রায়বাড়ি দেখেছি দূর থেকে। বাড়িটা বিরাট। পোড়োবাড়ি মনে হয়েছিল। তবে ভূত আছে কিনা জানি না। মানে এ নিয়ে জিগ্যেস করিনি কাউকে। তা আপনারা জানলেন কি করে?'

কুঞ্জবিহারী আগন্তুকদের উৎসাহ দিলেন, 'বলুন বলুন। দীপককে সব খুলে বসুন। ওর এ ব্যাপারে খুব এক্সপিরিয়েন্স।' তিনি চেয়ারে পিঠ এলিয়ে দেন। মুখে স্মিত হাসি।

সম্পাদকের কথাটা খচ্ করে কানে বাজল দীপকের। ওঁর রকম-সকম সুবিধের ঠেকল না। কুঞ্জবিহারী খটখটে মানুষ। এত বিগলিত ভাব দেখাবার কারণ? যা হোক সে অলোকনাথের কথায় মন দেয়—

'আমাদের পাড়ার গগনেন্দ্র রায়ের কাছ থেকে এই বাড়িটার সন্ধান পেয়েছি। গগন রায়ের পূর্বপুরুষের ভিটে ওই বাড়ি। বহুকাল ফাঁকা পড়ে আছে। কেউ থাকে না। প্রায় পঁচাত্তর বছর।'

দীপক ভুরু কুঁচকে বলে, 'একটা প্রশ্ন করব?'

'বিলক্ষণ, বিলক্ষণ। করবেন বৈকি', বলল অলোকনাথ।

'আপনাদের এই অদ্ভুত শখের কারণ? মানে ভূতের সন্ধান। এইরকম ভূত-প্রেতচর্চার ক্লাব আছে শুনেছি। আপনারা কি সেরকম কোনও ক্লাবের?'

'আরে না না', অলোক দত্ত বাধা দেয়, 'আমরা কোনও ভূত-প্রেত অনুসন্ধানী ক্লাবের মেম্বার নই। এটা স্রেফ আমাদের দুজনের শখ। দুজনে একই অফিসে চাকরি করি। অনেক দিনের ফ্রেন্ড। হঠাৎই শখটা গজাল।'

'হঠাৎ এই অদ্ভুত শখ!' বিড়বিড় করে দীপক।

'সে মশাই এক হিস্ট্রি', অলোক দত্ত হাত-মুখ নেড়ে বলে, 'একদিন অফিসে তক্ক হচ্ছিল টিফিনে—ভূত আছে কি নেই? বেশিরভাগই বলল যে আছে। কয়েকজন বলল, তাদের পরিচিত কেউ কেউ ভূত দেখেছে নিজের চোখে।

'আমি আর গোলক বললাম—ভূত নেই। বিশ্বাস করি না ভূতে। তক্কাতক্কি হতে হতে বেট রাখা হল। আরও দু-একজন অবিশ্যি আমাদের সাপোর্ট করেছিল।

'ভূতে বিশ্বাসীদের একজন বলল, যে দমদমে নাকি একটা মস্ত পোড়োবাড়ি আছে। বহু পুরোনো। লর্ড ক্লাইভের আমলের। বাড়িটায় রাতে কেউ থাকতে চায় না। কারণ নাকি সাহেব ভূতরা সেখানে পায়চারি করে রাতে। আমাদের ওই বাড়িতে রাত কাটাতে চ্যালেঞ্জ জানাল। আমরা অ্যাকসেপ্ট করলাম।

'গেলাম সেই বাড়িতে। তবে আমি এবং গোলক ছাড়া ভূতে অবিশ্বাসীরা আর কেউ যায়নি শেষ অবধি। যা হোক থাকলাম সেখানে রাতে। নির্বিঘ্নেই কাটালাম। কিন্তু ভূতের দর্শন মিলল না।

'সেই মশাই শুরু। বেশ নেশা ধরে গেল। ভূতুড়েবাড়ির খোঁজ পেলেই সেখানে গিয়ে রাত কাটাই। ভেদিয়ারটা হবে আমাদের আট নম্বর কেস।'

'কিছু দেখেননি?' প্রশ্নটা করেন কুঞ্জবিহারী।

'নাঃ।' মাথা নাড়ে অলোক দত্ত, 'তবে ট্রাই করে যাচ্ছি।'

গোলকপতি বলে ওঠে, 'দেখিনি বটে, তবে বলতে পারেন কিছু শুনেছি।'

'কি রকম?' কুঞ্জবিহারী খাড়া হয়ে বসেন।

'এই অদ্ভুত অদ্ভুত কিছু আওয়াজ।'

'ওগুলো সত্যি সত্যি ভৌতিক আওয়াজ কিনা প্রমাণ হয়নি।' অলোকনাথ দাবড়ে দেয় গোলকপতিকে।

'তা বটে, তা বটে।' মিনমিন করে গোলকপতি।

'নন্দনপুরে রায়বাড়ি এদ্দিন ধরে খালি পড়ে আছে কেন?' দীপক কৌতূহলী।

'সে এক হিস্ট্রি মশাই', জানায় অলোকনাথ, 'ওই গগন রায়ের কাছে শোনা।

'প্রায় পঁচাত্তর বছর আগে রায়বাড়ি ছিল জমজমাট। একবার অন্নপ্রাশন হয় ওই বাড়ির একটি মেয়ের। বড় রায়কর্তার প্রথম নাতনি। খুব ধুমধাম হচ্ছে। অনেক লোকজন এসেছে বাড়িতে। সন্ধের সময় হঠাৎ কলেরা শুরু হল বাড়িতে। দু'দিনেই ওই বাড়িতে দশ-বারোজন মারা যায় ওলাউঠায়। ওই বংশের ছয়-সাতজন আর কাজের লোক মানে এই ঝি-চাকর-দারোয়ান জনা চার-পাঁচ। যার অন্নপ্রাশন সেই ছোট্ট মেয়েটিরও মৃত্যু হয়। আর মারা যান বড়কর্তা স্বয়ং। উৎসব বাড়িতে হাহাকার উঠল। গ্রামেও ছড়িয়ে পড়েছিল রোগ। মারা যায় কিছু গ্রামের অন্য লোক। বেশিরভাগ লোকই গ্রাম ছেড়ে পালায়। জানেন তো তখন এই মারাত্মক রোগের তেমন কোনও চিকিৎসাই ছিল না।

'যা হোক এই দুর্ঘটনার কিছুদিন বাদে গ্রামের লোক আবার ফিরে আসে নিজের নিজের ভিটেয়। কিন্তু শোকার্ত রায়রা মাসখানেকের মধ্যে চিরকালের মতো ওই বাড়ি ত্যাগ করে। ওই বংশের কেউ আর কখনো ওই বাড়িতে রাত কাটায়নি। বাড়ির দামি দামি জিনিস যতটা পারে সঙ্গে নিয়ে যায়। কিছু বিক্রি করে। জমিদারির বেশির ভাগটাই বেচে দেয়।

'একজন কেয়ারটেকার রেখেছিল। কিন্তু সেও নাকি রাতে থাকত না বাড়ির ভিতর। শেষে ও বাড়ি দেখাশুনা করারও কেউ রইল না। বাড়িটা নাকি একদম ভূতুড়ে হয়ে গেছে। হানাবাড়ি।

'গগন রায় নিজে কখনো যায়নি নন্দনপুর। সে কলকাতাতেই জন্মেছে, বড় হয়েছে। এসব তার বাবার কাছে শোনা।'

'ওখানে ভূতুড়ে কাণ্ড কি হয়?' জানতে চান কুঞ্জবাবু।

অলোকনাথ বলল, 'তা খুব বলতে পারেনি গগন। কি সব নাকি অদ্ভুত অদ্ভুত শব্দ হয়। কি সব নাকি দেখা যায়। আসলে এ নিয়ে ওর বাবা বিশেষ কিছু বলতে চাইতেন না।'

দীপক বলল, 'বাঃ এত কথা তো জানতাম না। তাহলে সেদিন বাড়িটা একবার ঘুরে দেখে নিতাম।'

কুঞ্জবিহারী বললেন, 'দীপক, এনাদের নন্দনপুরে কিভাবে যেতে হয় বুঝিয়ে দাও ভালো করে। আর—আর—আমার একটা আইডিয়া এসেছে। যদি তুমিও ওদের সঙ্গে যাও মন্দ হয় না। রাতে থেকে যাবে একসঙ্গে। মানে রিপোর্টার হিসেবে। তোমাদের এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে দারুণ একখানা স্টোরি হবে বঙ্গবার্তায়। হেডিং দেব—ভূতুড়ে বাড়িতে ভূতের খোঁজে। কি আপনাদের কোনও আপত্তি আছে, কাগজের কেউ গেলে?'

অলোকনাথ বলল, 'না না, আপত্তির কি? ভালোই তো। দলে একজন বাড়বে।'

কুঞ্জবিহারীর এই প্যাঁচটাই আশঙ্কা করেছিল দীপক। তাকে এদের সঙ্গে ভিড়িয়ে দেবার মতলব। সে গুম মেরে যায়। কথা বলে না।

কুঞ্জবিহারী দীপকের রকম দেখে বললেন, 'অবশ্য তোমার যদি কোনও ইয়ে থাকে, জোর করব না। দেখি আমিই না হয় যাব তাহলে।'

দীপকের মাথায় চড়াৎ করে রক্ত উঠে গেল। সদ্য পরিচিত লোকগুলির সামনে এমন ডাউন দেওয়া? ওই ইয়ের মানেটা যে কি—যে কেউ ধরতে পারবে। অর্থাৎ সম্পাদক বলতে চান যে দীপক সঙ্গে না গেলে বুঝতে হবে যে সে ভয় পাচ্ছে। ভূতের ভয়। তাই যেতে চাইছে না।

দীপক গম্ভীরভাবে জিগ্যেস করল অলোকনাথকে, 'আপনারা কবে নন্দনপুর যেতে চান?'

'আসছে কাল। আজ শুক্রবার। শনি-রবি ছুটি আছে অফিসে। কাল রায়বাড়িতে রাত কাটিয়ে, রবিবার কলকাতা ফিরব।'

'ঠিক আছে, আমি যাব আপনাদের সঙ্গে।' নেহাৎ তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে জানায় দীপক।

কুঞ্জবাবু অমনি দীপকের পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন, 'সাব্বাস্! আমি জানতাম যে তুমি এমন চান্স ছাড়বে না। যাক, এঁদের সঙ্গে প্রোগ্রামটা ঠিক করে নাও। হ্যাঁ, আপনারা আজ কোথায় থাকছেন?'

অলোকনাথ বলল, 'আমরা কোনও হোটেলে থাকব।'

কুঞ্জবাবু বললেন, 'অলরাইট। দীপক ওঁদের বোলপুর নিবাসে নিয়ে যাও। আমার নাম করে ভালো ঘর দিতে বল।'

শনিবার। সকাল ন'টা নাগাদ ভেদিয়া স্টেশনে নামল তিনজন—দীপক, অলোকনাথ এবং গোলকপতি।

স্টেশন থেকে নন্দনপুর যেতে দুটো সাইকেল রিকশা ভাড়া করা হল। একটায় গোলকপতি। অন্যটায় অলোকনাথ ও দীপক।

আঁকাবাঁকা মেঠো পথ ধরে যেতে যেতে রিকশাওলা জিগ্যেস করল দীপকদের, 'নন্দনপুরে কার কাছে যাবেন?'

'শচীন কর্মকার', জবাব দেয় অলোকনাথ। নন্দনপুরে শচীন কর্মকারের নামে একটা চিঠি দিয়েছে গগন রায়। কলকাতায় একটা কাজে এসে গগনদের বাড়িতে এসেছিলেন শচীনবাবু। তখন সামান্য আলাপ হয় গগনের সঙ্গে।

'শচীনদার কুটুম বুঝি?' রিকশাওলার কৌতূহল।

'না না, চেনা লোক। আসতে বলেছিলেন একটা কাজে।' সামাল দেয় দীপক।

গ্রামের বাইরে থেকেই দীপকরা ভাড়া মিটিয়ে বিদায় দেয় রিকশা। তারপর হেঁটে গাঁয়ে ঢোকে।

একটা বাচ্চা ছেলেকে জিগ্যেস করতেই একেবারে সঙ্গে করে নিয়ে চলল শচীন কর্মকারের বাড়ি। দেখতে দেখতে পথে কুচোকাঁচার দল জুটে যায় শহুরে বাবুদের পিছু পিছু।

শচীন কর্মকারের বয়স পঞ্চাশ পেরিয়েছে। ছোটখাটো নিরীহদর্শন মানুষ। গগন রায়ের চিঠি পড়ে এবং পরিচয় পেয়ে খাতির করে বসালেন। চা-মুড়ি খাওয়ালেন।

গগনের চিঠিতে অলোকনাথ এবং গোলকপতির নন্দনপুরে যাওয়ার আসল উদ্দেশ্য লেখা ছিল না। অলোকনাথের মুখে তাদের আগমনের কারণটা জেনে বেশ গম্ভীর হয়ে গেলেন শচীনবাবু। ক্ষুব্ধস্বরে বললেন, 'এসব নিয়ে খোঁচাখুঁচি করা, তেনাদের ত্যক্ত করা কি উচিত হবে?'

অলোকনাথ তাড়াতাড়ি বোঝায়, 'না না, আমরা কাউকে বিরক্ত করতে চাই না। আমরা যুক্তিবাদী। ভূত-প্রেত মানে তেনারা সত্যি সত্যি আছেন কিনা তার প্রমাণ খুঁজছি। দুঃখের বিষয় এ পর্যন্ত কিছু পাইনি। তাই এসেছি—'

'প্রমাণ?' ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে জানান শচীন্দ্রনাথ, 'এসব প্রমাণ কি সহজে মেলে? ভাগ্য চাই। আর এসব প্রমাণ সহ্য করার মতন মনের বলও থাকে না সবার।'

এবার গোলকপতি মোটা গলায় মন্তব্য ছাড়ে, 'দেখুন, মনের জোর আমাদের নেহাৎ কম নয়। সত্যি তেমন প্রমাণ মিললে ভিরমি খাব না, একটু ভরসা রাখতে পারেন।'

কর্মকারমশাই পিটপিট করে গোলকপতির দশাসই চেহারাখানায় চোখ বুলিয়ে বললেন, 'তা বেশ। আমার যা বলার বললাম।'

দীপক এতক্ষণ চুপচাপ শুনছিল। এবার বলে, 'রায়বাড়িতে কি হয়? মানে কিছু দেখা-টেখা যায় কি? কেন লোকে থাকে না রাতে?'

কর্মকারমশাই বললেন, 'বুড়ো কত্তার খড়মের আওয়াজ শুনেছে অনেকে। ওই বাড়ির ভিতর হেঁটে বেড়াচ্ছেন রাত্তিরে—খট্‌খট্‌ করে। রাতে ওই বাড়ির ছাদের কিনারে ছায়ামূর্তি দেখেছে কেউ কেউ। শোনা গেছে কান্নার আওয়াজ। যেন বাচ্চা কাঁদছে। আমি অবশ্য নিজে কিছু দেখিনি বা শুনিনি। আসলে ও বাড়ির ধারে-কাছে ঘেঁষি না সন্ধের পর। কি দরকার মশাই, অনাবশ্যক কৌতূহল মেটাতে গিয়ে কি বিপদে পড়ব?'

দীপক অলোকনাথ ও গোলকপতিকে বলল, 'চলুন না, বাড়িটা একবার ঘুরে দেখে আসি।'

'অফকোর্স।' অলোকনাথরা উঠে পড়ে। শচীনবাবু পথ দেখিয়ে চলেন।

একপাল বাচ্চা ছেলে-মেয়ে পিছু নিল তাদের। গ্রামের অন্য বাড়ি থেকে বয়স্ক লোকেরাও উঁকিঝুঁকি মারে।

রায়বাড়ি নন্দনপুর গ্রামের অন্য বাড়িগুলির সীমানা থেকে বেশ খানিক তফাতে। একদম ফাঁকায়। বাড়িটা ঘিরে ছোট-বড় অনেক গাছ। ঝোপঝাড়। দূর থেকেই নজর পড়ে বাড়িটা।

রায়বাড়ি থেকে অজয় নদের কূল মাত্র শ'দুই গজ। আগে নাকি অজয় নদ ঢের দূরে ছিল।

জমিদার বাড়িই বটে। মস্ত বড়। দোতলা। দো মহলা। অট্টালিকা ঘিরে বিরাট এলাকা উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। পাঁচিল অবশ্য বহু জায়গায় এখন ভাঙা। পাঁচিলের গা ঘেঁষে অনেকগুলো ঘর সারি সারি। ঘরগুলো কোনওটাই আস্ত নেই। ওগুলো ছিল কাছারিবাড়ি, অতিথিশালা, নাটমন্দির ইত্যাদি।

একটা প্রকাণ্ড জাম গাছ বাড়িটার প্রায় ঘাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। তার ডালপালা ঝুঁকে পড়েছে অট্টালিকার ছাদে। পলস্তরা খসে ইঁট বেরিয়ে পড়েছে প্রায় গোটা বাড়ির দেয়ালে। কয়েকটা অশথ গাছ জন্মেছে বাড়িটার গায়ে। অট্টালিকার পেছন দিকে একটা মজা পুকুর। একটা কুয়োও রয়েছে। তবে কুয়োর জল ঘোলাটে নোংরা।

কবাটহীন প্রকাণ্ড সদর দরজার হাঁ-এর ভিতরে ঢোকে চারজন। পিছু নেওয়া বাচ্চার দল কিন্তু বাড়ির ভিতরে ঢোকে না। বোধহয় সঙ্কোচে।

ঢুকেই চৌকো বাঁধানো মস্ত উঠোন। উঠোন অনেক জায়গাতেই খোবলানো। ইঁট-মাটি বেরিয়ে পড়েছে। উইয়ের ঢিবি উঠেছে। উঠোন ঘিরে উঁচু বারান্দা তিন দিকে। বারান্দা পেরিয়ে পরপর ঘর।

দোতলাতেও একই রকম চওড়া বারান্দা আর ঘরের সারি। মোটা মোটা গোল গোল থাম দোতলার বারান্দার ভার কাঁধে নিয়ে আজও সটান খাড়া। দুই কোণ দিয়ে সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলায়।

বাড়িটা যে অভিশপ্ত ঢুকেই যেন টের পাওয়া যায়। কেমন গা-ছমছম করে এই বিশাল নির্জন অট্টালিকার অন্দরে প্রবেশ করেই।

একতলার বারান্দা ধরে ওরা হাঁটতে লাগল।

এই জনমানবহীন অট্টালিকার বাসিন্দা এখন অজস্র পায়রা, শালিক আর চামচিকে। আরও নিশ্চয় থাকে কিছু সরীসৃপ, কীটপতঙ্গ। তাদের সহজে চোখে পড়ে না।

সহসা জুতোর শব্দে বিরক্ত ভীতচকিত কিছু পায়রা, শালিক উড়তে লাগল ঘুলঘুলি আর কড়িবরগার আশ্রয় থেকে বেরিয়ে। সাঁ সাঁ করে এলোমেলো পাক খায় শূন্যে কয়েকটা চামচিকে।

একতলার বেশিরভাগ ঘরের দরজা-জানলায় কবাট নেই। কোথাও কোথাও মাত্র কাঠের ফ্রেমের কিছু অংশ অবশিষ্ট রয়েছে। কোনও দরজা-জানলায় ভাঙা পাল্লার খানিক অংশ কোনও মতে ঝুলে আছে। নোংরা মেঝে। ছাদ ঝুলে ভর্তি। তবে থামের গায়ে, বারান্দার কার্নিশে, দেয়ালে কিছু অপূর্ব কারুকার্য এই অট্টালিকার অতীত সৌন্দর্যের সাক্ষ্য দিচ্ছে।

শচীন কর্মকার জানালেন, 'এ বাড়ি যে কবে তৈরি হয়েছে গাঁয়ে কেউ আজ বলতে পারে না সঠিক। তবে সোয়া-শ বছরের পুরোনো তো বটেই।'

ঠিক সদর দরজার মুখ পেরিয়ে বাঁয়ে দেখা গেল একটা মস্ত হলঘর। কর্মকারমশাই জানালেন যে, এটা নাকি ছিল বৈঠকখানা। গান-বাজনার আসরও বসত ওই ঘরে।

ঘরখানায় তখনো রয়েছে, প্রাচীন আমলের কয়েকটা বড় বড় চেয়ার। একটা গোল কাঠের টেবিল। দেয়ালে ঝুলছে একটা বড় ভাঙা আয়না এবং একটি মস্ত হাতে আঁকা ছবি। অয়েল পেন্টিং। রায়বংশের কারও প্রতিকৃতি। ছবির ওপর ধুলো-ময়লা জমেছে। বোঝা যায় এক রাশভারী মধ্যবয়স্ক পুরুষের বুক অবধি চেহারা।

কর্মকার বললেন, 'শুনেছি ওটা বড়কর্তার ছবি। ওলাউঠায় মারা গেছলেন সেইবার।'

হলঘর থেকে বেরিয়ে গোলকপতি দেখাল, 'ওরে ব্বাপ্ ওই দেখুন।'

সকলে দেখল, চত্বরের এক কোণে লম্বা একটা সাপের খোলস।

শচীনবাবু বললেন, 'হুঁ পোড়োবাড়ি! খরিস সাপ বাসা বেঁধেছে। শুধু কি তেনাদের ভয়? এনাদের ভয়ও কম নয়। সাবধানে থাকবেন।'

দোতলায় ওঠা হল।

বারান্দায় লোহার জাফরি লাগানো ঘের। কোমর সমান উঁচু জাফরিতে মরচে পড়েছে। নড়বড়ে। তবে নকশা চমৎকার।

দোতলার ঘরগুলোয় উঁকি মারে দীপকরা। নীচের তলার মতোই অবস্থা।

সিঁড়ি উঠে গেছে ছাদে। শচীনবাবু বারণ করলেন, উপরে যেতে। ভাঙা সিঁড়ি। তা বটে। দোতলার ছাদেও বড় বড় ফাটল ধরেছে। নেহাতই খুব পুরু দেয়াল, মজবুত করে বানানো বাড়ি, তাই এতকাল খাড়া রয়েছে, এত অবহেলা সত্ত্বেও।

সবাই নীচে নেমে এল।

'এ বাড়িতে লোক ঢোকে', দীপক মন্তব্য করে, 'ওই দেখুন পোড়া বিড়ির টুকরো উঠোনে।'

'হুঁ', শচীনবাবু জানান, 'দিনের বেলা বাগাল ছেলেগুলো ঢোকে হয়তো। কিন্তু রাতে?' তিনি মাথা নাড়েন।

বাড়িটা দেখতে দেখতে দীপকের মনে একটা সন্দেহ জাগে। রাতে চোর-ডাকাত লুকিয়ে থাকার পক্ষে আদর্শ জায়গা। সে জিগ্যেস করে, 'আপনাদের এদিকে চুরি-ডাকাতি কেমন হয়?'

'তা হয় বৈকি', জানান শচীনবাবু, 'চুরি-ডাকাতি আজকাল কোথায় না হয়। তবে আমাদের গাঁয়ে ডাকাতি হয়নি বহুকাল। ছিঁচকে চুরি হয় মাঝে-মধ্যে। গাঁয়ে তেমন বড়লোক কে? সোনা-দানা কি আর মিলবে?'

একটা সরু প্যাসেজ দিয়ে দ্বিতীয় মহলে যাবার রাস্তা। সেদিকে একবার উঁকি দিল দীপকরা। বাড়ির ওই অংশের অবস্থা আরও খারাপ। আরও জরাজীর্ণ। আরও নোংরা।

দীপকরা ঠিক করল যে, প্রথম মহলেই কাটাবে রাত।

কোথায় থাকা যায়, পরামর্শ করে তিনজনে।

শচীনবাবু শুকনো মুখে বললেন, 'আপনারা কি সত্যি থাকবেন এখানে? মানে রাতে?'

'নিশ্চয়ই।' অলোকনাথের মন্তব্য।

'ভয় হচ্ছে, কিছু দুর্ঘটনা ঘটলে লোকে আমায় দুষবে।'

'না না, আপনাকে দোষ দেবে কেন? বলেন তো লিখে দিয়ে যাব।' অলোকনাথ ভরসা দেয়।

শচীনবাবু হতাশভাবে মাথা নাড়েন।

নীচের হলঘরটায় রাতে থাকা ঠিক হল। বড় বড় জানলার ফোকর দিয়ে ঘরখানা ভেসে যাচ্ছে দিনের আলোয়। দূরে দেখা যাচ্ছে অজয় নদের পাড়।

অলোকনাথ বলল শচীনবাবুকে, 'একটি লোক জোগাড় করতে পারেন? ঘরখানা একটু ঝাঁটপাট দিয়ে সাফ করে দেবে। আর দুটো মাদুর বা চাটাই পেলে ভালো হয়। কখনো কখনো একটু গড়িয়ে নেব।'

'ঠিক আছে, হয়ে যাবে।' কর্মকারমশাই আশ্বাস দেন। 'আহারটা কিন্তু আমার বাড়িতে করতে হবে।'

অলোকনাথরা প্রথমে আপত্তি জানায়, 'পাঁউরুটি আছে আমাদের সঙ্গে। গ্রামে মুড়ি পাওয়া যাবে! তাতেই হবে।'

শচীনবাবু ক্ষুণ্ণ হয়ে বললেন, 'সে কি, আপনারা অতিথি। গগনের বন্ধু। মুড়ি খেয়ে কাটাবেন? তা হয় না। সামান্য দুটো অন্ন যোগাতে পারব না?'

দীপকরা রাজি হয় অগত্যা।

'বেশ দুপুরে আপনার কাছে খাচ্ছি। রাতে কিন্তু কোনও ব্যবস্থা করবেন না। পাঁউরুটি খাব। ভাত খেলে ঘুম আসবে।'

কর্মকারমশাই গেলেন নিজের বাড়িতে। দীপকরা তিনজনে গেল অজয় নদের তীরে বেড়াতে।

বৈশাখ মাস। অজয় নদেতে তখন জল খুব কম। প্রশস্ত নদীগর্ভে বালির চড়া পড়েছে। ক্ষীণ একটা স্রোত বইছে এক ধার ঘেঁষে। জলের বুকে সবচেয়ে গভীরেও হাঁটু জলের বেশি নয়। মানুষজন গোরু-মোষ দিব্যি হেঁটে পার হচ্ছে নদী। ওপারে দেখা যাচ্ছে গাছ-গাছালিতে ঢাকা কয়েকটি গ্রাম।

বেলা এগারোটা নাগাদ, তিনজনে গ্রামে ফেরে।

শচীনবাবুর বাড়ি পৌঁছে দেখে যে রীতিমতো এক জটলা তাঁর বাসার সামনে। শচীন কর্মকারও রয়েছেন তার মধ্যে। দীপকরা হাজির হতে ভিড়ে গুঞ্জন ওঠে। কর্মকারমশাই আহ্বান জানান দীপকদের, 'একটু জিরিয়ে নিন। তারপর স্নানাহার করবেন।'

বাড়ির বাইরের দিকে একটা ছোট ঘরে বসেছে দীপকরা তক্তপোশে চেয়ারে। এক বৃদ্ধ এসে বসেন তাদের কাছে। বাইরের ভিড়টা তখন জানলা-দরজায় উপচে পড়ছে।

শচীনবাবু পরিচয় করিয়ে দিলেন, 'আমাদের মণ্ডলমশাই।'

বৃদ্ধ বার দুই গলা ঝেড়ে নিয়ে গম্ভীর সুরে বললেন, 'হুঁ শুনলাম সব। তা আপনারা কি সত্যি ওই বাড়িতে রাত কাটাবেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ', সবিনয় নিবেদন করে গোলকপতি, 'সেই উদ্দেশ্যেই যে এসেছি।'

'ভিতরে না থেকে, বাড়িটার বাইরে মানে নাটমন্দিরের সামনে চত্বরে থাকলে হয় না?' বৃদ্ধ বলেন।

'আজ্ঞে না। ভিতরে থাকতেই যে চাই।' অলোকনাথ দৃঢ়কণ্ঠে জানায়।

'সাপখোপের ভয়ও তো আছে। পোড়োবাড়ি।' বৃদ্ধ নিরস্ত করার চেষ্টা চালান।

'আজ্ঞে আছে বৈকি। আমরা সতর্ক থাকব। লাঠি রাখব।' গোলকপতি তার পেশিবহুল বাহু তুলে এমন ভঙ্গি করে যার অর্থ, শুধু সাপখোপ কেন, অশরীরীদের বিরুদ্ধেও তারা প্রস্তুত।

'হুম্। আপনারা শহুরে মানুষ। তবু অনুরোধ করছি, একটিবার ভেবে দেখবেন।'

'নিশ্চয়।' অলোকনাথের বিনীত আশ্বাস।

বৃদ্ধ উঠে গেলেন।

ঘরের বাইরে দাওয়ায় তখন জোর আড্ডা বসে। জামা-জুতো খুলে বসে জিরিয়ে নিতে নিতে দীপকদের কানে আসে ভয়াবহ সব ভৌতিক ঘটনার বর্ণনা। রায়বাড়ি নিয়েও গল্প হচ্ছিল।

বিকেল বিকেল দীপকরা বেরিয়ে পড়ে রায়বাড়ির উদ্দেশে।

তাড়াতাড়ি বেরোবার কারণ শচীনবাবুর বাসার সামনে তাদের জন্য সবসময় যে পরিমাণ ভিড় লেগে আছে সেটা গৃহকর্তার পক্ষে বিরক্তিকর হচ্ছে।

গ্রামের একটা দল কিন্তু তাদের সঙ্গে সঙ্গে চলল। তাতে সব বয়সি মানুষ। শচীন কর্মকারও রয়েছেন।

অট্টালিকার বাইরে নাটমন্দিরের চাতালে বসল দীপকরা।

অলোকনাথ ব্যাগ থেকে একটা টেপ-রেকর্ডার বের করে নতুন খালি ক্যাসেট ভরে। চালিয়ে পরীক্ষা করতে থাকে।

গোলকপতি তার ফ্ল্যাশ-বাল্ব লাগানো ক্যামেরা ঠিকঠাক করতে লাগল।

'এসব কি করতে এনেছেন?' জিগ্যেস করেছিল দীপক।

ওরা বলেছিল যে কোনও মূর্তির ছবি তোলার দরকার হয় যদি? কোনও অদ্ভুত শব্দ বা কণ্ঠস্বর শুনে রেকর্ড করে রাখা যায় যদি—তাই নিয়েছি।

দুজনের কাছে আরও দুটি জিনিস আছে গোপনে। দুটো বড় বড় ধারাল ছুরি। আত্মরক্ষার প্রয়োজনে। দীপক একটা লাঠি এনেছে।

গ্রামের ভিড়টা কিছু দূরে দাঁড়িয়ে মহা কৌতূহলে দেখছে আগন্তুকদের কার্যকলাপ। দুজন বয়স্ক লোক বসে গেলেন চাতালের এককোণে।

'গান শুনবেন বুঝি?'

টেপ-রেকর্ডারটা দেখিয়ে এক ছোকরা প্রশ্ন করে।

'হ্যাঁ, রাত জাগতে হবে যে।' অলোকনাথ হেসে জানায়।

গ্রামের একটি ছেলে, মুখে সরা চাপা ছোট একটা মাটির কলসি কাঁধে হাজির হল। তার পিছনে আর একটি ছেলের হাতে একটা হ্যারিকেন।

'এগুলো কোথায় রাখব?' জিগ্যেস করে তারা।

দীপক বলল, 'নীচে হলঘরটায় রেখে এস ভাই। কলসিতে জল ভরে এনেছ তো?'

'হ্যাঁ।' মাথা নেড়ে ওরা ঢুকে যায় রায়বাড়ির ভিতর। একটু বাদে জিনিস দুটো রেখে বেরিয়ে আসে।

আইডিয়াটা দীপকের। অলোকনাথদের সঙ্গে একটা জলের বোতল আছে বটে। তবে এই গরমকালে তিনজনের এক বোতল জলে তেষ্টা মিটবে না। তাই কর্মকারমশাইকে কলসির ব্যবস্থা করতে বলেছিল।

মোমবাতি ওদের সঙ্গে আছে। কিন্তু বাড়িটায় যা হাওয়া খেলে মোমবাতি নিবে যেতে পারে। তাই হ্যারিকেনের ব্যবস্থা কর্মকারমশাইয়ের কৃপায়।

দীপক ভাবল, আর একবার বাড়িটার ভেতর দেখে আসি। সে একাই ঢুকে যায় রায়বাড়িতে।

হলঘরে উঁকি দিয়ে দেখল, সব ব্যবস্থা করিয়ে রেখেছেন শচীনবাবু। ঘরটা খানিক সাফ হয়েছে। দুটো মাদুর বিছানো রয়েছে মেঝেতে। দরজার পাশে জলভরা কলসি এবং লণ্ঠনটা রাখা।

দীপক দোতলায় ওঠে।

একটা ঘরে ঢুকে সে নদী দেখছে জানলা দিয়ে। হঠাৎ—খট্-খট্-খট্ শব্দে চমকে যায়। ঠিক যেন খড়ম পায়ে চলার আওয়াজ। এমন দিনের বেলা! ছ্যাঁৎ করে ওঠে বুক।

ফের সেরকম শব্দ হয় দু'বার। শব্দটা যেন ঘরে অন্য জানলাটার কাছ থেকে আসছে। ওই জানলায় একখানা মাত্র খড়খড়ি দেওয়া পাল্লা ভাঙা অবস্থায় কোনওরকমে টিকে আছে আজও।

দমকা বাতাস আসে। দীপক লক্ষ করে যে অমনি এক টুকরো ভাঙা ঝুলেপড়া কাঠ পাশে একটা কাঠের গায়ে দুলে দুলে আঘাত করে হাওয়ার ধাক্কায়। আওয়াজ হয়—খট্ খট্।

ওঃ এই ব্যাপার। এই বুঝি খড়ম পায়ে বড়কর্তার পায়চারি করার রহস্য। এ বাড়িতে এমনি ভাঙাচোরা জানলা-দরজার পাল্লা অজস্র। হাওয়ার ধাক্কায় তারাই শব্দ করে নিশ্চয়। নিস্তব্ধ রাতে সে শব্দ স্পষ্ট শোনায়। লোকে ভাবে খড়ম পায়ে বড়কর্তার ভূত ঘুরে বেড়াচ্ছে। হাসি পেল দীপকের। অলৌকিক রহস্যগুলো বেশিরভাগই এইভাবে সৃষ্টি হয়।

দীপক বাড়ি থেকে বেরিয়ে বসল অলোকনাথদের কাছে চাতালে। ওরা তখন ক্যামেরা, টেপ-রেকর্ডারের কাজ শেষ করে চুপচাপ বসে।

গ্রামের ভিড়টা ঠায় রয়েছে। গুজগুজ করছে নিজেদের মধ্যে।

গোলকপতি ফিসফিস করে, 'আচ্ছা জ্বালালে। লোকগুলো যে নড়ে না। কি রকম ড্যাবড্যাব করে দেখছে। এখানে একটু রেস্ট নিয়ে সন্ধের পর বাড়িটায় ঢুকব ভেবেছিলুম।'

দীপক মুচকি হেসে বলল, 'শেষ দেখা দেখে নিচ্ছে। কাল তো আর আমাদের জ্যান্তো দেখার আশা কম।'

গোলকপতি রাগে মুখ ভেটকায়।

দিনের আলো ক্রমে নিভে আসে। ঝাঁকড়া গাছগুলোর ছায়া ঘিরে ধরছে বাড়িটাকে। বাতাসের বেগ আর শোঁ শোঁ আওয়াজ বাড়ছে। থমথমে হয়ে উঠছে চারপাশ।

দীপক রায়বাড়ির ছাদে ঝুঁকেপড়া গাছের ডালপালার নড়াচড়া দেখতে দেখতে ভাবে—ওই ছায়া, ওই আলো-আঁধারিকে ভুল করা অসম্ভব নয়। যেন রাতে কেউ দাঁড়িয়ে আছে ছাদে। চলাফেরা করছে কিনার ঘেঁষে।

গ্রামের বয়স্করা উসখুস করে এবার। শচীন কর্মকার উঠে পড়লেন, 'তাহলে আমি চলি। একটু কাজ আছে বাসায়।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনাদের আর আটকাব না। কাল দেখা হবে।' অলোকনাথ তৎক্ষণাৎ বিদায় জানায়।

আস্তে আস্তে বয়স্ক লোকেরা চলে যায়, কিন্তু ছেলে-ছোকরার দল তখনো নড়ে না।

গোলকপতি সন্দিগ্ধভাবে বলল, 'ছোঁড়াগুলো বাড়ির ভিতর অবধি পিছু নেবে না তো? তাহলে আর বড়কর্তার দর্শন পেয়েছি?'

'দেখা যাক', দীপক উঠে পড়ে, 'চলুন বাড়ির ভিতরে গিয়ে একটু গড়িয়ে নিই।'

সঙ্গী দুজনও উঠে পড়ে। গ্রামের ছেলেরা কিন্তু বাড়ির ভিতরে ঢোকে না।

আপাতত হলঘরে বসে না দীপকরা। ঘরের ভিতর খুব হাওয়া। তবু একটা বোটকা গন্ধ ভাসছে। ওরা বাইরে বারান্দায় খবরের কাগজ পেতে পা ছড়িয়ে বসে, থামে ঠেস দিয়ে।

হঠাৎ কোত্থেকে একটি লোক এসে সামনে দাঁড়াল।

মানুষটি ছোটখাটো। রং কালো। মাঝবয়সি। পরনে খাটো ধুতি ও ফতুয়া। পা খালি। মুখে বিনয়ী লাজুক হাসি।

সে হাত কচলাতে কচলাতে মৃদু নরম সুরে বলল, 'আজ্ঞে শুনলেম। তাই এলেম দেখতে।'

'কি শুনলে?' দীপক অবাক হয়ে বলে।

'আজ্ঞে, আপনারা নাকি এখানে রাত কাটাবেন?'

'হুঁ।' অলোকনাথের সংক্ষিপ্ত জবাব।

'তা বেশ।' লোকটি ইতি-উতি চেয়ে হলঘরটা দেখিয়ে বলে, 'ওই ঘরে থাকবেন বুঝি?'

'হ্যাঁ।'

'ঘরে বড়কত্তার ছবিখানা দেখেছেন?' লোকটি আগ্রহ ভরে জিগ্যেস করে।

'হুঁম্।' দায়সারা জবাব দেয় অলোকনাথ। বিরক্ত হচ্ছে। এ আপদ আবার কোত্থেকে জুটল?

'ভারী মানী লোক ছিলেন বড়কত্তা। যেমন দাপট। আবার দান-ধ্যানও ছিল খুব। আহা ছারখার হয়ে গেল অমন সোনার সংসার।' লোকটি নিজের মনেই বকে চলে।

দীপকরা নিস্পৃহভাবে বসে থাকে। সাড়া দেয় না।

লোকটি হঠাৎ বলল, 'বাবু এ-বাড়ি আমায় ভীষণ টানে। এ-বাড়ির কত যে কাহিনি জানি। ফুরসৎ পেলেই বাড়িটা একবার ঘুরে দেখে নিই। বড়কত্তার ছবিটা দেখি। পেন্নাম জানাই।'

দীপকরা এবার বেশ অবাক হয়। দীপক বলে, 'তুমি কি এখানেই থাক? এই গাঁয়ে?'

'আজ্ঞে।' ঘাড় হেলায় লোকটি।

'কি নাম তোমার?'

'আজ্ঞে অভয়পদ হাজরা।' বলেই লোকটি ব্যস্ত হয়ে বলল, 'যাই বড়কত্তার ছবিটা একবার দর্শন করে আসি। আলো কমে আসছে।'

অভয়পদ লঘু পায়ে ঢুকে যায় হলঘরে। দীপকরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। কত বিচিত্র মানুষ যে আছে! আজও রায়বাড়ির প্রাচীন গৌরব নিয়ে রোমন্থন করে।

খানিক বাদে ঘর থেকে বেরিয়ে ফের সামনে আসে অভয়পদ। মুখ উজ্জ্বল। বলে, 'ওঃ, সাক্ষাৎ পুরুষসিংহ। কি দৃষ্টি! যেন বর্শাফলক। আপনারা নিশ্চিন্তে থাকুন, কত্তা ভালো মানুষদের অপকার করেন না।'

গোলকপতি রসিকতা করে, 'অভয় তোমার তো খুব সাহস। সন্ধে হলে নাকি এ বাড়িতে কেউ ঢোকে না।'

অভয়পদ বিনীত হাস্যে নীরবে প্রশংসাটা হজম করে। তারপর বলে, 'আজ্ঞে চলি এখন।'

সে হাতজোড় করে নমস্কার জানিয়ে সুড়ুৎ করে বেরিয়ে গেল। সদর দিয়ে গেল না। গেল খিড়কি পথ দিয়ে। বাড়ির পিছন দিকে।

থামের আড়ালে একটা মোমবাতি জ্বেলে তিনজন চুপচাপ বসে থাকে বারান্দায়। কেন জানি না, কথাবার্তা কইতে ইচ্ছে করে না।

দিনের আলোর শেষ রেশটুকু মিলিয়ে যায়। মাথার ওপর আকাশে ফুটে ওঠে একটি দুটি করে তারা। হালকা জ্যোৎস্নার রুপোলি আভা স্পষ্ট হয়।

বাড়ির পরিবেশ রীতিমতো ছমছমে হয়ে ওঠে।

অদৃশ্য পায়রাগুলি ঝটপট করে। অন্ধকার চিরে শূন্যে পাক খায় চামচিকেরা। চাঁদের আলো আর বাড়ির নানা অংশের ছায়া জাল বোনে উঠোনে, দেয়ালের গায়ে।

সোঁ সোঁ করে ধেয়ে আসা বাতাস অট্টালিকার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ছিল। বাড়ির অজস্র ফাটল আর ফাঁক-ফোকরে হাওয়া ঢুকে শব্দ তোলে! মনে হয় যেন গোটা বাড়িখানা দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে ঘন ঘন।

অন্ধকারের আড়াল থেকে কত বিচিত্র আওয়াজ ভেসে আসে।

চ্যাঁ চ্যাঁ চ্যাঁ। তীক্ষ্ণ আওয়াজে তিনজন শিউরে ওঠে সহসা। ঠিক যেন মানবশিশুর কান্না। তারপরই দীপক হেসে বলে, 'শকুনের ছানার ডাক। আমি আগে শুনেছি। কাছে কোথাও বাসা আছে শকুনের।'

শুধু অনেক অজানা শব্দ নয়, অনেক অদৃশ্য নড়াচড়া টের পায় তারা। স্নায়ু টানটান। সজাগ

তাদের চোখ, সতর্ক কান। অস্বস্তি বাড়ে। কেবলই অনুভব করে, অট্টালিকার কোণে কোণে জমাট আঁধার ফুঁড়ে কাদের চোখ যেন লক্ষ করছে তাদের।

ওরা উঠে পড়ে। এবার হলঘরে ঢোকে। হ্যারিকেনটা জ্বালে। মোমবাতিটাও জ্বলছে। তবে শিখাটা লাফাচ্ছে বাতাসে। যে কোনও সময়ে দপ্ করে শেষ নিশ্বাস ফেলবে।

রাতের খাওয়া সেরে নেয় দীপকরা। পাঁউরুটি-মাখন আর কলা। জল খায়।

খানিক বাদে গোলকপতি বড় বড় হাই তুলতে লাগল। আড়মোড়া ভেঙে বলল, 'আঃ, ঘুম পাচ্ছে। সারাদিন রেস্ট হয়নি।'

সে মাদুরে চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়ে বলল, 'একটু ঘুমিয়ে নিই। ঘণ্টাখানেক বাদে ডেকে দিও। এখন তো মোটে আটটা। তেনারা তো শুনেছি মাঝরাতের আগে দেখা দেন না।'

ব্যস, গোলকপতি ভোঁস ভোঁস করে ঘুমাতে লাগল।

খানিক পরে অলোকনাথও শুয়ে পড়ল গোলকপতির পাশে। হাই তুলে বলল, 'সত্যি খুব টায়ার্ড লাগছে। একটু গড়িয়ে নিই।'

একটু পরে দীপক দেখে অলোকনাথও ঘুমাচ্ছে।

সে ভাবল, বাঃ, এরা তো আচ্ছা লোক। ভূত দেখতে এসে পোড়োবাড়িতে দিব্যি নিশ্চিন্তে ঘুম মারল। নার্ভ বটে।

দীপকেরও ক্লান্তি বোধ হচ্ছিল। তবে তার রাত জাগা অভ্যেস আছে। খবরের কাগজে অনেক সময় কাজ করতে হয় রাত জেগে। সে চেয়ারখানা টেনে নিয়ে বসল খোলা জানলার সামনে। সঙ্গে ফ্লাস্কে চা আছে। মাঝরাতে খাওয়া যাবে আর ভোরবেলা।

হালকা চাঁদের আলোয় দেখা যাচ্ছে বাইরে ধু-ধু মাঠ, নদীর উঁচু পাড়, কালো কালো ঝোপঝাড় গাছ। ভারী রহস্যময় প্রকৃতি। আকাশে অগুনতি টিপটিপ আলো জ্বলা তারা। খট্-খট্-খট্—সেই রকম কাঠে কাঠে ঠোক্কর লাগার শব্দ দোতলায়। যেন কেউ খড়ম পায়ে হাঁটছে।

বড়কর্তার ছবিখানার দিকে তাকাল দীপক। ঘরের স্বল্প আলোয় তাঁর বড় বড় চোখের তীব্র দৃষ্টি যেন লক্ষ করছে দীপককে। গা ছমছম করে।

জল তেষ্টা পাচ্ছিল। দীপক উঠে জল খেল কলসি থেকে।

বাতাসে গ্রীষ্ম দিনের গরম ভাপ আর নেই। নদীর দিক থেকে আসা হু-হু হাওয়ায় চমৎকার শীতল ভাব। মোলায়েম স্পর্শ বুলিয়ে দিচ্ছে গায়ে-মুখে। দীপকের ঢুলুনি আসতে থাকে। সে পা ছড়িয়ে আরাম করে বসে।

দীপক চোখ মেলে চমকে খাড়া হয়ে বসল।

মুখে সূর্যের আলো পড়ছে। সে চেয়ারে বসে। ঘাড়ে বেশ ব্যথা।

তার মানে? ভোর হয়ে গেছে! রাত কাবার! সে ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিয়েছে গোটা রাত এই চেয়ারেই!

দীপক ঘাড় ফিরিয়ে দেখে যে গোলকপতি এবং অলোকনাথ মেঝেতে মাদুরে শুয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। দীপক তাড়াতাড়ি গিয়ে তাদের ঠেলা মারে, 'ও মশাই, উঠুন উঠুন। ভোর হয়ে গেছে।'

অলোকনাথ ধড়মড় করে উঠে বসে বলে, 'অ্যাঁ সত্যি তো! ডাকেননি কেন?'

দীপক বলে, 'ডাকব কি? আমিও যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।'

গোলকপতি উঠতে চায় না। অলোকনাথের রাম ধাক্কা খেয়ে তার নিদ্রাসুখ ঘুচল। উঠে বসে, ব্যাপারটা বুঝতে পেরে গোল গোল চোখে বলল, 'যাঃ, ভূত দেখা মিস্ হয়ে গেল যে। বড়কর্তা হয়তো ঘুরে গেছেন। অতিথিরা ঘুমোচ্ছে দেখে আর ডিসটার্ব করেননি। যাক্‌গে চা দে। দেখি ফ্লাস্কটা।'

কিন্তু ফ্লাস্ক কৈ?

তারপরই আবিষ্কার হল যে শুধু ফ্লাস্কটা নয়, তাদের ক্যামেরা, টেপ-রেকর্ডারও নেই। মেঝেতে তাদের পাশেই রাখা ছিল। সব হাওয়া।

'অ্যাঁ, আমার ঘড়ি?' দীপক নিজের বাঁ হাতের কব্জি দেখে আঁতকায়।

দেখা গেল, বাকি দুজনেরও রিস্টওয়াচ নেই হাতে।

কে সরাল?

তিনজন বেরোয় তাড়াতাড়ি।

আঁতিপাতি করে খুঁজতে থাকে গোটা বাড়ি। নাঃ কোথাও নেই তাদের জিনিস। বাড়ি যথারীতি জনমানবহীন।

তারা বেরোয় সদর দিয়ে।

ভাঙা পাঁচিলের কাছে এক দল গ্রামের লোক জড়ো হয়েছে সেই ভোরে। বোধহয় আগন্তুকদের খুঁজে বাড়িতে ঢুকবে কিনা প্ল্যান করছিল। দীপকদের দেখে ছুটে আসে।

দীপকরা তাদের দিকে দিকপাত না করে হন্তদন্ত হয়ে খুঁজতে থাকে। তিনজন তিনদিকে।

একটু পরেই দীপকের ডাক শোনা যায়। বাড়ির পিছনে খিড়কির দিক থেকে, 'ও গোলকবাবু, ও অলোকবাবু, এদিকে আসুন। শীগগির।'

গোলকপতি এবং অলোকনাথ ডাক লক্ষ করে ছোটে। তাদের পিছু নেয় গাঁয়ের লোক।

বাড়ির খিড়কি-দরজা থেকে সামান্য দূরে একটা দৃশ্য দেখে থমকে যায় সবাই।

সেই অভয়পদ মাটিতে পড়ে আছে। একদম বেহুঁশ। তার কাছে উবু হয়ে বসে দীপক একটা চটের থলি থেকে বের করছে ক্যামেরা। টেপ-রেকর্ডার ও ফ্লাস্কটা রয়েছে পাশে। মাটিতে।

'একি! এ তো আমাদের জিনিসগুলো।' গোলকপতি, অলোকনাথ সরবে চেঁচায়।

'হুঁ' দীপক ঘাড় নেড়ে এবার থলি থেকে বের করে তাদের তিনটি রিস্টওয়াচ।

'এখানে কি করে এল? কে আনল?' উত্তেজিত গোলকপতির প্রশ্ন।

দীপক বলল, 'জানি না তবে মনে হচ্ছে এরই কীর্তি।' দীপক অভয়পদকে দেখায়।

'আরে ঘেঁটু!' কয়েকজন গাঁয়ের লোক অভয়পদকে দেখে অবাক হয়ে বলে ওঠে।

অভয়পদর মুখে-চোখে খানিকক্ষণ জলের ঝাপটা দেবার পর সে চোখ মেলে। ফ্যালফ্যালে চাউনি। বসানো হয় তাকে। হঠাৎ সে একটা চিৎকার দিয়ে উঠে ছুটে পালাতে যায়। গাঁয়ের লোকেরা তাকে জাপটে ধরে। অভয়পদ বিকৃত কণ্ঠে হাঁউমাউ করতে থাকে। তাকে তখন নিয়ে যাওয়া হয় গ্রামের ভিতর। সে খানিক ধাতস্থ হলে ঘটনাটা জানা যায় একটু একটু করে। পরের সংখ্যা বঙ্গবার্তায় প্রকাশিত দীপকের রিপোর্ট থেকে কিছু কিছু অংশ তুলে দিচ্ছি। পাঠক বুঝতে পারবেন আসল ব্যাপারটা কি ঘটেছিল।

অভয়পদর বাড়ি মোটেই নন্দনপুর নয়। সে থাকে অজয় নদের ওপারে। ও একজন দাগী চোর। অভয়পদ ওর আসল নাম নয়। ওর আসল নাম বংশীবদন। তবে ও ঘেঁটু নামেই পরিচিত।

সেদিন ঘেঁটু নন্দনপুরে গিয়েছিল একটা দরকারে। তখন আমাদের তিনজনকে দেখে। শোনে আমাদের উদ্দেশ্য। ভিড়ের মধ্যে লুকিয়ে নজর করে আমাদের দামি ক্যামেরা, টেপ-রেকর্ডার, ঘড়ি। অমনি মতলব খেলে যায় তার মাথায়। তখুনি চলে যায় পাশের গ্রামে তার এক স্যাঙাতের বাসায়। সেখান থেকে জোগাড় করে ঘুমের ওষুধ। তারপর ফিরে আসে। সুযোগ মতো অন্যদের চোখ এড়িয়ে রায়বাড়িতে ঢুকে একা আলাপ জমায় আমাদের সঙ্গে। বড়কর্তার ছবি দেখার ছল করে হলঘরে ঢুকে সে কলসিতে আমাদের খাবার জলে মিশিয়ে দেয় ঘুমের ওষুধ....ওই জল খেয়েই আমরা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ি....

ঘেঁটু ওরফে অভয়পদ লুকিয়ে ছিল কাছেই। বাইরে একটা গাছে চড়ে নজর রেখেছিল হলঘরের ভিতর।

আমরা ঘুমিয়ে পড়তে সে খিড়কি দিয়ে ঢোকে। আমাদের ক্যামেরা ইত্যাদি দামি জিনিস হস্তগত করে।

ঘেঁটু খিড়কি দিয়ে বেরিয়ে যখন পালাচ্ছে হঠাৎ নাকি দু'হাত মেলে তার পথ আগলে দাঁড়ায় মিশকালো এক বিশাল ছায়ামূর্তি। চাপা রক্তহিম করা গলায় সে হুংকার দেয়, 'এই ব্যাটা।'

ঘেঁটু কাঠ হয়ে যায় ভয়ে।

ছায়া দানব ঘড়ঘড়ে চাপা কণ্ঠে গর্জায়, 'রায়বাড়িতে চুরি করে পালাবি? কি ভেবেছিস? কেন, ভৈরব সর্দার কি নেই? শয়তান—'

বলতে বলতেই সেই ছায়ামূর্তি নাকি এক হাত বাড়িয়ে বরফশীতল বজ্রকঠিন মুঠিতে ঘেঁটুর চুলের গোছা পাকড়ে তুলে তাকে আছড়ে ফেলে দেয় মাটিতে। ঘেঁটু তখুনি জ্ঞান হারায়.......

নন্দনপুরের লোকেদের কাছে জানা গেছে যে ভৈরব সর্দার ছিল রায়বাড়ির এক দুর্ধর্ষ লেঠেল। প্রায় পঁচাত্তর বছর আগে সেই কলেরার মড়কে ভৈরবও মারা যায়।

ঘেঁটু এখনো সারেনি। মাঝে মাঝে পাগলের মতো করছে। চেঁচিয়ে উঠছে আতঙ্কে। অন্ধকারে কিছুতেই একা থাকতে চায় না। ডাক্তার বলেছে, ওর নার্ভে প্রচণ্ড শক্ লেগেছে। হয়তো ও সুস্থ হবে। তবে সময় লাগবে।

ঘেঁটুকে চুরির দায়ে আর পুলিশে দেওয়া হয়নি। কারণ এ-যাত্রা তার যথেষ্ট শাস্তি হয়েছে।

আশ্বিন ১৪০০

ভূতের খপ্পরে

রবিদাস সাহারায়

নেড়াদের বেলতলায় ছিল ভূতের মস্ত বড় আড্ডা। গেছো ভূত, মেছো ভূত, মামদো ভূত, সিট্‌কে ভূত, শাঁকচুন্নী—সব কিছু কায়েমিভাবে বাসা বেঁধেছিল ঐ বেলগাছটার তলায়।

নামেই ওটা বেলতলা, কিন্তু হিজল, তেঁতুল, তাল, তমাল—অনেকরকম গাছের মিলন ঘটেছে সেখানে। অর্থাৎ ভূতপ্রেতরা যে সব গাছে থাকতে ভালোবাসে সে সব গাছের মোটেই অভাব নেই। কাজেই ভূতদের ওখানে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত।

দিনের বেলাই ওপথ দিয়ে যেতে বুক ধড়ফড় করে। আর রাতের বেলা!....একা গেলে কাউকে আর প্রাণ নিয়ে বাড়িতে ফিরতে হবে না।

এই তো সেদিন হরু ঠাকুরের বাড়ি বেড়াতে এসেছিল তাঁর ভাগনে চেতন ঠাকুর। ঠিক দুক্‌কুর বেলা। নেড়াদের বেলতলার কাছাকাছি যেই এসেছে অমনি তিনটে ভূত সুড়সুড় করে গাছ থেকে নেমে এসে বলল—পেন্নাম হই ঠাকুর। আপনি বুঝি এ গাঁয়ে নতুন এলেন?

চেতন ঠাকুর তো চমকে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। দিনের বেলায় ভূত—এ যেন সে বিশ্বাস করতেই চাইল না। কিন্তু না বিশ্বাস করেই বা উপায় কি? চোখের সামনে জলজ্যান্ত ভূত! তাই তার মাথা গেল ঘুলিয়ে।

ভূতরা খ্যানখেনে গলায় বলল—কি, আমাদের কথা বুঝি মশাইর কানেই যাচ্ছে না? বলি এ গাঁয়ে কি নতুন এলেন?

চেতন ঠাকুরের তো চেতনা হারাবার যোগাড়। চোখ ছানাবড়া করে আমতা আমতা করে বলল—অ্যাঁ, অ্যাঁ হ্যাঁ—নতুন এসেছি।

হাতে ওটা কি? ইলিশ মাছ বুঝি? একটি ভূত চেতন ঠাকুরের হাতে ঝুলানো মুখবাঁধা হাঁড়িটা দেখিয়ে জিগ্যেস করলে।

অ্যাঁ—অ্যাঁ...হ্যাঁ, হ্যাঁ...চেতন ঠাকুরের এবার চেতনা হল—সত্যি হাতে হাঁড়ির ভেতর ইলিশ মাছ। মামা হরু ঠাকুর ইলিশ মাছ খেতে ভালোবাসেন বলে তার মা ইলিশ মাছ কুটে, নুন মাখিয়ে দিয়েছে।

হেঁ—হেঁ—হেঁ...আমরা গাছের ডাল থেকেই গন্ধ পেয়েছি...আমাদের সঙ্গে চালাকি!

কিন্তু মামার জন্য নিয়ে আসা ইলিশ মাছে ভাগ বসাবে এই ভূতেরা? সেটা কি প্রাণে সইবে? তাই সে বলল—না না, ইলিশ মাছ নয়!

তবু মনে তার বড্ড ভয়। তাই ভূত তাড়াবার মন্ত্র আওড়াতে লাগল—

ভূত আমার পুত
পেত্নী আমার ঝি,
রা—রা—রা...

আর বলতে পারল না কিছু। সব কিছু যেন গুলিয়ে যেতে লাগল।

ভূতেরা নাচতে লাগল ধেই ধেই করে।

দাও দাও ইলিশ মাছ...

খাব খাব ইলিশ মাছ...

দাও দাও...

খাব...খাব...

চেতন ঠাকুর মাছের হাঁড়িটা আড়াল করতে চাইল। কিন্তু এবার ভূত তিনটি তার চারদিকে ঘিরে শুরু করল প্রলয় নাচ।

তোর ঘাড় মটকে খাব!

তোর পেটটি চিরে খাব!!

তোর হাড় চিবিয়ে খাব!!!

চেতন ঠাকুর দেখল ব্যাপারটা সুবিধের নয়। আগে নিজে বাঁচলে বাপের নাম। তাই মাছের হাঁড়িটা ছুঁড়ে ফেলেই দে ছুট্। ছুটতে ছুটতে চেতন ঠাকুর একেবারে মামার বাড়িতে। আর এসেই একেবারে অচৈতন্য। মাথায় একুশ কলস জল ঢালবার পর নাকি চেতন ঠাকুরের চেতনা ফিরেছিল।

চেতনা ফেরার পর হরু ঠাকুর ভাগনের মুখে শুনতে পেলেন সব কাহিনি। শুনেই তো চটে একেবারে আগুন। কি, ভূতের এত আস্পর্ধা! হরু ঠাকুরের ইলিশ মাছ খাবে ভূতেরা! আচ্ছা, রসো!

হরু ঠাকুর ঝাড়ফুঁক মন্ত্র জানতেন অনেক। সেদিনই এক মুঠো সরষে মন্ত্র পড়ে ছড়িয়ে দিলেন বেলতলার সামনে। আর যায় কোথায়! হুড় হুড় করে গাছ থেকে নেমে এল ভূতের দল। আর কি নাচন-কুঁদন!

হরু ঠাকুর বললেন—আমার ইলিশ মাছ নিয়েছিস কেন?

ভূতেরা বলল—আপনার ইলিশ মাছ নেব কেন ঠাকুর? সে তো একটা উট্‌কো লোকের মাছ!

হরু ঠাকুর বললেন—আমার ভাগ্নের মাছ। আমার জন্যই তো এনেছিল।

ভূতেরা বলল—দোহাই ঠাকুর। তোমার মাছ জানলে নিতাম না। এখনো সে মাছ খাইনি। নিয়ে যাও তোমার মাছ।

একটি ভূত গাছের ডাল থেকে নিয়ে এল সেই হাঁড়ি। হরু ঠাকুর বললেন—দে, আমার এত সাধের ইলিশ মাছ! তবে তোরাও যখন আশা করেছিস, নে এর থেকে দু'চার টুকরো।

হরু ঠাকুর নিজেই ল্যাজার আর মাথার কাছ থেকে দু'এক টুকরো পাতলা কাঁটাওয়ালা মাছ বেছে দিলেন।

তবে আমাদের ছেড়ে দাও ঠাকুর! ভূতেরা কাকুতি-মিনতি করতে লাগল।

হরু ঠাকুর আবার সরষেতে মন্ত্র ফুঁকে ভূতদের মুক্ত করে দিলেন। তারপর হনহন করে ইলিশ মাছের হাঁড়িটা নিয়ে ছুটে চললেন বাড়ির দিকে।

ভূতেরা মুক্তি পেল বটে—কিন্তু হরু ঠাকুরের উপর মনে মনে চটে রইল। ভাবল—বাগে পেলেই তারা হরু ঠাকুরের ঘাড় মটকাবে।

এইভাবে কেটে যায় দু'মাস—এক বছর।

একদিন সন্ধ্যাবেলায় হরু ঠাকুর ফিরছেন কাজলগাঁয়ের হাট থেকে। হাতে ঝোলাভরতি হাটের সওদা—মাছ, তরিতরকারি আর ফলফলাদি। ফিরতে একটু দেরি হয়ে গেছে—তাই পথে আজ লোকজন নেই।

বেলতলার কাছ দিয়ে যেতেই একটা যেন দমকা হাওয়া বয়ে গেল। গা'টা ছমছম করে উঠল হরু ঠাকুরের। হঠাৎ দুম্ করে একটা শব্দ হল। হরু ঠাকুর চমকে উঠেই দেখলেন—একটা ভূত লাফ দিয়ে গাছ থেকে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে আর একটা দুম্ শব্দ। দেখলেন—আরও একটা ভূত লাফিয়ে তাঁর সামনে পড়েছে।

হরু ঠাকুর অবাক হয়ে জিগ্যেস করলেন—কিরে, ব্যাপার কি?

প্রথম ভূত হাতজোড় করে বলল—আজ্ঞে ঠাকুর মশাই, আমরা বড় বিপদে পড়েছি।

হরু ঠাকুর জিগ্যেস করলেন—কি বিপদ?

ভূত বলল—আজ্ঞে আমাদের বাবা গত হয়েছেন।

কবে?

এই মঙ্গলবারে অমাবস্যার দিন।

কি হয়েছিল?

ঐ বাগদীপাড়ায় হাতিমাথাওলা বাগদীর উপর ভর করতে গিয়ে—

হাতিমাথাওলা বাগদী? সে আবার কে?

ঐ যে গো—তোমরা আবার ঠাকুর-দেবতার নাম রাখো কিনা—সে সব নাম যে আমাদের নিতে নেই—ঐ যে সেই গাঁজাখোর দেব্‌তার ছেলের নাম—

ওঃ, সেই গণেশের কথা বলছিস? গণেশ বাগদী?

হ্যাঁ গো হ্যাঁ। ওর উপর ভর করতে গিয়েই তো এমন পেট খারাপ হল যে সেদিন রাত্রেই একেবারে অক্কা।

হরু ঠাকুর মৌখিক শোক প্রকাশ করে বললেন—আহা, তোর বাবা মরে গেল! বড় ভালো লোক ছিল রে!

ভূত গদ্গদ স্বরে বলল—হ্যাঁ কর্তা, বাবা তো আপনাকে খুব ভালোবাসত। তাই বলছি কি, তার সৎকাজটাও আপনি করে দিন।

হরু ঠাকুর অবাক হয়ে জিগ্যেস করলেন—মানে? কি করতে বলিস আমাকে?

আজ্ঞে বাবার শ্রাদ্ধটা শুদ্ধু ভাবে করতে চাই। আমরা তো আর তন্তর-মন্তর জানি না। কাজেই পুরোতগিরির কাজটা আপনাকেই করতে হবে।

একথা শুনে হরু ঠাকুরের বুকটা টিপটিপ করতে লাগল। সর্বনাশ! মানুষ হয়ে করবেন ভূতের পুরোতগিরি!

চোখে তিনি আকাশ-পাতাল দেখতে লাগলেন।

এদিকে দুমদাম শব্দ করে আরও কয়েকটি ভূত গাছ থেকে লাফিয়ে পড়ল। সবাই ঘিরে ধরল হরু ঠাকুরকে। বলল—ঠাকুর মশাই! রাজি হতেই হবে—নইলে পথ ছাড়ব না।

হরু ঠাকুর দেখলেন—এ এক বিষম সংকট! এখন স্বীকার না হয়েও কোনো উপায় নেই। তাছাড়া পথে-ঘাটে রাত-বিরেতে কতরকম বিপদ ঘটতে পারে। কাজেই এদের মন খুশি না করলেও চলে না। তাছাড়া একটা বুদ্ধি করে বাঁচতে হবে। তাই জিগ্যেস করলেন—তোদের বাবার শ্রাদ্ধ কবে?

আজকেই।

সে কি রে! সন্ধ্যা তো হয়ে এল। সন্ধ্যাবেলা কি শ্রাদ্ধ হয়? দিনের বেলা তো শ্রাদ্ধ করতে হয়।

আপনাদের মানুষদের শ্রাদ্ধ হয় দিনের বেলা। আমাদের শ্রাদ্ধ রাত্তির বেলাতেই হয় কর্তা!

হরু ঠাকুর দেখলেন মহা বিপদ। স্বীকার না হয়েও উপায় নেই। তাই বললেন—শ্রাদ্ধ করা তো মুখের কথা নয়। যোগাড়যন্তর সব করতে হবে—তবে তো—

ভূতেরা বলল—আমাদের যোগাড়যন্তর সব ঠিক আছে কর্তা। আপনি বসে গেলেই হল। খাবার-দাবারও সব তৈরি।

হরু ঠাকুর দেখলেন—সত্যি গাছের তলায় বড় বড় মানকচুর পাতায়, মরা মানুষের মাথার খুলিতে কত সব জিনিসপত্তর সাজানো। কেঁচোর চড়চড়ি, মরা ইঁদুরের ঘণ্ট, শুকনো মরা কাকের কাবাব, আরো কত কিছু—

হরু ঠাকুর ওসব দেখে বললেন—সত্যি তোরা পেল্লায় আয়োজন করেছিস্‌ রে!

গাছের তলায় টিমটিম করে বাতি জ্বলছে। একটু পরেই হরু ঠাকুর বুঝলেন—ওটা বাতি নয়। কতগুলো জোনাকি পোকা ধরে গোবরের মধ্যে গুঁজে রাখা হয়েছে—তার মধ্য থেকেই ঠিকরে বেরুচ্ছে সেই আলো।

একটা জায়গা নিকিয়ে পরিষ্কার করা হয়েছে। একটা খড়ের আসনও পাতা হয়েছে সেখানে। একটি ভূত বলল—এখানে বসুন কর্তা।

হরু ঠাকুর সেখানে বসলেন। মনে মনে ভাবলেন, আচ্ছা ফ্যাসাদে পড়া গেছে। আজ বুঝি ভূতের হাতেই বেঘোরে প্রাণটা যায়!

হঠাৎ হরু ঠাকুরের মাথায় একটা বুদ্ধি গজাল। তিনি বললেন—আরও একটা আসন লাগবে যে! যে পিণ্ডি দেবে তাকেও তো এখানে বসতে হবে।

সঙ্গে সঙ্গে হুকুম তামিল হল। একটা ভূত হাত বাড়িয়ে দিল—সেই হাতটা লম্বা হতে হতে

গিয়ে ঠেকল জলার ধারের কাশবনে—সেখান থেকে এক মুঠো কাশ ছিঁড়ে আনল। চোখের নিমেষে আসন তৈরি হয়ে গেল। চোখ ছানাবড়া করে হরু ঠাকুর ব্যাপারটা দেখলেন।

পাশেই আসন পাতা হয়ে গেল। হরু ঠাকুর বললেন—তোরা একজন এখানে বোস্, মন্ত্র পড়তে হবে।

একটা ভূত এগিয়ে এসে জিগ্যেস করল—পিণ্ডি দেবার সময় ঐ আকাশের ওপরে যারা থাকে তেনাদের নাম বলতে হবে না তো?

হরু ঠাকুর বললেন—কাদের নাম? ওঃ, সেই দেবতাদের নাম? না না, তা বলতে হবে না।

হরু ঠাকুরের হাতে যে ঝোলাটা ছিল তাতে ছিল অনেক খাবার-দাবার। সেটার উপর দৃষ্টি সব ভূতেরই পড়েছিল—আর লোভও ছিল সকলেরই। তারা ভেবেছিল ঠাকুরমশাই যেই মন্ত্র পড়তে আসনে গিয়ে বসবেন তখনই ঐসব জিনিসের সদ্‌গতি করবে। কাজেই হরু ঠাকুর ঝোলাটা পাশে রেখে আসনে বসতেই কয়েকটি ভূত উঁকিঝুঁকি মারতে লাগল।

হরু ঠাকুর তা বুঝতে পেরে বললেন—শোন্ সবাই তোরা উপুস করে আছিস তো? শ্রাদ্ধ শেষ না হওয়া অবধি উপুস থাকতে হয়।

এবার আর কোনো ভূতের মুখে রা নেই।

হরু ঠাকুর বললেন—আমার ঝোলায় আছে সন্দেশ, মিহিদানা, গজা আর দরবেশ। তোদের শ্রাদ্ধের জন্যই এনেছি। যে উপুস থেকে শ্রাদ্ধের মন্তর পড়বে সে-ই শুধু ওগুলো খাবে। অন্য কারুর আজ ওসব খেতে একেবারে নিষেধ।

কথা শেষ করতে না করতে একটি সিট্‌কে ভূত আসনের উপর গিয়ে বসে পড়ল। বলল—আমি মন্তর পড়ব।

সঙ্গে সঙ্গে আর একটি মামদো ভূত তাকে টেনে তুলে ফেলল। বলল—কি, তুই পড়বি মন্তর? তুই উপুস করেছিস?

করিনি?

হুম্, গয়লাবাড়ির গরুর বাচ্চাটাকে আজ খেল কে? ওঠ্ ওঠ্, আমি মন্তর পড়ব। বলেই দুপ্ করে মামদো ভূত আসনে বসে পড়ল।

অমনি পাশ থেকে একটা মেছো ভূত তার গালে বসিয়ে দিল একটা থাপ্পড়। বলল—কি, তুই পড়বি মন্তর? তুই আবার উপুস করলি কখন? পচা ডোবা থেকে পচা শামুকগুলো তুলে খেয়েছিস না? যা যা—আমি পড়ব মন্তর!

হঠাৎ গাছ থেকে আর একটা গেছো ভূত লাফ দিয়ে ওর ঘাড়ের উপর পড়ে বলল—ফের মিছে কথা বলছিস গোবরা? তুই আবার কোথাকার উপোসী? আজ সক্কাল বেলাতেই তো গোঁসাইদের আঁস্তাকুড় ঘেঁটে কত কিছু খেয়ে এলি। মন্তর যদি পড়ি তো আমিই পড়ব।

গোবরাও ছাড়বার পাত্র নয়। সে বিরাশি সিক্কা ওজনের এক থাপ্পড় বসিয়ে দিল গেছো ভূত নন্টের গালে। বলল—আমার উপর কর্তালি করতে আসিস কোন্ সাহসে রে? তুই কি খেয়েছিস আমি দেখিনি?

কি খেয়েছি?

ব্যাঙ খেয়েছিস।

ওদিকে আগের ভূতগুলোও হাতাহাতি শুরু করে দিয়েছে। তুমুল হাতাহাতি। যে আসনে বসতে চায় তাকেই মারে। চোখের নিমেষে এক প্রলয় কাণ্ড বেঁধে গেল।

হরু ঠাকুর বুঝলেন, এই সুযোগ। তিনি তাড়াতাড়ি উঠে ঝোলাটা হাতে নিয়েই সেখান থেকে ছুট্। মুখে মুখে রামনাম আওড়াতে লাগলেন। যত দূরে যান ততই জোরে জোরে রাম রাম বলে চেঁচান। ভয় যেন আর কাটে না। শেষ অবধি বাড়িতে এসে নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেন।

—

অগ্রহায়ণ ১৩৭০

বুড়ির ভূত

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

এবার শীতে পুপসিদের মধুপুরের বাড়ি সরগরম। কে না এসেছে! বাবা, মা, ঠাকুরদা, ঠাকুমা, মাসতুতো দিদি মুনা, মামাতো বোন কঙ্কা, টুকটুকি, এমনকি চরম কাজের মানুষ ভানুমামাও। এত লোকজন দেখে বাড়ির কেয়ারটেকার ত্রিভুবনের মুখে হাসি আর ধরে না।

আসেনি শুধু পুপসির দিদি খুকু। সদ্য খবরের কাগজের অফিসে চাকরি পেয়েছে সে, বেজায় ব্যস্ত থাকে দিনরাত। এই ফিচার, ওই রিপোর্টিং, এখানে যাওয়া, সেখানে ছোটা...। মধুপুর যাওয়ার প্রস্তাব শুনে নাক কুঁচকেছিল খুকু, অফিসের রোমাঞ্চকর কাজকর্ম ছেড়ে পাণ্ডববর্জিত পুরীতে বেড়াতে আসার তার কোনও বাসনাই নেই।

হ্যাঁ, পাণ্ডববর্জিত পুরীই বটে। পাঁচিলঘেরা পেল্লাই বাড়ি, চতুর্দিকে আম, জাম, বেল, নিম, শাল, মহুয়ার মিনি জঙ্গল। স্টেশন থেকে বাড়িটা বেশ দূর, প্রায় পাঁচ কিলোমিটার। আশেপাশে আরও খানকয়েক এরকম পুরোনো পুরোনো বাগানবাড়ি আছে বটে, কোনওটাতেই জনমনিষ্যি নেই। এ বাড়িতেও মানুষ বলতে দুজন। ত্রিভুবন আর তার বউ বাসন্তী। তারা থাকে সেই পাঁচিলের ধারে, আউট হাউসে। মাঝে মাঝে ঝাড়াঝুড়ি করা ছাড়া পুপসিদের এই দোতলা বাড়িটা প্রায় খোলাই হয় না।

পুপসিদের ট্রেন মধুপুর পৌঁছেছিল বিকেল তিনটেয়। ত্রিভুবনকে আগেই খবর দেওয়া ছিল, সার সার ঘর খুলে রেখেছে সে। স্থানীয় একটা লোককে ধরে গোটা বাড়ি ঝকঝকে তকতকে করে ফেলেছে।

ডিসেম্বরের শেষ। দিন এখন খুব ছোট। পৌঁছে হাত-পা ছড়াতে না ছড়াতেই সন্ধে। উঁহু, হাত-পা ছড়ানোর উপায় কোথায়? জব্বর ঠান্ডা এখানে, শাল, সোয়েটার, টুপি, মোজা, গ্লাভস যে যা পারছে গায়ে চাপিয়ে ফেলছে। তবু শীতের হাত থেকে নিস্তার নেই, হাড়ে পর্যন্ত কাঁপুনি ধরে যায়।

এদিকে বিজলিবাতিও নেই। ঘরে ঘরে হ্যারিকেন জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে ত্রিভুবন। তবে কেউ এখন নিজের ঘরে নেই, সব্বাই জড়ো হয়েছে দোতলার হলটায়। জোর হৈ-হল্লা চলছে। গল্প-হাসি-গান...

বাসন্তী এসে আর এক প্রস্থ চা দিয়ে গেল। ছোটদের জন্য গরম গরম খাঁটি গরুর দুধ। গরুও খাঁটি, দুধও খাঁটি, খাওয়ার পর গোঁফে ইয়া পুরু দুধের সর লেগে থাকে।

পুপসির দিদা প্রীতিলতা অনেকক্ষণ ধরেই রান্নাঘরে যাওয়ার জন্য উসখুস করছিলেন। জিগ্যেস করলেন বাসন্তীকে,—হ্যাঁ রে, আজ রাতে কী খাবার?

লুচি, বেগুনভাজা, আলুচচ্চড়ি আর পেঁড়া।

ব্যস্? মুরগি-টুরগি কিছু হচ্ছে না?

মেনু ঠিক করার দায়িত্ব ভানুমামার। তাকে এবার টিমের ম্যানেজার করা হয়েছে। এসেই একটা সাইকেল জুটিয়ে সে বাজারে ছুটেছিল, নিয়ে এসেছে গাদাখানেক ময়দা, ঘি, আলু, বেগুন, লঙ্কা, পেঁয়াজ, আর মধুপুরের বিখ্যাত পেঁড়া। দোকানেই সে খান আষ্টেক পেঁড়া সাঁটিয়েছে, বাড়ি আসতে আসতে আরও গোটা পাঁচেক।

ভানু গম্ভীর ভাবে বলল, না মাতাশ্রী। আজ সারাদিন প্রচুর উল্টোপাল্টা খাওয়া হয়েছে, রাত্তিরবেলা শুধু লুচি-চচ্চড়িই ভালো।

প্রীতিলতা ঘোর আমিষাশী। মুখ বিকৃত করে বললেন, অ্যাহ্, বেড়াতে এসে মুরগি-মাটন ছাড়া মুখে রোচে?

পুপসি মাছ-মাংস খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। তার সামনে আমিষ খাওয়ার গল্প করলেও সে আহত

হয়। দিদাকে জ্ঞান দেওয়ার ভঙ্গিতে সে বলল, দ্যাখো দিদা, প্রাণীহত্যা মহাপাপ। এই যে তোমরা মুরগি-ভেড়া জবাই করো, জানো তাদের আত্মারা তোমাদের আশেপাশে ঘুরে বেড়ায়? তোমাদের অভিশাপ দেয়?

মুনা খিলখিল হেসে উঠল, মুরগিভূত? ভেড়াভূত?

ঠাট্টা করো না মুনাদিদি। ভেবো না স্কুলে পড়াচ্ছ বলে সব জেনে গেছ! পুপসি রীতিমতো গোমড়া, মানুষ মরে ভূত হতে পারে, জীবজন্তুরা পারে না?

কঙ্কা শীতে জড়োসড়ো হয়ে পুপসির মায়ের গা ঘেঁষে বসে। কাঁদো কাঁদো মুখে সে বলে উঠল, আবার ভূত-টুতের কথা বলছ কেন?

মুনা বলল, ওমা, কী বোকা রে তুই! ভূতের ভয় পাচ্ছিস?

পুপসির দাদু ধীশঙ্কর বললেন, ভূতকে কে না ভয় পায়?

কেন ভয় পাও? তুমি কি কখনও ভূত দেখেছ?

দেখেছি বৈকি। ধীশঙ্কর ভালো করে গায়ে শালটা জড়িয়ে নিলেন, জানিস তো, একসময়ে আমার কীরকম ফুটবলের নেশা ছিল। মোহনবাগান ক্লাবে না গিয়ে একদিনও থাকতে পারতাম না। একদিন ক্লাব থেকে বেরিয়ে আমি আর আমার বন্ধু দরবারি ধর্মতলার দিকে যাচ্ছি...ময়দানের মধ্যে দিয়ে গেলে অনেকটা শর্টকাট হয়, ময়দান ধরেই চলেছি...ঘুরঘুট্টে অন্ধকার, বেশ তাড়াতাড়িই মাঠটুকু পার হচ্ছিলাম আমরা, তখনই স্পষ্ট পেছনে একজনের গলা, দাদা, আপনাদের কাছে কালকের মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের টিকিট হবে? চমকে তাকিয়েছি দুজনে। ওমা, দেখি কেউ কোথ্থাও নেই। ভাবলাম আমাদের শোনার ভুল। আবার দু'পা এগিয়েছি, আবার এক প্রশ্ন! ঘুরলাম, কেউ নেই। তারপর এক পা করে হাঁটছি, আর ফিরে ফিরে তাকাচ্ছি। গলার স্বরটা সঙ্গে সঙ্গে আসছে, কিন্তু ধারে-কাছে একটি প্রাণীও নেই। আমরা দুই বন্ধু ঠকঠক করে কাঁপতে শুরু করলাম। হাঁটুতে হাঁটু লেগে যাচ্ছে। দরদর ঘামছি...

মুনা কাঁধ ঝাঁকাল, এতে কী প্রমাণ হয়? তোমরা দেখতে তো কাউকে পাওনি!

তা পাইনি। কিন্তু...

কী কিন্তু?

আজব এক কাণ্ড হল। আমাদের পকেটে তখন সত্যি সত্যি টিকিট ছিল, আমি আর দরবারি যুক্তি করে একটা টিকিট ঘাসে ফেলে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে কোথ্থেকে জোর বাতাসের ঝাপটা এল একটা, আর টিকিটটা সোঁ করে উড়ে চলে গেল। ব্যস্, তারপর ওই গলাও থেমে গেছে। আর নো প্রশ্ন, নো রিকোয়েস্ট।...এটাকে কি ভূতের এভিডেন্স বলা যায় না?

টুকটুকি দাদুর হাঁটু চেপে ধরেছে, ভূতের গল্প থাক না দাদু।

কিন্তু ভূতের গল্প একবার শুরু হলে আর কি থামে? তার ওপর যদি এমন একটা শীতের রাত হয়, যেখানে আলো-আঁধার মিশে একটা আধিভৌতিক পরিবেশ তৈরি করেছে?

দেখা গেল ঘরের অনেকেই কখনও না কখনও দেখা পেয়েছে ভূত-পেত্নিদের। পুপসির বাবা নাকি একবার এক সাইকেল ভূতের পাল্লায় পড়েছিল। পুপসির ঠাকুমা পড়েছিলেন মেছো ভূতের কবলে। প্রীতিলতাকে নাকি একবার মাদ্রাজি পেত্নি তাড়া করেছিল, প্রাণপণে পো পো করে তিনি তাকে বিদায় করেছিলেন। ভাগ্যিস প্রীতিলতার জানা ছিল তামিলে 'পো' মানে 'যা'! পুপসির মাও বাদ যায়নি, সে নাকি একবার এক ব্রহ্মদত্যির খপ্পরে পড়েছিল। ভারী ছিঁচকে ছিল ভূতটা। আসানসোলে থাকার সময়ে সুমিত্রা একটু অন্যমনস্ক হলেই নাকি কলাটা মুলোটা হাপিশ করে দিত পাশের বেলগাছের ব্রহ্মদত্যি।

একমাত্র দেখা গেল পুপসির ঠাকুরদা নিখিলনাথেরই কপাল খারাপ। তাঁর চোখের জ্যোতি বরাবরই ক্ষীণ, সে জন্যই নাকি তাঁর এ জীবনে ভূতের দর্শন পাওয়া হয়ে ওঠেনি। এই নিয়ে মৃদু আফসোসও আছে তাঁর।

ভানুমামা আর মুনা ভূতের গল্প শুনতে শুনতে হেসে গড়াগড়ি খাচ্ছিল।

ভানু বলল, আরে ছোঃ। তোমরা কখনও সাহসী লোকদের ভূত দেখতে দেখেছ?

সঙ্গে সঙ্গে মুনা সায় দিল, ঠিক ঠিক। ভূত শুধু ভীতু মানুষদেরই দেখা দেয়। ভূত মানুষের মনের ভুল। দুর্বলতা।

পুপসি চেঁচিয়ে উঠল, মোটেই না। ভূত সব্বাইকে দেখা দেয়। আমার কাছে একদিন একটা হরিণের ভূত এসেছিল। জলে ভরা কী করুণ দুটো চোখ! অবিকল মানুষের গলায় বলল, তোমরা এত নিষ্ঠুর কেন গো? বিনা কারণে কেন আমাদের মেরে ফেলো?

পেছন পেছন কোনও বাঘের ভূত আসেনি? হরিণের ভূতটাকে খেতে? ভানু অট্টহাস্যে ফেটে পড়ল, তোদের মতো লেবদুসকে নিয়ে আর পারা যায় না। ভয় পেয়ে পেয়ে তুই যেন কেমন কেবলি হয়ে গেছিস।

ত্রিভুবন দরজায় দাঁড়িয়ে। হঠাৎ সে বলে উঠল, অমন কথা বলো না ভানুদাদা, তেনারা শুনলে রাগ করবেন।...জানো, এ বাড়ির বাগানেও তেনারা আছেন!

তাই নাকি? ক'জন আছে?

একজন তো প্রায়ই দেখা দেন। এক বুড়ি। ওই কুয়োপাড়ের আমগাছটায় গলায় দড়ি দিয়েছিল। কেন এখানে এসে মরল কে জানে, হঠাৎ একদিন সকালে কুয়োর জল তুলতে গিয়ে দেখি...

তুমি কি সেই দশ বছর আগের ঘটনাটা বলছ? পুপসির ঠাকুমা সান্ত্বনা জিগ্যেস করলেন, সেই বুড়িটা এখানেই কোন গাঁয়ে থাকত না?

হ্যাঁ মা, ঠিকই ধরেছেন। ছেলেরা দেখত না মাকে, বড় দুঃখী ছিল বুড়িটা।

সে যে ভূত হয়ে এখানে আছে আগে বলোনি তো?

আপনারা ভয় পাবেন বলে বলিনি। দেখেননি, আপনারা এখানে এলে আমি আপনাদের সন্ধের পর কুয়োতলায় যেতে বারণ করি? সে তো ওই বুড়ির জন্যই। ছেলে দুটো গিয়ে যদি গয়ায় পিণ্ডি চড়িয়ে আসত, তাহলে হয়তো বুড়ি শান্ত হত। এখন তো ফি পূর্ণিমা-অমাবস্যাতেই আসছে।

এসে কী করে? ভানু চোখ ঘোরাল, হাঁউমাউখাঁউ মানুষের গন্ধ পাঁউ বলে?

না গো দাদা, খালি কাঁদে। ছেলেপিলেরা অবহেলা করলে মায়ের মরে গিয়েও যে দুঃখ যায় না গো।...মাঝে মাঝে অবশ্য ডাকেও যেন কাকে। মনে হয় ছেলেদেরই।

বেশ জম্পেশ গপ্পোটা ফেঁদেছ তো? ভানু খ্যাক খ্যাক হাসছে, তা অমাবস্যাটা কবে? তেনাকে কি দেখা যাবে?

যেতেই পারে। কালই তো অমাবস্যা। না না, আজই তো পড়ে গেছে।

বাহ্। তা এলে আজ একবার ডেকো। বুড়ির সঙ্গে একটু গপ্পোসপ্পো করা যাবে। চাই কি বুঝিয়ে-সুঝিয়ে আমি ওকে স্বর্গের রাস্তাটাও দেখিয়ে দিতে পারি।

গল্পে গল্পে রাত বাড়ছে। পথশ্রমে সকলেই আজ অল্পবিস্তর ক্লান্ত, খাওয়ার ডাক পড়তেই সবাই মিলে ছুটেছে একতলায়। আহারপর্ব চুকিয়েই যে যার মতো কাঁপতে কাঁপতে ঢুকে পড়েছে লেপ-কম্বলে।

দোতলার একটা ঘরে মুনা-পুপসি শুয়েছে। পাশের ঘরে ভানুমামা। কঙ্কা-টুকটুকি ভয়ে বেজায় কাতর, তাদের মা-বাবা সঙ্গে আসেনি বলে কোথাও তারা ভরসা পাচ্ছে না। দুজনে গুটিসুটি আশ্রয় নিয়েছে দাদু-ঠাকুমার খাটে।

গভীর রাতে হঠাৎই ঘুম ভেঙে গেল পুপসির। কেমন যেন একটা শব্দ শোনা যাচ্ছে! কান পাতল। শব্দ কোথায়? এ তো গলার আওয়াজ! কে যেন অনেক দূর থেকে ডাকছে না?

মুনাকে ঠেলল পুপসি, এই মুনাদি, ওঠ্।...শোন্।...শুনতে পাচ্ছিস?

মুনা অতি কষ্টে লেপ থেকে মুখ বার করল, কী শুনব?

কে যেন...!

আর বলতে হল না, গলার আওয়াজটা মুনার কানেও পৌঁছে গেছে। মিহি স্বরে কে যেন আবার ডাকল, মুনা...পুপসি...?

মুনা পুপসির হাত খামচে ধরল, উরি বাবারে! উরি বাবারে!

পুপসি ডুকরে উঠল, তখনই বলেছিলাম আত্মা নিয়ে ঠাট্টা-ইয়ার্কি করিস না! এখন কী হবে? কী করি বল তো?

রাম নাম কর। রাম নাম কর।

ঠান্ডা-ফান্ডা সব উবে গেছে। রাম নাম জপ করছে দু'বোন। আশ্চর্য, আওয়াজটাও থেমে গেল!

একটু বুঝি ধাতস্থ হয়েছে দুজনে, হঠাৎই একটা ধুপ করে শব্দ!

মুনা কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, ওটা কী হল রে?

বুড়িটা বোধহয় গাছ থেকে নেমে এল।

আর কোনও কথা নেই, দুই বোন হুড়মুড়িয়ে ছুটছে পাশের ঘরে, ভানুমামা...ভানুমামা...?

ভানুর দরজা ভেজানোই ছিল। আলগা ধাক্কা দিতেই খুলে গেছে।

সঙ্গে সঙ্গে লেপের ভেতর থেকে ভানুর আর্ত চিৎকার, ওরে বাবা রে! এসে গেছে রে! ছেড়ে দাও রে! আর কিছু বলব না রে!

দুই বোন কোরাসে ডেকে উঠল, ভানুমামা, আমরা। মুনা-পুপসি। তুমিও কি আমাদের মতো ভয় পেয়ে গেছ?

ও, তোরা! ওমনি তড়াক করে উঠে বসেছে ভানু, দেখলি তো, কেমন ভয় পাওয়ার অ্যাক্টিংটা করলাম!

ঘরে মৃদু হ্যারিকেনের আলো। মুনা-পুপসি মুখ চাওয়াচাওয়ি করল।

পুপসি বলল, তুমি কিছু শোননি?

কী শুনব?...যত্ত সব ভীতুর ডিম! য্যা য্যা, শুয়ে পড় গিয়ে।

বলেই আবার শোয়ার তোড়জোড় করছে ভানু। কিন্তু লেপে আর মাথা ঢোকাতে হল না। ফের শুরু হয়েছে মিহি স্বরের আহ্বান। এবার রীতিমতো কাছ থেকে। একেবারে স্পষ্ট গলা, ওরে, আমি এসেছি, দরজা খোল। ওরে মুনা-পুপসি...ভানুমামা-আ-আ...

শেষ সম্বোধনটার সঙ্গে সঙ্গে ঘরে যেন প্রলয় ঘটে গেল। লেপ-মশারিসুদ্ধ হুড়মুড় করে মেঝেতে পড়ে গেছে ভানু। লেপের ভেতর থেকে অবিকল একটা ম্যান-রোল হয়ে চিঁ চিঁ করছে, ওরে, ভানুমামা বলে ডাকে কেন রে? আমি কোন সুবাদে ও বুড়ির মামা হলাম রে?

মিহি স্বর আর হাঁকাহাঁকিতে থেমে নেই, দুমদাম ধাক্কা দিচ্ছে নীচতলার দরজায়, কী হল, দরজা খোল। আমি আর কতক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে থাকব?

ভানুর দাঁতকপাটি লেগে গেছে। ঠকঠক কাঁপতে কাঁপতে বলে চলেছে, দাঁড়িয়ে আছিস কেন? চলে যা না।

কী গো, দরজা খুলবে না? আমি কি দরজা ভেঙে ফেলব? এবার রীতিমতো শাসানি, একবার ভেতরে ঢুকি, তোমাদের সবার আমি মজা দেখাচ্ছি।

সর্বনাশ করেছে! ওরে মুনা, ওরে পুপসি, আর বুঝি রক্ষা নেই। বুড়ি আমার মুন্ডু নিয়ে গেণ্ডুয়া খেলবে!

বাড়ির সকলেই প্রায় জেগে গেছে। থম মেরে আছে সকলে। যেন কী ভয়ঙ্কর ব্যাপার ঘটতে চলেছে আন্দাজ করার চেষ্টা করছে। কঙ্কা-টুকটুকি উচ্চৈঃস্বরে কান্না জুড়ে দিল।

ক্রুদ্ধ মিহি গলা এবার ক্রমশ করুণ, খুলবে না কেউ? আমি যে ঠান্ডায় জমে গেলাম। অনেক তো হল, আর কেন শাস্তি দিচ্ছ?

আঁইই, এ যে আবার সুর বদলালো! নরম করে ডাকছে! ওরে খুলিসনি, খুলিসনি...

তবু কে যেন খুলে দিল দরজা। মিহি গলা হাঁউমাউ করতে করতে ঢুকে পড়েছে ভেতরে। তীর বেগে উঠে আসছে।

ভানু অজ্ঞান হয়ে গেল।

সকলে মিলে জলের ঝাপটা দিয়ে জ্ঞান ফেরাল ভানুর। চোখ খুলেই ভানুর প্রথম বুলি, বুড়িটা কোথায়? গেছে?

খুকু ঝুঁকল মুখের ওপর, আমি বুড়ি কেন হব? আমি খুকু। খুকু। বুড়ি তো তোমার দিদির নাম। সে তো এখন কলকাতায়।

ভানু চোখ পিটপিট করল, খুকু তুই? তুই কোথ্‌থেকে এলি?

কলকাতা থেকে। ভাবলাম পেছন পেছন চলে এসে তোমাদের একটা সারপ্রাইজ দিই। মধুপুরে ট্রেন ঢোকার কথা সাড়ে আটটায়, এল সাড়ে বারোটায়। আসানসোলে একটা মালগাড়ির ইঞ্জিন খারাপ হয়ে...!

খুকু সোজা হয়ে দাঁড়াল। পরনে জিনস্‌, পুলওভার, মাথায় ব্রিটিশ হ্যাট। দেখে কে বলবে এ ছেলে নয়, মেয়ে!

ঘরভর্তি লোকজনকে ঝাঁঝাল গলায় বলল খুকু, কখন থেকে গেটে এসে চিল্লাচ্ছি...কত কষ্ট করে একটা রিক্সাঅলাকে পটিয়ে-পাটিয়ে স্টেশন থেকে এলাম...কী তোমাদের মরণঘুম, কিছুতেই সাড়া পাওয়া যায় না! শেষে উপায় না দেখে পাঁচিল টপকালাম...জোর জোর দরজা ধাক্কাচ্ছি, তাও তোমরা....

বলতে বলতে খুকু ফের ভানুর দিকে ঝুঁকেছে, কী ভানুমামা, ভূত ভেবে বসলে? ইশ, তোমাকে আমি এতদিন সাহসী বলে জানতাম...

ভানু আবার অজ্ঞান। তবে এবার ভয়ে নয়, লজ্জায়।

——

আশ্বিন ১৪০৭

জলের দেবতা এবং ভূত

সমরেশ মজুমদার

এক গ্রামের প্রান্তে একটি চাষী পরিবার বাস করত। তারা খুব গরিব। নিজেদের কোনো জমিজমা নেই। অন্য মানুষের জমি চাষ করে যা পায় তাই দিয়ে কোনোমতে আধপেটা খেয়ে থাকে। গ্রামের পাশেই বড় নদী। কিন্তু ওই পরিবারের কেউ নদীর কাছে যেত না। কারণ তাদের এক পূর্বপুরুষ নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে ডুবে মারা গিয়েছিল। তারপর থেকেই আদেশ জারি হয়েছিল কেউ যেন ভুলেও নদীর কাছে না যায়।

চাষীর দুই ছেলে। দুজনেই বাবাকে খুব মান্য করে। বাবার সঙ্গে পরিশ্রম করে। কিন্তু একটা ব্যাপারে দুজনের খুব অমিল। বড় ছেলে রোজ রাত্রে খুব ভালো ভালো স্বপ্ন দেখে। ভালো খাবার, ভালো দৃশ্য, সুন্দর ফুল এবং দেবদেবীরা তার স্বপ্নে দেখা দেন। আর ছোট ছেলে স্বপ্ন দেখলেই যাবতীয় খারাপ দেখতে পায়। সে ইতিমধ্যে তার স্বপ্নে গেছো ভূত, শাঁকচুন্নি, স্কন্ধকাটা ভূত, ব্রহ্মদৈত্য দেখে ফেলেছে। দেখে দেখে ক্রমশ অভ্যস্ত হয়ে যাওয়ায় আর মনে ভয় আসে না।

সকালবেলায় চাষী কাজ খুঁজতে যাওয়ার সময় বড় ছেলেকে জিজ্ঞাসা করে, 'কাল রাত্রে তুই কি স্বপ্ন দেখলি বড় খোকা?'

বড় ছেলে বলল, 'পবনপুত্র বীর হনুমানকে দেখলাম। তিনি বললেন, বাবা তোমার স্বপ্নে সব দেবতা আসেন, শুধু বরুণদেব ছাড়া। কেন জানো? আমি বললাম, না তো। তখন বীর হনুমান বললেন, তুমি নদীর কাছে থেকেও কখনও নদী দ্যাখোনি, তাই।'

চাষী বলল, 'স্বপ্নে ওরকম অনেক কিছু শোনা যায় কিন্তু শুনতে নেই। তা হ্যাঁরে ছোট খোকা, কাল তুই কোন ভূত দেখলি?'

ছোট ছেলে বিষণ্ণ মুখে বলল, 'কাল কোনো ভূত-পেত্নিকে দেখতে পাইনি বাবা। তারা নাকি মেছোভূতের বাড়িতে গিয়েছিল।'

'একথা তোকে কে বলল?' চাষী জিজ্ঞাসা করল।

'একটা কানা প্যাঁচা স্বপ্নে উড়ে এল। সে-ই বলল। মেছোভূতের বাড়িতে নাকি সবার নেমন্তন্ন ছিল। নদীর বড় বড় মাছ ধরেছিল জমিদারমশাই, সব মেছোভূত নিয়ে নিয়েছে ওদের খাওয়াবে বলে। কানা প্যাঁচা আমাকে ঠাট্টা করল নেমন্তন্ন পাইনি বলে।'

চাষী বলল, 'স্বপ্নে অমন কথা অনেকেই বলে কিন্তু কান দিবি না।'

সেদিন কাজ পেল না ওরা। বৃষ্টি না হলে কাজ নেই। কাজ না হলে তো খাবার জুটবে না। খরা শুরু হয়ে গেল। চাষী আর তার ছেলেরা শাকপাতা জঙ্গল থেকে তুলে নিয়ে এসে সেদ্ধ করে খেতে লাগল। একসময় খরার দাপটে গাছের পাতাও শুকিয়ে গেল। চাষীর রাত্রে ঘুম হত না কিন্তু তার ছেলেরা বেশ ঘুমাত। সেদিন সকাল হতে চাষী দেখল বড় ছেলে মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে। চাষী তাকে কারণ জিজ্ঞাসা করতে সে বলল, 'কাল রাত্রে স্বপ্নে কোনো দেবতাকে দেখতে পাইনি। কোনো ভালো ফুল বা ভালো দৃশ্য চোখে পড়েনি। শুধু মালো পাড়ার নিবারণকাকা এক ঝুড়ি মাছ নিয়ে চলে গিয়েছিল বিক্রি করতে।'

কথাটা শুনে ছোট ছেলেও বলল, সে কাল রাত্রে নিবারণকাকাকে দেখেছে। কোনো ভূত-পেত্নি-দানব নয়। শুধু নিবারণকাকা ঝুড়ি থেকে মাছ তুলে কপ্ কপ্ করে কাঁচা খেয়ে নিচ্ছিল।

এসব শোনার পর চাষী ঠিক করল, আর নয়, এখান থেকে ছেলেদের নিয়ে দূরে কোথাও চলে

যেতে হবে। কাজের অভাবে খাবার জুটছে না, তার ওপর ছেলেরা যদি শুধু মাছের স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করে তাহলে হয়তো একদিন নদীতে মাছ ধরতে যেতে চাইবে।

অতএব পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে ওরা রওনা হল। গ্রাম ছাড়িয়ে প্রান্তর, প্রান্তর ছাড়িয়ে বন, যাচ্ছে তো যাচ্ছেই। শেষে খিদে-তেষ্টায় ক্লান্ত হয়ে ওরা একটা বটগাছের নীচে বসে পড়ল। ঠিক তখনই একজন সাধুপুরুষ সেখানে এসে দাঁড়ালেন। তাঁকে দেখে চাষী প্রণাম করে বলল, 'বাবা, আমরা কাজ করে পেট ভরাতে চাই। আপনি আমাদের পথ বলে দিন। কোথায় গেলে কাজ পাব?'

সাধুপুরুষ বললে, 'বলতে পারি কিন্তু একটা শর্তে। আমি দুটো প্রশ্ন করব, যদি তার ঠিকঠাক জবাব দিতে পার তাহলেই বলব।'

চাষী বলল, 'আমি মুখ্যু মানুষ, আমি কি করে উত্তর দেব?'

সাধুপুরুষ বললেন, 'থাক তাহলে।'

তখন বড় ছেলে বলল, 'বাবা, আমি যদি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করি?'

সাধুপুরুষ বললেন, 'বেশ তো। প্রথম প্রশ্ন হল, কোন ফুল ঝরে না? দ্বিতীয় প্রশ্ন হল, মৃত্যুকে কে ভয় করে না?'

বড় ছেলে একটু ভাবল। তারপর বলল, 'উত্তর যদি ভুল হয়?'

'ভুল হলে কিছুই পাবে না। তোমরা দুজন দূরে গিয়ে দাঁড়াও। আমি ওর দেওয়া উত্তর তোমাদের সামনে শুনব না।'

চাষী আর তার ছোট ছেলে অনেকটা দূরত্বে গিয়ে দাঁড়ালে বড় ছেলে বলল, 'প্রথম প্রশ্নের উত্তর আমি জানি। রোজ রাত্রে আমি সুন্দর ফুল দেখি। সেটা কখনও শুকোয় না, ঝরে যায় না। কারণ সে ফুটেছিল স্বর্গের নন্দনকাননে।'

সাধুপুরুষ মাথা নাড়লেন, 'ঠিক ঠিক। তাই ওর বুকে মধু নেই, গন্ধ নেই। এবার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দাও।'

বড় ছেলে বলল, 'তার উত্তর আমার জানা নেই প্রভু।'

সাধুপুরুষ বড় ছেলেকে চাষীর কাছে পাঠিয়ে দিয়ে ছোট ছেলেকে কাছে ডাকলেন, 'তুমি কি প্রশ্ন দুটোর জবাব দিতে পারবে?'

মাথা চুলকে ছোট ছেলে বলল, 'প্রথম প্রশ্নের জবাব আমি জানি না। তবে দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাব হচ্ছে, মৃত্যুকে ভয় পায় না দৈত্য-দানব ভূত-পেত্নি। রোজ রাত্রে তাদের আমি দেখি তো! আর মরার ভয় নেই বলে ওরা ভয় পায় না।'

'বাঃ, ঠিক বলেছ।'

এবার চাষীকে ডেকে সাধুপুরুষ বললেন, 'তোমার দুই ছেলে একটা করে উত্তর ঠিক বলেছে। দুজনের উত্তর জুড়লে দুটো উত্তরই সঠিক। কিন্তু সেটা তো কথা ছিল না। তবু অর্ধেকটা দিয়েছে বলে তোমাকে একটা উপায় বলে দিচ্ছি। তোমরা এখানে মাটি খোঁড়। খুঁড়তে খুঁড়তে বিরাট দীঘি তৈরি কর। সেই দীঘি তোমাদের খাওয়াবে।'

উপদেশ মতো দীঘি তৈরি হল। দীঘিতে প্রচুর মাছ হল। সেই মাছ খেয়ে ওরা দিব্যি ছিল। কিন্তু এক রাত্রে বরুণদেব চলে এলেন বড় ছেলের স্বপ্নে। এসে খুব রাগ করলেন তাঁকে পুজো না করে দীঘি কাটা হয়েছে বলে। আবার ছোট ছেলে স্বপ্নে দেখল মেছোভূত তিড়িং বিড়িং নাচছে। তাকে বাদ দিয়ে ওরা মাছ খাচ্ছে বলে।

সকালে সব শুনে চাষী দুটো বেদি তৈরি করল দীঘির ধারে। একটার ওপর বরুণদেবের মূর্তি এনে বসাল, অন্যটির ওপর মেছোভূতের মূর্তি। একেবারে মুখোমুখি।

মুশকিল হল, সেই রাত থেকে চাষীর ছেলে দুটোর মন খুব খারাপ, তারা আর স্বপ্ন দেখতে পাচ্ছে না।

আশ্বিন ১৪০৭

পাতালের মাতুল

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা

কথা শুনলে গায়ে জ্বালা ধরে গাঁয়ের লোকের।

যত নালিশই আসুক ডল্‌ফের নামে, মা তা হেসে উড়িয়ে দেন—"ও ছেলে আমার তেমন নয় গো! দুটো দিন যেতে দাও বাছারা, ওর বুদ্ধিটা একটু পাকুক, তখন দেখো, ও একটা নামকরা মানুষ হবে দেশের মধ্যে। একটু ক্ষ্যামা-ঘেন্না এই কয়টা দিন তোমরা না করলে, আর কে করবে বলো!"

বিধবা অনাথা মেয়েমানুষটাকে কী আর বলা যায় মুখের উপর? বেগুন বেচা মুখ করে সবাই চলে যায় হেলিগার গিন্নির সমুখ থেকে। গজগজ করে আড়ালে আড়ালে—"শাসন নেই, শিক্ষা নেই। বুদ্ধি যখন পাকবে, ও ছেলে হবে ডাকু। এই পনেরো-ষোল বছরেই যা নমুনা ছাড়ছে বাছাধন। কারও বাগানে একটা আপেল পাকবার জো নেই, ও গিয়ে রাতের আঁধারে তা পেড়ে এনেছে। কারও মোরগ উঠোনের বাইরে আসবার জো নেই, ও তাকে ভোগে লাগিয়েছে শিককাবাব করে। বুদ্ধি পাকলে?—হুঁঃ!"

অনাথা হেলিগার গিন্নির মুখ চেয়ে গাঁয়ের লোক বাধ্য হয়েই দস্যি ছেলেটাকে ক্ষ্যামা-ঘেন্না করে। তবে সদাই তারা সচেষ্ট থাকে ওর ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলতে। সদাই চোখ-কান মেলে রাখে, যাতে নিজেদের ছেলেগুলোও উচ্ছন্নে না যায় ওর সঙ্গে মিশে। উপায় কী? সাবধান থাকতেই হবে কয়টা বছর, যতদিন বুদ্ধি না পাকে ডল্‌ফের।

সবাই ডল্‌ফের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলে, কেবল এক বুড়ো গ্রুট ছাড়া। গির্জার চাকরি করে গ্রুট। গাঁয়ে কেউ মরলে গ্রুটই তার কবর খোঁড়ে। কাজেই তার একটু আলাদা রকম খাতির আছেই গাঁয়ের ভিতর। সেই খাতিরটুকু সম্বল করে বুড়ো লেগে গেল, কী করে ছেলেটাকে কোনো একটা কাজে ভিড়িয়ে দেওয়া যায়, সেই চেষ্টায়।

ডাক্তার নিপারসেন হচ্ছেন গাঁয়ের একমাত্র ডাক্তার। ওষুধপত্র তাঁর তত নেই, যত আছে মোটা মোটা ডাক্তারি কেতাব। যখনই কোনো রোগী আসুক, দেখতে পাবে ডাক্তারটি বসে আছেন সেই সব কেতাবেরই কোনো একখানায় তন্ময় হয়ে। রোগী দাঁড়িয়ে বা বসে নিজের ব্যারামের বৃত্তান্ত বলে গেল। ডাক্তারের চোখ কিন্তু বই ছেড়ে রোগীর দিকে একবারও তাকিয়ে দেখল না। বৃত্তান্তটা শেষ হলে একটা হাঁক শোনা গেল—ডাক্তার ডাকছেন তাঁর সহকারীকে, ওষুধ দেবার জন্য।

সহকারী একজন চিরদিনই রাখেন ডাক্তার নিপারসেন। একাধারে সে ছাত্র ও কম্পাউন্ডার। গাঁয়েরই কোনো গরিবের ছেলেকে তিনি বহাল করেন এ কাজে। উদয়াস্ত সে খাটে। বড়ি পাকায়, মলম বানায়, পাঁচমিশেলি ওষুধে জল ঢেলে ঢেলে লাল-নীল-সাদা ওষুধ তৈরি করে হরেক রকম। বিনিময়ে খেতে ও শুতে পায় ডাক্তারের বাড়িতে, আর পায় ভবিষ্যতের জন্য দরাজ প্রতিশ্রুতি—"তোকে আমি পুরোদস্তুর ডাক্তার বানিয়ে দেব। আমি মরলে আমারই জায়গা তুই দখল করতে পারবি এ গাঁয়ে"—ইত্যাদি।

ছাত্র কম্পাউন্ডার এ যাবৎ অনেক এসেছে নিপারসেনের কাছে, কেউ এক বছর কেউ দুই বছরের বেশি টেকেনি। একঘেয়েমির জন্যই হোক অথবা পেট ভরে খেতে না পাওয়ার জন্যই হোক, উজ্জ্বল ভবিষ্যতের পাকাপোক্ত প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও সবাই পালিয়েছে একে একে। গ্রুট শুনতে পেল, আবার কম্পাউন্ডারের সিংহাসন খালি হয়েছে নিপারসেনের ডাক্তারখানায়। সে গিয়ে ধরে পড়ল ডাক্তারকে—

"ডল্‌ফ হেলিগারকেই নিতে হবে মশাই! ওর বাবা আমার দোস্ত ছিল। আমার খাতিরে ছেলেটার একটা হিল্লে করে দিন আপনি।"

ডাক্তারের কাজ মানুষকে কবরে পাঠানো, গ্রুটের কাজ মানুষের জন্য কবর খোঁড়া। কাজেই পরোক্ষভাবে দুজনকে সহকর্মী না বলা যাবে কেন? অন্তত গ্রুট তো নিশ্চয়ই ডাক্তারকে মনে করে সহকর্মী, তা নইলে কিসের জোরে সে খাতির দাবি করে তাঁর কাছে?

সে যাই হোক, খানিকটা গাঁই-গুঁই করে শেষ পর্যন্ত ডল্‌ফকেই চাকরি দিলেন ডাক্তার। পাড়াপড়শি মন খুলে আশীর্বাদ করল ডাক্তার আর গ্রুট দুজনকেই।

নিপারসেন ডাক্তারের চাকরি যখন নিয়েছে ডল্‌ফ, দিনের বেলাটা অন্তত গাঁয়ের বাড়িগুলো রেহাই পাবে ওর দৌরাত্ম্য থেকে।

আশীর্বাদ করলেন হেলিগার গিন্নিও। তাঁর এতকালের আশা বুঝি সফল হবার পথ ধরেছে এইবার। নিপারসেন তো বলেইছেন ডল্‌ফকে ডাক্তার করে দেবেন। তা ডাক্তারের চেয়ে মান্যগণ্য লোক আর কে থাকতে পারে পাড়াগাঁ জায়গায়? তিনি পড়শিদের ডেকে ডেকে বলতে লাগলেন—"দেখলে তো? আমি বলিনি যে ও একটা নামকরা মানুষ হবে দেশের মধ্যে?"

দিন কাটে। ডল্‌ফ নামকরা মানুষ হবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। খেটে যাচ্ছে ভূতের মতো। না খেটে উপায় নেই। ডাক্তারটি কড়া মনিব। বড়ি পাকানো, মলম বানানো, পাঁচমিশেলি ওষুধে জল ঢেলে ঢেলে লাল-নীল-সাদা হরেকরকম মিক্‌চার তৈরি করা, এসব ব্যাপারে এক মিনিটের ঢিলেমি দেখলে নিপারসেন গর্জে ওঠেন—"তবেই হয়েছ তুমি ডাক্তার! কাজে ফাঁকি দিতে চাও যদি, বেরিয়ে যাও আমার ডাক্তারখানা থেকে।"

হায়! বেরিয়ে যাওয়ার উপায় যদি থাকত, ডল্‌ফ কি এক মিনিট দেরি করত বেরিয়ে যেতে? এ কাজ তার একদম ভালো লাগে না! এ যাবৎ তার দিন কেটেছে মাঠে-ঘাটে দস্যিপনা করে করে। কখনও কোনো পড়শির ঘোড়ার সওয়ার হয়ে দেশবিদেশ ছুটে বেড়াচ্ছে ঝড়ের বেগে, কখনও বা হডসন নদের দুর্বার স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে সাঁতার কাটছে এপার-ওপার, আবার এমনও কোনো কোনো দিন ঘটে গিয়েছে যে, কোনো বন্ধুর বাবার বন্দুকটা কোনো ফিকিরে হাতিয়ে নিয়ে সে গিয়ে ডুব মেরেছে গহন অরণ্যে। হরিণ-টরিণ তুচ্ছ প্রাণীর তো কথাই নেই, দুর্দান্ত বাইসন বা জাগুয়ার সামনে পড়লেও সে তার মোকাবিলা করতে ভয় পায়নি সেদিন।

সেই ডল্‌ফ কিনা বুক-সমান-উঁচু টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে পিল বানাচ্ছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা? জীবনে ধিক্কার এসে গিয়েছে ওর। কবে সে এ শিক্ষানবিশিতে লাথি মেরে বেরিয়ে পড়ত রাস্তায়, যদি না তার লজ্জা করত অনাথা মায়ের দুঃখের অন্নে ভাগ বসাবার জন্য সেই মায়েরই কুঁড়েতে ফিরে যেতে।

লজ্জা করবে, পারবে না ডল্‌ফ মায়ের মনে কষ্ট দিতে। মা যে দিন গুনছে, কবে ডল্‌ফ ডাক্তার হয়ে বেরুবে, কবে সে দশজনের একজন হয়ে মাথা উঁচু করে বেড়াবে এই গ্রামে! ডল্‌ফ ভাগ্যকে অভিশাপ দেয়। তবু দিনের পর দিন পিল বানাতেই থাকে নিপারসেনের টেবিলে দাঁড়িয়ে।

বললে লোকে হয়তো বিশ্বাস করবে না, এইভাবে চব্বিশ ঘণ্টা নিজেকে শাপান্ত করতে করতেও পরিপূর্ণ চারটি বছর নিপারসেনের ডাক্তারখানায় কাটিয়ে দিল ডল্‌ফ হেলিগার। ডাক্তারি সে থোড়াই শিখেছে, ডাক্তার হওয়া তার ভাগ্যে আছে, এমন আশা ভুলক্রমেও সে কখনও করে না।

কুড়ি বছর বয়স হল ডল্‌ফের। গাঁট্টা জোয়ান সে এই বয়সেই। আর এই সময়ই ঘটল একটা ঘটনা।

দেদার পয়সা জমিয়েছেন নিপারসেন এই গাঁয়ে ডাক্তারি করে করে। কি কর যায় সে পয়সা দিয়ে? গাঁ থেকে মাইল তিন দূরে একটা বাড়ি সস্তায় বিক্রি হচ্ছে শুনে ঝট করে তিনি তা কিনে ফেললেন।

কিনবার পরে তাঁর চক্ষুস্থির। বাড়িটা যে হানাবাড়ি, সে খবর তো তাঁকে আগে কেউ বলেনি!

নিপারসেনের মতলব ছিল, বাড়িতে আপাতত এক ঘর চাষীকে তিনি বসাবেন। বাড়ির লাগোয়া জমিগুলো আবাদ করবে তারা। আধাআধি বখরা দেবে ফসলের ফি-বছর। কিন্তু দেখ বরাতের ফের, কোনো চাষী ওবাড়িতে বসবাস করতে রাজি হয় না। এমনকি লাঙল নিয়ে ও-বাড়ির জমিতে ঢুকতেও তারা নারাজ। "কাঁচা মুন্ডুটা যমের হাতে কে তুলে দেবে মশাই?" সাফ জবাব দেয় সবাই।

ডাক্তার যখন বাড়ি নিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছেন, ডল্‌ফ এল একটা প্রস্তাব নিয়ে—"বলেন যদি, আমি গিয়ে বাড়িটাতে বাস করি কিছুদিন। ভূত আমার করবে কী? আমি ওখানে বাস করেও জ্যান্ত আছি—এটা যখন দেখবে চাষীরা, সাহস পাবে ওদিকে ভিড়তে।"

নিপারসেন তো লুফে নিলেন এ প্রস্তাব। নিজে তিনি যথেষ্ট বিশ্বাস রাখেন যে ভূতেরা ইচ্ছে করলে অনেক কিছু করতে পারে মানুষের। বাড়ি কেনার অর্থটা বিলকুল লোকসান হতে বসেছে দেখেও নিজে গিয়ে ওখানে বাস করার কল্পনা এক মুহূর্তের জন্যও মগজে আসেনি তাঁর। হাজার হোক পয়সা লোকসান হলে তা একদিন কোনো না কোনোভাবে পূরণ হতেও পারে, কিন্তু জান লোকসান হয়ে গেলে তা আর পূরণ হবার ভরসা নেই কোনোদিন। তবে ডল্‌ফ যেতে চাইছে, যাক না! হাজার হোক, নিজের জীবনে অন্যের জীবনে বহুৎ ফারাক। হ্যাঁ, যায় যদি তো যাক। কিন্তু ডল্‌ফ? সে যেতে চায় কেন? সে কি বিশ্বাস করে না ভূতে?

তা করে। পাড়াগাঁয়ের ছেলে, জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই ভগবানে আর ভূতে সমানভাবেই বিশ্বাস করতে শিখেছে। হ্যাঁ, বিশ্বাস করে, তবে ভয় করে না। করে না এই কারণে যে ভয় বস্তুটাই তার অস্থি-মজ্জায় কোথাও নেই। ভূত আছে, থাকুক, একটা শক্তসমর্থ মানুষের সে কী ক্ষতি করবে? আর বলতে কী, ভূতের অস্তিত্বে ষোল আনা বিশ্বাস আছে বলেই ডল্‌ফ যেতে চাইছে হানাবাড়িতে। স্রেফ একঘেয়ে জীবনে একটুখানি বৈচিত্র্যের আশায়। পিল পাকিয়ে পাকিয়ে জীবনটাই যে বিস্বাদ লাগছে তার কাছে!

ডাক্তারের কাছে একটি শুধু অনুরোধ রাখল ডল্‌ফ তার মায়ের কাছে এ খবর এক্ষুনি যেন না পৌঁছায়। যাক কিছুদিন। সব লোক যখন জানবে, মাও জানবেন আস্তে আস্তে। গোড়ায় জানতে পারলে মা একটা কান্নাকাটি জুড়ে দেবেন, একটা বিষম বাগড়া পড়ে যাবে ব্যাপারটাতে।

তাই হল। যথাসময়ে একদিন সন্ধ্যার পরে নিঃশব্দে হানাবাড়ির দিকে রওনা হয়ে গেল ডল্‌ফ। সঙ্গে গেলেন ডাক্তার নিজে তাঁর রাঁধুনিটিকে নিয়ে। বাড়িটা দেখিয়ে শুনিয়ে দেবার জন্য আর কি! একটা ঘর খুলে ডল্‌ফকে তার ভিতর স্থিতু করে দিয়ে ওঁরা দুজন ফিরে আসবেন। ডাক্তারের হাতে লণ্ঠন, রাঁধুনির হাতে একটা মোমবাতি, ডল্‌ফের বগলে একখানা কম্বল।

তিন মাইল পথ, এক ঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছে গেল সবাই। জায়গাটা এমন, দিনের বেলাও একা সেখানে গেলে গা ছমছম করার কথা। চারদিকেই ছোট ছোট পাহাড়। মাঝ বরাবর একটা নিচু উপত্যকায় ঐ একটি মাত্র বাড়ি। যথেষ্ট পুরোনো বটে, তবে ভেঙেচুরে পড়েনি এখনো। আসবাবপত্র অনেকই রয়েছে, তবে সবই কেমন সেকেলে ধরনের। ওলন্দাজেরা যখন উত্তর আমেরিকার এই অঞ্চলটাতে প্রথম আসে উপনিবেশ গড়ে তুলবার জন্য, সেই যুগের।

বলাবাহুল্য ডল্‌ফেরাও ওলন্দাজ। এ ফ্যাশানের খাট-বিছানা-টেবিল-চেয়ার গাঁয়ের ধনীদের বাড়িতে সে আগেও দেখেছে। কাজেই এ বাড়ির পরিবেশটা তার ঘরোয়া বলেই মনে হল। সেও একটা স্বস্তি।

অনেক লম্বা লম্বা বারান্দা পেরিয়ে, অনেক সরু সরু সিঁড়ি মাড়িয়ে ডাক্তার ডল্‌ফকে এনে তুললেন একখানা বৃহৎ শয়নকক্ষে! একপাশে বৃহৎ খাট, তাতে ছেঁড়া গদি। অন্যপাশে বৃহৎ অগ্নিকুণ্ড, তাতে আগুন নেই। কোথা থেকেই বা থাকবে? মাঝখানে একখানা বৃহৎ সোফা, তার উপরে আচ্ছাদনের কোনো বালাই নেই। শক্ত কাঠে ধুলো জমে আছে রাশি রাশি।

ডল্‌ফ কম্বল বিছিয়ে ফেলল ছেঁড়া গদির ওপর। রাঁধুনি মোমটা জ্বেলে অগ্নিকুণ্ডের মাথায় বসিয়ে দিল। ডাক্তার বললেন—"দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়। কেমন?"

এই বলেই লণ্ঠন এবং রাঁধুনি নিয়ে তিনি বেরিয়ে পড়লেন ঘর থেকে। ডল্‌ফ ঘরের দরজায় খিল এঁটে দিল এবং শুয়ে পড়ল হানাবাড়ির ছেঁড়া গদিতে। ভূতের কথাই ভাবছে সে, তাতে সন্দেহ নেই। তবে সে ভাবনার সঙ্গে ভয়ের সংস্রব আদৌ নেই। যা আছে, তা হল কৌতূহল। গাঁয়ে ঘরে ভূত হচ্ছে একটা পহেলা নম্বরের আলোচ্য বিষয়। যদিও এমন কোনো লোকের সঙ্গে ডল্‌ফের আজও পরিচয় ঘটেনি, যে নাকি নিজের চোখে ভূত দেখেছে। আজ যদি ডল্‌ফ নিজের চোখে তা দেখতে পায়, সে অবশ্যই নিজের বরাতের প্রশংসা করতে পারবে।

ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়েই পড়ল ডল্‌ফ।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিল তার হিসাব কে দেবে? হঠাৎই ভেঙে গেল ঘুম। মোম তখনও জ্বলছে। সেই আলোতে ডল্‌ফ দেখল, এসেছে ভূত, সত্যিই এসেছে। ঘরে আর সে একা নয়। দরোজা যদিও আগের মতোই খিল বন্ধ রয়েছে, তবু এক দশাসই লম্বা চওড়া আধবয়সী পুরুষের আবির্ভাব ঘটেছে হাড্ডিসার সোফার উপরে। পোশাক তার পুরোনো কালের ওলন্দাজদের মতোই। লালচে চুল-দাড়ির বেষ্টনীর ভিতরে পাকাটে মুখখানা তার বড়ই যেন বিষণ্ণ দেখাচ্ছে।

বেশ মনোযোগ দিয়ে দুজনে দুজনকে দেখছে। ভূত দেখছে ডল্‌ফকে, ডল্‌ফ দেখছে ভূতকে। ডল্‌ফ ভাবছে, ভূতটা যখন এসেইছে, কথা বলে না কেন? কিংবা ভয় দেখাবার মতলবে যদি এসে থাকে, ভেংচি-টেংচি কাটে না কেন? পরক্ষণেই তার মনে পড়ে গেল ভূতের তো রক্ত-মাংসের দেহ নেই, যা দেখা যাচ্ছে, তা ছায়া বই আর কিছু নয়। ছায়া কথা কইবে কেমন করে? আর ভেংচি, ভয় দেখাবার জন্য ও হয়তো আসেইনি আদৌ।

তবে? ওর সঙ্গে আলাপ জমানো যায় কেমন করে?

খানিকটা ইতস্তত করে বেশ মোলায়েম সুরেই ডল্‌ফ বলল—"দেখুন মিস্টার ভূত, আপনি যখন দয়া করে দেখা দিয়েছেন এ অধমকে, তখন অবশ্যই ধরে নিতে পারি যে আমার কাছে কোনো দরকার আছে আপনার। সে দরকারের কথাটা চটপট বলে ফেললে ভালো হয় না কি? রাত এখনও খানিকটা আছে বোধহয়। আর একটু ঘুমুতে চাই।"

নাঃ, জবাব নেই, মিস্টার ভূতের তরফ থেকে।

অতঃপর কী করা যেতে পারে, তাই ভাবছে ডল্‌ফ। এমন সময়ে ভূতটা উঠে দাঁড়াল সোফা ছেড়ে। হেঁটে গেল দুই পা, দরোজার দিকেই গেল। তারপর থামল, আর পিছন ফিরে তাকাল ডল্‌ফের দিকে। ডল্‌ফ যেন দেখল, ভূতের মাথাটা নড়ছে অল্প অল্প, যেন সে ইশারায় ডাকছে ডল্‌ফকে সঙ্গে আসবার জন্য।

ডল্‌ফ উঠে বসল বিছানার উপরে।

ভূত আবার দুই পা হাঁটল, আবার থামল, আবার ইশারা করল তেমনিভাবে।

নিশ্চয়ই ভূত এইটাই চাইছে যে ডল্‌ফ অনুসরণ করুক তার?

মতলব কী ভূতটার? ভীষণ কৌতূহল হচ্ছে ডল্‌ফের। সে উঠে দাঁড়াল খাট থেকে, দুই পা সেও এগিয়ে গেল ভূতের দিকে। এবারে ভূতের মাথা বেশ জোরে জোরে নড়ছে, বেশ খুশি খুশি ভাব তার।

ভয়? ডল্‌ফ ও চিজটার সঙ্গে পরিচিত নয়। ভূত কেন তাকে সঙ্গে আসতে বলছে, জানবার জন্য দারুণ ব্যস্ত হয়েছে ও।

ভূত দরোজা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আবার ইশারা করল ওকে, তারপর কী কাণ্ড! বেমালুম উবে গেল ডল্‌ফের চোখের সামনেই। ডল্‌ফ চোখ কচলাচ্ছে। সত্যিই উবে গেল নাকি? নাকি চোখের ভুল হচ্ছে ডল্‌ফের?

না, ভুল তার হয়নি। সত্যিই নেই ভূতটা।

অর্থাৎ সে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েছে। ঘরে ঢোকার বেলায়ও বন্ধ দরোজার ভিতর দিয়ে সে ঢুকেছিল। বেরুবার বেলায়ও বন্ধ দরোজা তার গতি রোধ করতে পারেনি। কিন্তু বেরিয়ে যাওয়ার

আগেও সে তৃতীয়বার ইশারা করে গিয়েছে ডল্‌ফকে। ডল্‌ফ কি ভয় পাবে তার সঙ্গে যেতে? আরে তাই কখনো হয় নাকি? ভয়? ছিঃ!

যেহেতু বন্ধ দরোজার ভিতর দিয়ে বেরুনো ডল্‌ফের পক্ষে সম্ভব নয়, তাই সে খুলে ফেলল দরোজাটা। বাঃ! ঐ যে মিস্টার ভূত, ঠিক দুই পা সামনেই দাঁড়িয়ে আছেন তার প্রতীক্ষায়!

তারপর সরু সরু সিঁড়ি আর লম্বা লম্বা বারান্দা বেয়ে বেয়ে অনেকক্ষণ ধরে ভূতের অনুসরণ করল ডল্‌ফ। অবশেষে ভূত থামল আর একটা দরোজায়। তারপর আবার চট করে উবে গেল ওর সমুখ থেকে।

এবার আর ভেবে দেখবার কিছু নেই, ডল্‌ফ দরোজাটা খুলে ফেলল। ঠিক! ঐ তো দাঁড়িয়ে আছে ভূত। ডল্‌ফকে দেখেই সে আবার চলতে শুরু করল। এবার আর তারা বাড়ির ভিতরে নেই। খোলা উঠোন, তার পরে খানিকটা মাঠ। অনেক পথ পেরিয়ে বিশাল এক ইঁদারার পাশে গিয়ে দাঁড়াল ভূত।

ডল্‌ফও আছে ভূতের পিছনেই।

ভূত আবারও ফিরে তাকাল ডল্‌ফের পানে। জ্যোছনায় ঝকঝক করছে চারিধার। ভূতের মুখখানা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে ডল্‌ফ। কী করুণ আবেদন বেচারা ভূতের মুখে-চোখে! কিছু একটা সাহায্য যে ডল্‌ফের কাছে ও চাইছে, তাতে তো আর কোনো সন্দেহই নেই!

কী সাহায্য হতে পারে সেটা? হায়, বেচারা ভূত! তার তো কথা কইবার সামর্থ্য নেই!

এইবার আর এক কাণ্ড! ভূতটা ইঁদারার ভিতরে নেমে যাচ্ছে যে! আরে, কোথায় যায় ও? কোথায় যায়?

ডল্‌ফের দিকেই দুই চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে ভূতটা ধীরে ধীরে নেমে যাচ্ছে ইঁদারায়। এইবার তার কোমরের নীচের সবটা অদৃশ্য হয়ে গেল। এইবার বুক। এইবার কাঁধ—

আর একটা মিনতিভরা ইশারা, তারপর ভূত অদৃশ্য।

ভূতটা পাগল নাকি? ওর ঐ শেষ ইশারা শিরোধার্য করে ডল্‌ফও ইঁদারায় নামবে, এরকমটা যদি ও প্রত্যাশা করে থাকে, তবে ডল্‌ফ বলবে, ভূতটা নেহাতই ভূত। ওর কোনো আক্কেল নেই।

না, নামবে না ডল্‌ফ নিশ্চয়ই। তবে ইঁদারার উপর থেকে ঝুঁকে পড়ে যতটা সম্ভব দেখে নেবে ওর নীচের অবস্থাটা। ভূত কি এখনও নামছে, না উবে গিয়েছে?

উচু গাঁথুনি দিয়ে ঘেরা রয়েছে ইঁদারার মুখ। ডল্‌ফ এসে সেই গাঁথুনির উপর দিয়ে ঝুঁকে পড়ল। চাঁদের আলোতে ইঁদারার নীচের দিকটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। জল চকচক করছে জ্যোছনায়, তবে বহু বহু নীচে। আর ভূত? বেমালুম হাওয়া! সে ঐ পাতালে ডুব মেরেছে নিয্যস। এই পাতালেই থাকে না কি ও? অমন ইট-পাথরের মোকাম পছন্দ নয় ওর!

যাক সে কথা, এ রাত্রে ডল্‌ফের আর কিছু করবার নেই। সে গুটি গুটি ফিরে গেল বাড়ির ভিতরে, তার শোবার ঘরে। শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগল, ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখল, যেন সে দড়ি বেয়ে নেমে যাচ্ছে ইঁদারার ভিতরে—যাচ্ছে—যাচ্ছে, একদম পাতালে নেমে যাচ্ছে—

কী যেন একটা কী পাতাল থেকে তুলে আনবার জরুরি তাগিদ রয়েছে তার। না আনলে যেন কিছুতেই চলবে না। জিনিসটা যেন তারই, তার ছাড়া আর কারুর নয় যেন—

তারপর স্বপ্নেই সে আবার দেখল, সেই বিষণ্ণ-বদন ভূতটাকে। সে যেন ঠোঁট নাড়ছে, ডল্‌ফের কানে যেন ভূতের কথা স্পষ্ট ধরা পড়ছে—"ওটা তোমারই। একটু মেহনত করে তুমি ওটা তুলে আন বাবা! তুমি তো ভীতু নও।"

ঘুম ভাঙলেই ডল্‌ফ দেখল, রাত ভোর হয়ে এসেছে। সে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ল বাড়িটা থেকে, লোকজন জেগে ওঠার আগেই নিপারসেনের ডাক্তারখানায় তাকে পৌঁছোতে হবে। সে যে হানাবাড়িতে রাত্রি যাপন করেছে, এটা আপাতত কাউকে জানানো চলবে না—

"না, কিছু দেখিনি। অঘোরে ঘুমিয়েছি সারা রাত" ডাক্তারের নানা প্রশ্নের জবাবে সাফ জবাব দিয়ে দিচ্ছে ডল্‌ফ—"ভূত তো দূরে থাকুক একটা ছারপোকা পর্যন্ত কামড়ায়নি স্যার!"

বরাত ভালো ডল্‌ফের, দিনের ভিতর এক সময় গ্রুট এল ডাক্তারের বাড়িতে বেড়াতে। ডল্‌ফ কোনোদিন যা করেনি, তাই করল আজ। মুখটা কাঁচুমাচু করে গ্রুটকে বলল—"কাকা, বড্ডো মুশকিলে পড়েছি, কিছু পয়সা আমায় দেবে?"

কোনোদিন যে পয়সা চায়নি, সে আজ চায় কেন? গ্রুট অবাক্। তবু, গ্রুট ভালোবাসে ছেলেটাকে। বিমুখ করতে পারল না তাকে। পকেটে যা ছিল, সব ঝেড়ে ডল্‌ফকে দিয়ে দিল।

সন্ধ্যা হতে না হতেই ডল্‌ফ বেরিয়ে পড়ল একটা মোমবাতি নিয়ে। আজ তো আর পথ দেখাবার জন্য ডাক্তার বা রাঁধুনির যাওয়ার দরকার নেই তার সঙ্গে।

ডল্‌ফ বেরুল, কিন্তু সোজাসুজি হানাবাড়ির দিকে না গিয়ে উঠল গিয়ে গাঁয়ের মুদিখানার দোকানটাতে। ওরা গেরস্তালির হরেকরকম জিনিসই মজুদ রাখে সারা বছর। কার কখন কী দরকার হয়ে পড়ে, বলা যায় কী!

আজ ডল্‌ফের দরকার কয়েকগাছা মজবুদ দড়ি। ডাক্তারের গরু বাঁধবার দড়িগুলো বিলকুল পচে গিয়েছে। একটা একটা করে ছয়গাছা দড়ি সে বেছে নিল। দাম মিটিয়ে দিল গ্রুটের পয়সা দিয়ে।

হানাবাড়িতে পৌঁছে ডল্‌ফের কাজ হল আজ, ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়া নয়, ইঁদারার পাশে বসে খাটো দড়িগুলো জোড়া দিয়ে দিয়ে একটা পেল্লায় লম্বা দড়ি বানানো। তা ছাড়াও, সেই পেল্লায় লম্বা দড়ির মাঝে মাঝে এক একটা গেরো দেওয়া। নামবার সময় ঐসব গেরোতে হাত রাখা চলবে এক-আধ মিনিটের জন্য, গেরোতে পা বাধিয়ে জিরোনোও চলবে দরকার মতো।

ইঁদারা থেকে সামান্য দূরে একটা বাবলা গাছ। কালই তা লক্ষ করেছিল ডল্‌ফ। সেই গাছের গুঁড়িতে শক্ত করে দড়ির এক মাথা বেঁধে ফেলল সে। তারপর দড়ি ঝুলিয়ে দিল ইঁদারার ভিতর। জলের তলাতেও দড়ি নেমে গেল অনেকদূর। এইবার ডল্‌ফ জামাকাপড় ছেড়ে রাখল বাবলার তলায়, আর 'জয় যীশু' বলে নেমে পড়ল দড়ি ধরে।

শীতের দিন নয়, তবু শীত-শীত করছে বই কি! কেমন যেন শিউরে শিউরে উঠছে দেহের ভিতরে। শীত? না ভয়? ভয়? ধ্যুৎ! কিন্তু শীতও না। তবে কী এটা?

যা খুশি তা হোক, ডল্‌ফ সড়সড় করে নামছে। মাঝে মাঝে জিরিয়ে নিচ্ছে দড়ির গিঁঠ ধরে ধরে, যাতে নতুন দড়ির ঘষায় হাতের চামড়া ছড়ে না যায়। কিন্তু কতক্ষণ আর? নামতে শুরু করার একটু পরেই ডল্‌ফ দেখল সে জল ছুঁয়েছে। যদিও উপর থেকে মনে হয়েছিল, গভীর ইঁদারার তলায় পৌঁছুতে সময় লাগবে অনেক।

বরাত জোর, কুয়োর জল গরম। যতক্ষণ খুশি ও থাকতে পারবে এ জলে। কতক্ষণ থাকতে হবে কে জানে।

জল গভীরও। দশ-বারো ফুট তো বটেই। ডল্‌ফ দড়ি ছেড়ে দিয়ে ডুব দিল জলে। পচা গন্ধ অবশ্য জলটাতে। তা সে তো স্বাভাবিক! কেউ নাড়ে-চাড়ে না এ-জল!

ডুব! ডুব! ডুবিয়ে হডসনের তলা থেকে মাটি তুলে আনে ডল্‌ফ, দশ-বারো ফুট জলের তলায় পৌঁছে মাটি হাতড়ে দেখা তার পক্ষে শক্ত কত! প্রথমবার গোল-পানা একটা কী পিছল জিনিস হাতে ঠেকতেই সেটা তুলে নিয়ে ভুচ্ করে জলের উপরে ভেসে উঠল ডল্‌ফ!

চাঁদের আলোতে জিনিসটা দাঁত বার করে হেসে উঠল ডল্‌ফকে দেখে। কী সর্বনাশ! মড়ার মাথা একটা, সাদা হাড় শ্যাওলায় সবুজ হয়ে গিয়েছে এখানে-ওখানে।

এমন চমকে উঠেছিল ডল্‌ফ যে মড়ার মাথাটা তার হাত থেকে ফসকে জলে পড়ে গেল আবার। সে ভাবতে লাগল—জলে ভাসতে ভাসতে অনেক কথাই মাথায় আসছে তার।

ভূত মশাইয়ের মতলবখানা এবার যেন বোঝা যাচ্ছে একটু একটু। এইখানে ইঁদারার জলে পড়ে আছে তার হাড়গোড়গুলো। গির্জার আঙিনায় কবর না পাওয়ার দরুন আত্মা শান্তি পাচ্ছে না তার।

ডল্‌ফকে ডেকে আনার ভিতরে ভূতের উদ্দেশ্য ছিল এই যে ও তার হাড়গুলোকে তুলে নিয়ে খ্রিস্টধর্মের বিধানমতে কবর দিক।

বড় চাট্টিখানি কথা নয় মিস্টার ভূত! বহুৎ ঝামেলার ব্যাপার ওটা।

তবু, নেমে যখন আসাই গিয়েছে, নিঃসন্দেহ হয়ে নেওয়া ভালো। মাথাটাই ডল্‌ফ পেয়েছে এযাবৎ। ধড়টাও এখানেই আছে তো? এমন যদি হয় যে ধড়টা এখানে নেই। শুধু কাটা মুন্ডুটাই পড়ে আছে। তাহলে ডল্‌ফ এক্ষুনি সেটাকে তুলে নিয়ে যেতে পারে। লুকিয়ে রাখতে পারে অন্য কোথাও দুই-একদিন, তারপর গ্রুটকে খোশামোদে রাজি করিয়ে গির্জার হাতায় একটা গর্ত করে—

সে পরের কথা। আগে জানা দরকার সত্যিকার অবস্থাটা। ডল্‌ফ আবার ডুব দিল। যাচ্চলে! একটা আংটার ভিতর হাত ঢুকে গেল ডল্‌ফের। কিসের আংটা হতে পারে? বালতির? কড়ার? সিন্দুকের ডালার?

না, সিন্দুক নয়, জিনিসটা হালকা। অনায়াসে এক হাতেই ওটা উঁচু করে তুলে ফেলল ডল্‌ফ। জলের উপরে ভেসে উঠে দেখল, একটা বালতির মতোই বস্তু, মাঝারি আকারের। কী থাকতে পারে এতে? বালতির মুখে একখানা থালা চাপা দেওয়া রয়েছে, সরু তার দিয়ে তা আবার বালতির সঙ্গে মজবুদ করে বাঁধা।

কী থাকতে পারে এর ভিতর?

বালতিটা দড়ির শেষ মাথায় বেঁধে ফেলল ডল্‌ফ, ওঠার সময় উপরে নিয়ে যাবে। তারপরে হাড়গোড়ের সন্ধানে আবার দিল ডুব। উঠল বই কি! বড়-ছোট নানা আকারের হাড়ের টুকরো উঠতে লাগল একটার পরে একটা। মানুষটাকে খণ্ড খণ্ড করে কেটে ইঁদারায় ফেলে দিয়েছিল কোনো ডাকুর দল। কী জন্য? ঐ বালতিটার জন্যই কি?

হাড়গুলো আপাতত থাকুক। বালতিটা নিয়ে যাওয়া যাক। রহস্যের সমাধান হয়তো ওরই ভিতরে আছে।

ডল্‌ফ আগে নিজে উপরে উঠল দড়ি বেয়ে। তারপরে বালতিসুদ্ধ দড়িটাও তুলল টেনে। প্রথম কাজ জামাকাপড় পরে নেওয়া, তারপর বালতি আর দড়ি নিয়ে বাড়ির ভিতর ঢুকে পড়া। সেখানে দরোজা বন্ধ করে বালতি খুলে দেখা—

খুলে যখন দেখল, ডল্‌ফের চক্ষুস্থির। এক বালতি মোহর বালতির ভিতর। আর একটা পিতলের মজবুদ কৌটো, সেটা খুলতে রীতিমতো বেগ পেতে হল ডল্‌ফকে। এমন ভাবে তা বন্ধ করা, যাতে জল ঢুকতে না পারে কৌটোতে।

তবু অনেক চেষ্টায় তা খুলে ফেলল ডল্‌ফ। আর কিছু নয়, একখানা চিঠি। ওলন্দাজ ভাষায় তাতে লেখা—

"মাত্র আঠারো বছর বয়সে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়েছিলাম পয়সা করবার জন্য। কালিফোর্নিয়ায় নদীর চড়ায় বালি ধুয়ে ধুয়ে সোনার কণা বার করেছি, প্রায় কুড়ি বছর ধরে। তারপর শহরে গিয়ে বেচলাম সেই সোনার কণাগুলি। মন্দ দাম হল না। তারপর শুরু করলাম লগনির ব্যবসা, চড়া সুদে। বছর দশেক রইলাম সে ব্যবসা নিয়ে। তারপর বাড়ির জন্য মনটা অস্থির হয়ে উঠল, ব্যবসা গুটিয়ে ফেলে এক বালতি মোহর কিনে ফেললাম সর্বস্বের বিনিময়ে।

"বাড়ি এসে দেখি আপনার জন সব মরে গিয়েছে, তবে একটা ছোট বোন নাকি বেঁচে আছে হডসনের কূলে ক্যাটস্কিল পাহাড়ের আনাচে-কানাচে কোনো এক জায়গায়। তার স্বামীর নাম গুস্টেড হেলিগার—"

এই পর্যন্ত পড়েই চমকে আঁতকে একেবারে লাফিয়ে উঠল ডল্‌ফ। গুস্টেড হেলিগার তো তারই বাবার নাম! এ চিঠি যার লেখা, সে তা হলে সাক্ষাৎ মামা ডল্‌ফের? হ্যাঁ, মনে পড়ছে তো! তার মা তো মাঝে মাঝেই তার এক নিরুদ্দেশ মামার গল্প করে থাকে। কী নাম ভালো? স্পিগেল! ফিলিয়ান ভ্যান্ডার স্পিগেল!

চিঠির নীচেও এই যে নাম সই রয়েছে "ফিলিয়ান ভ্যান্ডার স্পিগেল"!

নিজের উত্তেজনা নিজেই কোনোরকমে শান্ত করল ডল্‌ফ। তারপরে পড়ে ফেলল চিঠির বাকি অংশটা। খুঁজতে খুঁজতে স্পিগেল এই বাড়ি পর্যন্ত এসে পড়েছিল। হঠাৎ ঝড়-বাদলা শুরু হল বলে আশ্রয় নিল এই বাড়িতেই রাতটার জন্য। কিন্তু তাইতেই হল সর্বনাশ। মালিকেরা কেউ উপস্থিত ছিল না এখানে, ছিল একপাল চাকর-বাকর। তারা কেমন করে যেন টের পেয়ে গেল যে বালতিতে সোনা ভর্তি।

আর তারা যে টের পেয়েছে, তা বুঝতেও পারল স্পিগেল। তার মনে নিশ্চিত ধারণা হল যে রাতের ভিতরেই তাকে খুন করে ঐ চাকরেরা তার সোনা লুঠ করবে।

"কী করব? কেমন করে রক্ষা পাব এ সংকটে?"—এই ভাবতে ভাবতে স্পিগেল লিখে ফেলেছিল এই চিঠিটা। "কেমন করে রক্ষা পাব"—এই কথাতেই চিঠি শেষ।

না, রক্ষা সে পায়নি।

চিঠি লেখার পরের ঘটনাগুলো ডল্‌ফ অনুমান করেই নিল। চিঠি কৌটোয় বন্ধ করে বালতিতে রেখে সেই তুমুল ঝড়-বাদলায় বাড়ির আশ্রয় ছেড়ে হয়তো বেরিয়ে পড়েছিল মামা। চাকরগুলোও হয়তো সঙ্গে সঙ্গে ধাওয়া করেছিল পিছনে। পালাবার মুখে বালতিটা লুকিয়ে ফেলবার জন্যই হয়তো বেশি ব্যস্ত হয়েছিল স্পিগেল। তাই ইঁদারাটা দেখতে পেয়ে ওটা ফেলে দিয়েছিল তারই ভিতরে।

তারপরে চাকরগুলোও হয়তো তাকে ধরে ফেলেছিল, আর মোহর না পাওয়ার দরুন রাগের মাথায় স্পিগেলকে খুন করে ফেলে দিয়েছিল ঐ ইঁদারাতেই।

সে যাই হোক, মামার অর্থ ভাগনেই পেয়েছে। পাতাল থেকে তুলে এনে মামাকে যথাশাস্ত্র কবর দেবেই ডল্‌ফ।

---

* ওয়াশিংটন আর্ভিং-এর ভৌতিক গল্প "ডল্‌ফ হেলিগার" অবলম্বনে।

চৈত্র ১৩৮০

প্রেতের কান্না

শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সন্ধ্যা পেরিয়ে গেছে অনেকক্ষণ। পৃথিবীর বুকে নেমে এসেছে জমজমাট অন্ধকার। দেবকুমার বুঝতে পারল সে পথ হারিয়ে ফেলেছে—বন্ধু রজতের বাড়ি খুঁজে বার করা একেবারেই অসাধ্য।

কত চেষ্টাই তো করল সে! কিন্তু রজতের বাড়িতে ফিরে যাওয়ার পথ সে খুঁজে বার করতে পারল না।

মনে মনে জেগে ওঠে তার শত অনুতাপ। রজত তাকে বারণ করেছিল। সে বলেছিল বারবারই, "শোনো দেবকুমার, এসব পাহাড়ে জায়গা একেবারেই ভালো নয়, এখানে-সেখানে কত বিপদ ওৎ পেতে বসে আছে! কাজেই বিকেল পাঁচটা না বাজতেই ফিরে এসো!"

সে তখন হেসেছিল বিদ্রূপের হাসি! একটা শক্ত-সমর্থ জোয়ান ছেলে সে, পাহাড়ে পথ বলেই কি তার বিপদ হবে? সে কি পাঁচ বছরের কচি ছেলে যে তাকে সহজেই কেউ বিপদে ফেলতে পারে?

তখন এমনি কত কথাই তার মনে হয়েছিল, কিন্তু এখন? এখন যে বাচ্চা ছেলের মতোই সে পথ হারিয়ে ফেলল? এখন কোথায় সে যাবে? কেই বা তাকে আশ্রয় দেবে?

হ্যাঁ, ঐ যে দূরে একটা আলো দেখা যায় না?

দেবকুমারের আশা হল, নিশ্চয়ই ঐখানে কোনো বসতি আছে, ওখানে গেলে সে নিশ্চয়ই একটু আশ্রয় পেতে পারে!

দেবকুমার জোরে পা চালিয়ে দিল।

মিনিট দশেক পরেই দেখা গেল, এক প্রকাণ্ড বাড়ি তার সুমুখে দাঁড়িয়ে। বাড়িটি জীর্ণ পুরাতন হলেও বুঝতে কষ্ট হয় না যে এককালে এর পেছনে ছিল বিরাট ধনীর কোনো ইতিহাস!

বিরাট সিংহ-দরজা—লৌহ-ফটক। তারই মাথায় মিট্‌মিট্ করে একটা আলো জ্বলছে। অর্ধ-উন্মুক্ত ফটকের এক কোণে একখানি চেয়ারে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক উপবিষ্ট। পরম নিশ্চিন্ত মনে তিনি হুঁকো হাতে ধূমপানে ব্যস্ত।

দেবকুমারের পায়ের শব্দে চমকিত হয়ে তিনি তাঁর আধখোলা চোখ দুটি ভালো করে খুললেন ও একটু সোজা হয়ে বসলেন।

"দেখুন, আমি বড় বিপন্ন। পথ হারিয়ে ফেলেছি। আজ রাতের মতো আপনার এখানে একটু আশ্রয় প্রার্থনা করি।"

দেবকুমারের কথায় অসহায় মিনতি ঝরে পড়ে।

ভদ্রলোক একবার দেবকুমারের আপাদমস্তক ভালো করে দেখে নিলেন। তারপর কোনো কথা না বলে পাশের একটি ছোট বোতামে চাপ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির ভিতরে কোথাও ঝন্‌ঝন্ করে ঘণ্টা বেজে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে মধ্যবয়সী এক পরিচারিকা সেখানে উপস্থিত হল।

ভদ্রলোক ঠিক তেমনিভাবে তামাক খেতে খেতেই নীরবে দেবকুমারকে দেখিয়ে তাকে ভিতরে নিয়ে যেতে ইঙ্গিত করলেন। দেবকুমার পরম কৃতজ্ঞভাবে তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে পরিচারিকার পেছনে পেছনে ওপরে যাওয়ার সিঁড়িপথে অন্তর্হিত হয়ে গেল।

মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেল হঠাৎ! দেবকুমার বুঝতে পারে না তার ঘুম ভাঙল কেন! নিশুতি অন্ধকার রাত, কিন্তু কেমন একটা থমথমে ভাব!

সে তার বালিশের তলা হতে টর্চটি টেনে বার করতে যায়। কিন্তু মনে হল তার খাটসুদ্ধু গোটা বিছানাই যেন মেজে হতে উঁচু হয়ে উঠেছে! কি এ?

দেবকুমার বসতে চেষ্টা করল বিছানার ওপর। কিন্তু বসতে গেলেই পড়ে যায়, আবার সে লুটিয়ে পড়ে বিছানার ওপরেই। কারণ, সমস্ত খাটখানি তখন প্রায় তিন হাত উঁচুতে শূন্যে উঠে গেছে!

দেবকুমার ভীত-সন্ত্রস্ত ভাবে শেষ পরিণতি লক্ষ করতে লাগল!

সহসা ধপ্ করে খাটখানি পড়ে গেল। প্রচণ্ড শব্দে দোতলার মেজে থর্‌থর্ করে কেঁপে উঠল! মনে হল, কোনো মত্ত হস্তী বুঝি তার মাথা দিয়ে খাটখানা ঠেলে ফেলে দিলে!

পরক্ষণেই একটা কনকনে ঠান্ডা হাওয়া! মুহূর্তে শীতে কেঁপে ওঠে দেবকুমার! হঠাৎ কার একটা মর্মভেদী নিঃশ্বাস তার মুখে এসে লাগে! কিন্তু এত ঠান্ডা! নিঃশ্বাস কি কখনো কারো এত ঠান্ডা হয়? এ যেন বরফের ছুরি।

দেবকুমার না-জানি কোন্ এক অজানা ভয়ে কখন তার চোখ অনেকটা বন্ধ করেই ফেলেছিল! কিন্তু আসলে সে তো ভীরু নয়। সাহসী বলে তার রীতিমতো সুনামই ছিল। কাজেই তার সমস্ত জড়তা ও ভয় সে এইবার দূরে ঠেলে ফেলে দেয়, পূর্ণ বিস্ফারিত চোখে তাকায় সে। কিন্তু চাইতেই—ও কি?

খোলা জানলায় একখানা বীভৎস মুখ, সে মুখে এক তিলও মাংস নেই, সাদা ধবধবে হাড়ের মুখ...নাক-চোখের জায়গায় তিন-তিনটে গর্ত, দু'ঠোঁটের জায়গায় দু'সারি দাঁত বেরিয়ে আছে। এক মুহূর্তের জন্যে দেবকুমারের মাথাটা ঘুরে গেল, তার চোখ দুটি আপনা হতে বন্ধ হয়ে গেল।

হঠাৎ একটা বিশ্রী হাসির শব্দে চমকে ওঠে দেবকুমার...কিন্তু এ কি? কোথায় সে বীভৎস মুখ? এত বড় বিস্ময়কর ঘটনাকেও ছাপিয়ে আর একটা বিভীষিকা ফুটে উঠল তার চোখের সামনে।

সে দেখে, দুটি করুণ চোখ—সুন্দরীর চোখই তাকে বলা যায়—একান্ত মিনতি-মাখা,—দেবকুমারের মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে তাকিয়ে আছে!

দেবকুমারের বুকের রক্ত মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে যায়! কে যেন একরাশ বরফের ছোপ তার দেহমনে বুলিয়ে গেল!

চোখ তার বন্ধ করে দেবকুমার—ভয়ে বা বিস্ময়ে! পরক্ষণেই আবার সে চোখ মেলে তাকায়। কিন্তু তখনো সেই চোখ—ঠিক তেমনিভাবে—তারই মুখের ওপর ঝুঁকে আছে। তার এক ঝলক ঠান্ডা নিঃশ্বাস দেবকুমারের কপালে এসে বুঝি কাঁপুনি জাগিয়ে তোলে।

সহসা—একটা প্রচণ্ড শব্দ! সজোরে দরজাটা কে খুলে ফেলল। পরক্ষণেই একটা প্রকাণ্ড জোয়ান লোক ঝড়ের বেগে ঘরে ঢোকে। ঢুকেই সে এক লাফে মহিলার দিকে এগিয়ে এল। তারপর মুহূর্তমধ্যে তার চুল ধরে টেনে তাকে মাটিতে ফেলে দিল!

আর্তনাদ করে উঠল সেই বিপন্ন মহিলা। কিন্তু পরক্ষণেই সেই জোয়ান লোকটার হাতে চক্‌চক্ করে ওঠে একখানি শাণিত ছুরি আর সহসা স্তব্ধ হয়ে গেল মহিলার কণ্ঠস্বর।

দেবকুমারের চোখের সম্মুখে রক্তের নদী বয়ে যায়! মহিলার রক্তাক্ত দেহ তার মাঝখানে। দেবকুমার সে দৃশ্য আর দেখতে পারে না—ভয়ে সে চোখ বন্ধ করল!

কতক্ষণ সে এইভাবে ছিল বলা যায় না—কিন্তু কি এক বিচিত্র শব্দে চমকিত হয়ে আবার সে চোখ মেলে চায়!—

ওঃ! কি ভয়ঙ্কর! নিহত মহিলার চোখ থেকে আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছে। কি তার উত্তাপ আর কি তার জ্যোতি! সমস্ত ঘরে যেন আগুন জ্বলে উঠেছে! আর সেই আগুনের মাঝখানে রক্ত-সমুদ্রে সেই সুন্দরী মহিলা! তার সর্বদেহ রক্তমাখা, বুকের একপাশ দিয়ে তখনো বয়ে চলে ফুটন্ত রক্তস্রোত!

দেবকুমার স্তব্ধ, হতবাক! কিন্তু কিসের আকর্ষণে সে চোখ তার ফেরাতে পারল না, মন্ত্রমুগ্ধ শিকারের মতো সে যেন শিকারির চোখে চোখ মিলিয়ে ঠিক তেমনি ভাবেই তাকিয়ে রইল!

মহিলা হিংস্র দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকায়, ঠোঁট তার কেঁপে ওঠে। না-জানি কোন্ অভিসম্পাত সে বিলিয়ে দেয় অত্যাচারী পৃথিবীর বুকে!

সহসা দূরে কেন অসংখ্য পদশব্দ?—দূর হতে কাছে, ক্রমশই আরো কাছে, কে জানে কত লোকজনের পদশব্দ নৈশ স্তব্ধতা ভারী করে তোলে!

দেবকুমার বুঝতে পারে, একজন দুজন নয়, অসংখ্য লোক—হিংস্র শিকারির মতো বাড়িতে ঢুকে পড়েছে! তাদের হৈ-হল্লা ও অস্ত্রের ঝঞ্ঝনায় আতঙ্ক সৃষ্টি হয়, সমস্ত পৃথিবী যেন দারুণ ভয়ে তার চোখ বন্ধ করে ফেলল!

বুক কেঁপে ওঠে দেবকুমারের! কিন্তু সে বুঝি চিৎকার করবার শক্তিটুকু পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছে!

হঠাৎ কিসের বিজয়-উল্লাসে সমস্ত আকাশ-বাতাস ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল! সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড বেগে ঝড়ের মতো ঘরে ঢোকে একপাল যমদূত—সকলেই সশস্ত্র ভয়ঙ্কর! কিন্তু তাদের পুরোভাগে সেই মহিলার হত্যাকারী নৃশংস ব্যক্তি।

হিড়্ হিড়্ করে টেনে তাকে ঘরে নিয়ে এল যমদূতের দল! তারপর তার দেহের সর্বত্র এলোপাথাড়ি চলে অসংখ্য অস্ত্রাঘাত! ছোরা, তলোয়ার, শড়কি-বল্লম তাকে প্রায় ভূমিতলে গেঁথে ফেলে! মহিলার ফুটন্ত রক্তের সঙ্গে তার সদ্যোনিঃসৃত রক্ত মিশে একাকার হয়ে গেল!

"হাঃ! হাঃ! হাঃ! হাঃ!"—একটা বীভৎস অট্টহাসিতে মহিলা উল্লসিত হয়ে ওঠে। আর সঙ্গে সঙ্গে কোথা হতে বুঝি বা ছাদ ফুঁড়ে টুপ্‌টাপ্ ঝরে ঝরে পড়তে লাগল কতকগুলি কচিকাঁচা ছেলেমেয়েদের রক্তমাখা ছিন্নশির ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।

আর্তনাদ ও উল্লাসের চিৎকারে কান ঝালাপালা হয়ে যায়, আর ঠিক সেই মুহূর্তে প্রচণ্ড ভূমিকম্পে সেই বিশাল বাড়িখানির ভিত পর্যন্ত কেঁপে ওঠে!

প্রলয়-দোলায় কেঁপে ওঠে দেবকুমারের সমস্ত খাটখানি, টগবগে ফুটন্ত রক্ত তার কপালে ও মুখে ছিটকে এসে লাগে! কয়েকটা ভয়ঙ্কর হিংস্র যমদূত গোটাকয়েক বীভৎস কঙ্কাল সহ অবশেষে দেবকুমারের দিকেও তেড়ে এল!

ভয়ে শিউরে উঠল দেবকুমার! দু'হাত মাথায় তুলে সে প্রাণপণে চিৎকার করে ওঠে, "বাঁচাও! বাঁচাও!"—

জ্ঞান যখন হল, তখন সে দেখে, তার বন্ধু রজত ও একজন ডাক্তার তার পাশে বসে!

ভাবতে চেষ্টা করে সে, কোথায় সে আছে আর কেমন করে এল?

চোখ চাইতে পারে না সে। অবশেষে ধীরে ধীরে মনে আসে তার সব কিছু। কিন্তু বুঝতে পারে না, নিশীথের সেই ভয়ঙ্কর প্রাসাদে ওরা দুজনই বা এল কখন আর কেমন করে এল!

"কেমন করে এল?"—সম্ভবত তার বুকের ভাষা মুখে ফুটে বেরিয়েছিল একটু জোরেই।

রজত বলে, "হ্যাঁ ভাই, এ প্রশ্ন তোমার মনে জেগে ওঠা খুবই স্বাভাবিক। সংক্ষেপে বলছি শোনো—

অনেক রাতে তুমি যখন ফিরলে না, তখন আমার এই ডাক্তার বন্ধুটিকে নিয়ে তোমায় খুঁজতে বেরোই। এ বাড়িটা আমার বাড়ি হতে প্রায় মাইল তিনেক দূর।

এর কাছাকাছি আসতেই তোমার একটা আর্তনাদ আমাদের কানে আসে। আমরা তখুনি টর্চ হাতে বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ি। এসে যা দেখলুম, তাতে আর আশা হয়নি যে তোমাকে জীবন্ত ফিরে পাব। দেখি, তুমি এই খাটের ওপর পড়ে আছ, কিন্তু মাথা তোমার মাটিতে ঝুলছে! আর তোমার নাক-মুখ দিয়ে রক্ত ঝরছে!—"

বাধা দিয়ে দেবকুমার বলে, "কিন্তু ওরা সব গেল কোথায়? সেই নিহত মহিলা, বাচ্চা ছেলেমেয়েদের কাটা মাথাগুলি—সেই রক্তনদী—রক্তস্রোত—"

"থামুন," বাধা দিয়ে বলেন ডাক্তারবাবু, "ওকথা আর ভাববেন না দেবকুমারবাবু। এ বাড়িটা ভূতের বাড়ি, যা-কিছু আপনি দেখেছেন, সবই ভৌতিক ব্যাপার দেখেছেন। আসলে কিছুই সত্য নয়।—"

"কিন্তু মিছামিছি এমন একটা—"

দেবকুমারের কথায় বাধা দিয়ে বলে রজত, "মিছামিছি কিছুই নয় দেবকুমার। অনেক দিন আগে এক ধনী জমিদার তাঁর স্ত্রীর ওপর বিরক্ত হয়ে অতি নিষ্ঠুরভাবে তাকে হত্যা করেছিলেন। কিন্তু তিনিও হাতে হাতে তার সাজা পেয়ে গেছেন। মহিলার আত্মীয়-স্বজন যাঁরা, তাঁরা একদল ভাড়াটে গুন্ডা লেলিয়ে এবাড়ির সবাইকে কচুকাটা করে গেছেন। সেই থেকে এবাড়ি পোড়ো বাড়ি বলেই বিখ্যাত। কেউ এখানে থাকে না। মাঝে মাঝে দু'একটা অপরিচিত ব্যক্তির মৃতদেহ এখানে আবিষ্কার হয়। সম্ভবত তোমারই মতো দৈবাৎ যারা এখানে রাতের অতিথি হয়, ভোরবেলা তাদেরই শব হয়তো পাওয়া গেছে। তোমার ভাগ্যি ভালো যে, আমরা বোধহয় খুব সময়মতোই এসে পড়েছিলাম।"

দেবকুমার নীরবে ভাবতে থাকে; বিস্ময়ে ও ভয়ে তার মুখ থেকে কোনো কথা বেরোয় না। কিন্তু সেদিন সে তাদের সঙ্গে রজতের বাড়ি ফিরে গেলেও, কয়েকদিন পরে একদল মিস্ত্রি নিয়ে আবার সে ফিরে এসেছিল সেইখানে।

রজতকে বলল সে, "ভাই, খাটের তলাটা ওদের খুঁড়তে বলো। আমার খাটখানি সেদিন বড্ড দুলে উঠেছিল, উঁচু হয়ে উঠেছিল অনেকটা। তার কারণ কি বলতে পারো?"

"তা কেমন করে বলব ভাই? তুমি বলছ খুঁড়তে, বেশ খুঁড়েই দেখা যাক।"

ঘণ্টাকয়েক পরিশ্রমের পর, মেজের সিমেন্ট ফাটিয়ে যখন আগাগোড়া খুঁড়ে ফেলা হল, তখন দেখা গেল—রক্তমাংসহীন কার এক কঙ্কাল। আর সেই কঙ্কালের আশেপাশে কিছু হার ও ব্রেসলেট তখনো সেই নিহত মহিলার পরিচয় ঘোষণা করছে!

সমবেত সকলেই স্তব্ধ হয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর রজত বললে, "রহস্য তাহলে পরিষ্কার হয়ে গেল দেবকুমার! সম্ভবত প্রত্যহ গভীর রাতে মহিলার অতৃপ্ত আত্মা তার গোপন আবাস হতে বেরিয়ে আসে। আর তারপর যা হয়ে থাকে, সে সম্ভবত বাস্তবের পুনরাভিনয়। জীবনে একদিন যা হয়েছিল, এবাড়ির ভৌতিক অধিবাসীরা আজও তার 'রিহার্সেল' দিয়ে যাচ্ছে!

যাহোক দিন তো প্রায় শেষ হয়ে এল। আর দু'এক ঘণ্টা এখানে থাকতে পারলে এবাড়ির আরো কিছু গোপন রহস্য হয়তো উদ্ধার করা যেত, কিন্তু সে কি সঙ্গত হবে ভাই?—"

"ও কি?" চিৎকার করে ওঠেন ডাক্তারবাবু। সেদিকে তাকিয়ে তারা দেখে, একপাল সাদা ও কালো বাদুড় হঠাৎ জানালার সার্সিতে এসে মাথা ঠুকে মরছে! তাদের কুৎকুতে রক্তচোখে হিংস্র ঝলক!

জোরে চিৎকার করে ওঠে রজত, "না আর নয়। এক্ষুনি বেরিয়ে পড়ো দেবকুমার! বেরিয়ে পড়ো ডাক্তার। নইলে সমস্ত আত্মা আজ আবার প্রতিশোধ নিতে এগিয়ে আসবে—"

মুহূর্তে ছুটে বেরিয়ে যায় সবাই। মনে হল কারা যেন তাদের পিছু পিছু বেগে ছুটে আসছে! নাগাল পেলেই বুঝি বা ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে!

শ্রাবণ ১৩৬৩

অবিশ্বাস্য

নিমাই ভট্টাচার্য

শনিবারের বারবেলায় বেরুতে অনেকেই বারণ করেছিল। কিন্তু সকলের কথা অগ্রাহ্য করে বড়বাজার থেকে কেনাকাটা সেরে যখন শিয়ালদা স্টেশনে পৌঁছলাম তখন আর মাত্র পাঁচ-সাত মিঃ বাকি আছে গাড়ি ছাড়তে। তাই তাড়াতাড়ি বোলপুরের একটি টিকিট কিনে দৌড়লাম, সেখানে গয়া প্যাসেঞ্জার দাঁড়িয়ে আছে। কুলি দুজন সব মালপত্র বাঙ্কের উপর গুছিয়ে রেখে তাদের প্রাপ্য বুঝে নিয়ে চলে গেল। ট্রেন ধরার তাগিদে খেয়ালই হয়নি। যখন খেয়াল হল তখন ট্রেন ছাড়ার ঘণ্টা দিয়ে দিয়েছে। একটা বড় বগীতে একমাত্র যাত্রী বলতে আমিই। মনটা খারাপ হয়ে গেল— যখন মনে হল চুরি, রাহাজানি ও ছেনতাইয়ের জন্য এই গাড়িটার যথেষ্ট নামডাক আছে। একটা মাত্র আলো শিবরাত্রির সলতের মতন জ্বলছে। সারা বগীটার মধ্যে যেন একটা আলো-আঁধারির খেলা চলছে। নিজেকে কি রকম যেন অসহায় মনে হতে লাগল। দুর্গা নাম স্মরণ করে, সাহসে ভর দিয়ে দরজার ছিটকিনিগুলো লাগিয়ে দিয়ে এবং মালপত্রগুলো গোছগাছ করে বসে পড়লাম।

গাড়ি চলতে শুরু করেছে। চিন্তা করছিলাম ছেলেমেয়ে ও স্ত্রীর কথা, এখন তারা কি করছে? আর এইসব ঝামেলা আমার মাথার উপর চাপিয়ে দেওয়ার জন্য মনে মনে স্ত্রীকে খুব গালিগালাজ করছিলাম। আমি যেখানটায় বসেছিলাম সেখান থেকে ওপাশের বাথরুমটা পরিষ্কারই দেখা যায়। একমনে চিন্তা করছি, ঠিক সেই সময় বোলপুরের কিঙ্করবাবু বাথরুম থেকে হাসতে হাসতে আমারই সামনে বসে পড়লেন। কিঙ্করবাবুকে দেখামাত্র কেমন যেন হতবাক্ হয়ে গিয়েছিলাম। দরজা তো ভেতর থেকে বন্ধ, তবে এই চলতি গাড়িতে এলেন কেমন করে? এইসব যখন চিন্তা করছি কিঙ্করবাবুই তার সমাধান করে দিলেন। বললেন—ভায়ার কি শ্বশুরালয়ে যাওয়া হচ্ছে?

আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু আপনি? আর জিজ্ঞাসা করতে হল না। উনিই বললেন—জানি ভায়া তোমার মনের মধ্যে এই প্রশ্নটাই তোলপাড় করে তুলেছে। আরে ভায়া তুমি আসবার একটু আগেই বাথরুমে গিয়েছিলাম। ক'দিন ধরে পেটটা বড় গোলমাল শুরু করেছে। তা তোমাকে দেখতে পাব আমিও আশা করিনি। যাক ভালোই হয়েছে ভায়া তোমাকে পেয়ে, বেশ গল্প করতে করতে যাওয়া যাবে কি বলো?

যুক্তিটা মনে মনে মেনে নিলাম। জিজ্ঞাসা করলাম—তা আপনি হঠাৎ এ সময়ে এখানে? আপনি তো কোথাও বড় একটা বার হন না শুনেছি।

আর বলো কেন ভায়া, আত্মীয়স্বজনে ভরতি বাড়ি, যেন গমগম করছে, তা সত্ত্বেও বড় বৌমার জন্য মনটা খারাপ হওয়ায় বাধ্য হয়েই সবাইকে রেখে বেলা ২টার সময় বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ি বৌমার বাড়ির উদ্দেশ্যে। শিবপুরে এসে যখন পৌঁছলাম তখন সন্ধ্যা হব হব। এসেই শুনি বৌমার একটি পুত্রসন্তান হয়েছে ঠিক বেলা ২টার সময়। তাই আর দেরি না করে, এই রাত্রের ট্রেনে যাওয়াই স্থির করে সেই শুভ সংবাদ বয়ে নিয়ে চলেছি। তুমি তো জানো বড় ভাগ্নের বিয়ে আমি নিজে দেখে দিয়েছি। বড় বৌমা আমার ঘরের লক্ষ্মী। আমি কি না এসে থাকতে পারি?

এতগুলো কথা একসঙ্গে বলে একটা বিড়ি ধরিয়ে চুপচাপ টানতে লাগলেন। আজ যেন কিঙ্করবাবুকে কেমন কেমন মনে হতে লাগল। দেখে মনে হয় ওঁর যথাসর্বস্ব কেউ চুরি করে নিয়ে গেছে। চুলগুলো কেমন এলোমেলো, চোখ দুটো যেন কোটরের মধ্যে ঢুকে আগুনের ভাঁটার মতো জ্বলছে, গলার স্বরটাও যেন ক্ষীণ শোনাচ্ছে। মনে হচ্ছে বহু দূর থেকে কে যেন কথা বলছে। সে

চেহারায়ও যেন সেই সুন্দরতা আর নেই। মনে হয় সারা শরীর কে ঝলসে দিয়েছে। কাপড়টা ছেঁড়া, এক পা ধুলো ভরতি। আজকের কিঙ্করবাবু আর সেদিনের কিঙ্করবাবু আকাশপাতাল তফাৎ। অথচ বোলপুরে এঁকে চেনে না এমন লোক বোধহয় খুব কমই আছে। বিরাট অবস্থা, নিজের ছেলেমেয়ে বলতে কেউ নেই। ঐ ভাগ্নে দুজনকে নিজের কাছে রেখে মানুষ করেছেন, তাদের বিয়ে-থা দিয়েছেন, এখন তারাই এনার সব। তারাই এনার ব্যবসাপত্তর, জমিজমা, সব দেখাশুনা করে। শখের মধ্যে যার দু'বেলা ইস্ত্রি করা জামাকাপড় না হলে চলে না সে কিনা এই ছেঁড়া পোশাকে আমারই সামনে এই অবস্থায় ট্রেনে যাচ্ছে! কিন্তু কেন?

হঠাৎই কিঙ্করবাবু বললেন—ভায়া তো অনেক রকম বাজার করেছ দেখছি, তা গীতার বিয়ে তাহলে বেশ ভালোভাবেই হচ্ছে?

বললাম—সবই আপনাদের আশীর্বাদ।

আমাদের আশীর্বাদ সব সময়ই আছে ভায়া। তা ছেলেটি বেশ ভালোই, যেমন সুন্দর চেহারা তেমনি সুন্দর মন। সর্বদাই হাসিখুশি। জান ভায়া একবার জিগ্যেস করেছিলাম—হ্যাঁরে, বিয়েতে কি কি পাচ্ছিস? তাতে কি বললে জানো। কি হবে ঐ সামান্য যৌতুক নিয়ে। যাকে নিয়ে সারাজীবন ঘর করতে হবে তার মধ্যে ঐ সামান্য যৌতুক যে সব সময় মনে করিয়ে দেবে নিজের অক্ষমতা। তাই তো বলে দিয়েছি আমার কোনো দাবিই নেই। ভাব তো—এই রকম চিন্তা যদি সব ছেলেদের মধ্যে থাকত, তাহলে আর মেয়ের বাপেরা সর্বস্বান্ত হত না। লোভকে কতখানি দমন করতে পারলে, এই ধরনের কথা বলা যায়। তাই তো আশীর্বাদ করছি ভায়া ওদের বিয়ে সার্থক হোক, ওরা সুখী হোক। প্রসঙ্গটা পালটে হঠাৎ বলে উঠলেন—ভায়া, আমার এই ঘড়িটা ও টাকাগুলো তোমার ঐ তরকারির বস্তার মধ্যে ঢুকিয়ে রাখো তো। শুনেছি এই ট্রেনটা ভালো না। একটা কাগজে মুড়ে গোটা কতক টাকা ও ঘড়িটা আমার হাতে দিলেন।

যুক্তিটা ভালোই মনে করে আমিও আমার ঘড়ি, আংটি ও কিছু টাকা একটা রুমালে বেঁধে তরকারির বস্তার মাঝামাঝি জায়গায় রেখে দিলাম। কিঙ্করবাবুর উপস্থিতিটা আমার খুব অস্বস্তি লাগছিল, তাই বার বার বগীটার ওপাশে গিয়ে ধূমপান করতে হচ্ছিল। কিঙ্করবাবু বোধহয় আমার মনের কথাটা টের পেয়েছিলেন, তাই একটা বিড়ি বাড়িয়ে ধরলেন আমার সামনে। আমি ইতস্তত করছি দেখে, হাসতে হাসতে বললেন—ভায়া ছেলেরা বড় হলে তাকে ঠিক বন্ধুর মতন করে নিতে হয়। এতে লজ্জা পাবার কিছু নেই, অসঙ্কোচে ধরিয়ে ফেল।

আমিও আর দ্বিরুক্তি না করে বিড়িটার সৎগতি করলাম। কিঙ্করবাবু চোখ বুজে বিড়ি টেনে চলেছেন দেখে আমিও জানলার বাহিরে দূরে বহু দূরে ঘুমন্ত গ্রামগুলির দিকে তাকিয়ে হারিয়ে যাই কোনো এক অজানা স্বপ্নপুরীর উদ্দেশ্যে। তাকিয়ে থাকি জ্যোৎস্নায় স্নাত মাঠ, ঘাট, বন, প্রান্তরের দিকে। সম্ভবত আজ পূর্ণিমা। পূর্ণিমার পূর্ণ আলোয় সারা পৃথিবী যেন অবগাহন স্নান করছে। ঠিক যেন একটা স্বপ্নলোকের ভেতর দিয়ে ছুটে চলেছে আমাদের যন্ত্রদানবটা। দানবটার গর্জনে আকাশ-বাতাস কেঁপে উঠছে। সেই ভয়ে শিশুরা সব মায়ের বুকে মুখ লুকিয়ে চুপটি করে শুয়ে আছে। গাছগুলোও সব ভয়ে পিছন দিকে ছুটে পালাচ্ছে। তারই মধ্যে দিয়ে দানবটা গর্জন করতে করতে ছুটে চলেছে সামনের দিকে। আরও একজন সমান তালে ছুটে চলেছে তার হাসিমুখ নিয়ে। দেখে মনে হয় দুজনেরই চলার শেষ নেই।—হঠাৎ কল্পলোক থেকে ফিরে এলাম পাশ দিয়ে চলে যাওয়া বিকট আর এক দানবের গর্জনের আওয়াজে। ঘুরে দেখি—কিঙ্করবাবু চোখ দুটো খোলা রেখে, মুখটা হাঁ করে ঘুমুচ্ছেন। যেন একটা মরা মানুষকে কেউ বসিয়ে রেখে দিয়েছে। বগীর ভেতর অল্প আলোয় কিঙ্করবাবুর মুখটা দেখে বেশ ভয় ভয় করতে লাগল। আবার একটা সিগারেট ধরিয়ে বাহিরের দিকে তাকিয়ে বসে রইলাম। রাত এগারোটা হবে, এইবার গাড়ি ব্যান্ডেলে পৌঁছবে। নানান ধরনের চিন্তার মধ্যে দিয়ে এক সময় খেয়াল হল গাড়ি প্লাটফর্মে ঢুকছে।—কিঙ্করবাবু সেইভাবেই ঘুমিয়ে আছেন। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে একটা চা-ওয়ালাকে ডেকে দু'ভাঁড় চা নিয়ে কিঙ্করবাবুকে ডেকে

তুললাম। চা খেতে খেতে দুজনে গল্প করতে থাকি। এক সময় কিঙ্করবাবুই বললেন—ভায়া এবার তুমি একটু গড়াগড়ি দিয়ে নাও। আমি তো অনেকক্ষণ ঘুমোলাম।

সুযোগ পেয়ে শুয়ে পড়লাম। একটু তন্দ্রার মতন এসেছিল হঠাৎ একটা চিৎকারে ঘুমটা ভেঙে গেল। তাকিয়ে দেখি কিঙ্করবাবু নেই। বুকটার মধ্যে ছ্যাঁৎ করে উঠল। উঠে গিয়ে দেখি কিঙ্করবাবু দরজাটা খুলে ঝুঁকে পড়ে কি যেন দেখছেন পেছন দিকে। হয়তো আমারই পায়ের শব্দ শুনে আস্তে আস্তে ঘুরে নিজের সিটের দিকে চলে গেলেন। কিছু কথা জিগ্যেস করবার সাহস হল না। দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে আমি আমার জায়গায় এসে বসলাম।

এই কিঙ্করবাবুর সঙ্গে আমার বছর খানেক দেখা-সাক্ষাৎ নেই। প্রায় এক বছর পর আমি শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছি। তবে আগে যতবার গেছি এঁর সঙ্গে দেখা না করে আসিনি। এনার অমায়িক ব্যবহার যেন বার বার হাতছানি দিয়ে ডাকে। কিন্তু আজ কেবলই মনে হচ্ছে এই কিঙ্করবাবুর মধ্যে কোথায় যেন একটা বিরাট তফাৎ উঁকি মারছে।

শক্তিগড় বহুক্ষণ পার হয়ে এসেছি। বর্ধমান আসতে আর বেশি দেরি নেই, তাই আর না ঘুমিয়ে জেগে বসে রইলাম। ওদিকে কিঙ্করবাবুও চোখ বন্ধ করে চুপচাপ বসে আছেন। রাত্রি এখন প্রায় দুটো হবে, ঠান্ডাটাও বেশ জাঁকিয়ে পড়াতে শীত শীত করছে।

এক সময় বর্ধমানে গাড়ি থামতে কিঙ্করবাবু উঠে পড়লেন। বললেন—একটু বোস ভায়া আমি আসছি, বলেই এমন করে চলে গেলেন মনে হল যেন হাওয়ায় মিশে গেলেন। তার ঠিক একটু পরেই একজন চেকার গাড়িতে উঠলেন টিকিট চেক করতে। আমাকে একা দেখে বেশ আশ্চর্য হয়েই প্রশ্ন করলেন।—এত বড় কামরায় এত মাল নিয়ে এই রাত্রের গাড়িতে যাওয়া মোটেই উচিত হয়নি আপনার। একটু আগেই শক্তিগড়ের কাছে একজন নামকরা গুন্ডা গাড়ি থেকে পড়ে মারা গেছে। এই বলে ভদ্রলোক চলে গেলেন এবং যাবার সময় সাবধানে থাকতে বলে গেলেন আমাকে। ভদ্রলোকের কথা শুনে চিন্তার ঝড় বয়ে চলে মনের মধ্যে—শক্তিগড়ের কাছাকাছিই তো কিঙ্করবাবু দরজা খুলে বাইরে কি যেন দেখছিলেন, একটা চিৎকারেই তো আমার ঘুমটা ভেঙে গিয়েছিল। তবে কি.........

আর চিন্তা করতে পারলাম না। কিন্তু একি! গাড়ি তো চলতে শুরু করেছে অনেকক্ষণ, কিঙ্করবাবু কোথায়? একটা অজানা আশঙ্কায় বুকের ভেতর দুরদুর করতে লাগল। জানলা থেকে, পেছনে ফেলে আসা অন্ধকারে আচ্ছন্ন প্লাটফর্মের দিকে তাকিয়ে কিঙ্করবাবুকে খোঁজবার চেষ্টা করছি। এমন সময় একখানা হাত আমার কাঁধের উপর পড়ায় আঁতকে উঠে ফিরেই দেখি, বিরাট এক ঠোঙা খাবার হাতে নিয়ে কিঙ্করবাবু সেই প্রাণ কাঁপানো হাসি হেসে চলেছেন। আমার ফ্যাকাশে মুখের দিকে তাকিয়ে নিজেই অকস্মাৎ বলে উঠলেন—দরজায় দাঁড়িয়ে চাঁদের লুকোচুরি খেলা দেখছিলাম, তাই খেয়ালই ছিল না তোমার কথা। এস খাওয়া যাক, ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছে, বলে নিজেই দুটো জায়গা করে খাবার ভাগ করলেন। খাবারের পরিমাণ দেখে আমার চোখ তো ছানাবড়া—এত খাবার জীবনে কোনোদিনই খাইনি, বিশেষ করে মিষ্টি তো খেতেই পারি না। তাই ওরই মধ্যে সামান্য কিছু নিয়ে বাকিটা কিঙ্করবাবুর পাতে তুলে দিই। তাই দেখে কিঙ্করবাবুর হাসি আর ধরে না, বললেন—ভায়া তোমাদের বয়সে আমরা কবজি ডুবিয়ে খেতাম আর পাহাড় ভেঙে বেড়াতাম। আর তোমরা?—মানে আজকের এই যুবসম্প্রদায় সে তুলনায় খেতেই পারে না। অবশ্য এর জন্য তোমাদেরই বা দায়ী করি কি করে। দেশের এমনই সমাজ-ব্যবস্থা, যার ফলে এই সম্প্রদায় না খেতে পেয়ে শুকিয়ে শুকিয়ে দেশলাইয়ের কাঠির মতন হয়ে উঠেছে। জান, আমার যদি ক্ষমতা থাকত, তাহলে ঐ শুকিয়ে যাওয়া কাঠিগুলোর মাথায় এমন একটা বারুদের খোল দিয়ে ঘষা দিতাম যার ফলে সব কাঠিগুলো একসঙ্গে জ্বলে উঠত—আর সেই আগুনে সব জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে আসল সোনার রং ধরিয়ে দিতাম বাংলার প্রতিটি ঘরে ঘরে।—তাই তো বলি ভায়া, কবজি ডুবিয়ে খাবে, পাহাড় ভেঙে বেড়াবে, আর মনকে করবে নির্ভীক। দেখবে সেখানে থাকবে না কোনো ভয়। নাও নাও আরম্ভ কর.....।

খাওয়ার শেষে ওয়াটার বোতল থেকে খানিকটা করে দুজনে জল খেয়ে, একটা সিগারেট ধরালাম। কিঙ্করবাবু নিজে একটা বিড়ি ধরিয়ে চোখ বুজে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় বসে রইলেন। সারাদিনের ক্লান্তিতে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।—হঠাৎ কিঙ্করবাবুর ডাকে ধড়মড় করে উঠে বসি।—অজয় নদী পার হচ্ছে ভায়া, মালপত্তর সব ঠিক করে নাও। বাইরে চাঁদের আলোটা কেমন যেন একটা ঘুমন্ত স্বপ্নপুরির মতন দেখাচ্ছিল। আস্তে আস্তে প্লাটফর্মে গাড়িটা দাঁড়াতে, কিঙ্করবাবু আর আমি মালপত্তর সব ধরাধরি করে প্লাটফর্মের একটা গাছতলায় জড়ো করে রাখলাম।—ঠান্ডাটাও বেশ পড়েছে, হিম-শীতল জ্যোৎস্না আলোকিত প্লাটফর্মে আমরাই মাত্র দুজন যাত্রী। একজন স্বপ্নলোকের মধ্যে আকুলি-বিকুলি হয়ে কি যেন দেখার চেষ্টা করছে, তার ঐ চাহনির মধ্যে কাকে যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে।

ভায়া কি এই রাত্রেই বাড়ি যাবে, না বাকি রাতটুকু এইখানে কাটিয়ে ভোরবেলায় যাবে?

তাইতো ভাবছি, আর মাত্র ঘণ্টা দুই রাত আছে, এত মালপত্তর নিয়ে যাওয়া কি ঠিক হবে?

তাহলে এক কাজ করো, এসো ভায়া, বাকি রাতটুকু দুজনে গল্প করে কাটিয়ে দিই।

অগত্যা দুজনে গাছতলার বাঁধানো জায়গায় বসে পড়লাম। চারিদিকে নিস্তব্ধ। দূরের লাইটগুলো যেন এক একটা প্রদীপের মতন টিমটিম করে জ্বলছে। চাঁদের আলোটা অনেকটা ফিকে হয়ে এসেছে। লাইনের ওপাশে দুটো কুকুরের মারামারির চিৎকার ভেসে আসছে দূর থেকে। এক সময় কিঙ্করবাবু উঠে চলে গেলেন বুকিং অফিসের দিকে।

একা একা বসে আছি আর ভাবছি...আজ থেকে ১৫ বছর আগে ঠিক এমনি একটা রাত, সেদিনও সম্ভবত আকাশে এই জ্যোৎস্নাই মুখরিত করে দিয়েছিল। তবে সেদিন সঙ্গে ছিল আমার স্ত্রী। পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল রবীন্দ্রনাথের তীর্থভূমির সঙ্গে, লালমাটির এই দেশ আম্রকুঞ্জের ছায়ায় স্থাপিত শান্তিনিকেতনের সঙ্গে। আজ তার কত পরিবর্তন। হঠাৎ চমক ভাঙল একটা মালগাড়ির আওয়াজে। তারই পিছনের লাল আলোটা ধীরে ধীরে দূর থেকে দূরে মিলিয়ে যেতে লাগল কোন এক নাম-না-জানা দেশের উদ্দেশ্যে। ফিরে দেখি, একজন পাহারাদার ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে আমার দিকে।

বাবুসাহাব্ কি কলকাত্তাসে আসলেন? কোথা যাবেন?

যাব শুঁড়িপাড়ায়। শ্বশুরমশায়ের নাম বলাতে বুঝলাম শ্বশুরমশাইকে চেনে।

হাসতে হাসতে পাহারাদার বলল—আরে উন্‌কে তো হামি বহুত চিনে। পরশুরোজ উন্‌কা ছোট লেড়কির সাদি আছে, হামার ভি নিমন্ত্রণ আছে। তা হাপনি বুঝি উসব্ বাজার করিয়ে আনলেন। আচ্ছা বাবুজি হামি চল্লো, পরশুরোজ ফিন দেখা হোবে।

চলে গেল একটা দেশওয়ালি সুর ভাঁজতে ভাঁজতে। কিঙ্করবাবু দু'ভাঁড় চা নিয়ে হাজির। ভোর ৩।৪টার সময় চা কোথায় পেলেন চিন্তা করছি। এমন সময় উনিই হাসতে হাসতে বললেন—একজনকে ডেকে তুলে চা করিয়ে নিয়ে আসতে হল।

চা খেতে খেতে গল্প করছি। এক সময় বললাম—আপনি বরং বাড়ি চলে যান। মিছিমিছি আমার জন্য এই ঠান্ডায় কষ্ট পাচ্ছেন।

হাসতে হাসতে কিঙ্করবাবু বললেন—বুঝলে ভায়া সবই মায়া, আর এই মায়া আছে বলেই মানুষ বারবার পৃথিবীতে জন্ম নেয়। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবকে তাই মায়ার বাঁধনে জড়িয়ে থাকতে চায়। অহেতুক উতলা হয়ো না, একসঙ্গেই যাওয়া যাবে।

অগত্যা বসে বসে গল্প করতে লাগলাম। এক সময় পূর্ব গগনে একটা ক্ষীণ আলোর রেখা ধীরে ধীরে তার মিষ্টি আলোর ধারা ছড়িয়ে দিতে লাগল এই মর্ত্যের পৃথিবীতে। হঠাৎ কিঙ্করবাবু কেমন যেন চঞ্চল হয়ে উঠলেন। দুটো বিড়ি বার করে, একটা আমার দিকে বাড়িয়ে ধরে বললেন—ভায়া, একটু বসো, আমি ঐ মাঠটা দিয়ে ঘুরে আসি একবার। বলে, উত্তর দিকের মাঠটায় আলো-আঁধারির মধ্যে মিশে গেলেন।

আলোর রেখাটা ধীরে ধীরে বড় থেকে বড় হয়ে ভরিয়ে তুলেছে আলোর বন্যায়। সেই আলোর পরশে পাখিরা সব গান ধরেছে, দিনমণির আগমনের অপেক্ষায়। দু'একজন করে লোক চলতে শুরু

করেছে, কিন্তু কিঙ্করবাবুর আর আসার নাম নেই! যেন হারিয়ে গেছে লোকটা। অনেকক্ষণ বসে আছি, চলে যাব কিনা ভাবছি এমন সময় আমারই বড় শালা শুঁড়িপাড়া থেকে বেরিয়ে লাইন পার হয়ে দোকান খোলার উদ্দেশ্যে এদিকেই আসছে। আমাকে ঐ অবস্থায় দেখে প্রশ্ন করল—কি ব্যাপার এখানে বসে? রিকশা পাননি বুঝি?

বললাম—আরে, না হে। তোমাদের কিঙ্করবাবু আমাকে বসতে বলে, সেই যে গেলেন ঐ মাঠটার দিকে এখনো পর্যন্ত তাঁর ফেরার নাম নেই।

শালাবাবু কিছুক্ষণ অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে তাড়াতাড়ি একটা রিকশা ডেকে মালপত্তর তুলে শুঁড়িপাড়ার দিকে রওনা হল আমাকে নিয়ে। পথে যেতে যেতে যতবারই কিঙ্করবাবুর কথা তুলি, ততবারই অন্য প্রসঙ্গে চলে যায় শালাবাবু। তবে কি কিঙ্করবাবুদের সঙ্গে এদের কথা বন্ধ নাকি! হয়তো সেই কারণে শুনতে চাইছে না কিঙ্করবাবুর কথা, তাই হয়তো বার বার অন্য প্রসঙ্গে চলে যাচ্ছে। মনে মনে বিরক্তি বোধ হতে লাগল বড় শালাটির উপর। রিকশা চৌমাথা হয়ে সোজা উত্তরে উকিলপট্টির দিকে চলতে লাগল। আর সামান্য পথই বাকি আছে।

এক সময়ে শ্বশুরবাড়ির দরজার সামনে এসে রিকশা দাঁড়ায়। আমাকে দেখে স্ত্রী, ছেলেমেয়ে, শ্বশুর-শাশুড়ি ও আত্মীয়স্বজন সবাই বেরিয়ে সদরে এল। চেয়ে দেখি, পাশেই কিঙ্করবাবুদের বাড়িটা তখনো ঘুমে অচেতন।

শাশুড়ি ঠাকুরন দাওয়ায় একটা মাদুর পেতে দিলেন। হাত-মুখ ধুয়ে এসে বেশ আরাম করে বসলাম। সঙ্গে সঙ্গে ছোট শালীটি এককাপ গরম চা এনে দিল এবং বেশ আমেজ করেই খেতে লাগলাম। আদর-আপ্যায়নের বহরে সমস্ত ক্লান্তি যেন সরে যেতে লাগল। হাজার হোক বড় জামাই তো!

আমার মাল নাবাতেই ব্যস্ত, বড় শালাকে দেখেই মনে পড়ে গেল কিঙ্করবাবুর কথা। জিজ্ঞাসা করলাম—হ্যাঁ হে, কিঙ্করবাবু ফিরেছে কিনা একবার খোঁজ নিয়েছ, না, আমার জন্য তিনি আবার স্টেশনে দৌড়োদৌড়ি করছেন? কি ভাববেন ভদ্রলোক! সারারাত একসঙ্গে এলাম, আমাকে কত খাওয়ালেন, আদর-যত্ন করলেন, আর আমি কিনা তাঁকে রেখেই চলে এলাম! একসঙ্গে এতগুলো কথা বলে তাকিয়ে দেখি বাড়িসুদ্ধ সবাই হাঁ করে চেয়ে আছে আমার দিকে। ওদের চাউনিতে নিজেকে কেমন বোকা বোকা মনে হতে লাগল।

হঠাৎ শাশুড়ি ঠাকুরন প্রশ্ন করলেন—তুমি কার কথা বলছ বাবা? তুমি কি সত্যি বলছ যে, কিঙ্করবাবু গত রাত থেকে তোমার সঙ্গে ছিলেন? বললাম—হ্যাঁ মা, আমি মিথ্যে বলব কেন! ব্যস্ আমার উত্তর পেয়েই, এ আমার কি হল রে.....বলে চেঁচিয়ে হাউমাউ করে কাঁদতে শুরু করলেন শাশুড়ি। সামনে বড় শালাকে দেখে বললেন—ওরে বাবলু, যা তো বাবুর বড় ভাগ্নেকে তাড়াতাড়ি একবার ডেকে আন।

এবার বিস্ময়ের পালা আমার। মাথাটা কেমন যেন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। এদের সব কাণ্ড দেখে মনে হচ্ছে আমি এবার কেঁদে ফেলব। বিস্ময়ের পর বিস্ময়! কিছুক্ষণের মধ্যেই কিঙ্করবাবুর দুই ভাগ্নে আমার সামনে এসে হাজির। তাকে দেখামাত্র শাশুড়ি ঠাকুরন বলতে লাগলেন—বাবা ধীরেন, আমার বড় জামাই তোমার মামার সম্বন্ধে কি বলছে শোন। ছোট শালীটিও দেখি তার মায়ের সঙ্গে সুর মিলিয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে কাঁদছে। আমার স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে সবাই একই সুরে সুর মিলিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে কাঁদছে। শ্বশুরমশাই মাথায় হাত দিয়ে একপাশে চুপটি করে বসে আছেন। মোটের উপর সবাই অনেকটা তফাতে সরে আমার দিকে কেমন যেন ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে রয়েছে। চোখের উপর এই দৃশ্য দেখে কেমন যেন অস্থিরতার মধ্যে ছটফট করতে থাকি। মনে হচ্ছে এবার আমি পাগল হয়ে যাব। এমন সময় ধীরেন আমার পাশে বসে জিজ্ঞাসা করল—কি হয়েছে জামাইবাবু, আমাকে সব খুলে বলুন তো?

ধীরে ধীরে গত রাত্রের সমস্ত ঘটনাগুলো ধীরেনকে বললাম। আর এও বললাম—তোমার মামা

যে আমাকে বললেন গতকাল বেলা দু'টার সময় তোমার একটি পুত্রসন্তান হয়েছে। তাছাড়া, আরও বললেন, তাঁর ক্যাশবাক্সের কোন এক গোপন স্থানে রেখেছেন একছড়া সোনার হার হিরের লকেট সমেত তোমার ছেলের অর্থাৎ তাঁর ভাবী নাতির জন্য। লক্ষ করলাম, আমার কথা শেষ হতে না হতে ধীরেনের ছোট ভাই এক দৌড় মারল তাদের বাড়ির দিকে। আমি বলে চললাম—তাছাড়া, এই দেখ না আমার তরকারির বস্তার মধ্যে রাখা তোমার মামার ঘড়ি ও কিছু টাকা—বলে তাড়াতাড়ি সকলের সামনে তরকারির বস্তাটা খুলে ঢেলে ফেললাম। সকলেই অবাক হয়ে আমার কার্যকলাপ দেখছিল। তৎক্ষণাৎ তরকারির ভেতর থেকে রুমালে বাঁধা জিনিসটা টেনে নিয়ে খুলে ফেললাম সকলের সামনে। কিন্তু এ কি? কি করে সম্ভব? আমার জিনিস ছাড়া আর কিছু নেই দেখে মাথাটা হঠাৎ ঘুরে গেল। অথচ আমি নিজের হাতে যা বেঁধে রেখেছি তাহলে—। আমার অবস্থা দেখে সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। শাশুড়ি ঠাকুরন তো আবার গলা ছেড়ে ভৈরবী রাগে সুর ধরেছেন। অন্যরাও ধরব ধরব করছে। আমার তখন ত্রিশঙ্কুর মতন মনের অবস্থা। ধীরেন অসহায় ভাবে সকলকে বোঝাবার চেষ্টা করছে।

ঠিক এমন সময় ধীরেনের ছোট ভাই বাইরে থেকে ঐ পরিস্থিতিতে এসে ঢুকল। হাতে তার একছড়া সোনার হার হিরের লকেট সমেত।

হাঁপাতে হাঁপাতে বলতে থাকে—দাদা, এইমাত্র শিবপুর থেকে ট্রাঙ্ককল এসেছিল যে, গতকাল দুপুর দু'টার সময় তোমার একটি পুত্রসন্তান হয়েছে। এই বলে ধীরেনের ভাই চুপ করে। দেখি ধীরেন অবাক নেত্রে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। আমি তখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে সকলের মুখের দিকে বোকার মতো তাকিয়ে আছি আর ভাবছি, এ কোথায় এলাম রে বাবা! আমি পাগল না, এরা সব পাগল! আসল ব্যাপারটা যে কি, বুঝতে না পেরে কাঁদব না হাসব কিছুই ঠিক করতে পাচ্ছি না। এক সময় ধীরেনই সমস্যার সমাধান করে দেয়, বলে—জামাইবাবু, আপনি আমায় যে অবস্থায় দেখছেন, এটা মামার শেষ কাজ আমি করেছি বলে। মামা গতকাল দুপুর দু'টায় দেহ রেখেছেন।

ধীরেনের কথা শুনে, সারা শরীরের মধ্যে রক্তের স্রোত যেন হাজার গুণ বেড়ে গেল। নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। ভয়ে সারা শরীর ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল ধীরেনের মুখে ঐ একটি কথা শুনে। সকলে মিলে আমাকে ধরে শুইয়ে দিল। কিরকম একটা গোলকধাঁধার মধ্যে পড়ে ছটফট করতে থাকি। তবে কি আমি সব ভুল দেখলাম! কিন্তু তা কি করে সম্ভব!—ঐ লকেট দেওয়া হার? ট্রাঙ্ককলের ঐ বার্তা? সে তো মিথ্যে নয়!

—

অগ্রহায়ণ ১৩৮৪

মড়ার খুলি ও মামা

মানবেন্দ্র পাল

আর একটু হলেই বুলুটা বাস চাপা পড়ত। এমন অসাবধানে রাস্তা পার হয়—

কথাটা বলল আমার ভাইঝি রীণা। বুলু ওর ক্লাসফ্রেন্ড। রীণার কাকু, কাজেই বুলুরও আমি কাকু। সম্প্রতি নেপাল ঘুরে এল। এখানে এসে এতক্ষণ বাড়ির সকলের কাছে নেপালের গল্প করছিল। আমি ছিলাম না। তাই আমার জন্যে একটুকরো স্লিপ রেখে গেছে।

স্লিপটা আমার হাতে দিতে দিতে রীণা গজগজ করল—এত অসাবধান মেয়েটা—এখুনি যে কী সর্বনাশ হত!

সে কথার উত্তর না দিয়ে আমি স্লিপটা পড়তে লাগলাম।

শ্রীচরণেষু কাকু,

নেপালে গিয়ে দুটো মজার জিনিস পেয়েছি। শিগগির একদিন চলে আসুন।...

সেদিনই বিকেলে অফিস-ফেরত বুলুদের বাড়ি গেলাম। বাইরে-ঘরেই ওকে পাওয়া গেল। ও তখন নেপালের ওপর লেখা কয়েকটা বই থেকে কী সব নোট করছিল, আমায় দেখেই আনন্দে লাফিয়ে উঠল।

তারপর একটুও দেরি না করে আমায় টেনে নিয়ে গিয়ে ওর কাচের আলমারির মধ্যে রাখা দুটো মজার জিনিসের একটা দেখাল।

আমি একটু অবাক হয়ে বললাম—এই তোমার মজার জিনিস?

ও খুব হাসতে লাগল।

মজার জিনিস নয়? এমন জিনিস ভূ-ভারতে কোথাও আর পাবেন?

তা বটে। জিনিসটা আর কিছুই নয়, একটা মড়ার খুলি। মড়ার খুলি তো অনেক দেখেছি কিন্তু এত ছোটো খুলি কখনো চোখে পড়েনি। খুলিটা স্বচ্ছন্দে হাতের মুঠোয় ধরা যায়।

কেমন? মজার জিনিস নয়? বলে বুলু আবার হাসতে লাগল।

মজার কিনা জানি না, তবে অদ্ভুত।

এমনি সময়ে বুলুর মা চা-জলখাবার নিয়ে ঢুকলেন।

দেখুন দিকি মেয়ের কী অনাসৃষ্টি কাণ্ড! শাড়ি গেল, ইম্‌পোরটেড ছাতা গেল, ক্যামেরা গেল—শেষ পর্যন্ত এই মড়ার খুলিটা ফুটপাথ থেকে পঞ্চাশ টাকা দিয়ে কিনে আনল। আর তারপরেই কী বিপদ শুনেছেন তো? কাঠমাণ্ডু থেকে দক্ষিণাকালী দেখতে গিয়ে সিঁড়ি থেকে একেবারে খাদে পড়ে যাচ্ছিল!

বুলুকে জিগ্যেস করলাম—এটা তো তোমার এক নম্বর মজার জিনিস, দু'নম্বরটি?

বুলু মুচকে একটু হাসল। বলল, সেটা আজ দেখানো যাবে না, যে কোনো মঙ্গল কি শুক্কুরবারে আসবেন।

বুলুর এই দু'নম্বর মজার জিনিসটি যে আরো কত অদ্ভুত হতে পারে তা আমার ধারণা ছিল না।

মঙ্গল কি শুক্কুরবার মনে নেই। একদিন সন্ধের সময়ে বুলুদের বাড়ি গিয়ে দরজায় কলিংবেল টিপলাম। কিন্তু তখনই কেউ দরজা খুলে দিল না। এরকম বড়ো একটা হয় না। শেষে বার তিনেক বেল টেপার পর—ওদের বাড়ি যে বুড়িমানুষটি কাজ করে—সে দরজা খুলে দিল।

কিন্তু ভেতরে ঢুকেই হতাশ হয়ে গেলাম। বুঝলাম বুলু নেই, বুলুর মাও নেই।

বুড়িকে জিগ্যেস করলাম—কেউ নেই?

ও মাথা দুলিয়ে জানাল আছে। বলে বাইরে-ঘরের পর্দাফেলা দরজাটা দেখিয়ে দিল।

যাক, বুলু তা হলে আছে। মনে করে পর্দা সরিয়ে বসার ঘরে ঢুকতেই থমকে গেলাম।

না, বুলু নয়। কেউ একজন কোচে গা এলিয়ে সামনের সেন্টার টেবিলের ওপর দু'পা তুলে বসে আছেন। পরনে ধবধবে পা-জামা, গায়ে গিলে করা আদ্দির পাঞ্জাবি।

ইনি যে কে তা বোঝার উপায় নেই। কেননা তিনি একখানা খবরের কাগজ মুখের ওপর আড়াল করে রয়েছেন।

কি করব ভেবে না পেয়ে জুতোর শব্দ করে সামনের কোচটা একটু টেনে নিয়ে বসলাম। কিন্তু ভদ্রলোক কাগজ সরিয়ে একবার দেখলেনও না। এমনকি শ্রীচরণ দুখানিও আমার মুখের সামনে থেকে নামালেন না।

খুবই বিশ্রী লাগছিল। একবার ভাবলাম উঠে চলে যাই। কিন্তু এই অতি অদ্ভুত, অদৃষ্টপূর্ব অভদ্র লোকটিকে ভালো করে না জেনেও যেতে ইচ্ছে করছিল না। অগত্যা একটা সিগারেট ধরিয়ে চুপচাপ বসে রইলাম।

এমনি কতক্ষণ গেল, হঠাৎ চমকে উঠলাম।

আরে! ওটা কি?

ভদ্রলোকের কোচের একপাশে কোনোরকমে একটা ম্যাগাজিন চাপা দেওয়া সেই মড়ার খুলিটা না?

ভালো করে দেখতে গিয়ে সেন্টার টেবিলটা নড়ে গেল। একটা বই পড়ে গেল। আর ঠিক তখনই—আঃ! কী সৌভাগ্য আমার! ভদ্রলোক কাগজখানি মুখের সামনে থেকে সরালেন। অমনি তাঁর শ্রীচরণের মতো শ্রীমুখখানিও দেখতে পেলাম। ছুঁচলো মুখ। মাথাটা মুখের তুলনায় বড়ো। অনেকটা নারকেলের মতো। রুক্ষু চুলগুলো সেই মাথার ওপর ফেঁপে ফুলে উঠেছে। কিন্তু সরু গোঁপ-জোড়ার ভারী বাহার!

এও সহ্য করা যায়—কিন্তু এই রাত্তিরে কেউ যে কালো সানগ্লাস পরে থাকতে পারে তা যেন ভাবাই যায় না।

যাই হোক, ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর গলায় যে রুদ্রাক্ষের মালা ছিল এটা এতক্ষণ নজরে আসেনি। তিনি উঠে দাঁড়ালেন। তারপর সামনে যে একজন ভদ্রলোক বসে আছেন, সেদিকে লক্ষ্যমাত্র না করে ম্যাগাজিনের তলা থেকে খুলিটা নিয়ে বুলুর সেই আলমারিতে রেখে এলেন। যেন তিনি খুলিটা ভালো করে দেখতে নিয়েছিলেন, দেখার পর রেখে দিলেন আর কি।

বুলু কি আলমারিতে চাবি লাগিয়ে যায়নি? নাকি ওটা খোলাই থাকে?

জানি না।

ভদ্রলোক আবার নিজের জায়গায় গিয়ে মুখের ওপর কাগজ আড়াল করে বসলেন।

আর ধৈর্য ধরে থাকতে পারলাম না। জিগ্যেস করলাম—বুলু কখন আসবে বলতে পারেন?

উত্তরে একটা গম্ভীর স্বর গলার মধ্যে ঘড় ঘড় করে উঠল—মিনিট তেরোর মধ্যে।

ও বাবা! ইনি যে আবার মিনিট-সেকেন্ড ধরে কথা বলেন! দশ মিনিটও নয়, পনেরো মিনিটও নয়—একেবারে তেরো মিনিট!

জিগ্যেস করলাম—ওর সঙ্গে কি আপনার দেখা হয়েছে?

না।

দেখা হয়নি, বুলু কোথায় গেছে তাও বোধহয় জানেন না। অথচ তিনি বলতে পারেন—তেরো মিনিট পরে আসবে!

কত রকমের স্ক্রু-ঢিলে মানুষই না আছে!

একটু পরে উনিই আবার কথা বললেন—হ্যাঁ, আর আট মিনিটের মধ্যেই ওর এসে পড়া উচিত যদি না কোনো অ্যাকসিডেন্ট হয়।

অ্যাকসিডেন্ট!

হ্যাঁ। মানে দুর্ঘটনা।

আমি অবাক হয়ে জিগ্যেস করলাম, আপনি অ্যাকসিডেন্টের ভয় পাচ্ছেন কেন?

উনি তেমনি করেই উত্তর দিলেন, অ্যাকসিডেন্টকে ও ভাগ্যের সঙ্গে জড়িয়ে এনেছে।

কিন্তু বুঝতে না পারলেও রীণার সেদিনের কথা মনে পড়ে গেল। আমাদের বাড়ি থেকে ফেরার পথে নাকি বাস চাপা পড়ছিল।

এমনি সময়ে কলিংবেল বাজল। তারপর আধ মিনিটের মধ্যে বুলু হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকল।—ও মা, কাকু! কতক্ষণ এসেছেন?

আমি উত্তর দেবার আগেই ভদ্রলোক হঠাৎই উঠে পড়লেন।

বুলু বললে, এ কি মামা, এখুনি উঠছেন?

হ্যাঁ। তুমি একটু শুনে যেও।

বলে সামান্যতম ভদ্রতাটুকুও না দেখিয়ে প্রায় আমার গায়ে ধাক্কা দিয়ে চলে গেলেন।

বুলু ওকে এগিয়ে দিয়ে ফিরে এল। মুখটা থমথম করছে। একটু চুপ করে থেকে বলল, উনি হঠাৎ অমন করে চলে গেলেন কেন বুঝলাম না। আপনার সঙ্গে বোধহয় ভালো করে কথাও বলেননি?

আমি একটু হাসলাম।

যাবার সময়ে আমাকে বললেন কি জানেন? বললেন, হয় ঐ খুলিটা এ ঘর থেকে সরাও, নয় যার-তার এ ঘরে ঢোকা বন্ধ করো। কথার মানে বুঝেছেন তো কাকু?

আমি আবার শুধু হাসলাম।

এই হচ্ছে নাকি বুলুর দু-নম্বর মজার জিনিস—বুলুর নতুন পাতানো মামা!

মামাটির সঙ্গে বুলুর আলাপ হয় নেপালের কাঠমাণ্ডুর একটা হোটেলে। তিনি বাঙালি। কলকাতাতেও যেমন তাঁর একটা আস্তানা আছে তেমনি আছে কাঠমাণ্ডুতেও। কিন্তু কাঠমাণ্ডুতে কোথায় যে পাকাপাকিভাবে থাকেন, কি করেন তা কেউ জানে না। মাঝে মাঝে এই হোটেলে তাঁর দেখা পাওয়া যায়। এখানে তাঁর পরিচয় একজন জ্যোতিষী বলে। মুখ দেখেই তিনি ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান বলে দিতে পারেন।

এই সূত্রেই বুলুর সঙ্গে তাঁর আলাপ। হোটেলের সবাই ভিড় করে আসে তাঁর ঘরে। শুধু বুলুই যায় না। সে এসব মোটে বিশ্বাস করে না। কিন্তু বুলু না গেলে কি হবে—ভদ্রলোক নিজেই একদিন ডাকলেন—ও মামণি! শোনো শোনো।

অগত্যা বুলুকে ঢুকতে হয়েছিল ওঁর ঘরে।

সবাই আসে, শুধু তুমিই আস না।

বুলু হেসে বলেছিল—আমি ওসব বিশ্বাস করি না।

ভদ্রলোক একটু হেসেছিলেন।

সেদিন ঐ পর্যন্ত।

এরপর একদিন ভদ্রলোক বুলুকে একেবারে তাজ্জব করে দিলেন যখন বললেন, তোমার বাবার জন্যে কিছু ভেব না। তিনি ভালো আছেন। এই মাসের শেষেই তিনি ফিরে আসছেন।

বুলুর বাবা লিবিয়াতে চাকরি নিয়ে গিয়েছিলেন। অবাক কাণ্ড—নেপালে আসার ঠিক আগের দিনই বুলুরা চিঠি পেয়েছিল—তিনি ফিরছেন।

এত বড়ো ভবিষ্যৎবাণীর পর আর কি ঠিক থাকা যায়? বরফ গলল। বুলু দারুণ বিশ্বাসী হয়ে গেল। ভদ্রলোককে 'মামা' বলে ডাকতে লাগল।

কিন্তু অবাক হবার ব্যাপার তখনো বাকি ছিল।

নেপাল থেকে ফেরার আগের দিন।

সন্ধের পর বুলুরা দক্ষিণাকালী দেখে হোটেলে ফিরল। দক্ষিণাকালী মন্দির কাঠমান্ডু থেকে প্রায় তিরিশ কিলোমিটার দূরে। অনেক পাহাড়, খাদ পেরিয়ে তবে যেতে হয়। মন্দিরটা একটা পাহাড়ের নীচে। নামতে হয় অনেকগুলো সিঁড়ি ভেঙে। ঐরকম পরিবেশেই বুঝি কালীকে মানায়। প্রকৃতির কোলে নিস্তব্ধ, নিঝুম পরিবেশটি।

যাই হোক, বুলু ফিরেই তার এই নতুন মামাটির সঙ্গে দেখা করল। হাসতে হাসতে ব্যাগ খুলে কাগজে মোড়া একটা জিনিস বের করে তাঁর হাতে দিয়ে বলল, দেখুন তো মামা, জিনিসটা কেমন হল?

জিনিস দেখে তো মামা হতভম্ব!

এটা তুমি কোথায় পেলে?

বুলু বলল, একজন পাহাড়ির কাছ থেকে কিনলাম দক্ষিণাকালীর মন্দিরের কাছে।

মামা অনেকক্ষণ ধরে সেই ছোট্ট খুলিটা পরীক্ষা করে দেখলেন। তারপর বললেন, এ যে বড়ো ভয়ঙ্কর জিনিস! এ নিয়ে তুমি কি করবে মা?

বুলু তাড়াতাড়ি তাঁর হাত থেকে খুলিটা নিয়ে বলল, আলমারিতে সাজিয়ে রাখব।

মামা ভুরু কুঁচকে কিছুক্ষণ বুলুর দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, কাজটা কি ভালো হবে? ও যার জিনিস তাকে ফিরিয়ে দেওয়াই উচিত।

এই পর্যন্ত বলে তিনি একটু থামলেন। তারপর বললেন, আমি শিগগিরই ওখানে যাব। ইচ্ছে করলে আমায় দিতে পার। যার জিনিস তাকে ফিরিয়ে দেব। দামটা না হয় এখুনি তোমায় দিয়ে দিচ্ছি।

কিন্তু বুলু রাজি হয়নি।

তখন উনি বললেন, আমার কথা তোমার মাকে বোলো। তিনি কী বলেন আমায় জানিও।

বুলু দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই জিগ্যেস করল—কেন? এটা যদি রাখি তা হলে কি হবে?

বিপদ অনিবার্য। কেন? আজ ওটা কেনার পর তোমার কি কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি?

এবার বুলুর মুখ শুকিয়ে গেল। মনে পড়ল দক্ষিণাকালী দেখতে যাবার সময়ে তিনতলা সমান উঁচু সিঁড়ি থেকে পা স্লিপ করে খাদে পড়ে যাচ্ছিল! খুব বেঁচে গেছে।

এই বিচিত্র মাথাটির সম্বন্ধে বুলু আগে কিছু খবর পেয়েছিল কাঠমান্ডু থেকে চলে আসার দিন হোটেলের নেপালি চাকরটির কাছ থেকে। তাকে খাবার সময়ে বখশিস দিতে কথায় কথায় ও হিন্দিতে জানায় যে ঐ লোকটি 'ভয়ঙ্কর দেব্‌তা আছেন'। তিনি নাকি নেপালের জাগ্রত দেবতা কালভৈরবের সাধক। কালভৈরব হচ্ছেন মৃত্যুর দেবতা। বিকট চেহারা। কুচকুচে কালো রঙ। তাঁর গলায় মুণ্ডমালা—বীভৎস মুখের হাঁয়ের মধ্যে দিয়ে তাঁর হিংস্র জন্তুর মতো ধারালো দাঁত বেরিয়ে এসেছে।

নেপালিটা জানাল, ঐ দেব্‌তাকে খুশি করে ইনি প্রচণ্ড ক্ষমতা পেয়েছেন। ইচ্ছে করলেই যে কোনো লোকের ক্ষতি করে দিতে পারেন। ভয়ে হোটেলের ম্যানেজার ওঁর কাছ থেকে একটি টাকাও নেন না। উপরন্তু খাতির করেন।

এই হল বুলুর মামার পরিচয়। বুলুরা তো কলকাতা চলে এল। তারপর হঠাৎই একদিন সন্ধেবেলা সেই মামা বুলুদের বাড়ি এসে হাজির।

জিগ্যেস করলাম—ঠিকানা দিয়েছিলে?

বুলু একটু ভেবে বলল, ঠিক মনে নেই। নিশ্চয় দিয়েছিলাম। নইলে উনি এলেন কি করে? তারপর থেকে প্রায় সপ্তাহে দু'দিন করে আসেন। গল্প করেন, চলে যান।

কোথায় যান?

ঠাকুরপুকুরের কাছে কবরডাঙা বলে একটা জায়গা আছে। সেখানে ওঁদের পুরোনো

বাড়ি। কলকাতায় এলে একাই থাকেন। সবই কেমন রহস্যময়। বলি বটে, এই মামাটি মজার জিনিস। কিন্তু সত্যি বলছি কাকু, মাঝে মাঝে কেমন ভয়ও করে। লোকটার কাছ থেকে রেহাই পেলে বাঁচি।

খুলিটার কথা উনি জিগ্যেস করেন?

বুলু মাথা নাড়ল।—না। এখানে এসে পর্যন্ত খুলির কথা বলেননি।

এই পর্যন্ত বলে বুলু ভুল শুধরে বললে—হ্যাঁ, একদিনই বলেছিলেন। সেই যে সাবধান করে দিয়েছিলেন।

আমি হাসলাম। বললাম, হ্যাঁ, পাছে আমি চুরি করে নিই!

বুলু লজ্জায় জিব কাটল।—ইস্!

তবু সেদিন যে খুলিটা তিনি আলমারি থেকে বের করে আমার পায়ের শব্দ পেয়ে তাড়াতাড়ি ম্যাগাজিন চাপা দিয়ে রেখেছিলেন সে কথাটা বুলুকে আর বললাম না।

এই মামা লোকটিকে প্রথম দিন থেকেই আমার ভালো লাগেনি। শুধু অভদ্র বলেই নয়, লোকটি মতলববাজ। নেপালে না গেলেও জানি—এইরকম এক ধরনের তান্ত্রিক আছে যারা নিজের সিদ্ধির জন্যে সবরকম অপকর্ম করতে পারে। এ বাড়িতে তাঁর আসার উদ্দেশ্য অন্তত আমার কাছে পরিষ্কার! সেই সঙ্গে বুলুও যে কী মারাত্মক ফাঁদে জড়িয়ে পড়ছে তাও আমার জানা। শুধু বুলুই নয়, আমিও লোকটির বিষনজরে পড়েছি। তাই বুলুর মনে আমাকে চোর বলে সন্দেহ ধরিয়ে দিতেও চেষ্টা করেছে। এরপর হয় তো আমার জীবনও বিপন্ন হতে পারে।

অপরাধ? অপরাধ—খুলি চুরি করার ওঁর চেষ্টা আমার কাছে ধরা পড়ে গেছে।

সে যাই হোক, বুলুকে এখন ঐ ভদ্রবেশী তান্ত্রিকের হাত থেকে বাঁচাতে হবে।

কিন্তু—কি করে? আমি যা ভাবছি তা যদি বুলুকে বলি তাহলে সে বিশ্বাস নাও করতে পারে। উল্টে আমার ওপর ধারণা খারাপ হবে।

আর যদি বিশ্বাস করেও, একজন ভদ্রলোককে কি সরাসরি বাড়ি আসতে বারণ করতে পারে?

বারণ করলেই কি উনি শুনবেন? ঐ খুলিটা যে ওঁর চাইই।

দিন পনেরো পর।

অফিস থেকে সবে ফিরেছি। হঠাৎ বুলু এসে হাজির। তার উদ্‌ভ্রান্ত ভাব দেখে চমকে উঠলাম।—কী হয়েছে?

আজ দুপুরে আমাদের বাড়িতে চোর এসেছিল। আমরা কেউ ছিলাম না। আর সেই সময়ে—

কেন? সেই বুড়ি কাজের লোকটি?

বলছি দাঁড়ান, আগে একটু বসি। ইতিমধ্যে রীণা, রীণার মাও এসে পড়েছেন।

রীণা, একটু জল দে তো!

রীণা তাড়াতাড়ি জল এনে দিল। জল খেয়ে রুমালে মুখ মুছে বুলু বলল, অন্য দিনের মতোই বুড়িটা দুপুরে ঘুমোচ্ছিল। আজ আবার দুপুরে এদিকে এক পশলা বৃষ্টি হয়েছিল। কাজেই আরামেই ঘুমোচ্ছিল। কখন থেকে যে কলিংবেলটা বেজে যাচ্ছিল তা সে শুনতে পায়নি। যখন শুনল ধড়মড় করে উঠে দরজা খুলে দিল। কিন্তু কেউ কোথাও নেই। তখন বুড়ি আবার গিয়ে শুল। একটু পরে আবার বেল বাজল, বুড়ি আবার উঠে দরজা খুলল। কিন্তু এবারও কাউকে দেখতে পেল না। এমনি করে তিন তিনবার। বুড়ি বুঝল এ নিশ্চয় কোনো দুষ্টু ছেলের কাজ। তাই চারবারের বার বুড়ি রেগে রাস্তায় নেমে দুষ্টু ছেলে ধরবার জন্যে এদিক-ওদিক খুঁজতে লাগল। কিন্তু কারো টিকিটুকুও দেখতে পেল না। তখন ফিরে এসে দরজা বন্ধ করে আবার শুয়ে পড়ল।

এই পর্যন্ত বলে বুলু থামল।

বললাম, কিন্তু চোর এসেছিল কি করে বুঝলে? দুষ্টু ছেলের কাজও তো হতে পারে।

তা হতে পারে। তবু—

বুলু কি ভাবতে লাগল।

তারপর যেন আপন মনেই বলল, আমার কেমন ভালো ঠেকছে না। চোর এসেছিল বলেই আমার সন্দেহ। তাছাড়া—

বললাম—থামলে কেন?

না, তেমন কিছু নয়, তবু বলছি, বিকেলে বাড়ি ফিরে এসে দেখি চৌকাঠে জুতোর কাদা।

আমি চমকে উঠলাম। সে ভাব গোপন করে বললাম, কাদা আগে ছিল না?

বুলু মনে করবার চেষ্টা করে বলল—তা হলে নিশ্চয় আমার চোখে পড়ত। তাছাড়া কাদা আসবে কোত্থেকে? বৃষ্টি তো হল দুপুরে।

রাইট! বলে বুলুর পিঠ চাপড়ালাম।

যাই হোক, কিছু চুরি যায়নি তো?

না! এইটুকুই রেহাই।

ঠিক জান কিছু চুরি যায়নি?

বুলু হেসে বলল, ঘরে ঢুকে এক নজর দেখে কিছু চুরি গেছে বলে তো মনে হল না।

চলো, এখনি তোমার বাড়ি যাব।

বলে তখনই গায়ে হাওয়াই শার্টটা চড়িয়ে বুলুকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

ওদের বাড়ি ঢুকেই চলে এলাম ওদের বাইরে-ঘরে। বুলুকে বললাম, তোমার আলমারিটা খোলো।

বুলু চাবি বের করে লাগাতে গেল কিন্তু তার দরকার ছিল না। আলমারিটা খোলাই ছিল। ভেতরে সেই খুলিটা নেই।

সেই অবস্থাতেই বেরিয়ে পড়লাম।

বুলু ব্যাকুল হয়ে পিছু ডাকল—কোথায় যাচ্ছেন?

বললাম, কবরডাঙায় তোমার ঐ ভণ্ড মামার আস্তানায়।

ও প্রায় কেঁদে উঠল—না-না, এই সন্ধেবেলা যাবেন না।

কিন্তু আমার তখন জেদ—ওটা উদ্ধার করে লোকটাকে পুলিশে দিতেই হবে।

ঠাকুরপুকুরের এদিকটায় কখনো আসিনি। দু'ধারে মাঠ, কোথাও বা রীতিমতো জঙ্গল। কবরডাঙা। জায়গাটা রীতিমতো গ্রাম। তবু রাস্তাটা পিচঢালা। বাস চলে। মাঝে মাঝে লরিও যায়। এখানে পুরোনো বাড়ি কি আছে জিগ্যেস করতেই একটা লোক মাঠের ওপর বিরাট দোতলা ভাঙা বাড়িটা দেখিয়ে দিয়ে বলল, ভূতের বাড়ি তো?

হ্যাঁ, বলে মাঠে নেমে পড়লাম। লোকটা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

তখন সন্ধে হয়ে গেছে। দূর থেকে বাড়িটাকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন প্রেতপুরী। ইট খসে পড়ছে। আলসের মধ্যে দিয়ে উঠেছে অশ্বত্থের চারা। ঢুকে পড়লাম সেই বাড়িতে। অন্ধকার। চারিদিক থমথম করছে। তারই মধ্যে—হঠাৎ মনে হল যেন দুটো জ্বলজ্বলে চোখ! থমকে গেলাম।

না, একটা কুকুর। কুকুরটা আমায় দেখে পালাল। সামনেই সিঁড়ি। টর্চও সঙ্গে করে আনিনি। দেশলাই জ্বালতে জ্বালতে দোতলায় উঠে এলাম। একটা ঘর। বোধহয় একটি মাত্র ঘরেই দরজা-জানলা আছে। ঢুকে পড়লাম। দড়িতে ঝুলছে একটা লুঙ্গি, একটা ফর্সা পাজামা, একটা পাঞ্জাবি। সামনে কালো কাপড় ঢাকা—ওটা কি?

ভালো করে দেখলাম। ওটা একটা তে-পায়া। চমকে উঠলাম। এইরকম তে-পায়াতেই তো প্রেতাত্মা নামানো হয়। মামা কি তা হলে—

কিন্তু—আসল জিনিসটি কোথায়? মামাই বা কোথায়?

আবার দেশলাই জ্বাললাম। লক্ষ্য পড়ল কুলুঙ্গিতে। একটি তামার পাত্রে সেই ছোট্ট মড়ার খুলিটি!

আমি মরিয়া হয়ে খুলিটা তুলে নিয়ে পকেটে পুরলাম। তারপর একছুটে নীচে। সামনেই সেই মাঠ। মাঠের পরেই পিচঢালা রাস্তা। পাছে দৌড়লে কারো নজরে পড়ি তাই জোরে হাঁটতে লাগলাম। নিশ্বাস বন্ধ করে হাঁটছি। চারিদিকে অন্ধকার—শুধু অন্ধকার!

হঠাৎ আমার মনে হল, এই নির্জন মাঠে আমি আর একা নই। কেউ যেন পিছনে রয়েছে।

....হ্যাঁ, স্পষ্ট বুঝতে পারছি পিছনের মানুষটি এসে পড়েছে।....আমি দৌড়তে লাগলাম। কিন্তু পারলাম না। পিছনের লোকটা ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার ওপর। আমি হুমড়ি খেয়ে পড়লাম। সে অমনি আমাকে জাপ্‌টে ধরল। উঃ, কী কঠিন সে হাত দুটো। সে স্বচ্ছন্দে আমার পকেট থেকে খুলিটা বের করে নিল। তারপর আমার গলা টিপে ধরল।...মৃত্যু নিশ্চিত জেনে আমি প্রাণপণ শক্তি প্রয়োগ করলাম। এক মুহূর্তের জন্যে ওর হাতটা ঢিলে হয়ে গেল। অমনি কোনোরকমে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে ছুটলাম রাস্তার দিকে। সেও ছুটে আসছে আমার পিছনে।

রাস্তায় লরির হেডলাইট....তবু আমি ঝাঁপিয়ে পড়লাম রাস্তায়। লোকটাও সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিল।

লরিটা দুরন্ত গতিতে বেরিয়ে গেল।

ভালো করে তাকিয়ে দেখলাম—নাঃ, আমি বেঁচে আছি। কিন্তু—রাস্তার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে ওটা কি?

কিন্তু সেদিকে মন দেবার মতো অবস্থা তখন ছিল না। হাঁটতে লাগলাম ডায়মন্ডহারবার রোডের দিকে।

পরের দিন সকালে বুলুদের বাড়ি চা খেতে খেতে সমস্ত ঘটনা বললাম। কাগজেও ঐ অঞ্চলে লরিচাপা পড়ে একটি মৃত্যুর খবর বেরিয়েছে।

বুলু বলল, আপনি খুব বেঁচে গেছেন কাকু! ভাগ্যি খুলিটা তখন আপনার কাছে ছিল না।

আমি হেসে বললাম, আর লরির চাকার নীচে খুলিটারও সদ্‌ব্যবহার হয়ে গেল।

বুলু একটু হাসল। তারপর বলল, কিন্তু আশ্চর্য এই যে—লোকটার যে বর্ণনা কাগজে রয়েছে তার সঙ্গে মামার চেহারা মেলে না।

আমি বললাম, তা জানি। ওটি মামার শাগরেদ। মামা কিন্তু রইলেন বহাল তবিয়তে। হয়তো আবার আসবেন।

বুলু শিউরে উঠল।

—

আশ্বিন ১৩৯৩

সেই রাতে

বেলা দেবী

আমি, সুজিত, বিমল, সমীর, মানস—আমরা পাঁচ বন্ধু আমাদের অন্যতম বন্ধু ধীমানের আমন্ত্রণে তার গ্রামের বাড়ি নয়নসুখে গিয়েছিলাম তার বিয়ের বৌভাত উপলক্ষে।

সেই স্কুলজীবন থেকেই আমাদের ছ'জনের মধ্যে বন্ধুত্ব। স্কুলে একসঙ্গে পড়তাম। কলেজজীবনও একই সঙ্গে কাটিয়েছি। তারপর আজ বছর তিন-চার গাঁটছড়ার গিঁট খুলেছে। মানে যে যার কর্মক্ষেত্রে এদিক-ওদিক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়েছি।

ধীমানদের প্রচুর জমি-জিরেত। বি এ পাশ করার পর সে অন্য কোনো কাজে না গিয়ে বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষ করে। সে বিশেষ অনুরোধ করে আমাদের পাঁচ বন্ধুকে লিখেছে একে অজ-পাড়াগাঁ, তার উপর তোদের এই বন্ধু আক্ষরিক অর্থেই যাকে বলে চাষা। এতে যদি তোদের মানের হানি না হয় তবে অবশ্য আসিস।

একে শ্রাবণ মাস। ভরা বর্ষা। তায় হচ্ছে পাড়াগাঁ। যাবার ইচ্ছে ছিল না। শুধু ধীমানের ঐ খোঁচাটুকুর জন্যই হয়তো যাব মনস্থ করলাম। আমাদের দলের মধ্যে ধীমানেরই প্রথম বিয়ে হচ্ছে।

সমীর বলল—বৌভাত সেরে সেদিনই কিন্তু আমাদের ফিরতে হবে। আমার মোটেই ছুটি নেই। অফিসে গোলমাল চলছে। অতিকষ্টে একদিনের ছুটি আদায় করেছি।

মানস বলল—আমারও সেদিনই ফিরতে হবে ভাই। জরুরি কাজ রয়েছে।

এদিকে আমি, বিমল আর সুজিত একসঙ্গে দক্ষিণ ভারত ঘুরতে যাব ঠিক করেছি। একমাস আগেই টিকিট কাটা রিজার্ভেশন সব হয়ে গেছে। ধীমানের বৌভাত বুধবার। আর আমাদের রওয়ানা হতে হবে শুক্রবার। সন্ধের দিকে ট্রেন। কাজেই বৌভাত সেরে সেদিনই রাতের ট্রেনে কলকাতায় ফিরে আসার ব্যাপারে সবাই একমত।

বৌভাতের দিন ভোরের ট্রেনে রওয়ানা হয়ে গেলাম। স্টেশন থেকে তিনটা রিকশা নিয়ে চললাম পাঁচজনে। মিনিট পনেরো চলার পর রিকশা দাঁড়িয়ে পড়ল। রিকশাওয়ালা বলল—রিকশা আর যাবে না বাবু। যাবার পথ নেই।

আমরা নেমে পড়লাম। জিজ্ঞাসা করলাম—এখান থেকে নয়নসুখ কত পথ হে?

তা বাবু আধমাইলটাক হবে। এই আলপথ ধরে ধরে চলে যান। পৌঁছে যাবেন।

দু'দিকে ধানক্ষেত। মাঝে সরু আলপথ। পাশাপাশি দুজনের চলার উপায় নেই। আমরা লাইন করে হাঁটছিলাম। পথের দু'পাশে কোথাও কোথাও খানা-ডোবাও রয়েছে। হাঁটছি তো হাঁটছিই। বিমল বলল—ধীমানটার বাড়ি কোন ধেদ্দেড়ে গোবিন্দপুরে রে ভাই! ওঃ, কি রাস্তা দেখেছিস!

সুজিত বলল—মোটেই আধমাইল রাস্তা নয়। মাইলখানেক হবে মনে হচ্ছে।

যাক্, শেষ পর্যন্ত অনেকটা পথ ঠেঙিয়ে আমরা ধীমানদের বাড়িতে উঠলাম।

আমাদের দেখে ধীমান খুশিতে কলরব করে উঠল—আরে আয় আয়। তোরা সবাই এসেছিস দেখছি। আমি তো ভাবতেই পারিনি সবাই আসবি। ওঃ, আমার যে কি আনন্দ হচ্ছে!

ধীমান যে কিভাবে আমাদের আপ্যায়ন করবে যেন ভেবে পাচ্ছে না। এই চা এল। পরক্ষণেই বাটিভরা এত এত সরশুদ্ধু দুধ নিয়ে আসছে। চুমুক দিয়ে দেখি ক্ষীরের গন্ধ। ঘরের গরুর দুধ।

দুপুরে পাতে যা এক একখানা মাছভাজা ফেলল, ওজন হবে আড়াইশো গ্রাম করে। সব পুকুরের মাছ। সদ্য জল থেকে তোলা। টাটকা। খেতে যে কি চমৎকার স্বাদ!

সময়টা শ্রাবণ মাস। বিকেল চারটে নাগাদ আকাশ কালো করে মেঘ জমল। তারপর সে কি তোড়ে বৃষ্টি! সেইসঙ্গে জোর হাওয়া, ঝড়ো হাওয়া। সুজিত বলল—কি দারুণ দুর্যোগ করল রে, ফিরব কি করে!

ধীমান বলল—ধ্যাৎ, আজকে যাবি কি, আজ থাক। যাবার কথা কাল ভেবে দেখা যাবে।

আমরা রাজি হলাম না। রাত এগারটায় লাস্ট ট্রেন। বৌভাতের খাওয়া সেরে ধীমান এবং তার মা-বাবা-ভাই-বোনেদের অনেক অনুরোধ উপেক্ষা করে রাত ন'টায় বেরিয়ে পড়লাম। সন্ধের পর থেকে বৃষ্টিটাও ধরেছিল।

আবার সেই আলের পথ দিয়ে চলছি। এবারের যাত্রা আরও কঠিন। তখন ছিল দিনের আলো। পথ শুকনো। এখন ঘুটঘুটে অন্ধকার। বৃষ্টি হয়ে যাবার দরুন পথ পিছল। কাদায় পা বসে যায়। বাড়ি থেকে আসার সময় একটা টর্চও আনা হয়নি। পাড়াগাঁয়ে আসছি সেটা খেয়াল করা হয়নি। খানিকটা রাস্তা যেতেই আবার নামল প্রচণ্ড বৃষ্টি। সেইসঙ্গে ঝড়ো হাওয়া। একেবারে সোনায় সোহাগা আর কি!

হঠাৎ যেন একটা চিৎকার শুনতে পেলাম। আমি ছিলাম সবার আগে। বললাম—কে চিৎকার করে উঠল মনে হচ্ছে।

পেছন থেকে ওরা বলল—কই না তো। আমরা তো কিছু শুনিনি। আর শোনা যাবে কি! বৃষ্টি আর হাওয়ার যা শব্দ!

যাবার পথে স্টেশন থেকে রিকশা পাওয়া যায়। ফেরার পথে রিকশাও পাওয়া যায় না। তার মানে পুরো রাস্তাটাই হেঁটে যেতে হবে। বড় রাস্তায় পড়ে দেখি ঝড়-বৃষ্টিতে ইলেকট্রিকের তার ছিঁড়ে গেছে। তাই গোটা এলাকা অন্ধকার। অন্ধকারেও এবার আমাদের খেয়াল হল—দলে আমরা চারজন আছি। আর একজন কই?

কারও মুখ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। আমি জিজ্ঞাসা করতেই একে একে সাড়া দিল সুজিত, বিমল, সমীর। মানস? মানস কোথায়?

মানস সবার পেছনে আসছিল। সে কি খুব বেশি পিছিয়ে পড়েছে?

হঠাৎ আমাদের সামনের দিকে অনেকটা তফাৎ থেকে মানসের সাড়া পাওয়া গেল—এই, আমি আগে আছি। তোরা আয়।

তাজ্জব ব্যাপার! আলের সরু পথে একজনকে পাশ কাটিয়ে তো আর একজনের এগিয়ে যাবার জো নেই। মানস সবার পেছন থেকে সবার আগে গেল কি করে! যাক—আবার হাঁটতে লাগলাম, মানস আগে। আমরা পেছনে। এই দুর্যোগে পেছল পথে পা টিপে টিপে হাঁটতে গিয়ে আমাদের পাক্কা দু'ঘণ্টা সময় লেগে গেল স্টেশনে পৌঁছতে। স্টেশনে পৌঁছে দেখি গাড়ি ছাড়তে আর এক মিনিট বাকি। দৌড়ে গিয়ে একটা কামরায় উঠে পড়লাম। যাবার পথেই ফিরতি টিকিট কেটে রেখেছিলাম। ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই গাড়ি দুলে উঠল।

আবার দেখলাম আমরা চারজন। মানস ওঠেনি। আরে, মানস তো ওঠেনি। ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে যে। দরজা খুলে গলা বাড়িয়ে দেখি ট্রেনের দিকে ছুটে আসছে মানস। হাত নেড়ে চেঁচিয়ে বলল—ভাবিস্‌নে আমি পাশেই উঠছি।

ও লাফিয়ে অন্য কামরায় উঠল দেখতে পেলাম।

বিমল বলল—মানসটা কি উল্টোপাল্টা কাণ্ড শুরু করেছে দ্যাখ্‌। এই দেখি সবার পেছনে, আবার দেখি সবার আগে। আমাদের আগে হেঁটে এল—আমরা উঠে পড়লাম আর ও উঠতে পারল না।

আমি বললাম—উঠেছে। অন্য কামরায়।

রাতের ট্রেন। ভিড় নেই। বেশ ফাঁকা ফাঁকা। বৃষ্টিতে একেবারে ভিজে গিয়েছিলাম। কিটব্যাগ

থেকে তোয়ালে বের করে গা-মাথা মুছে ভেজা জামা-কাপড় পালটে আয়েশ করে বসলাম। সেই ভোরবেলা থেকে ধকল যাচ্ছে। তার উপর এতটা পথ হাঁটার পরিশ্রম। গাড়ির দুলুনিতে ঢুলতে ঢুলতে ঘুমোতে ঘুমোতে ভোররাতে হাওড়া পৌঁছে গেলাম।

মানসের সঙ্গে আর যোগাযোগ হল না।

সমীর বলল—মানসটা এমন ইয়ার্কি শুরু করল কেন রে! ওর কি হয়েছে বল্ তো!

আমরা যে যার বাড়ি ফিরলাম।

শুক্রবার সকালেই সেই মর্মান্তিক খবরটা জানতে পেরেছিলাম। ধীমানদের বাড়ি থেকে স্টেশনে আসার পথের পাশে একটা ডোবার মধ্যে মানসের মৃতদেহ দেখতে পাওয়া গেছে পরদিন সকালবেলা। মুখে মুখে খবরটা ছড়িয়ে পড়ায় ধীমানরাও কৌতূহলী হয়ে দেখতে এসেছিল। ওরাই মৃতদেহ সনাক্ত করে। ওখানকার পুলিশ কলকাতার পুলিশকে খবর জানায়। কলকাতা পুলিশ মানসদের বাড়িতে খবর দিয়ে গেছে। ঝড়বৃষ্টির মধ্যেও আমি তাহলে চিৎকারটা ঠিকই শুনেছিলাম। পা হড়কে ডোবায় পড়ে যাবার সময় মানসই চিৎকার করে উঠেছিল। মানস সাঁতার জানতো না তাই ডুবে মরল। সে আমাদের থেকে বেশ খানিকটা পিছিয়ে পড়েছিল এবং সে সময়ে প্রচণ্ড দুর্যোগ চলছিল বলে এত বড় ঘটনাটা ঘটে গেল অথচ আমরা টেরও পেলাম না।

কিন্তু আমি কি দেখলাম! আমি একা নই। আমরা সবাই দেখলাম। চোখের ভুল কি সবার একসঙ্গে হয়?

পৌষ ১৩৮৪

গিরিধারীর গেরো

আনন্দ বাগচী

ভর সন্ধের ঝিমধরা অন্ধকারে পিন্টু বাড়ির দিকে ছুটছিল। খেলার মাঠে আজ তার বেশ দেরি হয়ে গিয়েছিল। হাত-পা ধুয়ে এক্ষুনি তাকে পড়তে বসে যেতে হবে। কিন্তু বাবার বকুনির থেকেও খুব জ্যান্ত একটা ভয় এই মুহূর্তে তার পিছু নিয়েছিল। তাই ডাইনে-বাঁয়ে কোনো দিকে তাকাবার সাহস ছিল না। কাছেই কোথাও গাছের ডালে একজোড়া হুতুম প্যাঁচা ভুতুড়ে গলায় রক্ত-হিমকরা ডাক ডাকছিল। এর চেয়ে বাঘের ডাক শুনলেও বুঝি পিন্টু এরকম ভয়ে সিঁটিয়ে যেত না।

জায়গাটা ঊর্ধ্বশ্বাসে পেরিয়ে এসে পিন্টু পায়ের গতি কমিয়ে দিয়েছিল। বাড়ি এসে গেছে, শাঁখের শব্দ শোনা গেল। শাঁখের নয়তো যেন মায়ের গলা। আশপাশের বাড়ির থেকে ঠিক আলাদা, চিনতে পারে। ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ার মতো ভয়টা এতক্ষণে গা ছেড়েছে। রাস্তার শেষ বাঁকটা এসে গিয়েছিল, মোড় ঘুরলেই এবার বাড়ি দেখা যাবে। তাই আনমনা পিন্টু প্রথমে দেখতে পায়নি। বাঁকের মুখে ঝাঁকড়া তেঁতুলতলায় মাথায় ইয়া পাগড়ি বাঁধা একটা লোক উবু হয়ে বসে খৈনি ডলছিল। পেছন ফিরে বসে থাকায় লোকটাও পিন্টুকে দেখতে পায়নি। হঠাৎ হাততালির মতো শব্দ শুনে পিন্টু থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর একটু নজর করতে আবছা মতন চোখে পড়ল। প্রথমে মনে হয়েছিল কোনো কাকতাড়ুয়া মূর্তি, কেউ দুষ্টুমি করে ওখানে পুঁতে রেখে গেছে। প্রকাণ্ড হাণ্ডার মতো মাথাটা ঝুঁকে আছে, গায়ে চিত্তির-বিচিত্তির করা খাটো কামিজ বোধহয় হাওয়ায় দুলছে। কিন্তু না, ওটা একটা লোক, চোরচোট্টা হওয়াই সম্ভব, খুব নিরিবিলি নিশ্চিন্তে খৈনি পিটছে। ফট ফট ফটাস আওয়াজটা সেই জন্যেই।

একটুও ভয় পায়নি তা নয়। কিন্তু ভাবটা চাপা দিতে বেশ জোর গলায় চেঁচিয়ে উঠল পিন্টু, হ্যাই লোকটা! কী করছ ওখানে?

আচমকা হাঁক শুনে খুব চমকে গিয়েছিল লোকটা। তিড়িং করে একপাক ঘুরে উঠে দাঁড়াতেই পিন্টুর হাসি পেয়ে গেল। ও হরি, এ যে পুঁচকে, এক তালপাতার সেপাই! হাড্ডিসার লিকপিকে চেহারায় অ্যাত্তোবড়ো পাগড়ি একদম মানায়নি। তার ওপর আবার কাঠবেড়ালির ফুলকো ন্যাজের মতো একজোড়া পালোয়ানী গোঁফ। কোনোরকমে হাঁটুর তলা অবদি নেমেছে একটা ডোরাকাটা আঁটোখাটো পাজামা। পিন্টুকে হাসতে দেখে লোকটাও চোখ পিটপিট করে হাসতে লাগল বিনয়ের অবতার হয়ে। এয়ার ইন্ডিয়ার বিজ্ঞাপনে দেখা কুর্নিশ করা মূর্তির মতোই আধভাঙা চিঁচিঁ গলায় বলল, ও আপুনি খোঁকাঁবাবু আসেন!

লোকটা হিন্দুস্থানী কিন্তু ভাঙাচোরা বাংলা বলে। খোকাবাবু বলায় পিন্টুর আত্মসম্মানে একটু চোট লাগল। সে দুধের খোকা নাকি! এবার রীতিমতো ক্লাস সিক্সে উঠেছে। সবুজ সাথী ক্রিকেট ক্লাবে স্পিন বোলার হিসেবে তার নাম হয়েছে। ক্লাবের দাদারা পর্যন্ত তাই আদর করে স্পিনটু বলে ডাকে, আর এই পুঁচকে লোকটা তাকে কিনা—

ধমকের গলায় পিন্টু বলল, পিন্টুবাবু বলবে!

লোকটা বাধ্য ছেলের মতো পায়ে পায়ে এগিয়ে এল। ঘাড় নেড়ে বলল, হাঁ হাঁ, যা বোলাবেন হামি বলবে। পিন্টুঁবাঁবু। বহুৎ আচ্ছা নাম আসে। বহোৎ মিঠা।

পিন্টু বলল, তা তো বুঝলাম। কিন্তু কি মতলব? এখানে কেন?

এই কুছ কামকাজের খোঁজে।

হুঁ কাজ খোঁজার জায়গাই বটে! দেখি দেখি, তোমার বগলে ন্যাকড়ায় জড়ানো ওগুলো কি! সিঁদ কাঠিফাটি নয় তো?

লজ্জিত ভঙ্গিতে মাথা হেলিয়ে লোকটা বলে, জী হাঁ। ঝুটা কেনো বলব। সিঁদ খাঁটি ভি আসে!

পিন্টু চমকে যায় ওর সত্যবাদিতায়। বলে, অ্যাঁ! তুমি তাহলে চোর?

লোকটা এবার প্রতিবাদ জানাল, নেহি পিন্টুবাঁবু। হামি চৌর না, কামচোর ভি না। মেহন্নত করকে খাই। সাচ্চা আদমি।

পিন্টু মনে মনে বলে, সাচ্চা আদমি না হাতি! কামচোর কথাটার মানে তার ঠিক জানা ছিল না। মুখে বলতে যাচ্ছিল, তাহলে এইসব যন্তর-ফন্তর কেন? কিন্তু বলা হল না, লোকটা বোধহয় তার মনের কথা বুঝতে পেরেই ভাঙা বাংলায় বলল, যন্তর-ফন্তরের কোথা ছেড়ে দিন, বাড়ির কাম তো, কোখন কোন চীজ দরকার হোয় কোন জানে!

পিন্টুর মনে পড়ে গেল তাদের বাড়িতে এখন কাজের লোকের খুব অনটন চলেছে। বহু দিনের পুরোনো লোক বিশুদা খুব বুড়ো হয়ে গিয়েছিল, আর পেরে উঠছিল না। কাজ ছেড়ে দিয়ে দেশে চলে যাবার পর বাবা অনেক চেষ্টা-চরিত্র করে দু-একজনকে যে ধরে আনেননি তা নয়, কিন্তু কেউ বেশিদিন টেকেনি। কেউ এক সপ্তাহ, কেউ এক মাস বড়জোর। মায়ের খুব কষ্ট হচ্ছে, রোজ বাবাকে বলে। কিন্তু এখন নাকি লোক পাওয়া দুষ্কর। চতুর্দিকে এত ছোটছোট কারখানা গজিয়েছে, বাড়ির কাজ ফেলে সবাই সেখানে চলে যায়।

তুমি বাড়ির কাজ ঘরের কাজ করবে?

হাঁ হাঁ জরুর করব।

কী কী কাজ জানো!

সোব। যা বোলবেন সোব ফিনিশ করে দিব।

ওরে বাবা, এ যে আবার ইংরিজি-মিংরিজিও বলে। পিন্টু মাথা চুলকে বলে, ইয়ে, বিড়ির কারখানা, রংকল, তাঁতকল, প্লাস্টিক, প্লাইউড...

লোকটা ওকে কথা শেষ করতে দিল না, কভি নেহি, কোখোনো না, আমি ঘরকা আদমি। উ পেলাস্টিক-ইলাস্টিক বহোত খতরনাক্, ডর লাগে, পিন্টুবাঁবু। এক্‌বার আঁগ লাগবেঁ তো ব্যস্ খতম!

বাজিয়ে নিয়ে ভালোই হল। এ যাত্রা এই লোকটা হয়তো টিকেও যেতে পারে। তবে যা পলকা। অবিশ্যি মায়ের যদি পছন্দ হয় তবে। খুশি হয়ে পিন্টু বলল, তা হলে চলো আমাদের বাড়ি।

ছুটতে ছুটতে এসে পিন্টু বাড়িতে ঢুকেই বাবার মুখোমুখি পড়ে গেল। বারান্দায় চটি ফটফটিয়ে পায়চারি করার ধরন দেখেই বুঝেছিল বাবা ভীষণ চটেছেন। কিন্তু ওর এখন সাতখুনও মাপ হয়ে যাবার কথা, ঘণ্টাখানেক দেরি তো কোনো ব্যাপারই নয়। বাবা কিছু বলার আগেই ও হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, বাবা আমি গিদ্‌ধর সিং—

কথাটা শেষ করতে পারল না। ওর বাবা রাগে ফেটে পড়লেন, তা তো বটেই। গিদ্‌ধড় মানে গাধা। তুমি গাধা না হলে কি আর মাথায় সিং গজায়!

আমি না! কাজের লোক, নিয়ে এসেছি, ওর সঙ্গে কথা বলুন।

অ্যাঁ! কোথায়?

পিন্টুও কেমন ঘাবড়ে গেল। বলল, তাই তো গেল কোথায়? আমার পিছু পিছুই তো—

বুঝেছি! তোমার মাথায় শুধু সিং-ই গজায়নি, মাথাটিও গেছে!

জী হুঁজৌর? পিন্টুর বাবার পিছন থেকে মিহি খোনা গলায় দ্রুত উত্তর হল, গিরধঁর লাল সিং হাঁজির!

পিন্টু তার বাবাকে এরকম চমকাতে কখনো দেখেনি। লোকটার চেহারা দেখে ওঁর মুখ দিয়ে কথা বেরোল না।

কার সঙ্গে কথা বলছ? বলতে বলতে পিন্টুর মা ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে থমকে দাঁড়াল, কী আপদ! এই সঙ্টা আবার এখানে কি করছে? এ ভূতটাকে তুমি কোত্থেকে জোটালে!

পিন্টুর বাবা বললেন, তোমার লোক।

আমার লোক? পিন্টুর মা আকাশ থেকে পড়ল। পিন্টুও আর দাঁড়াল না, এই সুযোগে সরে পড়ল।

তা গিরিধারী না গিরধর এ বাড়িতে বহাল হয়ে গেল তিন মিনিটের মধ্যেই। শুধু একটা ব্যাপারে ফয়সলা হতে যা এই দেরিটুকুন হল। গিরিধারী নাকি মাইনে নিতে কিছুতেই রাজি হল না। সে শুধু খাবে আর কাজ করবে। আর থাকবে। শুধু খাওয়া-থাকার বদলে সর্বক্ষণের কাজের লোক। সংসারের যাবতীয় কাজ সে একা করবে। এ যুগে ভাবাই যায় না।

ওই রোগা-পটকা লোকটা কিন্তু সত্যিই ভেলকি দেখাল। একাই একশো বলে একটা কথা আছে, লোকটা যেন তাই। কিন্তু প্রতিটা কাজ যেমন নিখুঁত তেমনি তাড়াতাড়ি। পাঁজা পাঁজা বাসন যা অন্য লোকের এক-দেড়ঘণ্টা লেগে যাবার কথা, কুয়োতলা থেকে মেজে আনতে গিরিধারীর পাঁচ মিনিট লাগে কিনা সন্দেহ। কিন্তু ফাঁকি নেই। প্রতিটি বাসন-কোসন ঝকঝক করছে, বুঝি মুখ দেখা যায়। ঘরদোর তক্‌তক্ করছে, এক কণা ধুলো নেই। বিছানাপত্র টানটান, আলনা ফিটফাট, জুতোর পালিশ থেকে আলো ঠিকরোচ্ছে। রান্নাঘরে পা দিয়েই পিন্টুর মা চমকে যায়, উনুনে আঁচ গনগন করছে। ঠাকুরকে ফুলজল দিয়ে এসেই স্তম্ভিত। বাটনা বাটা হয়ে গেছে, একতাল আটা মাখা শেষ। বঁটির আওয়াজ শুনে পিছন ফিরে দেখেন কুটনো-ফুটনো রেডি। তবু এই লোকের হাতে রান্না খেতে প্রবৃত্তি হয় না। সেই এক জামা-কাপড়, এক পাগড়ি, ছাড়াছাড়ির বালাই নেই। জন্মে কখনো চান করেছে বলে তো মনে হয় না। মায়ের খুব বাছবিচার কিন্তু বাবা নিচু গলায় সাবধান করে দেন, এসব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে ওকে ঘাঁটিয়ো না। যদি ছেড়ে পালায়, তুমিই পস্তাবে।

তা ঠিক, কাজে-কর্মে লোকটার তুলনা হয় না। দোষের মধ্যে রাক্কুসে খোরাক আর কুম্ভকর্ণের মতো ঘুম। ভাত পেলে ওর মাথার ঠিক থাকে না। ভেতো বাঙালি না, এ ভেতো হিন্দুস্থানি। তাদের তিনজনের ভাত একলা সাঁটিয়ে দেয়। আর ঘুমোলে ওকে জাগায় কার সাধ্যি। তখন বাড়িসুদ্ধু লোককেই জেগে থাকতে হয়, আর ও বাড়ি কাঁপিয়ে ঘুমোয়। নাকের দুই ফুটোয় যেন বাঘ-সিংঘি একসঙ্গে ভর করে তখন। দিন তিনেকে মায়ের অবস্থা কাহিল। বাবার কাছে গিয়ে নালিশ জানাল, এ কি মনুষ্য না আর কিছু?

বাবা হাসি চেপে গম্ভীর হলেন, কেন কি করেছে গিরিধারী?

কী করেনি? রাতদিন কাজ দাও কাজ দাও করলে আমি কেমন করে সামলাই বলতে পারো?

খানিকক্ষণ চিন্তা করে বাবা বললেন, ঠিক আছে ওকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। ও কতবড় ম্যাজিক জানে দেখছি। বাছাধনের এবার নাভিশ্বাস তুলিয়ে ছাড়ব।

গিরিধারী এসে সেলাম করে দাঁড়াল। ওর ওপরে নতুন হুকুম জারি হল। এখন থেকে রোজ সকালে ওকে টাউনশিপের বাজারে যেতে হবে। বাসে-ফাসে না, হেঁটে যাবে হেঁটে ফিরবে। শুনে পিন্টু আঁতকে উঠল। টাউনশিপের বাজার তাদের বাড়ি থেকে পাঁচ মাইলের ওপর। তার মানে রোজ দশ-সাড়ে দশ মাইল ঠেঙিয়ে ওকে বাজার বয়ে নিয়ে আসতে হবে। এটা খুবই অবিচারের কাজ হল, তবে বাবার হুকুম, সে আর কি বলবে!

বাজারে পাঠিয়ে বাবা হাসতে হাসতে মাকে বললেন, এর ফলটা কিন্তু খুব ভালো হল না। লোকটা আজই পালাচ্ছে, তুমি জেনে রাখো।

একটু ফাঁক পেয়ে মা বাবার সঙ্গে সুখ-দুঃখের গল্প করছিল এমন সময় রান্নঘর থেকে মাঁ জীর তলব হল। পিন্টু ঘড়ির দিকে তাকাল। মিনিট পনেরো হল টাকাকড়ি থলে-ফলে বুঝে নিয়েছে, অথচ এখনো পর্যন্ত বাড়ি থেকে বেরতেই পারল না! মা রাগের মাথায় উঠে গেল ওকে ধমকাতে।

নিজের আবিষ্কার বলে কিনা কে জানে, গিরিধারীর ওপরে পিন্টুর একটু দুর্বলতাই জন্মে গেছে। বাজারটা কিন্তু ও দারুণ করে, খুব সস্তায়। একই টাকায় বাবার চেয়ে তিনগুণ জিনিস আনে।

পিন্টুর মা ফিরে এল প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। দেখেই বোঝা গেল ভীষণ ভয় পেয়েছে। মুখ কাগজের মতো সাদা, সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপছে, কথা বলার ক্ষমতা নেই।

কী ব্যাপার দেখার জন্যে বাবার পিছু পিছু পিন্টুও ছুটে গেল রান্নাঘরে। এ কী অসম্ভব ব্যাপার! গিরিধারী টাউনশিপের বাজার কখন সেরে এসেছে কে জানে, আনাজপাতি, মাছ কুটে ধুয়ে রেডি করে রেখে গিয়েছে। মনে হতেই পারত ও টাউনশিপে যায়নি, অন্যদিনের মতো ঘরের কাছেই বাজার সেরেছে। কিন্তু না, রসগোল্লার হাঁড়ির মোড়কে টাউনশিপের দোকানের নাম-ঠিকানা ছাপা।

গিরিধারীকে দেখতে না পেয়ে যেন বাঁচা গেল। পিন্টুর বাবা যা বোঝার বুঝে ফেলেছিলেন। একমুহূর্তও সময় নষ্ট না করে, ওকে নিয়ে তিনি ঊর্ধ্বশ্বাসে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। তারপর পিন্টুকে ওর মায়ের কাছে রেখে যেন কোথায় বেরলেন। একটু পরেই অনেকগুলো গলার উত্তেজিত কোলাহল শুনে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে পিন্টু দেখল উঠোনে এক বিরাট দঙ্গল। পাড়া ঝেঁটিয়ে লোকজন এসে গেছে লাঠিসোঁটা নিয়ে। দুঃখিত পিন্টু বুঝতে পারল গিরিধারীকে আর বাঁচানো যাবে না। সবাই যে রকম ক্ষেপে উঠেছে তাতে গণধোলাইয়ে ওর হাড্ডি চুর হয়ে যাবে আজ। যদি না বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে থাকে।

অনেক খোঁজাখুঁজির পর দেখা গেল হতভাগা বাড়ি ছেড়ে পালায়নি। নিজের ঘরে খিল বন্ধ করে লুকিয়ে আছে। বুদ্ধু কোথাকার! এবার মরবে। পিন্টুর ভেতরে ভেতরে খুব কষ্ট হল।

জনতা পাগলের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল বন্ধ দরজার ওপর। সেই চাপ ওই পলকা দরজা বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারল না, ভেঙে পড়ল। সবার কেমন ধাঁধা লাগল। দরজা-জানালা বন্ধ সেই ঘরের মেঝেয় গিরিধারী হুমড়ি খেয়ে মরে পড়ে আছে। ভয়েই হার্ট ফেল করেছে না বিষ খেয়েছে কে জানে!

জানলা-টানলাগুলো খুলে দিতেই সবাই আর এক দফা চমকাল। কোথায় গিরিধারী! মেঝের ওপর ওর পাগড়ি কামিজ আর পাজামা এমনভাবে পড়ে ছিল যে ধাঁধা লেগেছিল। গিরিধারী নেই, সে বোধহয় চিরকালের মতোই ওদের ছেড়ে চলে গেছে।

পরে যখনই ওর কথা উঠত পিন্টুর বাবা মাথা নেড়ে বলতেন, গিরিধারীর আত্মা মুক্তি পেয়েছে। কেউ নিশ্চয় ওর নামে গয়ায় পিণ্ডি দিয়েছিল।

ফাল্গুন ১৪০০

সঙ্কেত

শ্রীনীরোদচন্দ্র মজুমদার

বসন্তর চিঠি পেয়ে অবাক হয়ে গেলাম।

ঘুরতে ঘুরতে আরা জেলার এক কোণে গিয়ে সে আস্তানা পেতেছে—এক বিরাট পড়ো বাড়িতে।

সে লিখেছে—

"ও ভাই নিখিল! অবশেষে ঘোরাঘুরির অন্ত হল বোধহয়। ঠিক যেমনটি চাই, তেমনি একখানি বাড়ি পেয়েছি। বাকি দিনগুলো এইখানেই শান্তিতে কাটিয়ে দিতে পারব মনে হয়। বাড়িটার কিছু কিছু রোজই ভেঙে পড়ছে, তবু দোতলায় খানচারেক ঘর এখনও যা আছে, আমার চেয়ে তাদের পরমায়ু বেশি—এমন আশা রাখি। সেগুলিতে আমি সংসার পেতেছি। একখানাতে শুই, একখানাতে লেখাপড়া করি, আর একখানা দিয়েছি তিনকড়ির মাকে রান্নাবান্নার জন্য। চতুর্থ কামরা তোমার জন্য গুছিয়ে রেখেছি; যত শীগগির পারো, তুমি চলে এসো।

জানো এ বাড়ির ইতিহাস? এটা ছিল রাজবাড়ি। ১৮৫৭ সালে যখন প্রথম স্বাধীনতা-যুদ্ধ হয়, তখন এ-বাড়ির মালিক দস্তুরমতো লড়াই করেছিলেন ইংরেজের বিরুদ্ধে। তাঁর নাম কুমার দলপৎ সিং। তেজি মানুষ ছিলেন। নানাসাহেবের দরবারে রীতিমতো খাতির ছিল তাঁর।

যুদ্ধে যখন হার হল, কুমার বাহাদুর কানপুর থেকে পেছিয়ে এলেন। কাশী, পাটনা, ছাপরা—সর্বত্রই তাঁর কলিজার রক্ত ঝরেছিল কিছু কিছু। অবশেষে সাদা-জাতের শাসনে কবরের শান্তি প্রতিষ্ঠিত হল গোটা দেশে। দলপৎ সিংয়ের নামে হুলিয়া বেরুল—যে তাঁকে ধরিয়ে দেবে, দশ হাজার টাকা পুরস্কার পাবে।

নিজের জেলাতেই গা-ঢাকা দিয়ে এদিক-ওদিক ঘোরাফেরা করতেন কুমার বাহাদুর। এখানে সবাই তাঁকে চিনত, মানত, ভক্তি করত। বন্ধু, আত্মীয়, প্রজা—যার বাড়িতে দু'দিনের জন্য আশ্রয় নিতেন—সে যেন স্বর্গ হাতে পেত—সাবধানে তাঁকে লুকিয়ে রাখত, আর প্রাণপণে তাঁর সেবা করত। মোটের উপর খুব বেশি কষ্ট তিনি পাননি। ইংরেজের চরকে ফাঁকি দিয়ে বেশ নিরাপদে দিন কাটাচ্ছিলেন তিনি। অবশেষে বিনা মেঘে বজ্রপাত হল। তিনি ধরা পড়লেন তাঁর নিজের বাড়িতে।

বহুদিন পরে দলপৎ সিং এসেছিলেন স্ত্রী-পুত্রকে দেখবার জন্য। আরও দু'একবার এমন এসেছিলেন, তখন কোনো বিপদ হয়নি। কিন্তু এবার হল। তাঁরই খুড়তুতো ভাই মহীনূর তেতলার জানলা থেকে একখানা কালো কাপড় ওড়াল ক'মিনিট। অদূরে বটগাছে ইংরেজের চর লুকিয়েছিল এই সঙ্কেতের প্রত্যাশায়! সেই রাত্রেই সাদা পল্টন এসে বাড়ি ঘেরাও করল—দলপৎ সিংকে টেনে বার করে তাঁর বাড়ির ভিতরেই তাঁকে হত্যা করল।

তারপর থেকে রাজবাড়ি শ্রীহীন। জমিদারির মালিক হল মহীনূর সিং, কিন্তু সে বাস করল পাটনায় গিয়ে। পঞ্চাশ বছর যেতে না যেতে বাড়িটা একেবারে পরিত্যক্ত হল। এখনকার অবস্থা দেখলে তুমি হয়তো ভয় পাবে। চারিদিকে ইঁট-পাথর ভেঙে ভেঙে পড়ছে, আশেপাশে জঙ্গল গজিয়ে উঠেছে, পরিখার জল পচে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে।

কিন্তু পরিখার বাইরে নতুন কলোনি গজিয়ে উঠেছে একটা। যে-মাঠে একদিন দলপৎ সিং দু-হাজার সিপাহীকে কুচ-কাওয়াজ করাতেন, তার বুক চিরে লাল সুরকির রাস্তা চারিদিকে ডালপালা ছড়িয়ে দিয়েছে, আর তাদেরই গায়ে গায়ে মাথা তুলেছে পাকিস্তানী উদ্বাস্তুদের ঘর-বাড়ি। প্রধানত

ধনী লোকদেরই কলোনি এটা। এখানে বিজলী-বাতি পর্যন্ত এসেছে, মোটরের হর্ন আর রেডিওর রাগিণী সর্বদা শুনতে পাওয়া যায় আমার ভাঙাবাড়ির দোতলা থেকে।

পরিখার এপারে এই কলোনি, ওপারে আবার খানকতক কুঁড়ে। তারই একখানাতে তিনকড়ির মা বাস করে। এপারে আলো, আর ওপারে অন্ধকার—এ দুইয়ের মাঝখানে আমার ভগ্নপুরী। বর্তমান মালিকরা এ বাড়ির আসবাবপত্র সব সরিয়ে ফেলেছেন, তবে দরজা-জানলাগুলো এখনো আছে। বছরে দু'শো টাকা মাত্র ভাড়ায় এই বিশাল ধ্বংসাবশেষ আমি ভাড়া নিয়েছি। এমন সস্তায় এত ভালো জায়গা দুনিয়ায় কোথাও পাব না আর। আমার এত ভালো লেগেছে বলেই তোমাকে আসতে না লিখে পারলাম না।

তোমার বসন্ত।"

চিঠি পড়ে আমি অবাক! একটা পড়ো বাড়ির উপর এ-রকম স্নেহ! নির্জনতা সে ভালোবাসে, জানি। তাই বলে সারাজীবন একটা ভাঙা বাড়ির মধ্যে নিজেকে কবর দিয়ে রাখতে হবে—এ কি পাগলামি? বয়স তার সবে ত্রিশ, অর্থ-সামর্থ্য মন্দ নয়, ছবি আঁকতে পারে, লেখক হিসেবেও নাম করেছে একটু—সে লোক যদি এভাবে পৃথিবীর বাইরে চলে যেতে চায়, তাহলে বন্ধুর কর্তব্য হবে তাকে ধরে এনে ডাক্তার দেখানো!

বন্ধু বলতে শুধু আমি। কাজেই আমায় যেতে হবে।

এক শীতের প্রভাতে আরায় গিয়ে হাজির হলাম। সঙ্গে নিজের গাড়ি ছিল। পথের বিবরণ বসন্তর চিঠিতে বিশদ ভাবেই পেয়েছি, কাজেই বাহাদুর-নগরে পৌঁছুতে কষ্ট হল না। আমার আসবার আগে বসন্তকে চিঠি দিইনি। তার সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে একা স্বাধীনভাবে বাড়িটা দেখে নিতে চাই আমি।

এই সে কলোনি! লাল সাদা গেরুয়া রঙের ছোট ছোট বাড়ি, ফুলবাগানের ফ্রেমে আঁটা এক-একখানি ছবি যেন! পুল আছে, পাথরের পুল। দু'শো বছর আগে পুলের মুখে শান্ত্রীর ঘর আর লোহার দরজা ছিল, এখনো তার চিহ্ন আছে।

পুলের উপর দিয়ে ভাঙা রাজবাড়ির হাতায় এসে পৌঁছুলাম। কী জঙ্গল চারিধারে! কিন্তু বড় গাছের জঙ্গল নয়—ছোট ছোট আগাছা—তাতে বিশাল অট্টালিকার এধার থেকে ওধার পর্যন্ত দেখার অসুবিধা হয় না। গাড়ি থেকে নেমে, সেই দূর থেকেই নিষ্পলক নয়নে তাকিয়ে রইলাম বাড়িটার দিকে। মস্ত বড় বাড়ি! লম্বায়, চওড়ায় যেমন, তেমনি বিরাট উঁচু! বাড়িটা দেখে ভয়-বিতৃষ্ণার বদলে শ্রদ্ধা হল আমার। কেন যে পাগলা বসন্ত এমন করে বাড়ির মায়ায় বিভোর হয়েছে, বুঝলাম।

মোট নিয়ে খানিকটা এগিয়ে গেলাম বাড়ির দিকে। বসন্ত আওয়াজ পেল বাড়ির ভিতর থেকে। জানলাতে তার মুখ দেখা গেল একবার—তারপর নেমে এসে আমায় একেবারে বুকে জড়িয়ে ধরল।

গাড়ি রাখবার জায়গার অভাব নেই। বসন্ত আমায় আস্তাবলে নিয়ে গেল। এক সময়ে পাঁচশো ঘোড়া থাকতো এই আস্তাবলে। বাড়ির তুলনায় এটা বেশ ভালো অবস্থাতেই আছে। সেখানে গাড়ি রেখে বাড়ির ভিতরে ঢুকলাম।

প্রথমেই সিংহদ্বার। মোটা লোহার পাতে মোড়া জবরদস্ত কাঠের দরজা। তার ডাইনে-বাঁয়ে মাথার উপরে তেতলা-সমান উঁচু পাথরের দেওয়াল। ভিতর থেকে যদি সিংহদ্বার বন্ধ করে দেওয়া যায়, কারও সাধ্য নেই বাড়িতে ঢুকবে।

সিংহদ্বারের পর একটা ঘর—দরবার-ঘরের মতো। বহু স্তম্ভের মাথায় নক্সা-করা ছাদের কিয়দংশ এখনো বর্তমান। ভাঙা দিকটা দিয়ে চাওড়া পাথরের সিঁড়ি উপরে উঠে গিয়েছে। সিঁড়ির পাশে একসময়ে কাঠের রেলিং ছিল, তার চিহ্ন এখনো আছে। বসন্ত বলল, "বাড়ির মালিকরা রেলিংগুলো খুলে নিয়ে বিক্রি করে দিয়েছে।"

সিঁড়ি চওড়া। রেলিং না থাকলেও গড়িয়ে পড়বার আশঙ্কা নেই। দোতলায় উঠে অনেক ভাঙা-চোরা দালান আর কামরা পেরিয়ে বসন্তর নিজস্ব ঘরগুলির পাত্তা পাওয়া গেল। এগুলি রীতিমতো

পরিচ্ছন্ন। পাথরের দেওয়াল কোথাও একটু চিড় খায়নি—গায়ে রাবণবধের ছবি এঁকেছিল কোন্ শিল্পী সেই স্মরণাতীত কালে—বিবর্ণ হয়ে গেলেও সে-ছবির ভঙ্গি এখনো চোখে পড়ে।

তিনকড়ির মা'র দেখা মিলল না। সেদিনকার মতো রান্না শেষ করে দিয়ে আগেই সে চলে গেছে। এ-বেলার ভাত এবং ও-বেলার রুটি—সব একসঙ্গে। অপরাহ্ণে সে আর আসে না এখানে।

"আসে না কেন?" আমি প্রশ্ন করলাম—"ভূতের ভয় নাকি?"

"ভূত, না ছাই! ভূত নেই।" বসন্ত যেন লজ্জায় মাটিয়ে নুয়ে পড়ল। "একটা ভূত না থাকায় বাড়িটার মর্যাদাহানি হয়েছে। এ বিরাট ভাঙা বাড়ি, যে দেখবে সেই ভাববে, এখানে একটা কলোনি আছে ভূতের। কিন্তু, আমার দুর্ভাগ্য, এই এক বছরের মধ্যে ভূতের টিকি দেখিনি—যদিও বাড়িতে আমি নিছক একা বাস করি।"

আমি বললাম—"ভূত নেই, এ-কথার মানে? সেই দলপৎ সিংয়ের কী হল? সে-ভদ্রলোকের যখন অপঘাত-মৃত্যু হয়েছিল এ-বাড়িতে, তখন ভূত না হয়ে তিনি যাবেন কোথায়?"

বসন্তর মুখ হঠাৎ গম্ভীর হল। সে জিভ কামড়ে বলল—"কুমার বাহাদুর পুণ্যাত্মা লোক ছিলেন, একাধারে বীর এবং সৎ। অপঘাতে মৃত্যু হয়েছিল, সেটা তাঁর দোষে নয়। তিনি মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই স্বর্গে চলে গেছেন। ভূত হয়ে পৃথিবীতে তাঁকে ঘুরতে হবে কেন?"

আমি নাছোড়বান্দা। "তিনি না হয় স্বর্গে গেছেন, কিন্তু তাঁকে যারা মেরেছে—তারা? বিশেষ করে সেই বেইমান মহীনূর? তারা নিশ্চয় স্বর্গে যায়নি?"

"এখানে তারা মরেনি কেউ!"—উত্তর দেয় বসন্ত।

"অন্য জায়গায় মরলে বুঝি একদিন বেড়াতে আসতে পারে না এখানে? হাজার হলেও এ-বাড়িটা তাদের একটা কীর্তির অকুস্থান! ভূত হয়ে একবারও কেউ এটা দেখতে আসবে না, এ কেমন কথা?"

আমার এ-পরিহাস বসন্তর ভালো লাগছে না, আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম। তবু কী নেশা আমায় পেয়ে বসেছিল—কথার ঐ বিশ্রী হাল্কা সুর কিছুতেই আমি ত্যাগ করতে পারিনি। অবশেষে বসন্ত তিক্তস্বরে বলে উঠল—"তুমি একটা কথা ভুলে যাচ্ছ—সে কীর্তিমানরা এখানকার জীব ছিল না। এখান থেকে সঙ্কেত করে তাদের ডেকে আনা হয়েছিল। যতদিন আবার সঙ্কেত না পাচ্ছে, আসবে কেন?"

চমৎকার জবাব দিয়েছে বসন্ত। আমি "হো হো" করে হেসে উঠলাম। ভূতের কথা ছেড়ে দুজনে খেতে বসা গেল। খাবার তৈরি ছিল শুধু বসন্তর জন্য। কাজেই তায় দু'বেলার রসদ এক বেলাতেই শেষ করে ফেলতে হল।

বসন্ত বলল—"কুছ পরোয়া নেই, কলোনিতে হোটেল আছে—চা-বিস্কুট, চপ-কাটলেট, ভাত-তরকারি-পরোটা সব মেলে। ও-বেলা সেখান থেকে খাবার আনব।"

খাওয়ার পর বিশ্রাম আমার অভ্যাস নেই। আমি বাড়িটা দেখতে বেরুলাম। আধঘণ্টা পরে বসন্ত এসে যোগ দিলে আমার সঙ্গে। সে অবশ্য আগেই সব তন্ন তন্ন করে বহুবার দেখেছে। একবার এক ভাঙা ছাদ ধসে পড়েছিল, তাতে আর একটু হলেই জন্মের মতো চাপা পড়ত।

আমি গম্ভীর হয়ে বললাম—"তুমি যে চাপা পড়ে মরোনি, এটা তো ঠিক? হঠাৎ যদি বুঝতে পারি যে তুমি বসন্তর ছায়ামাত্র, বসন্তর কায়া এইখানেই কোথাও কোনো ভগ্নস্তূপের নীচে গুঁড়ো হয়ে আছে, তাতে আমি একটুও আশ্চর্য হব না।"

বসন্ত হেসে উত্তর দিলে—"কিন্তু তিনুর মা আশ্চর্য হবে সে যদি বুঝতে পারে এতদিন এত ভাত আর এত রুটি সে পাকিয়েছে শুধু একটা ছায়ার উদর-পূর্তির জন্য!"

কথা বলতে বলতে দুজনে সারা পুরীটা ঘুরে ঘুরে দেখছি—কোথাও পা দেওয়া নিরাপদ নয়, কোন্ ঘরের দেওয়ালে গুপ্তদ্বার আছে, মেঝের কোন্খানটাতে লুকিয়ে থাকবার গোপন গহ্বর আছে, এ সব বসন্তর নখদর্পণে। হাজার রকমের বিস্ময় সে একের পর এক আমার চোখের সুমুখে উদ্ঘাটন

করে চলেছে। আমি ভাবছি, এই নেশাতেই মশগুল হয়ে আছে ও! এ মোহ থেকে ওকে বিচ্ছিন্ন না করলে হয়তো পাগল হয়ে যাবে শেষে।

তেতলার ছাদের এক কোণে একটা সরু সিঁড়ি। সেই সিঁড়ির মাথায় ছোট একখানি ঘর। বসন্ত বলল, "ও ঘরে এক শিবলিঙ্গ আছেন। বোধহয় বাড়ির মেয়েরা ওখানে শিবপূজা করতেন।"

হেঁটে হেঁটে ততক্ষণে আমি শ্রান্ত হয়ে পড়েছি। একটা মামুলি শিবলিঙ্গ দেখবার জন্য আর জীর্ণ সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠবার উৎসাহ হল না আমার। কিছুক্ষণ ছাদে বসে দম নিলাম দুজনে, তারপর নেমে এলাম নিজেদের কামরায়।

অপরাহ্নে দুজনে হোটেলে গিয়ে খাবার কিনে আনলাম। বেলাবেলি ফিরে এলাম; কারণ, বাড়িতে কেরোসিনের লণ্ঠন ভিন্ন আর কোনো আলো নেই। রাত্রিবেলা তার সাহায্যে রেলিংবিহীন সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠা খুব নিরাপদ নয়।

সিংহদ্বারে অর্গল এঁটে দুই বন্ধু যখন দোতলায় উঠলাম, তখনও সূর্য অস্ত যায়নি। খাবারগুলো ঘরে রেখে বসন্ত বলল—"তেতলায় চলো, সেখানে একটা জানলা দিয়ে সূর্যাস্ত দেখা যায়, সে যে কী চমৎকার! আমি একশো দিন দেখেছি, তবু আমার দেখার সাধ মেটে না।...."

বসন্তর সঙ্গে সেই তেতলার জানলায় গিয়ে বসলাম। বসন্ত প্রায়ই এখানে বসে। কাজেই ধুলো বড় নেই। সত্যই অপূর্ব দৃশ্য! খানকতক খোলার ঘর মাঠে ইতস্তত ছড়ানো। বসন্ত বলল, তারই একটাতে তিনকড়ির মা বাস করে। সেই কুঁড়েখানার প্রায় একশো হাত পিছনে এক প্রাচীন বটগাছ, তার পিছনে একটা ঝিল, সেই ঝিলের জলে অস্ত সূর্যের রক্তরশ্মি ছড়িয়ে পড়েছে যেন এক ঝলক গোলা আবিরের মতো। আকাশ আর পৃথিবীতে একটানা লাল রংয়ের সমারোহ। বুড়ো বটের ডালে এই শীতের দিনে পাতার বাহুল্য বিশেষ ছিল না—ন্যাড়া ডালগুলোকে মনে হচ্ছে যেন লালের পটভূমিতে সরু-মোটা কতকগুলো আঁকা-বাঁকা কালির আঁচড়!

দুজনে বসে আছি পশ্চিম আকাশের পানে তাকিয়ে। হঠাৎ একখানা পা তুলে দিলাম সেই বেদির উপরে। পায়ের শব্দটা জোরেই হল আর সেই শব্দ শুনে আমরা দুজনেই উৎকর্ণ হয়ে উঠলাম।

ফাঁপা জায়গায় আঘাত করলে যে-রকম শব্দ হয়, এ শব্দ সেইরকম। আমি সকৌতুকে বললাম, "বাড়িটার কোথায় যে কত গর্ত আর সুড়ঙ্গ আছে, তুমিও তা এতদিনে আবিষ্কার করতে পারোনি। এখানটাতেও কিছু আছে নিশ্চয়।"

বসন্ত বিনা বাক্যব্যয়ে নীচে থেকে শাবল নিয়ে এল, আর বিনা বাক্যব্যয়ে আমি তাই দিয়ে আঘাত করতে লাগলাম জানলার নীচেকার ফাঁপা জায়গাটিতে।

দু-টুকরো পাথর খুলে একটা অগভীর গর্ত দেখা দিল। সেই শাবলখানাই আমি নামিয়ে দিলাম ওর ভিতরে। খানিকটা নাড়াচাড়া করতে কী একটা বস্তু যেন জড়িয়ে গেল সেই শাবলের মাথায়। আমি সেটা টেনে তুললাম শাবল-সমেত। একখানা কাপড়! রংটা ধোঁয়াটে। বেশি লম্বা নয়, হাত-পাঁচেক হবে।

বসন্তর মুখে ভ্রূকুটি। আমি মনে মনে হাসলাম। ও হিংসায় ফেটে পড়ছে! ওর বাড়িতে এসে আমি একটা গোপন রহস্য আবিষ্কার করে বসলাম—এ এক বৎসরে যার সন্ধান ও পায়নি! এ পরাজয় হজম করতে পারছে না যেন!

কাপড়খানা জানলার বাইরে ধরে ভালো করে ঝাড়তে লাগলাম। ধুলো তাতে আছে, কিন্তু সে ধুলো ঝাড়লে যাবার নয়, তা আমি জানি। অন্তত একশো বছরের পুরোনো ধুলো! ওকি আর—

হঠাৎ আহত বুলডগের মতো একটা ক্রুদ্ধ গর্জন করে বসন্ত হাত বাড়িয়ে চাদরখানা আমার হাত থেকে কেড়ে নিলে—"করছো কী তুমি?"

"অ্যাঁ!"—বিস্ময়ে হতবাক হয়ে আমি ওর পানে তাকাই।

"এ যে সেই কাপড়, যা দিয়ে পাপিষ্ঠ মহীনূর সেদিন ইংরেজের চরকে সঙ্কেত করেছিল!"

এই বলে সে সভয়ে তাকাতে লাগল ঐ ন্যাড়া বটগাছটার দিকে, যেন ওর আঁকাবাঁকা ডালের আড়ালে সে কোনো লুক্কায়িত চরের সাদা মুখ দেখতে পেয়েছে!

কথাটা আমারও মনে লাগল। খুব সম্ভব এটা সেই কাপড়, আর খুব সম্ভব এই জানলা দিয়েই মহীনূর ঐ বটগাছের দিকে সঙ্কেত করেছিল! কিন্তু তা যদি হয়, তাতে বসন্তর এমন বিচলিত হবার কী আছে?

বুঝতে না পেরে আমি ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে ওর দিকে তাকিয়ে আছি দেখে সে রেগে উঠল ভয়ানক। জানলাটা বন্ধ করে দিয়ে কালো কাপড়খানা তার নিজস্ব গর্তের ভিতর নিক্ষেপ করল তখনি। তারপর পাথর দিয়ে গর্ত বন্ধ করতে করতে সে গজ্‌রাতে লাগল—"আস্ত বোকা! ও সঙ্কেতে কী অনর্থই না ঘটেছিল সেদিন! আজ আবার তেমন কিছু হয় যদি?"

আমি আকাশ থেকে পড়লাম! আজ আবার অনর্থ? কী রকম অনর্থ? কে ঘটাবে অনর্থ? কেন ঘটাবে? ঝড়ের বেগে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করি আমি।

উত্তর দেবার আগে সে আমার হাত ধরে টেনে নামিয়ে নিয়ে এল দোতলায়—নিজের ঘরে। তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে প্রায়। ম্লান গোধূলির আলোয় সিংহদ্বারের দিকে তাকিয়ে সে বলল মৃদু কণ্ঠে, "ঐ দোর খুলে আমরা পালাই, চলো! এখনো সময় আছে। তারা আসবার আগে আমরা পালিয়ে যেতে পারব। হোটেলে একটা রাত্রির মতো আশ্রয় পেতে পারব। চলো, এখনই চলো। এরপর তারা এসে পড়বে হয়তো!"

"কারা? কারা এসে পড়বে?" আমি কিছু বুঝতে না পেরে পাগলের মতো চেঁচিয়ে উঠলাম। কিছু বুঝতে পারছিলাম না—কেবল এইটুকু ছাড়া যে অভাগা বসন্ত বদ্ধ পাগল হয়ে গেছে!

আমার প্রশ্ন শুনে বসন্ত আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাইল। আমিও ভালো করে তাকিয়ে দেখলাম তার দিকে—না! তার চোখে পাগলামির কোনো আভাস নেই! তবে? এ সব কী বলছে ও?

বসন্ত বললে—"কারা এসে পড়বে, বুঝছ না? সেই সেদিন যারা এসেছিল,—মনে করছ—তারা আর নেই? পাগল! তারা মরেছে বটে, কিন্তু তাদের হিংসা মরেনি। পাপ দীর্ঘজীবী। রক্তের তৃষ্ণা একবার জাগলে সহজে তা মেটে না! একটা দলপৎ সিংয়ের রক্ত পান করে সেই দুশো গোরা সৈনিকের রক্ত-পিপাসা চিরদিনের মতো ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে, ভেবো না! তারা আবার একটা সঙ্কেত-পাবার প্রত্যাশায় আছে এই প্রায় একশো বছর ধরে। সে সঙ্কেত আজ তারা পেয়েছে। সেই একই জানলা থেকে, সেই একই কালো কাপড়ের সঙ্কেত। আজ তারা আসবে, ঠিক যেভাবে সেদিন এসেছিল!"

আমি রীতিমতো ভয়ার্ত হয়ে পড়লাম। সে শুধু ওর ভয়ের ছোঁয়াচ লেগে! পরক্ষণেই জোর করে হেসে উঠলাম—"কী বলছ, বসন্ত? কিসের সঙ্কেত? কিসের রক্ত-পিপাসা? যত আজগুবি কথা ভেবে ভেবে এই এক বছর ধরে তুমি নিজের মাথার মাথা খেয়েছ। চলো, খেতে বসা যাক। খেয়ে লম্বা ঘুম। তারপর সকালে তোমায় নিয়ে বাংলা মুল্লুকে ফিরে যাচ্ছি আমি!"

"ফিরে যেতে চাইলেই ওরা তোমায় যেতে দেবে? হেসে তুমি উড়িয়ে দিলে আমার কথা! বেশ, তুমি যদি মরতে রাজি থাকো, আমিও আছি! দেখি, কি হয়?"

দুজনে গিয়ে খেতে বসলাম। কেরোসিনের আলো জ্বলছে—মিটমিট করে—চারিদিকে থম্‌থমে গুমোট। বাতাসের আভাস নেই কোথাও। জানলা খোলা আছে। কিন্তু কলোনিতে একটাও আলো জ্বলেনি এখনো। ওখানে বাড়িতে-বাড়িতে গলিতে-গলিতে বিজলী বাতি আছে দেখে এসেছি! ওদিককার লাইন ফিউজ হয়ে গেল না কি?

মনের ভাব ভাষায় প্রকাশ করা মাত্র বসন্ত তিক্ত হাসি হেসে বলল—"তুমি তা এতক্ষণে লক্ষ করলে? আমি বহুক্ষণ আগেই দেখেছি—আলো দেখা যাচ্ছে না! রোজ যায়, আজ দেখা যাচ্ছে না। ফিউজ হয়নি, বাড়িতে-বাড়িতে একশো আলো জ্বলছে ওখানে। শুধু আলোর কথা ভাবছ তুমি! আমি ভাবছি গ্রামোফোন-রেডিওর গানের কথা। রোজ প্রতি বাড়ি থেকে তার আওয়াজ পাই,

আজ পাচ্ছি না। এ সবের মানে? মানে, বাইরের পৃথিবী থেকে এ-বাড়িটা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে ওরা! ঐ বাইরে দেখছ জমাট অন্ধকারের দেওয়াল—ও অন্ধকার এ পৃথিবীর নয়, প্রেতলোকের।"

আমি চকিতে স্তব্ধ হয়ে বসে থেকে লাফিয়ে উঠলাম। বসন্তর হাত ধরে তাকে তুলে বললাম—"চলো, আমরা এখনি বেরিয়ে যাব। তুমি যা বলেছিলে—হোটেলে রাত কাটাব আজ। তোমার এ-সব আজগুবি কথায় বিশ্বাস করি না। কিন্তু তুমি যেরকম ভয় পেয়েছ, তাতে এখানে তোমাকে আর তিলার্ধ থাকতে দেওয়া উচিত হবে না—চলো!"

আমার সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বসন্ত বলল—"চলো, কিন্তু বেশি দূর যেতে হবে না। ওরা এসে গিয়েছে। বাড়িটা ওরা ঘিরে বসে আছে। এখন বাইরে যাওয়া মানে ওদের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়া! অবশ্য তাতে কিছু আসে যায় না। মরতে যখন হবেই, দু-মিনিট আগে না হয় পরে?"

এতক্ষণে আমারও যেন ধারণা হল যে অনৈসর্গিক একটা কিছু ঘটতে চলেছে! রক্তের গন্ধ পাচ্ছি চারিদিকে। বাতাস বইছে না, কিন্তু একটা শিরশির আওয়াজ কানের কাছে—কারা যেন ফিসফিস করে কথা কইছে ঠিক আমার পাশে দাঁড়িয়ে! একটা অশিব প্রভাব বিশাল পাষাণপুরীকে গিলে ধরেছে যেন! এখান থেকে পালাতে হবে! পালাতেই হবে!

সিঁড়ির উপরে লণ্ঠন রেখে হাতড়ে হাতড়ে নীচে নেমে গেলাম। দরবার-হল্ পেরিয়ে সিংহদ্বারে এসে পড়লাম। ভগবানকে ডেকে আগল খুলে ফেললাম একটানে—কর্কশ আওয়াজ তুলে ভারী কাঠের পাল্লা পিছনে সরে এল।

দরজা খোলা। এবার এগিয়ে গেলেই হয়।

তা হয় না! এগিয়ে যেতে চাইলেই যাওয়া যায় না! সেই যে অন্ধকারের দেওয়াল, সেটা সত্যই নীরেট—তা কে জানতো? এক পা অগ্রসর হলেই সেই দেওয়ালে ধাক্কা খাচ্ছি। ঠিক যেন একটা কালো পাহাড় আমাদের পথ আটকে দাঁড়িয়ে! বসন্ত চুপি চুপি বলল—"দেখছ? যাবার পথ নেই।"

হৃৎপিণ্ড ধুক্‌ধুক্ করছে কিনা ভালো বুঝতে পারলাম না হঠাৎ! সে বিষয়ে যখন আশ্বস্ত হলাম—তখন একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলাম সেই অন্ধকার প্রাচীরের দিকে। প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগলাম—ওর মর্মস্থল ভেদ করে পরপারে দৃষ্টি প্রেরণ করবার জন্য। কিন্তু না! যেমন করে ধাক্কা খেয়ে আমাদের দেহ ফিরে এসেছিল, ঠিক সেইভাবে ধাক্কা খেয়ে দৃষ্টিও পিছনে পিছিয়ে আসতে লাগল।

কী করব—ভেবে ঠিক করতে না পেরে হতভম্বের মতো তাকিয়ে আছি ঐ আঁধার প্রাচীরের দিকে, এমন সময় হঠাৎ আলো জ্বলে উঠল এখানে-সেখানে! মশালের আলো! সে আলোর রংটা নীলচে। আলোর সংখ্যা ক্রমে বেড়ে যাচ্ছে। সে আলোয় ঝকমক করে উঠছে শত শত ইস্পাতের ফলা! ওগুলো তলোয়ার? না, কিরীচ? না, বর্শা? অস্ত্রের পিছনে সাদা সাদা মুখও যেন অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে অনেকগুলো!

হঠাৎ পুরুষ কণ্ঠে ইংরেজি শব্দ কানে এল—"মার্চ!"

সেই আধ-আলো অন্ধকারের নীরেট দেওয়াল হঠাৎ যেন জ্বলে উঠে আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে চায়! আমি বসন্তর হাত ধরে সিংহদ্বারের এপিঠে পিছিয়ে এসে বিদ্যুতের মতো ক্ষিপ্র হস্তে দ্বারে অর্গল এঁটে দিলাম। আর সেই মুহূর্তে ওপিঠে যেন হাজারটা দানব একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল—দারুণ আক্রোশে।

ছুট্! ছুট্! দরবার পেরিয়ে সিঁড়ি! সিঁড়ি বেয়ে দোতলা! কিন্তু ঘর কোথায়? সিংহদরজায় প্রচণ্ড আঘাত পড়ছে মুহুর্মুহু। যেন দশটা হাতি ছুটে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে ওর ওপর! এ আক্রমণ সহ্য করে শতাব্দীর পুরাতন কাঠের দরজা কতক্ষণ খাড়া থাকবে?

প্রলয়-কোলাহল চারিদিকে! ইংরেজি ভাষায় নারকীয় তর্জন! "মারো! কাটো! ফাঁসি দাও

বিদ্রোহীকে! আগুনে পোড়াও বাচ্চাদের! মেয়েদের ধরে বাঁদী করে নিয়ে চলো!"—নানারকম চিৎকার আর শাসানি!

মড়-মড়-মড়াৎ! "ঐ...ঐ ভাঙল সিংহদ্বার! আর উপায় নেই! এবার মৃত্যু!"

বসন্ত আমার হাত ধরে তেতলার দিকে ছুটল। জিজ্ঞাসা করলাম—"কোথায়?"

হতাশ কণ্ঠে সে উত্তর দিল—"কোথায় আর? চলো তেতলার ছাদে! যতক্ষণ বাঁচি, চেষ্টা করতে হবে! যদি সেখানে না যায়!"

কেন যাবে না? ঐ যে দোতলার সিঁড়িতে দুপ্ দুপ্ পায়ের শব্দ!

তেতলা! যাওয়ার জায়গা নেই! আমি বললাম—"এখান থেকে লাফ দিয়ে নীচে পড়ি। ভূতের হাতে মরার চেয়ে আত্মহত্যা ভালো।"

বসন্ত বলল—"ঐ সিঁড়ির মাথার ঘরটাতে উঠি, চলো। লাফ যদি দিতে হয়, ঐ ঘর থেকে দিতে পারব, জানলা আছে।"

যখন সে ঘরে উঠলাম, তখন সিঁড়িতে একশো পায়ের শব্দ! আশ্চর্য! তবু জীর্ণ সিঁড়ি ভেঙে পড়ছে না!

ঘরের অন্ধকারে তবু কী জানি—কিসের আলো শিবলিঙ্গের উপর পড়ল! বসন্ত আর আমি একসঙ্গে সেই দেবতার পায়ে আছাড় খেয়ে পড়লাম—"মহাদেব, রক্ষা করো!"

তারপর দুজনেই অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম বোধহয়!

যখন জ্ঞান হল—তখন প্রভাতের রৌদ্র এসে পড়েছে আমাদের মাথায়। দুজনে দুজনের মুখের দিকে তাকাই। স্বপ্ন?

না, স্বপ্ন নয়! সমস্ত বাড়ি লণ্ড-ভণ্ড হয়ে গেছে—এক রাত্রে। দরজা-জানলা উপড়ানো। আমাদের খাট-বিছানা পরিখার জলে ভিজে ছপছপ করছে! সবচেয়ে সর্বনাশ, মোটরখানি চূর্ণ-বিচূর্ণ!

নীচে থেকে হাতজোড় করে শিবলিঙ্গকে প্রণাম জানিয়ে আমরা দুজনে হাত ধরাধরি করে বেরিয়ে পড়লাম বাড়ি থেকে। খুব বেঁচে গেছি!

অগ্রহায়ণ ১৩৬০

লগ্ বুকের ছেঁড়াপাতা

সঙ্কর্ষণ রায়

'আপনি এখানে ক্যাম্প করেছেন কেন?' আমার তাঁবুর সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন একজন মাঝবয়সি ভদ্রলোক, তিনি প্রশ্ন করলেন।

'এই অঞ্চলে ক্যাম্প করার মতো জায়গা এর চেয়ে ভালো তো কোথাও খুঁজে পাইনি।' আমি জবাব দিলাম, 'নির্জন ফাঁকা জায়গা, কাছাকাছি কেউ কোথাও নেই....'

'জায়গাটি কেন নির্জন, বোঝার চেষ্টা করুন। এখানে একটা কয়লাখনি ছিল, নাম পোড়াডিহি কোলিয়ারি। বছরখানেক আগে খনির মধ্যে বিস্ফোরণ হয়েছিল। বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে খনিটি জলে ডুবে যায় এবং খনির মধ্যে যারা কাজ করছিল সকলেই মারা পড়ে। তারপর কোলিয়ারি বন্ধ হয়ে যায়, কোলিয়ারির সকলেই এখান থেকে চলে যায়। আপনি পরিত্যক্ত এই কোলিয়ারির পাশে মাঠের মধ্যে ক্যাম্প করেছেন....'

'তাতে ক্ষতি কি হয়েছে জানতে পারি কি?'

'মৃতদের সঙ্গে সহাবস্থান করছেন আপনি। খনির মধ্যে যারা মরেছে তাদের একজনেরও মৃতদেহ উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।'

'মরা মানুষকে আমি ভয় পাই না!'

'খনি-নিরাপত্তা বিভাগের ডিরেক্টর হরি সিং কিন্তু পান। এই দুর্ঘটনার তদন্তের কাজে এসেছেন তিনি, অথচ এখানে ক্যাম্প করে থাকছেন না। খনির মধ্যে যারা মারা পড়েছে, তাদের মধ্যে বিশেষ একজন সম্বন্ধে তাঁর অস্বস্তি আছে।'

'কে সে?'

'এই খনিরই ম্যানেজার সুমন্ত মিত্র। হরি সিং তাঁর তদন্তের ফলে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে খনির মধ্যে দুর্ঘটনার জন্য সেই দায়ী। খনির মধ্যে দাহ্য বিস্ফোরক মিথেন গ্যাস জমে আছে জেনেও নাকি সে খনিটাকে চালু রেখেছিল। হরি সিং তাঁর রিপোর্টে এই কথা লিখেই কিন্তু ভয় পেতে শুরু করেছেন....তাঁর আশঙ্কা সুমন্ত হয়তো বেরিয়ে এসে...'

'হরি সিংয়ের মতো একজন বিজ্ঞানী ভূতে ভয় পান!' মৃদুমন্দ হাসতে হাসতে আমি বললাম, 'আমার সে ভয় নেই। হরি সিংকে গিয়ে বলুন, ভূত থাকলেও তার কিছু করার ক্ষমতা আছে বলে মনে হয় না। কিন্তু সিংজী এ-জাতীয় সিদ্ধান্তে এলেন কি করে জানতে ইচ্ছে করে। কারণ বিস্ফোরক গ্যাসে ভরা খনিতে জেনে-শুনে কাজ চালানো তো সুমন্তবাবুর পক্ষে আত্মঘাতী হওয়ার সামিল। তার মানে কি এই যে সুমন্তবাবু আত্মঘাতী হতে চেয়েছিলেন!'

'হয়তো তাই।' প্রৌঢ় ভদ্রলোক গম্ভীরমুখে বললেন, 'শুনেছি টাকা-পয়সার টানাটানি চলছিল তার। ক্ষতিপূরণ বাবদ স্ত্রীকে মোটা অঙ্কের টাকা পাইয়ে দিতে চেয়েছিল সুমন্ত। কিন্তু হরি সিংয়ের এই রিপোর্টের দরুন সুমন্তর স্ত্রী ক্ষতিপূরণ হিসেবে এক পয়সাও পাবেন কিনা সন্দেহ।'

'খুবই দুঃখের কথা।'

'অবশ্যই। কিন্তু যাক সে কথা। চলুন, গৌরাংডির ডাকবাংলোতে গিয়ে থাকবেন।'

'না আমি এখানেই থাকব। এখানে থাকতে একটুও ভয় করছে না আমার। পরেশ, তুমি ভয় পাচ্ছ না তো?' প্রশ্নটা আমি আমার ফিল্ড্ অরডার্লি পরেশ গিরিকে করি।

'না স্যার।' পরেশ গম্ভীর মুখে জবাব দিল, 'আপনি যখন ভয় পাচ্ছেন না, তখন আমি পাব কেন!'

প্রৌঢ় ভদ্রলোক চলে যাওয়ার পর পরেশ তার মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললে, 'আপনি বা আমি ভয় না পেলেও জায়গাটা কিন্তু ভয়ংকর। জলে ডুবে থাকা এতগুলো মরা মানুষের পাশাপাশি থাকা....'

'জলে ডুবে থাকা মরা মানুষরা পচে-গলে জলের সঙ্গে একাকার হয়ে গিয়েছে।' আমি বললাম, 'তাদের দরুন ভয় পাওয়ার কিছু নেই....'

জায়গাটি হল রূপনারায়ণপুর থেকে দশ কিলোমিটার দূরে গৌরাংডি। গৌরাংডির চারপাশে ছোটখাটো কয়েকটি কয়লার খনি আছে। কয়লা নয়, অন্যান্য খনিজের খোঁজে গিয়েছি আমি ওখানে। তাঁবু খাটিয়ে অস্থায়ী আবাস গড়ে তুলেছি। দিন পনেরো আমার ওখানে থাকার কথা!

খনিজের খোঁজে ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা শুরু করার আগে পরিত্যক্ত খনিটিকে পরীক্ষা করার ঝোঁক চাপল আমার। যেখানে পরেশ ও আমি তাঁবু খাটিয়েছি সেখান থেকে কয়েক পা এগিয়ে গেলে একটি ঢিবি, ঢিবির ওপাশে খনি। জং-ধরা লোহার ডেরিকের নীচে শ্যাফ্‌ট। শ্যাফ্‌টের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছিল অতলস্পর্শী গহ্বর। অন্ধকারে কিছুই দেখা না গেলেও আর্দ্রতার আভাস পাই। বুঝতে পারি, খনির ভেতরকার সুড়ঙ্গগুলি সব জলে ভরে আছে।

ওখানে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর একটু যেন অস্তিত্ব বোধ করি। নিঃশ্বাসের কষ্ট হতে থাকে, মনে হল নিঃশ্বাস নেবার মতো যথেষ্ট হাওয়া নেই।

স্পষ্ট বুঝতে পারি যে খনির মধ্যে জল ছাড়া আছে বিষাক্ত বাতাস। সরে আসি ওখান থেকে। তাড়াতাড়ি ক্যাম্পে ফিরে এসে তাঁবুর মধ্যে ঢুকে খনির বিষ এখানকার বাতাসকে দূষিত করেছে কিনা বোঝার চেষ্টা করি।

কয়লাখনির বিষাক্ত গ্যাস গন্ধ ও বর্ণহীন, কাজেই বাতাসে তার অস্বস্তি আছে কি নেই তা আমাদের শরীরের ওপরে তার প্রতিক্রিয়া দিয়ে বুঝতে হবে। খানিকক্ষণ তাঁবুর মধ্যে বসে থেকে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিই। কোনওরকম অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি না। নিঃশ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে না। কাজেই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে এই সিদ্ধান্তে আসি যে খনির বিষাক্ত গ্যাস খনির মধ্যেই সীমাবদ্ধ আছে।

ক্রমশ সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার আরো গাঢ় হয়ে ওঠে। রাত্রে আমাকে খাবার পরিবেশন করতে করতে পরেশ বললে, 'কী সাংঘাতিক অন্ধকার!'

'কৃষ্ণপক্ষের রাত, অন্ধকার তো হবেই।' আমি বললাম।

'কিন্তু এত অন্ধকার আর কোথাও হতে দেখিনি। যত অন্ধকার হওয়া উচিত তার চেয়ে বেশি অন্ধকার আকাশ থেকে নেমে এসেছে।'

'কি সব যা তা বলছ তার ঠিক নেই!'

'ঠিকই বলেছি স্যার।' পরেশ গম্ভীর মুখে বললে, 'এ ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতা আপনার চেয়ে অনেক বেশি। আজকের রাতটা বড় খারাপ....'

মাঝ রাতে পরেশের ডাকে আমার ঘুম ভেঙে যায়। ধড়মড় করে উঠে বসলাম। খাটের পাশের টুল থেকে চশমা তুলে নিয়ে চোখে এঁটে লণ্ঠনের ক্ষীণ আলোয় পরেশের ভয়ার্ত ফ্যাকাশে মুখ দেখতে পাই। এতই ভয় পেয়ে গিয়েছে সে যে তার মুখে কথা ফুটছে না।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে পরেশের কাঁধে হাত রেখে তাকে ঝাঁকানি দিতে দিতে বললাম, 'কি ব্যাপার পরেশ? কি হয়েছে তোমার?'

'সে এসেছে!' কম্পিত স্বরে পরেশ বললে।

'কে?'

'যার জন্য আরও অন্ধকার আকাশ থেকে নেমে এল...'

'কি সব যা তা বলছ তার ঠিক নেই!'

'কোলিয়ারির পাশে ঢিবির ওপরে কুয়াশা নড়েচড়ে, মনে হচ্ছে ঐ ঢিবির ওপরে দাঁড়িয়ে আছে....'

'চল দেখি....'

'না হুজুর, না!' পরেশ আর্তস্বরে বললে।

গায়ে চাদর জড়িয়ে আমি বেরিয়ে এলাম তাঁবু থেকে, পরেশের নিষেধে কর্ণপাত না করে।

তখন আকাশে আত্মপ্রকাশ করেছে কৃষ্ণপক্ষের একফালি চাঁদ। অন্ধকার ফিকে হয়ে গিয়েছে। কোলিয়ারির পাশের ঢিবিটাকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। ঢিবির ওপরে চাপ চাপ কুয়াশা ছাড়া আর কিছুই নেই। পরেশের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'কই, কুয়াশার মধ্যে কোনওরকম নড়াচড়া তো দেখতে পাচ্ছি না।'

'এখন দেখতে পাচ্ছেন না।' পরেশ বললে, 'কিন্তু একটু আগেই আমি দেখেছিলাম....'

'তার মানে আমাকে দেখেই পালিয়েছে। আমাকে দেখেই যে পালায় তাকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। যাও, তোমার তাঁবুর মধ্যে ঢুকে পড়ো, সকাল হওয়ার আগে আর বেরিও না।'

আধঘণ্টার মধ্যেই কিন্তু পরেশ তার তাঁবু থেকে বেরিয়ে আসে। আমার তাঁবুর মধ্যে ঢুকে ভয়ার্ত কণ্ঠে বললে, 'আমার তাঁবু ধরে ঝাঁকানি দিচ্ছে স্যার....'

'কে ঝাঁকানি দিচ্ছে?' আমি আবার বেরিয়ে আসি আমার তাঁবু থেকে, 'হাতে-নাতে ধরে ফেলতে পারছ না? চল দেখছি।'

ধরা-ছোঁওয়ার মধ্যে কাউকেই পাওয়া যায় না। আমি পরেশকে বললাম, 'তোমার তাঁবু ধরে কেউই ঝাঁকানি দিচ্ছে না, হয়তো বাতাসে নড়ে উঠেছে।'

'বাতাস কই যে বাতাসে নড়ে উঠবে!' পরেশ ঝাঁঝালো স্বরে বলে ওঠে।

'বাতাস না থাকলে বেঁচে আছ কি করে! সে যাই হোক, আমাকে আর বিরক্ত না করে ঘুমোতে দাও। ভয় যদি পেয়ে থাক, আমার তাঁবুতে এসে শোও।'

আমার কথার ওপরে কোনও কথা না বলে পরেশ আমার তাঁবু থেকে বেরিয়ে যায়। সে আর ফিরে এল না দেখে আমার মনে হল হয়তো সে আর ভয় পাচ্ছে না, কিংবা তাঁবুতে ঝাঁকানি দেওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

পরদিন সকালে পরেশ যথারীতি চা নিয়ে এল আমার তাঁবুতে। টুলের ওপরে চায়ের কাপের সঙ্গে একটি খাম রাখল। বন্ধ খাম, তার ওপরে খনি-নিরাপত্তা বিভাগের অধিকর্তা হরি সিংয়ের নাম লেখা আছে।

'কে দিয়ে গেল এটা?' আমি প্রশ্ন করি।

'রাতে যে এসেছিল, সে।' পরেশ গম্ভীর মুখে জবাব দিল। 'আমার তাঁবুতে অনেকক্ষণ ধরে ঝাঁকানি দেওয়ার পর ঢুকে পড়েছিল তাঁবুর মধ্যে।'

'কে সে? দেখেছ তুমি তাকে?'

'না। পা থেকে মাথা পর্যন্ত কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়েছিলাম, কম্বল সরিয়ে দেখার সাহস হয়নি আমার। ঘর থেকে সে বেরিয়ে যাওয়ার পর আমার ক্যাম্প-খাটের পাশে টুলের ওপরে এই চিঠিটাকে পড়ে থাকতে দেখলাম....'

খনি-নিরাপত্তা বিভাগের অধিকর্তাকে গৌরাংডির সরকারি বিশ্রামগৃহে পেয়ে গেলাম। পোড়াডিহি কোলিয়ারির দুর্ঘটনার তদন্ত শেষ করে তিনি তখন ধানবাদে ফিরে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছেন। চিঠিটা পড়ে তিনি উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। 'তদন্তের কাজ আবার নতুন করে শুরু করতে হবে। কিন্তু এতদিন কোথায় ছিল এই কাগজটা?'

'তা তো জানি না। আজই আমার ফিলড্ অর্ডার্লি পরেশ দিল এটা আমাকে। কিন্তু কি আছে ওতে?'

'পোড়াডিহি কোলিয়ারির ম্যানেজার সুমন্ত মিত্রের বিবৃতি। দুর্ঘটনার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে লিখেছেন তিনি। আসলে এটা কোলিয়ারির লগ্ বুকের ছেঁড়াপাতা।'

'কি লিখেছেন তিনি?'

'এই দেখুন....'

সুমন্ত মিত্র লিখেছেন ঃ কয়লার স্তরের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল একটা গ্যাস পকেট। হঠাৎ তার মধ্য থেকে মিথেন গ্যাস বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে। এই গ্যাস পকেটের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমি কিছুই জানতাম না। আমার জানার কথাও নয়, কারণ গ্যাস বেরিয়ে আসা শুরু না হওয়া পর্যন্ত সে যে আছে তা বোঝার উপায় নেই। ঠিক এখনই ব্ল্যাস্টিং শুরু হবে। শট্ ফায়ারার তার কাজ শুরু করে দিয়েছে। তাকে আটকাতে পারব না। এখান থেকে আমি চিৎকার করলেও সে শুনতে পাবে না। কাজেই সর্বনাশ আসন্ন....

এরপর আর কিছু লিখতে পারেননি সুমন্ত মিত্র, নীচে অনেক কষ্টে নিজের নাম স্বাক্ষর করেছেন।

খনি-নিরাপত্তা বিভাগের অধিকর্তা হরি সিং বললেন, 'সুমন্ত যা লিখেছেন তা যদি সত্য হয়, খনির মধ্যে আগে কখনো গ্যাস ছিল না, বিস্ফোরণের মুহূর্তেই কয়লার স্তরের লুকোনো গ্যাস পকেট থেকে মিথেন গ্যাস বেরিয়ে এসেছিল। অতএব, খনির এই দুর্ঘটনার জন্য সুমন্ত মিত্র দায়ী নন।'

খনির লগ্ বুকের ওই ছেঁড়াপাতার ভিত্তিতে নতুন করে তদন্ত হল এবং সুমন্ত মিত্র অব্যাহতি পেলেন খনির দুর্ঘটনার দায়িত্ব থেকে। এতে খুশি হলেন সুমন্তর হিতৈষী বন্ধুরা। কারণ এই দুর্ঘটনার ব্যাপারে সুমন্ত নির্দোষ প্রমাণিত হওয়াতে সুমন্তর স্ত্রীর জন্য ক্ষতিপূরণের টাকা আদায় করে নিতে অসুবিধে হবে না।

লগ্ বুকের ছেঁড়া পাতাটিকে জলে ডোবা খনি থেকে কে তুলে নিয়ে এসে পরেশকে দিল এ প্রশ্নের কোনও সন্তোষজনক জবাব অবশ্য হরি সিং পেলেন না। পরেশ তাকে চোখে দেখেনি। কোলিয়ারির পাশের ঢিবির ওপরে যখন সে দাঁড়িয়েছিল তখন কুয়াশার সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়েছিল সে। পরে যখন পরেশের তাঁবুর মধ্যে ঢুকেছিল, তখন তার দিকে তাকাবার সাহস হয়নি পরেশের। তবে সে ঢুকতেই তাঁবুর ভেতরকার বাতাস নাকি স্যাঁতসেঁতে হয়ে উঠেছিল। পরেশের ধারণা সে জলের মধ্য থেকে উঠে এসেছিল।

জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৯

আত্মা ও দুরাত্মা

ময়ূখ চৌধুরী

পৃথিবীতে অনেক সময় এমন ঘটনা ঘটে যার সঠিক অর্থ বুদ্ধি ও যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। এই ধরনের একটি কাহিনি আমি সংগ্রহ করেছি প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ থেকে। যে ভদ্রলোক এই ঘটনা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন, তিনি একজন সম্পন্ন ব্যবসায়ী। ভদ্রলোকের মাতৃভূমি ইংলন্ডে কিন্তু তাঁর ব্যবসায়ের ক্ষেত্র ছিল আফ্রিকার উগান্ডা নামক স্থানে।

ভদ্রলোকের লিখিত বিবরণী থেকে নিম্নলিখিত কাহিনিটি পরিবেশন করছি—

"আমার জমিতে কয়েকজন নিগ্রো শ্রমিক নিযুক্ত করেছিলাম। একদিন শ্রমিকদের দলপতি আমার সঙ্গে দেখা করে জানালে, গত রাত্রে তাদের দলভুক্ত একজন মজুর হঠাৎ মারা পড়েছে। নিগ্রোদের বিশ্বাস, ঘরের মধ্যে কোনও লোক মৃত্যুবরণ করলে প্রতিবেশীদের অকল্যাণ হয়। এইজন্য তারা অধিকাংশ সময়ে মুমূর্ষু রোগীকে জঙ্গলের মধ্যে রেখে আসে। রুগ্ন ব্যক্তি বনের মধ্যেই মারা যায়। মৃতদেহের সৎকার হয় না, হায়না প্রভৃতি হিংস্র শ্বাপদ তার দেহের মাংসে ক্ষুন্নিবৃত্তি করে। নির্দিষ্ট স্থানে পড়ে থাকে শুধু চর্বিত কঙ্কালের স্তূপ।

অসুস্থ মজুরটির সম্বন্ধেও তার সহকর্মীরা পূর্বোক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে চেয়েছিল কিন্তু দলের সর্দার বাধা দেওয়ায় তাদের পরিকল্পনা কার্যে পরিণত হয়নি। বিগত রাত্রে ঐ মুমূর্ষু ব্যক্তি তার কুটিরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে। মালিক এখন মৃতদেহ সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করবেন সেই কথাই জানতে এসেছে সর্দার।

সর্দারের সঙ্গে গিয়ে মৃতদেহটাকে কুটিরের ভিতর থেকে এনে আমার গাড়িতে রাখলাম, তারপর বেগে গাড়ি ছুটিয়ে দিলাম হাসপাতালের দিকে। মৃত ব্যক্তির শব-ব্যবচ্ছেদ করে তার মৃত্যুর সঠিক কারণ নির্ণয় করা দরকার। সেইজন্যই আমি হাসপাতালের দিকে যাত্রা করেছিলাম।

কুটিরের ভিতর আবছা আলো-আঁধারির মধ্যে মরা মানুষটাকে খুব ভালো করে দেখতে পাইনি। বাইরে উজ্জ্বল সূর্যালোকে তার মুখ দেখে আমি তাকে চিনতে পারলাম। মাত্র কিছুদিন আগেই লোকটি আমার কাছে মজুরের কাজ করতে এসেছিল। লোকটিকে আমি হালকা কাজ দিয়েছিলাম, কারণ কষ্টসাধ্য কাজ করার মতো উপযুক্ত শরীর তার ছিল না।

তার একটি পা ছিল ভাঙা, একটি চোখ ছিল অন্ধ এবং অজ্ঞাত কোনও দুর্ঘটনার ফলে তার মুখের ওপর থেকে লুপ্ত হয়েছিল নাসিকার অস্তিত্ব, নাকের জায়গায় দৃষ্টিগোচর হত দুটি বৃহৎ ছিদ্র!

তবে লোকটির দেহে বিকৃতি থাকলেও মানুষ হিসাবে সে খারাপ ছিল না। কাজকর্ম সে মন দিয়েই করত। কিন্তু অন্যান্য শ্রমিকরা তাকে এড়িয়ে চলত, তাদের ধারণা ছিল বিকৃত দেহের অধিকারী আগন্তুক একজন জাদুকর!

যাই হোক, সেদিন মৃত ব্যক্তির লাশটাকে হাসপাতালে জমা করে দিলাম। কর্তৃপক্ষ বললেন— কয়েকদিনের মধ্যেই তার মৃত্যুর কারণ আমায় জানিয়ে দেওয়া হবে।

হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ কথা রেখেছিলেন। দু'দিন পরেই তাঁরা আমাকে লোকটির মৃত্যুর কারণ জানিয়েছিলেন—উক্ত ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে পেটের গোলমালে! মৃত ব্যক্তির পেটের ভিতর পাওয়া গেছে কয়েকটা লম্বা লম্বা লোহার পেরেক, কাচের টুকরো এবং অনেকগুলো পাথর!....

পৃথিবীতে এত রকম খাদ্য থাকতে লোকটা কাচ, লোহা আর পাথর খেয়ে মরতে গেল কেন? খুব সম্ভব জাদুবিদ্যার অনুশীলন করার জন্যই লোকটি ঐ অখাদ্য বস্তুগুলিকে গলাধঃকরণ করেছিল।

তবে লোকটি জাদুকর হলেও খুব উচ্চশ্রেণির জাদুকর নয়; জাদুবিদ্যাকে হজম করতে পারেনি বলেই তার পেটে কাচ, লোহা আর পাথর হজম হল না!

পূর্বোক্ত ঘটনার কিছুদিন পরে আমাদের এলাকায় হানা দিলে এক অজ্ঞাত আততায়ী। প্রতি রাত্রেই এলাকার বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত ভেড়ার আস্তানাগুলোতে হানা দিয়ে অজ্ঞাত হত্যাকারী যথেচ্ছভাবে হত্যাকাণ্ড চালাতে লাগল। মৃত পশুগুলির দেহে অধিকাংশ সময়েই কোনও ক্ষতচিহ্ন থাকত না। হন্তারক শুধু ভেড়ার মাথার খুলি ভেঙে ঘিলুটা খেয়ে পালিয়ে যায়!

আমি অনুমান করলাম, এই হত্যাকাণ্ডের নায়ক একটি অতিকায় হায়না। মাংসাশী শ্বাপদগোষ্ঠীর মধ্যে ভেড়ার মাথার খুলি কামড়ে ভেঙে ফেলার মতো চোয়ালের জোর একমাত্র হায়নারই আছে। চোয়ালে অসাধারণ শক্তি থাকলেও হায়না খুব ভীরু জন্তু। তবে দুই-একটি হায়না মাঝে মাঝে দুঃসাহসের পরিচয় দেয়।

আমি ঠিক করলাম, মেষকুলের হন্তারক এই অজ্ঞাত আততায়ীকে যেমন করেই হোক বধ করতে হবে।

চেষ্টার ত্রুটি হয়নি। ফাঁদ পেতে রেখেছি। খুনি ফাঁদের ধারে-কাছেও আসেনি। বন্দুক হাতে প্রতিরাত্রে ভোরের দিকে টহল দিয়েছি; মারা তো দূরের কথা, হত্যাকারীকে চোখেও দেখতে পাইনি। অথচ প্রতিদিন সকালে খবর এসেছে, এক বা একাধিক মেষ আততায়ীর কবলে মৃত্যুবরণ করেছে। তবে চোখে না দেখলেও হন্তারক যে একটি হায়না, সেই বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ ছিল না।

কয়েকদিন পরেই একটি ঘটনায় প্রমাণ হল আমার ধারণা নির্ভুল।

আমার জন্য নির্দিষ্ট বাড়িটা তখনও তৈরি হয়নি, সবে মাত্র নির্মাণকার্য চলছিল। আমি একটা ঘাসের তৈরি কুঁড়েঘরে সাময়িকভাবে আশ্রয় নিয়েছিলাম, হঠাৎ একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি নিয়ে ঘুম ভেঙে জেগে উঠলাম। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের সংকেত অগ্রাহ্য করে আবার শয্যা আশ্রয় করব কি না ভাবছি, হঠাৎ একটা অস্পষ্ট শব্দ শুনলাম আমার বিছানার খুব কাছে! বালিশের তলা থেকে টর্চ নিয়ে জ্বেলে দিলাম। পরক্ষণেই আমার চোখের সামনে তীব্র বৈদ্যুতিক আলোর মধ্যে ভেসে উঠল একটা প্রকাণ্ড হায়নার মূর্তি!

আমি স্তম্ভিত নেত্রে দেখলাম, আমার বিছানা থেকে প্রায় এক গজ দূরে দাঁড়িয়ে আছে জন্তুটা। এত বড় হায়না ইতিপূর্বে আমার চোখে পড়েনি!

নিজের অজ্ঞাতসারেই আমার কণ্ঠ ভেদ করে নির্গত হল এক তীব্র চিৎকার-ধ্বনি। এক লাফে শয্যা ত্যাগ করে ঘরের কোণ থেকে আমি বন্দুকটা টেনে নিলাম। এমনই দুর্ভাগ্য যে, শুতে যাওয়ার আগে আমি বন্দুকে গুলি ভরতে ভুলে গিয়েছিলাম। টেবিলের ওপর একটা ছোট বাক্সে আমি টোটাগুলো রেখেছিলাম। হাত বাড়িয়ে বাক্সটা খুঁজছি এমন সময়ে হল আর এক নূতন বিপদ! সাঁ করে ছুটে গেল একটা দমকা হাওয়া আর হাওয়ার ঝটকা লেগে কুঁড়েঘরের নীচের দিকের ঝাঁপটা সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল!

(উগান্ডার যে অঞ্চলে আমি ছিলাম সেখানকার কুটিরগুলোর দরজায় কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল। মেঝের সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে উপর-নীচে লাগানো থাকত দুটি ঝাঁপ বা দরজার পাল্লা)

ঝাঁপের পাল্লাটা বন্ধ হয়ে যেতেই আমি চমকে উঠলাম।

অত্যন্ত সঙ্গীন মুহূর্ত—পালানোর পথ বন্ধ দেখে হায়নাটা হয়তো আমাকে এখনই আক্রমণ করবে। ঝাঁপের নীচের অংশটা সে এক লাফে টপকে যেতে পারে বটে, কিন্তু পলায়নের ঐ সহজ পন্থা তার মগজে ঢুকবে কিনা সন্দেহ। বুনো জানোয়ার যদি নিজেকে কোণঠাসা মনে করে তাহলে সে সামনে যাকে পায় তার উপরই ঝাঁপিয়ে পড়ে।

জন্তুটার বিরাট দেহের দিকে তাকালাম। সত্যি, এটা একটা অতিকায় হায়না। যদি এক গুলিতে ওকে শুইয়ে দিতে না পারি তবে বন্ধ ঘরের মধ্যে হায়নার আক্রমণে আমার মৃত্যু সুনিশ্চিত। খুব সাবধানে যতদূর সম্ভব নিঃশব্দে আমি বন্দুকে গুলি ভরতে লাগলাম।

হঠাৎ বন্ধ ঘরের মধ্যে হল আর এক চতুষ্পদের আবির্ভাব! আমার বুল-টেরিয়ার 'স্যাম' বোধহয় দরজার কাছেই ছিল। নীচের দিকের ঝাঁপটা একলাফে ডিঙিয়ে এসে সে হায়নাটাকে আক্রমণ করলে!

স্যাম সাহসী কুকুর, কিন্তু সে বোকা নয়।

হায়নার ভয়ংকর দাঁত আর কঠিন চোয়াল সম্বন্ধে সে যথেষ্ট সচেতন—চারপাশে ঘুরে ঘুরে আক্রমণ চালিয়ে শত্রুকে সে বিব্রত করে তুলল কিন্তু হায়নার ঘাড়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সে নিজের জীবন বিপন্ন করলে না।

হায়নার দংশন অতি ভয়ংকর। এক কামড়েই সে স্যামের মাথার খুলি ভেঙে দিতে পারে। বুদ্ধিমান কুকুর তাকে সেই সুযোগ দিলে না।

ইতিমধ্যে নিজেকে সামলে নিয়ে এক লাথি মেরে দরজার নীচের অংশটা আমি খুলে দিলাম। তৎক্ষণাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে হায়নাটা দূরের ঝোপ লক্ষ করে তীর বেগে ছুটল।

আমি ততক্ষণে বন্দুকে গুলি ভরে ফেলেছি।

জন্তুটাকে লক্ষ করে গুলি ছুঁড়লাম। নিশানা ব্যর্থ হল। হায়নার ধাবমান দেহ অদৃশ্য হয়ে গেল অন্ধকার অরণ্যের অন্তরালে।

বেশ কয়েকটা দিন কাটল নির্বিবাদে। আমরা ভাবলাম খুনি বোধহয় আর আমাদের বিরক্ত করবে না। কিন্তু কয়েকদিন পরেই আবার হত্যাকাণ্ড শুরু হল।

প্রতি রাত্রেই একটি কি দুটি ভেড়া হায়নার কবলে মারা পড়তে লাগল। আমার জেদ চেপে গেল—জন্তুটাকে মারতেই হবে।

প্রতিদিন শেষ রাতে ভোর হবার একটু আগে আমি সমস্ত অঞ্চলটায় টহল দিতে শুরু করলাম। পর পর আটটি রাত কাটল, অবশেষে নবম রাত্রে আমার চেষ্টা সফল হল। একটু দূরে অবস্থিত উঁচু জমির তলায় ঝোপের ভিতর একটা কালো ছায়া যেন সাঁৎ করে সরে গেল। হয়তো চোখের ভুল! তবু তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমি পর্যবেক্ষণ করতে লাগলাম। না, ভুল হয়নি। হঠাৎ ঝোপের উপর উঁচু জমির উপর আত্মপ্রকাশ করলে একটা চতুষ্পদ পশু!

নীলাভ কৃষ্ণ আকাশের পটভূমিকায় উচ্চভূমির উপর দণ্ডায়মান হায়নার দেহটা খুব স্পষ্ট হয়ে উঠল আমার দৃষ্টিপথে। লক্ষ্য স্থির করে গুলি ছুঁড়লাম। গুলি লাগল হায়নার পেটে। দারুণ যাতনায় অস্থির হয়ে জন্তুটা নিজের উদরে দংশন করতে লাগল! আবার অগ্নিবৃষ্টি করলে আমার বন্দুক, হায়নার মৃতদেহ উপর থেকে আছড়ে পড়ল নীচের জমিতে, গুলি এইবার জন্তুটার মস্তিষ্ক ভেদ করেছে।

মৃত হায়নার কাছে এসে তাকে লক্ষ করতে লাগলাম। বিরাট জানোয়ার। জন্তুটার দেহে কিছু খুঁত আছে—তার পিছনের একটি পা ভাঙা, অজ্ঞাত কোনও দুর্ঘটনার ফলে তার একটি চক্ষু হয়েছে অন্ধ এবং নাসিকার কিছু অংশ লুপ্ত হয়ে গেছে মুখের ওপর থেকে!

বিদ্যুৎচমকের মতো আমার মনে একটা সন্দেহের ছায়া উঁকি মারল, মুহূর্তের জন্য আমার মানসপটে ভেসে উঠল একটি মৃত মানুষের প্রতিমূর্তি—

কিছুদিন আগে যে নিগ্রো মজুরটি মারা গেছে তার সঙ্গে এই জন্তুটার অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে। পূর্বোক্ত মানুষটিরও ছিল একটি পা ভাঙা, একটি চোখ অন্ধ এবং ভূমিশয্যায় শায়িত এই মৃত হায়নার মতো তার মুখের উপরও ছিল না নাসিকার অস্তিত্ব!

আমার সর্বদেহের ভিতর দিয়ে ছুটে গেল আতঙ্কের শীতল স্রোত! পরক্ষণেই নিজের মনকে শাসন করলাম।

বিকৃত দেহ মানুষ যদি থাকতে পারে তবে তার মতো একটা হায়নাই বা থাকবে না কেন? দৈহিক সাদৃশ্যটা নিতান্তই ঘটনাচক্রের যোগাযোগ।

আমি আস্তানায় ফিরে এসে কয়েকজন শ্রমিককে হত্যাকারীর মৃত্যুসংবাদ দিলাম। তারা উৎফুল্ল হয়ে উঠল। আমি জন্তুটাকে মাটির নীচে কবর দিতে বললাম।

হায়নার চামড়া কোনও কাজে লাগে না।

পরের দিন সন্ধ্যাবেলা আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে মজুরদের সর্দার। তার বক্তব্য হচ্ছে হায়নার পেট চিরে তারা কয়েকটা জিনিস পেয়েছে এবং ঐ জিনিসগুলো সে আমাকে দেখাতে চায়।

সর্দার দু'খানা হাত মেলে ধরলে আমার চোখের সামনে।

আমি চমকে উঠলাম—সর্দারের প্রসারিত দুই করতলের উপর রয়েছে কয়েকটি লোহার পেরেক, কিছু কাচের টুকরো এবং কয়েকটা পাথর!

'বাওয়ানা,' সর্দার বললে, 'এই জিনিসগুলো হায়নার পেটের ভিতর পাওয়া গেছে।'

আমি কথা বলতে পারলাম না, অনুভব করলাম আমার ঘাড়ের চুল খাড়া হয়ে উঠেছে কাঁটার মতো!

—সবই কি ঘটনাচক্র? একটি পা ভাঙা, একটি চোখ অন্ধ, মুখের উপর ছিন্ন নাসিকার অংশ, সব কিছুই কি শুধু ঘটনাচক্রের যোগাযোগ? অবশেষে এই পাথর, কাচ আর লোহার পেরেক?

মৃত মানুষটা কেন ঐ সব বস্তু খেয়েছিল জানি না, কিন্তু এই সৃষ্টিছাড়া হায়নাটাও বিশেষ করে ঐ অখাদ্য বস্তুগুলিকে উদরস্থ করল কেন?

আমি এই ঘটনার কোনও সঠিক ব্যাখ্যা করতে পারিনি। তবে আফ্রিকাবাসীর বিশ্বাস-অবিশ্বাসকে এখন আর অশিক্ষিত মানুষের কুসংস্কার বলে অবজ্ঞা করতে পারি না।"

কাহিনির লেখক কোনও সিদ্ধান্তে আসতে পারেননি। তিনি এখানেই সমাপ্তির রেখা টেনে দিয়েছেন।

আফ্রিকার অরণ্যসংকুল প্রদেশে দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে যে সব শ্বেতাঙ্গ পর্যটক ও শিকারি ঘুরে বেড়িয়েছেন তাঁদের লিখিত রোজনামচায় অনেক অদ্ভুত ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায়। বিস্তীর্ণ আফ্রিকার বুকের উপর ঘুমিয়ে আছে এক রহস্যময় জগৎ—

সভ্য পৃথিবীর অধিবাসীরা আজও সেই জাদুপুরীর দরজা খুলতে পারেনি।

ফাল্গুন ১৩৮০

যাদের দেখা যায় না

আশা দেবী

ডুয়ার্সে চাকরি নিয়ে গিয়েছি। আপাতত একাকী। নতুন জায়গা; এর হালচাল সম্পূর্ণ না জেনে সপরিবারে যাওয়ার বিঘ্ন আছে—তাই একা এসেছি।

চাকরিটা কি করে পেলাম? বন্ধু গৌতমের যত্ন ও চেষ্টায়। সে-ই এটা আমাকে জুটিয়ে দিয়েছে। তাই তার ওপর আমার কৃতজ্ঞতার আর শেষ নেই। কিন্তু চাকরিটা জুটিয়ে দিয়ে সে গেল কোথায়? আজ দু'মাসেরও বেশি কাজে জয়েন করেছি, বহু খুঁজেছি কিন্তু গৌতমের কোনো খোঁজ পাইনি। কেউ কোনো খোঁজ দিতেও পারেনি। আশ্চর্য! ও কি তবে অন্য কোথাও ভালো কাজ পেয়েচলে গেল?

নিঃসঙ্গ আমি। বই-ই আমার সঙ্গী। বই না পড়লে আমার রাতে ঘুম আসে না।

সেদিন একটা বই পড়ছিলাম ইজিচেয়ারে শুয়ে শুয়ে। ঠান্ডা কনকনে রাত। দূরে ডুয়ার্সের ঘন অরণ্য জমাট বেঁধে যেন কালো ক্রেয়নে আঁকা ছবির মতো দেখাচ্ছে। স্টেশনের ক্ষীণ আলো কুয়াশার চাদর মুড়ি দিয়ে কেমন দপদপ করতে লাগল। উড়ে গেল একা নিশাচর পাখি বিশ্রী আওয়াজ করে।

টেবিলের জ্বলন্ত লণ্ঠনটা দপদপ করে খানিক কালি তুলে হঠাৎই নিভে গেল। ঘরটা ভরে গেল পোড়া কেরোসিনের গন্ধে আর ঘনীভূত অন্ধকারে। সঙ্গে সঙ্গে উত্তরের এক ঝলক হিমেল হাওয়া পাগলের মতো আছড়ে পড়ে ঘরের দরজা-জানালাগুলো সব ক্ষিপ্ত হাতে খুলে দিল।

চমকে উঠে আমি মাথার তলায় রাখা দেশলাইটা খুঁজতে লাগলাম আঁতিপাতি করে।

পেছন থেকে কে বললে ঃ এই নে দেশলাই—হয়তো ড্যাম্প লেগেছে, জ্বলবে না। তবে চেষ্টা করে দেখতে দোষ কী?

গৌতম? তুই?—আমি অবাক হয়ে গেলাম।

হ্যাঁরে বিমল। দেখতে এলাম তোকে।

এই রাতদুপুরে? তোমার আর আসবার সময় হল না!

না! আমার সময় বড় কম। তোর কাছে আমি কিছু বলব। কথাগুলো খুবই জরুরি। আমার সঙ্গে একটু আসতে হবে বাইরে।

আমি খুশি হয়ে বললাম ঃ এটা আর বেশি কথা কি! চল কোথায় যেতে হবে। এ চাকরিটাও তো তোর জন্যই পেয়েছি। তুই আমার কত উপকারী বন্ধু। তার ওপর ছোটবেলার খেলার সাথী—যাব নিশ্চয়ই, দাঁড়া! গায়ে একটা চাদর দিয়ে নিই। বাইরে ঠান্ডা।

বাইরে বেরিয়ে আমরা পাশাপাশি হাঁটতে লাগলাম। কিন্তু গৌতম কেন যেন একটু দূরে দূরে আমাদের মধ্যে একটা তফাৎ বাঁচিয়ে চলতে লাগল।

হঠাৎ লক্ষ পড়ল গৌতমের গা খালি! ঠান্ডার মধ্যে খালি গায়ে গৌতম হাঁটছে কি করে!

আমি ব্যস্ত হয়ে উঠলাম, একি তোর গায়ে যে কিছু নেই? তোর শীত লাগছে না? নে আমার এই চাদরটা।

গৌতম কিছু না বলে আমার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ, তারপর বলল ঃ আমার শীত লাগে না। ওটা তুই রাখ।

তার দৃষ্টিতে কী ছিল জানি না। আমি যেন কেমন হতবাক হয়ে গেলাম। কিছু যে বলব তাও পারলাম না। চুপ করেই চলতে লাগলাম। রাতের ঘন অন্ধকারে গৌতমকে ভালো করে দেখা যাচ্ছিল না। অনুমানে বুঝছিলাম সে আমার সঙ্গেই আছে।

খানিকটা দূরে দুটো পাশাপাশি পাথর রাস্তার ওপরই পড়ে ছিল। গৌতম নিজে একটার ওপর বসে অন্যটা আঙুল দিয়ে আমাকে দেখিয়ে দিয়ে বললে ঃ বস, দরকারি কথাটা আজ সেরেই নি। তুই কিন্তু কোনো প্রশ্ন না করে সব কথা শুনে যাবি আগে। হ্যাঁ-হুঁ করবারও দরকার নেই, তারপর বন্ধুর জন্যে যা পারিস করবি।

আমি বললাম, বেশ, বল কি বলবি?

গৌতম শুরু করল। আমি একটা ব্যবসায়ী ফার্মে চাকরি করতাম। ওরা আমাকে অনেক টাকা মাইনে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিছুদিন কাজ করবার পর আমি বুঝতে পারি ওরা সৎভাবে টাকা রোজগার করে না। বরং খুবই অসৎ পথ বেছে নিয়েছে টাকা করবার জন্যে। আমার এ ব্যাপারটা একেবারে পছন্দ নয়। এটা ওরা বুঝতে পেরে আমাকে তাদের টাকার একটা মোটা অংশ দিয়ে আমার মুখ বন্ধ করে দিতে চায়। কিন্তু আমি ওদের ওই পাপের টাকা একেবারেই নিতে চাইনি। বরং আমাকে এ সব টাকার অংশ দিতে চাইলে আমি চাকরি ছেড়ে দেব বলি, তখন ব্যাপারটা আরো ঘোরালো হয়ে ওঠে। ওরা আমাকে নজরবন্দী করে ঘরে আটকে রাখে।

একদিন আমি গভীর রাতে পালাবার চেষ্টা করে ধরা পড়ে যাই। খুবই ভয় পেয়েছিলাম ওরা বুঝি আমাকে মারধোর করবে। কিন্তু কিছুই করল না দেখে অবাক হয়েছিলাম। তবে ওদের চালচলন, চোখ-মুখের চাহনি দেখেও বুঝতে পারছিলাম আমার জন্যে আরো ভয়ঙ্কর কিছু অপেক্ষা করে আছে—

আমি রুদ্ধশ্বাসে গৌতমের কথা শুনছিলাম। আর শুনছিল নিথর আকাশ—নিশুতি রাত—আর ঘুমন্ত বন। মাঝে মাঝে রাতচরা পাখির আওয়াজ আর বাতাসে ঝাউবনের শনশন শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা যাচ্ছিল না। পাশে তাকিয়ে দেখলাম গৌতম বেশ দূরেই বসেছে। কেন? আমার কাছে এসে বসলে কী দোষ হত! আমি কথা বলতে যাব, ঠিক তখনই গৌতম বুক ভরে নিঃশ্বাস নিয়ে ক্লান্ত ধরা গলায় আবার বলতে শুরু করল ঃ ওরা আজ হঠাৎ আমাকে বলল, অনেকদিন ঘরে বন্দী আছ, চল, আজকে একটু বেড়িয়ে আসবে।

ঘুমন্ত আমাকে শীতের রাতে ঘুম ভাঙিয়ে তুলে বেড়াতে নিয়ে যেতে চাওয়ায় আমি ভয়ে চমকে উঠেছিলাম। কিন্তু সে ভাব প্রকাশ না করে খুব ঠান্ডা গলায় বলেছিলাম ঃ এত রাতে বেড়াতে যাওয়া, থাক না আজ। অন্য আর একদিন যাওয়া যাবে।

কিন্তু ওরা আমাকে ছাড়েনি। জোর করে গাড়িতে তুলেছিল। তারপর গাড়ি ছুটিয়েছিল জঙ্গলের পথে। গভীর ঘন পাহাড়-জঙ্গল পেরিয়ে ওরা একটা ছোট জলার ধারে এসে থেমেছিল। সেখানে আমাকে ওরা শাসাতে লাগল, চুরির টাকার ভাগ নিতে হবে, তা না হলে ওখানেই আমাকে ওরা শেষ করে দেবে।

তুমি তো জান বিমল, আমি মার একমাত্র ছেলে। মার কাছে কখনও কোনো অন্যায় করবার শিক্ষা পাইনি। চুরি করা টাকা আমি কেমন করে মার হাতে তুলে দেব! তার চেয়ে তো আমার....

আমার দ্বিধা দেখে ওরা বুঝে নিল আমি আর যাই হই চোর নই। তারপর আমাকে ওরা খুন করে ওই জঙ্গলে ফেলে দিয়ে গেল।

এতক্ষণ আমি স্তম্ভিত হয়ে গল্প শুনছিলাম। এবার চমকে উঠলাম। তবে যার সঙ্গে আমি এতদূর এলাম সে কি আমার বাল্যবন্ধু গৌতম নয়! তার প্রেতাত্মা। সমস্ত শরীর আমার হিম হয়ে গেল। এত শীতেও ঘেমে উঠলাম।

গৌতম আমার অবস্থা বুঝতে পেরে বলল, ভয় পাস না। তোর তো আমি কোনো ক্ষতি করব না। আমি তোর সাহায্য চাই। করবি?

বল?—আমি সাহসে ভর করে বললাম।

আমি আমার মার কাছে যেতে পারব না। কারণ মা যদি বুঝতে পারেন আমি নেই, তাহলে আর বাঁচবেন না। তিনি আজ ক'দিন থেকেই মনে মনে কী যেন বুঝে ঘরে শুয়ে শুয়ে কাঁদছেন। তুই গিয়ে আমার নাম করে এই টাকা ক'টা ওঁর হাতে দিবি। বলবি ঃ গৌতম দিয়েছে। আর কিছু বলবি না।

আর ওই পাথরের পাশে আমার শবটা পড়ে আছে, ওটার সন্ধান আর ওই বদমাশগুলোর সব কথা পুলিশের কাছে গিয়ে বলে দিবি। ওদের সাবধান করে দিবি ওরা যেন কোনোমতে তোর নামটা প্রকাশ না করে। আমার শবের পাশে আমার মানিব্যাগটা পড়ে আছে, ওটা ভাই তুলে নে। ওতেই সবকিছু পাবি।

হিম ঠান্ডা বাতাসের সঙ্গে ভোরের আলোর জোয়ারে মিশে গেল গৌতম। আর ওকে দেখা গেল না।

পৌষ ১৩৯৩

টোকোনের বন্ধু

শিশিরকুমার মজুমদার

সব হিসেব গোলমাল হয়ে গেল চাঁদরার ঘোষবাবুর জন্য, কাজ মেটাতে তিনি রাত করে ফেললেন। শীতের রাত, তার উপরে চারদিকে ঘন কুয়াশায় ছাওয়া, কাঁপতে কাঁপতে স্টেশনে এসেই ট্রেন পেয়ে গেলেন ব্রজবাবু। একখানা কুলতলির টিকিট কেটে আরাম করে চাদর মুড়ি দিয়ে ট্রেনের কামরার এক কোণে বসে পড়লেন।

চাঁদরা থেকে কুলতলি বেশ কিছুক্ষণের পথ। মনে মনে হিসাব কষে একটু অস্বস্তিতেই পড়লেন ব্রজবাবু। কুলতলিতে নতুন বাড়ি করে এসেছে ওঁর মেয়ে-জামাই। চিঠি লিখে এদিনের কথা আগেই জানিয়ে দিয়েছেন ব্রজবাবু। বিকাল নাগাদ ওখানে পৌঁছে, রাতটা আজ ওখানেই থাকবেন। ঝুলিতে এই নাতির জন্য কেনা ক'খানা নতুন অ্যাডভেঞ্চারের বই। কিন্তু চাঁদরার ঘোষবাবুই সব গোলমাল করে দিলেন। এখন জামাই-মেয়ে নিশ্চয়ই দেরি দেখে চিন্তায় পড়বে। কি আর করা, গাড়ি ছাড়তেই চোখ বুজলেন ব্রজবাবু। ঠিক ইচ্ছায় নয়, শীতের রাতের আমেজও ছিল কিছুটা।

এক চটকায় ঘুম ভাঙতে দেখলেন গোটা কামরা খালি, একা উনিই যাত্রী! কতক্ষণ যে কেটে গেছে ট্রেনে, কোথায় যে এসেছেন, সব হিসাব ওঁর গোলমাল হয়ে গেল। ঘড়িতে দেখলেন, ঘণ্টা দুই এর মধ্যে কেটে গিয়েছে। সর্বনাশ, তার মানে তো কুলতলি পিছনে ফেলে এসেছেন তিনি!

পরের স্টেশনে গাড়ি থামতেই তাড়াতাড়ি নেমে পড়লেন তিনি। কোথাও কেউ নেই। অত রাতে অজ পাড়াগাঁয়ে এই ঠান্ডায় যাত্রী আসবে কোথা থেকে! কিন্তু কোথায় নামলেন তিনি? ভালো করে এদিক-ওদিক দেখে খুশিই হলেন, না, যেখানে নেমেছেন, সেটাই কুলতলি, ওই তো স্টেশনের শেষে বিশাল বটগাছটা, তার নীচে বেঞ্চ পাতা। কতবার ট্রেন ধরতে এসে ওটাতে বসেছেন উনি। নিশ্চিন্ত মনেই স্টেশনের বাইরে এলেন তিনি। কোনো সন্দেহ নেই, ঠিক জায়গাতেই নেমেছেন তিনি। তবে হ্যাঁ, আগে রাস্তার বাঁদিকে ক'টা কাঁচা দোকান ছিল চায়ের। তার পাশে রিক্সাগুলো দাঁড়াত। এখন সেখানে পাকা দোকান। এত রাতে তালা বন্ধ। আর রিক্সাগুলোও ওখানে নেই। বছর কতক আগে শেষবার কুলতলি এসেছিলেন উনি। বছরখানেকে এই সামান্য পরিবর্তনটা কি আর হবে না!

নিশ্চিন্ত মনেই এগোলেন উনি। বেশ কিছুটা এগিয়েই সামনে রেল-পোল। লুপ লাইনটা এখান দিয়েই গেছে। মেল ট্রেনগুলো সোজা এরই উপর দিয়ে যায়। এরপর ক'খানা পাকা দালান, তারপর ক্ষেত জমি। তারপর দুটো মান্ধাতার আমলের বিশাল দীঘি। তা ছাড়ালেই ভাঙা শিবমন্দির। তারপরেই সরকারি কলোনি। তার দু'নম্বর গলিতেই ওঁর মেয়ের বাড়ি।

স্টেশনে রিক্সা না পেয়ে জোর কদমে হাঁটতে থাকলেন ব্রজবাবু।

রাত অনেক হয়েছে। মেয়ে-জামাইয়ের যথেষ্ট চিন্তার কারণ এরই মধ্যে হয়েছেন উনি। তবে থাক, সব ভালো যার শেষ ভালো। নানান কথা ভাবতে ভাবতে ঘোর কুয়াশা ভেদ করে সামনে এগিয়েই থমকে দাঁড়ালেন ব্রজবাবু। একি! সামনে আবার রেল-পোল কেন? এই তো কিছুক্ষণ আগেই ওটা উনি পেছনে ফেলে এসেছেন! তাহলে এ কোথায় এলেন উনি? রাস্তা জনশূন্য। আশেপাশে বাড়ি নেই। কাউকে যে কিছু জিগ্যেস করবেন, সে উপায়ও নেই। একটা ব্যাপার পরিষ্কার ওঁর কাছে। ট্রেনে ঝিমুনি আসাতে কোথায় নামতে কোথায় এসে পড়েছেন উনি। বোকার মতো বটগাছ চিহ্ন দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে ফের বেকায়দায় পড়েছেন উনি। এখন আবার ফিরে গিয়ে ট্রেন ধরতে হবে। কপালে অশেষ দুর্ভোগ না থাকলে এমন হয়! ফিরতেই যাচ্ছিলেন উনি...., ঠিক তখনি সামনের ঘন কুয়াশার মাঝ থেকে একটা অবাক করা গলার স্বর ভেসে এল, এ কি দাদু, আপনি এখানে এত রাতে! কোথায় গেছিলেন, যাবেন কোথায়?

গলাটা বড় চেনা চেনা মনে হল ব্রজবাবুর। কিন্তু বুঝতেই পারলেন না এখানে এভাবে এত রাতে চেনাজানা কে ওঁর আসতে পারে! তাও ছেলেমানুষ!

কুয়াশা ভেদ করে ছেলেটা ওঁর সামনে এসে দাঁড়াল। নেহাতই বাচ্চা ছেলে, পরনে হাফ প্যান্ট, হাফ হাতা শার্ট। একটা গরম জামাও গায়ে নেই। তবে দেখলেই বোঝা যায় ভদ্রঘরের ছেলে। অন্ধকারে মুখটা ওর যতটা দেখতে পেলেন ব্রজবাবু, বড়ই চেনা চেনা বলে মনে হল। কিন্তু....!

ছেলেটা মুচকি হেসে বলল, দাদু আমাকে চিনতে পারেননি তো?

ব্রজবাবু হ্যাঁ, না, কিছু বলার আগেই ও বলল, আমি তো টোকোনের বন্ধু, বাপ্পন আমার নাম, এক ক্লাসে পড়তাম, পাশের বাড়িতে থাকতাম।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে ব্রজবাবু বললেন, ও হো হো, মনে পড়েছে, মনে পড়েছে। তোমার বাবা না ব্যাঙ্কে কাজ করেন?

হ্যাঁ ঠিক বলেছেন। বলল ছেলেটা।

তা তুমি এখানে এত রাতে কি করছ? অবাক ব্রজবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, আজ ঠান্ডাও পড়েছে বেশ, গায়ে তো কিছুই দাওনি দেখছি!

বাপ্পন অন্ধকারে হাসল, বলল, আমার কথা থাক দাদু, আপনি তো রাস্তা হারিয়েছেন। টোকোনরা তো থাকে কুলতলি। এ তো তার আগের স্টেশন মান্দারহাট। কোথায় নামতে আপনি কোথায় নেমে পড়েছেন।

ব্যস্ত হয়ে ব্রজবাবু বললেন, তাই তো, তাহলে ফিরে গিয়ে স্টেশনে ট্রেন ধরি। আজ আমাকে কুলতলি যেতেই হবে।

বাপ্পন বলল, এখন যে ট্রেন পাবেন দাদু তা মান্দারহাটে থামলেও কুলতলিতে থামবে না। সে ট্রেন আবার সেই সকালে।

পথের মাঝে থমকে ব্রজবাবু বললেন, তাহলে উপায়?

এগারোটা বাহান্নয় শেষ ট্রেন মান্দারহাটে, ওটা সোজা কলকাতায় যায়। ওটাতেই কি ফিরে যাবেন?

না বাবা, না, চিঠি লিখে ওদের জানিয়েছি আজ আসব। এখন না গেলে সারা রাত চিন্তায় ছটফট করবে। তার চেয়ে তুমি আমাকে একটা রিক্সা ডেকে দাও, চলে যাই। বরাতে খরচা ছিল, হবে।

এত রাতে কোনো রিক্সা ওদিকে যেতে চাইবে না।

ভীষণ হতাশ হয়ে ব্রজবাবু ফের বললেন, তা হলে উপায়?

ছেলেটা আবার কুয়াশায় হারিয়ে গেল। কুয়াশার ভিতর থেকেই বলল, হাঁটতে হবে দাদু, দেড় মাইল পথ। মাঠের মাঝ দিয়ে আল ধরে। না, না, চিন্তা করবেন না, শীতকালে ওপথেই বেশি লোক চলে দিনে। তবে আমি যদি সঙ্গে থাকি তো রাতেই বা কি ভয়! চলুন আমার সঙ্গে, আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

মনে নানান প্রশ্ন জাগল ব্রজবাবুর। থাকতে না পেরে বললেন, সে কি, এত রাতে তুমি আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে, তোমার বাবা, মা....

বাপ্পন বাধা দিয়ে বলল, ও নিয়ে ভাববেন না। ওঁরা আজকাল এখানেই থাকেন না। বদলি নিয়ে অন্য জায়গায় চলে গেছেন। আমি এখন একা থাকি এখানে। একদম একা। শেষ কথাগুলো ওর কেমন যেন দুঃখে ভরা!

না, মানে তোমরা থাকতে কোথায়? অবাক ব্রজবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা না টোকোনদের বাড়ির পাশে থাকতে কুলতলিতে?

হ্যাঁ, থাকতাম তো। ঠিক পাশের বাড়িতে। সে বাড়ি তো ভাড়া বাড়ি ছিল। দু'বছর আগে বাবা এখানে এই মান্দারহাটে বাড়ি করেছিলেন। সেই থেকেই আমি এখানে।

ও, তাই বল, বললেন ব্রজবাবু, তা বাবা, মা না থাক, গার্জেন তো কেউ আছেন? চল আমি নয় তাঁর কাছ থেকে তোমাকে সঙ্গে নেবার পারমিশনটা নিয়ে নিই। আজ রাতে না হয় কুলতলিতেই থেকে যাবে।

বাপ্পন বলল, খুব মজা হত তাহলে, কিন্তু দাদু ওসব আর হবার নয়। তার চে আপনি ওই ডানদিকের পায়ে চলা পথটা ধরুন তো, রোজ আমি স্কুলে যেতাম ওই পথটা দিয়ে। এমনিতে যেতে বেশ। কিন্তু বর্ষাকালে কাদায় কাদায় চারদিক পিছল, আর প্যাচপ্যাচে হয়ে পড়ে, তাছাড়া তখন এদিকের ধান-জমি সব জলের তলায় চলে যায়। সাপের ভয় থাকে খুব। এখন শীতকালে কোনো ভয় নেই। চলুন আপনি, আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

মনটা বেশ খুঁতখুঁত করতে থাকল ব্রজবাবুর। ছেলেটার কথাবার্তা যেন কেমন! এত রাতে অতটুকু ছেলে একা যাবে....কিন্তু কি আর করবেন উনি? নিরুপায় হয়ে ওর কথামতোই হাঁটতে আরম্ভ করলেন। মনে মনে ঠিক করলেন, এত রাতে আর ওকে একা ফেরত পাঠাবেন না। ধরে রাখবেন কুলতলিতে। এসব ভেবে মনে যেন উনি একটু স্বস্তি পেলেন। ভাগ্যিস ছেলেটা এসেছে এই শীতে সাহায্য করতে, তা না হলে তো...., আর ভাবতেই পারলেন না ব্রজবাবু।

হাঁটতে হাঁটতে প্রশ্ন করলেন, তুমি তো টোকোনের সঙ্গে একই ক্লাসে পড়। না?

হ্যাঁ, পড়তাম।

পড়তাম কেন? অবাক ব্রজবাবু জিজ্ঞাসা করলেন।

উত্তরে বাপ্পন বলল, দাদু, দাদু, আপনি অত বাঁ দিকে যাবেন না। ওদিকে একটা চোরা গর্ত আছে, খুব গভীর। আমিও আগে জানতাম না, বিপদ তো সেজন্যই ঘটেছিল।

এসব কথা ব্রজবাবুর কানে ঠিক গেল না। ডানদিকে সরে এসে উনি আবার ওঁর প্রশ্নের জের টানলেন, পড়াশুনা ছেড়ে দিয়েছ নাকি? হাতের কাজ-টাজ শেখ! কি কর আজকাল?

ছেলেটা কোনো উত্তর দিল না। সঙ্গে সঙ্গে একটা কথা মনে হল ব্রজবাবুর, তবে কি এ ছেলে বয়ে গেছে! না, না, তা-ই বা হয় কি করে, ও তো টোকোনের বন্ধু, বয়স বড়জোর দশ কি বারো। ও বয়স তো বয়ে যাওয়ার নয়। তবে? ব্রজবাবু থাকতে না পেরে ফের জিজ্ঞাসা করলেন, ও কি হে? কি হল তোমার, কথা বলছ না যে!

থেকে থেকে ঘন কুয়াশায় ঢেকে যাচ্ছিল চারদিক। কখনও ছেলেটাকে দেখা যাচ্ছিল, কখনও ও হারিয়ে যাচ্ছিল। তেমনি কুয়াশায় ও তখন হারিয়ে গেছে। উত্তর না পেয়ে বেশ অস্বস্তিতে পড়লেন ব্রজবাবু। চাপা গলায় ডাক দিলেন, বাপ্পন, কোথায় গেলে তুমি?

কুয়াশার মাঝ থেকে বাপ্পন উত্তর দিল, ঠিক চলেছেন দাদু। চিন্তা করবেন না। আর কিছুটা এগোলেই পাকা পথ, ওখানে পৌঁছালে সোজা কুলতলি। আর আধঘণ্টায় পৌঁছে যাব।

খুশি হয়ে ব্রজবাবু বললেন, হ্যাঁ, কি বলছিলাম যেন, ওঃ তোমার পড়াশুনার কথা। ব্রজবাবু কথা শেষ করতে পারলেন না।

কুয়াশার মাঝ থেকেই বাপ্পন বলল, জানেন দাদু, আমি না পড়াশুনায় খুব ভালো ছিলাম। টোকোনের সঙ্গে খুব ভাব ছিল আমার। বাবা ব্যাঙ্ক থেকে ধার নিয়ে এই মান্দারহাটে বাড়ি করলেন। এখানেও ভালো স্কুল আছে। আমি বললাম, নতুন স্কুলে আমি কিছুতেই পড়ব না। বাবা বললেন, দেড় মাইল পথ রোজ যাবি কি করে? আমি বললাম, হেঁটে যাব-আসব। আমার কষ্ট হবে না। আমি আমার পুরোনো বন্ধুদের ছাড়তে পারব না। বাবা ভীষণ রাগ করলেন, বললেন, যা ইচ্ছা তাই কর। ব্যস, আর আমাকে বদলি নিতে হল না। আমরা নতুন বাড়িতে উঠে এলাম। তখনও বৃষ্টি নামেনি। শুকনো মাঠঘাট। হেঁটে স্কুলে যেতে-আসতে আমার মন্দ লাগত না। তারপর যখন এই সিধে রাস্তাটার খোঁজ পেলাম তখন আর আমাকে দেখে কে! তারপর নামল বৃষ্টি! ভীষণ বৃষ্টি! দেখতে দেখতে চারদিকে জল জমে গেল। মাঠে যে সব লোক কাজ করত, তারা আমাকে বলল, খোকা, আর এ পথে আসা-যাওয়া কর না। ঘুরপথেই যেও। আমি সে কথা শুনব কেন, এ পথে মাত্র আধঘণ্টা সময় লাগে, আর ও পথে....

ব্রজবাবু বাধা দিয়ে বললেন, আমরাও তো সে পথেই যাচ্ছি, তাহলে তো কিছুক্ষণেই কুলতলি পৌঁছে যাব?

কুয়াশা কেটে গেল। বাপ্পন বার হয়ে এসে বলল, হ্যাঁ, আর বড়জোর পাঁচ-সাত মিনিট লাগবে, ঐ তো সামনে পাকা পথ।

অন্ধকারের মাঝে কালো চওড়া পাকা পথটা সত্যিই দেখতে পেলেন ব্রজবাবু। খুশি হয়ে বললেন, হ্যাঁ, তুমি যেন কি বলছিলে?

গত বছর ভীষণ বর্ষা হয়েছিল এদিকে। একদিন স্কুলে পৌঁছেছি, নামল ভীষণ বৃষ্টি। সে কি বৃষ্টি! সাড়ে চারটেয় যখন ছুটি হল তখনও টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। দিনটা ছিল সাতই আষাঢ়, আমার সঙ্গে ক্লাসে টোকোনের একটু ঝগড়া হয়েছিল। একটা ডট পেন, ওর মামা ওকে দিয়েছিল, চাররকম কালি ছিল তাতে। আমি বললাম, আমাকে দু'দিন দে না ভাই। বাড়ি নিয়ে যাব। ও কিচ্ছুতেই দিল না। ভীষণ দুঃখ হল আমার। ছুটির পর আবদুল বলল, চল আমরা বার হয়ে পড়ি, বৃষ্টি বাড়তে পারে। পাকা রাস্তায় ও প্রায় মান্দারহাটের কাছাকাছি থাকে। আমি রাগ করে বললাম, না, আমি একা যাব। রাগ হল এই জন্য, কারণ আবদুলও টোকোনের হয়ে কথা বলেছিল, বলেছিল, মামা ওকে জিনিসটা দিয়েছেন, ও কেন তোকে দেবে। আবদুল ভয় পেয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, তুই কোন দিকে যাবি? আমিও রাগ করেই বলেছিলাম, আজ আমি মাঠপথে ফিরব। আবদুল বলেছিল, না ভাই, যাস না। টোকোন বলেছিল, আবদুল ওকে বল, ওর একটা মাসির বাড়ি এখানে আছে, আমার ওপরে রাগ করেছে করুক, সেখানে তো ও গিয়ে থাকতে পারে। আগে কি থাকেনি নাকি ও! আবদুল বলেছিল, আমার সঙ্গেই ফিরে চল না। আজ তোর কি হল বল তো? আমার রাগ তখন যেন কেমন দুঃখ হয়ে গিয়েছিল। এত কথা বলছে ওরা অথচ একবারও তো বলছে না, এই নে ডট পেনটা, আমি কি আর ওটা নিতাম? ফেরতই তো তাহলে দিয়ে দিতাম। তা নয়, ওরা আমাকে থাকতে বলছে, সঙ্গে যেতে বলছে। আমি বলেছিলাম, আমি থাকব না, আমি যাবই, আর যাব ওই মাঠপথে একা একা। বলে আর আমি দাঁড়াইনি। রাগ করে তো কিছুদূর চলে এলাম, পায়ের পাতা ডোবা জল ক্রমে হাঁটু ছাড়িয়ে যখন প্রায় কোমর পর্যন্ত উঠল, আমি ভয়ে থেমে ছিলাম। কোন দিকে পথ, কোন দিকে যে যাব, কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। ভীষণ ভয়ে ঠিক করলাম, ফিরেই যাব। আজ নয় টোকোনদের বাড়িতেই থাকব রাতে। ফিরতে গেলাম যেই...থামল বাপ্পন।

ব্রজবাবু প্রায় আতঙ্কে বললেন, কি সাহস তোমার, এমন রাগও করে কেউ? ভাগ্যিস ফেরার বুদ্ধি করেছিলে।

কুয়াশায় আবার প্রায় হারিয়ে যাওয়া বাপ্পন বলল, দাদু, ওই দেখুন গলির মুখে টোকোনের বাবা দাঁড়িয়ে আছেন আলো হাতে। আমি যাই দাদু।

ব্রজবাবু হাঁ হাঁ করে চেঁচিয়ে উঠলেন, যাবে মানে? পাগল হলে নাকি তুমি? বাবা-মা নেই, তা বলে কি আমরা নেই নাকি! চল বাড়ি চল। আজ রাতে—

কুয়াশায় একদম হারিয়ে গিয়ে বাপ্পন বলল, পথের মাঝে সেই গর্তটাতে পড়ে গেছিলাম সেদিন দাদু। আর উঠতে পারিনি। পাঁচ দিন পরে জল নেমে গেলে আমাকে সবাই খুঁজে বার করে।

মানে! চেঁচিয়ে উঠলেন ব্রজবাবু।

জমাট বাঁধা কুয়াশার মাঝ থেকে প্রায় হারিয়ে যাওয়া গলায় স্বর ভেসে এল, দুঃখে বাবা-মা বাড়ি বিক্রি করে চলে গেছেন। টোকোন আর আবদুল খুব কেঁদেছিল। দাদু, সবাইকে বলবেন, আমি ওদের খুউব ভালোবাসি। নতুন জায়গায় বাবা-মা বাড়ি করেছিলেন বলে এ হয়নি। আর ডট পেন....দূর, ওসব কিছুই না। ও আমার ভাগ্য। কাউকে পাচ্ছিলাম না, এসব কথা বলতে। আপনি এলেন, বললাম। এবারে আমার ছুটি। যাই দাদু। গলার স্বর মিলিয়ে গেল।

ব্রজবাবু তাকিয়ে দেখলেন, ওদিক থেকে আলো হাতে ওঁর জামাই হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে আসছে। কাছে এসে অবাক হয়ে বলল, এ কি, এদিক থেকে কি করে আসছেন আপনি?

শান্ত ভাবে ব্রজবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, টোকোনের বন্ধু বাপ্পনের বাবা-মার নতুন ঠিকানাটা কি জান তুমি? দিয়ো তো, একটা জরুরি চিঠি লিখব।

বৈশাখ ১৩৯৩

আয়নার কুহক

শ্রীপরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

শীতের শেষ। পাতা-ঝরা গাছগুলোতে আবার নতুন করে কুঁড়ি দেখা দেবার উপক্রম হচ্ছে। সকালবেলাকার রোদ্দুরটা খুব মিঠে না হলেও একেবারে কড়া নয়। দোতলার বারান্দায় একটা ইজিচেয়ারে শুয়ে বিমান পত্রিকার উপর চোখ বুলিয়ে নিচ্ছে। আর একটু বাদেই উঠে নাওয়া-খাওয়া শেষ করে অফিসমুখো হতে হবে। হঠাৎ দরজায় কড়ানাড়া শুনে সে উঠতে যাবে, এমন সময় তার ছোট বোন নমিতা দরজা খুলে পিয়নের হাত থেকে একটা খাম নিয়ে বারান্দায় এগিয়ে এল। বিমানের দিদি শমিতা চানে যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছিল, সেও ঘর থেকে বেরিয়ে এল বারান্দায়। বিমান খামটা হাতে নিয়ে উপরের ঠিকানার দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগল—"এ কার চিঠি?"

শমিতা বল্লে ঃ "ভাবনা ছেড়ে খামটা ছিঁড়ে দেখ্ না বিমান! আমাকে আবার এক্ষুনি চান সারতে হবে।"

বিমান খাম ছিঁড়ে চিঠিটা বার করে মোটামুটি একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে শমিতার হাতে দিয়ে দিলে। তারপর চোখ বুজে চেয়ারটায় শুয়ে পড়ল। কপালে তার চিন্তার রেখা সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। শমিতা-নমিতা দুজনেই এতক্ষণে চিঠিটা পড়ে ফেলেছে। কিন্তু তাদের মুখে যে প্রতিক্রিয়ার চিহ্ন দেখা দিল, তা বিমানের মতো নয়—ভিন্নতর। শমিতার মুখে আনন্দের আভাস ফুটে উঠল আর নমিতা আনন্দে একেবারেই হাততালি দিয়ে উঠল।

শমিতা বিমানকে বল্লে ঃ "তুই ভাবছিস কি বিমান? এতদিনে ভগবান তবু মুখ তুলে চাইলেন!"

বিমানের চোখে-মুখে ক্রমে আশার আলো দেখা দিলেও সে যেন একেবারে নিশ্চিন্ত হতে পারেনি। তবু বল্লে, "বটে!"

প্রসঙ্গটি আপাতত এখানেই চাপা পড়ে গেল। শমিতার ইস্কুলের বেলা, বিমানের অফিস-টাইম আর নমিতার কলেজে যাবার সময় হয়ে এসেছে। তাড়াহুড়া করে সবাই চান-খাওয়া সেরে যথাস্থানে রওনা হল। দোতলার সেই ফ্ল্যাটের দরজায় একটা তালা মাত্র ঝুলে রইল।

এই ফাঁকে পেছনের ইতিহাসটা সেরে নিলে আমাদের এগুতে সুবিধে হবে।

কলকাতার কাছেই একটা মফঃস্বল শহর। ডাঃ সেনের খুব ফলাও ব্যবসা—খুব পশার জমিয়ে বসেছেন আর দু'হাতে টাকা লুটছেন। তাঁর ছোট ভাই এম. এ পাশ করে শহরেই ছেলেদের একটা হাইস্কুলে মাস্টারি জুটিয়ে নিয়েছিলেন। ডাঃ সেন নিঃসন্তান; আর তাঁর ভাইয়ের ছিল দুটি মেয়ে আর একটি ছেলে—শমিতা, নমিতা আর বিমান। ভাগ্যের বিপাকে অল্পবয়সেই ওদের বাপ-মা দুজনেই অকালে মারা পড়লেন একটা আকস্মিক দুর্ঘটনায়। নিঃসন্তান ডাঃ সেন তাদের সেই শোক বুঝবার সুযোগ দিলেন না। নিজের সন্তানের মতো করেই ওদের মানুষ করতে লাগলেন। শমিতা বি. এ পাশ করেছে, বিমান কলেজে পড়ছে, আর নমিতা স্কুলেরই উপর দিকের একটা শ্রেণিতে প্রমোশন পেয়েছে—এমন সময় ডাঃ সেনেরও ডাক পড়ল পরলোকে। সদ্য-বিধবা ওদের জ্যেঠাইমার তখন অবলম্বন বলতে শুধু এই দেবর-পুত্র-কন্যাগণই।

দীর্ঘকালের মধ্যে পরিবারে দুর্ঘটনা কয়েকটি ঘটলেও কারও চোখে-মুখে কোনো অশান্তি বা দুর্ভাবনার চিহ্ন ছিল না। কিন্তু ডাঃ সেনের মৃত্যুর পর দেখা দিল মহা অশান্তি। বিমান আর কিছুতেই তার জ্যেঠাইমার সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারছে না। খুঁটিনাটি অনেক কিছুতেই তাদের মধ্যে সংঘর্ষ

বাধতে লাগল। আর তা শিগ্‌গিরই সংক্রামিত হল শমিতা-নমিতার মধ্যে। প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে যোগ না দিলেও একটা পরোক্ষ প্রভাব তাদের উপর এমন একটা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল, যার জন্যে তারা এ অস্বস্তিকর পরিস্থিতিকে আর কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারছে না। অবশ্য, এ অবস্থাও আর বেশিদিন রইল না—একটা সাংঘাতিক আঘাতে অকস্মাৎ তারা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল।

অতি সাধারণ একটা ঘটনাকে সূত্রপাত করে তাদের জ্যেঠাইমা যখন বিমানকে টাকা-পয়সার খোঁটা দিয়ে আক্রমণ করলেন, তখন বিমানও চপলকণ্ঠে উত্তর করেছিল—"ডাইনিবুড়ি, তুমি মলে কী হবে? তখন তোমার টাকাপয়সা যক হয়ে আগলে রাখতে পারবে তো? পেত্নি হয়ে দেখো—আমি দু'হাতে তোমার পয়সা উড়াব।"

বলা বাহুল্য, জ্যেঠাইমার মেজাজ তখন সপ্তমে চড়ে গেছে—তিনি তাদের শাপ-শাপান্ত করতে লাগলেন। তারপর আর এখানে তিষ্ঠানো তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তিন ভাই-বোন তল্পিতল্পা গুটিয়ে চলে এল কলকাতায়। দোতলার এই ফ্ল্যাটটা ভাড়া নিয়ে তাদের দিন কাটতে লাগল। শমিতা একটা স্কুলে মাস্টারি নিয়ে বিমানকে বি. এ পাশ করিয়েছে। এক্ষণে তারা দুজনে চাকরি করে, আর নমিতা কলেজে পড়ে।

সেদিন সকালবেলা খামে-মোড়া যে চিঠিটা বিমানের নামে এসেছিল, সেটা ছিল উকিলের চিঠি। তাতে তাদের জ্যেঠাইমার মৃত্যু-সংবাদ জানিয়ে উকিল তাদের সম্পত্তির দখল নিতে বলেছেন। আইনত তারাই জ্যেঠাইমার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী।

বিকেল ৬টা। সবাই কর্মস্থল থেকে ফিরে এসে বিশ্রামরত। সারা দিন সবাই চিঠির কথা ভেবে ভেবে যার যার চিন্তাকে গুছিয়ে রেখেছিল। চা খেতে খেতে তারই জের টেনে আলোচনা চলল। বিমান গোড়াতে দোমনা থাকলেও বোনদের আগ্রহাতিশয্যে শেষ পর্যন্ত তাদের জ্যেঠাইমার বাড়ি ফিরে গিয়ে থাকতে রাজি হল। ঠিক হল, আপাতত তারা একমাসের ছুটি নিয়ে বাড়ি যাবে—তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা হবে। আর যদি পাকাপাকিভাবে তাদের বাড়িতে থাকাই সাব্যস্ত হয়, তবে একদিন এখানকার সব বন্ধুবান্ধবদের নেমন্তন্ন করে যে একটা মহাভোজের আয়োজন করা হবে—তা-ও আপাতত ঠিক হয়ে রইল। দুঃখকষ্টের মধ্য দিয়ে যে দিনগুলো তাদের এখানে কেটেছে, সুদে-আসলে তার ওসুল হবে ও-বাড়িতে গিয়ে। ঠাকুর-চাকর রেখে, চাই কি, পায়ের ওপর পা দিয়ে আরামেই তাদের বাকি দিনগুলো কাটিয়ে দিতে পারবে।

বিমান ভাবছিল—জ্যেঠাইমার সঙ্গে সে যে অসদ্ব্যবহার করেছিল, এবং তার ফলে তিনি যখন তাদের বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন, তখন তাঁরই বাড়ি গিয়ে থাকা এবং হয়তো বা বাকি জীবনটা সেখানেই কাটানো খুব সঙ্গত হবে কি না! কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখন খেয়াল হল যে, তার সংসারের বোঝা বইতে গিয়ে তার বেচারা দিদি আজও বিয়ের ফুরসুত পেল না, তখন তাকে অন্তত এ টানাহ্যাঁচড়ার হাত থেকে মুক্তি দেবার জন্যে হলেও তাদের ও-বাড়ি যাওয়াই সঙ্গত।

পরদিনই তারা এখানকার পাট উঠিয়ে দিয়ে চলে গেল অদূরবর্তী সেই মফঃস্বল শহরে—তাদের জ্যেঠাইমার বাড়ি।

ছোট শহরে ওদের বাড়িটাই সবচেয়ে বড় এবং চোখে পড়বার মতো বাড়িই ওটা। দোতলা বাড়ি—চারিদিক খোলা। সামনে-পিছনে—দু'দিক থেকেই উপরে উঠবার সিঁড়ি। নীচের তলাটা রান্নাঘর, বসবার ঘর, গুদাম, চাকরবাকরদের থাকবার ঘর। আর শোবার ঘর সব কটাই উপরে। মাঝখানে একটা মস্তবড় হলঘর আর তার দু'পাশে দুটো দুটো চারটে শোবার ঘর। দক্ষিণ-পূর্ব কোণের ঘরটাই বাড়ির সবচেয়ে ভালো ঘর—সবচেয়ে আরামপ্রদ। তাদের জ্যেঠাইমা ওই ঘরটাতেই বরাবর বাস করে গেছেন। শমিতা সবার বড়—কাজেই ওই ঘরটা তাকেই দেওয়া হল। এ-ঘরটার সঙ্গেই রয়েছে এরি একটা জুড়িঘর পশ্চিম দিকে। নমিতার ভাগে পড়ল ঐটে। হলঘর পার হয়ে যে দুটো ঘর—তার একটা নিল বিমান। সারাটা দিন ওরা সবাই মিলে ঝাড়পোঁছ করে কিছুটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে তুলল ঘরগুলো।

নীচে বসবার ঘরে বসে সন্ধেবেলায় ওরা পুরোনো স্মৃতি রোমন্থন করছিল। এ বাড়ির প্রতিটি ইটের সঙ্গে এদের পরিচয়—দীর্ঘদিন এখানে বসবাস করে তারা হঠাৎ এ-বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। আবার তাদের এই আকস্মিক আগমনটা যেন ওদের নিকটই কেমন বিস্ময়ের বিষয় বলে মনে হচ্ছিল। ওই নিয়েই তাদের আলোচনা চলছিল। বিমান বলছিল ঃ "এখানে, এঘরে বসেই আমি জ্যেঠাইমাকে ডাইনিবুড়ি বলে গাল দিয়েছিলাম।" শমিতা কান দিয়ে বিমানের কথা শুনছিল বটে—কিন্তু তার দৃষ্টি বিমানকে ডিঙিয়ে গিয়ে পড়ছিল পাশের ঘরটায়। হঠাৎ সে বল্লে ঃ "দ্যাখ তো নমিতা, পাশের ঘরে কে? আমার যেন মনে হল—"

নমিতা চট্ করে ঘুরে এসে বল্লে ঃ "কই, না তো! ওখানে আবার কে থাকবে? ঠাকুর-চাকরও তো এখন পর্যন্ত জোটেনি!"

মাথা নেড়ে শমিতা বল্লে ঃ "না না, যাই বলিস্—আমি ঠিক দেখেছি কে একজন যেন পর্দাটার আড়ালে দাঁড়িয়ে আমাদের কথা শুনছিল।"

নমিতা বল্লে ঃ "হ্যাঁ দিদি, তোমার যত—। ও বাব্বা! কখন খেতে যাবে? রাত কত হয়েছে, খেয়াল করেছ? তুমি রান্নাঘরে যাও দিদি, আমি উপর থেকে চট্ করে ঘুরে আসছি।"

শমিতা রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে গেল, আর নমিতা সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগল। হলঘরে ঢুকতেই তার মনে হল একটা সাদা শাড়ির আঁচল যেন শমিতার ঘরের ভিতর মিলিয়ে গেল! সে চমকে উঠে ভাবল, "দিদি তো নীচে রান্নাঘরে—তবে তার ঘরের ভিতর কে ঢুকল?" এমন সময় পেছনে সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনে সে ফিরে তাকিয়ে দেখলে—শমিতা উপরে উঠে আসছে। নমিতা বল্লে ঃ "দিদি, এইমাত্র কে যেন তোমার ঘরে গিয়ে ঢুকল বলে মনে হল!"

তারা দুজনে এগিয়ে শমিতার ঘরে গিয়ে দেখলে—কেউ কোথাও নেই। আর থাকবেই বা কোথায়? শাড়ি-পরা লোক তো এ-বাড়িতে ওরা দুটি বৈ তিনটি নেই।

নমিতা বল্লে ঃ "অথচ আমি যেন স্পষ্ট দেখলুম থান-কাপড়ের একটা আঁচল তোমার ঘরেই গিয়ে ঢুকল।"

চমকে উঠে শমিতা বল্লে ঃ "থান-কাপড়ের আঁচল? সত্যি তাই, আমিও তখন থান-কাপড়-পরা একজন মহিলাকেই যেন পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে আমাদের কথা শুনতে দেখেছিলুম!"

নমিতার মুখ শুকিয়ে গেল। তবু হাসি টেনে বল্লে ঃ "তবে কি আমরা সব ভূত দেখতে আরম্ভ করেছি? কী জানি, এখানে এসে অবধি যেন সব গুলিয়ে যাচ্ছে! ঠাকুর-চাকর সব এলে বাঁচি!"

ক'দিন পরের কথা। যে উকিলের কাছ থেকে চিঠি পেয়ে তারা এখানে এসেছে, তিনিই এলেন তাদের সঙ্গে দেখা করতে। রামভদ্রবাবু প্রাচীন ব্যক্তি—দীর্ঘকাল এদের সঙ্গে সম্পর্কিত। শুধু উকিল হিসেবেই নয়, তিনি ছিলেন ডাঃ সেনের একজন সত্যিকার হিতৈষী, এবং তিনিই এতাবৎ ডাঃ সেনের সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করতেন। বিমান বাড়ি নেই। ওরা রামভদ্রবাবুকে সঙ্গে নিয়ে বসবার ঘরে গেল।

শমিতা কথাপ্রসঙ্গে জানতে চাইল ঃ "জ্যেঠাইমা কি মরবার আগে খুব বেশি কাহিল হয়ে পড়েছিলেন?"

সহসা রামভদ্রবাবুর মুখ দিয়ে কোনো উত্তর জুগাল না। তিনি আমতা আমতা করে বল্লেন ঃ "তা—মানে—অর্থাৎ তাঁর ঠিক মৃত্যুর সময়টাতে আমি এখানে উপস্থিত ছিলাম না।"

তাঁর এ উত্তরে শমিতা সন্তুষ্ট হতে পারলে না। তার যেন মনে হল—রামভদ্রবাবু প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যেতে চাইছেন। তাই শমিতা সরাসরি প্রশ্ন করলে ঃ "আচ্ছা তাঁর শেষ চিকিৎসা কে করেছিলেন?"

এবার রামভদ্রবাবু একটু স্পষ্ট করেই বল্লেন ঃ "চিকিৎসা তাঁর ডাঃ গুহই করেছিলেন। তবে যতদূর মনে হচ্ছে তোমাদের জ্যেঠাইমার মরবার অন্তত দশদিন আগে থেকেই তিনি আর চিকিৎসা করেননি।"

নমিতা বল্লে ঃ "ওঃ, তাহলে চিকিৎসার অভাবেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে!"

রামভদ্রবাবু জবাব দিলেন, “না মা! কথাটা ঠিক হল না। চিকিৎসার তাঁর প্রয়োজন ছিল না—তিনি অনেকটা সুস্থই হয়ে উঠেছিলেন। তারপর সেদিন যখন ডাক্তারকে তিনি খবর পাঠালেন, তখন ডাক্তার বাড়ি ছিলেন না। তিনি যখন এসে পৌঁছলেন, তখন সব শেষ হয়ে গেছে।”

শমিতা-নমিতা দুজনেই একসঙ্গে বলে উঠল ঃ “তার মানে?”

রামভদ্রবাবু একটু থতমত খেয়ে বল্লেন ঃ “মানে, তখন তিনি অর্থাৎ তাঁর মৃত্যুটা ঠিক স্বাভাবিক নয়। তাঁর শোবার ঘরের কড়িতে একটা শাড়ি ঝুলিয়ে—না, হ্যাঁ, শাড়িটা বেশ শক্তই ছিল; ছিঁড়ে যায়নি।”

দু'হাতে মুখ ঢেকে ফেলে শমিতা আর নমিতা। খানিকক্ষণ সব চুপচাপ—রামভদ্রবাবুও এই অবসরে তাঁর উত্তেজনাটা একটু প্রশমিত করে নেবার সুযোগ পেলেন।

খানিক বাদে একটু আত্মস্থ হয়ে শমিতা বল্লে ঃ “তাহলে তিনি আত্মহত্যা করেছেন?”

রামভদ্রবাবু মাথা নেড়ে স্বীকৃতি জানালেন। শমিতা বল্লে ঃ “থাক্, ভালোই হল—খবরটা জেনে রাখলুম। কিন্তু আমার একটা অনুরোধ। বিমানকে খবরটা জানাবেন না। ওর শরীরটা খুব সুস্থ নয়—হয়তো এ-আঘাত সইতে পারবে না!”

রামভদ্রবাবু স্বীকৃত হলেন। আরও খানিকক্ষণ কথাবার্তা বলে তিনি বিদায় নিলেন।

দু'বোন খানিক চুপ করে থাকবার পর শমিতাই প্রথম কথা বল্লে ঃ “তাহলে এই ঘটনা! গোড়া থেকেই আমার যেন কেমন একটা সন্দেহ হয়েছিল! আর এই জন্যেই এ সমস্ত—”

নমিতা তার দিদিকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বল্লে ঃ “আমার ভয় করছে দিদি! আমারও মনে হচ্ছে, এ বাড়িতে কোথায় যেন কী লুকিয়ে রয়েছে! সাদা থান-পরা—”

শমিতা কথাটা শেষ করলে ঃ “সাদা থান-পরা একজন মহিলা যেন বাড়িময় ঘুরে বেড়াচ্ছেন! হ্যাঁ রে নমি—জ্যেঠাইমাই তো শেষ বয়সে সাদা থান পরতেন—নারে?”

অকস্মাৎ যেন সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে গেল। কিন্তু এতে তাদের ভয় মোটে কাটল না, বরং একটা অজানা আতঙ্কে যেন ওদের বাক্‌রুদ্ধ হয়ে এল! অনেকক্ষণ পর বিমান এসে ঘরে ঢুকতে তাদের ভয় কমল, মুখ দিয়ে কথা বেরুল। তারা বিমানকে জানাল যে, উকিল রামভদ্রবাবু এসে খানিক অপেক্ষা করে চলে গেছেন। তিনি কিছু বলে গেছেন কি না জানতে চাইলে নমিতা বল্লে ঃ “তেমন কিছু নয়।” তাদের আলাপ-আলোচনার কোনো কথাই তারা প্রকাশ করলে না।

দিন তাদের কেটে চলল শঙ্কার আর একটা অজানিত বিভীষিকার মধ্য দিয়ে কিন্তু বিমানকে তারা কোনো কথাই জানালে না। একদিন শমিতা নমিতাকে ডেকে বল্লে ঃ “দ্যাখ সে নমিতা! কি অদ্ভুত কাণ্ড!”

এ ক'দিন ধরে তারা সর্বক্ষণই সচকিত ছিল। শমিতার ডাক শুনে নমিতা সঙ্গে সঙ্গে তার ঘরে চলে এল। শমিতা কিছু না বলে শুধু দেয়ালে টাঙানো বিরাট আয়নাটার দিকে আঙুল বাড়িয়ে দিলে। নমিতা এগিয়ে দেখলে—আয়নাটার গায়ে একটা অস্পষ্ট কালো দাগ। সে শাড়ির আঁচল দিয়ে ওটাকে ঘষে তুলে ফেলতে চেষ্টা করলে। শমিতা বল্লে ঃ “বৃথা চেষ্টা। এ কিছুতেই উঠবে না—মনে হয়, দাগটা আয়নার উপর নয়, একেবারে ভেতরে।”

নমিতা বল্লে ঃ “তাতে আশ্চর্য হবার কি আছে?”

শমিতা একটু উত্তেজিতভাবেই বল্লে ঃ “নেই কিছু? আমাদের জন্মের আগে এ আয়না কেনা হয়েছে—কিন্তু এ পর্যন্ত এতে কোনো দাগ ছিল না, কাল পর্যন্তও এ দাগ ছিল না।”

সেদিন রাত্রিতে—নমিতার চোখ জড়িয়ে এসেছে, এমন সময় তার দরজায় মৃদু পদধ্বনি আর সঙ্গে সঙ্গে শমিতার ভয়জড়িত কণ্ঠ শুনতে পেল—“ঘুমিয়েছিস্ নমিতা? শীগ্‌গির আয়।”

একলাফে বিছানা ছেড়ে নমিতা দরজা খুলে বাইরে চলে এল। শমিতার মুখ ভয়ে বিবর্ণ হয়ে

গেছে, আর আতঙ্কে সে হাত মোচড়াচ্ছে। নমিতাকে ডেকে ঘরে নিয়ে এসে আয়নাটার দিকে আঙুল বাড়িয়ে দিলে। আয়নার দিকে তাকিয়ে নমিতা চম্‌কে উঠল—তার মুখে-চোখেও ভয়ের রেখা দেখা দিল। আয়নার দাগটা আরও একটু স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে—যেন কিসের একটা ছায়া পড়েছে! শমিতা নমিতার মুখের দিকে তাকিয়ে বল্লে ঃ "উপর থেকে কী যেন একটা ঝুলে পড়েছে, আর তারই ছায়া বলে মনে হচ্ছে—তাই নয়?"

নমিতা দু'চোখ বন্ধ করে তার দিদিকে জড়িয়ে ধরে বল্লে ঃ "আমারও তাই মনে হচ্ছে। কী ভয়ানক দিদি!"

শমিতা এক্ষণে নমিতাকে সান্ত্বনা দিয়ে বল্লে ঃ "ভয় কিরে? এতে তো আর কোনো ক্ষতি হচ্ছে না—যত কিছু ছায়া পড়ুক না!" শেষ কথাটা বলতে গিয়ে শমিতার গলাটাও কেঁপে উঠল। নমিতা দিদিকে এ ঘরটা ছেড়ে দেবার, নয়তো আয়নাটা বিক্রি করে দেবার পরামর্শ দিলে। কিন্তু শমিতা বল্লে ঃ "কিন্তু এতে বিমানের মনে শুধু সন্দেহই জাগবে—কাজেই দরকার নেই এসব করে। শুধু খেয়াল রাখবি, বিমান যেন কিছুই বুঝতে না পারে।"

কিন্তু তাদের এত চাপাচাপিই বিমানের মনে সন্দেহ ঢুকিয়ে দিলে। তার মনে হল কোথায় যেন কী একটা গলদ ঢুকেছে! আয়নার দাগটা ক্রমেই বৃহত্তর আর স্পষ্টতর হয়ে উঠছে। শমিতা পারতপক্ষে আর তার ঘরের দিকে যেতে চায় না। রাত্তিরে ঘরে আলো জ্বালতে চায় না। একদিন শমিতা-নমিতা দুজনেই অন্যমনস্কভাবে তার ঘরে ঢুকে পড়তেই তাদের চোখ গিয়ে পড়ল আয়নাটার উপর। আর সঙ্গে সঙ্গেই দুজনে চিৎকার করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে হলঘর থেকে বিমান এসে উপস্থিত হল। তাদের দুজনকে এ অবস্থায় দেখে বল্লে ঃ "আমি ক'দিন ধরেই তোমাদের অদ্ভুত আচরণ লক্ষ করছি আর আড়াল থেকে তোমাদের কথা শুনছি। তোমাদের ডাক্তার দেখানো দরকার হয়ে পড়েছে, নইলে তোমাদের এ ভূত-দেখার পাগলামি সারবে না।"

শমিতা তাকে টেনে এনে আয়নার সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বল্লে ঃ "আয়নাটার দিকে তাকিয়ে দ্যাখো। দেখতে পাচ্ছ কিছু?" বিমানের চোখে লক্ষণীয় কিছুই পড়ল না। সে সোজা ঘাড় নাড়লে। তারা সব একসঙ্গে বেরিয়ে এল। বিমান হলঘরে বসল আর ওরা নীচে নেমে গেল।

শমিতা তখন ভয়ে কাঠ হয়ে রয়েছে। সে নমিতাকে বল্লে ঃ "কিন্তু বিমান কেন আয়নায় ওকে দেখতে পেল না? ওর উপরই তো জ্যেঠাইমার রাগ ছিল বেশি। তবে কি হঠাৎ একদিন দেখা দিয়ে ডাইনিবুড়ি ওকে ভয় দেখিয়ে মারবে? তার চেয়ে চল্‌ নমিতা, এক্ষুনি আয়নাটাকে টুকরো টুকরো করে ভেঙে ফেলি।"

ওদিকে হলঘরে একটুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে বিমান চুপিচুপি আবার শমিতার ঘরে গিয়ে ঢুকল। আয়নাটার উপর চোখ পড়তেই তার সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল।—স্পষ্ট একটা ছায়া কড়িকাঠ থেকে ঝুলানো—দুলছে, দুলছে। ডাক ছেড়ে চিৎকার করতে গেল সে, কিন্তু গলা দিয়ে তার আওয়াজ বেরোল না। সে দৌড়ে সামনের সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল নীচে—তার বোনদের বলবে যে, সে-ও দেখেছে। কিন্তু কোথায়—তারা তো নেই!

ওরা ওদিকে পিছনের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেছে। উপরের হলঘরে ওদের পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। বিমান আবার সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছে। কিন্তু ও কে সিঁড়ির মাথায়—সাদা থান-পরা একজন মহিলা? সাদা থান! সাদা থান!! হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল—জ্যেঠাইমা তো সাদা থান পরতেন! ওঃ, সেই ডাইনিবুড়ি!! কিন্তু কোথায় মিলিয়ে গেল?—অবাক কাণ্ড তো! বিমানের বুক ধপ্‌ধপ্‌ করছে—তার কান গরম হয়ে গেছে—কপাল ঘামছে।

জোর করে সে পা দুটোকে টেনে টেনে উপরে তুলছে—তারপর এগিয়ে যাচ্ছে শমিতার ঘরের দিকে। আস্তে আস্তে সে ঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়াল। শমিতা আর নমিতা জড়াজড়ি করে আয়নাটার সামনে বসে আছে। হ্যাঁ, এবার স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে—কড়িকাঠ থেকে একটা শাড়ি ঝুলছে—শাড়ির একটা মাথা তার জ্যেঠাইমার গলায় ফাঁস হয়ে আটকে আছে। বুড়ির জিবটা বেরিয়ে এসেছে—

চোখ দুটো জবাফুলের মতো লাল—মুখটা বীভৎস হয়ে গেছে দেখতে। ক্রমে আয়নার মধ্যে ছায়াটা দুলতে লাগল—দুলছে, দুলছে। বিমানের গলা দিয়ে ক্ষীণ আওয়াজ বেরুচ্ছে ঃ "ওঃ, তাহলে এই ব্যাপার! ডাইনিবুড়ি ফাঁসিতে ঝুলেছে—আর তার ছায়াটা আয়নায় আট্‌কা পড়ে গেছে।"

বিমানের উপস্থিতি তার বোনেরা লক্ষ করলে এতক্ষণে। নমিতা শমিতার কানে ফিসফিস করে বল্লে ঃ "দেখতে পেয়েছে, দাদা দেখতে পেয়েছে ঐ ছায়াটা। দ্যাখ, দ্যাখ, ছায়ামূর্তির চোখটা কেমন জ্বলে জ্বলে উঠছে!"

বিমানের ক্ষীণ আওয়াজে যেন কিসের জোর লাগল—তার কথা স্পষ্টতর হয়ে উঠল ঃ "এবার বাগে পেয়েছি তোমাকে ডাইনিবুড়ি! আর পালাতে দেব না—বেঁচে থাকতে তুমি জ্বালিয়ে মেরেছ; মরেও আবার জ্বালাতে এসেছ? দাঁড়াও, এবার তোমার জারিজুরি বার করছি।"

এগুতে এগুতে বিমান একেবারে আয়নাটার সামনে এসে ঝুঁকে পড়ে দেখতে লাগল। ঐ তো, ঐ তো ছায়াটার চোখের পলক পড়ছে—কেমন তাকাচ্ছে!

চিৎকার করে বিমান দু'হাতে মুখ ঢেকে ফেললে। তারপর একটি মুহূর্তমাত্র গা-ঝাড়া দিয়ে সে উঠে দাঁড়াল—চোখ দুটো তার জবাফুলের মতো—মুখের উপর নীল শিরাগুলো ভেসে উঠল। আবিষ্টের মতো একবার চারিদিকে তাকিয়ে হঠাৎ পিতলের ফুলদানিটা হাতে তুলে নিয়ে এলোপাথাড়ি আঘাত হানতে লাগল আয়নাটার ওপর। ঝনঝন করে আয়না টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ল ঘরময়। ভূতগ্রস্তের মতো অট্টহাসি হাসতে হাসতে দু'পা পিছিয়ে এল বিমান—হাত থেকে তার ফুলদানিটা খসে পড়ল। বিমূঢ়, চমকিত বোনদের দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগল বিমান—ক্লিষ্ট হাসি। দু'হাতে সে অকস্মাৎ কপালের দু'দিকের রগ দুটো টিপে ধরে। তারপরই সে দুলতে লাগল—ডাইনে, বাঁয়ে! শমিতা ও নমিতা দুজনে ভয়ে-আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল। বিমান গুঁড়ি মেরে পড়ে গেল মেঝের উপর। দৌড়ে এসে শমিতা তাকে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে ডাকতে লাগল—সাড়া নেই! গা ধরে নাড়া দিল—সবটা শরীর দুলে দুলে উঠল। প্রাণহীন বিমানের দেহটাকে ধরে লুটিয়ে লুটিয়ে কাঁদতে লাগল শমিতা। সম্বিৎহারা নমিতা চিৎকার করে উঠল ঃ "ঐ যে, ঐ যে, ডাইনিবুড়ি দেওয়ালটার গায় মিশে দাঁড়িয়ে আছে, ঐ যে!"

শমিতা মাথাটা তুলে আবিষ্টের মতো কাতর কণ্ঠে বলতে লাগল; "না না, বিমান ডাইনিবুড়িকে হত্যা করেছে। আমি দেখেছি; নিজের চোখে দেখেছি।"

ঠাকুর-চাকর চিৎকার শুনে নীচে থেকে এসে দোরগোড়ায় জমা হয়েছে। তারা দেখতে পেল—কুণ্ডলী পাকানো বিমানের দেহটাকে জড়িয়ে ধরে পড়ে আছে নমিতা, আর শমিতা ছোট্ট ছেলেকে ঘুমপাড়ানোর মতো করেই যেন বিমানের পিঠে হাত রেখে ঘুম পাড়াচ্ছে আর শূন্য দৃষ্টিতে যেন কাকে লক্ষ করে মিনতি-মাখা কণ্ঠে বলছে; "যাও যাও ডাইনিবুড়ি, দোহাই তোমার। বিমান তোমাকে হত্যা করেছে; আমি যে নিজের চোখে দেখেছি। জ্যেঠাইমা, লক্ষ্মীটি, যাও তুমি!!" *

---

* August Dertich লিখিত 'The Sheraton Mirror' নামক গল্পের ছায়া অবলম্বনে।

শ্রাবণ ১৩৫৯

মামীমা

কার্তিক মজুমদার

অনিমেষবাবু বলে উঠলেন, 'না-না, ভূত বলতে যা ভয়ের ব্যাপার বোঝায়, তা আমি দেখিনি। তবে যা দেখেছি, তা অদ্ভুত ব্যাপার। সে আজকের কথা নয়, বহুদিন আগের।'

ডাকবাংলোর বারান্দায় বসে আমরা কয়েকজন গল্প করছি। রাত প্রায় দশটা বাজে। মফঃস্বল শহর, এর মধ্যে আশেপাশের সব আওয়াজই প্রায় থেমে গেছে। আধো অন্ধকারে মশাদের ক্ষীণ গুঞ্জন আর দমকা হাওয়ার একটু শব্দের আভাস ছাড়া আর কিছু ছিল না।

একটা সিগারেট ধরিয়ে অনিমেষবাবু আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'আপনি আত্মা মানেন? জানেন, মানুষের আত্মার কোনও ক্ষয় নেই। মৃত্যুর পরে দেহ তাকে বিদায় দিলেও বহুদিনের টানে সবাইকে ছেড়ে সে দূরে চলে যেতে চায় না। অবিশ্যি আমরা তা ঠিক প্রত্যক্ষ করতে পারি না।'

আমি বললাম, 'অনিমেষবাবু, ও সম্বন্ধে আমার কোনও ধারণা বা কৌতূহল নেই। দেহের বাইরে তার কোনও অস্তিত্ব থাকতে পারে বলে আমার মনে হয় না।'

'আমারও মনে হত না। কিন্তু বার কয়েক কিছু বিচিত্র ঘটনা আমি চোখে দেখেছি, তাতেই আমার ওই ধারণা জন্মেছে। আমার যে প্রথম অভিজ্ঞতা, তা আমার শৈশবের।'

অনিমেষবাবু থামলেন, তারপর বলতে শুরু করলেন—'আমার ছেলেবেলার যে ঘটনার কথা আমি বলছি, তখন আমি ইস্কুলে পড়ি। বাবা তখন বরিশাল শহরে কাজ করতেন, ওইখানেই আমাদের ছেলেবেলা কেটেছিল। পূর্ববঙ্গের বড় বড় নদীগুলি আপনারা দেখেছেন কিনা জানি না, এখন তো সেখানে যাবার পথ বন্ধ। সে নদীগুলি বর্ষাকালে ফুলে ফেঁপে বিরাট হয়ে যায়। ওইসব নদী থাকার ফলে ও দেশে এত পাকা মাঝি হয় আর ছেলেমেয়েরা জলের পোকার মতো সাঁতার কাটে। আমিও ছেলেবেলায় ওখানে থাকতাম বলে পাকা সাঁতারু হয়ে গিয়েছিলাম। আমাদের গেম্‌স মাস্টার ছিলেন হরেনবাবু। তিনি আমাদের বিকালের দিকে সাঁতার আর ডাইভিং শেখাতেন।

বাবার চাকরিতে বদলি হবার দরুন একবার বছর দেড়েকের মতো আমাকে খুলনায় মামার বাড়িতে থাকতে হয়েছিল। বাবার ইচ্ছা ছিল ওখানেই আমি ইস্কুলের পড়াটা শেষ করি। কারণ বেশি বদলি হবার ঠেলায় আমাদের পড়াশুনোর দিকে তিনি নজর দিতে পারছিলেন না। কিন্তু মামার বাড়িতে রেখেও বাবা নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না। একবার তিনি গিয়ে দেখলেন যে মামার বাড়ির দুধেভাতে আমার ইহকালটি ঝরঝরে হয়েছে। তার প্রধান কারণটি হলেন আমার মামীমা। তাঁর ছেলেপিলে ছিল না। আমাকে তিনি একবেলা ভাগ্নের আদর আর একবেলা মায়ের স্নেহ বিতরণ করছিলেন। আমার সৌভাগ্য দেখে অনেকেই তাঁকে 'ভাগ্নে কখনও আপন হয় না' এইরকম জ্ঞান দান করেছিলেন, কিন্তু মামীমাকে টলাতে পারেননি। কিন্তু বাবার কাছে শেষকালে তাঁকে হার মানতে হল। বাবা দীর্ঘদিন বাদে এসে দেখলেন, আমার চেহারা গোলগাল গোপালের মতো হয়েছে, রঙ ফর্সা হয়েছে, ভাতপাতে পাঁচ-ছটা আম নির্বিকারে শেষ করছি আর সন্ধেবেলা পড়বার সময়ে ঢুলে-ঢুলে পড়ে যাচ্ছি। তখন একরাত্রি দুশ্চিন্তা ও অনিদ্রার পর পরের দিন সকালে তিনি মামাকে বললেন, 'খোকাকে আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাব এইবার।'

মামার যে তাতে খুব আপত্তি ছিল, তা নয়। কিন্তু মামীমার কথা ভেবে তিনি একটু চিন্তিত হয়ে পড়লেন। বললেন, 'কেন? খোকার তো ভালোই পড়াশুনো হচ্ছিল এখানে। তাছাড়া চেহারাটাও এখানে থেকে বেশ ফিরেছে।'

বাবার অভিজ্ঞ চোখ বুঝে নিয়েছিল যে, মামার কথার শেষ অংশটা সত্য আর প্রথম অংশটি মিথ্যে। তাই তিনি সে কথার ধার দিয়েও গেলেন না। বললেন, 'না, আমার ওখানে থেকেই এখন ও পড়াশুনো করবে। বরিশাল থেকে আমি শীগ্‌গির বদলিও হচ্ছি না, আর ওখানে ইস্কুলে পড়াশুনো ভালোই হয়।' তখনও মহাত্মা অশ্বিনীকুমারের যুগ শেষ হয়ে যায়নি। বরিশালের লেখাপড়ার নামডাক ছিল সে সময়ে।

মামীমা কিন্তু তা শুনে এক কথায় ভেঙে পড়লেন। প্রথমে ঠাকুরঘরে গিয়ে অনেকক্ষণ চোখ মুছলেন, তারপর মামার কাছে গিয়ে খানিকটা কান্নাকাটি করলেন। শেষকালে বাবার কাছে গিয়ে বললেন, 'মুখুজ্যেমশাই, খোকা এখানেই থাকুক না।'

সে-কালে বাড়ির বউদের সব ব্যাপারে কথা বলার বা মতামত দেওয়ার রেওয়াজ ছিল না। ভাত খাবার সময়ে বড়জোর দু-চারটি কথাবার্তা হত। তাছাড়া বাবা ছিলেন ভারী রাশভারী মানুষ। খাওয়া-দাওয়ার পরে তিনি যখন মামীমার কথায় না বলে দিলেন, তখন তিনি চোখে কাপড় দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'খোকাকে আপনি নিয়ে যান মুখুজ্যেমশাই, কিন্তু আর কখনও আমার কাছে নিয়ে আসবেন না। ওকে দেখলে আমি বুক ফেটে মরে যাব।'

বাবা কম কথার লোক। তিনি অন্যদিকে চেয়ে নিঃশব্দে গোঁফে হাত বুলাতে লাগলেন, কোনও উত্তর দিলেন না। আমি তখন ছোট হলেও মোটামুটি এটা বুঝতে পেরেছিলাম যে আমাকে চলে যেতে হবে। আমি রান্নাঘরে মামীমার গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদোকাঁদো হয়ে বললাম, 'মামীমা, আমি কিছুতেই যাব না। তুমি বাবাকে চলে যেতে বল, নয়তো তুমিও বাবার সঙ্গে চল। তা নাহলে আমাকে কোথাও লুকিয়ে রাখো।'

রান্নাঘরে রাঁধুনি বামনী রান্না করছিল, সে আমার কথায় মুচকি হাসল, আর মামীমা হেসে উঠলেন খিলখিল করে। সে হাসি আর থামতে চায় না। হাসতে হাসতে তাঁর মুখ লাল হয়ে উঠল, চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল, তাও হাসি থামে না। পরে বড় হয়ে বুঝতে শিখেছি, ও হাসিটা একধরনের কান্না।

সে-দিন সারাদিনের মধ্যে মামীমার আর দেখা পেলাম না। সমস্ত দিনই তিনি চোখের আড়ালে রইলেন। রওনা হবার সময়ে পর্যন্ত তাঁকে দেখতে পেলাম না। সন্ধেবেলায় ঘোড়ার গাড়িতে করে স্টেশনে রওনা হলাম। মালপত্তর উঠতে লাগল, বাবা আর মামার সঙ্গে চাকরি-বাকরি নিয়ে নানা কথাবার্তা হল। মামীমা কাছেপিঠেও এলেন না। তারপর এক সময়ে গাড়ি ছেড়ে দিল।'

অনিমেষবাবু কথা থামিয়ে এবারে একটা সিগারেট ধরালেন। এ পাশ থেকে রমাপতি জিজ্ঞাসা করল, 'এরপর আর মামীমার সঙ্গে আপনার দেখা হয়নি?'

'হয়েছিল। একবারই শুধু দেখা হয়েছিল এর পরে। সেই কথাই বলছি।' অনিমেষবাবু অন্ধকারে একটা মশা মারলেন, তারপর পা-টা ভাঁজ করে চেয়ারে আরাম করে বসে বলতে শুরু করলেন—

'বরিশালে এসে ইস্কুলে ভর্তি হয়ে আবার আমার নতুন জীবন শুরু হয়ে গেল। প্রথম-প্রথম মামাবাড়ির জন্যে মন খারাপ হত। দু-একবার পোস্টকার্ডে মামীমাকে চিঠিও লিখেছিলাম বলে মনে পড়ে, কিন্তু উত্তর আসেনি। তারপর এক সময়ে সবকিছু ভুলে খেলাধূলা ইস্কুল নিয়ে মেতে উঠলাম।'

অনিমেষবাবু অন্ধকারের দিকে একবার চাইলেন। বোধহয় পুরোনো দিনগুলির কথা একবার মনে করে নিলেন। তারপর কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে বলতে লাগলেন।

'আগেই বলেছিলাম, আমি বরিশালে থাকার সময়ে সাঁতার কেটে কেটে পাকা সাঁতারু হয়েছিলাম। আমাদের সাঁতারের ক্লাবে নিয়মিত তালিম নিতে হত ড্রিল-মাস্টারের কাছে। কারণ, প্রতি বছর জেলায় সাঁতার আর ডাইভিং-এর বেশ জোরালো কম্পিটিশন হত। কলকাতার মতো এ-ক্লাস ডাইভিং পুল মফঃস্বল শহরে তৈরি সম্ভব নয়। তবু যতখানি সম্ভব কাজ চালানোর মতো ডাইভিং-এর ব্যবস্থা করা হত নদীর পাড়ে। নীচেই অগাধ জল। আমরা হুকুম মতো নীল রঙের জাঙিয়া পরে কখনও হাঁসের মতো সাঁতার কাটতাম, কখনও ডিগবাজি খেয়ে ডাইভিং অভ্যাস করতাম। ড্রিল-মাস্টার চিৎকার

করে আমাদের ঠিক মতো তালিম দিতেন। ভুল করলে মারধোর দিতেও কসুর করতেন না। তাঁর ধ্যান-জপ ছিল কিভাবে ট্রফিটা আমাদের ক্লাবের হাতে আসতে পারে।

আমার স্পষ্ট মনে আছে ওইরকম একটা প্র্যাকটিসের দিনে আমরা সবাই জাঙিয়া পরে লাফালাফি করে হালকা একসারসাইজ করছি। একটু বাদেই আমাদের ডাইভিং প্র্যাকটিস শুরু হয়ে যাবে। ড্রিল-মাস্টার হুইসেল দিলেন। উঁচু ডাইভিং বোর্ডে দাঁড়িয়ে আমিও তখন সমস্ত স্নায়ু শক্ত করেছি ঝাঁপ দেব বলে। কিন্তু হাত তুলে ঝাঁপ দিতে গিয়েই সঙ্গে সঙ্গে চমকে গিয়ে পিছিয়ে এলাম। তারপরেই আমি অনুভব করলাম আমার হাত কাঁপছে, পা-ও কাঁপছে ঠকঠক করে।

ড্রিল-মাস্টার 'হোয়াট্স দ্যাট্' বলে চিৎকার করে উঠলেন। তারপর বাংলায় গালাগালি দিতে লাগলেন। তখনই আবার চোখ পাকিয়ে হাত তুলে দ্বিতীয়বার বাঁশি বাজালেন। কিন্তু তখনও আমার কোনও চাঞ্চল্য নেই, আমি ফ্যালফ্যাল করে শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে আছি। এবারে ড্রিল-মাস্টারের খটকা লাগল। গালাগাল আর একপ্রস্থ দিলেন বটে, কিন্তু আমার হাবভাব দেখে ঘাবড়ে গেলেন। আমি যে ক্লাস সেভেনের অনিমেষ মুখার্জি, যে চিংড়ি মাছের মতো তিড়িক করে ডাইভ মারি ঘণ্টার পর ঘণ্টা, সে হাবার মতো সামনের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে! দূরে আর সব ছেলেও অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আমার কাণ্ড দেখছে।

এরপরে ড্রিল-মাস্টার সোজা গট্গট্ করে ওপরে উঠে এসে আমার হাত চেপে ধরতেই আমি কী যেন অসংলগ্ন কথা তাঁকে বললাম, তারপরেই অজ্ঞান হয়ে গেলাম। আমি হয়তো জলেই পড়ে যেতাম, কিন্তু তিনি তাঁর মোটা চওড়া হাতে আমাকে শক্ত করে ধরে ফেললেন। ড্রিল-মাস্টার আমাকে শক্ত করে ধরেছেন, সেটুকু আমার মনে আছে, তারপরে আর কিছু মনে নেই।'

'আপনি অজ্ঞান হয়ে গেলেন কেন হঠাৎ ও অবস্থায়?' রমাপতি জিজ্ঞাসা করল। 'ভয় পেয়েছিলেন?'

অনিমেষবাবু বললেন, 'সবটা শুনুন, বলছি। আমাকে অজ্ঞান হয়ে যেতে দেখে ড্রিল-মাস্টার আর জনা তিনেক ছেলে আমাকে ধরাধরি করে নীচে নিয়ে এল। কাছেই হরি ডাক্তারের ডিসপেনসারি, দু-তিনজন ছুটল ডাক্তারকে ডাকতে। শুনেছিলাম আমার নাকি কয়েক ঘণ্টা কোনও চৈতন্য ছিল না।

ড্রিল-মাস্টার ছেলেদের বললেন, ডাইভ দেওয়া এখন কিছুক্ষণ বন্ধ থাক। তারপর ভ্রূ কুঁচকে খানিকক্ষণ কি যেন চিন্তা করলেন। ছেলেরা দেখল এরপরেই তিনি জামা-গেঞ্জি খুলে পৈতেটা কোমরে জড়িয়ে জলে নেমে গেলেন। ডাইভিং বোর্ড থেকে ঝাঁপিয়ে নামলেন না, পাড় থেকে নেমে গেলেন। ছেলেরা জিজ্ঞাসা করাতে বললেন, 'দাঁড়া, জলটা একটু দেখে নিই। আমার কেমন যেন একটু খটকা লাগছে।'

ছেলেরা দেখল, তিনি সাঁতরে খানিক দূরে চলে গেলেন, তারপর ডাইভ-বোর্ড থেকে নদীর যে জায়গায় ঝাঁপিয়ে পড়ে, সেইখানে গিয়ে ডুব মারলেন। গভীর জল। অনেকক্ষণ পরে তিনি উপরে ভেসে উঠলেন। দেখা গেল জলের উপরে উঠে এসে তিনি সাঁতরে ফিরে এলেন না, আবার বড় নিঃশ্বাস নিয়ে ডুব মারলেন। ইতিমধ্যে অনেক লোক নদীর ধারে জড়ো হয়ে গেছে, কারণ এ খবরের কথা মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। সবাই অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে, ড্রিল-মাস্টার অনেকক্ষণ ধরে জলের তলায় কী যেন খুঁজে বেড়াচ্ছেন। কেউ-কেউ জলে নেমে পড়ল, কিন্তু তাদের এগিয়ে যাবার আগেই ড্রিল-মাস্টার আবার জলের উপরে ভেসে উঠলেন। ক্লান্ত, বিবর্ণ মুখে কয়েকটা স্ট্রোকে সাঁতরে পাড়ে চলে এলেন। পাড়ে উঠে এসেই বললেন, 'অনিমেষ মরবার হাত থেকে বেঁচে গিয়েছে। শীগগির মাঝিদের খবর দাও। সাঁতার ডাইভিং সব বন্ধ থাক।'

সেই গভীর জল তোলপাড় করে ঘণ্টা কয়েক বাদে মাঝিরা বহুকষ্টে দড়ি দিয়ে বেঁধে তুলল একটা বিশাল তেঁতুল গাছের গুঁড়ি। তার খাড়া-খাড়া শিকড়গুলি প্রাচীন দিনের লুপ্ত হয়ে যাওয়া বিরাট জন্তুদের গায়ের কাঁটার মতো ভয়ঙ্কর। বর্ষার জলের টানে কোথা থেকে ভেসে এসেছে কে

জানে? আমি যদি না থেমে তার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়তাম, তাহলে মাথা বা বুক চুরমার হয়ে যেত। আমার লাশটা হয়তো দিন-দুই পরে ভাসতে ভাসতে নদীর আর এক প্রান্তে গিয়ে ভেঙে যাওয়া পাড়ের কোনও বুনো ঝোপের পাশে আটকে থাকত। লোকে বলত জটাধারী ওকে টেনে নিয়েছেন।

আমার যখন জ্ঞান হল, তখন আমি নিজের বাড়িতে বিছানায় শুয়ে। ডাক্তারবাবু, ড্রিল-মাস্টারমশাই, আর কিছু ছেলে আমার আশেপাশে রয়েছে। ওযুধ-মেশানো গরম দুধ খেতে খেতে সব শুনলাম। তারপর সুস্থ হয়ে উঠে বসলে বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, 'খোকা, তুমি বুঝলে কি করে যে জলের তলায় ওইরকম একটা ভয়ঙ্কর জিনিস রয়েছে?'

বললাম, 'না, আমি তো তা বুঝতে পারিনি।'

'তবে? অমন করে পিছিয়ে এলে কেন?'

আমি বলতে যাচ্ছিলাম কিভাবে কেমন করে আমি লাফ দিতে গিয়েও পিছিয়ে এলাম। কিন্তু বলতে গিয়ে আমার গলা ধরে গেল, কথা কেমন আটকে গেল, চোখে জল এসে গেল।

মা শিয়রেই বসেছিলেন, বললেন, 'থাক-থাক, এখন তোমার বলবার দরকার নেই।' তিনি সবাইকে সরে যেতে হাতের ইশারা করলেন। বললেন, 'ভগবান রক্ষা করেছেন?'

কিন্তু ভগবানকে আমি দেখিনি। আমি চোখ বন্ধ করে কয়েক ঘণ্টা আগের দৃশ্যকে ফিরিয়ে এনে দেখতে লাগলাম। জলে ঝাঁপ দেবার আগে যে আমাকে হাসিমুখে দু-হাত ধরে ঠেলে দিল, তাকে যে আমি চিনি। তার ওই টুকটুকে রঙ, মাথায় কালো চুলের নীচে কপালে বড় করে দেওয়া লাল সিঁদুরের টিপ তো আমার মন থেকে মুছে যায়নি। কতদিন রান্নাঘরে গিয়ে দৌরাত্ম্য করলে পরে আমাকে হাসিমুখে ওমনি করেই ঠেলে দিয়েছে মামীমা।

মানুষ অনেক সময় শৈশবেই অদ্ভুত অনুভূতি পায়। সবাই যখন একে-একে ঘর ছেড়ে চলে গেল, তখন আমি আস্তে আস্তে মাথাটা তুলে মাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'মা, মামীমা কি বেঁচে নেই?'

মা যেন একটু চমকে উঠে হাত বাড়িয়ে আমার মাথাটা বালিশের উপর ধীরে ধীরে নামিয়ে দিলেন। তারপর একটু চুপ করে থেকে নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'পাঁচদিন হল মারা গেছেন, কিন্তু তুই কী করে জানলি? আমরা তো সবে আজ সকালে চিঠি পেলাম।'

শ্রাবণ ১৩৯৬

ভূতেরা এখন

তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

মানুষের মধ্যেই তাদের বাস। একই জনপদে। দেশ আর কাল এক, কেবল ভিন্ন স্তর আর মাত্রার বিন্যাসে তাদের সমাজ আলাদা। কত গল্প তাদের নিয়ে, কত উপকথা, ছড়া আর প্রবচন। বেশ ভালো আছে দুই সমাজ, পাশাপাশি, আজ বহুদিন ধরে। যতদিন মানবসমাজ, প্রায় ততদিনই ভূতসমাজও। প্রতিবেশী হলেও উভয় সমাজের সদস্যদের যোগাযোগ হয় কম। আগে তবু হত, এখন বড্ড বেশি আলো আর সভ্যতার ধুমধাড়াক্কার চোটে কেউ কারো দেখা পায় না। এ ভালো কথা নয়।

সেদিন সন্ধেবেলা জেগে ওঠার পর থেকে ক্রমাগত মাকে বিরক্ত করে যাচ্ছিল নোংরা। নোংরার মা অতিষ্ঠ হয়ে শেষে বলে ফেলল, বাঁচ, বাঁচ, তুই বাঁচলে আমি মরি—

বকা খেয়ে নোংরা একগাল হেসে বাতাসে ভর করে চলে গেল নদীর ধারের ঝুপসি জিলিপি ফলের গাছটায়। সেখানে জড়ো হয়েছে শুঁটকি, পোকা, নিমকি, গোবর—এককথায় মশানপাড়ার সব ছেলেপুলে। এখন থেকে দুপুর রাত্তিরে খাওয়ার সময় পর্যন্ত চলবে খেলাধুলো। গোটাকতক আলেয়া ধরে রাখা আছে, সেগুলোকে তাড়া করে খেলা হবে।

শেওড়া গাছের নিচু ডালে বসে গতমাসের ভয় দেখানোর হিসেব দেখছিল মশানপাড়ার কমিশনার কলেরা পাঁচু। সেখান থেকেই পা দোলাতে দোলাতে সে বলল, নোংরার মা, যতই রাগ হোক, ছেলেপুলেকে বাঁচার গাল দিতে নেই। দিন দিন কী হচ্ছে?

নোংরার মায়ের নাম পোড়ানি। সে হেসে বলল, ভয় নেই কলেরা ঠাকুরপো, মায়ের গালে ছেলে বাঁচে না। তোমার হিসেব কদ্দূর হল?

হিসেব তো হল, কিন্তু মন বড় খারাপ হয়ে যাচ্ছে বৌদি—

কেন, কেন?

মশানপাড়া ওয়ার্ডে যুবক ভূত আছে অন্তত বাহান্নজন। গেল সভায় তাদের মাথাপিছু পাঁচজন করে মানুষকে ভয় দেখানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তাহলে মোট কত হয়? দুশো ষাট জন। আজ পর্যন্ত কত হয়েছে জানো? মাত্র ছিয়ানব্বই জন। তাও প্রকৃত ভয় পেয়েছে কুড়ি জন, বাকিরা চোখের ভুল কিংবা ঘুমের ঘোরে দেখা স্বপ্ন বলে উড়িয়ে দিয়েছে।

পোড়ানি সময়োচিত বিষণ্ণ মুখ করে বসে রইল। সমাজের পরিবর্তন, সভাসমিতি—এসব জটিল কথাবার্তা তার মাথায় ঢোকে না। কিন্তু পোড়ানি লক্ষ করেছে এসব কথা বলা আজকালকার ফ্যাশান। আলোচনা করতে গেলে বেফাঁস হয়ে পড়বার সম্ভাবনা, কাজেই বুঝদারের মতো চুপ থাকাই ভালো।

কলেরা পাঁচুর মাঝে মাঝে সত্যিই মন কেমন করে। সে আজকের ভূত নয়। সিপাহি বিদ্রোহের পরে পরেই মুর্শিদাবাদ জেলার কলেরা মড়কে সে ভূতজন্ম পায়। দুশো বছরে কত লোককে সে ভয় দেখিয়েছে, ঝুপ ঝুপ বর্ষার দিনে জোলো বাতাসে ভর দিয়ে মেঘলা আকাশের নীচে ভেসে বেড়িয়েছে। আর এখন সব গেল। কোথায় সেই সবুজ ধানক্ষেত, এখানে-ওখানে ছড়িয়ে থাকা পোড়ো বাড়ি, সন্ধের পরে জ্বলে ওঠা জোনাকি। একটু একটু করে শহর এগিয়ে এসে গ্রাম খেয়ে ফেলেছে। তারপর আছে তীব্র ইলেকট্রিক আলোর বন্যা। পাঁচজন ভূতেই বলুক, অত আলোয় স্বচ্ছন্দে বাস করা অসুবিধে না? এই তো খন্তাই সুখে থাকত পুবপাড়ার বটগাছে। আজ দেড়শো বছরের পারিবারিক ভিটে তাদের। হঠাৎ গতবছর থেকে সেই বটগাছের পাশে বিরাট বাড়ি উঠছে। এক ধরনের লোক

হয়েছে আজকাল, তাদের বলে প্রোমোটার, তারাই বাড়ি তুলছে। দুমদাম ঝনঝন খটাংখট আওয়াজ, লরি আর পে-লোডারের আনাগোনা, শতেক মানুষের দিনরাত চিৎকারে খন্তাই উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে বটগাছ ছেড়ে পালিয়েছে। নতুন বাসস্থান না পেয়ে এখন সে রেললাইনের ধারে কনডেম্‌ড কেবিনঘরে কোনোমতে মাথা গুঁজে আছে। ভূতসমাজের দিক থেকে অবশ্য এই অত্যাচার এবং অসম্মানের প্রতিশোধ নেওয়া হয়েছে। শহরের লোকাল মস্তান দাদাকে প্রভাবিত করে তাকে দিয়ে হাঙ্গামা বাধানো হয়েছে। প্রণামীর টাকা না পেলে তারা বাড়ির কাজ করতে দেবে না। বাধ্য হয়ে প্রোমোটার টাকা দিয়েছে, এবং সেই ক্ষতি পুষিয়ে নেবার জন্য কম ভাগে সিমেন্ট, গঙ্গামাটি আর দু'নম্বর মালমশলা দিয়ে গাঁথুনির কাজ চালাচ্ছে। ভূতসমাজ গভীর আশা পোষণ করে এ বাড়ি অচিরে ভেঙে পড়বে।

আজ একটু বেশি রাত্তিরে পাঁচুর পাড়ার খেঁদি ভূতিনীর বিয়ে। পাত্র হল বীরভূম তেলিপাড়া মহাশ্মশানের এক নব্য ভূত। গত হপ্তায় সে দলবল নিয়ে পাত্রী দেখতে এসে খেঁদির দুধে-আলকাতরা রঙ, ঠোঁটের দু'পাশ দিয়ে বেরিয়ে থাকা শ্ব-দন্ত আর মাথাভরা উলকুটি-ধুলকুটি চুল দেখে মুগ্ধ হয়ে ফিরে গিয়েছিল। তাছাড়া মেয়ে কত কাজের দেখাবার জন্য বাড়ির লোকেরা পাত্র খেতে বসলে খেঁদিকে দিয়ে পরিবেশন করিয়েছিল। পরিবেশনের সময়ে খেঁদির মাথা থেকে বরের পাতে আট-দশটি উকুন পড়ে। তা দেখে আত্মহারা পাত্র বাড়ি গিয়ে নাকি বলেছে—এ মেয়ে ছাড়া সে বিয়ে করবে না। তাহলে একরকম পছন্দের বিয়েই বলা যেতে পারে। খুব জাঁকজমক হবে। গায়ে পাঁক মেখে, চুলে ধুলোর গুঁড়ো ছড়িয়ে যতরকম সম্ভব ভালো সাজগোজ করে পাঁচু নেমন্তন্ন খেতে যাবে। শোনা গেল আনন্দিত খেঁদির মা সকাল থেকে মেয়েকে বারবার আশীর্বাদ করছে—এত ভালো পাত্রও তোর কপালে ছিল মা! এখন প্রার্থনা করি, সারামরণ তোদের অশান্তিতে কাটুক, শীগগির ডাইভোর্স হোক—

পুলকিত খেঁদি মাকে প্রণাম করে বলেছে—তোমার আশীর্বাদ যেন সত্য হয় মা—

শেওড়া গাছের নীচে বসে নোংরার ছোট ভাই নোনতা সেই কখন থেকে একঘেয়ে সুরে বায়না করে যাচ্ছে—আঁমি পঁচা মাঁছ খাঁবো। অঁ ম্যাঁ গঁ, পঁচা মাঁছ খাঁবো—

অতিষ্ঠ হয়ে পোড়ানি বলল, আর পারিনে রে বাপু! সন্ধে থেকে বায়না চলেছে! আমরা কি বেম্মদত্যি না মামদো, সে কথায় কথায় দামি খাবার খাওয়াব? আমরা সাধারণ ঘরের পাঁচমিশেলি ঘাঁটা ভূত, রোজদিন কি ঘরে পচা মাছ থাকে? এখন দুটো টাটকা মাছ যাহোক করে খেয়ে নে, তারপর দুপুর রাত্তিরে খেঁদির বিয়েতে পেটভরে পচা মাছ খাবি—

গাছের ডাল থেকে কলেরা পাঁচু বলল, শুধু কি তাই? আরো কী কী খাওয়াচ্ছে শুনবে নোংরার মা? শকুনের ডিমের ওমলেট, বাসি চাটনি—

মেয়েদের নোলা দেখাতে নেই। খুব লোভ হলেও পোড়ানি অন্যমনস্ক হওয়ার ভান করল।

হিসেব শেষ করে গাছের ডাল ছেড়ে বাতাসে ভাসল পাঁচু। পাড়ার একেবারে শেষে একটা তুঁতঝোপে থাকে তার বন্ধু দন্তাই, কিছুদিন ধরে তার শরীর ভালো যাচ্ছে না। একবার দেখতে যাওয়া দরকার।

বন্ধুর বাড়ি পৌঁছে পাঁচু দেখল ব্যাপার খুবই গুরুতর। চালতে গাছের গা বেয়ে ওঠা তেলাকুচো লতার দোলনায় দুলতে দুলতে দন্তাই আধুনিক বাংলা কবিতা আবৃত্তি করছে, আর ঝোপের পাশে বসে কান্নাকাটি করছে বাড়ির লোকজন। পাঁচুকে দেখে দন্তাইয়ের ভাই খন্তাই এগিয়ে এসে বলল, পাঁচুদা, সর্বনাশ হয়েছে! দাদাকে বোধহয় মানুষে পেয়েছে। ইদানিং বড্ড মানুষের পাড়ায় ঘোরাঘুরি করত, সবাই কত বারণ করতাম—সে কথা শুনত না। ও পাড়ার বাতাস তো ভালো নয়, ছোঁয়াচ লেগে গিয়েছে—

পাঁচু জিগ্যেস করল, কী দন্তাই, এসব কী হচ্ছে?

দুলতে দুলতেই দন্তাই প্রথমে হিঃ হিঃ করে হাসল, তারপর বলল, বাতাসে লোহার ঘ্রাণ, পরবশ প্রার্থনায় কাটে দিন, কাটে ঘন হিম রাত। কার ছবি অন্ধকারে? মৃগয়ায় বেরিয়েছে কোন সে কিরাত?

তারপরেই আবার হিঃ হিঃ হিঃ।

ধাক্কা খাওয়ার মতো করে পিছিয়ে এল পাঁচু। তার মুখে ভয় ও বিস্ময়।

খন্তাই বলল, শুনলেন পাঁচুদা? এইরকম চলছে আজ তিনদিন।

কিন্তু এসব কী বলছে দন্তাই? এর মানে কী?

মানে তো জানি না। তবে একে বলে আধুনিক কবিতা। বাজারে খুব কদর। শুধু কি কবিতা? এদিকে আসুন, দাদার কাণ্ড দেখাই—

তুঁতঝোপের পেছনে সামান্য একটু খোলা জায়গা ঘিরে কয়েকটা কাঁটাওয়ালা বাবলা গাছ। গাছেদের গায়ে কাঁটায় ফুটিয়ে কয়েকটা কাগজ টাঙানো। তাতে রঙিন হিজিবিজি কীসব আঁকা। খন্তাই বলল, দেখেছেন? ছবির একজিবিশন।

বিস্মিত পাঁচু জিগ্যেস করল, এ কার আঁকা?

সব দাদার। দু'দিন ধরে ছবি এঁকে গাছে টাঙিয়েছে। আমরা খুলে ফেলতে চেষ্টা করলে কামড়াতে আসছে। খুব বিপদ পাঁচুদা।

পাঁচু কাছে গিয়ে প্রথম ছবিটা দেখল। সবুজ রঙের একটা গোলমতো, তার নীচে কয়েকটা ঢেউ খেলানো খয়েরি দাগ, ডানদিকে আর বাঁদিকে চারটে বাঁশগাছ ঠেলে আকাশের দিকে উঠেছে। হঠাৎ দেখলে মনে হয় বাঁশঝাড়ের ভেতর দিয়ে নদীর ওপারে সূর্যাস্তের ছবি। কিন্তু নীচে লেখা আছে—জ্যোৎস্নায় তাজমহল। পরের ছবিতে একটা নীল লম্বা দাগ, সেই দাগের ওপর একটা হলুদ ত্রিভুজ, পাশে পাখির খাঁচার মতো কী যেন। তলায় লেখা—স্নানরতা নারী। বাকি ছবিগুলোর দিকে হতভম্ব পাঁচু ভয়ে এগুলো না।

খন্তাই বলল, কী বুঝছেন পাঁচুদা?

বুঝব আর কী? মানুষেই পেয়েছে। তুই একবার কানকুলো বুড়োকে খবর দে, সে এসে স্বস্ত্যয়ন করুক, ভূতপত্রীর পুঁথিটা একবার পড়ুক, দোষ কেটে যাবে এখন। সামনের শনিবার রাত্তিরে করতে পারিস। রাত্তিরটা ভালো, ত্র্যহস্পর্শ। পাঠ শেষ হলে পাড়ার ভূতসকলকে প্রসাদ খাইয়ে দিস। দশ কিলো ব্যাঙ আর পাঁচ কিলো গিরগিটিতেই কুলিয়ে যাবে। খরচ বাড়াস না—

তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, আজ আমার বহুদিনের একটা ধাঁধা কেটে গেল।

কী পাঁচুদা?

ভয় দেখানোর ডিউটিতে ঘুরতে ঘুরতে শহরের অনেক জায়গাতেই এরকম ছবি টাঙানো দেখেছি। ভাবতাম এগুলো কারা করে। আজ বুঝতে পারছি আমরাই উৎস। ভূত পাগল হলে এসব আঁকে।

খন্তাই বিষণ্ণমুখে চুপ করে রইল।

খেঁদির বিয়ের উৎসবে রাত্তিরে মশানপাড়ায় বেশ বড়রকমের একটা হট্টগোল বাধল। বরযাত্রী এসেছিল প্রায় পঞ্চাশজন ভূত। তাদের মধ্যে কেউ কেউ গিয়ে বিবাহবাসরের আশেপাশে শেওড়া আর বেলগাছের ডালগুলো দখল করে চড়ে বসল। বাকিরা দাঁড়িয়ে একি-ওদিক তাকাচ্ছে, এমন সময় ব্যস্ত হয়ে খেঁদির কাকা ছারমুই এসে বলল, আসুন, আসুন! দাঁড়িয়ে কেন সব? এই এখেনে এসে বসুন—

বরযাত্রীদের মধ্যে একজন বলল, ওই ওখেনে? মাটিতে বসব? কেন বলুন তো? বাকিরা তো সব সুন্দর গাছের ডালে জাঁকিয়ে বসেছে। আমরা কী অপরাধ করলাম?

আজ্ঞে, ওঁরা নিজেরাই ওখেনে গিয়ে বসেছেন। আমরা তো বসাইনি। আমরা সবার জায়গা উঠোনেই করেছিলাম। দেখুন না, কেমন শ্মশান থেকে আনা মড়ার গদি পেতে দিয়েছি—

একজন রগচটা লোক বলল, আপনি বসুন গিয়ে মড়ার বিছানায়, আমরা নিচু আসনে বসব না। তেলিপাড়া গঙ্গাযাত্রা ইউনিয়নের নাম শুনেছেন? আমরা সেই ইউনিয়নের মেম্বার। আমাদের যা তা ভূত ভাববেন না—

ঘাবড়ে গিয়ে ছারমুই বলল, না, না! তা কেন? আপনারা সকলেই মাননীয় ভূত।

সে মান দিচ্ছেন কোথায়? যারা গাছের ডালে গিয়ে বসেছে তারা কারা জানেন? তারা হচ্ছে গাত্রদাহ অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য। ওদের গুরুত্ব কি আমাদের চাইতে বেশি?

না, না, সে কী কথা! আপনারা সবাই সমান—

গাছের ডাল থেকে একজন মাতব্বর ভূত বলল—ও আবার কী? **সমান** কেন হব? আমরা সম্মানে ও প্রতিষ্ঠায় বড়। জানেন, আমাদের অদৃশ্য প্ররোচনায় গত এক বছরে দেড়শো গৃহবধূকে পুড়িয়ে মারা হয়েছে? বাষট্টিজন গায়ে আগুন দিয়ে আত্মহত্যা করেছে? আমাদেরই গোপন উৎসাহে সারা দেশে সতেরোটা নাশকতামূলক অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে? গাত্রদাহ অ্যাসোসিয়েশনের অবদানকে বাদ দিয়ে ভূতসমাজের প্রকৃত ইতিহাস লেখা যায় না।

গঙ্গাযাত্রা ইউনিয়নের একজন বলল, খালি বড় বড় কথা! পাড়ার বাইরে কে চেনে ওদের?

খেঁদির বাবা আরমুই এসে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে তখনকার মতো বিরোধ মিটিয়ে দিল।

পরিবেশনের সময় আর একটা ঝামেলা বেধেছিল! চাটনির স্বাদ ভালো হওয়ায় সবাই দু'তিনবার করে চেয়ে নিচ্ছিল। গাত্রদাহ অ্যাসোসিয়েশনের ভূতেরা চেঁচামেচি শুরু করে—এ কী মশাই! আমাদের পাতে যা দিলেন, এ তো তিনদিনের বেশি বাসি নয়। ওদের তো গতহপ্তার চাটনি দিচ্ছেন—

আরমুই বিনীতভাবে বলল, মাননীয়গণ, আপনারা সবাই বরযাত্রী। একই দলে এক জায়গা থেকেই এসেছেন। নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করেন কেন?

ইউনিয়নের লোকেরা বলল, নিজেদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝিই তো বেঁচে থাকার সার্থকতা।

অ্যাসোসিয়েশনের মেম্বাররা বলল—ভ্রাতৃবিরোধের আনন্দ থেকে আমাদের বঞ্চিত করবেন না।

দুই দলের লোক একসঙ্গে বলল, জয় হাঙ্গামা! লাগাও কাহুটাল!

নিমন্ত্রিতদের খাবার সাপ্লাই করেছিল মড়কানন্দ ময়রা। খবর পেয়ে সে এসে বলল, দাদারা, আমি পচা কুকুর ছাড়া, পচা খাবার ছাড়া দোকানে রাখি না। আপনাদের মতো মানুষকে কি টাটকা খাবার দিয়ে ঠকাতে পারি? খবর নিয়ে দেখবেন মানুষজন্মে দোকান থেকে বিয়েবাড়িতে পচা দই সাপ্লাই করে মানুষ মারবার কারণে গণধোলাইতে আমি ভূতজন্ম পাই। টাটকা খাবার কাকে বলে আমি জানিই না। মনে সন্দেহ না রেখে প্রাণভরে খান দাদারা, আমি জামিন—

পাঁচু ইউনিয়ন করা ভূত। স্বজাতির অধঃপতন দেখে সে পরের সপ্তাহে ব্রহ্মডাঙার মাঠে এক বিরাট মিটিং ডাকল অঞ্চলের সব ভূতেদের নিয়ে। পাঁচু তাদের বলল, ভাইসব, মানুষ আমাদের বড্ডই ক্ষতি করেছে। আমরা তাদের কাজকর্মে কখনো নাক গলাইনি। পোড়ো বাড়ি, অন্ধকার রাত্তির, শ্মশান-মশান নিয়ে বেশ ছিলাম। পাজি মানুষেরা আমাদের সব সুখ কেড়েছে। পোড়ো বাড়ি ভেঙে পাঁচতলা ফ্ল্যাট উঠছে, শ্মশানে আলোর বন্যা, সেখানে ইলেকট্রিক চুল্লি বসেছে, যুক্তিবাদী সমিতির লোকেরা গ্রামে-গঞ্জে ঘুরে বক্তৃতা করে সবাইকে বোঝাচ্ছে আমরা নাকি নেই। দশরথের ছেলেও আমাদের এত ক্ষতি করতে পারেনি। বেশ, আমরাও মজা বোঝাচ্ছি মানুষদের। আসুন ভাইসব, আমরা দলে দলে ভাগ হয়ে মানুষের বুদ্ধি দখল করি। তারা যা করতে চাইছে, তার উল্টোটা করাই। কেউ প্রশাসকদের কাছে যান, কেউ যান জনপ্রতিনিধিদের কাছে। খবরের কাগজের ভার নিক একদল, আর একদল যাক ডাক্তারদের কাছে। শিক্ষক, অধ্যাপক আর পড়াশুনোর সিলেবাস যারা তৈরি করে তাদের তো আমরা এর আগেই দখল করেছি। এভাবেই ভুতুড়ে বুদ্ধি ছড়িয়ে দিই মানবসমাজের সর্বস্তরে। সবাই বলুন—ভূতের জয়!

নিজেদের কাজ বুঝে নিয়ে বাতাসে মিশে গেল তারা। ছড়িয়ে পড়ল নতুন কর্মক্ষেত্রে।

এ হল আজ থেকে এক কি দেড় দশক আগেকার কথা। ভূতেরা খুব বিবেকবান কর্মী। তারা কাজে ফাঁকি দেয় না। নতুন কর্মসূচীতে তারা কতখানি সফল সেটা এই যুগে যাঁরা বেঁচে আছেন তাঁরা বুঝতেই পারছেন। ভয়ে ভয়ে বেঁচে থাকা ছাড়া এর থেকে রেহাই পাওয়ার তো কোনো পথ দেখছি না।

——

আশ্বিন ১৪০৭

তেলেস্‌মাতি' বাড়ি

আবদুল জব্বার

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার প্রফেসার হয়ে এল নাজিমউদ্দিন। হুগলির ফুরফুরা শরীফের কাছে বাড়ি তাদের। কলকাতায় তাদের পৈতৃক ব্যবসা আছে বই বিক্রি আর বাইন্ডিংয়ের। কলকাতায় থেকেই পড়াশুনো করেছে নাজিম।

বিয়ের পর চাকরিও মিলে গেল। ফার্স্ট ক্লাসের ওপর তলায় নম্বর মিলেছিল তার। ডক্টরেটও করেছে।

স্ত্রী জাহানারা লাজুক আর ভীতু স্বভাবের মেয়ে। গ্রামে থেকেই বি এ পাশ করেছে। তাকে নিয়ে আসতে হল বর্ধমানে। ট্রেনে চড়তেও তার ভয়। সে ভয় ক্রমে ক্রমে অবশ্য কেটে গেল।

নাজিম এক মুসলিম পরিবারে সপ্তাহ খানেক কাটানোর পরে শহরের পশ্চিম দিকের একটি বাগানের মধ্যে চমৎকার একখানা চার কামরার দোতলা বাড়ি ভাড়া পেলে। পেছনে শানবাঁধানো বড় পুকুর। বাগানে গাছপালা। কবরখানা। ভাঙা পড়ো হাওয়াখানা। জমিদারশ্রেণির লোক যাঁরা এ বাড়ির মালিক, সবাই নাকি 'বাংলাদেশে' চলে গেছেন। কেয়ারটেকার বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের এক কেরানি। ফরসা পাতলা চেহারার আধবুড়ো গোলাম হোসেন খাঁ।

এমন বাড়ি পড়ে থাকে কেন এ প্রশ্ন অবশ্য মনে এসেছিল নাজিমের। গোলাম হোসেন উত্তর দেয়, 'কে নেবে—কার এমন ধক্ আছে! তাছাড়া নির্জনতা আপনি যেমন ভালোবাসেন, সবাই কি তা চায়? তিনদিকেই ফাঁকা মাঠ।'

গোটা বাড়িটাই মাত্র পাঁচশো টাকা। সে দুটো-তিনটে টিউশনিতেই জোগাড় হয়ে যাবে।

কাজের মেয়ে গোলাপী বিবিকে আনতে হয়েছে দেশ থেকে। রাঁধাবাড়ায় তার চমৎকার হাত। তাছাড়া একাই বা জাহানারা থাকবে কি করে?

বিকালে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফেরার সময় কাছের দোকানে সাবান, সেন্ট, পাউডার, পাঁউরুটি, মাখন, বিস্কুট কেনার পর দোকানদার কোথায় কোন বাড়িতে সে উঠেছে জেনে নেবার পরে বলেছে, 'ওটা তো ভূতের বাড়ি! ওখানে কেউ থাকতে পারে না। সবাই পালায়।'

হেসেছে নাজিম। বলেছে, 'আমি ভূতে বিশ্বাস করি না। যাদের বুদ্ধি কম, সাহস নেই, আধিভৌতিক কল্পনা আছে, তারা নিজের ছায়াকেও ভূত দ্যাখে।'

কথাটা জাহানারাকে বলেনি। এমনিতেই সে ভীতু। জোঁক দেখলেই লাফ দেয়।

গোলাপী কিন্তু খুব সাহসী মেয়ে। একাই থাকবে সে নীচের ঘরে। প্রথম দু'দিন অবশ্য দোতলায় পাশের ঘরে ছিল। রাত্রে বাঁশবনের দিকে কবরখানায় কি যেন শব্দ হয় দীর্ঘ সুরেলা লয়ে—'ক্যাঁ ও ও ও ও....'

জাহানারারও কানে পড়েছে।

'কি শব্দ গো ওটা?'

'ও কিছু না। ঘুমোও। রাত জাগলে মাথা গরম হয়, তখন টিকটিকির ডাক শুনে মনে হয় স্কুটার ছুটে গেল! কটা বাঁশ লম্বা হয়ে তেঁতুল গাছের ওপর শুয়েছে। বাতাসে দোলা খেলে ডালের গায়ে ঘর্ষণ খায়—তাই ক্যাঁওও করে শব্দ ওঠে। বড় মাছের ঘাইও শোনা যায় পুকুরে। এটা নাকি পীরের পুকুর। কেউ মাছ মারে না। তেঁতুল গাছে অজস্র তেঁতুল হয়, কেউ পাড়ে না—কাঠবিড়ালিতে খায়। পুকুরের পানি স্বচ্ছ হলেও জলজ ঘাসের জন্য যেন কালো দ্যাখায়।'

জাহানারা প্রতি ওক্ত নামাজের পর কোরআন শরীফ পড়ে সুর করে। তার ধারণা, ভূত থাকলে তাতে ভেগে যায়।

গোলাপী আবার এক কাঠি বাড়া। বলে, 'ভূত কলমা-দরুদে ভাগে বটে, মামদো ভূত হলে ভাগে না গো বউমা।'

মামদো ভূত নাকি মুসলমান লোকের 'রুহ্' (আত্মা) বদ হয়ে গেলে হয়—যারা গলায় দড়ি দিয়ে কিংবা বিষ খেয়ে অথবা পুকুরে ডুবে অনেক কষ্ট পেয়ে মরে।

কথাগুলো যেন জাহানারার মনে গেঁথে যায়। গোলাপী বিবি উত্তরদিকের ঘোষপাড়া থেকে দুধ আনতে যায় আর এ বাড়ির অনেক কথা শুনে আসে। সব কথাই সে বলে জাহানারাকে। রং চড়ায়ও কথার মধ্যে।

এই বাড়ি নাকি অভিশপ্ত। তিন তিনটে লোক মরেছে। পুকুরে ডুবে মরেছে একটা বউ। ঐ পুকুরে সে গা ধোয় আর চুল ঝাড়ে শানের ঘাটে শব্দ করে। অমাবস্যা আর পূর্ণিমা রাতে তাকে নাকি দ্যাখা যায়।

বিষ খেয়ে মরেছে মেজোকর্তা। সেই বৌটারই স্বামী।

নাজিম সব শোনে। আমল দেয় না। বলে, 'ভূতের গল্প সবই মানুষের বানানো। উদ্দেশ্য, ভয় দ্যাখানো বা মজা করা। দুর্বল লোক বুদ্ধিহীন হলে সে নিজের ভুল কাজে নিজেই কাবু হয়। এসব বিশ্বাসে 'ইমান' (আস্থা) হারায়। মনে মনে ভূতপ্রেতকেই পুজো করে।'

একদিন রাতে কিন্তু নাজিমই বিভ্রান্ত হয়ে গেল। কার যেন পায়ের শব্দ দোতলার বারান্দা ধরে এগিয়ে যায়। জাহানারা তখন ঘুমোচ্ছে।

গোলাপী বিবিও নীচের ঘরে নাক ডাকাচ্ছে। ঘর-দোর সব বন্ধ। ছাদের ওপরে কি যেন ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। এ শব্দটা খিরিশ গাছের ডাল বেয়ে এসে ভাম বা উদ্‌বিড়াল পড়ার হতে পারে; কোনো কোনো এলাকায় এই প্রাণীটাকে 'মাছ-বাঘরোল'ও বলে।

কিন্তু স্পষ্ট যেন মানুষের হাঁটার শব্দ—দুম দুম করে চলে যায়। বাঁ হাতে টর্চ আর ডান হাতে লোহার রড নিয়ে খুব আস্তে আস্তে বেরোয়। অবশ্য দোর খোলার একটু শব্দ হয়ে যায়। কিন্তু কেউ কোথাও নেই।

নীচে নেমে আসে। ভিজে পায়ের দাগ! বাথরুম থেকে গোলাপীর ঘরের দোর পর্যন্ত।

গোলাপীই তাহলে বাইরে গিয়েছিল? তাই হবে। পুরুষদের মতো খড়ম-পা নয়। পেট-চাপা একটু ছোট ছোট পায়ের ছাপ। এসে শুয়ে পড়ল।

এটা-সেটা দেখে, নানান কিছু সন্দেহ করে মাসখানেক কেটে গেল। মানুষ আশ্চর্য হয়। নাজিমরা এখনো বাস করছে? নাজিম বলে, 'আমি তো ভূত ছাড়াতে জানি!' হাসে সে।

কিন্তু একরাত্রে গোলাপী গোঁ গোঁ করে কাঁদতে লাগল। অস্পষ্ট ভাষায় কেবলই গোঁয়াতে থাকে অনেকক্ষণ। গলা টিপে ধরেছে কেউ?

নীচে নেমে এসে ডাকে নাজিম। দোরে ঘা মারে। কতক্ষণ পরে জেগে যায় গোলাপী। ঘামে ডুবে গেছে তার সর্বশরীর। বলে, 'একটা বিস্তর চুলওলি কালো শাড়িপরা বউ আমার বুকে চেপে বসেছিল—আমাকে জোর করে যেন গেলাসভরা নিমছাল পেষা কষ খাওয়াতে চায়।'

'তুমি খেলে না কেন? তোমার রোগ ভালো হয়ে যেত। মহিলা মামদো ধরেছিল তোমাকে। সে কারো ভালো বই মন্দ করে না।' বলে হাসে নাজিম। জাহানারাকে বলে, 'আসলে গোলাপীর তেল-ঝাল-চর্বি জাতীয় খাদ্য খেয়ে হজম হয়নি, পেটে গ্যাস জন্মেছে—ব্রেনের শিরা বিশ্রাম নেয় ঘুমের সময় কিন্তু উত্তপ্ত হবার ফলে ঐসব মনের বা চিন্তার অথবা ধারণার ছবি তৈরি হয়ে স্বপন দেখেছে।'

ক্রমেই সব তত্ত্ব ঠেলে দিয়ে বছর কেটে গেল। আর ভয় নেই। কোনো প্রাকৃতিক কারণের সূত্র খুঁজে না পেয়ে বুদ্ধি হারায়নি নাজিম। তাদের পুত্রসন্তান এসে গেল।

শুরু হল এবার মামদোর উৎপাত। একুশ দিন যাবার পর বাচ্চার দোলা যেন কোন অদৃশ্য শক্তির টানে দুলতে থাকে। বাচ্চা কাঁদলে কে গালে থাবা মেরে মেরে থামায়! রান্নাঘরের মধ্যে থেকে মনে করেছে বোধহয় গোলাপী। কিন্তু কই না তো, সে তো তখন ঘাটে মাছ রগড়াচ্ছে।

কে বাচ্চাকে তাহলে বোতল ধরে দুধ খাওয়াল? নীচেয় খালি বোতল বসানো আছে!

ক্রমেই আরো ঘন হয়ে এল সেই আসা-যাওয়া। নাজিম ছাত্রদের পড়ানো, খাতা দ্যাখা, ডিউটিতে যাওয়া নিয়ে ব্যস্ত। স্কুটারে যাতায়াত করে।

একদিন বাচ্চাকে দুধ খাইয়ে তাকে কোলে নিয়ে বসে বসেই ঘুমিয়ে গিয়েছিল। কে যেন খুব আলতো হাতে বাচ্চাকে তুলে নিয়ে শুইয়ে দিয়ে তাকেও ঠেলে ঠেলে শুইয়ে দিল। ভয়ে চোখ মেলল না জাহানারা। কি করে দ্যাখা যাক। মাথার চুলে তেল দিয়ে আঁচড়ে দিচ্ছে। পা টিপে দিচ্ছে। বলল, ‘গোলাপী ‘বুবু’ (দিদি) নাকি!’

‘হুঁ।’ উত্তর পেলে।

অকাতরে ঘুমিয়ে গেল জাহানারা।

ছুটি পড়তে তারা বাড়িতে এল। গোলাপীও এল সঙ্গে। বাড়ি পড়ে রইল তালাচাবি আঁটা। কোনো চোর-ডাকাতও ওখানে যাবে না।

ফিরে এসে দেখল সত্যিই তাই।

ঝাঁটপাট দেওয়া চকচকে ঘরকন্না।

তিন-চার ঘণ্টা হল তারা ফিরেছে—গোলাপী রান্নার জোগাড় না করে ছেলে বয়ে এসে ঘুমিয়ে গেল। যদিও গোলাপী রান্না করেছে তবু গল্প ফাঁদে ঃ ‘গরম ভাত-তরকারি রান্নাবান্না করা তো আছে। ডাল, কলিজি আর আলুভাজা। সেদ্ধ ডিম। কে এসব করে রাখল? আমরা আজ আসব জানলই বা কেমন করে?’

নাজিম এ রহস্যের কিছু সমাধান খুঁজে পায় না।

‘তবু অদৃশ্য কেউ অমঙ্গল তো করেনি? দুর্ঘটনা না ঘটালেই হল। রোজ রান্না করে রাখলে তো আরো ভালো। তাহলে বিবি গোলাপজানকে বিদায় আদায় করে দিই।’

জাহানারার স্বপ্নে একদিন দর্শন দিল একটি বউ।

‘কে তুমি ভাই?’

‘এ বাড়ির মেজোবউ—রঙ্গিলা বেগম।’

‘তুমি প্রেতাত্মা হয়ে গেছ?’

‘হাঁ, মেয়ে-মামদো। আমি তোমার বাচ্চাকে ভালোবাসি। তোমাকেও ভালোবাসি। আমার মেজোকর্তা আমাকে গলা টিপে মেরে ফেলে পুকুরে ডুবিয়ে দেয়। তুমি আমাকে ভয় পেও না। আমি তোমার কোনোরকম ক্ষতি করব না।’

‘তোমার স্বামীও মামদো-ভূত হয়েছে?’

‘হাঁ। শ্বশুরও। এই বাড়ির সবাই ‘বাংলাদেশে’ চলে যেতে তারাও তাদের খোঁজে চলে গেছে, আর আসে না।’

স্বপ্নের ব্যাপারটা জাহানারা নাজিমকে বলতে সে কিছু উত্তর দিতে পারল না। শুধু তাকিয়ে রইল। এরপর জাহানারার আর সহজে ঘুম ভাঙে না। সে ঘুমোলেই অন্য জগতে চলে যায়—কতরকম স্বপ্ন দ্যাখে। স্বপ্ন দেখতে সে ভালোবাসে।

বড় ডাক্তার দ্যাখানোর পর জাহানারার সুস্থতা ফিরে এল।

‘তেলেস্‌মাতি’ বাড়ির অপবাদ দূর হয়ে গেল। এসব কীর্তিকলাপের গল্প প্রতিবেশীরাই বানায়।

আশ্বিন ১৪০৭

অলৌকিক জিপ

পরেশ দত্ত

হাবিবপুরে এসে ওরা শুনল মাইল তিনেকের মধ্যে একটা দারুণ সুন্দর পাহাড়ি ঝরনা আছে। খবরটা প্রথম নিয়ে এল বিশু আর বাপ্পা। ওরা ঝরনা দেখতে যাবে শুনে ওদের ছোট বোন টুটুল আর মুনমুনও ধরে বসল তাদেরও ঝরনা দেখাতে নিয়ে যেতে হবে।

দিন পাঁচেক আগে দক্ষিণ বিহারের হাবিবপুরে বেড়াতে এসেছে দুটি পরিবার। বিশু আর মুনমুনের বাবা সরোজ বোস কলকাতার এক বড় ফার্মের মালিক। বাপ্পা আর টুটুলের বাবা রঞ্জন দত্ত কলকাতা হাইকোর্টের প্রথম সারির অ্যাডভোকেট। দুটি পরিবার বহুদিন খুব ঘনিষ্ঠ। ফি বছর পুজোর ছুটিতে কলকাতার বাইরে বেশ কিছুদিনের জন্য বেড়াতে যাবেনই।

এবার তাঁরা এসেছেন হাবিবপুরে। রেলস্টশন থেকে অনেকটা দূরে হলেও স্বাস্থ্যাবাস হিসাবে জায়গাটার সুনাম আছে। নদীর ধারে ছোটবড় পাহাড়। একটা পাহাড়ের মাথায় শের শাহের আমলের দুর্গ। স্টেশন থেকে বাস-ট্যাক্সিতে যোগাযোগ আছে। তবে জনবসতি কিছুটা কম।

স্টেশন থেকে হাবিবপুরে আসার পথে মাইল পাঁচেক জায়গা জুড়ে ছোট-বড় পাহাড় আর শাল, মহুয়া, দেওদারের ঘন জঙ্গল। জঙ্গলের বুক চিরে এগিয়ে গেছে পিচ-বাঁধানো সরু পথ।

বিশু আর বাপ্পার বাবা-মায়েরা ওদের ঝরনা দেখতে যাওয়ায় বাধা দিলেন না। তবে বললেন ট্যাক্সি নিয়ে যেতে। ওদের চার ভাই-বোনের মধ্যে বিশু বয়সে সব চাইতে বড়। ক্লাস টেন-এ উঠেছে। পথে বেরিয়ে বিশু বলল, 'ট্যাক্সির কী দরকার আমরা হেঁটেই চলে যাব। ফেরার পথে ট্যাক্সি বা টাঙ্গা নেব।'

দুপুরে খেয়ে উঠেই বেরিয়ে পড়েছে ওরা। সঙ্গে টিফিন কেরিয়ারে কিছু স্ন্যাক্স। বিকেলে ঝরনার ধারে বসে ঝরনার মিষ্টি গান শুনতে শুনতে মজা করে খাবে।

শাল, মহুয়ার অরণ্যের মধ্যে দিয়ে পাকা সড়ক। শেষ আশ্বিনের ময়ূরকণ্ঠী রঙের আকাশের নীচে সোনা মাখা রোদ ঝরে পড়ছে অরণ্যময় সবুজ পাহাড়ের গায়ে।

গভীর জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে টুটুল বলল, 'দু'পাশে কী ঘন জঙ্গল দেখেছ বিশুদা। বাঘ-টাঘও থাকতে পারে।'

বাপ্পা হেসে বলল, 'হ্যাঁ তোর ঘাড় ভেঙে খাবে।'

মুনমুন বলল, 'ভয় দেখাবে না বাপ্পাদা। ভালো হবে না বলছি।'

বেলা দুটোর পরেই ওরা ঝরনার কাছাকাছি পৌঁছে গেল। ঝরনা পথের ঠিক ধারে নয়। পাকা সড়ক থেকে আরও আধ মাইল বন-বাদাড়ের ভেতর মানুষ আর জঙ্গলের পশুর পায়ে চলা পথ ধরে এগোতে হয়। ঘন ছায়ায় ঢাকা জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে চলতে চলতে ঝরনার শব্দ কানে এল ওদের।

ঝরনার সামনে দাঁড়িয়ে মুগ্ধ বিস্ময়ে কথা বলতে ভুলে গেল ওরা। প্রায় দুশো ফুট উঁচু পাহাড়ের মাথা থেকে জলস্রোত নীচে পড়ার আগে পাহাড়ের মাঝামাঝি জায়গায় যেখানে প্রথম ধাক্কা খাচ্ছে সেখানে জলের অজস্র কণায় রোদ পড়ে রামধনুর মতো সাতটি রং ঝলসে উঠছে। ঝরনার তিন দিকে মাথা তুলেছে সবুজ জঙ্গুলে পাহাড়। ঝরনার চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে ছোট-বড় শিলাখণ্ড। অনেক উঁচু থেকে নীচের পাথরে জল পড়ার একটানা প্রচণ্ড শব্দে কথা ভালো করে শোনা যায় না।

ওরা ঝরনার ধারে পৌঁছবার আগেই এক বাঙালি পরিবার এসেছেন। বাবা-মায়ের সঙ্গে ওদের বয়সি দুটি ছেলে-মেয়ে। ওদের দিকে তাকিয়ে সকলে হাসলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই আলাপ জমে উঠল।

কিছুক্ষণ পর স্যুট-টাই পরা আরও তিনজন লোক ঝরনা দেখতে এল। ছেলে-মেয়ে দুটি বাবা-মায়ের সঙ্গে নিজেদের পরিচয় দিয়ে আলাপ করল। একজনের নাম মনোহর প্রসাদ, আর একজনের নাম উমর খাঁ, তৃতীয় জনের নাম শিবনাথ প্রধান। ছেলে-মেয়ে দুটির বাবার নাম অমল চৌধুরী, ভদ্রমহিলা আলপনা চৌধুরী। ছেলে-মেয়ে দুটির নাম রুণু আর ঝুনু।

ঝরনার পাশের একটা পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে বিশু বলল, 'এই টুটুল, মুনমুন তোরা বোস, ওদিকের পাহাড় থেকে আমরা একটু বেড়িয়ে আসি।'

মুনমুন বলল, 'বারে! তোমরা চলে গেলে আমাদের ভয় করবে না বুঝি?'

'ভয় করবে কেন?' আলপনা চৌধুরী বললেন, 'আমরা তো রয়েছি।'

বিশু, বাপ্পা পাহাড়ের দিকে এগিয়ে যাবার পর টুটুল-মুনমুন রুণু-ঝুনুর সঙ্গে ঝরনার জলের ধারে ছুটোছুটি করতে লাগল। ছোট-বড় বোল্ডারের ওপর দিয়ে জলের প্রায় মাঝামাঝি চলে গেল।

'এই খোকা-খুকুরা', মনোহর প্রসাদ চেঁচিয়ে সাবধান করে দিল, 'অতদূরে যেও না, জলে পড়ে যাবে।'

মুনমুনেরা ফিরে আসতে ফ্লাস্ক থেকে গরম কফি ঢালতে ঢালতে শিবনাথ প্রধান বলল, 'খোকা-খুকুরা কফি খাবে নাকি?'

'না, আমাদের সঙ্গে চা আছে', মুনমুন জবাব দিল, 'আপনারা খান।'

'তা হলে দুটো টফি খাও।' উমর খাঁ হেসে ওদের দিকে এক মুঠো টফি এগিয়ে দিল।

পকেট থেকে একটা মিনি টেপ-রেকর্ডার বার করে চালিয়ে দিল মনোহর প্রসাদ। ঝরনার গান চাপা পড়ে গেল হিন্দি ফিল্মের গানে।

আধঘণ্টার মধ্যেই পাহাড় থেকে ফিরে এল বিশু-বাপ্পা। মনোহর প্রসাদেরা এখন তাস নিয়ে বসেছে। শিবনাথ প্রধান বোল্ডারে হেলান দিয়ে একটা ইংরেজি বই পড়ছে।

রুণু-ঝুনু আর তাদের বাবা-মায়ের সঙ্গে গোল হয়ে বসে গল্প জুড়ে দিল বিশু-বাপ্পারা।

কিছুক্ষণ পর মনোহর প্রসাদেরা উঠে পড়ল। টেপ-রেকর্ডার বাজাতে বাজাতে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে সড়কের দিকে এগিয়ে গেল। লোকগুলোকে কেমন যেন ভালো লাগছিল না মুনমুনদের। চলে যেতে স্বস্তিবোধ করল।

বিশুরা আসার আগেই রুণু-ঝুনুদের খাওয়া হয়ে গেছিল। ওদের মা আলপনা চৌধুরী বললেন, 'সেই সকাল ন'টায় আমরা ঝরনায় এসেছি। এবার আমরা উঠব।'

বিশু বলল, 'আপনারা এগোন। আমরা আর একটু থেকে খেয়ে নিয়ে চলে যাব।'

পাহাড়ের মাথায় মেঘের আনাগোনা চলছিল। সেদিকে তাকিয়ে অমল চৌধুরী বললেন, 'বেশিক্ষণ এখানে থেকো না, বৃষ্টি আসতে পারে।'

রুণু-ঝুনুরা চলে যাবার কিছুক্ষণ পর ওরা দেখল ঝরনায় কালো মেঘের ছায়া পড়েছে। মাঝে মাঝে সূর্য আড়াল হয়ে যাচ্ছে। আর দেরি না করে সঙ্গে আনা খাবার সাজাতে বসল মুনমুন, টুটুল। গল্প করতে করতে খেল ওরা।

খেয়ে উঠতে না উঠতেই পশ্চিমের পাহাড়ের আড়ালে সূর্য ঢাকা পড়ে গেল। অন্ধকারে ছেয়ে গেল চারিদিক। পাহাড়ের গায়ে গাছপালার ডাল কালো হয়ে এল। চটপট টিফিন কেরিয়ার গুছিয়ে নিয়ে উঠে পড়ল ওরা। কিন্তু কিছুটা এগোতেই দারুণ বৃষ্টি এল। ছুটে গিয়ে ওরা একটা বড় মহুয়া গাছের নীচে দাঁড়াল।

বিশুরা ভেবেছিল অসময়ের বৃষ্টি কিছুক্ষণের মধ্যেই ধরে যাবে। কিন্তু আধঘণ্টার পরও বৃষ্টি থামার কোনো লক্ষণই দেখা গেল না। পাহাড়-জঙ্গলের ওপর ঝরঝর শব্দে বৃষ্টি ঝরতে লাগল। বিদ্যুতের ঝলকানিতে আলো হয়ে উঠল গাছের নীচের অন্ধকার। মেঘের গুমগুম শব্দে কেঁপে উঠল পাহাড়। বৃষ্টির ঘন কুয়াশা ভেদ করে কোনোদিকেই আর নজর চলে না। গাছের পাতা থেকে জল ঝরে ওদের সারা গা-মাথা ভিজে জবজবে।

মুনমুন, টুটুল ভয়ে জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে রইল। আচমকা বাজের শব্দে ওদের কানে তালা ধরে গেল। দেখল বাজ পড়ে পাহাড়ের মাথায় একটা গাছে আগুন ধরে গেছে।

ঘণ্টাখানেক পর বৃষ্টি কমে এল। আকাশে এখনও ঘন মেঘের আনাগোনা। গাছের ডালপাতা থেকে জল ঝরছে। সড়কের দিকে এগিয়ে চলল ওরা। সকলের সামনে বিশু ওদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। বাড়ি থেকে বেরুবার সময় পাশ ব্যাগে টর্চ এনেছিল। টর্চ জ্বেলে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলল। পায়ের নীচে বৃষ্টির ঘোলাটে জল হুহু করে বয়ে যাচ্ছে। পায়ে চলা পথের কোনো চিহ্ন নেই। পুবদিকে সড়ক। ওরা পশ্চিমে পাহাড়ের দিকে এসেছিল। পথের চিহ্ন না পেয়ে ফের পুবদিকে এগিয়ে চলল। কিন্তু কিছুটা এগিয়ে বুঝতে পারল জঙ্গলের মধ্যে ওরা দিক ভুল করেছে।

বাপ্পা ভয়ে ভয়ে বলল, 'বিশুদা এদিক দিয়ে আমরা আসিনি।'

মুনমুন বলল, 'তাহলে কী হবে দাদা!'

'কী আবার হবে?' বিশু ওদের ভরসা দিল, 'আয় আমরা ফের ঝরনার কাছে ফিরে যাই।'

পেছনে হেঁটেও কিন্তু ঝরনার কাছে যেতে পারল না। ঝরনার শব্দ তখন আরও দূরে। দিনের আলো নিভে গেছে।

বাপ্পা জিগ্যেস করল, 'এখন আমরা কোনদিকে যাব বিশুদা?'

জঙ্গলের ভেতর টর্চের আলো ফেলল বিশু। পথের কোনো হদিস করতে পারল না।

মুনমুন ফুঁপিয়ে উঠল, 'আমরা কী বাড়ি ফিরতে পারব না দাদা?'

টুটুল বলল, 'সারারাত কী আমাদের জঙ্গলের মধ্যে থাকতে হবে?'

কি বলে ওদের ভরসা দেবে ভেবে পেল না বিশু, বাপ্পা।

খানিকবাদে বিশু বলল, 'এক জায়গায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে কোনো লাভ নেই। চল আমরা ডানদিকে এগোই।'

গাছের জটলার ভেতর দিয়ে টর্চের ফোকাস ফেলে এগিয়ে চলল ওরা। কোনদিকে যাচ্ছে কিছুই জানে না। তবু সামনে এগিয়ে চলল।

মিনিট পনেরো চলার পর বাপ্পা ফিসফিস করে বলে উঠল, 'বিশুদা দেখ দেখ গাছের ফাঁকে আলো দেখা যাচ্ছে।'

থমকে দাঁড়িয়ে বিশু বলল, 'হ্যাঁ। আলোগুলো যেন সরে সরে যাচ্ছে মনে হচ্ছে।'

টুটুল বলল, 'মনে হচ্ছে গাড়ির আলো।'

মুনমুন বলে উঠল, 'ওই দিকেই তাহলে বাস রাস্তা।'

জঙ্গলের ভেতর দিয়ে জোরে পা চালিয়ে দিল ওরা। এতক্ষণে মুক্তির পথ খুঁজে পেয়েছে। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই ওরা পাকা সড়কের ওপর এসে পড়ল। বৃষ্টিতে ভিজে সপ্‌সপ্‌ করছে ওদের পোশাক। উপায় নেই, বাড়ি ফেরার আগে পর্যন্ত ভিজে পোশাক পরে থাকতে হবে। তখনও ঝিরঝিরে বৃষ্টি পড়ছে।

আচমকা বিদ্যুৎঝলকের সঙ্গে কাছাকাছি কোথাও বাজ পড়ল। সেই সঙ্গে ফের চেপে নামল বৃষ্টি।

পথ যখন খুঁজে পেয়েছে তখন হেঁটেও ফিরতে পারে। তবে ঝড়-বৃষ্টি মাথায় করে প্রায় তিন মাইল পথ কেমন করে পার হবে!

একটা বড় গাছের নীচে দাঁড়িয়ে বিশু বলল, 'ফেরার পথে কোনো গাড়ি দেখলে আমরা লিফ্‌ট চাইব।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা ভারী-ট্রাকের শব্দ শুনল ওরা। কিন্তু হতাশ হয়ে দেখল ট্রাকটা আসছে উলটো পথে। অর্থাৎ ওরা যে দিকে যাবে সেই দিক থেকে।

ট্রাকটা যেদিকে চলে গেল কিছুক্ষণের মধ্যে সেদিকে দুটো জোরাল হেডলাইট দেখতে পেল ওরা। কাছাকাছি আসতে দেখল একটা জিপ ছুটে আসছে।

পথের প্রায় মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে চেঁচিয়ে জিপটাকে থামতে অনুরোধ করল বিশু। ঘ্যাঁচ করে বিকট শব্দে ব্রেক কষল জিপটা। ড্রাইভিং সিট থেকে একজন মুখ বাড়াল, 'খোকা-খুকুরা কোথায় যাবে তোমরা?'

'হাবিবপুরে।' মিনতি করল বিশু, 'আপনাদের জিপে দয়া করে পৌঁছে দেবেন আমাদের?'

বাপ্পা বলল, 'খুব বিপদে পড়েছি আমরা।'

'আরে, তোমাদের সঙ্গে আমাদের ঝরনায় দেখা হয়েছিল না?' ড্রাইভিং সিট থেকে গলা বাড়িয়ে বলে উঠল উমর খাঁ।

পেছনের সিট থেকে শিবনাথ বলল, 'কেয়া বাৎ! এখনো বাড়ি ফেরোনি তোমরা! জলদি উঠে এসো গাড়িতে।' পেছনের সিট থেকে মনোহর প্রসাদ সামনের সিটে উঠে এসে ওদের জায়গা করে দিল। পেছনের সিটে ঠেসাঠেসি করে বসল সকলে।

জিপে স্টার্ট দিয়ে উমর খাঁ জিগ্যেস করল, 'হাবিবপুরে কোথায় থাক তোমরা?'

'চকের কাছে স্টেট ব্যাঙ্কের সামনে আমাদের পৌঁছে দিলেই আমরা বাড়ি চলে যেতে পারব।'

জিপ ছুটে চলল। এতক্ষণে সত্যিই নিশ্চিন্ত হল ওরা। আর কয়েক মিনিটের মধ্যে বাড়ি পৌঁছে যাবে। ওদের বাড়ির লোকেরাও হয়তো এতক্ষণ খুঁজতে বেরিয়েছেন।

মোড়ের পর মোড়, বাঁকের পর বাঁক পার হয়ে বৃষ্টির মধ্যে ভিজে রাস্তায় চাকার নীচে ছরছর শব্দ তুলে জিপ ছুটে চলল। জিপের হেডলাইটে বৃষ্টির ফোঁটাগুলো রুপোলি জরির ঝালরের মতো ঝলমল করতে লাগল। প্রবল বৃষ্টিতে পথের আলো নিভে গেছে। পিছল পথে গাড়ি তেমন জোরে ছুটতে পারছে না।

আধঘণ্টার মধ্যেও গাড়ি হাবিবপুরে না পৌঁছতে ভাবনায় পড়ল বিশু। জিপে পনেরো মিনিটও লাগবার কথা নয়।

'হাবিবপুর ঠিক চেনেন তো?' উমর খাঁর দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করল বিশু।

'হা-হা' করে সশব্দে হেসে উঠল উমর খাঁ, 'হাবিবপুরে থাকি, হাবিবপুর চিনব না!'

'হাবিবপুরে পৌঁছতে আর কতক্ষণ লাগবে', চিন্তিত মুখে জিগ্যেস করল বাপ্পা। সেও একটা কিছু সন্দেহ করেছে। পথে আলো না থাকলেও চকিত বিদ্যুতের আলোয় বাইরে দেখার চেষ্টা করল বিশুরা। আশপাশের গাছপালা, পাহাড় দেখে মনে হচ্ছে গাড়ি হাবিবপুরের দিকে যাচ্ছে না। তাহলে কোনদিকে চলেছে ওরা?

'কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন আমাদের?' শক্ত গলায় বলল বিশু।

'কেন? হাবিবপুরে।' জোরে হেসে উঠল উমর খাঁ।

'না, হাবিবপুরের দিকে যাচ্ছেন না আপনারা।' বিশু বলল, 'কোথায় চলেছেন আপনারা?'

'গেলেই জানতে পারবে।' ব্যাক সিটে ওদের পাশে বসে বলল শিবনাথ। একটা চকচকে ছোরা ওদের চোখের সামনে নাচিয়ে বলল, 'চুপচাপ বসে থাক। নইলে জান খতম করে দেব। জঙ্গলের ভেতর তোমাদের লাশ গায়েব হয়ে যাবে।'

'তার মানে!' বাপ্পা বলে উঠল, 'আমাদের অন্য কোথাও নিয়ে যাচ্ছেন?'

'মতলব কী আপনাদের?' বলে উঠল বিশু, 'কী করতে চান আমাদের নিয়ে?'

'মতলব খুব সোজা,' বলল মনোহর প্রসাদ, 'তোমাদের বাবাদের কাছে তোমাদের খবর পাঠাব আমরা। পঞ্চাশ হাজার টাকা না দিলে ছেলেমেয়েদের ফেরত পাবেন না।'

'আপনারা শয়তান,' চিৎকার করে উঠল বিশু, 'এই মতলবেই তাহলে সেই দুপুর থেকে আমাদের পিছু নিয়েছিলেন।'

'তুমি দেখছি খুব বুদ্ধিমান,' ওরা তিনজন একসঙ্গে হো হো করে হেসে উঠল।

হঠাৎ একটা তীব্র আলোর ঝলক এসে পড়তে বিশু তাকিয়ে দেখল পেছনের রাস্তা দিয়ে একটা

গাড়ি আসছে। ঘন ঘন হর্ন শুনে মনে হচ্ছে গাড়িটা খুব জোরে ছুটে আসছে। হয়তো হর্ন দিয়ে সামনের গাড়িকে থামতে বলছে।

উমর খাঁর দলের লোকেরা পেছনের গাড়িটাকে দেখার চেষ্টা করল। পুলিশের গাড়ি নয়তো! বিশুদের বুক আশায় দুলে উঠল। ওদের বাবারা হয়তো পুলিশে জানিয়েছেন, ওদের না ফেরার খবর। ওদের খুঁজতে হয়তো পুলিশ গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে।

দেখতে দেখতে পেছনের গাড়িটা তীব্র বেগে ছুটে এসে ওদের জিপকে ওভারটেক করার চেষ্টা করে ডান পাশে এসে পড়ল। বিশুরা দেখল পাশের গাড়িটাও একটা জিপ।

ড্রাইভিং সিট থেকে ভারী গলায় ড্রাইভার বলে উঠল, 'এই উমর খাঁ, গাড়ি থামা।'

'আরে কে বসির খান?' গাড়ির স্পিড কমিয়ে মাথা বাড়িয়ে বলে উঠল উমর খাঁ।

'হ্যাঁরে আমি,' চেঁচিয়ে বলল পাশের জিপের ড্রাইভার, 'গাড়ি থামা।'

ঘ্যাচ করে ঝাঁকানি দিয়ে থেমে গেল বিশুদের জিপ। দুটো জিপ এখন প্রায় গায়ে গায়ে লেগেছে। পাশের জিপে একা বসে রয়েছে কাবুলীওয়ালার মতো দশাসই চেহারার লোকটা। মুখে চাপ দাড়ি। মাথায় সাদা কাপড় জড়ানো পাগড়ি।

'আরে বসির খান,' জিগ্যেস করল মনোহর প্রসাদ, 'কোথায় গেছিলে তুমি?'

'মজিদপুরের দিকে একটা জরুরি দরকার ছিল। হেডলাইটে দেখতে পেলুম তোদের জিপটাকে।' জবাব দিয়ে জিপের ব্যাক সিটে বিশুদের দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, 'বেশ শাঁসালো সওদা দেখছি। পেলি কোথায়?'

'ঝরনার কাছে,' জবাব দিল শিবনাথ, 'পঞ্চাশ হাজারের কমে ওয়াপাস দেব না।'

'কি বললি পঞ্চাশ হাজার!' ধমকে উঠল বসির খান, 'এক লাখের কমে ছাড়া চলবে না।'

'অত টাকা কী দেবে গুরু!' বলল উমর খাঁ।

'আলবৎ দেবে।' বিশুদের দিকে আগুনের ভাঁটার মতো চোখে তাকাল বসির খান, 'নইলে চারটেকেই কোতল করে দেব। তোরা পারবি না। সওদা আমার গাড়িতে তুলে দে। যা করার আমি করব।'

বিশুদের গাড়ির ভেতরে উঁকি দিয়ে গর্জে উঠল বসির খান, 'এই বাচ্চা লোক, জলদি উঠে আয় আমার গাড়িতে।' উমর খাঁর জিপ থেকে বিশুদের হাত ধরে মুখ চেপে নামিয়ে বসির খানের জিপে তুলে দিল মনোহর প্রসাদ।

জিপে স্টার্ট দেবার আগে অন্ধকারে ঝক্‌ঝক্ করে উঠল বসির খানের ভাঁটার মতো চোখ। জিপের সামনের খোপ থেকে একটা পিস্তল বার করে পেছনের সিটে বিশুদের দিকে হাত বাড়িয়ে দেখিয়ে বসির খান বলল, 'একদম চুপচাপ বসে থাকবে। চ্যাঁচালে গুলিতে শির উড়িয়ে দেব। মালুম!'

বসির খানকে দেখে বিশু-বাপ্পার প্রাণ উড়ে গেল। টুটুল-মুনমুন প্রায় দিশা হারিয়ে ফেলল। তপ্ত কড়াই থেকে এবার বোধহয় তারা জ্বলন্ত উনুনের মধ্যে পড়ল। লোকটা শুধু ডাকাত নয়। ডাকাতদের লিডার। ওরা ভেবে পেল না কী করবে। এদিকটা শহরের একেবারে বাইরে। ঝোপ-জঙ্গল-পাহাড় ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। জঙ্গলে হিংস্র জানোয়ার থাকাও অসম্ভব নয়।

বসির খানের জিপ ঝড়ের মতো উড়ে চলল। মুষলধারে বৃষ্টির বাধা মানছে না। নিমেষের মধ্যে বাঁকের পর বাঁকে তিন-চার মাথার মোড় পার হয়ে যাচ্ছে। পাশের গাছপালা ভালো দেখা যাচ্ছে না। সামনের গাড়ি চোখের পলকে সরে সরে যাচ্ছে। জিপের তীব্র হর্ন শুনে বাঁ পাশ ঘেঁষে পথ ছেড়ে দিচ্ছে। ড্রাইভিং সিটে বসে থাকা ওই মানুষটার যেন ভয়ডর বলে কিছু নেই। সামনে ট্রাক এসে পড়লে ব্রেক কষার সময়ে গাড়িটা উল্টে যাবে। কেউই বাঁচবে না।

বিশু বরাবর ডানপিটে। কিন্তু এখন আর ভাবতে পারছে না কী করে এই সাংঘাতিক ডাকাতটার হাত থেকে বাঁচবে। বিশুরা জানে না কোথায় নিয়ে চলেছে ওদের। কে জানে ওদের বাড়ি থেকে কত দূরে। এরপর হয়তো পাহাড়-জঙ্গলের মধ্যে ওদের গোপন ডেরায় লুকিয়ে রাখবে। বাড়ির লোক

কোনোদিনই খুঁজে পাবে না ওদের। এক লক্ষ টাকা চেয়ে পাঠাবে ওদের বাবার কাছ থেকে। কি কুক্ষণে আজ ওরা বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল! ওদের খুঁজে না পেয়ে এতক্ষণে হয়তো ওদের বাড়ির সকলের মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

আচমকা বিদ্যুতের তীব্র ঝলকে বিশুদের চোখ ধাঁধিয়ে গেল। বসির খানও জিপটাকে ঝট করে ব্রেক কষে দাঁড় করিয়ে নামতে গেল। ঠিক তক্ষুনি চারদিক কাঁপিয়ে কড়কড় শব্দে বাজ পড়ল। কয়েক সেকেন্ড। চোখ-ধাঁধানি ভাবটা কাটতেই বিশুরা দেখল মাটিতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে বসির খান।

চোখ কচলে বাপ্পা বলল, 'বিশুদা, দেখ দেখ ওই হাবিবপুরের স্টেট ব্যাঙ্ক। ডান পাশের গলিতে আমাদের বাড়ি।'

জিপ থেকে নেমে টুটুল-মুনমুন ততক্ষণে ওদের বাড়ির দিকে ছুটতে শুরু করেছে। পেছনে বিশু আর বাপ্পা। দরজা খুলে মা-রা ওদের জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠলেন। ওদের বাবারা তখনও থানায় বসেছিলেন। ফোনে ওদের ফেরার খবর পেয়ে একজন এ. এস. আই.-এর সঙ্গে থানা থেকে ছুটে এলেন। ওদের কাছে সব শুনে তখনই ব্যাঙ্কের সামনে ছুটে গেলেন কিন্তু কোনো জিপই দেখতে পেলেন না।

এ. এস. আই. মিঃ শর্মা জিগ্যেস করলেন, 'জিপের ড্রাইভারের নাম জান?'

'হ্যাঁ জানি, বসির খান,' জবাব দিল বিশু, 'খুব লম্বা-চওড়া দেখতে।'

টুটুলের বাবা রঞ্জন দত্ত সভয়ে বললেন, 'ও বাবা! সে তো শুনেছি খুব নামকরা ডাকাত।'

মিঃ শর্মা হেসে বললেন, 'এক সময় সে ডাকাত ছিল ঠিকই কিন্তু পরে ওসব ছেড়ে দেয়। বরং সে ডাকাত সেজে তাদের সঙ্গে মেলামেশা করে পুলিশকে অনেক খবর এনে দিত।

'দিত বলছেন কেন, তবে কি সে আবার ডাকাতি করা শুরু করেছে,' জিগ্যেস করেন সরোজ বোস।

'না মিঃ বোস তা নয়,' বিষণ্ণভাবে মাথা নাড়েন মিঃ শর্মা। 'আসলে গতকাল রাতে এখান থেকে বিশ মাইল দূরে জঙ্গলের কাছে বাজ পড়ে মারা গেছে বসির খান। আমি তাই তো অবাক হচ্ছি আপনাদের ছেলেমেয়ের মুখে তার কথা শুনে। এদের বাঁচিয়ে, বসির কি চেয়েছিল তার কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করে যেতে!'

বৈশাখ ১৪০০

জয়ের দাদু

সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

তাঁকে আমি প্রথম দেখি ডালখোলায়। সেখানে বাসের জন্যে দাঁড়িয়েছিলাম। ভদ্রলোকটিও আমার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। চেহারাটা এমন কিছু আহামরি নয়। বয়সের দিক দিয়ে নিশ্চয় বুড়ো বলা যায়। রোগা চেহারা। গাল দুটো বসা। আমি বুড়োদের বয়স ঠিকমতো ধরতে পারি না। কত বয়স হবে বলতে পারব না। ষাট থেকে পঁচাত্তর অবধি যে কোনো বয়স হতে পারে। বেশি হওয়াও বিচিত্র নয়। আমার দিকে তাকাচ্ছিলেন। চোখ দুটো যেন জ্বলছে।

দ্বিতীয়বার দেখলাম মোহনাতে। ডালখোলা উত্তরবঙ্গে। মোহনা দক্ষিণ ওড়িশায়। মোহনা ডাকবাংলোয় আমি খাম পোস্টকার্ড কিনছিলাম। আমার কাছে চিঠি লেখার সরঞ্জাম না থাকলে আমার খুব অস্বস্তি হয়। শেষে যদি চিঠি লিখতে ইচ্ছা হওয়া সত্ত্বেও না লিখতে পারি। বুড়ো ভদ্রলোক পেছনে দাঁড়িয়ে গেলেন। তখন ডালখোলার কথা মনে পড়েনি। শুধু মনে হয়েছিল এঁকে আমি কোথায় দেখেছি।

তৃতীয়বার আবার বাসে। এবার আমি রাঁচি থেকে আসছিলাম রাত্রির বাসে। ট্রেনে জায়গা নেই। আমার রাঁচির অভিভাবক উত্তম বলল, বাস যায় রোজ। রাত্রি আটটায় ছাড়ে। বহড়াগোড়ার কাছে এসে একটা ধাবায় দাঁড়াল বাসটা। সেখানে শীতের দিনে ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে চা খেতে ভারী ভালো লাগে। ভদ্রলোক যে বাসে আছেন সেটা আমি বুঝলাম ওই ধাবাতে চা খাবার সময়। উনিও বোধহয় চা খেতেই নেমেছিলেন। এবার একটা জিনিস অদ্ভুত লাগল। এই গা-কাঁপানো শীতে ওঁর গায়ে একটা গরম জামা নেই। শুনেছিলাম বুড়োমানুষদের শীত করে বেশি। এ ভদ্রলোক তো দেখছি শীত বলে যে একটা ঋতু আছে তাই জানেন না।

বুঝতেই পারছ আমি ঘুরে বেড়ানোর চাকরি করি। অনেক লোকের সঙ্গে দেখা হয় আমার। কিন্তু বাংলা-বিহার-ওড়িশায় তিনবারই একজন অপরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা হওয়ায় আমার একটু আশ্চর্য লাগছিল। ভদ্রলোককে যে ভুলিনি কারণ ওই তাঁর আশ্চর্য রকমের উজ্জ্বল চোখ। বৃদ্ধদের চোখ কেমন ঘোলাটে হয়, এ লোকটির চোখ একদম ঘোলাটে নয়।

এরপর আমি জোড়হাট ডিব্রুগড়, ডিফু কোহিমা ইম্ফল, আগরতলা সব ঘুরেছি। আমার কিরকম আশা ছিল ভদ্রলোকের সঙ্গে আবার দেখা হবে। হয়নি। বিলোনিয়ায় একজন বৃদ্ধকে দেখে মনে হয়েছিল বোধহয় সেই লোক। তারপর দেখলাম, না—অন্য লোক। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল কি উজবুকের মতো ভাবছি। এই বিশাল ভারতবর্ষে একজনের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে যাওয়া খুব কম সময়েই হয়। আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। কিন্তু একই লোক, তারই বা আমার কাছে প্রমাণ কই? আমার মনের ভুল বলে আমি উড়িয়ে দিলাম। এত ঘুরতে ঘুরতে মাথাটা একটু আমার নিশ্চয় গোলমাল হয়ে গেছে।

দেখা কিন্তু হল। আর এবার দেখা হল কলকাতায়ই। সেবারও আমি রাঁচি থেকে ফিরছি রাতের বাসে। শাল ফুল আর মহুয়া ফুলের গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে আমার যাত্রাটা খারাপ হয়নি। আমি কলকাতা এসে পৌঁছলাম ভোরবেলা। তখনও ভালো করে সবকিছু দেখা যাচ্ছে না। অথচ কলকাতা পুরো জেগে গেছে। আমাদের বাস এস্‌প্ল্যানেড গুমটিতে দাঁড়াল। আমি বেরিয়ে এসে ভোরবেলার হাওয়াটা বুক ভরে গ্রহণ করলাম। এরপরই এই হাওয়া ডিজেলের গন্ধে ভরে যাবে। এখন হাওয়াটা ফুরফুরে। গুমটির ধারে একটা চায়ের দোকানের সামনে ভদ্রলোকের সঙ্গে চতুর্থবার দেখা হল। এবার উনি প্রথম কথা বললেন। হাত তুলে নমস্কার করে বললেন, 'আপনার সঙ্গে আমার একটু দরকার আছে।

আমার নাম সুদর্শন রায়। এখন আপনি ক্লান্ত, বাড়ি যান। স্নান করে একটু তাজা হয়ে নিন, আপনার সঙ্গে আমি পরে দেখা করব।' বলেই একটা দক্ষিণের দিকে যাওয়া ট্রামে টুপ করে উঠে পড়লেন।

আমি একটু ভোম্বু হয়ে গেলাম। ব্যাপারটা কি হচ্ছে! ভদ্রলোক আমার নাম জিজ্ঞাসা করলেন না, আমি কোথায় থাকি জিজ্ঞাসা করলেন না, অথচ বললেন আমার সঙ্গে পরে দেখা করবেন। এসবের কোনো মানে হয়? তখন অবিশ্যি ভেবে কোনো লাভ নেই। আমি নিজেও বাড়ি যাবার জন্য ব্যস্ত বোধ করছিলাম। স্নান করে একটু লম্বা হয়ে নিতে হবে। গাড়ির ধকল তো কম যায়নি।

তিনদিন বাদে আবার দেখা হল। এবার গঙ্গার ঘাটে। হাওড়া থেকে স্টিমারে চাঁদপাল ঘাটে এসে পৌঁছতেই দেখি ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন। বললেন, 'আপনার সঙ্গে জরুরি কথাটা চলুন এখনি সেরে ফেলি। আপনার কোম্পানিতে গিয়েছিলাম। আপনাদের ম্যানেজিং ডিরেক্টার মারা গেছেন, অফিস ছুটি। সুতরাং আপনার এখন একটু অবসর হবে।'

ভদ্রলোক আমাকে নিয়ে গঙ্গার ধারে চলে গেলেন। তারপর তাঁর মনের ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন। ওঁর ভাষাতেই বলি ঃ

'আপনাকে আমার বড্ড দরকার। আমি নিজে একটা কাজ করতে পারছি না। আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই আপনি সে কাজটা করবেন। আমার জীবনে আমি বোধহয় সবচেয়ে ভালোবেসেছি আমার নাতিকে। আমার নাতিটা বড় সুন্দর, বড় বুদ্ধিমান, কিন্তু একটা ব্যাপারে একটু বোকা। মানুষকে বড্ড সহজে বিশ্বাস করে, আর এইজন্যে ও বিপদে পড়তে চলেছে। আপনাকে তাই ডেকে এনেছি। আমার নাতির নাম সঞ্জয়। আমি ওকে জয় বলি। জয় এবার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে। পড়াশোনায় খুব ভালো। আর মনটা খুব দয়ালু। খুব ছোটবেলা থেকেই ও দুটো করে খেলনা চায়। একটা ও নিজে রাখে, আরেকটা ওর বন্ধুকে দেয়। এটা ও প্রথম করে তিন বছর বয়সে। ভাবতে পারেন একটা তিন বছরের ছেলে নিজের জন্য না চেয়ে বন্ধুর জন্য চাইছে?'

আমি প্রমাদ গুনলাম। পৃথিবীতে কিছু নাতিকগ্রস্ত ঠাকুর্দা থাকে। তারা মানুষজনকে তাদের নাতির কথা সবিস্তারে বলতে ভালোবাসে। এই ভদ্রলোকও নির্ঘাৎ সেই দলের। ভদ্রলোক সামলে নিলেন। তারপর আবার শুরু করলেন।

'পুরাতন কথা থাক। জয় একটা প্রচণ্ড বাজে লোকের পাল্লায় পড়েছে। এই লোকটা একটা আস্ত ঠক আর খুব খারাপ। ও ছোট ছোট ছেলেদের ওষুধ খেতে শেখায়। তারপর তাদের কাছ থেকে প্রচুর পয়সা চায় যখন তারা নেশাগ্রস্ত হয়ে যায়। ছেলেগুলো যখন পয়সা দিতে পারে না তখন তাদের বাড়ি থেকে জিনিসপত্র চুরি করতে শেখায়। লোকটাকে আপনি যাতে চিনতে পারেন তার ব্যবস্থা আমি করব। অবিশ্যি দেখলে আপনার চিনতে অসুবিধা হবে না। খুব সৌম্য চেহারা। ৫০/৫৫ বছর বয়স। সাদা দাড়ি, চোখে গোল চশমা। দেখলে মনে হবে সাধুসন্ত বুঝি। আসলে হাড়পাজি। আমার নাতিটা ওকে দেখে আর ওর কথাবার্তা শুনে একদম ওর চেলা হয়ে গেছে। আমার ছেলে-বৌও বুঝছে না লোকটা বজ্জাত। নাম মৃন্ময় দত্ত। এই বুড়ো বয়সেও লোকটা ছোঁড়া থাকতে চায়। ওর একটা মাদক দ্রব্যের আড্ডা আছে। সেই আড্ডাটা ওর বাড়ির নীচের ঘরে। আমি অনেক দিন তক্কে তক্কে আছি। লোকটাকে পুলিশে ধরাব বলে। পুলিশকে আমি ওর সব খবর জানিয়েছি। পাড়ার ছেলেগুলোকে ওরা পাতা খাওয়াবে আর আমরা কিচ্ছু করব না, এ তো হয় না। আগামীকাল পুলিশ ওখানে যাবে। কাল ওদের একটা বড় মিটিং আছে। যতগুলো লোকের সঙ্গে ও কারবার করে তারা আসবে। আমি পুলিশকে বলেছি। পুলিশ আমার কথা প্রথমে বিশ্বাস করেনি। এখন বিশ্বাস করেছে। কাল ও যদি মৃন্ময় দত্তর বাড়ি বিকালবেলা যায় তাহলে আমার জয়ও ধরা পড়বে। আপনি ওকে কাল বাড়ি থেকে বেরোনোর পরই আপনার গাড়িতে তুলে নেবেন। আর সন্ধ্যা আটটা পর্যন্ত আটকে রাখবেন যে কোনো ছুতায়। এ কাজটা আপনাকে করতেই হবে।'

আমি বললাম, 'আপনার নাতি, আপনি বুঝিয়ে বললেই তো ল্যাঠা চুকে যায়। আমাকে ছেলেধরার কাজ করতে হবে কেন?'

ভদ্রলোক বললেন, 'যে কোনো কারণেই হোক আমার ওর কাছে গিয়ে দাঁড়াবার উপায় নেই। আপনিই করবেন। বিশ্বাস করুন ওই একটাই নাতি আমার। ও যদি বিপদে পড়ে সে খুব খারাপ হবে।'

আমার ব্যাপারটা একদম ভালো লাগছিল না। অথচ এই ভদ্রলোক তাঁর নাতির জন্য বড্ড ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। তাঁকেও তো সামলাতে হবে। আমি শেষ চেষ্টা করলাম। বললাম, 'আমি তো আপনার জয়কে চিনি না। কি করে তাকে আটকাব। আর তাছাড়া গাড়িও তো আমার নেই।'

ভদ্রলোক বললেন, 'গাড়ির ব্যবস্থা আমি করব। আপনি গাড়ি চালাতে জানেন তো?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ জানি।'

পরের দিনের ব্যাপারটা খুব অদ্ভুত ছিল। সেদিন যে ঠিক ঠিক কি হয়েছিল আমার এখন যেন পরিষ্কার মনে নেই। সব গুলিয়ে গেছে। তবু পরিষ্কার করে বলবার চেষ্টা করছি। প্রথমে রবুর কথা বলি। রবু আমার বন্ধু। ও একটা ঝড়। কখন কি করবে ঠিক নেই। সেদিন সকালে একটা নীল মারুতি জিপসি জিপ নিয়ে হাজির হল। বলল, এই জিপটা তুই এক সপ্তাহ ব্যবহার কর। আমি সিঙ্গাপুরে একটা কনফারেন্সে যাচ্ছি। ফিরে এসে তোর কাছ থেকে ফেরত নেব। আমি সুদর্শনবাবুর মুখ মনে করলাম। বুড়ো কি করে জানত যে আমি একটা গাড়ি পাব?

বিকালবেলার আগেই সুদর্শনবাবু এসে পৌঁছলেন, বললেন, 'আর দেরি করবেন না, এখন না গেলে জয়কে পাওয়া যাবে না।' ভদ্রলোক আমার সঙ্গে গাড়িতে উঠলেন। তারপর অনেক ঘুরে-টুরে উত্তর কলকাতার একটা গলির মুখে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করালেন। বললেন, 'জয় এক্ষুনি বেরোবে। আমি চিনিয়ে দেব।' একটু পরে একটি কিশোর বালক বেরিয়ে এল। সত্যিই ভারী সুন্দর দেখতে। ভদ্রলোক বললেন, 'এবার আপনার কেরামতি।'

আমি গাড়িটা নিয়ে ওর পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। বললাম, 'তোমার নামই তো জয় তাই না?' ও একটু অবাক হয়ে বলল, 'না।' আমি বললাম, 'তোমার নাম সঞ্জয় রায় না?' ও বলল, 'হ্যাঁ, তবে জয় বলে আমায় একজন ডাকতেন। আমার অন্য নাম সুনু।' আমি বললাম, ডাহা মিথ্যা বললাম, 'আমি মৃন্ময়দার কাছ থেকে আসছি। মৃন্ময়দা বললেন, তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে।' সঞ্জয় একটুখানি ইতস্তত করল তারপর আমার গাড়িতে উঠে এল। বলল, 'আমি কখনো জিপসি চড়িনি।' সুদর্শনবাবু কখন যে সরে পড়লেন দেখতেই পেলাম না। ছেলেটি ভারী ভালো। সে বলল, 'আমার দাদু আমাকে জয় বলে ডাকতেন। অনেক দিন বাদে আমি 'জয়' নামটা শুনলাম।' আমিও বললাম, 'আমি তোমার দাদুর বন্ধু।' জয় আমার দিকে অবিশ্বাসী দৃষ্টি দিয়ে বলল, 'দাদু আপনার বন্ধু হবে কি করে! আপনি কত ছোট।' আমি বললাম, 'অসম বয়সি বন্ধুও তো হয়।'

এর মধ্যে ছেলেটি জিপসির সব যন্ত্রপাতি দেখছিল, একবার পেছনের সিটে চলে গেল। সব দেখে শুনে যখন সামনের সিটে ফিরে এল তখন আমি গাড়িটা নিয়ে বিবেকানন্দ ব্রিজে উঠে পড়েছি। ও এসেই বলল, 'আপনি আমায় কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন?' তারপরই চেঁচাতে লাগল। আমি যত বলি থাম। ও কথাই শোনে না। আরো চেঁচায়। আর আমায় বলতে থাকে, 'আপনি ছেলেধরা।'

আমি তখন মহা বিপদে পড়লাম। বললাম, 'ঠিক আছে গাড়ি ঘুরিয়ে নিচ্ছি। তুমি বিশ্বাস কর আমি তোমার দাদুর বন্ধু। তবে তোমার যখন দিল্লি রোডে বেড়ানো পছন্দ নয়, চল কোথায় তোমার মৃন্ময়দার বাড়ি সেখানেই নামিয়ে দেব।' ছেলেটা বার বার বলতে লাগল, 'আপনি মিথ্যাবাদী, আপনি মিথ্যাবাদী।' আমার খুব খারাপ লাগছিল। তবু যখন গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে ওর কথামতো রাস্তায় চলতে শুরু করলাম ও তখন একটু চুপ করল। আমি গাড়ি চালাতে থাকলাম। মৃন্ময় দত্ত থাকে দক্ষিণ কলকাতার এক প্রান্তে। সেখানে পৌঁছতে আমাদের অনেক দেরি হল। আমরা যখন পৌঁছলাম তখন মৃন্ময় দত্তর বাড়ির গলির মুখে বিরাট পুলিশবাহিনী। গাড়ি ঢুকতে দিল না। জয় খুব উত্তেজিত হয়ে পড়ল। 'কি হচ্ছে এখানে?' আমি বললাম, 'মৃন্ময়দার বাড়ি সার্চ হচ্ছে। এখানে গুলিগোলা চলবে।

চল সরে পড়ি।' বলতে বলতে লোকজন সব দৌড়তে শুরু করল। পুলিশরাও দৌড়তে থাকল। সে এক বিতিকিচ্ছিরি অবস্থা। আমি মারুতিটাকে জোরসে চালিয়ে নিয়ে বেরিয়ে এলাম।

জয় চুপ করে ছিল এতক্ষণ। আমি বললাম, 'দ্যাখো তোমার দাদু জানতেন যে তুমি ওই বাড়িতে আজ যাবে। তুমি জান না মৃন্ময় দত্ত অতি বড় অপরাধী। নিরীহ নিরপরাধ ছেলেদের ও সর্বনাশ করে। তোমার দাদুর কথাতেই পুলিশ আজ ও বাড়ি গেছে, আর দাদু চাইছিলেন না যে তুমি এই হাঙ্গামায় থাক। তাই বলেছিলেন তোমায় যে করে হোক এ জায়গা থেকে দূরে রাখতে। তুমি এত অবুঝের মতো ব্যবহার করলে বলে আমায় এখানে আসতে হল।'

জয় বলল, 'দাদুর সঙ্গে আপনার কবে দেখা হয়েছে?'

আমি বললাম, 'কেন, আজ বিকেলে। উনিই তো তোমায় চিনিয়ে দিলেন।'

জয় আমার দিকে—আমার দিকে অদ্ভুত করে তাকাল। বলল, 'চলুন, আমার বাবার কাছে চলুন।'

ওর বাড়িতে পৌঁছে আমায় ও একতলার ঘরে বসিয়ে দোতলায় চলে গেল। কিছুক্ষণ বাদে একজন বছর পঞ্চাশের লোক নেমে এলেন। তিনি বললেন, 'আপনি আমার বাবাকে চেনেন?' আমি বললাম, 'চিনি না। উনি নিজেই আমার সঙ্গে আলাপ করেছেন। বলেছেন, উনি জয়কে বারণ করতেন মৃন্ময় দত্তর সঙ্গে মিশতে, কিন্তু ওঁর কি অসুবিধা আছে এ বাড়িতে আসতে।' আমি সুদর্শন রায়ের চেহারারও বিবরণ দিলাম।

জয়ের মতোই এ ভদ্রলোকও আমার দিকে অদ্ভুতভাবে তাকালেন। বললেন, 'চলুন আমার সঙ্গে ওপরে।' সিঁড়ি দিয়ে উঠতেই দেখলাম সুদর্শন রায়ের ছবি। সেই গাল, সেই জ্বলজ্বলে চোখ। শুধু ছবিটার কাচে চন্দনের আলপনা আর ছবিটায় মালা পরানো।

আমি বললাম, 'এই তো সুদর্শনবাবু। এঁর সঙ্গেই তো আমার অনেকবার দেখা হয়েছে। আপনারা ছবিতে মালা দিয়েছেন কেন?' ভদ্রলোক বললেন, 'কারণ আমার বাবার আজ মৃত্যুর ১৫ বছর পূর্ণ হল। জয় যখন খুব ছোট তখন আমার বাবা মারা যান। জয়কে খুব ভালোবাসতেন। জয়ের কথা বলতে খুব ভালোবাসতেন। লোকে ওঁকে নিয়ে হাসত ওঁর পাগলামি দেখে। আপনি আমার চেয়ে ভাগ্যবান লোক। আপনি আজকেও ওঁকে দেখেছেন। আমি দেখিনি ১৫ বছর।'

আমার মাথা কেমন ঘুরতে লাগল। আমি ধপাস করে মাটিতে পড়ে গেলাম। সেটা অবিশ্যি অন্য কেচ্ছা। তবে আজও সঞ্জয়ের দাদুর গল্পটা ঠিক ধরতে পারিনি।

—

আশ্বিন ১৩৯৬

সিকান্দার বেগের প্রতিকৃতি

মায়া বসু

ট্রেনটা ছোট-বড় পাহাড় আর ঘনসন্নিবিষ্ট কেঁদ, পিয়াল, মহুয়া, দেবদারু আর শাল বনে ঘেরা অজ্ঞাত জঙ্গুলে জায়গাটায় অনিলকে নামিয়ে দিয়ে দু-মিনিটও দাঁড়াল না। পড়ন্ত রোদের শেষ আলো তখন সবচেয়ে উঁচু পাহাড়ের মাথায় গড়িয়ে পড়ছে।

ছোট্ট প্লাটফর্মটায় মাত্র দু-চারটে দেহাতীলোক সর্বাঙ্গে চাদর মুড়ি দিয়ে শ্মশানযাত্রীর মতো মুখ করে বসেছিল। চারদিক নিথর নিস্তব্ধ। সদ্য জ্বলে ওঠা টিমটিমে আলোগুলোর দিকে তাকালে মনে হয়, একটু জোরে হাওয়া বইলেই ওদের অস্তিত্ব একেবারে মুছে যাবে।

এমন জায়গায় শখ করে মানুষ বেড়াতে আসে!

জায়গাটার চারদিক তাকিয়ে দেখে হতাশ হয়ে গেল অনিল। কলকাতা থেকে অতনুর আকস্মিক অন্তর্ধান। তার কয়েকদিন পরই তাকে একখানা আর্জেন্ট টেলিগ্রাম করে এখানে টেনে আনার কোনো অর্থ খুঁজে না পেয়ে মনে মনে ও খুব বিরক্ত হয়েই ছিল। অতনু তো জানে অনিল বড় একটা কোথাও যায় না। ওর তো অনিলকে নিতে আসাও উচিত ছিল।

ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে, স্যুটকেসটা হাতে নিয়ে গেট পেরিয়ে ও সোজা একটা রিকশায় উঠে বসে বলল, মণিকুঠিতে নিয়ে চল। রিকশাওয়ালা একবার ভুরু কুঁচকে ওর মুখের দিকে ভালো করে তাকাল। তারপর কোনো কথা না বলে আঁকাবাঁকা জংলি পথ ধরে চলতে শুরু করল।

মণিকুঠির কাছে এসে রিকশা থামতেই, বাড়িটার দিকে ভালো করে তাকিয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল অনিল। কী সর্বনাশ? ঘন জঙ্গলের ভেতর এই ভাঙাচোরা পোড়ো বাড়িটার মধ্যে অতনু কী করতে এসেছে! আর্টিস্ট মানুষ। ছবি আঁকার বাতিক আছে। কিন্তু সেজন্যে বাড়ির কাউকে না জানিয়ে হঠাৎ এই পাণ্ডববর্জিত জায়গায়, জনহীন এমন একটা জীর্ণ বাড়িতে ও কী করতে এসেছে? আর অনিলকেই বা এমন ভাবে টেলিগ্রাম করে টেনে আনল কেন?

রিকশা ভাড়া মিটিয়ে অনিল বাড়ির ভেতর ঢুকল। কোথাও কেউ নেই। চেঁচিয়ে ডাকল, অতনু, এই অতনু? তুই কোথায়?

এসে গেছিস? যাক বাঁচলাম। আয় এ ঘরে আয়। অতনু তাড়াতাড়ি একটা লণ্ঠন হাতে নিয়ে ঘরের ভেতর থেকে বারান্দায় বেরিয়ে এসে খুশিভরা গলায় ওকে অভ্যর্থনা জানাল।

সাবধানে উঠোনের জঙ্গল পেরিয়ে ভাঙা বারান্দার ওপর উঠে অনিল অতনুর পেছন পেছন সামনের ঘরে ঢুকল। ঘরটা হলঘরের মতো বড়। চেহারা, পলেস্তারা খসা বাইরের মতোই— চুন- বালি খসা। ফাটা মেঝে। সারা ঘরময় কেমন একটা স্যাঁতসেঁতে গন্ধ। হলের দু'দিকে দু'খানা তক্তাপোশ। তার ওপর তোশক-চাদর-বালিশ। একপাশে জামাকাপড় রাখার আলনা। জলের কুঁজো-গ্লাস, টেবিল-চেয়ার। টেবিলের ওপর খানকতক বই, সেভিং সেট, আয়না চিরুনি, এটা-সেটা টুকটাক জিনিসপত্র।

রাস্তার দিকের জানলার কাছে অতনুর ছবি আঁকার সরঞ্জাম। রং তুলি, ক্যানভাস, ইজেল ইত্যাদি। আরো কিছু কিছু জিনিসপত্র অগোছালো ভাবে এদিক-ওদিক ছড়ানো।

হাতের ব্যাগদুটো একপাশে রেখে, হলের চারদিকে তাকিয়ে ব্যাজার মুখে অনিল বলল, যেমন বাড়ির ছিরি, তেমনই ঘরের চেহারা।

এটা আমার পিসিমার বাড়ি। বেওয়ারিশ পড়েছিল। তাই এখানে এসে উঠেছি। আর এখানে

কেন এলাম? সব বলব। তোকে টেলিগ্রাম করে এমনই আনিনি। আগে ট্রেনের জামাকাপড় ছেড়ে হাত-মুখ ধুয়ে নে। বারান্দায় বাথরুমে জল তোলা আছে। বিরজু বাজারে গেছে।

বিরজু দেহাতী হলেও ভালোই রান্না জানে। বাংলাও জানে। বাজার থেকে ফিরে এসেই ও চা খাওয়ালো ওদের। তারপর রাত আটটা বাজতে না বাজতেই আবার ওদের মাংসের ঝোল গরম ভাত আলু ভাতে ঘি সব কিছু যত্ন করে খাইয়ে, টুকিটাকি কাজকর্ম সেরে ঘরে ফেরার জন্যে প্রস্তুত হয়ে অতনুর সামনে এসে দাঁড়াল।

অতনু অনুনয় করে বলল, কী বিরজু, আজও বাড়ি যাবে?

বিরজু মাথা নাড়তে নাড়তে উত্তর দিল, না দাদাবাবু, আমি থাকব নাই। কাল সকালেই আসব। চা-খাবার করি দিব।

তবে যাও। মশারি দুটো ভালো করে ফেলে রেখে যেও। অতনু যেন রাগ করেই অন্য দিকে চলে গেল।

অবাক অনিল বলল, সে কি বিরজু, তুমি রাত্রে এ বাড়িতে থাক না? অতনু একাই থাকে!

বিরজু চাপা গলায় বলল, দাদাবাবু, আগে আমি আমার পরিবার, আমরা তো বরাবরই থাকতাম এ বাড়িতে। কিন্তু বড়দাদাবাবু আসার পর আর থাকতে পারলাম নাই।

থাকতে পারলে না! কেন?

সে আমি কিছু বলবেক নাই। রাত্তিরেই মালুম হবে। তারপর আরও গলা নামিয়ে বলল, শুনুন ছোটদাদাবাবু, যদি ভালো চান তো কাল সকালেই বড়দাদাবাবুকে নিয়ে কলকাতায় চলে যান।

অনিল বিরজুর চোখে-মুখে এক অপরিসীম আতঙ্কের ছায়া দেখতে পেয়ে কিছুটা আন্দাজ করে বলল, কেন? এই পোড়ো বাড়িটা বুঝি ভূতের বাড়ি?

না না দাদাবাবু। বাড়িটা ভাঙাচোরা, জঙ্গলের মধ্যে হলেও আমি তো ইখানে পরিবারকে নিয়ে অনেক বছর আছি। কিন্তুক,....ওই দাদাবাবু আসছে। আমি যাই।

বিরজু চলে যাবার পরই অতনু ফিরে এল। অনিলের চিন্তিত গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, কী রে? চুপচাপ বারান্দায় দাঁড়িয়ে কেন? বিরজু বুঝি তোর কানে মন্তোর পড়ে গেল? চল, ঘরের ভেতর চল। বাইরে যা ঠান্ডা!

ঘরে ঢুকেই অতনু দরজায় খিল তুলে দিল। একটা জানলা খোলা ছিল। বাইরে থেকে উত্তরে হাওয়া এসে জ্বলন্ত লণ্ঠনটার পলতেটাকে কাঁপিয়ে দিচ্ছিল, ফলে কালিপড়া কাচের চিমনির ভেতর ম্লান আলোটা দপদপ করছিল। স্থির চোখে সেই আলোর দিকে তাকিয়ে অতনু বলল, জানলাটা বন্ধ করে দিই কী বলিস?

অনিলের সম্মতির অপেক্ষা না রেখেই অতনু জানলাটা বন্ধ করে টেবিলের পাশের চেয়ারটায় বসে পড়ল।

ফেব্রুয়ারির শেষ। শীতটা বেশ জাঁকিয়েই পড়েছে। অনিল বিছানার মধ্যে সর্বাঙ্গে কম্বল জড়িয়ে বসে প্রশ্ন করল, এবার সোজা সত্যি কথাটা বল দেখি বাপু? এই জঙ্গলের মধ্যে তুমি শখের ছবি আঁকতে এসেছ, বেশ করেছ। কিন্তু আমাকে টেলিগ্রাম করে এমন ভাবে এখানে টেনে আনলে কেন?

অতনু টেবিলের ওপর থেকে সিগারেটের প্যাকেট, দেশলাই টেনে নিয়ে নিজে একটা সিগারেট ধরিয়ে, অনিলকেও একটা ধরিয়ে দিয়ে নিঃশব্দে হাসল। হাসিটা খুব ফ্যাকাশে নিষ্প্রাণ মনে হল অনিলের।

কী রে, কথার জবাব দিচ্ছিস না কেন! অনিল ধোঁয়া উড়িয়ে আবার তাগাদা মারল।

কাল শুনিস। আজ সারাদিন ট্রেনের ধকল গেছে। কাল সকালে বলব। তবে বলবার মতোও তেমন কিছু ঘটেনি—

যেটুকু ঘটেছে, তাই বল। এখুনি শুনব।

যদি বলি, একা থাকতে ভালো লাগছিল না?

বিশ্বাস করব না।

অতনু কেমন যেন নার্ভাস হয়ে পড়ল। তাড়াতাড়ি জবাব দিল, প্লিজ, কাল সব শুনিস।

চেয়ার ছেড়ে উঠে অতনু লণ্ঠনটা ঘরের কোণে সরিয়ে রাখল। তারপর মশারি ফেলে নিজের বিছানায় কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল।

রাত এখন ন'টাও বাজেনি।

পোড়ো বাড়িটার চারপাশের বুনো গাছ-গাছালির জঙ্গল থেকে তক্ষক ডাকছিল। ঝিঁঝির বিচিত্র ঐকতান ভেসে আসছিল। বাতাসে শুকনো পাতার মর্মরধ্বনি উঠছিল। আর থেকে থেকে শেয়াল-খটাসের ছুটোছুটির শব্দ উঠছিল। এসব শব্দই অন্ধকার রাতে স্নায়ু শিথিল করা, শরীর-মন হিম করে দেওয়া নিস্তব্ধতা অনিল আগে কখনো অনুভব করেনি।

অতনুর মেজাজ ভালো নেই। কথা বলার মুডও নেই।

কিন্তু কেন নেই? এ কথা বুঝতে পারল না অনিল। এক অদম্য কৌতূহল নিয়েই ওকে কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। এ কথা ভেবে ওর ভীষণ রাগ হচ্ছিল।

অতনু রায়। নামকরা চিত্রশিল্পী। বহু নামী আর্ট গ্যারালিতে বহুবার ওর একক চিত্র প্রদর্শনী হয়ে গেছে। কিছুদিন ধরে এক নতুন পদ্ধতিতে ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছে। আধুনিক কালের চিত্রশিল্পীদের মাঝে অতনুর খ্যাতি প্রতিষ্ঠা, অনেক নামী আর্টিস্টেরই ঈর্ষার কারণ।

বিশেষ করে পোট্রেটে অতনুর হাত অপূর্ব। দেশবিখ্যাত কয়েকজনের প্রতিকৃতি এঁকে ও পুরস্কারও পেয়েছে।

নতুন জায়গা অচেনা পরিবেশ, একটা অস্বস্তি তো থাকেই। বিছানাটাও অনিলের মনোমতো নয়। তার ওপর দারুণ ঠান্ডা। ঘুম আসছিল না ওর।

লণ্ঠনটা দরজার পাশে ভূষোকালি মেখে মিট মিট করে জ্বলছিল। তাতে ঘরের মাঝে আলোর থেকেও গা ছমছমে অন্ধকারই যেন বেশি। কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করছিল অনিল। ঘুম আসছে না। ইচ্ছে হচ্ছিল অতনুকে ডাকে।

কিন্তু অতনু সেই যে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েছে আর ওর কোনো সাড়া নেই। সত্যিই ওর শরীর ভালো নেই, মাথা ধরেছে কি না, কে জানে? নানা চিন্তা করতে করতে নিজের অজান্তেই অনিল ঘুমিয়ে পড়ল।

কতক্ষণ কেটে গেছে, কটা বাজে কে জানে? হঠাৎ একটা খস্‌খসানির শব্দে অনিলের ঘুম ভেঙে গেল। তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থার মধ্যেই ও টের পেল, হলের ভেতরেই কে যেন অস্থির পায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এমন সশব্দে চোর ঘুরে বেড়ায় না। তা হলে কে? ও কে? বিমূঢ় অনিল চিৎকার করতে চেষ্টা করল। কিন্তু ওর গলা দিয়ে একটা শব্দও বার হল না।

সাহস করে চোখ খুলে শব্দের উৎসস্থলের দিকে তাকাল। কিন্তু কিছুই দেখা গেল না। লণ্ঠনটা কখন নিভে গেছে কে জানে?

মাত্র কয়েক হাত দূরে অতনু শুয়ে আছে। সে কি এই শব্দ শুনতে পাচ্ছে না? অনিলের ইচ্ছে হল বিছানা থেকে নেমে ওকে ধাক্কা দিয়ে টেনে তোলে। কিন্তু তাও সম্ভব হল না। কেননা ভয়ে ওর হাত-পা ঠান্ডা অবশ হয়ে গেছে।

অনিল আবার অন্ধকারের মধ্যে তীক্ষ্ণ তীব্র দৃষ্টিতে সেই শব্দের দিকে তাকাল। এবার মনে হল, যেন একটা জমাট বাঁধা অন্ধকার চলন্ত মূর্তির রূপ ধরে ঠিক অতনুর ক্যানভাসের আশেপাশে কী যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে।

হঠাৎ সেই চলন্ত মূর্তিটা থমকে দাঁড়াল। তার একখানা হাত শূন্যে উঠল, যেন ও কাউকে ভীষণভাবে আঘাত করবে। যেন ও খুন করতেই চায়। অন্ধকার চোখে সয়ে যাওয়ায় অনিল তার হাতে একটা অস্ত্রও দেখতে পেল। ছুরি বা ভোজালি। হাত নামল। পরমুহূর্তেই ফ্যাঁস করে একটা বিশ্রী আওয়াজ উঠল।

অতনুর বিছানা থেকে সেই মুহূর্তেই জোরালো টর্চের আলো সেই ছায়ামূর্তিটার ওপর পড়ল। বিস্ফারিত চোখে অনিল দেখল, এক ক্রূর হিংস্র মুখ। চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই সেই ছায়ামূর্তি অন্ধকারে মিলিয়ে গেল!

অনিলের মুখ দিয়ে একটা ভয়ার্ত আর্তনাদ বেরিয়ে এল।

ততক্ষণে অতনু বিছানা ছেড়ে নেমে লণ্ঠনটা জ্বালিয়ে দিয়েছে। সে আলোয় অনিলও যেন এক দুঃস্বপ্ন থেকে জেগে উঠল।

লণ্ঠনটা উঁচু করে ধরে অতনু ইজেলটার সামনে দাঁড়িয়ে কী যেন দেখছিল। সেই দিকে তাকিয়ে অনিলও থমকে গেল। অতনু হয়তো কাল সারাটা দিন ধরে যে পোট্রেটটা এঁকেছিল, কারও অদৃশ্য নিষ্ঠুর হাত ছুরির আঘাতে সেই ছবিখানাকে ফালা ফালা করে ছিঁড়ে রেখে গেছে।

অতনু এ কী ব্যাপার? ঘরে কে এসেছিল! অনিলের কণ্ঠস্বর ভয়ে আড়ষ্ট।

অতনু ছেঁড়া ছবিখানার ওপর একখানা তোয়ালে চাপা দিয়ে নিজের বিছানায় এসে বসল। তার মুখ রক্তহীন। চোখের দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত। মুখ ফিরিয়ে মশারির বাইরে বসে থাকা অনিলের ভয়ার্ত মুখের দিকে তাকিয়ে ও বলল, এই জন্যেই...অনিল তোকে এখানে আসবার জন্যে টেলিগ্রাম করেছিলাম। মন-প্রাণ দিয়ে এই পোট্রেটটা নিরিবিলিতে বসে আঁকব বলেই এই জঙ্গলে পোড়োবাড়িতে এসেছিলাম। কিন্তু কিছুতেই পারছি না...পারছি না...

ছবি আঁকার জন্যে কলকাতা ছেড়ে এই জঙ্গলে এসেছিস! কেন, এ কাজ তো তোর স্টুডিওতেই করতে পারতিস।

আমি যে ছবি আঁকছি, সেটা ওখানে বসে আঁকা সম্ভব হত না। ক্লান্ত ভাবে ও বলল।

লণ্ঠনটার আলোয় ঘর কিছুটা আলোকিত। অনিলের সাহস ক্রমে ফিরে আসছিল। বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে ও আবার সেই প্রশ্ন করল, কিন্তু অতনু, দরজা তো বন্ধই আছে। তাহলে হলের ভেতর কে এসেছিল?

অতনু দু'হাতে মুখ ঢেকে চুপ করেই রইল।

অতনু, এটা এমনই একটা ব্যাপার যা আমি বুঝতে পারছি না। অথচ তুইও মুখ বন্ধ করে আছিস। তবে কি আমাকে বিশ্বাস করতে হবে যে যুক্তি-বুদ্ধি দিয়ে যার ব্যাখ্যা করা যায় না, এই পোড়ো বাড়িতে তেমনই কিছু একটা আছে?

অতনু মুখ থেকে হাত সরিয়ে অত্যন্ত ক্লান্ত গলায় জবাব দিল, অনিল, রাত দুটো বেজে গেছে। তুই বিশ্বাস কর, এখানে আমি মাত্র ছ'দিন এসেছি। দিন চার-পাঁচ পোট্রেটটা আঁকতে শুরু করেছি। কিন্তু প্রথম দুটো রাত ছাড়া বাদ বাকি ক'দিন একেবারেই ঘুমোতে পারিনি। কাল সকালে তোকে সব দেখাব, সব কিছু খুলে বলব।

পরদিন বেশ বেলা করেই ঘুম থেকে উঠল অনিল। চারদিকে দিনের আলো। রাস্তায় লোকজনের আসা-যাওয়া। বিরজু আর তার বৌয়ের উপস্থিতিতে অনিলের মন থেকে রাত্রের বিভীষিকা ক্রমে আবছা হয়ে গেল। বাড়িটাকেও বেশ ভালো লাগল। পুরোনো ভাঙাচোরা হলেও বেশ খোলামেলা। ভেতরটা পরিষ্কার। উঠোনে বিরজু আর তার বৌয়ের যত্ন ও পরিশ্রমে ফুলের গাছ, সব্জীর বাগান তৈরি হয়েছে। কয়েকটা পেয়ারা আর আতা গাছও আছে এক দিকে।

বারান্দা থেকে ছোট-বড় ঢেউ তোলা পাহাড় দেখা যায়। ভোরবেলা তার মাথায় প্রকাণ্ড সোনার থালার মতো সূর্য উদয় হয়। সামনে যতদূর চোখ যায়, সতেজ সবুজ ছোট-বড় গাছ-গাছালি। গাছের আড়ালে একটা ছোট্ট রুপোলি নদী।

বিরজুর বৌ ঘরের সব কাজ শুরু করল। বিরজু ওদের চা-টোস্ট দিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরেই শশা, কলা, গরম দুধ এনে দিল। খেতে খেতে অতনুকে লক্ষ করছিল অনিল। এত ভালো খাওয়া-দাওয়া, এত স্বাস্থ্যকর জায়গায় থাকা, তবু ওর চোখের কোণে কালি, শরীর দুর্বল রুগ্ন!

বিরজু বাজার থেকে মাছ আনবার জন্যে টাকা নিয়ে বেরিয়ে যেতে অতনু অনিলকে সঙ্গে নিয়ে

হল ঘরে ঢুকল। ক্যানভাসের ওপরকার তোয়ালেটা সরিয়ে ফেলতেই, কোনো অস্ত্র দিয়ে ফালাফালা করে ছেঁড়া গত রাতের সেই ছবিটা দিনের আলোয় ওদের চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠল।

অনিল অতনুর মুখের দিকে তাকাতেই ও নিঃশব্দে পাশের পুরোনো টেবিলটার ওপর থেকে একখানা ছবি তুলে অনিলকে দেখতে দিল।

ছবিটার দিকে তাকিয়েই অনিলের বুকের ভেতর শিরশির করে উঠল। কোনো একজনের এনলার্জ করা প্রোফাইল। কিন্তু এমন কুটিল ক্রূর নিষ্ঠুর মুখ অনিল আগে কখনো দেখেনি। অতনুর আঁকা অনেক খুনি ডাকাত, ঘাতকের ছবি ও দেখেছে কিন্তু এমনটা আর কোনোটা নয়। ছবিটা এতই প্রাণবন্ত, দেখলেই মনে হয় যেন এখনি কথা বলে উঠবে।

কিছুক্ষণ ছবিটার দিকে তাকিয়ে অনিলের মুখ কঠিন হয়ে উঠল। সোজাসুজি অতনুর দিকে তাকিয়ে সে প্রশ্ন করল, এটা সেই....সেই লোকটার ছবিটা না?

হ্যাঁ, আমি এই ছবিটা আঁকব বলেই এখানে চলে এসেছি।

অনিলের মনে ভেসে উঠল কিছুদিন আগেকার সেই ঘটনাটা। একটা পুরোনো বাড়ির হলঘর, দেয়ালে নতুন-পুরোনো নানা ধরনের ছবি টাঙানো। বেশিরভাগই তার পোট্রেট। পাগড়ি পরা, টুপিফেজ, মুকুট পরা, সগুম্ফ কীর্তিমান পুরুষ থেকে শুরু করে, অতি সাধারণ মানুষের প্রতিকৃতি। ছোট-বড় নানারকম তৈলচিত্র। জমিদার, নবাব, সাঁওতাল দম্পতি—কেউ বাদ নেই তার মধ্যে।

চিত্রশিল্প সম্বন্ধে অনিলের বিশেষ কোনো জ্ঞানই ছিল না। তবুও অতনুর সঙ্গে ওকে যেতে হয়েছিল।

ছবিগুলো খুব মনোযোগ দিয়েই দেখছিল অতনু। ছবিগুলো দেখা শেষ করে চলে আসবার সময়ই হঠাৎ এক কোণে অবহেলা উপেক্ষায় টাঙিয়ে রাখা বিবর্ণ একখানা ছবির দিকে নজর পড়েছিল অতনুর। ও দাঁড়িয়ে পড়েছিল। ওর সঙ্গে অনিলও থমকে দাঁড়িয়েছিল। তাকিয়ে দেখেছিল সেই ছবিটা। বিকৃত কুৎসিত কুদর্শন একটা মুখের ছবি। অতনুর দিকে তাকিয়ে দেখেছিল সম্মোহিতের মতো অপলক চোখে ও সেই ছবিটার দিকেই তাকিয়ে আছে।

একটু পরেই অতনু সেখান থেকে সরে গিয়ে প্রদর্শনীর এক কর্মকর্তার সঙ্গে কি সব বিষয়ে কথাবার্তা বলতে শুরু করেছিল। সেসব কথার মধ্যে প্রথমে অনুনয়-বিনয় পরে তর্কাতর্কিও ছিল। অনিল বিরক্ত বিব্রত হয়ে অতনুকে ওখান থেকে একরকম জোর করেই টেনে বার করে নিয়ে এসেছিল।

বাড়িতে ফিরে অতনু ছবিটার কথা খুলে বলেছিল। হিংস্র নিষ্ঠুর দর্শন মুখের ছবিটা সিকান্দার বেগের। সিরাজউদ্দৌলাকে যে বন্দী অবস্থায় নিষ্ঠুরভাবে খুন করেছিল, এই লোকটা সেই মহম্মদী বেগের একমাত্র বংশধর।

সিকান্দার বেগও নৃশংস চরিত্রের মানুষ।

একবার কোনো এক চিত্রকরের সঙ্গে পরিচয় হওয়ায় ওর খুব শখ হয় নিজের ছবি আঁকাবার। সেই শখের ফল বড়ই ভয়ঙ্কর হয়েছিল। ছবি শেষ হয়ে যাবার পর সিকান্দার বেগ তার ছবি দেখে এতই ক্রুদ্ধ হয়েছিল যে সেই চিত্রকরকে হত্যা করেছিল। সেই ছবিখানা নষ্ট করার আগেই সিকান্দার বেগ নিজেও খুন হয়ে যায়। কে যে তাকে খুন করেছিল তা জানা যায়নি।

সেই ছবিখানাই এত বছর বাদে বিবর্ণ হয়ে, অনেক হাত বদল হয়ে শেষ পর্যন্ত এই এগজিবিশনে এসে পৌঁছেছে।

ছবিটা দেখার পর থেকেই সেটাকে নতুন করে আঁকবার একটা ভয়ঙ্কর ইচ্ছা অতনুর মনে। কর্মকর্তার কাছ থেকে বেশ মোটা টাকা দিয়ে ছবিটা কিনতেও চেয়েছিল অতনু। প্রস্তাবে তিনি রাজি হননি। তখন অতনু তাঁকে একটা মোটা অঙ্কের টাকা দিয়ে দিন পাঁচ-সাতের জন্যে ছবিটাকে ভাড়া করতে চেয়েছিল নিজে আঁকবার জন্যে। কিন্তু তার এ প্রস্তাবও তৎক্ষণাৎ নাকচ হয়ে যায়। ভদ্রলোক কেন যে এমন করলেন সে বিষয়ে ওকে কিছু বলেননি।

পৃথিবীতে এত সুন্দর বিষয়বস্তু, এত জ্ঞানীগুণী মানুষ থাকতে অতনু যে কেন ওই খুনে লোকটার ছবিটার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছিল, কে জানে? একেই বলে বাতিক।

সেই অলুক্ষণে ছবিটাই আজ এখানে!

অনিল এবার প্রশ্ন করল, ছবিটা তুই কেমন করে পেলি?

আমি ওটা চুরি করেছি। কেমন করে চুরি করেছি নাইবা শুনলি। তারপরই সোজা এখানে পালিয়ে এসেছি। কলকাতায় থাকলে পাছে ধরা পড়ি।

ভেবেছিলাম ছবিটার ডিটেল ওয়ার্কগুলো শেষ করে ওটা আবার যথাস্থানে রেখে আসব। কিন্তু তুই শুনলে অবাক হবি ছবিটা দিনের বেলা আঁকছি আর রাত্রে রোজ এসে কে ওটাকে ছিঁড়ে নষ্ট করে দিয়ে যাচ্ছে! আজ বুঝেছি কে অমন করে ছবিটা নষ্ট করে দিয়ে যাচ্ছিল!

অবাক অনিল বলল, কাল রাতে কে এসেছিল ঘরে?

সিকান্দার বেগের আত্মা!

অনিলের বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল। অতনুর হাত ধরে ও অনুরোধ করল, অতনু, প্লিজ, তুই ওই ছবি আঁকা বন্ধ কর।

এত সহজে অতনু রায় হার মানবে না। অতনু উত্তেজিত হয়ে বলল, আমি বুঝেছি, যে আর্টিস্ট সিকান্দার বেগের ওই পোট্রেটটা এঁকে ছিলেন তিনি ওর স্বভাব চরিত্র ওর প্রকৃতি যথাযথ ফুটিয়ে তুলতে পারেননি। আমি পারব। ওর রক্তলোলুপ খুনি স্বভাব আমি ওর মুখের প্রত্যেকটি রেখায় ফুটিয়ে তুলবই।

না অতনু না। তোকে আমি একাজ করতে দেব না। তুই তো জানিস, যিনি ওর ওই পোট্রেটটা এঁকেছিলেন, তাঁর কি দশা হয়েছিল।

হাসল অতনু, একজন জীবন্ত মানুষ যা করতে পারে, অশরীরীর পক্ষে তা করা একেবারেই অসম্ভব। আমার কাজ পণ্ড করে ও আমাকে বারে বারে ভয় দেখাচ্ছে। কিন্তু ও অতনু রায়কে চেনে না। ওর ছবি আমি আঁকবই। শুধু তুই, যদি মাত্র দু-তিনটে দিন আমার কাছে থাকিস।

সারাটা দিন অতনু তার ছবি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে রইল। অনেকটা কাজ এগিয়েও গেল। অনিল আসার পর থেকেই ওর মনটা ভালো, তাই বেশ দ্রুত গতিতেই প্রাথমিক কাজগুলো শেষ হল। সারাটা দিন একটানা কাজ করে ও যখন উঠল, তখন ক্যানভাসের বুকে সিকান্দার বেগের চেহারার আদল স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। চোখ দুটো জ্বলন্ত। মুখের রেখায়, নাকের পাশের ভাঁজে ভাঁজে, ভুরুর ভঙ্গিতে আর পুরু ঠোঁটের কুটিলতায় এমনই একটা হিংস্র ভাব ফুটে উঠল যে বেশিক্ষণ আর ওই ছবির দিকে তাকিয়ে থাকা যায় না।

অন্য ক'দিনের মতো বিরজু ন'টা বাজতে না বাজতেই ওদের রাতের খানা খাইয়ে বাড়ি চলে গেল। দরজা-জানলা বন্ধ করে শুতে যাবার আগে সদ্য আঁকা ছবিখানা ইজেল থেকে খুলে অতনু অনিলের বিছানার তলায় লুকিয়ে রেখে দিল। অনিল অবাক চোখে ওর দিকে তাকিয়ে আছে দেখে হেসে বলল, তোর ওপর তো সিকান্দার বেগের রাগ নেই। তোকে তাই সন্দেহই করবে না। তাই এখানে রাখলাম।

কিন্তু ও যদি আসল ছবিখানা নষ্ট করে দেয়? তাহলে?

তা কখনো করবে না। ক'দিন ধরেই দেখছি তো। নিজের আসল ছবিখানা যেমনই হোক, ও সেটা স্পর্শও করে না।

ভীষণ ভয়েই অনিল কি যেন বলতে গেল....তাকে থামিয়ে অতনু বলল, তোর কোনো ভয় নেই। যতই হোক ও তো রক্তমাংসের কোনো জীব নয়। একটা অশরীরী ছায়া মাত্র।

অনিল কাঁপা গলায় বলল, ফালাফালা করে যে ছবিটাকে ছিঁড়ে ফেলতে পারে, তাকে কি ঠিক ছায়া শরীর বলা যায় অতনু?

সেদিন রাত্রেও সেই অশরীরীর উপস্থিতি টের পেল ওরা। টের পেল, সে সারা ঘরময় ঘুরে

বেড়াচ্ছে। কী যেন খুঁজছে কিন্তু খুঁজে পাচ্ছে না। দুজনে মড়ার মতো কম্বলমুড়ি দিয়ে পড়ে থাকল। কিছুক্ষণ পর বোধহয় ব্যর্থ হয়েই সেই প্রেতাত্মা হলঘর ছেড়ে উধাও হয়ে গেল।

ওরা দুজনে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচল। আনন্দে অধীর হয়ে অতনু বলল, দেখলি তো, যা বলেছিলাম। বোধহয় ও আর আমাদের জ্বালাবে না।

অনিল বিরক্ত হয়ে জবাব দিল, ওসব জানি না। তোকে কিন্তু আমি আর মাত্র দুটো দিন সময় দিচ্ছি।

তারপর দু'দিন দু'রাত কেটে গেছে। এই দু'রাতেই সিকান্দার বেগের প্রেতাত্মা এসে এদিক-ওদিক হাতড়ে গেছে।

আজকের রাতটাই ওদের শেষ রাত। ক'দিনের অক্লান্ত পরিশ্রমে অতনু সিকান্দার বেগের যে ছবি ক্যানভাসের বুকে ফুটিয়ে তুলেছে সত্যি বলতে কি, সেই ছবির দিকে তাকিয়ে অনিল খুব অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছিল। অতনু দারুণ উল্লসিত। কোন দেশের কোন চিত্রশিল্পী, কোন কোন খুনি ঘাতক জল্লাদের ছবি এঁকেছেন, তার বিস্তারিত বিবরণ অনিলকে শুনিয়ে দিল।

শোবার আগে অতনু সযত্নে ছবিখানা নিজের বিছানার মাথার কাছে রাখল। অবাক অনিল জিজ্ঞাসা করল, ব্যাপার কী, ছবিটা আজ তোর বিছানার কাছে রাখছিস কেন?

তুই যে ভীষণ নার্ভাস হয়ে পড়েছিস, তাই।

অতনুর কথায় অনিল স্বস্তি পেল। সত্যিই ছবিটার দিকে আর তাকানো যাচ্ছে না।

রাতের প্রথম প্রহর বেশ শান্তিতেই কাটল। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে চারদিক ক্রমশ নিস্তব্ধ হয়ে এল।

হঠাৎ ঝন্‌ঝন্‌ খন্‌খন্‌ শব্দে অনিলের ঘুম ভেঙে গেল। তাকিয়ে দেখল, লণ্ঠনটা নিভে গেছে। ঘর অন্ধকার। দরজায় ধাক্কাধাক্কির শব্দের সঙ্গে একটা ঝাপ্‌টাঝাপ্‌টির শব্দও ওর কানে এসে পৌঁছল।

'অতনু....অতনু....' অনিল চিৎকার করে অতনুকে ডাকতে চেষ্টা করল। কিন্তু ওর গলা দিয়ে একটা আর্ত গোঙানি ছাড়া কোনো শব্দই বের হল না। পরক্ষণেই অতনুর আর্তনাদে বন্ধ ঘরের সীমা ছাড়িয়ে, বাইরের জ্যোৎস্নাপ্লাবিত অরণ্য প্রান্তরে ছড়িয়ে পড়ল।

ভয়ে আতঙ্কে বিছানার ওপর উঠে বসল অনিল। প্রাণপণ শক্তিতে চেঁচিয়ে উঠল, অতনু....

বন্ধ দরজাটা হঠাৎ খুলে গেল। এক ঝলক ঠান্ডা বাতাস ঘরে ঢুকে অনিলের সর্বাঙ্গে ঝাপটা মারতেই ও প্রাণভয়ে মরিয়া হয়ে লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নেমে পড়ল। আতঙ্কে-ভয়ে খোলা দরজা দিয়ে প্রাণপণে ছুটতে লাগল।

বিরজু আশেপাশের বাড়ির লোকজনদের সঙ্গে নিয়ে অচেতন অনিলকে খুঁজে বার করে যখন বাড়ি পৌঁছল, তখন ভোর হতে আর দেরি নেই। খোলা দরজা দিয়ে হলঘরের ভেতরে ঢুকে সবাই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

সারা ঘর লণ্ডভণ্ড। যেন প্রচণ্ড একটা ঝড় বয়ে গেছে। মেঝের ওপর ভাঙা ফ্রেমের চূর্ণবিচূর্ণ কাঠামোটা পড়ে। অতনুর আঁকা সিকান্দার বেগের সেই জিঘাংসু রক্তলোলুপ ছবিটা ছিন্নভিন্ন হয়ে ঘরময় উড়ছে।

মেঝের একধারে লুটিয়ে পড়ে আছে অতনু। ও বোধহয় ওর সৃষ্টিকে বাঁচাবার শেষ চেষ্টা করেছিল! পারেনি!

ওর হাতের মুঠোর ভেতর ধরা সিকান্দার বেগের সেই আসল ছবিটা দোমড়ানো, মোচড়ানো। সেটাও অক্ষত নেই।

সম্বিৎ ফিরে পেয়ে অতনু বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকাল অনিলের মুখের দিকে। তারপর ক্লান্ত গলায় বলল, সিকান্দার বেগ তার ছোরা হাতে নিয়েই এসেছিল। ও চায় না ওর ছবি কেউ আঁকুক। আমিও আর আঁকতে পারব না রে।

চৈত্র ১৩৯৩

গভীর রাতের আতঙ্ক

হীরেন চট্টোপাধ্যায়

সবে চোখটা একটু লেগেছিল, আওয়াজ শুনে ভুরু কুঁচকে উঠল জটাধারীর। না, আলাদা করে কোনো শব্দ এখন আর বোঝার উপায় নেই। সেই দুপুর থেকে যে প্রলয় কাণ্ড শুরু হয়েছে—ভেবেছিল সন্ধে রাত নাগাদ সব ঠিকঠাক হয়ে যাবে, নিম্নচাপ না কী সব বললে রেডিয়োতে, সে আর কতক্ষণ থাকবে! কিন্তু রাত যত বাড়বে তর্জন-গর্জন ততই বাড়তে থাকবে, এ তো বাপু বাপের জন্মে দেখিনি কখনো।

জটাধারী চোখ বুজেই কান দুটো খাড়া রাখল। সারাদিন যা ঝক্কি গেছে, এত চট করে ঘুম ভেঙে যাবার তো কথা নয়। শব্দটা হল কিসের!

সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, এত সব বিচ্ছিরি আওয়াজের মধ্যেও যখন ঘুমিয়ে পড়েছিল, তখন ঘুমটা তো আর যে সে আওয়াজে ভাঙবে না। ঘুম তো একেবারে বিখ্যাত জটাধারীর। চন্দনপোতা গ্রামে যখন থাকত, গাঁসুদ্ধু লোক চিনত তাকে ওই ঘুমে—বলত 'ঘুমুলে তুই একেবারে মরা! ঘরে আগুন লাগলে টের পাবি না!' তা সে তো বহুকালের কথা, গাঁয়ে মড়ক লাগার পর বউ গেল, মেয়েটাও গেল—থাকা বলতে ওই ঘেঁটুচরণকে নিয়ে পালিয়ে এসেছিল কলকাতায়। সেও তো আজ নয় নয় করে—

ঠক! ঠক! ঠক!

ঘাড় হঠাৎ ঘুরে গেল জটাধারীর। দরজায় আওয়াজ হচ্ছে? ডাকছে কেউ? এই ঘোর দুর্যোগের রাতে!

সিঁটিয়ে পড়ে রইল জটাধারী। অসম্ভব! এই ঝড়জলের রাতে—

বাইরে হাওয়ার বেগ আরো বেড়েছে বোধহয়। ঘরটা বোধহয় উড়িয়ে নিয়ে যাবে এবার। এক-একবারের দমকা হাওয়া আছড়ে পড়ছে আর মনে হচ্ছে কাঠের পার্টিশান দেওয়া ঘরটা বুঝি কাত হয়ে পড়বে। সেই সঙ্গে জলের ঝাপটা। ছাদের অ্যাজবেস্টসের ওপর এমন জোরে পড়ছে ফোঁটাগুলো, ছাদ যেন ফুটো হয়ে যাবে মনে হচ্ছে মাঝে মাঝে।

না, এই ভয়ংকর রাতে জটাধারীর কাছে কেউ আসবে না, তা সে যত ভালো কাঠের মিস্ত্রিই হোক না কেন! সবচেয়ে বড়ো কথা, এ ঘর সে খুঁজেই পাবে না। রামমোহন সরণীর এই বাড়ির সামনে গাঁ থেকে যেদিন ছেলেটাকে কোলে করে হাজির হয়েছিল, ও তো একটা কাঠের গোলাই ভেবেছিল এটাকে। হ্যাঁ, চিন্টুরামের গোলা তো এটা বটেই, কিন্তু ভেতরে এই যে ঘরের মধ্যে ঘর, তার মধ্যে ঘর—এই গোলকধাঁধার কিছু কি ছাই জানত তখন সে! চিন্টুরাম তার হাতের কাজ দেখে খুশি হয়ে যখন এই ঘরটা তিরিশ টাকায় ভাড়া দিয়েছিল, ঘরে উঠতে গিয়েই তো ভিরমি খেয়েছিল সে। পাঁচবার উঠোনে পাক খাবার পর কাঠের সিঁড়ি—সিঁড়ি না বলে মই বলাই ভালো, অতি সাবধানে উঠে এই ছোট্ট কাঠের ঘর, ওপরে অ্যাজবেস্টসের ছাউনি। না, তার অবশ্য অসুবিধে হয় না। বাপ-ছেলে বসে কাজ করে, কাঠ তো চিন্টুর কাছেই থাকে। দুপুর বেলা এই ঘরেই দুটো ফুটিয়ে নেওয়া—রাত্তিরেও বেশিরভাগ চলে যায় তাতেই। আজকেও সেই রকম করেই মুড়ি-টুড়ি খেয়ে—

গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল জটাধারীর।

শব্দটা হল আবার। কোনো ভুল নেই। এবার আরো জোরে।

আশ্চর্য! এমন রাতে কেউ আসতে পারে তার কাছে! সামান্য একটা ছুতোর মিস্ত্রির কাছে কে আসবে ঝড়-জল ঠেলে!

একবার মনে হল, চিন্টুভাই নয় তো! কিন্তু এই রাত-বিরেতে তারই বা কী দরকার! সে তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না। সকাল হলেই তো—

ঠক! ঠক! ঠক!

এবার আরো জোরে এবং আরো নির্ভুল ভাবে।

কোনো উপায় নেই না উঠে। বিছানা থেকে উঠে হাত বাড়িয়ে সুইচটা টিপল জটাধারী। সেই একই রকম রয়েছে আলোটা। ভোল্টেজ খুব কমে গেছে আর কাঁপছে মৃগী রোগীর মতো। সন্ধের পরই হয়েছিল এইরকম, এখনও ঠিক হল না।

বিরক্ত মুখে ঘাড় ঘোরাতেই অ্যালার্ম ঘড়ির ওপর চোখ পড়ল।

একটা দশ।

রাত একটা দশে কেউ কারো বাড়ি আসে!

গলাটা কেমন শুকিয়ে উঠছিল জটাধারীর। তাকিয়ে দেখলে, ঘেঁটু অঘোরে ঘুমোচ্ছে। ওঃ, ঘুম পেয়েছে বটে বেটা! বাপকেও টেক্কা দেয় একেবারে। গায়ে হাত দিয়ে ধাক্কা দিল একবার, গলায় জোর তেমন ছিল না, ডাকল ফিসফিস করে, 'এই ঘেঁটু—ঘেঁটু রে—'

নাঃ, ওকে তোলা যাবে না। যা থাকে কপালে। পায়ে পায়ে কপাটের দিকে এগিয়ে গেল জটাধারী। দুর্যোগের রাত বটে, তবে গোটা বাড়িতে থই থই করছে লোক। তেমন করে একটা হাঁক মারতে পারলে লোকের অভাব হবে না।

কপাট খোলার সঙ্গে সঙ্গে বাইরের উন্মত্ত তাণ্ডব হু হু করে ঢুকে পড়ল ঘরের মধ্যে। এলোপাথাড়ি হাওয়া আর শোঁ শোঁ শব্দ মুহূর্তে লণ্ডভণ্ড করে দিল সব কিছু। দরজা ফের বন্ধ করার আগেই মানুষটা ঢুকে পড়েছে ঘরের মধ্যে।

মানুষ না বলে দৈত্য বলাই ভালো!

দরজার চেয়ে উঁচু মাথায়। গতরও সেইরকম। সমস্ত শরীরটাই বর্ষাতি দিয়ে ঢাকা। মাথার টুপি নেমে এসেছে মুখের ওপর—ফলে নাক-মুখ-চোখ কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। তার ওপর ঘরের কাঁপা কাঁপা আবছা আলো লোকটাকে কেমন রহস্যময় করে তুলেছে।

দেখলেই কেমন যেন আতঙ্ক জাগে মনে। চোখ পড়লেই গাটা শিরশির করে ওঠে।

'জটা মিস্ত্রি?'

কোথা থেকে যেন ভেসে এল স্বরটা। যেন এ ঘর থেকেই নয়, ফ্যাঁসা ফ্যাঁসা খোনা কণ্ঠস্বর। উচ্চারণটাও কেমন কেমন।

কিন্তু তার চেয়েও অবাক লাগছে নাম জানাটা। আপাতত অবশ্য কোনোরকমে বিদায় করাটাই আগে দরকার, তাই কোনোরকমে বললে, 'হ্যাঁ, কিন্তু আপনি—'

'কফিন বানাতে পারো?' থামিয়ে দিয়ে বলে উঠল সেই হিসহিসে কণ্ঠস্বর, এবার যেন সাপের মতো কেমন ছোবল মারছে।

কফিন বানাতে পারে জটাধারী। খানদানী মুসলমান পরিবারের কিছু কফিন বানিয়েছে, চিন্টুই নিয়ে এসেছে ওর কাছে। বলল সে কথা।

'কালকেই চাই কিন্তু আমার, রাত্তিরে।'

'কালকেই—মানে, হাতের কিছু কাজ—'

'বাজে কথা আমার পছন্দ নয়'—এবার গলার আওয়াজে যেন মেঘ ডাকছে। মেঘ ডাকছে এখানেই, নাকি বাইরে—নাকি ওর বুকের মধ্যেই! বলছিল, 'প্রচুর টাকা পাবে, সে জন্যে ভেবো না। কাঠটা দামি চাই, পিওর বার্মা টিক।'

পিওর বার্মা টিক! ব্যাটা জানল কোথা থেকে? আসল বার্মা সেগুন কি এখন চট করে পাওয়া যায়! কালই চিন্টুরাম নিলামে কিনে এনেছে—রাসেল স্ট্রিটে একটা সাহেববাড়ি ভাঙা হচ্ছিল, মওকা বুঝে কিছু মাল তুলে ফেলেছে।

'নাও, ধরো'—লোকটাই বলছিল। হাতটা একবার ওভারকোটের পকেটে ঢুকে আস্তে আস্তে বেরিয়ে এসেছে। আর সেদিকে চোখ পড়তেই বুকের ভেতর কে যেন দু'বার হাতুড়ি পিটে দিয়েছে জটাধারীর।

হাতে কড়কড়ে কিছু নোট, তার পরিমাণ বিশাল।

কিন্তু কারণটা ঠিক তাও নয়। এরকম হাত কোনো মানুষের হয়! আবছা আলোয় ঠিক দেখা যাচ্ছে না বটে, তবে এমন দশাসই মানুষের হাতে এক ফোঁটা মাংস নেই—একেবারে শুকনো খটখটে একটা সাদা হাত।

ভাববার মতো মনের অবস্থা ছিল না। কোনোরকমে আলগোছে টাকাটা নিয়ে জটাধারী বললে, 'আজ্ঞে, মাপটা কী হবে?'

'দেখে নাও।'

'মানে?' জটাধারীর মাথায় কিছু ঢুকছিল না। বেশি কিছু ভাববার আগেই লোকটা আবার বললে, 'আমারই কফিন।'

গুম গুম করে একসঙ্গে হাজারটা ঢাক যেন বেজে উঠল কানের কাছে। সাপের ছোবলের মতো ঠান্ডা বাতাস আছড়ে পড়ল বুকে!

হতভম্বের মতো কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল কে জানে। খেয়াল হতে দেখল, কেউ কোথাও নেই। দরজাটা খোলা।

বাইরে বেরিয়ে দেখে এলে হত, জটাধারী দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিয়ে দরজায় পিঠ দিয়ে ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলতে লাগল।

গোটা ব্যাপারটাকেই একটা দুঃস্বপ্ন মনে হচ্ছিল সকালে।

না, ঘুম ভালো করে হয়নি জটাধারীর রাত্তিরে। একটু করে চোখ লেগে এসেছে আর দরজায় ঠক ঠক শব্দ হচ্ছে মনে করে ঘুম ভেঙে গিয়েছে। সকালে ঘেঁটু সব শুনে হেসে উঠেছিল, বলেছিল, 'তুমি বাবা একটা ভীতুর ডিম! কেউ এলে আমার ঘুম ভাঙতো নি!'

ঘুম ভাঙবে! তুই তো ব্যাটা বাপের চেয়ে এক কাঠি বাড়া।

আসলে সব স্বপ্ন হতে পারে, কিন্তু চোখের সামনে ওই কড়কড়ে নোটের তাড়া—ওটা তো আর স্বপ্ন নয়।

চিন্টুরাম বলেছিল, 'দূর, অতো রাত্তিরে এসেছে বলেই তোর আবোল-তাবোল কথা মনে হচ্ছে। কেউ হঠাৎ মারা গেলে কফিন তো সঙ্গে সঙ্গেই লাগে, এ আর বেশি কথা কী?'

'কিন্তু ওই যে বললে কফিন ওর নিজের জন্যে—'

'তবে কি ডেডবডি সঙ্গে করে নিয়ে আসবে! ওর মতোই হয়তো বড়োসড়ো চেহারা—তাই নিজেকে দেখিয়ে দিয়েছে।'

না, তাও ভয় কাটছিল না জটার। দেখে চিন্টু বলেছে, 'ঠিক আছে বাবা, রাত্তিরে লোকটা আসবে বলেছে তো! আমি থাকব না হয় রাতে তোর সঙ্গে।'

'না না, তার দরকার নেই'—জটাধারী বলেছিল, 'তুমি আজ ঘেঁটুরে তোমার কাছে রেখে দিয়ো, তাইলিই হবে।'

তো, সেইরকমই হয়েছে। সাতটা-সাড়ে সাতটার মধ্যে দুটো ভাতে ভাত রেঁধে ওকে খাইয়ে দিয়েছে জটাধারী, নিজেও খেয়ে নিয়েছে। ঘেঁটু অঘোরে ঘুম দিচ্ছে, দেখে এসেছে ন'টার পর গিয়ে। তারপর থেকেই এই প্রতীক্ষা।

ঘড়িটা একবার দেখতে পারলে হত। দেখে অবশ্য লাভ নেই, যতক্ষণ শুয়ে আছে, বারোটা-সাড়ে বারোটা হবেই। তেষ্টাও যেন পাচ্ছে একটু একটু। কিন্তু উঠতে গেলেই মোমবাতিটা জ্বালতে হবে। কালকের দুর্যোগ তো কাটেনি এখনও, একটু ভাটা পড়েছে এইমাত্র। তবে আলোটা তেমনি

গেছে দুপুর থেকে। যাওবা মিট মিট করছিল পিদিমের মতো, দুপুর থেকে তাও ফট। সেইজন্যেই তো সারা দুপুর-বিকেল কাজ করে কাজটা উদ্ধার করেছিল জটাধারী, আলো যদি রাত্তিরেও না আসে, হাতের কাজ তো সারতে পারবে না। ঠিক তাই হল, ছাইয়ের আলো কি আজ আর আসবে! কক্ষনো না।

না, কাজটা জটাধারী খারাপ করেনি। ভয়েই হোক আর টাকার গুণেই হোক, কাজটা একেবারে পাকা হাতে সেরেছে। চিন্টুরাম মালটাও দিয়েছিল সরেস—ওই সাহেববাড়ি থেকে কেনা এক নম্বর সেগুন কাঠ। র‍্যাঁদা চালাচ্ছে যেন হাত বোলাচ্ছে ঘেঁটুর গায়ে। একটু ঘষতেই কি ফাইবার! আফশোস হচ্ছিল, এমন কাঠ কেউ মাটির তলায় দিয়ে নষ্ট করে!

যাক গে, সে যার জিনিস সে যা খুশি তাই করুক। কিন্তু কথা হচ্ছে, সত্যি সত্যি সে আসবে তো! নাকি সারাদিন ধরে জটার এই পরিশ্রমটাই বেকার! বলেছিল রাত্তিরে আসবে, তো সে রাত্তির মানে ক'টা! রোজ রোজই কি মানুষের কাছে গিয়ে রাতদুপুরে এইরকম উৎপাত করবে নাকি! সারাদিন পরিশ্রম করেছে, একটু ঘুম-টুম তো মানুষের দরকার, না কী!

ভাবছিল, তার মধ্যেই শব্দটা কানে এল জটার।

কালকের সেই শব্দই, কিন্তু একটু মোলায়েম, একটু আস্তে আস্তে।

শব্দটা শুনেছে তো ঠিক! নাকি ভেতরে ভেতরে একটা উত্তেজনা রয়েছে বলেই ভুল শুনছে! একটু অপেক্ষা করে দেখবে? কেউ এলে সে তো ডাকবে আর-একবার!

ডাকল। বেশি অপেক্ষা করতে হল না জটাধারীকে।

ঠক! ঠক! ঠক!

বিছানা থেকে নামল জটাধারী। মাথার কাছেই ছিল দেশলাইটা। মোমবাতির কাছে এগিয়ে গেল।

হাত কাঁপছিল। দুটো দেশলাই কাঠি খরচা করে কোনোরকমে ধরাল মোমবাতিটা। কুঁজো থেকে গড়িয়ে একটু জল খেল। জল একটু ছলকে পড়ল মেঝেয়। একটু বুঝি লাগলও কফিনের গায়ে। প্রায় গোটা ঘর জুড়েই তো রয়েছে ওটা। দরজা পর্যন্ত এগুবার আগেই আবার সেই শব্দ।

আবার সেই মূর্তি। আজ যেন আরো উৎকট লাগছে। মোমবাতির আবছা আলোয় মুখের গহ্বরগুলোই যেন বেশি প্রকট হয়ে উঠছে।

'ভেরি গুড।' কফিনের ওপর নজর পড়েছে তার, আগের দিনের মতো ফ্যাঁসা গলায় বলেছে, 'ওটা বার করে দাও ঘর থেকে।'

সে আর বলতে! আপদ যত তাড়াতাড়ি বিদেয় হয় ততই তো মঙ্গল। বাকি রাতটা অন্তত ঘুমোতে পারবে একটু শান্তিতে।

বাইরে বেরিয়ে গিয়েছিল, কোনোরকমে টানতে টানতে কফিনটাকে নীচে নামবার সিঁড়ির কাছে নিয়ে এল জটাধারী। ওভারকোটের পকেট থেকে হাত বার করেছিল লোকটা, বললে, 'ঠিক আছে।' হাত নেড়ে চলে যেতে ইঙ্গিত করল।

না বললেই যেন দাঁড়াত জটাধারী! তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে ঢুকে মোমবাতিটা ঠিক জায়গায় রেখেছে, পেছন ফিরতেই—

সেই মানুষ। ঘাড়ের কাছে যেন নিশ্বাস ফেলছে।

বুকটা ধক করে উঠেছিল জটাধারীর, বললে, 'আজ্ঞে—'

হাতটা বেরিয়ে এল লোকটার পকেট থেকে। হাতে ধরা একটা ছোটো সুদৃশ্য তালা আর রিংসমেত একটা চাবি।

'তালাটা তুমি বন্ধ করে দেবে কফিনের। ঠিক আছে?'

তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে নিতে গিয়ে হাতটা বোধহয় ছুঁয়ে ফেলেছিল জটাধারী।

সঙ্গে সঙ্গে যেন গোটা শরীরে বিদ্যুৎতরঙ্গ খেলে গিয়েছে।

হিমশীতল একটা হাত। যেন বরফের চেয়েও ঠান্ডা। একেবারে অবশ করে দেওয়ার মতো।

কোনোরকমে মাথা নিচু করে কফিনের দিকে এগিয়ে গেল। বেশ দামি তালা মনে হচ্ছে। সোনার না কি? কে জানে! চাবিটা লাগিয়ে রিংসুদ্ধু চাবিটা ফেরত দেবার জন্যে মুখ তুলেই চক্ষুস্থির।

গেল কোথায় মানুষটা!

এই তো জলজ্যান্তো দাঁড়িয়ে ছিল চোখের সামনে। এর মধ্যে যাবে কোথায়! ঘরে সেঁধোয়নি তো গিয়ে আবার?

তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে এল জটাধারী। কই না, ঘরেও তো নেই। তাহলে!

বিস্মিত চোখে ঘাড় ঘুরিয়েছিল জটা। চোখে যা পড়ল তা না দেখলেই বুঝি ছিল ভালো।

গোটা কফিনটা এখন ভাসছে হাওয়ায়। ঠিক যেন কেউ কাঁধের ওপর তুলে নিয়েছে। মনে হচ্ছে সিঁড়ি বেয়ে কেউ নেমে যাচ্ছে নীচে।

চোখ দুটো ভালো করে কচলে নিল জটাধারী।

সম্ভব না, একেবারেই সম্ভব নয়। একা একা ওই কফিন নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামবে, সেটাই অসম্ভব—কারণ সিঁড়ি তো ওটা নয়, আসলে ওটা মই। তার চেয়েও বড়ো কথা হল, কে বইছে ওটা! কেউ তো কোথাও নেই—স্পষ্টই তো দেখা যাচ্ছে ওটা আপনি-আপনি এগিয়ে যাচ্ছে।

জটাধারী এগিয়ে যাচ্ছিল সামনে। ইচ্ছে ছিল না একটুও, কিন্তু মনে হল কেন যেন টানছে ওকে চুম্বকের মতো। কফিনের পেছন পেছন যাওয়া ছাড়া কোনো উপায়ই যেন তার নেই। এক অদৃশ্য শক্তি যেন ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে তাকে ওদিকে।

রাস্তায় এসে পড়ল কফিন। হাওয়ার বেগ ততটা নেই, কিন্তু যা আছে তাও নেহাৎ মন্দ নয়। বৃষ্টি পড়ছে গুঁড়ি গুঁড়ি। শীত এখনো পড়েনি, কিন্তু ভিজে গায়ে হাওয়ার ঝাপটা লেগে রীতিমতো দাঁতে দাঁত লেগে যাচ্ছিল জটাধারীর।

কেন যাচ্ছে, কতক্ষণ যাচ্ছে, কোন দিকে যাচ্ছে—কিছুই খেয়াল ছিল না জটার। খেয়াল রেখে কোনো লাভও ছিল না তার। গাঁয়ে নিশির ডাকের কথা শুনেছে, এও যেন ঠিক তেমনি ব্যাপার। দেহ কাঁপছে ঠক ঠক করে, ভেতরে ভেতরে কাঁপুনি ধরছে—অথচ চোখের দৃষ্টি ওই একদিকে, পা চলছে যন্ত্রের মতো।

শেষ পর্যন্ত যেখানে গিয়ে কফিন থেমেছে সে জায়গাটাকে চিনতে পেরেছে জটাধারী। পেরে আর-একবার একটা শীতল স্রোত নেমে গিয়েছে ওর মাথা থেকে শিরদাঁড়ার ভেতর দিয়ে। এটা তো কবরখানা।

হ্যাঁ, সেই কবরখানা। বহু কবর যেখানে শোয়ানো। মাটির ওপর ছোট ছোট স্তম্ভ আর ফলক। চিন্টুরাম একবার নিয়ে এসেছিল তাকে এখানে। কফিন ওই দু-এক মুহূর্তই চুপ করে ছিল। নির্জন রাস্তা। একটি লোক নেই কোথাও। প্রত্যেকটি বাড়ির জানলা বন্ধ। রাস্তা ছাড়া এক ফোঁটা আলো নেই কোথাও। শুধু আবছা ঘোলাটে রাস্তার আলোয় দেখা যাচ্ছে এখন, কফিন বড়ো লোহার গেটের ওপর দিয়ে ঢুকছে ভেতরে।

আমি কী করে ঢুকব, গেট তো আমায় খুলে দেবে না কেউ—এ সব চিন্তার অনেক আগেই জটাধারী দেখতে পেল গেট বেয়ে সে ওপরে উঠছে। কে দেখে ফেলবে, দেখে ফেললে কী হবে, এ সব কথা ভাববার সময়ও ছিল না, ভাবার মতো অবস্থাতেও ছিল না সে। কফিনের সঙ্গে সঙ্গে এসে দাঁড়াল বিস্তীর্ণ গোরস্থানে। আর তারপর যা হল—

কোনোদিন কল্পনাও করা যাবে না সে দৃশ্য!

কফিন থেমে গেল একটা স্তম্ভের কাছে এসে। ঠিক তার পাশে একটা ফাঁকা জায়গায় নেমে পড়ল সেটা মাটিতে। আর ওই স্তম্ভটা এবার যেন নড়ে উঠল হঠাৎ।

দেখতে দেখতে, কেঁচো যেমন করে মাটি ফুঁড়ে ওঠে, তেমনি ভাবে মাটির পুঞ্জ সরিয়ে একটা কফিন উঠে এল নীচ থেকে।

একটা হু হু হাওয়া ছুটে এল যেন কোথা থেকে। সমস্ত গোরস্থান কাঁপিয়ে ধুলোর ঝড় উঠল। ধুলোয় ঢেকে গেল সমস্ত কিছু। সেই ধুলোর আস্তরণ যখন সরে গেছে সামনে থেকে, জটাধারীর কানে এল শিস দেবার মতো এক তীব্র শব্দ। সেই শব্দের সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেছে দুটো কফিনের ডালা। পরমুহূর্তেই উঠে এসেছে কফিনের ভেতর থেকে দুটো চেহারা।

একেবারে সেই চেহারা যে কফিনের অর্ডার দিয়ে এসেছিল, কফিন চাইতে এসেছিল। যেন দুটি যমজ ভাই। এক চেহারা, এক পোশাক।

দুজনে এগিয়ে এল সামনে। জড়িয়ে ধরল দুজন দুজনকে।

আবার একটা তীব্র হাওয়া। টুপি উড়ে গেল হাওয়ায়। এবার স্পষ্ট দেখতে পেল জটাধারী। দুটি নরকরোটি হাসছে হা হা করে। বীভৎস হাসিতে ফেটে পড়ছে—সাদা দাঁতের পাটি ঝলসে উঠছে ওই মৃদু আলোতেও—সেই সঙ্গে কান-ফাটানো অট্টহাসি—

একটা আর্ত চিৎকার এবার বেরিয়ে এসেছে বুক চিরে। কাটা গাছের মতো সেখানেই আছড়ে পড়েছে জটাধারী।

ধড়মড় করে উঠতে যাচ্ছিল জটাধারী, ছুটে এল খাকি পোশাক পরা গার্ড, বললে, 'যাক, জ্ঞান হয়েছে তাহলে। চুপ করে শুয়ে থাকো, আমি ফাদারকে একটা খবর দিই।'

গার্ড চলে গেলে জটাধারী একটু ভালো করে দেখতে চেষ্টা করল কোথায় আছে সে।

ছোটখাটো ঘর একটা। জানলা দিয়ে এক টুকরো রোদ পড়েছে দেওয়ালে। তার মানে সকাল হয়ে গেছে। দুর্যোগও কেটে গিয়েছে। ঘরের চেহারা দেখে বোঝাই যায় লোকটা একা থাকে এখানে। কাপড়-জামা ঝুলছে ক'টা। রান্নাবান্নার সরঞ্জাম রয়েছে একদিকে। তার মতোই ব্যবস্থা। একটু একটু করে গোটা ব্যাপারটা মনে পড়ছিল জটাধারীর। কফিনের সঙ্গে সঙ্গে সারা কলকাতার রাস্তায় ঘোরা, গোরস্থানে এসে পড়া, লোহার গেট টপকানো, তারপর—

আর! আর ভাবতে পারে না জটাধারী। মাথার ভেতরটা কেমন টনটন করে ওঠে। তাহলে কি সেই কংকালটাই তাকে আক্রমণ করেছিল, নাকি—গলার আওয়াজে বুঝতে পারল গার্ডটা ঢুকেছে ফের, বলছিল, 'একটু দুধের ব্যবস্থা করে এলাম তোমার জন্যে। নাড়ি খুব দুর্বল, ওই অবস্থায় অক্কা যে পাওনি এই ঢের।'

'কী হয়েছিল আমার?' খুব আস্তে আস্তে কোনোরকমে বলল জটাধারী।

'সেটা তো তুমিই বলবে আমাকে।' লোকটা বসল এসে পাশে—'চিৎকার-চেঁচামেচি শুনে গিয়ে দেখি একটা কবর খোঁড়া, কফিন বাইরে বার করা—আর তুমি পাশে পড়ে আছ অজ্ঞান হয়ে।'

'আর একটা কফিন ছিল না পাশে? নতুন কফিন?'

'ছিল বলেই তো বেঁচে গেলে তুমি। আমি ভেবেছিলাম তুমি ডেডবডি চুরি করতে এসেছ—পুলিশকে ফোন করতে যাচ্ছিলাম, তখন দেখি ওপাশে আর একটা নতুন কফিন।'

'যাক পেয়েছ তাহলে!'

'হ্যাঁ, কিন্তু তারপর যে ব্যাপার হল সে তো আরো সাংঘাতিক। ফাদারকে যখন ডেকে নিয়ে এলাম তখন দেখি কবর খোঁড়ার কোনো চিহ্নই নেই, স্তম্ভ যেমন ঠিক তেমনটি।'

'সেকি?'

'তার চেয়েও আজব কাণ্ড—নতুন কফিনে আর একটা ডেডবডি। সেটা আবার জানা গেল তোমার হাতের মুঠোয় ধরা চাবি দিয়ে সেটা খুলে। তার মানে ডেডবডি কফিনে ভরে তুমি নিয়ে এসেছ একা একা, যেটা আরো অসম্ভব।'

ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাচ্ছিল জটাধারী, কিছুই ঢুকছিল না মাথায়। দেখতে পেল সাদা পোশাক পরা এক ফাদার ঢুকছেন ঘরে। হাসিমুখে তিনিই বললেন, 'কিচ্ছু বুঝতে পারছ না তো? সব বুঝিয়ে বলছি তোমাকে, আগে তুমি আমাকে বলো কী হয়েছে।'

গুছিয়ে সব কিছু বলার মতো জ্ঞানগম্যি কি আর আছে নাকি ছাই জটাধারীর! তার ওপরে শরীরের যা অবস্থা! একটুখানি দুধ খেয়ে উঠে বসল, তারপর যেটুকু পারল বলল সব।

ফাদার বললেন, 'হ্যাঁ, যা ভেবেছি ব্যাপারটা ঠিক তাই। রাসেল স্ট্রিটের যে সাবেক বাড়িটা ভাঙা হয়েছে ওখানে অনেক দিন আগে থাকতেন দুই ভাই, জন পামার আর হ্যামফ্রে পামার। তামাকের ব্যবসায় খুব পয়সা করেছিলেন তাঁরা। বার্মা থেকে এক ব্যবসায়ী ওঁদের বাড়িতে আসার পরই জন পামার হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে যান। হ্যামফ্রের ধারণা তাঁর ভাইকে খুন করে ওই বাড়িতেই কোথাও গুম করে রাখা হয়েছে—যে কারণে ব্যবসাতে মন্দা দেখা গেলেও বাড়ি ছেড়ে কোথাও যাননি উনি। এ সব গল্প আমাকে উনিই বলেছেন। শেষদিকে দেখেছি মাথার একটু গোলমাল দেখা দিয়েছিল—সারা বাড়ি তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়াতেন। আমাকে অনুরোধ করেছিলেন ওঁর কবরের পাশে যেন একটা জায়গা ফাঁকা রাখা হয় ভাইয়ের জন্যে। সে ইচ্ছেও আমি পূর্ণ করেছিলাম ওঁর। প্রায় বছর তিনেক হল উনি মারা গেছেন। বিয়ে-থা দুই ভায়ের কেউই করেননি। এখন বিলেত থেকে ওঁর এক ওয়ারিশন এসে জোর করাতেই বাড়িটা ভাঙা হয়েছিল। বুঝতে পারছি, হ্যামফ্রের অনুমানই ঠিক। জনের অতৃপ্ত আত্মা এতদিনে ভাইয়ের মনের আশা পূর্ণ করতে পারল।'

হাঁ করে শুনছিল সব কিছু, ফাদার থামতে জটাধারী জিগ্যেস করলে, 'কিন্তু উনিই যে পামার সাহেব আপনি বুঝলেন কী করে?'

'দেখো, কী করে বুঝলাম'—সেই চাবি বার করলেন ফাদার গাউনের পকেট থেকে, 'এই চাবিই উনি দিয়েছিলেন তোমাকে। খাঁটি আইভরিতে বানানো চাবির রিং, নামটা খোদাই করা আছে ওখানেই, দেখো না!'

হাসি পাচ্ছিল জটাধারীর, এই এতক্ষণ পরে। ক-অক্ষর গো-মাংস বলে কথা। সে পড়বে ইংরেজিতে লেখা নাম! হেসে কী একটা বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ তড়াক করে উঠে দাঁড়াল, বললে, 'আমি যাচ্ছি ফাদার।'

'একটু রেস্ট নিয়ে যাও, তুমি এখনো দুর্বল—'

ধুত্তেরি ছাই দুর্বলের নিকুচি করেছে। আসলে ঘেঁটুচরণের কথা মনে পড়ে গিয়েছে ওর। সারা রাত ছেলেটা যে কী করেছে কে জানে। দরজা দিয়ে ছিটকে বেরুতে বেরুতে বলেছে, 'আমার ছেলেটা যে একা আছে গো ফাদার—'

—

আশ্বিন ১৪০৯

চশমা

দেবল দেববর্মা

রাঁচি স্টেশনে নেমে ধাক্কাধাক্কিতে চশমাটা চোখ থেকে ছিটকিয়ে পড়ল। শক্ত বুট জুতো পায়ে ষণ্ডাগোছের একটা লোক নির্মমভাবে সেটা মাড়িয়ে যেতেই কাচ দুটো ভেঙে চুরমার। অবস্থা দেখে সুধাকরের চোখ ফেটে জল এল।

একপাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে সুধাকর কী করবে তাই ভাবছিল। চশমা না থাকলে তার অন্ধ নাচারের দশা। ধীরে ধীরে হয়তো হাঁটাচলা করতে পারবে। কিন্তু পড়াশুনো?

ঠিক সেই মুহূর্তে শ্রীনিবাস কাছে এসে দাঁড়াল। তাকে অমনি নির্বাক দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ঈষৎ হেসে শুধোল, 'ব্যাপার কি?'

সাত টুকরো চশমাটা তুলে দেখাতেই শ্রীনিবাসের মুখের অবস্থা রীতিমতো করুণ হয়ে উঠল। সখেদে বলল, 'এই যাঃ! তাহলে এখন কী হবে?'

শ্রীনিবাস স্টেশনে হাজির সুধাকরকে রিসিভ করতে। আগামীকাল থেকে অনার্স পরীক্ষা শুরু। প্র্যাকটিকাল পরীক্ষার এক্সটারনাল একজামিনার হিসেবে সুধাকর এখানে এসেছে। বড়জোর দিন সাত থাকবে। সে ব্যবস্থা শ্রীনিবাস নিশ্চয় সব করে রেখেছে। এখন এই চশমাটা ভাঙতেই যত বিপত্তি।

ভাঙা চশমাটা একবার পরীক্ষা করেই শ্রীনিবাস বলল, 'শহীদচকে চশমার বড়ো দোকান আছে। দু-একদিনের মধ্যেই বানিয়ে দিতে পারবে।'

কিন্তু আশ্বাসটা সুধাকরের ঠিক মনঃপূত হল না। সে বলল, 'আপাতত কিসে কাজ চলবে? চশমা না থাকলেই কানা। তাহলে আগামীকাল পরীক্ষা নেব কেমন করে?'

কথাটা ঠিক। কাজ চলার মতো একটা কিছু বিকল্প ব্যবস্থা এখনই করতে হয়।

স্টেশন থেকে বেরিয়ে শ্রীনিবাস তাকে একটা অটোতে এনে তুলল। ঘড়ির দিকে একপলক তাকিয়ে বলল, 'চলুন, যাবার পথে শহীদচকে নেমে চশমার খোঁজ করে যাই?'

সুধাকর বলল, 'খোঁজ মানে একটা পুরোনো চশমা চাই। আপাতত যাতে দু-চারদিন কাজ চলে। তারমধ্যে ওরা ভাঙা চশমায় কাচ বসিয়ে দিক, তাহলেই হবে।'

শহীদচকে ফিরাইয়ালালের মস্ত ডিপার্টমেন্টাল স্টোর। তার উল্টোদিকে চশমার দোকান। ঘড়িতে আটটা বাজে। দোকানটা সবেমাত্র খুলেছে। সুধাকর একপাশে দাঁড়িয়ে ইতস্তত চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিল। স্যুটকেস হাতে খদ্দেরকে ঢুকতে দেখেই দোকানের মালিক একটু অবাক হয়ে তাকাল। শ্রীনিবাসকে লক্ষ করে বলল, 'কী ব্যাপার? সাতসকালে চশমার দোকানে আসতে হল?'

মালিক বোধহয় শ্রীনিবাসকে চেনে। অন্তত তার কথা বলার ভঙ্গি দেখে তাই মনে হল।

ভাঙা চশমাটা পকেট থেকে বের করে সুধাকর বলল, 'প্ল্যাটফর্মে হঠাৎ পড়ে গিয়ে এটা ভেঙে গেল। অথচ কাল সকাল দশটা থেকে পরীক্ষা শুরু। আমার আবার দশমা না হলে চোখ দুটো অন্ধ। একটা অক্ষরও পড়তে পারিনে।'

দোকানের মালিক চিন্তিতমুখে বলল, 'কিন্তু তিন-চারদিনের আগে তো আপনাকে চশমা বানিয়ে দিতে পারব না। ক্রিপ্টো গ্লাস হলে আবার কলকাতা থেকে আনাতে হবে। সে না হয় হল। কিন্তু দু-চার ঘণ্টার মধ্যে তো আর চশমা তৈরি হবে না।'

শ্রীনিবাস জিগ্যেস করল, 'দোকানে তৈরি চশমা নেই? মানে স্যারের চোখের পাওয়ারের সঙ্গে যদি সেটা মেলে? তাহলে অন্তত পরীক্ষাটা নিতে অসুবিধে হয় না।'

দোকানী ব্যাপারটা বুঝল। তৈরি চশমা নিশ্চয় আছে। কিন্তু মুশকিল হল পার্টি যদি হঠাৎ ডেলিভারি নিতে আসে?

কিছুক্ষণ পরে দোকানী বলল, 'আচ্ছা, পুরোনো চশমা হলে চলবে? ফ্রেম-ট্রেম কিন্তু বাজে, মানে ওল্ড স্টাইলের।'

সুধাকর ঈষৎ ঝাঁঝের সঙ্গে বলল, 'আরে মশায় ফ্রেম নিয়ে কী আমি ধুয়ে খাব? আমার হল কাজ চলা নিয়ে কথা।'

পুরোনো চশমা চোখে দিয়ে পরীক্ষা শুরু করল সুধাকর। কিন্তু কোনোটাই যে তার চোখের পাওয়ারের সঙ্গে মিলছে না। খবরের কাগজটা সামনে ধরে নানাভাবে চেষ্টা করল। হেডলাইন কিংবা বড় অক্ষর যদি বা পড়া যায় সাধারণ টাইপে ছাপা একটি বর্ণও তার দৃষ্টিতে বোধগম্য হল না।

হঠাৎ পুরোনো চশমার বাক্সে একটা চাঁদির ফ্রেমের চশমা তার নজরে পড়ল। হাত বাড়িয়ে সুধাকর সেটা টেনে নিতেই দোকানী বলল, 'এটা নিচ্ছেন?'

'দেখি, কাজ চলে কিনা।'

আশ্চর্য! চশমাটা চোখে দিতেই সুধাকরের দৃষ্টিতে কাগজের প্রতিটি অক্ষর স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। গড়গড় করে আট-দশ লাইন সে দিব্যি পড়ে গেল।

শ্রীনিবাস তালি বাজিয়ে বলল, 'হুররে! তাহলে এতেই কাজ হবে।'

সুধাকরের হঠাৎ মনে হল চশমার দিকে সে যখন হাত বাড়াল দোকানী যেন তখন একটু খুঁতখুঁত করেছিল।

মুচকি হেসে তাই সে শুধোল, 'চশমাটা দিতে আপনার আপত্তি আছে নাকি?'

'না আপত্তি কিসের? তবে একটা কথা—' দোকানী যেন কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেল।

'কী কথা আবার?' সুধাকর জিজ্ঞাসু হল।

দোকানী সহজভাবেই বলল, 'চশমাটা শুধু কাজের সময় ব্যবহার করবেন। মানে যখন কলেজে পরীক্ষা নেবেন।'

সুধাকর এক মুহূর্ত চিন্তা করল। কী বলতে চায় লোকটা? পুরোনো চশমাটা দিতে হয়তো ইচ্ছে নেই। এমনও সম্ভব যে ওর কোনও নিকটাত্মীয় এটা ব্যবহার করতেন।

ফিরাইয়ালালের দোকানের উল্টোদিকে সারবন্দী অটো দাঁড়িয়ে। ওরই একটাতে উঠে বসল শ্রীনিবাস আর সুধাকর।

একটা মস্ত কম্পাউন্ডওয়ালা বাড়ির সামনে দুজনে গাড়ি থেকে নামল।

শ্রীনিবাস বলল, 'পিছন দিকে একটা ছোট্ট গেস্টহাউস আছে। ওখানেই আপনার থাকার ব্যবস্থা করেছি।'

গেট খুলে কিছুদূর হেঁটে গেলেই গেস্টহাউসটা চোখে পড়ল। পুরোনো আমলের বাংলো প্যাটার্নের বাড়ি।

চৌকিদার গোছের একটা লোক এসে ঘরের দরজা খুলে দিল। হাতের স্যুটকেসটা টেনে নিয়ে কোণে টেবিলের ওপর রাখল। শেষে বিনীতভাবে জানাল, হুকুম পেলেই সে ব্রেকফাস্ট আর চা বানিয়ে আনবে।

শ্রীনিবাস বলল, 'আপনি মুখ-হাত ধুয়ে রেস্ট নিন স্যার। ব্রেকফাস্ট সেরে ছোট্ট একটু ঘুমও দিতে পারেন।'

'তুমি কখন আসছ?'

'বিকেলে।' শ্রীনিবাস কী যেন চিন্তা করল। একটু ভেবে বলল, 'ধরুন সাড়ে চারটে নাগাদ।'

'বেশ, তাই এসো।' সুধাকর সায় দিল। তারপর বলল, 'বিকেলে একটু বাজারে যাব। দু-একটা জিনিস কেনা দরকার।'

'কোনও অসুবিধে নেই। বিকেলে স্কুটার নিয়ে আসছি।'

বিকেল চারটে না বাজতেই সুধাকর তৈরি। চোখে-মুখে জল দিয়ে জামা-কাপড় বদলে নিল। চুলে চিরুনি বুলিয়ে সেই চাঁদির চশমাটা পরল।

আয়নায় নিজেকে দেখে সুধাকরের হাসি পাচ্ছিল। চশমাটা পরে তাকে কী অদ্ভুত না লাগছে। পরীক্ষা দিতে এসে ছাত্ররা আবার না তার মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে।

স্কুটার থেকে নেমে শ্রীনিবাস বলল, 'চশমাটা পরে আপনাকে মন্দ লাগছে না। একটু সেকেলে অবশ্য, কিন্তু প্যান্ট আর বুশশার্টখানা তেমনি মডার্ন।'

সুধাকর স্কুটারটা খুঁটিয়ে লক্ষ করল। বলল, 'আমি চালাব। তুমি বরং পিছনে বস।'

শ্রীনিবাস আপত্তি করল না। শুধু বলল, 'আপনার লাইসেন্স আছে তো?'

'আট বছরের পুরোনো লাইসেন্স। তোমার চিন্তার কারণ নেই।' সুধাকর সগর্বে জানাল।

গাড়ি মুহূর্তে স্পিড নিল। চশমার কাচের ভিতর দিয়ে সুধাকর পথঘাট দেখছিল। তার মনে হল সব ফাঁকা। লোক নেই, জন নেই, যেন এক শূন্যপথে কী অজানা আকর্ষণে সে প্রচণ্ড বেগে ছুটে চলেছে।

পিছন থেকে শ্রীনিবাস হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, 'গাড়ি থামান। গাড়ি থামান। এখুনি একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়ে যাবে।'

অ্যাকসিডেন্ট শুনেই সুধাকরের চেতনা ফিরে এল। ব্রেক কষে গাড়িটা একপাশে থামাতেই শ্রীনিবাস লাফ দিয়ে নামল। প্রায় ভর্ৎসনার সুরে বলল, 'এ কি গাড়ি চালানো! এখুনি যে অ্যাকসিডেন্ট হচ্ছিল।'

'অ্যাকসিডেন্ট?' সুধাকর অবাক হয়েছে মনে হল।

'অ্যাকসিডেন্ট নয়তো কী? রাস্তায় অত লোকজন। আর তার মাঝখান দিয়ে আপনি পঞ্চাশ-ষাট মাইল স্পিডে গাড়ি চালিয়ে এলেন।'

সুধাকর পাল্টা প্রশ্ন করল, 'রাস্তায় লোক কোথায়? আমি তো সব ফাঁকা দেখলাম।'

শ্রীনিবাস আর কথা বাড়াল না। সে শুধু বলল, 'নতুন জায়গায় আপনার গাড়ি চালাতে অসুবিধে হবে। তার চেয়ে বরং আপনি পিছনে বসুন।'

সুধাকর খুঁতখুঁত করছিল। আশ্চর্য! পথে লোকজন তো ছিল না। ফাঁকা রাস্তা। সে দিব্যি স্পিডে গাড়ি চালিয়ে এসেছে। তাহলে?

শ্রীনিবাস গাড়ির গতি কমিয়ে শহীদচকে এসে পৌঁছল। সামান্য কিছু কেনাকাটি ছিল। সেরে নিতে পনেরো মিনিটও লাগল না। ফেরার সময়ও শ্রীনিবাস নিজেই চালকের আসনে বসল।

কাঁকে রোডের সেই বাংলোবাড়িতে সন্ধের মুখে ফিরল দুজনে। চৌকিদার তার জন্য অপেক্ষা করছিল। ঘরে পা দিতেই বলল, 'চা বানিয়ে আনি সাব?'

সুধাকর ঘাড় হেলাতেই সে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল।

চা পান করে শ্রীনিবাস উঠল। বলল, 'কাল সকাল দশটা নাগাদ আসছি। আপনি তৈরি হয়ে থাকবেন।'

'অবশ্য', সুধাকর ঈষৎ হাসল।

বাংলোবাড়ির চৌকিদার থলি হাতে নিয়ে কী যেন সব কেনাকাটি করতে বেরিয়ে গেল। চাঁদির চশমাটা পরে সুধাকর একটা বইয়ের পাতায় চোখ বুলোচ্ছিল। সেই মুহূর্তে হঠাৎ লোডশেডিং হয়ে গেল। সুধাকর কোনওরকমে হাতড়ে একটা প্যাকাটি গোছের মোমবাতি বের করে আলো জ্বালল। তার কেমন যেন অস্বস্তি লাগছিল।

দরজায় ঠুকঠুক শব্দ শুনে সে মুখ তুলে তাকাল। আবছা অন্ধকারে দেখল চৌকাঠের সামনে এক মধ্যবয়সি ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে। তা বয়স চল্লিশের মতো হবে। পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি। চোখে চাঁদির চশমা। আজ সকালে দোকান থেকে যে চশমাটা সুধাকর নিয়ে এসেছে সেটা অবিকল তেমনি।

একটু অবাক হয়ে সুধাকর প্রশ্ন করল, 'আপনি কাকে খুঁজছেন? কিছু দরকার আছে?'

'না, দরকার তেমন নেই।' লোকটি হিন্দিতে জবাব দিলে। ঈষৎ হেসে বলল, 'আপনার সঙ্গেই দুটো কথা বলতে এলাম।'

'আমার সঙ্গে?' সুধাকর একটু অবাক হল। তারপর লোকটির উদ্দেশে বলল, 'বসুন।'

আগন্তুকের আগমনের কী উদ্দেশ্য হতে পারে সুধাকর তাই ভাবছিল। লোকটা কোনও পরীক্ষার্থীর গার্জেন নয় তো? আগামীকাল এগজামিনেশনে ক্যান্ডিডেটের যাতে কোনও সমস্যা না হয় সেজন্যই সুধাকরের কাছে আগাম তদ্বির জানাতে এসেছে।

কিন্তু না। লোকটা তেমন কোনও ইঙ্গিত দিল না, বরং তার সঙ্গে অন্য সব গল্প শুরু করল। সে থাকে ডোরান্ডায়। রাত্তিরে এদিকেই বেড়াতে এসেছিল। বাংলোবাড়ির দরজা খোলা দেখে নিছক কৌতূহলের বশে ঢুকে পড়েছে।

সুধাকর জিগ্যেস করল, 'বাংলোবাড়িটা খালি পড়ে থাকে নাকি?'

'হ্যাঁ। প্রায় সারা বছর। অবিশ্যি মাঝেমধ্যে এই আপনার মতো দু-চারজন আসে।'

ওর চশমার দিকে সুধাকর বারবার তাকাচ্ছিল। আশ্চর্য! এমন মিলও হয়।

লোকটি বলল, 'কী দেখছেন আমার মুখের দিকে তাকিয়ে?'

'না, তেমন কিছু নয়।' সুধাকর সলজ্জ হাসল। বলল, 'আসলে আপনার ওই চশমার সঙ্গে আমার এই স্পেকস্‌টার অদ্ভুত মিল রয়েছে।'

লোকটি বলল, 'চশমাটা বৌবাজারের একটা দোকান থেকে কেনা। তা প্রায় বারো বছর হল। ফ্রেমটা অর্ডার দিয়ে বানানো। খাঁটি সিলভার।'

'সে তো বুঝতেই পারছি।' সুধাকর জবাব দিল। লোকটি ফের বলল, 'একবার বেকায়দায় হাত থেকে পড়ে চশমার কাচ দুটো ভেঙে গেল। তখন ওটা দোকানে সারাতে দিতে হল।'

'চশমাটা কিন্তু চমৎকার সেরেছে। কাচ দুটো এমন সুন্দর। বাইফোকাল বলে বোঝা যায় না।

লোকটি ঈষৎ হাসল। বলল, 'শহীদচকের একটা দোকানে ওটা সারাতে দিয়েছিলাম। ওদের কাজকর্ম ভালো বলেই জানতাম।'

শহীদচকের প্রসঙ্গ উঠতেই সুধাকর একবার জিগ্যেস করবে ভাবল। এই চশমাটাও তো ওখান থেকেই নিয়ে এসেছে। তারপর মনে হল কী প্রয়োজন এসব কথা বলার? শহীদচকে তো একটা দোকান নেই।

আরো কিছুক্ষণ কথা বলে লোকটি উঠল। যাবার সময় বলল, 'আপনি ক'দিন আছেন এখানে?'

'চার-পাঁচ দিনের মতো।' সুধাকর জবাব দিল।

'যদি পারি তো আর একদিন বরং আপনার সঙ্গে দেখা করে যাব।'

'হ্যাঁ আসবেন।' সুধাকর অন্যমনস্কের মতো বলল।

পরদিন শ্রীনিবাস গাড়ি নিয়ে হাজির। বেলা তখনও দশটা হয়নি।

গাড়ি চলতেই শ্রীনিবাস বলল, 'আপনাকে যেন একটু অন্যমনস্ক লাগছে। কিছু ভাবছেন?'

'হ্যাঁ মানে গতকাল রাত্তিরে একটা ঘটনা ঘটল।'

'ঘটনা?'

সুধাকর ভুরু তুলে তাকাল। বলল, 'তুমি চলে যাবার কিছুক্ষণ পর ডোরান্ডা থেকে এক ভদ্রলোক এসেছিলেন। চৌকিদারটা তখন বাজারে গিয়েছিল।'

'ডোরান্ডা থেকে?' শ্রীনিবাস খুব অবাক হয়ে বলল, 'সে তো এখান থেকে অনেক দূর। তা প্রায় দশ-বারো কিলোমিটার রাস্তা।'

সুধাকর বলল, 'ভদ্রলোক নাকি কী কাজে এদিকেই এসেছিলেন। তখন আবার লোডশেডিং চলছে।'

'তারপর?'

'ভদ্রলোকের চোখে একটা চাঁদির চশমা। অবিকল এই চশমার মতো। প্রথমে মনে হল ওই চশমাটাই বুঝি উনি পরে আছেন। কিন্তু তা কেমন করে হবে? দোকানের সেই চশমাটা তো আমার চোখে, তাহলে?'

'ভদ্রলোক কেন এসেছিলেন? কারো জন্য তদ্বির করতে?'

'মোটেই না। তাহলেও তো একটা মানে ছিল।' সুধাকর চিন্তিত মুখে বলল, 'বাংলোর দরজা খোলা দেখে নিছক কৌতূহলের বশে ঢুকে পড়েছেন।'

শ্রীনিবাস বলল, 'ভদ্রলোকের নাম জিগ্যেস করেছিলেন?'

'ওই, যাঃ! ওটাই তো মস্ত ভুল হয়ে গেছে।' সুধাকর আফসোস করল। বলল, 'তবে উনি হয়তো আবার আসবেন। দু-একদিন বাদেই। নামটা তখন জেনে নিলে হবে।'

'না-না। ওসব উটকো লোককে বেশি আমল দেবেন না।' শ্রীনিবাস তাকে সাবধান করল। বলল, 'কী মতলবে এসেছিল কে জানে? যদি আবার আসে তো সিধে ভাগিয়ে দেবেন।'

সুধাকর আরো একটা কথা বলল। গতকাল রাত্রে চশমাটা সে টেবিলের ড্রয়ারের ভিতর রেখেছিল। আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখল চশমাটা টেবিলের ওপর রয়েছে।

শ্রীনিবাস বলল, 'ওটা আপনার মনের ভুল।'

কিন্তু দু'দিন নয়। ঠিক চারদিনের মাথায় লোকটি ফের উপস্থিত। তখন লোডশেডিং চলছে। চৌকিদারটা বাজারে। প্রায়ান্ধকার ঘরে একটা শীর্ণ মোমবাতির মরা আলোয় সুধাকর কী করবে তাই ভাবছিল। এমন সময় সেই ঠুকঠুক শব্দ শুনেই সে মুখ তুলে তাকাল। হ্যাঁ ওই ভদ্রলোক। সেদিনকার মতো পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি। চুলগুলি বিস্রস্ত। কপালের বাঁ দিকে একটা কাটা দাগ। প্রথম দিন অতটা নজর করেনি সুধাকর। ওর পায়ে এক জোড়া চকচকে পাম্পশু। কিন্তু চোখে আজ চশমাটা নেই।

লোকটি এগিয়ে এসে বলল, 'আজ একবার আপনার সঙ্গে দেখা করার সুযোগ হল।'

সুধাকর বলল, 'ডোরান্ডা তো অনেক দূর। এতটা পথ সেখান থেকেই এসেছেন?'

'হ্যাঁ। এলাম বলেই তো আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারলাম। আচ্ছা, আর ক'দিন থাকবেন এখানে?'

'কালই পরীক্ষা শেষ। রিজার্ভেশান পেলে রাত্তিরের ট্রেন ধরব। নইলে পরশু সিওর।'

টেবিলের ওপর দোকানের সেই চশমাটা পড়েছিল। একপলক সেদিকে তাকিয়ে সুধাকর জিগ্যেস করল, 'আপনার চশমার কী হল? ভুল করে বাড়িতে ফেলে এসেছেন নাকি?'

লোকটি কেমন অদ্ভুত হাসল। বলল, 'বাড়িতে ফেলে আসব কেন?' পরক্ষণেই টেবিল থেকে চাঁদির চশমাটা তুলে নিয়ে সেটি চোখে পরল। মুচকি হেসে বলল, 'এটাই তো আমার চশমা, পেয়ে গেছি।'

লোকটির চোখ দুটি যেন স্থির। অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। চোখের পাতা পড়ে না। আগের দিন চশমা পরে এসেছিল। তাই ঠিক বুঝতে পারেনি।

তবু সুধাকর প্রায় প্রতিবাদ জানাল, 'ও চশমাটা আপনার হবে কেন? শহীদচকের দোকান থেকে ওটা আমি চেয়ে এনেছি। পরীক্ষার ক'টা দিন ব্যবহার করব বলে। আমার চশমার কাচ ভেঙে গিয়েছিল তাই বদলাতে দিয়েছি। যাবার আগে ওটা ফেরত দিয়ে আমার চশমা ডেলিভারি নেব।'

লোকটি যেন একটু রহস্য করে বলল, 'এ চশমা তাহলে আমার নয়? আপনি ঠিক বলছেন?'

সুধাকর দৃঢ় কণ্ঠে জানাল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, এই চশমাটা সেই দোকানীর। অবশ্য আপনার চশমার সঙ্গে অদ্ভুত মিল। প্রথম দিন দেখে আমি রীতিমতো চমকে গিয়েছিলাম।'

লোকটি কেমন অদ্ভুত হাসল। তারপর সুধাকরের মুখের দিকে তাকিয়ে যেন জেরা করল, 'চশমাটা আমার নয় বলছেন?'

ঈষৎ বিরক্তির সঙ্গে সুধাকর জবাব দিল, 'বললাম তো। শহীদচকের একটা দোকান থেকে চশমাটা চেয়ে এনেছি।'

ঠক করে চশমাটা টেবিলে নামিয়ে রেখে সে উঠে দাঁড়াল। বলল, 'চশমাটা তাহলে খুঁজে দেখি। না পেলে কাল রাত্তিরে বরং আপনার কাছে একবার আসব।'

লোকটি দরজার মুখে যেতেই সুধাকর পিছন থেকে শুধোল, 'আচ্ছা, আপনার নামটা কী বলবেন?'

'আমার নাম?' সে ফিরে তাকাল। বলল, 'আমার নাম গিরিজাকান্ত মিশ্র। ডোরান্ডায় এই নামে সবাই চিনবে।'

পরদিন বিকেলে শহীদচকের সেই দোকানে গেল সুধাকর। শ্রীনিবাস সঙ্গে। চাঁদির চশমাটা ফেরত দিয়ে বলল, 'জানেন, ডোরান্ডা থেকে এক ভদ্রলোক এসেছিলেন আমার কাছে। তাঁর চোখেও অবিকল এই চশমা।'

দোকানী ভুরু কুঁচকে শুধোল, 'চশমাটা অবিকল এরকম দেখেছেন?'

'হ্যাঁ, মানে প্রথমদিন দেখে তো খুব অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। দ্বিতীয় দিন আবার চোখে চশমা নেই। টেবিল থেকে এই চশমাটা তুলে নিয়ে বললেন, এটাই নাকি তাঁর।'

শুনে দোকানী যেন একটু গম্ভীর হয়ে গেল। বলল, 'উনি কখন এসেছিলেন আপনার কাছে?'

'রাত্তি নটা নাগাদ। তখন আবার লোডশেডিং চলছে।'

দোকানী শুধোল, 'ভদ্রলোকের কপালের বাঁ দিকে একটা কাটা দাগ!'

'আশ্চর্য! আপনি চেনেন নাকি ওঁকে?'

'কী নাম জানেন?' দোকানী ফের শুধোল।

'হ্যাঁ, গিরিজাকান্ত মিশ্র। বললেন ডোরান্ডায় এই নামে তাঁকে সবাই চিনবে।' সুধাকর এক মুহূর্ত থামল। একটু মজা করে বলল, 'চশমা খুঁজে না পেলে রাত্তিরে হয়তো আবার আসবেন।'

দোকানী গম্ভীর মুখে বলল, 'বাবুজী, চশমাটা গিরিজাকান্তজীর।'

'তাই নাকি? তাহলে ওটা নিয়ে যাই। রাত্তিরে দেখা করতে এলে ফেরত দেব। এজন্যই উনি বারবার বলছিলেন চশমাটা তাঁর। কিন্তু—'

'কিন্তু কি?' দোকানী জিজ্ঞাসু হল।

'তাহলে আগের দিন যে চশমাটা ওঁকে পরতে দেখলাম সেটা কার?'

'তা জানি না।' দোকানী বলল, 'তবে চশমাটা গিরিজাকান্তজীর। এখানে কাচ বদলাতে দিয়েছিলেন। আর ডেলিভারি নেননি।'

'কেন?'

'সে খুব দুঃখের ব্যাপার। ডোরান্ডা থেকে স্কুটারে চেপে এদিকই আসছিলেন। হঠাৎ একটা লরির সঙ্গে ধাক্কা, সেই অ্যাকসিডেন্টে উনি মারা যান।' দোকানী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'চশমাটা তাই আপনাকে দিতে চাইনি। এর আগেও এক ভদ্রলোক ব্যবহার করতে নিয়ে যান। গিরিজাকান্তজী তাঁকেও অমনি দেখা দিয়েছেন। ভয় পেয়ে বেচারি পরের দিনই চশমাটা ফেরত দিতে পথ পাননি।'

শ্রীনিবাস বলল, 'ওই ভূতুড়ে চশমাটা তাহলে রেখেছেন কেন? গঙ্গায় বিসর্জন দিলেই পারেন।'

দোকানী হাসল, বলল, 'পিওর সিলভারের অমন সুন্দর একটা জিনিস। ভেবেছি ওটা কোনও মিউজিয়ামে পাঠিয়ে দেব।'

ফাল্গুন ১৩৯৯

ঠিক দশটায় ট্রেন এসেছিল

অনীশ দেব

ঘটনাটা আমি ভুলতে পারিনি—বোধহয় ভোলা যায় না বলেই। আর বারবার প্রশ্ন জাগে নিজের মনে: সেদিন আমি ঠিক দেখেছিলাম তো? না, একটু ভুল হল—সেদিন নয়, সে-রাতে। সে-রাতে আমি ঠিক দেখেছিলাম তো?

স্টেশনটার নাম সাতবহিনি। জীবনে কখনও তার নাম শুনিনি। তবে তাতে কোনও অসুবিধে নেই। সেল্‌সের লাইনে কাজ করি—নাম-না-জানা জায়গায় চষে বেড়ানোই আমাদের কাজ। সে-সব জায়গায় জিনিস বিক্রি করার মধ্যে একটা অন্যরকম মজা আছে।

আমাদের কোম্পানি একটা অদ্ভুত যন্ত্র বের করেছে। যন্ত্রটার কাজ হল মশা, মাছি, পোকামাকড় তাড়ানো। দেখতে ছোট—অনেকটা সেলুলার ফোনের মতো। ভেতরে যত রাজ্যের ইলেকট্রনিক সার্কিট। তবে যন্ত্রটা কাজ করে আলট্রাসনিক নীতিতে। অর্থাৎ, শব্দোত্তর তরঙ্গ তৈরি করে এমন কাণ্ড বাধিয়ে দেয় যে, মশা-মাছি-পোকামাকড় সেই শব্দ শুনে পরিত্রাহি চিৎকার করে পালাতে থাকে। অথচ মানুষের কান সেই শব্দ মোটেই শুনতে পায় না।

বিজ্ঞান আমি জানি না, বুঝি না। কিন্তু যন্ত্রটা খদ্দেরকে গছাতে হলে তার ভেতরকার ব্যাপার-স্যাপার সম্পর্কে খানিকটা অন্তত আইডিয়া থাকা দরকার। তাই ঠিক সেইটুকুই আমাদের কোম্পানির একজন এনজিনিয়ারের কাছ থেকে জেনে নিয়ে মোটামুটি মুখস্থ করে নিয়েছি।

কোম্পানির সঙ্গে কথা ছিল, গোমো, বারডিহি আর ডেহ্‌রি-অন-সোন, এই বেল্টটা আমি দু'সপ্তাহে কভার করব। মাইনে ছাড়াও আমাদের কমিশনের ব্যাপারটা বেশ অ্যাট্রাকটিভ। তাই যথেষ্ট উৎসাহ নিয়ে ট্যুরে বেরিয়ে পড়েছিলাম।

প্রথমে হাওড়া থেকে চলে গেছি গোমো জংশন। সেখানে দিন পাঁচেক কাজ করেছি। তারপর একদিন বিকেলে গোমো থেকে পাটনা-হাতিয়া এক্সপ্রেস ধরে রাত ন'টা-সাড়ে ন'টা নাগাদ পৌঁছে গেছি বারডিহি।

বারডিহিতে বেশি যন্ত্র বিক্রি করতে পারিনি। কে জানে, কপালটাই বোধহয় খারাপ ছিল! তাই দিনতিনেক পরই মনমরা অবস্থায় চড়ে বসেছি বারডিহি/ডেহ্‌রি-অন-সোন প্যাসেঞ্জারে। জায়গা দুটোর দূরত্ব মাত্র ১৪০ কিলোমিটার। কিন্তু টিক্‌টিক্ করে চলা গদাইলশকরী প্যাসেঞ্জার ট্রেন যে বেশ লেটে পৌঁছবে সেটা গোড়া থেকেই মালুম হয়েছিল।

শীতের সময়। তাই ডালটনগঞ্জ পেরোতে না পেরোতেই বাইরেটা অন্ধকার হয়ে এল। মাঠঘাট গমের খেত যা-কিছু দেখছিলাম সব মুছে গেল। গারওয়া রোড জংশন পেরোতেই আমার একটু তন্দ্রা মতো এসেছিল। হঠাৎই কোমরে আঁটা পেজারটা পিপ-পিপ করে বাঁশি বাজিয়ে আমাকে জাগিয়ে দিল।

তাড়াহুড়ো করে যন্ত্রটা চোখের সামনে তুলে ধরতেই মেসেজটা চোখে পড়ল। হেড কোয়ার্টার থেকে নির্দেশ এসেছে, এখনই বারডিহিতে ফিরে যেতে হবে। সেখানে একটা কোম্পানি জরুরি ভিত্তিতে পঁচিশ পিস পোকামাকড় তাড়ানোর যন্ত্র চাইছে। বারডিহির কাজ সেরে তারপর যেন আমি ডেহ্‌রি-অন-সোন রওনা হই।

ইলেকট্রনিক্স ক্রমেই যে বিরক্তিকর হয়ে উঠছে, পেজার এবং সেলুলার ফোন তার জ্বলন্ত প্রমাণ। শীতের সন্ধেয় প্যাসেঞ্জার ট্রেনে যে শান্তিতে একটু ঝিমোব তারও উপায় নেই। কিন্তু বিরক্তির সঙ্গে-সঙ্গে সামান্য প্রলোভনও উঁকি দিয়েছিল আমার মনে। কারণ পঁচিশ পিস যন্ত্র বিক্রির কমিশন নিতান্ত ফেলনা নয়।

বারডিহিতে কোথায় যেতে হবে সেই হদিসও পাওয়া গেল পেজারে। এখন শুধু ট্রেন থামলেই নেমে পড়ার অপেক্ষা।

কম্বল মুড়ি দেওয়া দেহাতী এক সঙ্গীকে বার তিনেক ডাকাডাকি করে তারপর জানতে পারলাম, পরের স্টেশন সাতবহিনি।

অগত্যা ট্রেন থামতেই হাড়কাঁপানো ঠান্ডায় নেমে পড়লাম সাতবহিনিতে। সাত বোনের কোনও কাহিনি থেকে এই স্টেশনের নাম রাখা হয়েছে কিনা কে জানে! তবে যেখানে আমি নামলাম তা স্টেশন না শ্মশান বোঝা দায়।

আমার সঙ্গে একটা হাতব্যাগ আর একটা বিশাল ভারী সুটকেস। সুটকেসে রয়েছে আমাদের তৈরি যন্ত্র ইনসেক্ট সেন্টিনেল, যাকে আমরা সংক্ষেপে আই-এস বলি।

শীতের ভারী বাতাসে করুণ হুইসল বাজিয়ে ট্রেন ছেড়ে গেল। আমি একা দাঁড়িয়ে রইলাম কাঁকর-ছড়ানো নিচু প্ল্যাটফর্মে। এদিক-ওদিক তাকিয়ে কাউকে দেখতে পেলাম না। শুধু কুয়াশা আর ঠান্ডা বাতাস আমাকে জড়িয়ে রইল।

ভূতে আমার তিলমাত্রও বিশ্বাস নেই। তাছাড়া, ট্রাভেলিং সেল্‌সম্যানদের ভূতের ভয় থাকলে চলে না। কিন্তু স্বীকার করতে লজ্জা নেই, সাতবহিনির প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে চারপাশটা কেমন ভূতুড়ে-ভূতুড়ে ঠেকছিল।

প্ল্যাটফর্মে টিমটিম করে দুটো ন্যাড়া বাল্‌ব জ্বলছিল। দেখে মনে হচ্ছিল, ওদেরও শীত করছে। আর কুয়াশার চাপে ওদের আলো বেশিদূর ঠিকরে যেতে পারছে না।

সামনে-পেছনে তাকালে গাঢ় আঁধার। তার ফাঁকফোকরে কোথাও একটা কি দুটো আলোর ফুটকি। আর আকাশে আধখানা চাঁদ, তাকে ঘিরে সহচর কয়েকটি তারা।

একটা অদ্ভুত ধরনের ডাক আমার কানে আসছিল। তবে ঝিঁঝি নয়, হয়তো অন্য কোনও পোকামাকড়। মাঝে-মাঝে একটা কনকনে বাতাসের ঢেউ আমার জ্যাকেট-সোয়েটারের অন্দরমহল পর্যন্ত ঢুকে পড়ে একেবারে কাঁপিয়ে দিচ্ছিল।

প্ল্যাটফর্মের ওপরে, খানিকটা দূরে, একটা ছোট ঘর গোছের ব্যাপার চোখে পড়ল। বোধহয় স্টেশনমাস্টারের ঘর। সে যাই হোক, আগে ওখানে গিয়ে আশ্রয় নেওয়া দরকার। নইলে এই ঠান্ডায় নির্ঘাৎ স্ট্যাচু হয়ে যেতে হবে।

সুটকেস আর ব্যাগ তুলে নিয়ে ঘরটার দিকে হাঁটা দিলাম। শীতের কামড়ে হাত-পায়ের জোড়গুলো প্রায় অকেজো হওয়ার জোগাড়। গায়ের জোরে নয়, স্রেফ মনের জোরে এগিয়ে চললাম। বারবার তেনজিং আর হিলারির কথা মনে পড়ছিল। মনে হচ্ছিল, আমার চারপাশে বরফ পড়ছে।

ঘরের কাছাকাছি প্রায় পৌঁছে গেছি, এমন সময় গাঢ় অন্ধকারের আড়াল থেকে একটা অদ্ভুত প্রাণী আমার সামনে এসে দাঁড়াল।

প্রাণী বলছি, কারণ তার সারাটা শরীর কম্বল দিয়ে ঢাকা—অনেকটা কবন্ধের মতো। তবে মাথার কাছটায় সামান্য ফাঁক লক্ষ করলাম। সেই ফাঁকের ভেতর দুটো চোখ স্পষ্ট জ্বলজ্বল করছে।

আমি থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। কে এই মানুষটা?

'কাঁহা যাওগে, মহারাজ?' জড়ানো ভারী গলায় কবন্ধ প্রশ্ন করল।

আমি কোনওরকমে তাকেও বোঝালাম যে, আমি বারডিহি ফিরতে চাই।

তাতে জানতে পারলাম, সকাল সওয়া সাতটার আগে কোনও ট্রেন নেই। কারণ, ডেহ্‌রি-অন-সোন/বারডিহি প্যাসেঞ্জার ওই সময়েই সাতবহিনিতে আসে। তারপর সে জড়ানো গলায় বলল, কোই বাত নহি। রাতটা মাস্টারজির কামরায় থেকে যান।

আমি যেন সেই নেমন্তন্নের অপেক্ষায় ছিলাম!

সুতরাং আর এক মুহূর্তও সময় নষ্ট না করে ঢুকে পড়লাম মাস্টারজির ঘরে। আমার কবন্ধ-চেহারার শুভাকাঙ্ক্ষী তখন জড়ানো গলায় দেশোয়ালি গান গাইছে।

ভেজানো দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকতেই কেমন অদ্ভুত একটা শিহরন খেলে গেল আমার শরীরে।

ঘরটা যেমন বিচিত্র, তেমনই বিচিত্র ঘরের তিনজন মানুষ।

জানি, এরপর আমি যা বলব সেটা বিশ্বাস হওয়া কঠিন, কিন্তু আমার মিথ্যে বলার কোনও উপায় নেই।

ঘরের ভেতরে ঢুকতেই আমার মনে হল, ঠান্ডাটা যেন বেশ কয়েকগুণ বেড়ে গেল। আজও মনে পড়ে, ব্যাপারটাতে আমি বেশ অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু পোড় খাওয়া সেল্‌সম্যানের সহজাত স্মার্টনেসে অবাক ভাবটাকে চট্ করে সামলে নিলাম। তারপর ঘরে হাজির তিনজন মানুষের দিকে তাকিয়ে কাষ্ঠ হেসে ঢুকে পড়লাম ঘরের অন্দরে। তারপর দরজাটা আবার ভেজিয়ে দিলাম।

চুন-সুরকির গাঁথুনি দিয়ে তৈরি ঘরটা মাপে মাঝারি। হয়তো দশ-বাই-পনেরো হবে। ঘরের মাথায় টিনের চাল। সেখান থেকে একটা উলঙ্গ বাল্‌ব ঝুলছে। ভোল্টেজ কম থাকায় তার আলোটা কেমন লালচে দেখাচ্ছে।

বাল্‌বের প্রায় গা ঘেঁষে ঝোলানো রয়েছে একটা বড় মাপের সিলিং ফ্যান। বাল্‌বটা ফ্যানের ওপর দিকটায় থাকায় ঘরের মেঝেতে আর দেওয়ালে ফ্যানটার বিচিত্র ছায়া পড়েছে। একটা ব্লেডের ছায়া ঘরের মানুষগুলোর গায়ের ওপর দিয়ে চলে গেছে দেওয়াল পর্যন্ত।

ঘরের জানলা দুটো। কিন্তু ঠান্ডার জন্য দুটোই বেশ ভালো করে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

ঘরের বাঁ দিক ঘেঁষে বেশ বড় মাপের চৌকো কাঠের টেবিল। তার একদিকে একটা সাবেকি চেয়ার—মাস্টারজির চেয়ার। তার পাশেই একটা যন্ত্র রাখা আছে। বোধহয় খবর পাঠানোর টরে-টক্কা যন্ত্র।

টেবিলে বেশ কিছু কাগজপত্র ডাঁই করা রয়েছে। তারই মাঝে একটা বড় মোমবাতি দাঁড় করানো। আর টেবিলের শেষ প্রান্তে একটা কালো রঙের ধুলো পড়া টেলিফোন। চেহারা দেখে মনে হয় না গত পাঁচ বছরে ওটা কখনও বেজে উঠেছে।

টেবিলের এ-পাশে আরও দুটো চেয়ার—কাঠ, পেরেক আর টিনের পাত দিয়ে যথাসাধ্য তাপ্পি মারা। তারই একটার হাতলে একটা নস্যি রঙের কম্বল ভাঁজ করে রাখা। কম্বলের কাছাকাছি কয়েকটা মশা উড়ছে, পিনপিন করে শব্দ হচ্ছে।

ঘরের তিনজন মানুষ এককোণে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে চাপা গলায় কথা বলছিল। তাদের ঘিরে সিগারেট অথবা বিড়ির ধোঁয়া উড়ছিল। আমার কাষ্ঠহাসির উত্তরে একজন উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাল আমাকে : 'আইয়ে, সাব, আইয়ে। বেফিকর রহিয়ে, টিরেন টাইমপে আ জায়েগি—'

কথায় বোঝা গেল, এই ঘরটা বেশ কিছুদিন ধরেই ওয়েটিং রুমের ভূমিকা পালন করছে—দিনে না হোক, অন্তত রাতের বেলায়। নইলে আমাকে দেখামাত্রই 'ট্রেন সময়মতো এসে যাবে' এ-কথা ঘোষণার মানে কী!

শীতের প্রকোপ বেড়ে উঠতেই বেশ খানিকটা অবাক হয়েছিলাম। কিন্তু তার চেয়েও বেশি অবাক হলাম ঘরের মানুষগুলোকে দেখে।

আগেই বলেছি ভূতের ওপরে আমার বিন্দুমাত্রও আস্থা নেই। আর এই তিনজনকে দেখে মোটেই চোর-ডাকাত বলে মনে হচ্ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি অবাক হলাম। কারণ তিনজনের পোশাক-আশাক একেবারে তিনরকমের। মানে, দেখেই বোঝা যাচ্ছিল, এই তিনজনের শিক্ষা, দীক্ষা, রুচি, সচ্ছলতা, এসবের মধ্যে কোনও মিলই নেই। অথচ ওরা তিনজন কাছাকাছি গোল হয়ে দাঁড়িয়ে বেশ ঘনিষ্ঠভাবে কথা বলছে!

প্রথমজন, যিনি আমাকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন, হঠাৎই টেবিলের কাছে গিয়ে সাবেকি চেয়ারটায় বসে পড়লেন। অর্থাৎ, তিনি-ই বোধহয় মাস্টারজি।

তাঁর পরনে গরম কাপড়ে তৈরি কালচে রঙের প্যান্ট। গাঢ় সবুজ সোয়েটারের ওপরে ঘন নীল রঙের প্রিন্স কোট এঁটে বসেছে। চেহারা মোটার দিকে হওয়ায় কোটটা মধ্যপ্রদেশ বরাবর যথেষ্ট

ফুলে রয়েছে। কোটের পকেট থেকে উঁকি মারছে দোমড়ানো-কোঁচকানো একটা রুমাল। আর দু'আঙুলের ফাঁকে জ্বলন্ত সিগারেট। মাস্টারজির রঙ ময়লা। গলায়-মাথায় মাফলার। গোলগাল মুখে বয়েসের ভাঁজ। ঠোঁটের ওপরে কাঁচা-পাকা ঝাঁটা গোঁফ। ভুরু জোড়া প্রায় গোঁফেরই আত্মীয়। মাথার যেটুকু দেখা যাচ্ছে তাতে বোঝা যায় ভদ্রলোকের অবস্থা একরকম ইন্দ্রলুপ্ত।

মাস্টারজি শব্দ করে নাক টানলেন কয়েকবার। তারপর পকেটের রুমাল দিয়ে নাকটিকে বাগিয়ে ধরে কষে ঝাড়া দিলেন দু'বার। রুমাল পকেটে রেখে সিগারেটে দুটো টান দিয়ে একটু সামলে নিয়ে আমাকে হিন্দিতে বললেন, 'বসুন, ওই চেয়ারটায় বসুন—'

হাতলে কম্বল ঝোলানো চেয়ারটিকে পেরিয়ে আমি পরের খালি চেয়ারটার কাছে গেলাম। হাতের সুটকেস ও ব্যাগ মেঝেতে নামিয়ে রেখে বসে পড়লাম চেয়ারে। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই ঠান্ডায় শিউরে উঠলাম। পাশের চেয়ারের কম্বলটা আমার গায়ে দিতে ইচ্ছে করল। কিন্তু কার-না-কার কম্বল, গায়ে দেওয়া ঠিক হবে না—এ কথা ভেবে চুপ করে রইলাম।

ঠিক তখনই ঘরের বাকি দুজন মানুষ টেবিলের কাছে এসে দাঁড়াল।

আমার দু'পাশে দুজন। বাল্‌বের আলোয় ওদের অদ্ভুত ছায়া পড়েছে টেবিলে, মেঝেতে।

একজনের চেহারা নিতান্তই কুলি-কামিন গোছের। গায়ের জামাকাপড়ও সেইরকম। মোটাসোটা, কুচকুচে কালো রঙ, চোখ লালচে, গা থেকে কেমন একটা বোটকা গন্ধ বেরোচ্ছে। দু'আঙুলে টিপে ধরা একটা বিড়িতে শেষ টান দিয়ে সেটা ছুঁড়ে ফেলে দিল মেঝেতে।

কিন্তু তৃতীয়জনের চেহারা আর পোশাক তাক লাগিয়ে দেওয়ার মতো।

ফরসা সুন্দর মুখে আভিজাত্যের ছাপ। পরিষ্কার করে দাড়ি-গোঁফ কামানো। বয়েস পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ হবে। পরনে হালকা ছাইরঙের থ্রি-পিস সুট। গলায় টাই। চোখে রিমলেস চশমা।

ভদ্রলোকের ডান হাতের মধ্যমা আর অনামিকায় সোনা-বাঁধানো দুটো পাথরের আংটি। আর কপালের বাঁ দিকে একটা বড় লালচে তিল।

চেয়ারে বসে খানিকটা স্বস্তি পেয়েছিলাম, তবে শীত একটুও কমেনি। তার ওপর এই অদ্ভুত ঘরে এই তিনজন মানুষের জোট আমাকে হতবাক করে দিয়েছে। কিন্তু উপায় কী! রাতটা চারজনে মিলেই কাটাতে হবে। সিগারেটের তেষ্টা পাওয়ায় একটা সিগারেট বের করে লাইটার জ্বেলে ধরালাম।

সিগারেটে সুখটান দিয়ে কিছুক্ষণ চুপচাপ কেটে যাওয়ার পর কী বলব ভাবছি, এমন সময় মাস্টারজিই আমাকে বিপদ থেকে বাঁচালেন। বললেন, 'আপনাকে দেখে সেল্‌সম্যান বলে মনে হচ্ছে—'

আশ্চর্য! কী করে উনি বুঝলেন আমি সেল্‌সম্যান! এই পাঁচ বছর সেল্‌সে চাকরি করে-করে আমার চেহারায় কি সেল্‌সম্যানের স্পষ্ট ছাপ পড়ে গেছে? সেরকম কোনও ছাপ আবার হয় নাকি!

আমার অবাক ভাব দেখে চাপা হাসলেন মাস্টারজি। ছোট-হয়ে-আসা সিগারেটটা টেবিলে রাখা একটা ভাঙা অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিয়ে বললেন, 'অবাক হওয়ার কিছু নেই। প্যাসেঞ্জার দেখে-দেখে আমার চোখ এক্সপার্ট হয়ে গেছে। তা কী বিক্রি করেন আপনি?'

আমি এবার একটু উৎসাহ পেলাম। মাস্টারজিকে ইনসেক্ট সেন্টিনেলের কথা বললাম। ভাবলাম, যাকগে, আমার যন্ত্রের গুণপনা জাহির করেই ঘণ্টা তিন-চারেক কাটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব। কিন্তু তার আগেই আমার বাঁ দিকে দাঁড়ানো সুট পরা ভদ্রলোক ধপ করে বসে পড়লেন দ্বিতীয় খালি চেয়ারটায়। সামান্য হেসে বললেন, 'হুঁ, আমিও একসময় এই লাইনে ছিলাম। সোলার ল্যানটার্ন—মানে সৌর লণ্ঠন বিক্রি করতাম। আপনি হয়তো নাম শুনে থাকবেন—চ্যাম্পিয়ন ব্র্যান্ড সোলার ল্যানটার্ন—'

নাম না শুনে থাকলেও আমি সৌজন্য দেখিয়ে ঘাড় নাড়লাম। ওঁকে একটা সিগারেট অফার করতেই মাথা নেড়ে 'না' বললেন।

বাইরে ট্রেনের হুইসল শোনা গেল। ঘটাং-ঘট শব্দ তুলে ঝড়ের বেগে ছুটে গেল কোনও এক্সপ্রেস

ট্রেন। ঘরটা থরথর করে সামান্য কেঁপে উঠল। মাথার ওপরে বিশাল পাখাটা দুলে উঠল এপাশ-ওপাশ। তার ব্লেডের ছায়া ঘরের মেঝেতে জীবন্ত প্রাণীর মতো নড়তে লাগল।

ট্রেনের হুইসল শোনা গেল আবার—বহুদূর থেকে ভেসে এল। আর তার ছুটে যাওয়ার শব্দ মিলিয়ে গেল ধীরে-ধীরে।

যতদূর জানি কোনও স্টেশন দিয়ে থ্রু ট্রেন পাস করাতে হলে সিগনাল সবুজ করে দিতে হয়। মাস্টারজি তো আমাদের সঙ্গে বসে আছেন! তা হলে সিগনালের কাজটা করল কে?

'কে আবার, জগ্‌মোহন।' গোঁফের ফাঁকে হেসে বললেন মাস্টারজি, 'আমার পোর্টার।'

ভদ্রলোকের দেখি আশ্চর্য ক্ষমতা! না বলা প্রশ্নও দিব্যি টের পেয়ে যান!

আমি কৌতূহলের নজরে তাঁকে জরিপ করলাম, কিন্তু অস্বাভাবিক কিছুই চোখে পড়ল না।

জগমোহন নিশ্চয়ই প্ল্যাটফর্মে দেখা কম্বল মুড়ি দেওয়া সেই কবন্ধ। আর এখন আমার ডান দিকে জবুথবু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তারই কোনও ভায়রাভাই। এই লোকটার পরিচয় এখনও আঁচ করতে পারিনি।

প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই হেঁচকি তুলে হাসলেন মাস্টারজি। রুমাল বের করে বেশ জোরে নাক ঝেড়ে বললেন, 'এ হল রামাইয়া। গ্যাংম্যান—মানে একসময় গ্যাংম্যান ছিল। বছর চারেক হল চাকরি ছেড়ে দিয়েছে। কাছাকাছি ঝোপড়িতে থাকে। মাঝে-মাঝে আমার সঙ্গে গল্প করতে চলে আসে—এই বিরজুবাবুর মতন—' কথা শেষ করে ফিটফাট প্রাক্তন সেল্‌সম্যানের দিকে হাত দেখালেন মাস্টারজি।

ভদ্রলোক হাতজোড় করে নমস্কার জানালেন আমাকে। বললেন, 'আমার নাম ব্রিজমোহন শ্রীবাস্তব।'

আমিও প্রতিনমস্কার করে নিজের পরিচয় দিলাম।

আমাদের গল্পগুজব চলতে লাগল। আর মাঝে-মাঝে সিগারেট। আমি ভাঙা-ভাঙা হিন্দিতে কাজ চালাচ্ছিলাম। শুধু রামাইয়া নীরব শ্রোতা হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ওর কম্বল ঘিরে মশার দল পিনপিন করে উড়ছে। কিন্তু তাতে ওর কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই।

কথাবার্তার ফাঁকে একবার হাতঘড়ি দেখলাম। সবে সাড়ে ন'টা।

সেটা লক্ষ করে মাস্টারজি বললেন, 'এর মধ্যেই ঘড়ি দেখছেন! আপনার ট্রেন তো সেই সকালে!'

ব্রিজমোহন শ্রীবাস্তব হাসলেন সে-কথা শুনে, বললেন, 'এর মধ্যেই বোর হয়ে গেলেন! আমাদের বোর হলে চলে না। আমাদের ট্রেন আসবে সেই রাত দশটায়—'

'আমাদের' মানে কাদের? ব্রিজমোহনের সহযাত্রী কি আর কেউ রয়েছেন? তাছাড়া রাত দশটায় কোন ট্রেনই বা আসবে! কোথায় যাওয়ার ট্রেন?

একটা শীতের ঢেউ পাক খেয়ে গেল আমাকে ঘিরে। শ্রীবাস্তবের মুখ-চোখ কেমন অদ্ভুত লাগছিল আমার। যখন উনি কথা বলছেন, হাসছেন, তখন সবকিছু ঠিকঠাক মনে হলেও ওঁর চোখজোড়ায় কোনওরকম ছায়া পড়ছে না। চোখ দুটো যেন মরা কই মাছের মতো : তীক্ষ্ণ, অথচ প্রাণহীন।

হঠাৎই আমার কোমরের কাছ থেকে পিপ-পিপ শব্দ উঠল। আবার সেই হতচ্ছাড়া পেজার! দেখি এবার কী খবর পাঠাল হেডকোয়ার্টার।

শ্রীবাস্তব এবং মাস্টারজি প্রায় একই সঙ্গে বলে উঠলেন, 'কী, পেজার নাকি?'

আমি মাথা নেড়ে বললাম, 'হ্যাঁ—'

তারপর যন্ত্রটা কোমর থেকে খুলে নিয়ে ধরলাম চোখের সামনে। মেসেজ রিসিভ করতে গিয়ে অবাক হলাম। কোথায় মেসেজ! শুধু সারি-সারি জিজ্ঞাসা-চিহ্ন ফুটে উঠেছে পেজারে।

বহু চেষ্টা করেও ওই অদ্ভুত মেসেজ আমি পালটাতে পারলাম না।

মাস্টারজি টেবিলের ওপারে আমার ঠিক উল্টোদিকে বসে আছেন। পেজারের মেসেজ কোনওমতেই ওঁর দেখতে পাওয়ার কথা নয়, কিন্তু উনি গলাখাঁকারি দিয়ে বললেন, 'ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি কখন যে কী করে বসে কোনও বিশ্বাস নেই। তবে ওই জিজ্ঞাসা-চিহ্নই জীবনের সার

কথা। তুলসীদাস বলে গেছেন, মায়া ছায়া একসি বিরলা জানে কোয়/ভগতাকে পাছে লাগে সম্মুখভাগে সোয়। মানে, মায়া আর ছায়া একই....' শেষটা উনি বিড়বিড় করে কী যে বললেন কিছুই বুঝতে পারলাম না।

অবশেষে ক্ষান্ত হয়ে পেজারটা আবার গুঁজে রাখলাম কোমরে।

রামাইয়া ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বোটকা গন্ধটা আমার নাকে এসে ঝাপটা মারল। আমার গা গুলিয়ে উঠল। অথচ বাকি দুজন দিব্যি নির্বিকার। ওঁদের দেখে মনে হচ্ছে ওঁরা যেন কোনও একটা ঘটনার জন্য অপেক্ষা করছেন—ট্রেনের জন্য নয়। অবশ্য মাস্টারজির ট্রেন ধরার কথাও নয়।

শ্রীবাস্তব হাত নেড়ে মশা তাড়ানোর চেষ্টা করে বললেন, 'মশার চেয়ে বিরক্তিকর আর কিছু নেই। গায়ে কামড় না বসিয়েও যদি আশেপাশে ওড়ে তা হলেও বিচ্ছিরি লাগে।'

আমি আবার একটা ছুতো পেয়ে একেবারে পাক্কা সেল্‌সম্যানের ক্ষিপ্রতায় ঝাঁপিয়ে পড়লাম। ঝুঁকে পড়ে সুটকেস খুলে একটা যন্ত্র বের করে নিলাম। কে বলতে পারে, যন্ত্রটা দেখেশুনে মাস্টারজি আর শ্রীবাস্তব হয়তো একটা করে কিনে ফেলতে পারেন! তাছাড়া কোম্পানির প্রচার তো খানিকটা হবেই।

একটা আই-এস মাস্টারজির টেবিলে রেখে যন্ত্রটার গুণাগুণ সম্পর্কে সাতকাহন বক্তৃতা শুরু করে দিলাম। মাস্টারজিকে তিন নম্বর সিগারেট অফার করে বললাম, 'যন্ত্রটা চালু করলেই এর অ্যাকশন দেখতে পাবেন। এ-ঘরের সব কটা মশা পালিয়ে গিয়ে একেবারে রেললাইনে গিয়ে শেলটার নেবে।'

মাস্টারজি সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বারকয়েক নাক টানলেন। ব্রিজমোহন শ্রীবাস্তবের সঙ্গে তাঁর চোখাচোখি হল। লক্ষ করলাম, ওঁদের দুজনের চোখেই কৌতুক। সেটা আমার আই-এস-এর প্রতি তাচ্ছিল্য কিনা বুঝতে পারলাম না।

মাস্টারজি বিড়বিড় করে বললেন, 'মশার জন্য আমাদের খুব একটা অসুবিধে হয় না। তবু আপনি যখন বলছেন তখন চালু করুন—'

শীত-টিত ভুলে গিয়ে আমি যন্ত্রটাকে ঘরের সুইচবোর্ডের কাছে নিয়ে গেলাম। প্লাগপয়েন্টে মেইন্‌স কর্ডের প্লাগটা গুঁজে দিয়ে যন্ত্রটাকে বসিয়ে দিলাম মেঝেতে। তারপর মাস্টারজি আর শ্রীবাস্তবের দিকে অহঙ্কারী ম্যাজিশিয়ানের ভঙ্গিতে তাকালাম।

এইবার হাত দুটো শব্দ করে ঝেড়ে নিয়ে একটু হেসে আই-এস-এর সুইচ অন করে দিলাম।

বিপর্যয়টা শুরু হল সঙ্গে সঙ্গেই।

আলট্রাসনিকের প্রকোপে পিনপিন করে ওড়া মশাগুলো যথারীতি পালাতে শুরু করল ঠিকই, তবে বাকি তিনজন মানুষও অদ্ভুত আচরণ শুরু করে দিল।

জ্বলন্ত সিগারেট ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মাস্টারজি তড়াক করে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন। দু'কানে আঙুল ঠেসে ধরে মুখ বিকৃত করে চিৎকার করে উঠলেন, 'বন্ধ্‌ কিজিয়ে, সাব, উও শয়তান মশিনকো বন্ধ্‌ কিজিয়ে—'

শ্রীবাস্তবের আভিজাত্য তখন কোথায় উবে গেছে! দু'কানে হাত চেপে লাফিয়ে উঠেছেন তিনিও। আর জড়ানো স্বরে চিৎকার করে কী সব বলছিলেন।

রামাইয়া পাগলা কুকুরের মতো দাপাদাপি করে ঘরময় দৌড়তে শুরু করে দিয়েছে। মাঝে-মাঝে লাফিয়ে উঠছে শূন্যে।

সব মিলিয়ে সে এক বীভৎস অবস্থা।

অবাক ভাবটা কোনওরকমে কাটিয়ে উঠে আমি চট করে আই-এস-এর সুইচটা অফ করে দিলাম।

যন্ত্রটায় তো এমন কোনও গোলমাল নেই যাতে আলট্রাসনিকে মানুষের কোনও অসুবিধে হবে! তাছাড়া আমার তো কিছু হয়নি! তা হলে এই তিনজন মানুষ এরকম অদ্ভুত আচরণ করল কেন?

মাস্টারজি আবার নিজের চেয়ারে বসে পড়েছেন। মাথা ঝুঁকিয়ে বড়-বড় শ্বাস ফেলছেন।

শ্রীবাস্তব একটা চেয়ারের পিঠে হাত রেখে একরকম যেন ধুঁকছেন।

আর রামাইয়া ঘরের মেঝেতে বসে মাথা ঝাঁকাচ্ছে আর মাঝে-মাঝে ভয়ার্ত চোখে একটু দূরে রাখা যন্ত্রটার দিকে দেখছে।

আমি খুব অপ্রস্তুত অবস্থায় পড়লাম। কী বলব, কী করব, ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না।

এমন সময় বহুদূর থেকে কোনও ট্রেনের হুইসল শোনা গেল।

হুইসলের শব্দটা অনেকটা আর্ত চিৎকারের মতো শোনাল।

আর ঠিক তখনই ঘরের সিলিং পাখাটা অতিকায় পেন্ডুলামের মতো ধীরে-ধীরে দুলতে শুরু করল।

শ্রীবাস্তব উদ্‌ভ্রান্ত চোখে তাকাল মাস্টারজির দিকে। চাপা গলায় বলল, 'ট্রেন আসছে... আমাদের ট্রেন...'

মাস্টারজি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। সোয়েটার-কোট টেনে-টুনে ঠিকঠাক করে নিলেন—যেন এখনই কোথাও বেরোবেন। আর রামাইয়া তার ক্লান্ত দেহটাকে ভাঁজ ভেঙে কোনওরকমে দাঁড় করাল।

আমি ঘড়ি দেখলাম। রাত দশটা হতে কয়েক সেকেন্ড বাকি।

ট্রেনটা ছুটে আসার শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল। কিন্তু তার ছোটার গতি বিন্দুমাত্রও কমছে বলে আমার মনে হল না।

এরপর যা হল তা কী করে আমি সইতে পেরেছি জানি না।

রামাইয়া এক ভয়ঙ্কর চিৎকার করে উঠল। চোখের পলকে ওর মুখ-মাথা ছিন্নভিন্ন তরমুজের মতো ফেটে চৌচির হয়ে রক্ত ছিটকে গেল চারপাশে। অথচ ওর কবন্ধ দেহটা তখনও সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে।

আমার হাত-পা থরথর করে কাঁপতে লাগল। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। তখনও জানি না, এরকম অবিশ্বাস্য ঘটনা আরও ঘটবে।

রামাইয়ার পর শ্রীবাস্তবের পালা।

ওঁর চিৎকারটা অনেকটা ঘাড় মটকে দেওয়া মুরগির মতো শোনাল। আর পাটকাঠি ভাঙার মতো মড়মড় শব্দ হয়ে ওঁর পেটের ওপর আড়াআড়ি তৈরি হয়ে গেল বীভৎস ক্ষতচিহ্ন। সুন্দর পোশাক-আশাক রক্তে ভেসে গেল। প্যান্ট বেয়ে রক্তের ঢল গড়িয়ে পড়তে লাগল মেঝেতে।

সেই অবস্থাতেই এক ভয়ঙ্কর উল্লাস ফুটে উঠল শ্রীবাস্তবের চোখে-মুখে। তিনি উত্তেজিতভাবে বলে উঠলেন, 'ট্রেন এসে গেছে—রাত দশটার ট্রেন—'

মাস্টারজি হাসলেন—উন্মাদের হাসি। হাসতে-হাসতেই তাঁর মাফলার জড়ানো গলাটা ফাঁক হয়ে গেল। মাথাটা ঝাঁকুনি দিয়ে ঘুরে গেল উলটো দিকে, কিন্তু বাকি দেহটা সোজাসুজি আমার মুখোমুখি—অ্যাটেনশনের ভঙ্গিতে দাঁড়ানো।

রক্ত ছড়িয়ে পড়েছিল টেবিলে, টেবিলের কাগজে। কোটের রঙ গাঢ় নীল হওয়ায় রক্তের দাগ তেমন করে বোঝা যাচ্ছিল না।

ওই অবস্থাতেই মাস্টারজি কোটের পকেট থেকে রুমাল বের করে নাক ঝাড়লেন।

সিলিং পাখাটা এখন আরও জোরে দুলছে। ওটার ব্লেডের ছায়া খেলা করে যাচ্ছে আমাদের চারজনের গায়ের ওপর।

'মাস্টারজি, চলুন, আর সময় নেই—' শ্রীবাস্তব তাড়া দিলেন মাস্টারজিকে।

তারপর আমার বিহ্বল চোখের সামনে তিন-তিনটে রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত মানুষ হাত ধরাধরি করে বেরিয়ে গেলেন ঘরের বাইরে। ট্রেনের শব্দটা তখন প্ল্যাটফর্মে ঝড় তুলছে।

চলে যাওয়ার সময় মাস্টারজির পিঠটা আমি দেখতে পাচ্ছিলাম। আর দেখতে পাচ্ছিলাম পিঠের দিকে ফেরানো তাঁর মুখটাও। সেখানে নানা জায়গায় রক্তের ছিটে, আর প্রশান্ত ভঙ্গিতে দু'চোখ বোজা।

মাস্টারজির ঠোঁট নড়ে উঠল : 'মায়া ছায়া একসি বিরলা জানে কোয়...'

ওঁরা তিনজন প্ল্যাটফর্মের ওপর দিয়ে তীরের মতো ছুটে গেলেন রেললাইনের দিকে। অন্ধকারে ওঁদের আর দেখা গেল না। ট্রেনের চাকার শব্দ রাতের অন্যান্য শব্দের গলা টিপে ধরল। বুক-ফাটানো রক্ত-হিম-করা আর্ত চিৎকার করে উঠল ছুটন্ত ট্রেনের হুইসল।

তারপর...

তারপর সব চুপচাপ।

শীতের বাতাস আর মশার পিনপিন শব্দ ঘিরে ধরেছিল আমাকে। তার একটু পরেই বোধহয় আমি ঘরের দরজার কাছে টলে পড়ে গিয়েছিলাম।

পরদিন বারডিহির ট্রেনে যখন উঠলাম তখনও পুরোপুরি সুস্থ হইনি। পোর্টার জগমোহন আমাকে ট্রেনে তুলে দিয়েছিল।

ওর কাছেই শুনেছি, রাত দশটার ওই এক্সপ্রেস ট্রেনের তলায় গত পাঁচ বছরে তিনজন সুইসাইড করেছে : মাস্টারজি, ব্রিজমোহন শ্রীবাস্তব আর রামাইয়া। যখন বেঁচে ছিল তখন ওরা কেউ কাউকে খুব একটা চিনত না। কিন্তু মারা যাওয়ার পর কোনও-কোনও রাতে ওরা তিনজন দেখা দেয় ওই ভাঙাচোরা ঘরটায়। তারপর একসঙ্গে ঝাঁপ দেয় ওই ভূতুড়ে এক্সপ্রেস ট্রেনের তলায়। এসবই জগমোহনের গা-সওয়া হয়ে গেছে। তবে ট্রেনটাকে সে কখনও চোখে দ্যাখেনি—শুধু তার শব্দ শুনেছে।

আশ্বিন ১৪০৪

ভূতের যদি থাকে খুঁৎ

স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়

বিয়ে বাড়ির হ্যাপা চুকতে বেশ রাত হয়ে গেল। বর-কনে যখন বাসরে ঢুকল নিবারণ হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল প্রায় বারোটা।

শীতের রাত্তির। চারদিক থমথমে নিশুতি। দু'চোখ এবার ঘুমে জড়িয়ে আসছে নিবারণের। ইচ্ছে করছে এক্ষুনি কোথাও শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। আর হবে নাই বা কেন—বরযাত্রী দলের সঙ্গে পাক্কা ছ'ঘণ্টা বাস-জার্নি করে তবে এই পাড়াগাঁয়ে বিয়ের আসরে এসেছে নিবারণ। নেহাত বর ঘনিষ্ঠ বন্ধু, না হলে আজকাল এসব ঝক্কি পোষায় না নিবারণের।

কিন্তু শোবার জায়গাই বা এখানে কোথায়? পুরো বরযাত্রী দলটাকেই আজ রাতে থাকতে হচ্ছে। বর বাসরে ঢুকতেই যে যার জায়গা ম্যানেজ করে শুয়ে পড়েছে। একমাত্র ঠাঁই করতে পারেনি নিবারণ। আর বাসরে ঢুকে সারারাত রঙ্গ করাও নিবারণের ধাতে সয় না। তাহলে এখন উপায়? এই মাঘ মাসের শীতের রাতে বাইরে শুয়েও তো কাটানো যায় না!

অতএব ছাউনি দেওয়া আস্তানা একটা চাই।

এ সময়ই হঠাৎ নজর পড়ল নিবারণের। বাড়ির খিড়কির পুকুরের ওধারে একটা বাড়ি দেখা যাচ্ছে। শুক্লপক্ষের ঢেউভাঙা চাঁদের আলোয় স্পষ্ট চোখে পড়ছে একটা ছোট্ট একতলা বাড়ি। এখান থেকে খুব দূরেও নয়। এদের সঙ্গে যদি জানাশোনা থাকে, কাউকে দিয়ে অনুরোধ করিয়ে একটা রাত ওখানে অতিথি হয়ে কাটিয়ে দেওয়া যায় না কি?

ভাবার সঙ্গে সঙ্গে নিবারণ আর দেরি না করে এদের বাড়ির একজন মাতব্বর গোছের লোককে পাকড়ে মতলবের কথাটা জানাল। কিন্তু শুনেই তো আঁতকে উঠলেন মাতব্বর ভদ্রলোক। বললেন—মশাই, ও চিন্তা মনেও আনবেন না। ও বাড়িতে মানুষ বাস করে না, ও ভূতুড়ে বাড়ি।

মানুষ বাস না করলেই যে সেটা ভূতুড়ে বাড়ি হতে হবে তার কোনো মানে আছে? নিবারণ ব্যাজার মুখে ঘাড় বেঁকিয়ে বলে। এমনিতেই ভূত-টুতের প্রতি বিশ্বাস নিবারণের কোনোকালেই বিশেষ নেই।

আরে মশাই, একথা এখানে সবাই জানে। ও বাড়িতে যে থাকত সে এক কাগজকলের কর্মী ছিল। বছর কয়েক আগে কারখানার মেশিনে দুটি হাতই কাটা যেতে চাকরিটা চলে যায়। সেই দুঃখে মাসখানেক বাদেই আত্মহত্যা করেছিল লোকটা। কিন্তু আত্মহত্যা করেও নাকি ও বাড়ির মায়া সে ছাড়তে পারেনি,—বলতে বলতে দস্তুরমতো চোখ বড় বড় করে মাতব্বর—আজ পর্যন্ত কেউই ওখানে গিয়ে একটা রাতও কাটাতে পারেনি।

কিন্তু ততক্ষণে একটা শতরঞ্জি আর চাদর বগলদাবাই করে ফেলেছে নিবারণ আর কথার মধ্যেই মাতব্বরের হাত থেকে হ্যারিকেনটাও নিয়ে নিয়েছে। তারপর সোজা পা চালিয়েছে খিড়কির দরজার দিকে। ক্লান্ত দেহে ভূতুড়ে গল্প শোনার মেজাজ এখন তার নেই। বাড়িটা ফাঁকা, এ খবরটাই তার কাছে যথেষ্ট, বাকিটা পরে দেখা যাবে।

পরিত্যক্ত ভূতুড়ে বদনাম হলেও বাড়িটা এখনও বসবাসের অনুপযুক্ত হয়ে যায়নি, সেটা ঢুকেই টের পাওয়া গেল।

ঘর বলতে একটাই। সেখানে থাকার মধ্যে আছে এক ধুলোমলিন তক্তাপোশ, ভাঙা টেবিল আর খান দুই ভাঙা চেয়ার। অল্প সময়ের মধ্যে তক্তাপোশটা কিছুটা ঝাড়ামোছা করে তার ওপরই শতরঞ্জি বিছিয়ে শুয়ে পড়ল নিবারণ। ঘরের সব ক'টা জানলা-দরজা বন্ধ থাকায় ভালোই হল, এই মাঘ মাসের

শীতে হাড়-কাঁপানো বাতাস ঢোকার ভাবনা রইল না। হ্যারিকেনের শিখাটা কমিয়ে রাখল টেবিলটার ওপর। আর কি! আগাগোড়া চাদর মুড়ি দিয়ে এখন একঘুমে রাতটা কাটিয়ে দিলেই হল।

একটা নিশ্চিন্ত হাই তুলে নিবারণ ভাবল ইচ্ছে করলেই আরও দু'একজন এসে এই পরিত্যক্ত ফাঁকা ঘরে আরামে রাতটা কাটিয়ে যেতে পারত। হয়তো যারা ভেবেছিল ওই মাতব্বরই আসতে দেননি। লোকটা নিজেই একটা ভূত, নিবারণ ভাবল—ভূত না হোক, অদ্ভুত তো বটেই।

হ্যারিকেনের অল্প আলোয় ঘরটা রহস্যময় দেখাচ্ছে। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে দু'চোখে ঘুম জড়িয়ে এল নিবারণের।

কত সময় কেটেছে কে জানে! হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেল!

ঘর অন্ধকার। হ্যারিকেনের আলো নিভে গেছে। নিবারণ কান পাততেই শুনল দুমদাম দুদ্দাড় শব্দ। ঘরের দরজা-জানলাগুলো বারবার খুলছে আর বন্ধ হচ্ছে। তবে কি হঠাৎ ঝড় এল—এই মাঘ মাসের শীতের রাতে? তাই বা যদি হয়, জানলাগুলো খুলছে বটে, তবে হাওয়া-টাওয়া তো ঢুকছে না।

নিবারণ হাতড়ে হাতড়ে দেশলাই বার করে হ্যারিকেনটা নতুন করে জ্বেলে দিল। দরজা-জানলা পড়ার শব্দ ততক্ষণে থেমে গেছে। হ্যারিকেনের আলোয় নিবারণ দেখল, কই, কোনো জানলা তো খুলে নেই। সবই আগের মতো ভেতর থেকে বন্ধ। তবে কি স্বপ্ন দেখছিল? এমন সশব্দ স্বপ্ন জীবনে কোনোদিন দেখেনি নিবারণ।

আসলে সেই মাতব্বর ভদ্রলোক যে ভয় দেখিয়েছিলেন সেটাই বোধহয় অবচেতন মনে....ভাবতে ভাবতে হাই তুলল নিবারণ।

কিন্তু ভাবনা আর হাই দুটোই আর শেষ হল না, তার আগেই দেখতে পেল—

ঘরের ঠিক মাঝখানটায় একটা কালো বেড়াল বসে রয়েছে।

আশ্চর্য! বেড়ালটা ঘরের মধ্যে ঢুকল কি করে! ঘরের প্রতিটি জানলা-দরজাই তো ভেতর থেকে বন্ধ! তবে কি আগে থেকেই এই তক্তাপোশের নীচে এসে বসেছিল, প্রায়-অন্ধকার ঘরে ঢুকে নিবারণ দেখতে পায়নি?

কুচকুচে কালো রঙের বেড়ালটার চোখ দুটো জ্বলছে অতি তীব্র দীপ্তিতে। দেখলে অস্বস্তি হয় বৈকি। কালো বেড়াল নাকি আবার অশরীরীর প্রতীক। হঠাৎ একটা জিনিস লক্ষ পড়ল নিবারণের। বেড়ালটার সামনের দু'পায়ের থাবা সমেত কিছুটা অংশ কাটা। অদ্ভুত তো! এবার কিন্তু সত্যি সত্যি আশঙ্কা দেখা দিল নিবারণের মনে। বিয়ে বাড়ির মাতব্বর বলেছিলেন এ বাড়িতে দু'হাত কাটা এক ভূতের বাস আছে—সেই ভূতটাই বেড়ালের রূপ ধরে বসে নেই তো?

ভাবতে ভাবতেই অবাক কাণ্ড—বেড়ালটা চোখের সামনেই বদলে গিয়ে একটা কুকুর হয়ে গেল। যাকে বলে খাঁটি নেড়ে কুত্তা। তেমনি ডিগডিগে ঘিয়ে ভাজা। কিন্তু তখনও সেই এক ব্যাপার—কুকুরের সামনের দুটি পায়ের কিছু অংশ কাটা। স্বভাবতই থেবড়ে বসে রইল কুকুরটা।

নাঃ, আর কোনো সন্দেহ নেই, ওটা এ বাড়ির সেই ভূতটাই বটে!

কিন্তু রাতদুপুরে চোখের সামনে ভূত বাবাজির খামকা ওই সব ম্যাজিক দেখানোর কারণটা কি নিবারণ বুঝতে পারল না। ওর কি ধারণা নিবারণ মুগ্ধ হয়ে বাহবা জানাবে?

ধুত্তরি! ঘুমের সময় এসব ব্যাঘাত নিবারণের একেবারেই পছন্দ নয়। হ্যারিকেনটা জ্বেলে রেখেই আগাগোড়া মুড়ি দিয়ে আবার শুয়ে পড়ল নিবারণ।

কিন্তু ঘুম আসার কি জো আছে—বিশেষত ভূতের সঙ্গে একঘরে থেকে?

একটু বাদেই শুরু হয়ে গেল নতুন উপদ্রব। সারা ঘর দাপিয়ে বেড়াতে লাগল কেউ। জানলা-দরজা থেকে শুরু করে তক্তাপোশটা পর্যন্ত টানাটানি শুরু করল।

এ তো মহাঝামেলা হল! এভাবে অনবরত ঝামেলা বাধিয়ে চললে আজকের ঘুমের তো দফা রফা। কাল ভোরেই আবার আট ঘণ্টা বাস-জার্নি করতে হবে। এর একটা হেস্তনেস্ত হওয়া দরকার। চাদরটা মুখ থেকে সরিয়ে তড়বড়িয়ে উঠে বসল নিবারণ—

আর উঠে বসতেই একেবারে মুখোমুখি। বিকট চেহারার এক মূর্তি তক্তাপোশের ঠিক সামনেই নিবারণের দিকে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। প্রথমটা চমকে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল নিবারণ। মাতব্বরের কথামতো এই তাহলে পোড়ো বাড়ির ভূত।

কিন্তু দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে অমন বীভৎস অঙ্গভঙ্গি করছে কেন? ভয় দেখিয়ে নিবারণকে ঘরছাড়া করার মতলবে কি?

ভয়ের বদলে এবার হাসিই পেল নিবারণের। একেই তো ভূতের ভয় জীবনে ওর কোনোদিনই নেই, তার ওপর এ হল....

মুখ ফুটে বলেই ফেলল—তোমার দৌড় তো জানি বাপু। আর যাই কর, ওই কব্জি পর্যন্ত কাটা হাত দুটো নিয়ে কারুর অনিষ্ট করা তোমার পক্ষে সম্ভব নয়। অতএব মেলা উৎপাত না করে একটা রাত এই অতিথিটিকে ঘরে শুয়ে একটু ঘুমোতে দাও। চিন্তা নেই, কাল সকালে উঠেই চলে যাব।—বলেই হাই তুলল নিবারণ। আবার নতুন করে ঘুম আসছে।

ভূত কিন্তু নড়ল না। একই জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু এবার ওর মুখের ভাব ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছে টের পেল নিবারণ। কেমন যেন করুণ হয়ে উঠছে ভূতের মুখটা। অসহায় ভাব ফুটে উঠছে। দেখতে দেখতে টপ্ টপ্ করে দু'ফোঁটা চোখের জল গড়িয়ে পড়ল চাদরে। স্পষ্টই টের পেল নিবারণ।

ভূত কাঁদছে! এমন অসম্ভব কাণ্ডের কথা কেউ কখনও শুনেছে? কিন্তু সেই দৃশ্যই চোখের সামনে দেখল নিবারণ। কিছুটা সময় তাকিয়ে রইল হকচকিয়ে, তারপর দাবড়ে উঠল, এসব হচ্ছে কি? এতক্ষণ উৎপাত করে সুবিধে না হওয়ায় এবার কান্নাকাটি ধরেছ? কিন্তু জেনে রাখ, রাত এ ঘরে না কাটিয়ে আমি নড়ছি না। আর তোমার মতো ঠুঁটো ভূতের সাধ্য নেই আমায় তাড়ায়....

এবার নিবারণের কথা আর শেষ হল না, তার আগেই ডুকরে কেঁদে উঠল ভূত। কাঁদতে কাঁদতে করুণ নাকি সুরে বলল, দোহাই, বারবার ওকথা বলে আমায় নতুন করে দাগা দেবেন না স্যার। আমি তো মরেই আছি, মরার বাড়া আর কি হতে পারে।—বলতে বলতে আর একবার ডুকরে উঠল।

এবার রীতিমতোই অবাক হল নিবারণ, এর সঙ্গে কৌতূহলও বাড়ল, বলল, তোমার কি ব্যাপার বল দেখি হে, তোমার পাল্লায় পড়ে ঘুমের দফারফা তো হলই, এখন না হয় জমিয়ে একটা ভূতুড়ে গল্পই শুনি।

গল্প না স্যার, খাঁটি সত্যি কথা। ভূত বাধা দিয়ে বলল, সত্যি বলছি মরে এত জ্বালা জানলে আগে আত্মহত্যাই করতাম না।

ভূত তার কাহিনি শুরু করল ঃ

জীবিতকালে ভূতের নাম ছিল বটু। তিন কুলে কেউ ছিল না। একাই থাকত এই বাড়িটায় আর স্থানীয় এক কাগজকলে কাজ করত। একদিন এক ঘোরতর দুর্ঘটনায় তার হাত দুটো কনুই থেকে কাটা গেল এবং সেই দুঃখে কিছুদিন বাদেই আত্মহত্যা করল। এই পর্যন্ত ওর গল্প আগেও শুনেছে নিবারণ।

তার পরের কথাগুলো শোনা গেল সাক্ষাৎ ভূতের মুখ থেকে।

ভূত হয়েও বটু অন্যের পরিহাস আর আত্মগ্লানি থেকে মুক্তি পায়নি। এর জন্যে দায়ী ভূতেদেরই সমাজব্যবস্থা।

মানুষের মতো ভূতেদেরও নাকি একটা সমাজ আছে। ভূতরূপ ধারণ করেই প্রতিটি ভূতকে সেখানে নিজের নাম 'রেজিস্ট্রি' করতে হয়। তারপর নতুন ভূত তার স্বভাব ও চরিত্র অনুযায়ী এক এক ধরনের দায়িত্ব পায়। যেমন কারুর দায়িত্ব মাছের বাজারে ঘোরাঘুরি করে ফাঁকতালে একটা ওজন মতো মাছ তুলে আনা, কারুর দায়িত্ব বেলগাছ বা নিমগাছ থেকে বেল বা নিমপাতা পাড়া আর কারুর কাজ শুধুই শ্যাওড়া গাছ, শ্মশান-মশান কিংবা আদাড়ে-বাদাড়ে ঘুরে ভিতু লোকেদের ভয় দেখিয়ে ভূতের পুরোনো ইজ্জত রক্ষা করা।

কিন্তু দু'হাত কাটা বটুর ভাগ্যে এর একটা কাজও জুটল না। কারণ ঠুঁটো হাতে এসব কোনো কাজ করাই বটুর পক্ষে সম্ভব নয়। মাঝ থেকে ভূত সমাজের অবহেলা আর পরিহাস শুনে ফিরতে হল বটুকে।

ফিরে এল ওর এই পুরোনো বাড়িতেই। চরম আত্মগ্লানিতে আর একবার আত্মঘাতী হবার ইচ্ছে জাগল মনে—কিন্তু হায়! ভূত হয়ে তাই বা কি করে সম্ভব!

অগত্যা ভূত সমাজ থেকে মুখ লুকিয়ে মনের দুঃখে বাড়িতে একা একাই দিন কাটছিল বটুর।

কিন্তু তার একা থাকার অধিকারেও হস্তক্ষেপ হল। মাঘ মাসের রাতের এই প্রচণ্ড ঠান্ডায় এ বাড়িতে থাকার উপযুক্ত একটি মাত্র ঘরেও মানুষ এসে ঢুকল—এবং সে কিছুতেই ঘর ছাড়তে রাজি নয়।

ভূতের কাহিনি শুনে নিবারণ বলল, কিন্তু একটা রাত মানুষের সঙ্গে কাটাতেই বা তোমার আপত্তি কিসের বাপু?

ভূত চোখ কপালে তুলে বলল, কি বলছেন স্যার, ভূতের ইজ্জত তো আগেই খুইয়েছি, এরপর যদি মানুষের সঙ্গে একঘরে রাত কাটাতে হয় তবে কি আর 'ভূতত্ব' বলে কিছু থাকে? এরপর তো ভূত সমাজ আমায় দেখলে থুতু দেবে। অথচ রাতটা যে বাইরে কাটাব সে উপায়ও নেই। মাঘের ঠান্ডা ভূতের পক্ষেও অসহ্য। বিশেষত ভূত হবার পর থেকে বাইরে থাকার অভ্যেসটাও তৈরি হয়নি।—বলতে বলতে বিষণ্ণতায় বুজে এল শ্রীমান ভূত ওরফে বটুর কণ্ঠ।

ভূত জীবনেও যে এত সমস্যা থাকতে পারে, আগে কখনও ভাবেনি নিবারণ। গালে হাত দিয়ে একটু সময় বসে ভাবে সে। ভূতের জন্যে রীতিমতো দুঃখই হতে থাকে। তারপর বলে, আচ্ছা, এই ভূত প্রাপ্তি থেকে তোমার কোনোভাবে মুক্তি নেই? শুনেছি গয়ায় পিণ্ডদান করলে নাকি....!

হুস্ করে আর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল ভূত, তারপর বলল, তা আমার জন্যে আর সে দায় কার পড়েছে বলুন? তিন কুলে কেউই নেই আমার।

বেশ, আমিই তোমার পিণ্ডদান করব, নিবারণ প্রগাঢ় সহানুভূতিতে ভূতকে আশ্বস্ত করে বলে, কিন্তু বাপু, একটাই শর্ত আমার, আজকের বাকি রাতটা বিনা উৎপাতে আমায় ঘুমতে দিতে হবে। নিদ্রা আর ক্লান্তিতে শরীরটা ভেঙে পড়ছে। বিরাট একটা হাই তুলল নিবারণ।

কিন্তু তারপরই আর ভূতকে দেখা গেল না। তার বদলে বিরাট এক কুচকুচে কালো টিকটিকি নিবারণের চোখের সামনে সরসর করে উঠে গেল কড়িকাঠের দিকে।

পরদিন বেশ বেলায় বিয়ে বাড়ির মাতব্বর ও বরযাত্রী দলের কয়েকজন যখন ভূতের বাড়িতে নিবারণকে খুঁজতে এল, নিবারণ তখনও তক্তাপোশে অকাতরে ঘুমোচ্ছে।

এরপর বরযাত্রী দলের একজন নিবারণের ঘুম ভাঙিয়ে যখন বলল, নিবারণদা, চটপট তৈরি হয়ে নাও, আমাদের বাস আর কিছুক্ষণের মধ্যেই স্টার্ট করবে, নিবারণ বলল, ও বাসে আমার আর যাওয়া হচ্ছে না রে, তোরা বরং চলে যা।

সেকি, তুমি কোথায় যাবে?

একটা কাজ সারব গয়ায়, তারপর কলকাতায় ফিরব।

শুনে সবাই হাঁ করে তাকিয়ে রইল নিবারণের দিকে। মাতব্বর পর্যন্ত কেমন হকচকিয়ে যান। শুধু ঘরের কড়িকাঠের সেই কুচকুচে কালো টিকটিকিটা আনন্দে ল্যাজ আছড়ে ডেকে ওঠে—টিক্-টিক্-টিক্।

নিবারণের মনে হল বটুই সায় দিয়েছে—ঠিক্-ঠিক্-ঠিক্!

আশ্বিন ১৩৯৩

কানে কানে কথা কয়

অসীম চৌধুরী

প্রায় পঞ্চাশ বছর আগেকার কথা। আমি তখন স্কুলে পড়ি। এখন যাকে তোমরা বলো ক্লাস নাইন...আমরা বলতাম সেকেন্ড ক্লাস। সেকেন্ড ক্লাসে হাফ-ইয়ার্লি পরীক্ষাতে অঙ্কে ফেল করলাম। খবরটা পেয়ে আমার এক কাকা দেশের বাড়ির কাছে একটা বোর্ডিং-স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। তিনি ওই স্কুলের অঙ্ক-কাম-ড্রিল মাস্টারমশাই ছিলেন। জায়গাটা কলকাতা থেকে অনেক দূরে। শুনেছি সেখানে না আছে পাকা রাস্তা, না আছে ইলেকট্রিক। বলতে গেলে তেপান্তরের মাঠের ধারে একতলা পুলিশ ব্যারাকের মতো বোর্ডিং বাড়িটা। স্কুল থেকে খুব কাছে না-হলেও খুব দূরেও নয়। গোটা পঞ্চাশ ঘর—সব ঘরে দুজন করে ছাত্র থাকে।

স্টেশন থেকে হাঁটতে হাঁটতে কাকার সঙ্গে চললাম বোর্ডিংয়ে। হাতে গোলাপ ফুলের ছবি-ছাপা টিনের বাক্স ও শতরঞ্চি দিয়ে বাঁধা বিছানা, বই-খাতাপত্র। চারদিক ঘুটঘুটে অন্ধকার। কাছে-পিঠে কোনো বাড়ি বা দোকান নেই। বোর্ডিংয়ের চার ধারে পেল্লায় পেল্লায় নারকেল, তাল, আম, কাঁঠাল, শেওড়া, তেঁতুল, বেল—আরও অনেক গাছ। চারদিক অন্ধকার নিঝুম দেখে আমার গা ছমছম করতে লাগল। মনে হল তাহলে কলকাতার লেক রোড ছেড়ে এখন থেকে এই জঙ্গলে থাকতে হবে! কাকা আমার মুখ দেখে বললেন, এখন রাত্রি তো, তাই অন্ধকারে গাছপালাগুলো কালো কালো দেখাচ্ছে, সকালে উঠলে তোর মন আনন্দে ভরে যাবে। ছাদে একটাই ঘর, সেখানে তুই থাকবি। ছাদে দাঁড়ালে দেখতে পাবি ধানক্ষেত, রেললাইন, পুকুর, তালগাছঘেরা দীঘি। সকালবেলা কত রকম পাখির ডাক। এক মাসের মধ্যে শরীর সেরে যাবে।

আমি মনে মনে ভাবলাম, শরীর সারা চুলোয় যাক, বাঁচলে হয়। ভয়ে ভয়ে বললাম, একা একটা ঘরে...ছাদে?

কাকা বললেন, আপাতত রশিদ আছে। টেস্ট পরীক্ষার পর সে শক্তিগড় চলে যাবে। তুই একাই থাকবি। কেউ ডিস্টার্ব করবে না। মন দিয়ে অঙ্ক করবি। বোর্ডিংয়ের ম্যানেজার বোম্বেটেকে বলে দিয়েছি খাবার সময় তোকে বেশি তরকারি, বড় বড় পোনা মাছের টুকরো দেবে। বাড়িতে দেখিয়ে দিবি তুইও অঙ্কে একশোর মধ্যে একশো পাওয়ার ছেলে!

আমি ভাবলাম, তবু ভালো—আপাতত রশিদ থাকবে।

কাকা আরও বললেন, রশিদ ছেলেটা ভালো। স্কুলের ফুটবল টিমের ক্যাপ্টেন, ক্লাসে ফার্স্ট হয়। তবে দোষ, নিজের পড়া সাঙ্গ করে অন্য ছাত্রদের ডিস্টার্ব করে। তোকে করলে বোম্বেটে মাস্টারকে কমপ্লেন করবি।

বোম্বেটে, সে আবার কী নাম? এখন অবশ্য ছেলেমেয়েদের সব অদ্ভুত অদ্ভুত নাম, অভিধানেও পাওয়া যায় না। কিন্তু আমাদের আসলে বোম্বেটে-টোম্বেটে নাম কেউ রাখত না।

বললাম, বোম্বেটে?

ওই, সারাদিন শুধু দীনেন রায়ের রবার্ট ব্লেকের চিনে বোম্বেটের গল্প পড়ে—তাই। আসল নাম গণেশ। দুষ্টুমি করবি নে, বোম্বেটে খুব ভালো লোক। রশিদের সঙ্গে একটু খটমট আছে।

কাকা আমাকে রুমমেট রশিদ আলি আর ম্যানেজার বোম্বেটের হেফাজতে দিয়ে টিচারদের হস্টেলে চলে গেলেন।

বোম্বেটে যেমনি মোটা তেমনি কালো, মহা ধূর্ত আর কলহবাজ। তার লাগত বেশি রশিদের সঙ্গে।

কাকা চলে যাবার পর প্রথম কথাতেই বোম্বেটে মাস্টার আমাকে ভয় পাইয়ে দিল। আমার তক্তাপোশের মাথার উপর একটা আলকাতরা মাখানো জানালা ছিল। পরে জেনেছিলাম উই থেকে বাঁচানোর জন্য জানালায় আলকাতরা মাখানো হত। বোম্বেটে মাস্টার গম্ভীর মুখে খোলা জানালাটা বন্ধ করতে করতে বলল, এইটে ভুলেও খুলে শুবি নে। এর গায়েই যে আসশেওড়া গাছ দেখছিস, ওখেনে অপদেবতা থাকে। ভুলেও ছাদে বাথরুম করবি নে। যে সব নারকেল, তাল, বেল, আম গাছ দেখছিস সেখানেও থাকে। অনেক ওঝা-টোঝা দিয়ে ঝাড়ফুঁক করা হয়েছে—যায়নি তেনারা। অমাবস্যার রাতে, শীতের রাতে বড়ই উৎপাত করে। এমন হুল্লোড় করে সকলে মিলে যেন গাছগুলো নয়, ছাদটাই ভেঙে ফেলার মতো হয়।

রশিদ বলল, কেন বেচারিকে ডরাচ্ছেন? না রে, আমি থাকতে তোর ভয় নেই।

তা তো নেই, তুই যে ভূতের রাজা। তোকে না করুক, একে করতে পারে।

রশিদ হেসে বলল, ম্যানেজার মাস্টারমশাই, সেই গতবার কালীপুজোর সময় ঘুম ভেঙে আপনার বুকের উপর ছাগলের কাটা মুন্ডু দেখে ভয় পাননি?

সে তো তোর কাজ। ভূত আমার অশ্বডিম্ব করবে। জানিস আমার কাছে ভূতের কবচ আছে? হরিহর তান্ত্রিকের দেওয়া। কবচটা দেখালে ভূত নয়, ভূতের ফোর্টিন ফাদারস পালাবে। ভুজঙ্গবাবুর ভাইয়ের ব্যাটা বলেই জানান দিয়ে রাখলাম। তারপর যেতে যেতে বললেন, ভূতের রাজার সঙ্গে থাকবি—তোর আবার ভয় কিসের? তবু মাথার তলায় একটা লোহা-টোহা রেখে শুবি। ভয়-টয় পেলে আমাকে বলবি। আমি তোকে হরিহর তান্ত্রিকের কাছে নিয়ে যাব।

বোর্ডিংয়ে আসার আগেও আমি দু-একবার ভূত দেখেছি। অনেকেই বলত লেক রোডে আমাদের বাড়ির ছাদে গঙ্গাজলের ট্যাঙ্কের উপর কালো কালো ছায়া দেখেছে। গাছপালা, মানুষ, কাপড়-জামার নয়, অদ্ভুত এক ধোঁয়াটে ছায়া। তাই পরতপক্ষে আমি একা ছাদে যেতাম না। কারও সঙ্গে ছাদে দিনে-দুপুরে গেলেও বড় বড় মরচেধরা ট্যাঙ্ক দুটো দেখে গা-ছমছম করত। ঠাকমা প্রায়ই ছাদে এসে ট্যাঙ্ক থেকে জল তুলে তুলসী গাছে দিতেন ও ডালা বন্ধ করতে ভুলে যেতেন। আমায় বলতেন, যা তো দাদা, ট্যাঙ্কের ডালা বন্ধ করে দিয়ে আয়, নয়তো কাকে ময়লা ফেলবে। ট্যাঙ্কের কালো জল দেখলেই বুক ঢিপঢিপ করত। মনে হত সেই ধোঁয়াটে ছায়া দুটো জলের মধ্যে বসে আছে। গেলেই ঘ্যাঁক করে চেপে ধরবে। সেই ট্যাঙ্কের উপর সত্যি আমি একদিন সন্ধেবেলা ভূত দেখলাম। আজও স্পষ্ট মনে আছে।

একদিন স্কুল থেকে এসে শুনলাম পাশের বাড়ির মুখুজ্যেমশাই লেক মার্কেটের দোকান বন্ধ করে এসে বাড়ি ঢুকেই বুকে হাত দিয়ে মারা গেছেন। মানুষ মরে গেলে আর মৃতদেহ দেখলে আমার ভীষণ ভয় করত। আমার এক পিসতুতো দাদা বলল, চল দেখে আসি।

যাব না, তবু দাদা জোর করে নিয়ে গেল। গিয়ে দেখি বৈঠকখানায় মুখুজ্যেমশাই চিৎপটাং হয়ে শুয়ে। গায়ে ফতুয়া, ধুতি হাঁটুর উপর, পায়ে চকচকে বুট জুতো। চোখ দুটো আবার খোলা। মনে হল যেন আমারই দিকে ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে রয়েছেন। তারই সঙ্গে শুনি বৃদ্ধা মুখুজ্যে ঠাকুমার বিলাপ—তুমি যে কেঁকড়া খেতে চেয়েছিলে, তোমার জন্যে রাঁদলুম বাড়লুম, আর তুমি না খেয়ে চলে গেলে গো! আমার যে মাচ খাওয়া ঘুচল গো! দারুণ বিকট গলায় কান্না।

সেই কাঁকড়া না খেয়ে হঠাৎ অক্কা পাওয়া মুখুজ্যেমশাইকে একদিন সন্ধেবেলা ট্যাঙ্কে বসে থাকতে দেখেছিলাম। সত্যি একটুও মিথ্যে নয়। একদিন সন্ধেবেলা ঠাকমা বললেন, যা তো দাদা, ছাদে বড়ির টিন ফেলে এসেছি। রোদে শুকুতে দিয়েছিলাম। রেতে হিম পড়ে সব নেতিয়ে যাবে।

সন্ধেবেলা ছাদে? অনেককেই খোশামোদ করলাম, কেউ সঙ্গে গেল না। এদিকে না আনলে ঠাকমা চটবেন! শাড়ির আঁচলে বাঁধা পয়সা থেকে আধপয়সা দেবেন না ঘুড়ি কিনতে! পা টিপে টিপে

রামসীতা, সীতারাম বলতে বলতে যেই ছাদে যাবার দরজা খুলেছি অমনি দেখি ট্যাঙ্কের উপর মুখুজ্যেমশাই বসে। সেই রকম বেশভূষা! আমাকে দেখে বুটজুতো পরা লিকলিকে পা দুটো দোলাতে দোলাতে খ্যাঁক খ্যাঁক করে হেসে বললেন, অ্যাই, তোর মুখুজ্যে ঠাকুমাকে বল আমার কেঁকড়া দিতে।

কথাটা শুনে আমার বুক টিপটিপ করতে শুরু করল। তখনও অজ্ঞান হইনি। মুখুজ্যেমশাই তেমনিভাবে হাসতে হাসতে বললেন, কেঁকড়া না খেয়ে আমি যাচ্ছি নে। আর তোর মুখুজ্যে ঠাকুমাকে বল যমের খাতায় নাম দেখেছি, এইবার যেতে হবে। এইসব দেখে আমি তো অজ্ঞান! আমার গোঁ গোঁ ডাক শুনে ঠাকমা ছাদে এলেন। তারপর আর অবশ্য মুখুজ্যেমশাইকে দেখিনি, বা শুনিনি কাঁকড়া খেতে চাওয়া। তবে তাঁর কথাটা যদি মিথ্যে হবে তাহলে সাতদিন পরই মুখুজ্যে ঠাকুমা ছড়া তেঁতুলের আচার করতে করতে পরপারে যাবেন কেন?

সে যাকগে, আমি যে রামভীতু আর অহরহ দিনে-দুপুরে ভূতের ভয় পাই রশিদ জেনে গেল। কিন্তু জানলেও কখনও আমাকে ভয় দেখায়নি।

একদিন রাত্রে অঘোরে ঘুমচ্ছিলাম, হঠাৎ শুনলাম রশিদ রেগে-মেগে বলছে, যা যা....ভাগ ভাগ। কী চাস তুই? আমি ধড়মড় করে উঠে বসলাম। রশিদ কার সঙ্গে কথা বলছে? আমাকে উঠে বসে থাকতে দেখে রশিদ বলল, বিশ্রী একটা স্বপ্ন দেখছিলাম রে! শুয়ে পড়। আমি চুপচাপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম। হঠাৎ রশিদ বলল, এই, তুই ভূত বিশ্বাস করিস? আমি ওকে অনেক আগেই মুখুজ্যেমশাইয়ের কথা বলেছি।

চুপ করে রইলাম। গভীর রাতে ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছে, ঝড়ো হাওয়াতে গাছগুলো দুলছে আর তারই সাঁ-সাঁ অদ্ভুত শব্দ ভেসে আসছে। সেই পরিবেশে কে আবার ভূতের কথা আলোচনা করতে চায়! রশিদ ভাঙা ভাঙা স্বরে বলল, একটা কন্দকাটা ভূত আমাকে প্রায়ই রাতে ঠেলা মেরে ঘুম ভাঙিয়ে চোখ গোল্লা গোল্লা করে বড়ই শাসাচ্ছে।

শাসাচ্ছে? কেন তুই কি করেছিস? ভয়ে ভয়ে বললাম।

গত মাসে বিজুরে ফুটবল খেলতে গেছিলাম। খুব ঘামি বলে ডাক্তার বলেছিল মাঠে নামার আগে চার-পাঁচ গেলাস পানি খেতে। আমি খেয়ে মাঠে গেছি, এমন সময়ে দারুণ বাথরুম পেল। এদিকে রেফারি তিনটে হুইসিল মেরেছে। সময় নেই দেখে খেলার মাঠের একটু পাশে নিমগাছ তলায় একটা ভাঙা ভাঙা বেদি আছে, সেখানে....নিমগাছের পাশেই যে কবরস্থান আমার জানা ছিল না। তারপর থেকেই রোজ রাতে আমার কানের কাছে মুখ এনে কে যেন বলে, এই বদমাশ, তুই আমার কবরের এলাকা নোংরা করেছিস কেন? তোকে মজা দেখাব। বিশ্রী খনখনে গলায় ধমকায়, ঠেলা মারে। চোখ খুলে দেখি একটা আলখাল্লা পরা মুন্ডু নেই ছায়া ছায়া মতন পাশে দাঁড়িয়ে। আমায় যেন খেয়ে ফেলবে। তারপর আমি হটহট করলেই তোর মাথার কাছের জানালা দিয়ে ভেসে ভেসে চলে যায়।

সত্যি? আমার গলা শুকিয়ে গেছে। ঠান্ডাতে ঘামছি।

রশিদ বলল, ভয় আমি পাই না। তবে রোজ রোজ এসে কন্দকাটাটা ভয় দেখালে বিরক্তি লাগে। তাছাড়া আরও কিছু ফুসফুস করে বলে, বুঝতে পারি না।

আমি বললাম, পিণ্ডি-টিণ্ডি দিলে হয় না?

ধ্যাৎ, মুসলমান ভূতের পিণ্ডি হয়? অনেকটা সময় চুপ থেকে বলল, ভাবছি হরিহর তান্ত্রিকের কাছে গেলে কেমন হয়? শুনেছি ভূতেদের মুঠোর মধ্যে ধরে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলেন। নট ছাড়ুনছুড়ুন নট কিচ্ছু।

তারপর থেকেই ছায়ার মতো রশিদের সঙ্গে ঘুরতে লাগলাম। রাতে ঘুমোতে পারি না। সবসময় মনে হয় রশিদের স্কন্দকাটা প্রেত আমার চারপাশে ঘুরছে। ফিসফিস করছে। সঙ্গে আবার কাঁকড়া খেতে-চাওয়া মুখুজ্যেমশাই। গাছগুলোর দিকে তাকাতে পারি না। পাকা পাকা বেলভর্তি বেলগাছের দিকে তো নয়ই। বোম্বেটে মাস্টারমশাই বলেছে, ওই বেলগাছে বেম্মদত্যি থাকেন। পণ্ডিতমশাই স্কুলকে

বড় ভালোবাসতেন। মরে গিয়েও ছাড়তে পারছেন না। স্বচক্ষে দেখেছেন বেম্মদত্যি পণ্ডিতমশাই সাদা থান আর খড়ম পায়ে খট খট খট করে উঠোনে ঘুরে বেড়ান। যে ওই গাছের বেল খেয়েছে সে তিন রাত পোয়াতে না পোয়াতেই পটল তুলছে। কাকাকেও বলতে পারি না। অঙ্ক মাথায় ঢোকে না। $(a+b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab$, তাও ভুলে যাচ্ছি।

এমন যখন অবস্থা, রশিদ বলল, বুঝলি আজ তান্ত্রিকের কাছে গেছলাম। কথা কইব কি, দেখলেই ভয় লাগে। ইয়া লম্বা এক-মুখ দাড়িগোঁফ। লম্বা লম্বা কটা চুল। চোখ দুটো বনবন করে ঘুরছে। সারা দেহে রক্তচন্দন। গলায় বড় বড় রুদ্রাক্ষের মালা আর বেড়ালের মুন্ডুর হার। হাতে তামার বালা। আশেপাশে কমসে কম দেড় ডজন কালো কুকুর আর বেড়াল! সামনে জ্বলছে আগুন, কে জানে কিসের। বিকট গন্ধ আর ধোঁয়া! সর্বদাই দাঁত কিড়মিড় করছে আর চিৎকার করছে, ভাগ ভাগ সব শকুনের দল। এমন শাস্তি দেব যে বুঝবি। বলছে আর আগুন থেকে গরম ছাই তুলে ছুঁড়ছে। আমি বললাম সব কথা। আমার কথা শুনে হরিহর তান্ত্রিক বলল, হতভাগা, তোকে আর বলতে হবে না। তোর পেছনেই গফুর আলির মুন্ডুহীন প্রেত দাঁড়িয়ে রয়েছে। তুই ওকে অসন্তুষ্ট করেছিস। ও তোর হাতে পানি খেতে চায়।

ভূতে পানি খাবে?

রশিদ বলল, হ্যাঁরে, তাই তো বলল।

আমি রশিদের পিছনের দিকে পিটপিট করে তাকালাম। কে জানে গফুর আলির স্কন্ধকাটা প্রেত দাঁড়িয়ে নেই তো?

রশিদ বলে চলেছে, আমার সব কথা শুনে বলল, ঠিক আছে, বেটাকে জব্দ করব। তার আগে ও যা চাইছে তাই দে। তুই এক গেলাস পানি চা-এর প্যাকেটের রাঙতা দিয়ে মুড়ে পাঁচটা শক্তিগড়ের ল্যাংচা, পাঁচটা বোমা (গোল গোল বোম্বাস্টিক ঝাল আলুর চপ), পাঁচ সিকে পয়সা ব্যাটার কবরে রেখে পাঁচটা ধূপ জ্বেলে বলবি—গফুর সাহেব, জল দিলাম। পান করে তৃপ্ত হও। এই বলে সব জিনিস কবরে রাখবি। যে সে দিন নয়, শনিবার অমাবস্যাতে। তারপর কবরের পাশে শুবি। সকালে উঠে যদি দেখিস একটা কালো বেড়াল আর কুকুর ল্যাংচা আর বোমা খাচ্ছে আর গেলাস রাঙতা মোড়া অথচ জল নেই তখন জানবি ব্যাটা জল খেয়েছে। ব্যস, বাকি যা করার আমি করব। আর তোর ভয় নেই।

না, রশিদের পেছনে কেউ নেই। দেওয়ালে বিরাট একটা মাকড়সা জাল বুনে চলেছে।

শনিবার অমাবস্যা। রাত বারোটা। আমরা দুজনে বৃষ্টির জলের নল বেয়ে নীচে নেমে চললাম কবরস্থানের আর শ্মশানের লাগোয়া অশ্বত্থ গাছতলায় ডেরাবাঁধা হরিহর তান্ত্রিকের বাড়ি। রশিদের মুখ গম্ভীর। হাতে ঠোঙাতে ল্যাংচা, ধূপ, গেলাস আর বোমা। আমি তো রাম রাম সীতারাম সীতারাম মনে মনে বলতে বলতে চলেছি। রশিদ কি বলছে জানি না।

রশিদ তান্ত্রিক হরিহরের যা বর্ণনা দিয়েছিল, সামনে দাঁড়িয়ে দেখলাম তার চেয়ে আরও বেশি ভয়াল ভয়ঙ্কর! তান্ত্রিকের চোখ আগুনের ভাঁটার মতো ঘুরছে। সামনে আগুন জ্বলছে। কে জানে কি পোড়াচ্ছে! বীভৎস তার গন্ধ আর ধোঁয়া। কালো কালো কুকুর আর বেড়াল আমাদের দেখে দাঁত খিঁচিয়ে তেড়ে এল। হরিহর তান্ত্রিক একমুঠো গরম ছাই ওদের দিকে ছুঁড়ে বলল, এও শয়তান, শান্ত হো যা। বলার সঙ্গে সঙ্গে কুকুর-বেড়ালগুলো শান্ত হয়ে গেল। হরিহর তান্ত্রিক রশিদকে দেখে বলল, এসে গেছিস? ভালোই। ব্যাটা তোর পিছনেই তো গলাকাটা গফুর দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওর কাটা মুন্ডুটা পাশেই জিভ বার করে ধুঁকছে।

রশিদ জিনিসগুলো হরিহর তান্ত্রিকের পায়ের কাছে রেখে অর্ধনিমীলিত চোখে ঘুমজড়িত কণ্ঠে বলল, হ্যাঁ।

যা পুকুরে যেয়ে জল আন গেলাস ভর্তি করে। ভয় নেই, গফুরের প্রেত তোর পেছু নেবে না, এখানে থাকবে। রশিদ চলে গেলে হরিহর তান্ত্রিক হঠাৎ বিকটভাবে হেসে একগাদা ছাই আমার দিকে ছুঁড়ে কর্কশ কণ্ঠে বলল, তুই কে রে? তোর ঘাড়ে দেখি বুটজুতো পরা বামুন ভূত! দাঁত খিচুনো বার করছি। ব্যাটার কি লোভ! কাঁকড়া খেতে চায়? আয় ইদিকে, আয় বলছি।

অবস্থা বুঝতেই পারছ তো আমার। প্রায় মরে গেছি। তান্ত্রিক এত কথা জানল কেমন করে?

হরিহর তান্ত্রিক আবার সেই রকম বিকটভাবে হেসে আমার একটা হাত খপ করে ধরে ফিসফিস করে বলল, বামুন প্রেতটা তোকে কিছু বলে? এই রাতে, বাথরুমে, শেওড়া গাছ থেকে? বল, বল, বলে ফেল।....যাঃ বলতে হবে না।

উত্তর দেব কী? কে যেন দৃঢ়মুষ্টিতে আমার গলা চেপে ধরেছে। সত্যই তো হরিহর তান্ত্রিক ভূত ধরে, তা না হলে মুখুজ্যেমশাইকে জানবে কেমন করে?

তারপর হরিহর তান্ত্রিক আমার হাতটা ছেড়ে দিয়ে বলল, যাঃ, তোর ভয় নেই। তবে তুই রোজ শোবার সময় বেটাকে জল দিবি। রোজ মাথার তলায় একটা কাগজে সীতারাম লিখে রাখবি। আর এক গেলাস জল রাখবি। বেটার গতি কোনোদিনই হবে না। পিণ্ডি দিলেও না। লালসা নিয়ে মরেছে যে। হাঃ হাঃ হাঃ। আকাশ-ফাটানো হাসি।

রশিদ এসে গেল। আমি কাঁপতে কাঁপতে ওর সঙ্গে ভগ্নস্তূপের মধ্য দিয়ে একটা ভাঙা কবরের সামনে এলাম। অমাবস্যা, চারিদিক অন্ধকার। বড় বড় গাছগুলো মনে হচ্ছে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নানা রকমের ভূত। হঠাৎ হঠাৎ শেয়াল ডাকছে। কুকুরে কুকুরে লড়াই করছে। পেঁচা ছুটোছুটি করছে। অদূরে শ্মশানে কারা যেন এসেছে। তারা আত্মার সদগতির জন্য বিকটভাবে হরিবোল হরিবোল করছে!

রশিদ নিষ্ঠার সঙ্গে ল্যাংচা, ধূপ, গেলাসভর্তি জল, বোমা, পাঁচ সিকে, ভাঙা কবরের উপর রেখে বলল, গফুর সাহেব, অন্যায় হয়ে গেছে। পানি খেয়ে শান্ত হও। তারপর টসের চায়ের প্যাকেটের মোটা রাঙতাটা দিয়ে জলভর্তি গেলাসের মুখটা মুড়ে কবরের পাশে চোখে হাত দিয়ে শুয়ে বলল, ঘুমো।

আশ্চর্য, ঘুমিয়ে পড়লাম। কত রাত জানি না, হঠাৎ কানে এল বিকট গোঁ গোঁ শব্দ! চোখ খুলে দেখি রশিদ কাটা ছাগলের মতো কবরের পাশে ছটফট করছে। ওকে ঠেলতে লাগলাম, রশিদ, রশিদ! কোথা থেকে একটা কালো কুকুর এসে ল্যাংচা আর বোমাগুলো খেতে লাগল। খাওয়া হলেই অদৃশ্য হয়ে গেল। ধীরে ধীরে রশিদ চোখ খুলে গেলাসটার দিকে তাকিয়ে বলল, পিয়ে গেছে, পানি পিয়ে গেছে।

গেলাসটা শূন্য! কে খেল? রাঙতা তো অটুট!

ভালো করে সকাল হয়নি। আমি আর রশিদ দৌড়তে দৌড়তে বোর্ডিংয়ে ফিরলাম। সকলে তখনো ঘুমোচ্ছে।

বিশ্বাস করো তারপর থেকে সব নর্মাল। রশিদের কানের কাছে কেউ আর ফিসফাস করে না। ছায়াও সে দেখে না। আশ্চর্য! আমারও ভূতের ভয় কেটে গেল সেই থেকে।

আষাঢ় ১৪০১

২৫ বছর পরে

গৌরী দে

একগাদা চিঠির মধ্যে চোখে পড়ল একটা পুরোনো খাম। অন্তত সাত-আট বছর আগের তৈরি তো বটেই। খামটার গায়ে কাঁপা কাঁপা হাতে লেখা আমার নাম দেখে রীতিমতো কৌতূহলী হয়ে উঠলুম। তাড়াতাড়ি খামটা খুলে চিঠি পড়তে শুরু করলুম।

কাগজটাও ময়লা। নীচে নাম লেখা 'সুমিত চন্দ্র'। খুব পরিচিত মনে হল নামটা কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারলুম না, সুমিত চন্দ্রের সঙ্গে আমার কবে কোথায় পরিচয় হয়েছিল। ভাবলুম চিঠিটা পড়ি—যদি বোঝা যায়।

"ভাই মনোজিৎ,

নির্বান্ধব অবস্থায় পড়ে আছি বছরের পর বছর। আমি খুব অসুস্থ। সব সময় মাথার যন্ত্রণা হয়। শিমুলতলার এই বিশাল বাড়িটায় থাকার মধ্যে শুধু আমি আর আমার বোন। তাও বোন মৃত্যুশয্যায়। আমার পাশে এই দুর্দিনে কারোর থাকা দরকার। কিন্তু কে থাকবে? হঠাৎ তোমার কথা মনে পড়ে গেল। চিরকালই তুমি ডানপিটে—ভয়ডর বলে তোমার কিছু নেই। তুমি এই সময় আমার পাশে থাকলে আমি অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করব। আমাকে চিনতে পেরেছ তো? আমি...মোটা..."

এইটুকু পড়েই চিনতে পারলুম সুমিতকে। আমার স্কুলের বন্ধু। আমাদের দুজনের মধ্যে খুব ভাব ছিল। সুমিত ছিল ফর্সা গোলগাল নাদুসনুদুস ভালোমানুষ। ওকে আমরা বন্ধুরা নাম দিয়েছিলুম "মোটা"। সেই নামেই ও আমাদের কাছে পরিচিত ছিল বলেই সুমিত নামটা চট্ করে মনে করতে পারিনি।

খামটা ভালো করে দেখতে অবাক হয়ে গেলুম। চিঠিটা শিমুলতলা থেকে পোস্ট করা হয়েছে এক বছর আগে। খামের দামটা বেড়েছে। কিন্তু সেভাবে স্ট্যাম্প দেওয়া হয়নি। ভাবলুম—তাই হয়তো পড়েছিল ডাকবিভাগে। তারপর দয়া করে কেউ সেটা পাঠিয়েছে। এতদিনে সুমিতের কি অবস্থা হল কে জানে?

ঠিক করলুম কালই রওনা হব। ক্ষতি কি! বন্ধুর উপকারও করা হবে, বেড়ানোও হবে। ক'দিনের ছুটি নিয়ে যাত্রা করলুম শিমুলতলার দিকে। পৌঁছতে বিকেল হয়ে গেল। চিঠির তলায় ঠিকানা ছিল, স্টেশনে নেমে একটা রিকশাওলাকে ঠিকানাটা বলতেই সে কেমন করে যেন আমার দিকে তাকাল। তারপর বলল, ঐ যে বাবু অটো দাঁড়িয়ে আছে ওদের বলুন।

অগত্যা অটো ধরে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছলুম যখন তখন প্রায় সন্ধে হয় হয়। অটো থেকে নেমে সুটকেসটা হাতে নিয়ে ভাড়া চুকিয়ে দিলুম। অটো চলে গেল। আমি দেখলুম আমার সামনে এক বিশাল বাড়ি। বাড়ির চারধারে পাথর, মরা গাছ, শুকনো কুয়ো, মাঝখানটা একটা টিপির মতো উঁচু তার ওপর বাড়িটা। কি রং ছিল বাড়িটার এককালে আজ আর বোঝা যায় না। বাইরের অন্ধকার নেমে আসছে বাড়িটার ওপর, ছাতের পাঁচিলে বিরাট ফাটল। তার গা চিরে বিশাল অশ্বত্থ গাছের শিকড় নেমেছে। মনে হচ্ছে বুঝিবা ভেঙে পড়ল, গা ছমছম করতে লাগল। এ কোথায় এলুম! নাকে ভেসে এল একটা অশুভ রহস্যময় গন্ধ।

একবার মনে করলুম ফিরে যাই। কিন্তু ছোটবেলা থেকে সাহসী বলে আমার একটা সুনাম ছিল—সেই কথা মনে পড়তেই দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে গেলুম বাড়িটার দিকে। সদর দরজা ভেজানো ছিল, হাত দিয়ে খুলতে যাব, নিজে থেকেই খুলে গেল। সামনে একটা লোক দাঁড়িয়ে। বোধহয় কাজের লোক। বললুম—সুমিত আছে? আমি ওর বন্ধু।

লোকটা স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইল। আমার সুটকেসটা তুলে নিয়ে এগিয়ে চলল। ওর পিছু নিলাম। মনে হল লোকটা বোবা। দালানের পর দালান, ঘর ফেলে এগিয়ে চলেছি তো চলেছি। শেষে একটা প্রায় অন্ধকার ঘরে ঢুকে পড়ল লোকটা। আমিও ঢুকলুম। ইলেকট্রিকের আলো নেই। মোমবাতিও জ্বলেনি। দেখলুম একটা ইজিচেয়ারের ওপর একটা মানুষের দেহ। এতক্ষণে চোখটা অন্ধকারে সয়ে গেছে—দেখলুম চেয়ারের গায়ে হেলান দিয়ে শুয়ে আছে একটা কঙ্কালসার দেহ। এই কি সুমিত? সেই কঙ্কালসার দেহে ঠোঁটটা নড়ে উঠল। বলল—মনোজিৎ এসেছ?

২৫ বছর আগে দেখা সেই সুমিতের সঙ্গে এই সুমিতের কত তফাৎ! সমস্ত চুল উঠে গেছে, চোখের কোল ঢুকে গেছে, সেই ফুলো গাল ভেঙে ঢুকে গেছে গর্ত তৈরি করে। বললুম—সুমিত? এ তোর কি চেহারা হয়েছে রে?

সুমিত হাসল। দেখলুম সে হাসিতে দাঁতহীন সুমিত আরও বীভৎস হয়ে উঠল। বলল—আজ দশ বছর ধরে ভুগছি। মাথার যন্ত্রণায় পাগল হতে বসেছি।

বললুম—চিকিৎসা করাসনি?

সুমিত বলল—করিয়েছি—কোনো কাজ হয়নি।

কলকাতায় আমার কাছে চলে গেলি না কেন?

পারিনি বোনের জন্যে। বিয়ের পরই নিঃসন্তান অবস্থায় সে ফিরে আসে। তারপরই কঠিন রোগে পড়ে। তাকে একা ফেলে যেতে পারিনি।

বললাম—কোথায় সে? কেমন আছে?

সুমিতের গলাটা কেঁপে উঠল, বলল—পাশের ঘরে। ঘণ্টাখানেক আগে তার মৃত্যু হয়েছে।

গায়ের মধ্যে শিরশির করে উঠল। এই প্রায় অন্ধকার ঘরে একটা মৃতপ্রায় মানুষ আর পাশের ঘরে একটা মৃতদেহ—কি করে রাত কাটাব? বললুম—তোমাদের হ্যারিকেন নেই?

ও বলল—জোর আলো আমি সহ্য করতে পারি না, চোখে যন্ত্রণা হয়। ঐ টেবিলের ওপর একটা সরু মোমবাতি আর দেশলাই আছে, একটু কষ্ট করে জ্বেলে নাও।

পেছন ফিরে লোকটাকে খুঁজলুম। সুমিত বলল—চলে গেছে। ওরা কেউ রাতে থাকে না।

উঠে গিয়ে ঘরের কোণে সরু মোমবাতিটা জ্বাললুম। ঘরটায় সামান্য আলো হল। চোখ চলে গেল পাশের ঘরের দিকে। সেই ক্ষীণ আলোতে পরিষ্কার দেখা গেল পাশের ঘরের খাটের ওপর সাদা চাদর ঢাকা একটা দেহ।

বললুম—সৎকার করতে হবে তো?

সুমিত বলল—কাল সকালের আগে হবে না। এত রাতে লোকজন পাব কোথায়? তুমি যাও, হাত-মুখ ধুয়ে কাপড়জামা ছেড়ে ঐ টেবিলে খাবার ঢাকা আছে, খেয়ে নাও।

বললুম—তুই খাবি না?

ও বলল—আমার হজম হয় না বলে ডাক্তার বিকেলের মধ্যে খেয়ে নিতে বলেছে। আমার খাওয়া হয়ে গেছে। তুমি খেয়ে নাও।

সব কাজ সেরে খাটে এসে বসলুম। সুমিতও এসে বসেছে খাটে। কিন্তু ওর সঙ্গে কথা বলব কি, সমস্তক্ষণ চোখটা ঐ পাশের ঘরে চলে যাচ্ছে। আমার সামনেই মধ্যিখানের দরজা। তাই সোজাসুজি ঐ দিকেই চোখটা আটকে যাচ্ছে। প্রচণ্ড অস্বস্তি হতে লাগল। বুঝতে পারছি না কি করব, এমন সময় সুমিত বলল—দেখো আমরা এ ঘরে কথা বলছি—ও ঘরে সুনীতির বোধহয় শান্তিভঙ্গ হচ্ছে। এক কাজ করি, দরজাটায় একটা তালা দিয়ে দি।

অবাক হয়ে বললুম, তালা কেন?

সুমিত বলল—ওটা ভালো বন্ধ হয় না। বহুদিনের দরজা তো, ফাঁক হয়ে থাকবে। একটা তালা লাগিয়ে দিলে খুলে যাবে না।

সত্যি বলতে কি খুব খুশি হলুম। মনে মনে সুমিতকে ধন্যবাদও দিলুম। সুমিত উঠল, একটা

বিরাট তালা দিল দরজাটা বন্ধ করে। চাবিটা এনে রাখল বালিশের তলায়। কিন্তু দরজাটা বেশ ফাঁক হয়ে রইল। কি করা যাবে। পুরোনো দরজা। মনটাকে অন্যমনস্ক করার চেষ্টা করতে লাগলুম। এমন সময় খস্‌খস্‌ শব্দ। কানখাড়া করে শুনল সুমিত। কে যেন আসছে মনে হল।

সুমিত তড়িৎবেগে উঠে দাঁড়াল খাট থেকে নেমে। পাশের ঘরের দিকে দৃষ্টি পড়তে আমার হৃৎপিণ্ড বন্ধ হবার উপক্রম ঘটল। পরিষ্কার দেখলুম—সাদা চাদর ঢাকা সুনীতির মৃতদেহটা খুব ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে বন্ধ দরজার দিকে। সুমিত চিৎকার করে বলে উঠল—এ তো সুনীতির পায়ের শব্দ। এ শব্দ আমি চিনি। সে আসছে। আমি জানতুম সে আসবে, তাই তো দরজাটা বন্ধ করে রেখেছি।

আমার মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছে না। আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি অন্ধকারের মধ্যে সাদা চাদর ঢাকা দেহটা দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে। সুমিত পাগলের মতো ছুটে বেড়াচ্ছে ঘরের মধ্যে। বলছে—সুনীতি, কালই আমি তোমার সৎকার করব বোন—তুমি একটু শান্ত হও।

আমি খাটের পেছনে নেমে দাঁড়িয়েছি। পালাতে চাইছি, পা দুটো আটকে গেছে ভারী হয়ে, নাড়াতে পারছি না। সুনীতি ক্রমাগত দরজা নাড়াচ্ছে। পরিষ্কার দেখলুম দরজার তালাটা ভেঙে পড়ল। হুট করে দরজা খুলে গেল। দমকা বাতাসে নিভন্ত মোমবাতি দপদপ করে নিভে গেল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে সুনীতির চাদরে ঢাকা শবটা ঝাঁপিয়ে পড়ল সুমিতের ওপর। একটা চিৎকার। তারপর সব শেষ।

ততক্ষণে ঘরের দরজা খুলে আমি ছুটতে আরম্ভ করেছি। পাগলের মতো ছুটছি তো ছুটছি। কতক্ষণ ছুটেছি জানি না। দিনের আলো চোখে পড়তে জ্ঞান এল। দেখলুম একটা বড় মাঠের মধ্যে আমি একা শুয়ে আছি। বুঝতে পারলুম এখানেই কালকে অটোটা আমাকে নামিয়ে দিয়েছিল। পাশে সুটকেসটাও পড়ে আছে। সামনের দিকে তাকিয়ে দেখি সেই বিশাল বাড়িটা আর নেই—তার বদলে পড়ে আছে ইট-কাঠ-পাথরের বিরাট ধ্বংসস্তূপ।

আশ্বিন ১৪০৪

রহস্যময় ঘোড়ার গাড়ি

বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

নিস্তব্ধ রাত। ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে অপেক্ষা করছি আমরা চারজন। অর্থাৎ আমি, আমার মামাতো ভাই বসন্ত, আমাদেরই প্রিয় বন্ধু শিবু আর আমাদের পথপ্রদর্শক কাজোড়া গ্রামের ছেলে মহেশ। সকালবেলাতেই রাতে থাকার জন্য জায়গা ঠিক করে গিয়েছিলাম। জায়গাটা হল ঐ গ্রামেরই একসময়ের জমিদার বিশ্বম্ভর মল্লিকের অতিথিশালা। জমিদারের প্রাসাদ কবেই ভগ্নস্তূপে পরিণত হয়েছে। সেই ভগ্নস্তূপের ধারে-কাছে কেউ আসে না। কারণ সকলেরই ধারণা রাতের অন্ধকারে ভেঙে পড়া প্রাসাদ জীবন্ত হয়ে ওঠে, জ্বলে ওঠে সারা বাড়ির আলো। দূরের গ্রামে বসেও দেখা যায় সেই আলোর বন্যা।

হাড়-কাঁপানো শীত ও সেই সঙ্গে টুপটাপ বৃষ্টির মধ্যে জমিদারের অতিথিশালায় আজ আমরা অতিথি। সন্ধে হবার আগেই তৈরি হয়ে এখানে ঢুকেছি। জোনাকি, ঝিঁঝিঁপোকা আর আমরা চারজন ছাড়া এখনো পর্যন্ত আর কারো অস্তিত্ব টের পাইনি। দূরের কোনো পেটা-ঘড়িতে রাত একটা বাজার সংকেত ছড়িয়ে পড়ল। নড়েচড়ে বসলাম আমরা। জমিদারবাড়ির সেই সাদা ঘোড়ায় টানা গাড়িটাকে কি দেখতে পাব এবার!

দিনটা ছিল রবিবার। মামা বাড়ি থাকায় সকলেই তাঁর ভয়ে দুপুরটা ঘুমিয়ে কাটিয়েছি। প্রতিবারের মতো এবারও ছুটি পড়তেই রানিগঞ্জে মামার বাড়িতে এসে হাজির হয়েছি। সমবয়সি দুই মামাতো ভাই বসন্ত, হেমন্ত আর ওদের বন্ধু শিবুর টানেই আমার বারবার রানিগঞ্জে আসা। যাই হোক, দুপুরে ঘুমোলে রাতে আমার ঘুম আসতে চায় না। সবাই ঘুমোচ্ছে। আমিই শুধু জেগে ছটফট করছি। এমন সময় মনে হল আমাদের বাড়ির সামনে যেন একটা ঘোড়ার গাড়ি এসে দাঁড়াল। রাস্তার দিকে ঘর, তাই বিছানা থেকে উঠে জানালা দিয়ে দেখবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু অন্ধকারের মধ্যে কিছুই দেখতে পেলাম না বলে আবার যখন বিছানার দিকে এগোচ্ছি, শুনতে পেলাম কে যেন দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে। আমিই সাড়া দিলাম, কে? বাইরে থেকে একজন বলল, এটা কি ডাঃ হরিহর সামন্তর বাড়ি? বললাম, হ্যাঁ। সেই একজন উত্তর দিল, একটু ডেকে দেবেন? আমরা কাজোড়া থেকে আসছি। এবার মামার গলা শুনলাম। দেখলাম হ্যারিকেন হাতে তিনি দরজার বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন।

মামা বললেন, আমি ডাঃ হরিহর সামন্ত। কী ব্যাপার?

লোকটা বলল, কাজোড়ার জমিদার ভীষণ অসুস্থ। আমি গাড়ি নিয়ে এসেছি। আপনাকে এখুনি একবার যেতে হবে ডাক্তারবাবু।

মামা বললেন, সকালে গেলে চলবে না?

না, ডাক্তারবাবু, এখুনি চলুন একবার। আমরা আপনাকে পৌঁছে দিয়ে যাব।

হ্যারিকেনের আলোয় নজরে পড়ল দুটো ধবধবে সাদা ঘোড়ায় টানা একটা দারুণ সুন্দর গাড়ি! কিন্তু যে লোকটা কথা বলছিল তাকে দেখতে পেলাম না। একটু পরেই গাড়িটা চলতে শুরু করল। মামীমার দরজা দেওয়া ও দুর্গা দুর্গা শুনে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লাম।

পরদিন ঘুম ভাঙল একটু বেলায়। মামা তখনও ফেরেননি। মামীমা খুব চিন্তা করছেন। সকাল-দুপুর-বিকেল গড়িয়ে রাত হয়ে গেল, মামা ফিরলেন না। এইভাবে সাত দিন কেটে গেল। পুলিশে খবর দেওয়া হল। তারাও পারল না কোনো হদিস করতে। মামীমা প্রায় পাগলের মতো হয়ে গেলেন।

তাঁর অবস্থা দেখে শেষ পর্যন্ত আমি, বসন্ত আর শিবু রওনা হলাম কাজোড়া গ্রামের দিকে। হেমন্তকে রেখে গেলাম মামীমার কাছে।

কাজোড়ায় পৌঁছে বাস থেকে নেমে একটা চায়ের দোকানে ঢুকলাম। শিবু বলল, তোরা এখানে অপেক্ষা কর, আমি আসছি। প্রায় ঘণ্টা দুই পর শিবু ফিরল সঙ্গে আর একটি ছেলেকে নিয়ে। বলল, এর নাম মহেশ। এখানকারই ছেলে। আমার সঙ্গে আলাপ আছে। আপাতত আমরা যাব এদেরই বাড়িতে। মনে হচ্ছে এরা আমাদের একটা কিছু রাস্তা দেখাতে পারবে।

মহেশদের বাড়ির দরজাতেই দাঁড়িয়েছিলেন এক বৃদ্ধ। মহেশ বলল, ইনি আমার দাদু। আমাদের গ্রামের সবকিছু এঁর জানা। মহেশের দাদুকে প্রণাম করে আমরা ভেতরের একটা ঘরে গিয়ে বসলাম। দাদু বললেন, আমি সবই শুনেছি। ব্যাপারটা সত্যিই অদ্ভুত। তোমরা যে রকম ঘোড়ার গাড়ির কথা বলছ সেই রকম একটা গাড়ি ছিল এখানকার জমিদার বিশ্বম্ভর মল্লিকের। এই গ্রামের শেষেই ছিল ওঁদের বিরাট দুই মহলা বাড়ি। খুব বড়সড় জমিদার না হলেও একসময় তাঁদের দাপট ছিল খুব। কিন্তু হঠাৎই একদিন ঐ জমিদারবাড়িতে আগুন লাগে। সেই আগুনে সব পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। মনুষ্যজন থেকে গরু-ঘোড়া অবধি সব শেষ। শুধু বারমহলের অতিথিশালার কিছুটা কিভাবে রক্ষা পায়। পরে শুনেছি নিজেদের পরিবারের মধ্যে রেষারেষির কারণে ওঁদের এক আত্মীয়ই নাকি লোক লাগিয়ে কাণ্ডটা ঘটিয়েছিলেন। তা তিনি নিজেও বোধহয় রক্ষা পাননি। সেই থেকে জমিদার বাড়ি শুধু একটা ধ্বংসস্তূপ। দিনের বেলাতেও কেউ ধারে-কাছে যায় না। তবে গভীর রাতে গাঁয়ের অনেকেই ঘোড়ার গাড়ির আওয়াজ পেয়েছে। কেউ কেউ আবার বলে, রাত বাড়লেই ঝাড়লণ্ঠনগুলো জ্বলতে দেখা যায়, জমিদারবাড়ি জীবন্ত হয়ে ওঠে। আমি অবশ্য কোনোদিন কিছু দেখিনি।

আমি বললাম, তাহলে কি আমি যে গাড়িটা দেখেছি সেটা ভুতুড়ে? আর এত লোক থাকতে বেছে বেছে মামাকেই বা ধরে নিয়ে এল কি জন্যে?

মহেশের দাদু বললেন, বোধহয় তোমার মামা ডাক্তার, তাই। পুড়ে গেলে তো ডাক্তারকেই লোকে আগে ডাকে। যাই হোক, তোমরা বিশ্রাম করো। ওদিককার পথঘাট সবই মহেশ চেনে এবং জানে। কাল সকালে আগে গিয়ে জায়গাটা দেখে এসো। তারপর ঠিক করা যাবে কি করা যায় না যায়।

সেই মতোই আজকের অভিযান। বৃষ্টি এখনও থামেনি। আমরা চারজন আমাদের চোখ-কানকে সজাগ রেখে অপেক্ষায় রইলাম। হঠাৎ কোথা থেকে একটা ঝোড়ো হাওয়া এসে যেন আছড়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে চোখের সামনে ঘটতে থাকল সব অবিশ্বাস্য ব্যাপার। আলোয় আলো চারদিক। ভগ্নস্তূপ থেকে উঠে এসেছে সেই আগের জমিদারবাড়ি। আমরা চারজনই যেন পাথর হয়ে গেছি। বৃষ্টি-বাতাস আর গাছপালার উন্মত্ত দাপাদাপির মধ্যে মনে হতে লাগল আজই হয়তো অতিথিশালার ছাদ ভেঙে আমরাও হারিয়ে যাব চিরকালের মতো। কিন্তু ভয় পেলে চলবে না। জানতেই হবে মামা কোথায় গেলেন।

অতিথিশালার কাছেই ঘোড়ার খুরের আওয়াজ শোনা গেল। একটু পরেই অতিথিশালার গা ঘেঁষে ছুটে বেরিয়ে গেল একটা ঘোড়ার গাড়ি। গাড়িটা যেন জমিদারবাড়ির আলোর বন্যার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সাদা ঘোড়া দুটোকে এক ঝলকের জন্য স্পষ্ট দেখা গেল। জীবন্ত জমিদারবাড়ির কোনো আওয়াজ আমাদের কানে পৌঁছাচ্ছে না, কেবল দেখতে পাচ্ছি বাড়ির মধ্যে অনেক ছায়ামূর্তি ঘোরাফেরা করছে। ঝড়বৃষ্টি এখন থেমে গেছে। আমাদের চারপাশের অন্ধকার আরও গাঢ় হয়ে এসেছে। থমথমে পরিবেশে কর্কশ চিৎকার করতে করতে একটা পেঁচা উড়ে গেল অতিথিশালার মাথার ওপর দিয়ে। আপ্রাণ চেষ্টায় নিজেদের স্থির রেখে বসে রইলাম ভোরের অপেক্ষায়।

ভোরের আলো ফুটতেই গাছে গাছে পাখি ডেকে উঠল। আমরাও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলাম। অস্পষ্ট পাহাড়ের মতো অদূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে জমিদারবাড়ি। কোথায় সেই আলোর রোশনাই, কোথায় মানুষজন, কোথায় বা সেই ঘোড়ার গাড়ি! প্রাণের চিহ্নমাত্র নেই কোথাও। অতিথিশালা থেকে বাইরেই চমকে উঠলাম আমরা, ভিজে মাটিতে ঘোড়ার খুরের ও গাড়ির চাকার দাগ স্পষ্ট!

ফিরে এলাম মহেশের বাড়িতে। দাদুকে জানালাম রাতে যা দেখেছি। ঠিক হল, সে দিনটা বিশ্রাম নিয়ে পরের দিন আবার আমরা যাব। এবার আরও কয়েকজনকে সঙ্গে নেবার পরামর্শ দিলেন দাদু। তাদের হাতে থাকবে মশাল, প্রয়োজনবোধে জ্বালাবে। এরা থাকবে অতিথিশালায়। আমরা থাকব জমিদারবাড়ির গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে-থাকা একটা পুরোনো বটগাছে। মহেশ আসবার সময় গাছটা দেখে নিয়েছে। আমাদের গাছের ওপর থাকবার অনুমতি দিয়ে দাদু বললেন, গ্রামের লোকজনকে নিয়ে তৈরি থাকব। মশালের আলো দেখলেই জমিদারবাড়ির সামনে হাজির হব।

সন্ধের আগেই বেরিয়ে পড়লাম। আমাদের সঙ্গে গ্রামেরই আরও চারজন লোক যোগ দিয়েছে। সকলেই সাহসী। তাই ব্যাপারটাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়ে এগিয়ে চললাম মাঠের মধ্যে দিয়ে। অতিথিশালায় পৌঁছে গ্রামের চারজনকে সেখানে রেখে আমি, বসন্ত, শিবু আর মহেশ একে একে উঠে পড়লাম বটগাছে। মহেশের নির্দেশমতো গাছের ডালের সঙ্গে দড়ি দিয়ে নিজেদের বেঁধে ফেললাম যাতে আচমকা না পড়ে যাই। ঝড়বৃষ্টি কিছুই আজ নেই। কিন্তু ঠান্ডাটা যেন আরও একটু বেড়েছে। চুপচাপ বসে আছি। কারুর মুখে কোনো কথা নেই। একটা অজানা আশঙ্কায় সকলেই সজাগ।

রাত যত গড়ায় আমাদের অস্বস্তি তত বাড়তে থাকে। কারা যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে আমাদের চারপাশে। তাদের উপস্থিতি প্রতি মুহূর্তে অনুভব করতে পারছি। আগের দিনের মতো পেটা-ঘড়িতে একটা বাজতেই জ্বলে উঠল জমিদারবাড়ির সব আলো। সঙ্গে সঙ্গে কানে এল ঘোড়ার চিঁ-হি-হি ডাক। দুটো ঘোড়া ছুটে আসছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই বটগাছের তলা দিয়ে ঘোড়ায় টানা সুন্দর গাড়িটা বাড়ির ভেতর ঢুকে গেল। গাছে বসে বাড়ির ভেতরটা আর সামনের ঘরগুলো দেখা যাচ্ছিল। দেখলাম গাড়িটা গিয়ে উঠোনে দাঁড়াল। চালক গাড়ির ওপর বসে। ভেতর থেকে ভেসে আসছে গান-বাজনার আওয়াজ, লোকজনের টুকরো-টাকরা কথাবার্তা। আচমকা সব শব্দ ছাপিয়ে কেউ যেন জোরে কেঁদে উঠল। চমকে উঠলাম আমরা চারজন। এ তো জ্যান্ত মানুষের আর্তনাদ! পরমুহূর্তে নিস্তব্ধ রাতের সমস্ত স্তব্ধতাকে তছনছ করে দিয়ে ঘোড়ার গাড়িটা উল্কার মতো কোথায় যেন চলে গেল! আবার কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে এসে আগের জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ল।

স্পষ্ট দেখলাম, গাড়ি থেকে একটা বীভৎস মুখ বেরিয়ে এসে ঢুকে গেল বাড়ির ভেতরে। কান্নার আওয়াজ ও আর্তনাদ আবার ছড়িয়ে পড়ল চারপাশে। এখানের বাতাস যেন ক্রমশই ভারী হয়ে উঠছে। আমি আস্তে করে সকলকে বললাম, সাবধানে থাকো।

সামনের যে জানলাটা দিয়ে ভেতরটা দেখা যাচ্ছিল, হঠাৎ দেখলাম সেই জানলা জুড়ে একটা মূর্তি দাঁড়িয়ে রয়েছে। আলো-অন্ধকারের মধ্যে তাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম না। কিন্তু জানলা থেকে সরে গিয়ে যখন ঝাড়লণ্ঠনের আলোর তলায় দাঁড়াল তখন তার বীভৎস কালো মুখটা নজরে পড়তেই চমকে উঠলাম। এমন বীভৎস মুখ আর চেহারা আগে কখনো দেখিনি। এর পর ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল আরও কয়েকটা মূর্তি। প্রত্যেকের দেহ যেন আগুনে ঝলসানো। মুখগুলো পুড়ে ভয়ঙ্কর হয়ে গেছে। তারা লম্বা লম্বা হাত বের করে ঘরে দাঁড়ানো মূর্তিটাকে জোর করে সামনের একটা বিরাট খাটে শুইয়ে দিয়ে তার ওপরে চাপিয়ে দিল কয়েকটা পুড়ে যাওয়া বিছানার চাদর। খাটে শুয়ে-থাকা মূর্তিটা ছটফট করে হাত-পা ছুঁড়তে লাগল। তার ঝলসানো সাদা সাদা হাত-পা দেখে আমি ঐ ঠান্ডার মধ্যেও ঘামতে আরম্ভ করলাম। বাকি তিনজনের অবস্থাও তথৈবচ। একে অপরের হাত শক্ত করে ধরে মনের শক্তি বাড়াবার চেষ্টা করছি। ওই ঘরের প্রত্যেকটা মূর্তির চেহারা একই ধরনের। তারপর আমাদের সমস্ত চিন্তা-ভাবনাকে চুরমার করে দিয়ে সব মূর্তিগুলো হাত-পা নেড়ে নিজেদের মধ্যে কি যেন বলাবলি করতে লাগল। আমরা কিছুই বুঝতে পারলাম না। ভয়াবহ এক অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়ে আমরা যখন দিশাহারা, ঠিক সেই সময় চোখের সামনে এমন একটা কাণ্ড ঘটল যে ভয়ে আতঙ্কে সকলেই সকলকে জড়িয়ে ধরে কাঁপতে লাগলাম। গাছের সঙ্গে নিজেদের বেঁধে না রাখলে হয়তো পড়েই যেতাম। ঘরের প্রত্যেকটা মূর্তিই কঙ্কাল হয়ে গেছে।

এতগুলো কঙ্কালকে একসঙ্গে দেখে বসন্ত অজ্ঞান হয়ে গেল। পিঠে বাঁধা জলের বোতল থেকে

জল নিয়ে মুখে-চোখে ছিটিয়ে কোনোরকমে ওকে সুস্থ করলাম। এদিকে জমিদারবাড়ির কঙ্কাল বাহিনী তখন জানলার ধারে চলে এসে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই বেশ কয়েকটা মাংসহীন হাত বেরিয়ে এসে আমাদের বটগাছটাকে ধাক্কা মারতে লাগল। ভাগ্যিস গাছের সঙ্গে নিজেদের বেঁধে রেখেছিলাম। বুঝতে অসুবিধে হল না আমাদের উপস্থিতি ওরা টের পেয়েছে। এর পর কি হল আর জানি না।

যখন জ্ঞান হল দেখলাম, আমি জমিদারবাড়ির সামনের মাঠে শুয়ে আছি। অনেক লোক আমাকে ঘিরে। পরে শুনেছিলাম আমাদের সকলের চিৎকার শুনে অতিথিশালা থেকে অন্য চারজন লোক মশাল জ্বালিয়ে ছুটে এসে আমাদের উদ্ধার করেছিল। মশালের আলো দেখে মহেশের দাদুও ছুটে এসেছিলেন, সঙ্গে গ্রামের শ' দুয়েক লোক। তারা জমিদারবাড়ি ঘিরে ফেলে চার-পাঁচজন লোককে উদ্ধার করে। তাঁদের মধ্যে আমার মামাও ছিলেন। তবে ভৌতিক ব্যাপার-স্যাপার কিছুই উদ্ধারকারীরা দেখতে পায়নি। যাঁদের উদ্ধার করা হল তাঁরা সকলেই আমার মামার মতো ডাক্তার। নিশুতি রাতে রোগীর বাড়ি থেকে ডাক পেয়ে ছুটে এসেছিলেন জমিদারবাড়িতে।

সেদিন মহেশের দাদু, মহেশ ও গ্রামের লোকেরা আমাদের জন্য যা করেছিলেন তার তুলনা নেই। সকলকে ধন্যবাদ আর কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সেইদিনই মামাকে নিয়ে ফিরে এলাম রানিগঞ্জে। অনাহারে, অনিদ্রায়, আতঙ্কে মামা তখন মানসিকভাবে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত। কখনো ফ্যালফ্যাল করে সকলকে দেখছেন, কখনো চিৎকার করে কাঁদছেন। প্রায় উন্মাদ।

আমার ছুটি শেষ হয়ে আসছে। তাই বাধ্য হয়ে কলকাতায় ফিরতে হল। মাঝে মাঝে বসন্তর চিঠি মামার ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠার খবর বয়ে আনে। খুশি হই। কিন্তু সেই এক-ঘর কঙ্কালের কথা মনে হলেই কলকাতার বাড়িতে বসেও ঘেমে উঠি।

আশ্বিন ১৪০১

কথার দাম

কমল লাহিড়ী

কয়েকদিন গুমোট গরমের পর আজ সকাল থেকেই আকাশের মুখ ভার। ভোররাত্রিতে ঝিরঝির করে একটু বৃষ্টিও হয়েছে। পলাশ কাল পড়ার ঘরে শুয়েছিল। মুন্নি, বাবা আর মা নীচের ঘরে। শিলং থেকে বড়দা, বউদি আর ভাইপো গুড্ডু এসেছে, তারা আর একটা ঘরে।

ভোরেই ঘুম ভেঙেছে পলাশের। পরীক্ষা শেষ হওয়ায় এখন পড়াশোনাতে একটু ঢিলেমি ভাব। কোচিং সেন্টারও কয়েকদিন হল বন্ধ। টুকাই, অনিন্দ্য আর প্রভাস—ওরাও খুশিমনে খেলাধুলো নিয়ে মেতে আছে। বিছানা থেকে নেমে সিঁড়ির কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে পলাশ। কাল ছাদের পাশে জড়ো করে রাখা কাগজের বান্ডিল থেকে কয়েকটা লেখার পাতা ঝড়ো হাওয়ায় উড়ে এসে এখানে পড়ে আছে। পাতাগুলো কুড়িয়ে জায়গামতো রেখে বাথরুমের দিকে গেল পলাশ।

মা চায়ের ব্যবস্থা করছেন। বড়দা গুড্ডুকে নিয়ে ব্যস্ত। বাবা এখনও ওঠেননি। চা দিতে এসে বৌদি বলে, পলাশ, তোমার পড়াশোনা কেমন চলছে?

ভালোই। এই তো পরীক্ষা শেষ হল।

সামনের বছরই তো ফাইনাল!

হ্যাঁ। কী যে ভয় করছে বৌদি!

দূর বোকা, ভয় কি? মন দিয়ে পড়লে পরীক্ষা একটা ব্যাপারই নয়। পলাশের মাথায় হাত বুলিয়ে বৌদি হাসতে হাসতে বলে।

সকালের চা-পান পর্ব আর জলখাবার মিটে যেতে গুড্ডুকে নিয়ে পলাশ বেরোল। বৃষ্টি না পড়লেও আকাশটা মেঘলা হয়েই আছে। টুকাই বাড়িতে ছিল না। বাজারে গেছে। অনিন্দ্যর বাড়িতেই গেল পলাশ। পাশেই প্রভাসের বাড়ি।

পলাশকে দেখে অনিন্দ্য খুব খুশি। বিশেষ করে গুড্ডুর আধ আধ কথা শুনে সবাই হেসে গড়াগড়ি। অনিন্দ্যর বোন মুনমুন তো কোল থেকে নামতেই চায় না। একটু পরে প্রভাসও এসে গেল। গল্প-আড্ডার একফাঁকে পলাশ বলে, অনিন্দ্য, আমার ওয়ার্ক এডুকেশনের খাতাটা কিন্তু আজ ফেরত দিবি। অজিত স্যারের সইটা যদি পারিস করিয়ে নিস।

হ্যাঁ, মনে আছে আমার। অজিত স্যারকে কাল বলেও রেখেছি। আমার আর তোর দুজনার খাতাই স্যার সই করে দেবেন বলেছেন। অনিন্দ্য জবাব দেয়।

পলাশ জানে অনিন্দ্যর কথার দাম। যত অসুবিধেই হোক, বন্ধু বা কাউকে কোনো কথা দিলে সেটা ও রাখবেই রাখবে। কয়েকবার প্রমাণও পেয়েছে।

পাঁপড় ভাজা আর চা খেয়ে গুড্ডুকে নিয়ে বাড়ি ফিরে এল পলাশ। বাজার হয়ে গেছে। বড়দার অনারে আজ রান্নার এলাহি ব্যবস্থা। অনেকদিন পরে বড়দা-বৌদি এসেছে। শিলং-এ তো তেমন কিছুই পাওয়া যায় না। আর দামও অসম্ভব। মা তাই বড়দা যা-যা খেতে ভালোবাসে সবই রান্নার ব্যবস্থা করছেন।

দুপুরে খাওয়ার পর বড়দা আর বৌদির সঙ্গে ক্যারাম খেলে বেশ কিছুটা সময় কাটল। দুপুরের পর থেকে শুরু হল বৃষ্টি। ছিচকাঁদুনে বৃষ্টি। এই একটু হচ্ছে আবার বন্ধ। বাইরে বেরুনো যাবে না। মা গল্পের বই নিয়ে শুয়েছেন। বাবা তাঁর তাসের আড্ডায়। ছুটির দিন হলেই বাবা বিশেষ বাড়িতে থাকেন না।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল। টাউন ক্লাবের মাঠে আজ শ্যামনগর ইয়ং ক্লাবের সঙ্গে টাউন ক্লাবের ফুটবল ম্যাচ ছিল। যা বৃষ্টি, হবে কি-না কে জানে! প্রভাস, অনিন্দ্য ওরাও আসবে বলেছিল। পলাশের মনটা ছটফট করছিল বাইরে যাওয়ার জন্য। বড়দা জামা-প্যান্ট পরে ছাতা নিয়েই বেরুল। বন্ধুদের সঙ্গে একবার দেখা করতে। গুড্ডুকে নিয়ে মুন্নি ব্যস্ত। বৌদি মার সঙ্গে রান্নাঘরে।

সন্ধে গড়িয়ে গেছে। কিছু সময় বিরতির পর এখন আবার বেশ জোরে বৃষ্টি পড়ছে। সঙ্গে ঝড়ো হাওয়া। বাবা এখনও বাড়ি ফেরেননি। বড়দাও বাইরে। সেই দুপুর থেকে একভাবে ঘরের মধ্যে থেকে পলাশের আর ভালো লাগছে না। ছাতা থাকলে না হয় বেরুনো যেত। মা এসে রুটি-তরকারি দিয়ে গেছেন। পড়ার টেবিলে বসে হেমেন্দ্রকুমারের 'আবার যখের ধন' বইটাই পড়ছিল পলাশ। এত ভালো বই এখন আর লেখা হয় না। শুধু বাজে বাজে কমিকস্ পড়তে ভালোও লাগে না। বাবা তো পুরোনো দিনের এই সব বই এখনও পড়েন। এমন ভয়ের বই রাত্রে পড়াই যায় না।

বাবা হয়তো ফিরে এসেছেন, পলাশ একবার ছাদের দিকে গিয়ে ফিরে এসেছে। বৃষ্টির জোর কমলেও ভীষণ বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। আর সঙ্গে বাজ পড়ার আওয়াজ। কিছুই ভালো লাগছে না। প্রভাসদের সঙ্গেও দেখা হল না। আর এখন তো বাইরে বেরুনোই যাবে না।

রাত প্রায় দশটা। সবাই একসঙ্গে খেয়েছে। বড়দার জন্য রাত্রেও মুড়িঘণ্ট রেখেছিলেন মা। পলাশও একটু পেয়েছে। শিলং পিক আর চেরাপুঞ্জির নানা রোমাঞ্চকর গল্প শুনতে শুনতে খাওয়া শেষ হল। মা এসে বিছানা ঠিক করে দিলেন। এক গ্লাস দুধ খেয়ে পলাশ বিছানায়।

রেডিওতে বলল, এটা ঠিক কালবৈশাখী নয়। কোথায় নাকি নিম্নচাপের সৃষ্টি হওয়ায় এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়। তবে গরমের হাত থেকে একটু রেহাই পাওয়া গেছে।

ঘুমিয়ে পড়েছিল পলাশ। হঠাৎ দরজার দিকে ঠুক-ঠুক শব্দে ঘুমটা ভেঙে গেল। এই ঝড়-জলের রাত্রে আবার কে এল! বিছানায় বসে দরজার দিকে তাকাতেই আবার শব্দ। ভয় পেলেও নিজেকে শক্ত করে মশারি তুলে নীচে নামল। একটু এগিয়ে যেতেই চমকে উঠল। কে যেন বাইরে থেকে কাঁপা কাঁপা গলায় ডাকছে, পলাশ—এই পলাশ, তাড়াতাড়ি দরজাটা খোল। ভিজে গেলাম। তোর ওয়ার্ক এডুকেশনের খাতাটা নিয়ে এসেছি।

আরে এ তো অনিন্দ্যর গলা! এত রাত্রে এই ঝড়-জল মাথায় করে খাতা দিতে এসেছে! অবাক কাণ্ড! তাড়াতাড়ি দরজা খুলতেই ওকে প্রায় ধাক্কা দিয়ে ঘরে ঢোকে অনিন্দ্য। কাকভেজা হয়ে গেছে। জামার তলা থেকে খাতাটা বের করে পলাশের দিকে এগিয়ে অনিন্দ্য বলে, তোকে বলেছিলাম আজ অজিত স্যারের সই করিয়ে খাতাটা ফেরত দেব। এই নে।

তা বলে এই এত রাত্রে? এত ঝড়-জলে? খাতার জন্যে কি তোর ঘুম হচ্ছিল না?

ও কিছু না। আমার কিছুই হয়নি। বাড়ি থেকে অবিশ্যি নিষেধ করেছিল। কিন্তু তুই তো বসে থাকবি। তাই স্যারের সই করিয়ে নিয়ে এলাম। নে ধর। আমি এখুনি যাব, অনেকক্ষণ বেরিয়েছি। বাড়িতে আবার ভাবছে। কথা শেষ করে আর পলাশকে অবাক করে হঠাৎই দ্রুতবেগে অনিন্দ্য দরজার দিকে এগিয়ে যায়। পলাশ ওকে এভাবে যেতে দিতে রাজি নয়। কিছু বলার জন্য তাড়াতাড়ি এগিয়ে যেতেই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়। অন্ধকারে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু কোথায় অনিন্দ্য? ও যেন ভোজবাজির মতো হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। গলা দিয়ে শব্দও বেরুতে চায় না। তবুও জোরে অনিন্দ্যর নাম ধরেই ডাকে পলাশ।

সিঁড়ির আলো জ্বলে ওঠে। রাত অবিশ্যি খুব বেশি হয়নি। সবে বারোটা। পলাশের চিৎকার শুনে বড়দা-বাবা-মা-বৌদি উপরে উঠে এসেছেন। বড়দা আগে এসে বলে, কি রে কি হয়েছে? ভয়-টয় পেয়েছিস!

না—অনিন্দ্য—কাঁপা কাঁপা গলায় জবাব দেয় পলাশ। বাবা বলেন, অনিন্দ্য কোথায়! গ্যাস হয়েছে

পেটে। ভুলভাল বকছিস। পলাশ এবার ঘরে ঢুকে ওয়ার্ক এডুকেশনের খাতাটা নিয়ে আসে। তারপর সব কথাই বলে যায়। পলাশের কথা শুনে বড়দা-বাবা কথা বলতে পারেন না। সব মিথ্যে হলেও এই খাতাটা তো মিথ্যে নয়। ভাবনার কথা হল। যাই হোক কিছুক্ষণ আলোচনার পর মা পলাশের কাছেই শোবেন ঠিক হল। বাবা-বড়দা-বৌদি নেমে গেলেন নীচে।

পরদিন ভোরবেলায় মা পলাশের ঘুম ভাঙালেন। নীচের ঘরে অনেক মানুষের কথার শব্দ। বিছানা থেকে নেমে দ্রুত নীচের ঘরের দিকেই যায় পলাশ। সেখানে তখন এক করুণ দৃশ্য চলছে। অনিন্দ্যর দাদা, প্রভাস, আরও কয়েকজন বসে আছে। বাবা তাদের সঙ্গেই কথা বলছেন।

পলাশ ভিতরে ঢুকতেই ওর দিকে এগিয়ে আসে প্রভাস। ছলছল চোখ। বড়দা বলে—আয় বোস। পলাশ তো কিছুই বুঝতে পারছে না। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সবার দিকে তাকাতেই ওকে জড়িয়ে ধরে ছেলেমানুষের মতো কেঁদে ওঠেন অনিন্দ্যর দাদা। ঠিক এমন সময় অজিত স্যারও ঘরে ঢোকেন।

পলাশ এবার আসল রহস্যের কথা শোনে। কাল রাত্রে ঝড়-জল মাথায় করে বাড়ির নিষেধ না শুনেই অনিন্দ্য পলাশদের বাড়ি আসছিল। বৃষ্টি তখন সত্যি অল্প ছিল। মা বলেছিলেন, এই রাত্রে না গিয়ে কাল সকালেই খাতা ফেরত দিতে। কিন্তু অনিন্দ্য সে কথা শোনেনি। অজিত স্যারও বললেন, হ্যাঁ, আমিও অত রাত্রে ওকে দেখে অবাকই হয়েছিলাম। তাড়াতাড়ি দুজনের খাতা সই করে ওকে বাড়ি যেতে বলে দিলাম। একটা খাতাও দিতে চাইলাম। নিল না।

এরপর অনিন্দ্যর বড়দা বলেন, স্যারের বাড়ি থেকে বেরিয়ে তোমাদের বাড়িতেই আসছিল। কিন্তু অমরাবতীর ভূতবাগানের রাস্তায় শর্টকাট করতেই অঘটন ঘটে গেল। বিদ্যুৎ আর বাজ পড়ছিল খুব। আমবাগানের নীচেই পড়েছিল ভাই, বাজ পড়েই...রাত সাড়ে এগারোটায় খোঁজ করতে করতে আমরা ওকে সেখানে পড়ে থাকতে দেখি।

আর শোনার কিছু নেই। সবই বুঝতে পারে পলাশ। ওকে কথা দিয়েছিল অনিন্দ্য তাই এইভাবে কথা রেখে গেছে। ধীরে ধীরে ওপরের ঘরে গিয়ে সেই ওয়ার্ক এডুকেশনের খাতাটা বুকের মধ্যে চেপে নেমে আসে পলাশ। খাতাটা প্রভাস টেনে নেয়। তারপর প্রতিটি পাতায় অজিত স্যারের সইগুলোও দেখে। কেউ আর কোনো কথা বলতে পারেন না। শুধু অবাক বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যান খাতাটার দিকে তাকিয়ে।

পলাশকে যেতে হবে। অনিন্দ্যর শেষ কাজে সঙ্গী তো হতেই হবে তাকে।

জ্যৈষ্ঠ ১৪০৪

হ্যাপি ভিলা

জীবন ভৌমিক

শিয়ালদার ফার্নিচারের দোকানের মালিক যেমন যেমন পথনির্দেশ দিয়েছিল, ঠিক সেইমতোই পিকনিক গার্ডেন স্টপেজে বাস থেকে নামলাম। রাস্তা পার হয়ে সোজাসুজি একটি কাঁচা রাস্তা এঁকেবেঁকে একটি ছোট পুকুরের শান বাঁধানো ঘাটে গিয়ে পড়েছে। হাড়সর্বস্ব লোকের মতো দাঁত বের করা সিঁড়ি-সর্বস্ব পুকুর। বাসক আর আকন্দ শিরীষের হাল্কা জঙ্গলের ভেতর দিয়ে হলুদ রঙের বাড়িটা এবার চোখে পড়ল। খেয়াল করিনি এতক্ষণ। ওটাই মিঃ ডি কুনহার হ্যাপি ভিলা। কিন্তু দেখেশুনে বড়ই আনহ্যাপি মনে হচ্ছে।

ভেতর থেকে আমাকে দেখতে পেয়েই হয়তো বারান্দায় একটি লোক এসে দাঁড়াল। সিঁড়িতে নেমে দূর থেকে সে বলল, 'হু ইজ দেয়ার? কাম অ্যালং দিস সাইড!' তাই তো! ডান দিকেই একটা সরু রাস্তা রয়েছে। জঙ্গলের আড়ালে পড়ে গিয়েছিল। এগিয়ে গেলাম সোজা। একেবারে বারান্দায় সিঁড়ি পর্যন্ত।

'আপনিই কি মিঃ ডি কুনহা!' আমি সবিনয়ে জিগ্যেস করি।

'ইয়েস, মাই বয়। কী চাই তোমার? কী দরকার?'

'নমস্কার। আমি অনেক দূর থেকে আসছি। আপনার সঙ্গে কিছু কথা ছিল।' এই কথা বলে আমি সিঁড়ির ধাপ পেরিয়ে নিঃশব্দে তার পেছন পেছন ভেতরে গেলাম।

মিঃ কুনহার বয়স ঠিক বলা যাবে না। পঞ্চাশ থেকে ষাট হবে। ছিপছিপে গড়ন। খুবই লম্বা। ছ'ফুটের বেশি হবে। জাতে পর্তুগীজ। মাথায় ইউল বারনারের মতো টাক। লম্বাটে মুখ। সুন্দর নাক-চোখ। খুব ফর্সা। অত্যন্ত আনমনা। বিমর্ষ। ময়লা ট্রাউজার। গায়ে গেঞ্জি। বলল, 'দয়া করে ভেতরে আসুন। অনেকদিন বাদে আমার বাড়িতে মানুষের পা পড়ল। আফটার মেনি মেনি ডেজ। প্লিজ কাম ইন।'

সন্ধে হয়ে এসেছে। চারদিক নিস্তব্ধ। মিঃ কুনহার মস্ত ঘরটি প্রায় শূন্য। আসবাব বলতে একটি মাত্র ছোট্ট চৌকি, এক কোণে। মনে হল বাড়িতে অন্য কোনও প্রাণী নেই। চামচিকে আরশোলা আছে বহু। চৌকিতে আমরা মুখোমুখি বসলাম। মিঃ কুনহা আমার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। বড় নিষ্ঠুর অথচ করুণ চোখ। আমার গা ছমছম করে উঠল। 'বলুন কী দরকার!' হঠাৎই চেঁচিয়ে উঠল সে। আমি চমকে উঠলাম।—থাক, হ্যাপি ভিলার মিঃ কুনহার কথা এখন থাক। আগের কথা আগে বলে নিই—

আমার অনেক দিনের শখ ছিল একটি রিভলভিং চেয়ারের। পায়ে চাকা লাগানো, চেয়ারের নীচে বল বিয়ারিং লাগানো, ভেলভেট লেদার দিয়ে গদিমোড়া। যেদিকে যেমন ইচ্ছে শরীর ছড়িয়ে বসব। বড় আরাম। কিন্তু তেমনি দাম। দর করেছিলাম একবার। সাড়ে তিনশো থেকে চারশো টাকা। আমার একমাসের মাইনে।

অফিসের কাছে এক পুরোনো ফার্নিচারের দোকানে মনের মতো একটি রিভলভিং চেয়ার দেখে একদিন দরাদরি করে মাত্র একশো টাকায় পেয়ে গেলাম। ভাবতেই পারিনি যে সত্যি সত্যি দোকানদার আমার বলা দামে চেয়ারটা দিয়ে দেবে! দেখলে কেউ বলবে না চেয়ারটা পুরোনো বা ব্যবহার করা। সেগুন কাঠের ওপর বার্নিশ করা জামফলের রং, চওড়া হাতল, নরম ভেলভেটে মোড়া গদি, মস্ত বহরের রাজকীয় ঐ চেয়ারখানা। হাতছাড়া যাতে না হয় সেইজন্য প্রথম দিন আমার পকেটে যে কুড়ি টাকা ছিল তাই অ্যাডভান্স করে এলাম। পরের দিন মুটে এবং গাড়িভাড়া খরচ করে চেয়ারটি

বাড়িতে আনলাম। নিজের পড়ার ঘরের লাগোয়া দক্ষিণের বারান্দায় সেদিনকার মতো রেখেছিলাম। সেই রাত্রে খুব জ্যোৎস্না ছিল।

দরকারি কাজকর্ম সেরে, রাতের খাওয়া-দাওয়া সারতে রোজকার মতো সেদিনও রাত প্রায় দশটা হল। অভ্যাসমতো সিগারেট নিয়ে বারান্দায় এলাম। বাইরের ঘরবাড়ি পথঘাট গাছগাছালি জ্যোৎস্নায় মাখামাখি, বারান্দায় গ্রিলের ফাঁক দিয়ে জ্যোৎস্নার এক ফালি আলপনা ঠিক আমার রিভলভিং চেয়ারটির ওপর। বাইরের বাতাস বারান্দায় খেলছিল বটে, কিন্তু আমার মনে হল আমার ঐ অপরিসর বারান্দায় ক্ষণিকের জন্য বাতাসের মত্ত এক দাপাদাপি হয়ে গেল। এবং তারপরই শান্ত। বারান্দার পর ছ'ফুট রাস্তা সংলগ্ন একটা মাঠ। ছেলের দল খেলতে খেলতে মাঠের ঘাস নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। ধুলোমাটিসম্পন্ন সাদা মাঠটি জ্যোৎস্নায় মনে হচ্ছে একটি ধবধবে সাদা চাদর। এইসব মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী উপভোগ করতে করতে আমি এক সময় চেয়ারে বসলাম। নিতান্ত স্বাভাবিকভাবেই সামনের মাঠে চোখ পড়েছিল। এবং আমি চমকে উঠেছিলাম। আমার সমস্ত শরীরে হঠাৎ কাঁটা দিয়ে উঠেছিল। ঠিক আমার বারান্দার সামনে ঐ ধবধবে সাদা মাঠে তার চেয়েও সাদা একটি কুকুর। একদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে। এত সাদা কুকুর আমি জীবনে দেখিনি। সাদা রং যে কী ভয়ঙ্কর হতে পারে, সেদিনই বুঝলাম। কুকুরটাকে কোনও অশুভ প্রতীক বলে আমার মনে হল। চেয়ার থেকে উঠে মুখে শব্দ করে হাত তুলে আমি কুকুরটাকে তাড়াবার চেষ্টা করলাম। পলকের মধ্যে ঐ জ্যোৎস্নায় সে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ফিরে চেয়ারে বসতে যাব, যেন কার শরীরে ধাক্কা লাগল। কে? কে! কই কেউ না তো! ভয়ে ছিটকে চলে এলাম বারান্দার অন্য প্রান্তে। চেয়ারে বসতে গিয়ে কীসের সঙ্গে আমার ধাক্কা লাগল! তবে কি মনের ভুল? কিন্তু সাদা কুকুরটা! সেটাও কি চোখের ভুল!

ঘড়িতে তখন রাত সাড়ে দশটা। আমি একটু দূরে দাঁড়িয়ে চেয়ারটার দিকে তাকিয়ে আছি। এই প্রথম নজরে পড়ল যে চেয়ারটার দুই হাতলে বেশ কতগুলো দাগ। সাদা সাদা, যেন আঁচড়ের দাগ। আগে তো দেখিনি! কিনে আনার সময়েও নজরে পড়েনি! ব্যবহার করা জিনিস। এরকম হতেই পারে।

কিন্তু একী! চেয়ারে বসার গদিটা গোল হয়ে আস্তে আস্তে বসে গেল কেন? একজন বসলে, তার শরীরের ভারে যেমন হয়, ঠিক তেমনি। চেয়ারের হেলান দেবার পেছনের জায়গাটা নড়ে উঠল কেন? একজন বসলে তার শরীরের ভারে যেমন নড়ে ওঠে! অথচ কাউকে তো দেখা যাচ্ছে না!

আমার সমস্ত শরীর ঘামে ভিজে উঠল। তবে কি আমি একটা ভূতুড়ে চেয়ার কিনে এনেছি বাড়িতে! সেইজন্যই কি এত কম দামে দোকানদার আমায় দিয়ে দিল! এই চেয়ার আমি ফিরিয়ে দেব। অথবা বিক্রি করে দিতে হবে অন্যত্র। কিন্তু তার আগে শেষ দেখা দেখতে চাই।

আমি ধীরে ধীরে শূন্য চেয়ারের দিকে এগিয়ে গেলাম। এবং বসতে গিয়ে কার আচমকা ধাক্কায় আমি বারান্দায় মুখ থুবড়ে পড়ে গেলাম। একটা চাপা আর্তনাদ আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল। কোনোক্রমে নিজেকে সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে দেখি সেই সাদা কুকুরটি বারান্দায়, চেয়ারের পাশে, নীচে মাটিতে বসে আছে জ্যোৎস্নার ফালিতে। আর দাঁড়াতে পারিনি সেখানে। ঘরে ঢুকে বারান্দার দরজা বন্ধ করে দিলাম। ঠান্ডা জলে মুখ-চোখ ধুয়ে শুয়ে পড়ি। সারারাত ঘুম নেই। আজগুবি, নাকি ভৌতিক ঐ চেয়ারের কথা আমি না পারলাম কাউকে বলতে, না পারলাম মন থেকে তাড়াতে!

দ্বিতীয় দিন, অফিসের কাজকর্ম সেরে সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে এলাম। ভেবেছিলাম চেয়ারটা ঘরে নিয়ে আসব। ভরসা পেলাম না। তবে সাহস করে বসলাম চেয়ারে। সব স্বাভাবিক। খেতে যাবার আগে ঘরেই নিয়ে এলাম চেয়ারটা। খাটের পাশে, জানলার ধারে, টেবিলের কাছেই বসালাম।

খেয়ে এসে সিগারেট নিয়ে বারান্দায় কিছুক্ষণ পায়চারি করে ঘরে এলাম। আমার বুক ধুকপুক করতে লাগল। ঘরের আলো জ্বালিয়ে রাখলাম। রেডিও খুলে দশটার খবর শুনলাম। এরই মধ্যে স্পষ্ট বুঝতে পারলাম চেয়ার নড়ে উঠল, বসার গদিতে চাপ পড়ে বসে গেল। আলো নিভিয়ে ওদিকে আর না তাকিয়ে বিছানায় উঠতে গিয়ে জানলার ওপারে চোখ গেল। সেই সাদা কুকুর। অসম্ভব স্থির তার দুই কালো চোখ। কোনোক্রমে হাত বাড়িয়ে জানলা বন্ধ করে দিয়ে চোখ চাপা দিয়ে শুয়ে পড়ি। আমার শরীর কাঁপতে থাকে।

পরদিন অফিস থেকে বেরিয়ে অফিসের কাছে যে ফার্নিচারের দোকান থেকে চেয়ারটি কিনেছিলাম সেখানে হাজির হলাম।

'পরশু যে চেয়ারটা কিনে নিয়ে গেলাম সেটা সেকেন্ড হ্যান্ড তো?'

'নিশ্চয়ই। আমাদের তো পুরোনো আসবাবেরই কারবার।'

'আচ্ছা, চেয়ারটা আপনারা যার কাছ থেকে কিনেছেন, তার ঠিকানা দিতে পারবেন?'

'কেন বলুন তো? আমরা চেয়ারের মালিকের খোঁজ তো দিতে পারব না। আমরা শিয়ালদার একটা বড় দোকান থেকে অন্যান্য কিছু আসবাবের সঙ্গে এনেছিলাম।'

'শিয়ালদার কোন দোকান?'

'স্টেশনের কাছে, পুব দিকে, ''ফার্নিচারস্ সিন্ডিকেট''।'

ঐখান থেকে সোজা চলে গেলাম শিয়ালদার সেই দোকানে। কোনও রকম ভূমিকা না করে মালিককে সরাসরি জিগ্যেস করি, 'দেড় মাস আগে ডালহৌসি স্কোয়ারের ''ফার্নিচার ট্রেডিং''-এ আপনারা কিছু পুরোনো আসবাব বিক্রি করেছেন?'

আমার প্রশ্নে দোকানের মালিক কিছুটা ঘাবড়ে গিয়ে জিগ্যেস করে, 'কেন, কী ব্যাপার! আপনি কোথা থেকে আসছেন?'

আমি মিথ্যে করেই বলি, 'পুরোনো দিনের আসবাব বিষয়ে আমার উৎসাহ আছে, আমি ঐ বিষয়ের উপর গবেষণামূলক কিছু কাজ করি।'

দোকানদার বলে, 'তাই বলুন! হ্যাঁ, ডালহৌসি স্কোয়ারের ঐ দোকানে কিছু মাল গেছে, দুটো আলমারি, তিনটে চেয়ার। তার মধ্যে একটা রিভলভিং চেয়ার ছিল।'

ঐ চেয়ারের মালিকের খোঁজ-সন্ধান ওখান থেকে নিয়ে সেদিনই চলে এসেছিলাম হ্যাপি ভিলার মিঃ ডি কুনহার কাছে।

মিঃ কুনহার সঙ্গে পরিচয় হবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় হঠাৎই সে চেঁচিয়ে উঠেছিল 'বলুন কী দরকার' বলে।

এই আকস্মিক চিৎকারে আমি চমকে উঠেও সরাসরি জিগ্যেস করেছিলাম, 'আপনার সব আসবাব বিক্রি করে দিয়েছেন কেন?'

মিঃ কুনহা ঠিক স্বাভাবিক মস্তিষ্কসম্পন্ন যে নয় সেটা বোঝাই গিয়েছিল তার কথাবার্তার ধরনধারণে, চলনে, গমনে ও চোখের দৃষ্টিতে। বড় উদাস কণ্ঠে বলল, 'ওহ্! লেট মি ফরগেট দ্যাট। আমি ওসব ভুলে যেতে চাই, আমাকে একা থাকতে দিন।'

আমি বিনীতভাবে মিঃ কুনহাকে বলি, 'দেখুন, চার বছর আগে আপনার বাড়িতে যে দুর্ঘটনা ঘটে গেছে, সে-কথা আমি আপনার বাড়ি খুঁজে আসার পথে স্থানীয় লোক-মুখেই শুনেছি। আপনার অনুপস্থিতিতে একদিন রাত্রিবেলায় একদল ডাকাত আপনার বাড়িতে ঢুকে আপনার স্ত্রী এবং তার পোষা প্রিয় কুকুরকে হত্যা করে অনেক গয়না ও টাকাপয়সা নিয়ে যায়। আপনি খবর পেয়ে বাড়িতে যখন এলেন তখন সব শেষ। শুনেছি তারপর থেকে আপনি ঘুরে ঘুরে বেড়ান, এই বাড়িটা পরিত্যক্ত পড়ে থাকে। স্ত্রীর ঐ মৃত্যু আপনার কাছে দুর্বহ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু আপনি বাড়ির সব ফার্নিচার বিক্রি করে দিলেন কেন?'

স্থিরশান্তভাবে মিঃ কুনহা এমনভাবে আমার কথাগুলো শুনছিল যেন সে এই বস্তুময় জগতের মানুষ নয়। কয়েক মুহূর্ত আমার দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে থেকে মিঃ কুনহা বলল, 'আমার স্ত্রী তার পছন্দমতো আসবাব ও শৌখিন জিনিস কিনে নিজের মতো করে এই বাড়ি সাজিয়েছিল। কিন্তু ভোগ করতে সে কিছুই পারল না।'

আমি জিগ্যেস করি, 'ফার্নিচার বিক্রি করলেন কবে?'

মিঃ কুনহা বলল, 'ওটাকে ঠিক বিক্রি বলা যায় না, আসলে এই বাড়ি, বাড়ির সব জিনিসপত্রের মধ্যে আমি হাঁপিয়ে উঠছিলাম। খবর দিয়েছিলাম একটা ফার্নিচারের দোকানে। নামমাত্র মূল্য দিয়ে একদিন এসে তারা সব তুলে নিয়ে গেল।'

'একটা রিভলভিং চেয়ারও ছিল?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। ভারী সুন্দর চেয়ার। বাড়িতে কাঠের মিস্ত্রি ডেকে আমার স্ত্রী নিজে তৈরি করিয়েছিল সেটা। কিন্তু আপনি চেয়ারটার কথা জিগ্যেস করছেন কেন বলুন তো!'

'বলছি। তার আগে বলুন তো, ঐ চেয়ারটার সঙ্গে কোনও ঘটনা জড়িয়ে আছে কিনা!'

'আছেই তো। আমার স্ত্রী রোজ রাতে শুতে যাবার আগে ঐ চেয়ারটায় বসে বাইবেল পড়ত। এরকম অবস্থাতেই একদিন বাড়িতে ডাকাত পড়ল। আমি বাড়িতে ছিলাম না তখন। ডাকাতরা অতর্কিতে তাকে আক্রমণ করল। আমার স্ত্রী বাধা দিতে গিয়েছিল হয়তো। ডাকাতরা তার মুখ চেপে গলা টিপে হত্যা করে। ঐ চেয়ারে বসা অবস্থাতেই।'

মিঃ কুনহার কথাবার্তার মধ্যে খুব অন্যমনস্কতা ছিল। থেমে থেমে কথা বলছিল। আমি এই সময় জিগ্যেস করি, 'একটা কুকুর ছিল তো আপনাদের?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ! আপনি দেখছি সবই জানেন। বড় আদরের কুকুর ছিল লিসি। লিসি হয়তো ডাকাতদের আক্রমণ করেছিল আমার স্ত্রীকে রক্ষা করার জন্য। কুকুরটাকেও তারা মেরে ফেলে।'

'আচ্ছা, লিসিকে কেমন দেখতে ছিল?'

'ওরকম ভালো জাতের কুকুর লাখে একটা মেলে। ধবধবে সাদা। কী সুন্দর!'

'হ্যাঁ, সারা শরীর ধবধবে সাদা, কিন্তু আপনার লিসির কপালের রঙ এক জায়গায় কালো ছিল।'

'হাউ স্ট্রেঞ্জ! আপনি জানলেন কী করে?'

'আমি লিসিকে দেখেছি। পরপর দু'দিন, রাত দশটা নাগাদ।'

'হোয়াট!' মিঃ কুনহা চিৎকার করে ওঠে।

আমি শান্ত গলায় বলি, 'শুধু লিসি নয়, আপনার স্ত্রীকেও। কারণ আপনাদের ঐ রিভলভিং চেয়ারটা আপাতত আমার ঘরে আছে।'

মিঃ কুনহা কোনও কথা বলতে পারছিল না। ঠোঁট দুটো কাঁপছিল। অনেক কষ্টে, খুব অসহায়ের মতো বলল, 'দুর্ঘটনার পর আমি কোনও দিন রাতে তার ঐ চেয়ারের কাছে যাইনি। এমন জানলে আমি অন্তত চেয়ারটা রেখে দিতাম। প্লিজ ঐ চেয়ারটা আমাকে ফিরিয়ে দিন। লেট আস লিভ ইন পিস্।'

দিয়েছিলাম। ঐ রিভলভিং চেয়ার পরের দিনই আমি হ্যাপি ভিলাতে ফেরত দিয়ে এসেছিলাম।

এসব বহুদিন আগের কথা। হ্যাপি ভিলা এখনও আছে। জীর্ণপ্রায়। আগাছা জঙ্গলে ঘেরা ঐ বাড়িতে শীর্ণ বৃদ্ধ এক পর্তুগীজ ভদ্রলোক বাস করে। রোজ রাত দশটায় সে দোতলার একটা ঘরে একটি রিভলভিং চেয়ারের সামনে বসে তার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে। হ্যাপি ভিলার কাছাকাছি বাড়ির লোকজন মাঝে মাঝে নাকি মেয়েমানুষের কণ্ঠও শুনতে পায়। কাঁপা কাঁপা সেই অস্বাভাবিক নারীকণ্ঠ শুনে সবাই ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকে।

আজকাল দিনের বেলাতেও হ্যাপি ভিলার ধারে-কাছে কেউ যায় না। স্থানীয় মানুষদের বিশ্বাস, মিঃ কুনহাও আর বেঁচে নেই। গত কয়েক বছরের মধ্যে কেউ তাকে একবারও দেখতে পায়নি। সন্ধ্যার পর হ্যাপি ভিলাতেও আলো জ্বলতে দেখা যায় না।

চেয়ারটা ফেরত দিয়ে আসার পর কত বছর পার হয়ে গেল। ভেবেছিলাম মিঃ কুনহার সঙ্গে দেখা করে আসব একদিন। কিন্তু দূর থেকে হ্যাপি ভিলার সম্বন্ধে যেটুকু খবরাখবর পেতাম তাতে ভরসা পাইনি।

মাত্র সেদিন খবর পেলাম, সরকারি কর্তৃপক্ষের সহায়তায় হ্যাপি ভিলাকে নাকি অধিগ্রহণ ও যথাযথ সংস্কার করে সেখানে জনসাধারণের কল্যাণার্থে কিছু একটা করা হবে। কারণ মিঃ কুনহার সম্পত্তির কোনও দাবিদার পাওয়া যায়নি। খবরটা শোনার পর থেকেই আমার বার বার হ্যাপি ভিলার কথা মনে হয়। যদিও লোকে সেটাকে ভূতের বাড়িই বলত, আমার কাছে কিন্তু সেটা সত্যি সত্যিই হ্যাপি ভিলা, সুখের নীড়। কারণ আমার বিশ্বাস, আজও সেখানে দুটি প্রাণী পরম শান্তিতে বাস করছে।

———

আশ্বিন ১৩৯১

শীতসন্ধ্যার ঝড়বৃষ্টি

অশোক কুমার সেনগুপ্ত

ফিরতি মৌসুমী বায়ুতে শীতে মৃদু বৃষ্টিপাত হয় দু'একদিন। শেষ অগ্রহায়ণে সারাদিন মেঘলা, মধ্যে মধ্যে ঝিরঝিরানি। ঠান্ডা হাওয়া নিয়ে দিনটা সেরকমই এল দেখেও ঘর থেকে বের হওয়াটাই ভুল হয়েছিল। কিন্তু যোগেন ঘোষ যা কাণ্ড করল তাতে না বেরিয়ে উপায় কী! পাঁচ হাজার টাকা কম কথা নয়। পরশু থেকে টাকার শোকে মন অস্থির হয়ে কোনো কাজকম্মই ভালো লাগছিল না। বন্ধুত্বের মুখোশ পরে বিশ্বাসঘাতকতা করা মানুষটির মুখোমুখি হবার জন্য ক্রোধ মাথারও ঠিক রাখেনি। নইলে এমন আবহাওয়ায় কেউ বের হয়!

যোগেন রাতারাতি স্টেশনারি দোকানটা বিক্রি করে সব পাওনাদারকে ফাঁকি দিয়ে কেটে পড়বে কে জানত! অবস্থা খারাপ চলছিল। দোকানের ভাড়াও বাকি পড়েছিল। যাই হোক এক রাতে তো দোকান বিক্রি হয় না। গোপনে তার প্রস্তুতি চালাচ্ছিল। কাউকে জানতে দেয়নি। মহা ধুরন্ধর। অথচ তার সঙ্গে কেমন বন্ধুত্বের ভান দেখাত। বাড়িওয়ালা জগদীশও কিছু বলেনি। সেও টাকা পেয়েছে এ বাবদ।

পাঁচ হাজার টাকা কম কথা নয়। উদ্ধার করতেই হবে। যোগেন যাবে কোথায়? নির্ঘাৎ গ্রামের বাড়ি। অনেকদিন আগে বন্ধুত্বের খাতিরে বাড়ি নিয়ে গিয়েছিল। সেই বাড়িতে ওকে ধরার উদ্দেশ্যেই আজকের যাত্রা।

যাত্রাটা মোটেই শুভ হয়নি। দিনের আলোয় নামা যেত আমোদপুর স্টেশনে। কিন্তু দানাপুর ফাস্ট প্যাসেঞ্জার তিন ঘণ্টা লেট করে বসল। তারপর বাস ধরতে হল। কালো আকাশের জন্যে সন্ধেটাও চটজলদি নেমে পড়ল। রাস্তাটা মনে আছে। ভয়ের কিছু নেই। সোজা মাটির সড়ক। একটা জঙ্গুলে ডাঙা, তারপর মাঠ পড়বে। মাঠ পেরুলেই গাঁয়ের ঘর।

বাস যেখানে নামায় সেটা মোড় বটে রামপুরের। কিন্তু ঘরবাড়ি নেই, একটা চায়ের দোকান নেই। আমের বাগান, তারপর ক্ষুদে জঙ্গল। যাকে বলে জংলা ভুঁই। মাটির সড়ক ওটাকে চিরেই বেরিয়ে গিয়েছে।

ঝিরঝিরে বৃষ্টি আর হিমেল হাওয়ায় খানিকটা হাঁটতেই কাঁপুনি ধরে গেল। মাথা পাক দিয়ে গলায় জড়ানো মাফলার, ভেতরে সোয়েটার, শার্ট, প্যান্ট, মোজা পরা পা, জব্বর শালমুড়ি দিয়েও রেহাই নেই। বৃষ্টিকে তোয়াক্কা না করলেও হাওয়া যেন ভেতরে বরফ ঢুকিয়ে দিচ্ছে। একটু তাপের জন্যে কী আকুলতা! মনে মনে ভাবে, এজন্যেই বলে জেদ খুব বেয়াড়া বস্তু। মাথা ঠান্ডা রেখে সব কাজ করতে হয়। ফ্যাসাদে না পড়লে মানুষ তা বোঝে না।

কতটা পথ হেঁটেছে হিসেব থাকে না। কিংবা পথ বেড়েই চলেছে। এটা যে ডাঙা তা ঠাওর করা যাচ্ছে দিব্যি। পাথুরে ডাঙা। ফলে হোঁচোটও খেতে হল। বুট জুতো তাই কিছুটা রক্ষে। তবে রক্ষের আর একটা ব্যাপারও পেয়ে গেল শিবনাথ। একটা বাড়ি তার নজরে পড়ল অন্ধকারে। বাড়ি এদিকে তাহলে আছে। আগের আসায় যোগেনের সঙ্গে গল্প করতে করতে চোখে পড়েনি। যাক, ভেতরে ঢুকে সে আশ্রয় নেবে। লোক নিশ্চয় আছে।

দরজা ঠেলতেই খুলে গেল। ছাউনি দেওয়া বারান্দার পরই ঘর। অন্ধকারে ঠিকঠাক ঠাওর করা হয় না। ঘরে চেয়ারে বসে থাকা মানুষটিকে সে দেখতে পেল। রোগাটে গড়ন, মাথায় ধবধবে সাদা চুল, তীক্ষ্ণ চোখ। চাদরমুড়ি দিয়ে বসা। কোনো আপ্যায়ন নেই। তীক্ষ্ণ চোখে তাকে দেখছে।

পাশেই বিছানা। মেঝেয় খানিকটা হেঁটে মানুষটির মুখোমুখি হতেই বিছানা দেখল। ঘরের ভেতরটা উষ্ণতায় ভরা।

শিবনাথ বসে পড়ল বিছানায়।

'অচেনা জায়গায় এসেছেন মনে হচ্ছে। নতুন মানুষ।'

'হ্যাঁ। রামপুর যাব।'

'আসছেন কোথা থেকে?'

'হাওড়া থেকে।'

'আপনি ভুল রাস্তায় এসে পড়েছেন।'

শিবনাথ ব্যস্ততার সঙ্গে বলল, 'তাই হবে। মনে হচ্ছিল তাই, রাস্তা—।'

'হবে কী—হয়েছে। কাজটা ঠিক করেননি। এমন বৃষ্টির মধ্যে কী বের হতে হয়! বয়স অল্প। নইলে তো মারা পড়তেন মশাই বেঘোরে। পথ তো হারিয়ে এদিকে এসে পড়েছেন।'

'তবু তো আপনাকে পেয়ে গেলাম।'

'তা পেলেন।' ভদ্রলোক গায়ের চাদরটা ভালো করে জড়িয়ে নেন। তারপর বলেন, 'বিছানায় গুছিয়ে বসুন জুতোটা খুলে। মনে হচ্ছে যেতে আর পারবেন না আপনি।'

'কেন?'

'বাঃ! অন্ধকারে বৃষ্টি আর হিমে পথ চিনবেন কী করে?'

শিবনাথ কথা বলল না।

'কাউকে সঙ্গে দিয়ে যে পাঠাব, তারও উপায় নেই। আমি একা।'

শিবনাথ বলল, 'বাড়ির অন্যান্যরা সব বুঝি—।'

লোকটা সে কথায় গেল না। বলল, 'রামপুরে কার বাড়ি যাবেন?'

'যোগেন ঘোষ।'

'আত্মীয়?'

'না। না। বন্ধু।' শিবনাথের এ ঘরের তাপ পেয়ে রাস্তার কষ্টটা যেন মুছে যায়। বুক আবার হু হু করে ওঠে। পাঁচ হাজার টাকা কম কথা! যোগেনকে পাওয়া যাবে কী না কে জানে। তবে ছেলেমেয়ে আছে। ওদের ছেড়ে যাবে কোথায়!

'বন্ধু যখন আগে জানিয়ে মোড়ে থাকতে বলতে পারতেন!'

শিবনাথ এবার বলে বসে, 'বন্ধু ছিল। তখন বুঝিনি। লোকটা শঠ, প্রবঞ্চক। জানেন রাতারাতি দোকান বিক্রি করে সরে পড়েছে। লোকের ধার শোধ করেনি। আমিও পাঁচ হাজার টাকা পাব। তার জন্যে এসেছি। দোকান বিক্রি করে শুনছি ষাট হাজার টাকা পেয়েছে। শহরে রাস্তার ধারে দোকান। দাম হবে না!'

'তা তো হবেই। তবে বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতা যে বললেন, সেটা নতুন কিছু নয়। আসলে বন্ধুই তারা নয়। নকল বন্ধু বা ছদ্মবেশী বন্ধু বলতে পারেন। এ অভিজ্ঞতা আমারও আছে। বন্ধুকে বন্ধু খুন করে এ ঘটনাও জানি। আমারই সে বন্ধু।'

'টাকার জন্য নিশ্চয়ই।'

'আবার কী! আপনার তো পাঁচ হাজার। সেটা ছিল মাত্র তিনশো।'

'মাত্র তিনশো টাকার জন্য খুন!'

'হ্যাঁ।' ভদ্রলোক বললেন, 'সেজন্যেই তো বলছি, আপনি কাজটা ঠিক করেননি। ওই যে বললেন যোগেন ঘোষ—এ অচেনা জায়গা, বিভুঁই, আপনাকে খুনও করতে পারে। বিশেষ করে ধরুন এমন রাতের মওকা পেলে।'

শিবনাথের এবার ভয় করে। ঠিক কথাই বলেছেন। অনায়াসে আমোদপুর না হোক আগে বোলপুরে নেমে রাত্রিটা কাটিয়ে এলে ভালো হত। এই যে বাড়িটা পাওয়া গেল তাই রক্ষে, তা না হলে মাঠে-ঘাটে পথ হারিয়ে কত যে ঘুরতে হত।

'কী ভাবছেন!'

'না। ভাগ্যিস আপনার এখানে আশ্রয় পেলাম!'

'এ জায়গাটা মানে রামপুরের রাস্তার ডাঙাটা সম্পর্কে আপনি তো কিছুই জানেন না। ডাঙাটার দক্ষিণের ঢালটা সম্পর্কে কিন্তু এখানকার সবাই জানে!'

শিবনাথ আতঙ্কিত স্বরে বলল, 'কী জানে!'

'একটা প্রেতাত্মার কথা। যাকে ভূত বলেন। একটা ভূত নাকি বাড়ি তৈরি করে লোককে আশ্রয় দেয়। নিশিকালে বাড়িটা থাকে। ভোর হতে না হতে উধাও।'

'ভাগ্যিস ওদিকে যাইনি।'

'যাকগে, ছাড়ুন ও কথা। বন্ধুর খুনের গল্পটা শুনবেন? মানে ওই তিনশো টাকা।'

শিবনাথ বলল, 'বলুন।'

ভদ্রলোক গায়ের চাদরটাকে ঢাকা দিলেন ভালো করে। বললেন, 'আসলে ভুল বোঝাবুঝির ব্যাপার। তিনশো টাকা হলে খুন হত না। তবে তিনশোই হোক আর তিন লক্ষই হোক, গল্পটা বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতার তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কুলপুর গাঁয়েই দুজনের বাড়ি। ছেলেবেলায় একসঙ্গে খেলেছে, স্কুলে পড়েছে। তারপর চাকরিও ভাগ্যক্রমে একই শহরে। দুজনেরই সরকারি চাকরি, তবে বিভাগ আলাদা। যাই হোক ঘটনাটা হল গাঁয়ের চাঁদু ভট্চাজের ভিটের গুপ্তধন নিয়ে। লোকটা ডাকাতদের কাছে ডাকাতির মালপত্র কেনে এমন একটা কথা চালু ছিল। চাঁদু ভট্চাজ মারা যাওয়ার পর কোনো শরিক ছিল না। ভিটেটা দুজনে কিনে নেয়। আধাআধি ভাগ করে নেবে বলে।' সামান্য থেমে ভদ্রলোক বললেন, 'কী মশাই, শুনছেন তো?'

'হ্যাঁ। হ্যাঁ।'

'বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না?'

'না। না।'

'না অসুবিধা হলেই হল। আমি ছোট করে বলছি। বেশ রসিয়ে রসিয়ে কথাবার্তা দিয়ে আমি জমাটি গল্প যে বলতে পারি না, তা নয়। কিন্তু ব্যাপার কী জানেন, বিশ্বাসঘাতকতার গল্প যত ছোট করে বলা যায়, ততই ভালো। এ কী মশাই বলার মতো গল্প! মানুষের নীচতা আর হীনতা নিয়ে আদিখ্যেতা করতে কার ভালো লাগে! আসলে মানুষ মাত্রই ভালো, এমনটি না মানতে পারেন, তবে আমি মানি। মানুষের মধ্যে যে পশু থাকে, তারা মানুষ নয়—তারা তো পশুই।'

'আপনি যে গল্পটা বলছিলেন। চাঁদু ভট্চাজের ভিটে।'

'হ্যাঁ। হ্যাঁ। চাঁদু ভট্চাজের ভিটে। ওর মাটি খুঁড়ে একটা ছোট্ট হাঁড়িতে ওই তিনশো টাকা বেরুল। এখন স্বাভাবিকভাবে দুজনেরই মনে হল, আরও হাঁড়ি আছে, আরও টাকা আছে, সোনার গয়নার হাঁড়িও থাকতে পারে। ব্যস, শুরু হল মনের ভেতরে দ্বন্দ্ব। একেবারে সরিয়ে দেবার মতলব করল এক বন্ধু অন্যকে। তারপর একদিন শেষ বাসে ওই মোড়ে নেমে ডাঙার ওই ঢালটাতে বন্ধুকে মেরে ফেলল।'

'কী সাঙ্ঘাতিক!'

'সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার তারপরও আছে।'

'খুনের পরও!'

'হ্যাঁ। মাটি খুঁড়ে কিন্তু আর কিছুই পাওয়া যায়নি।'

'বলেন কী!'

'তৃতীয় সাঙ্ঘাতিকটাও আপনার শোনা দরকার। নইলে গল্প অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।'

শিবনাথ শোনার জন্যে চোখ তুলে রাখল।

'বন্ধুকে হত্যার প্রায়শ্চিত্ত করতে বন্ধুটি আত্মহত্যা করে।'

গল্প শেষ বা ভদ্রলোকের কথাটি শেষ হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দরজার কপাট ঠেলে আর একজনের

প্রবেশ ঘটে। কালো প্যান্টের উপর গলা ঢাকা ফুলহাতা সোয়েটার কালো রঙের, হাতে ঘড়ি, মাথায় ঝাঁকড়া চুল। চেয়ারে বসা মানুষটির কোনো ভাবান্তর দেখা গেল না। আগন্তুক তাকে দেখল বটে তবে কথা বলল শিবনাথের সঙ্গে।

'সন্ধের বাসে নেমেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'নতুন মানুষ। এ রাস্তার পরিচয় ঠিক জানা নেই। তাই এখানে এসে পড়েছেন।'

শিবনাথ বলল, 'ঠিকই ধরেছেন। আপনিও বাস থেকে নেমে—'

'যা দুর্যোগ। বৃষ্টি বাড়ল বলে মনে হচ্ছে।' আগন্তুক বিছানায় বসে বলল, 'এরকম আবহাওয়ায় কেউ বের হয়?'

'তাই তো দেখছি।' শিবনাথ বলল, 'যাক্ তিনজন হওয়া গেল।'

'তিন একত্রিত হলে যে ভালো হয় তা হলপ করে বলতে পারি না। ত্র্যহস্পর্শ যোগ কী শুভ হয়? কে জানে। তা কী কথা হচ্ছিল?'

'আবার কী—বন্ধুত্বের কথা।'

আগন্তুক আসাতে শিবনাথের ভালোই লাগছে। কিন্তু ইনি কী এ বাড়িরই লোক? নাকি নয়? আসার কথা ছিল! চেয়ারে আসীন তো নীরব। কোনো কথা বলছে না। বাইরে হিম হাওয়া। বৃষ্টি কতটা কমল-বাড়ল কে জানে। এ ঘরে নিশিযাপন দেখা যাচ্ছে না খেয়েই করতে হবে। বাসে ওঠার আগে কচুরি খেয়েছে। মিষ্টি, চাও খেয়েছে। এই ঠান্ডায় চা হলে হত। ভদ্রলোক যখন আছেন, তার কী ব্যবস্থা নেই? কিন্তু বলা যাবে কী করে! শিবনাথ ইতস্তত করে। বিছানায় নড়েচড়ে বসে। এ ঘরের উষ্ণতায় বসে এখন আরাম বোধ হচ্ছে। বহুক্ষণ বাইরে যাওয়া হয়নি। একবার বেরুলে হত! এদের কাছে বাথরুমের কথা তো বলা যায় না। বাইরে সেরে এসে বিছানায় শুয়ে পড়বে।

'কী ব্যাপার?'

'একটু বাইরে যেতাম।'

'কেন?'

'অনেকক্ষণ বাথরুম সারা হয়নি আর কি।' শিবনাথ উঠে দাঁড়াল।

'আচ্ছা। যান ঘুরে আসুন।'

বাইরে বেরুতেই হিম হাওয়া শিবনাথকে যেন কাঁপিয়ে দিল। ঘুটঘুটে অন্ধকার। দরজার কপাট খোলা খানিকটা। অথচ বাইরে তো আলো আসছে না। মনে হতেই সে ভেবে দেখল, ঘরে কোনো আলো তো নেই। হ্যারিকেন কী অন্য কিছু। তবু পরস্পরকে দেখতে পাচ্ছিল কী করে? ভাবনার মধ্যে ভেতরের সংলাপ কানে গেল।

'তাহলে একজন মানুষ পাওয়া গিয়েছে।'

'হ্যাঁ।'

'যাক বহুদিন পর এল একজন। সেই শেষ কবে যেন এসেছিল?'

'অত মনে থাকে না।'

'সেটা ছিল বর্ষা। তুমুল বৃষ্টি হচ্ছিল।'

'হতে পারে।'

'ও কী জানে এখানে একজন প্রেত বাড়ি তৈরি করে চেয়ারে বসে থাকে! পথভ্রান্ত পথিকের সেখানে ঢুকলে ফেরা হয় না আর।'

'এও জানে, বন্ধুকে বন্ধু মাত্র তিনশো টাকার জন্য হত্যা করেছিল।'

'আঃ থাম। অন্তত আজকে আর তোমাকে খুন হতে হবে না। বন্ধুকে খুন করার সেই ভয়ঙ্করতা থেকে আজ একটা রাতের জন্যে মুক্তির আনন্দটা আমাকে উপভোগ করতে দাও।'

'ওকে খুন করবে?'

'হ্যাঁ বন্ধু, তাই তো করে থাকি। একটা মানুষের জন্যে তাই তো অপেক্ষা করি।'

'আর আমি বাড়ি বানিয়ে অপেক্ষা করি হত্যার দৃশ্যটা ঘটানোর জন্য। আমাদের কারো মুক্তি নেই।'

'আজ তোমাকে নয়, আমি ওই মানুষটির গলা টিপব।'

শিবনাথের বোঝার আগেই গলা দিয়ে বিকৃত আর্তস্বর বেরিয়ে আসে, 'ভূত! ভূত!'

ওমনি দরজার কাছে দাঁড়ায় আগন্তুক, 'কোথায় ভূত? এই দেখুন ভূত কেন বাড়িঘর কিচ্ছুটি নেই। চেয়ারে বসে থাকা লোক দেখেছেন, চেয়ারই নেই, তো লোক থাকবে! আঁ! আরে চিৎকার করে দেখ।'

শিবনাথ দেখল, বাড়িটা উধাও। কোনো লোক নেই। শুধু অন্ধকার আর অন্ধকার। সে ছুটতে শুরু করল প্রাণভয়ে। পিছনে তখনও ডাক, 'আরে শুনুন, শুনুন।' তারপর বিকট অট্টহাসি। অন্ধকার কাঁপিয়ে বৃষ্টিধারাকে দুলিয়ে যেন চতুর্দিকে সে হাসি ছড়িয়ে পড়তে থাকে। শিবনাথ ছোটে। দিক-দিশা নেই তার। উঁচু-নিচু পাথুরে ভুঁই, তারপর ক্ষেত, আল, ঝোপ কোনো কিছুকে তোয়াক্কা নেই। পড়তে পড়তে কোনোক্রমে নিজেকে সামলায় বেশ কয়েকবার। তারপরই টের পায় টর্চের তীব্র আলো তার উপর পড়ছে।

চেতনা ফিরে দেখে ঘরের মধ্যে সে শুয়ে আছে। হ্যারিকেন জ্বলছে। তিন-চারজন তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। চোখ খুলে বন্ধ করে, আবার চোখ খোলে।

'কে আপনি?'

'শিবনাথ।'

'নতুন লোক মনে হচ্ছে।'

'হ্যাঁ। রামপুর যাচ্ছিলাম।'

'সে এদিকে কোথায়? ভাগ্যিস টর্চের আলোয় চোখে পড়ল। আমি ওদিকে পাকা ধানের মাঠ জলে ভাসছে তাই আল কেটে জল বার করতে গিয়েছিলাম। কিন্তু ওদিকে এলেন কী করে?'

'ওই ডাঙায়—।'

'অ। স্যাঙাতখুন ডাঙা। যাক খুব বাঁচা বেঁচে গিয়েছেন।'

শিবনাথ আর রামপুর যায় না। হাওড়া ফিরে আসে। পাঁচ হাজার টাকার চেয়ে নিজের জীবনের দাম নিশ্চিত কিঞ্চিৎ বেশি।

কার্ত্তিক ১৪০৫

নস্যির ডিবে

শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়

লোকটাকে আসতে দেখে বিজনবাবু ভাবলেন তাহলে একেই নাহয় জিজ্ঞাসা করে জেনে নেওয়া যাক।

কিছু বলবেন? বিজনবাবুকে অমন বোকা বোকা মুখে তাকিয়ে থাকতে দেখে লোকটা প্রশ্ন করল।

হ্যাঁ, মানে...বিজনবাবু বললেন, এ পাড়ায় নতুন তো। আসিনি কখনো আগে, তাই এই ঠিকানাটা—বিজনবাবু পকেট থেকে একটা কাগজের টুকরো বার করতেই লোকটা সেটা ছিনিয়ে নিয়ে, চোখ বুলিয়ে বলল, বুঝেছি। ১৭/৩/২-এর বি ছিদাম মুদি লেন তো? সে তো আরো এগিয়ে। এখানে কোথায় খুঁজছেন! আসুন, আমার সঙ্গে। আমি তো ওদিকেই যাচ্ছি।

লোকটার কথা শুনে বিজনবাবু বললেন, বাঁচলাম। রাত হয়ে গেছে। পথে কেউ কোথাও নেই। ভেবে পাচ্ছিলাম না, কী করে পৌঁছব। আপনাকে পেয়ে আমার দারুণ সুবিধে হল।

দুজনে এবার পা মিলিয়ে হাঁটতে লাগলেন। বিজনবাবু বললেন, এখান থেকে কতদূর আমার এই ঠিকানাটা?

তা আধ কিলোমিটার তো হবেই। লোকটা উত্তর দিল। আপনি যাচ্ছেন কোথায়? লোকটা জানতে চাইল।

আজ্ঞে, ভাইঝির শ্বশুরবাড়ি। আসছি মেমারী থেকে।

মেমারী! মানে বর্ধমান?

আজ্ঞে, বিজনবাবু একটু থেমে বললেন, ঠিক মেমারী নয়, আমার বাড়ি আরো ভেতরে। মেমারী স্টেশান থেকে তা প্রায় কুড়ি-পঁচিশ কিলোমিটার পথ। এখানে জজকোর্টে আমার একটা কেসের শুনানি পড়েছে। সকাল দশটায় হাজিরা দিতে হবে। তাই ভাবলাম ভাইঝির বাড়ি গিয়ে আগের রাতটা থাকি। কে জানে, যদি দেরি হয়ে যায়? অতদূর থেকে আসা, সকালের ট্রেনটা যদি ফস্কে যায়।

ভালোই করেছেন। লোকটা হাঁটতে হাঁটতে বলল, এ পাড়ার রাস্তাঘাট সব আমার মুখস্থ। কথাটা বলেই, লোকটা বাঁয়ে ঘুরল। বিজনবাবুও তার সঙ্গ নিলেন। লোকটা বলল, এবার ফের বাঁ হাতে গিয়ে, তারপর দু'বার ডানদিকে বেঁকে, তারপর হাঁটতে হবে সোজা নাক বরাবর। আগে পৌঁছব আমি, তারপর আপনি।

এতসব আঁকাবাঁকা রাস্তা, আপনি না থাকলে মুশকিলে পড়তাম। খানিকটা ঘুরপাক খেয়ে শেষে মনে হয় ফিরেই যেতে হত।

ঠিক। লোকটা বলল, এ পাড়ার রাস্তাগুলোই এমন। এখানে ঠিকানা খুঁজে পাওয়া বেশ ঝামেলার।

আপনিও কি আসছেন বাইরে থেকে? বিজনবাবু প্রশ্ন করলেন।

বাইরে ঠিক বলা যাবে না। এখন আমি এই আশেপাশেই থাকি। তবে তাকে কী আর ঠিক থাকা বলা যায়—বলতে বলতে থেমে গিয়ে কথা ঘুরিয়ে সে বলল, যাকগে, সে অনেক কথা। সেসব না হয় নাই বললাম।

আপনি কি তার মানে একটা রাত কাটিয়েই—

না না। লোকটা হাঁকপাঁক করে উঠে বলল, রাতফাত আমি কাটাব না। যাব আর আসব।

বলেন কী? বিজনবাবু হাঁটতে হাঁটতে বললেন, এই রাতে পৌঁছেই আবার ফিরে যাবেন? এতটা পথ। অবশ্য উপায় একটা আছে—রিকশা! কারণ ট্রাম, বাস তো সব বন্ধ হয়ে গেছে।

ওসবের আমি তোয়াক্কা করি না। লোকটা বিজনবাবুকে থামিয়ে দিয়ে বলল, ওসব ট্রাম, বাস, অটো, রিকশায় আমার অরুচি। ওসব ঢের চড়েছি। এখন যেখানে যাই হেঁটেই যাই।

বলেন কী? বয়স তো দেখছি ভালোই হয়েছে। এত বয়েসেও আপনি—

হ্যাঁ। বয়স ভালোই হয়েছে। বোধহয় চুরাশি-পঁচাশি হবে। ঠিক হিসেব নেই। লোকটা কথাটা বলেই হাঁটার গতি একটু বাড়িয়ে দিল। পা-ও ফেলতে লাগল বেশ লম্বা লম্বা।

উফ্! বিজনবাবুর ওর সঙ্গে পা মিলিয়ে হাঁটতে গিয়ে দম ফুরিয়ে যেতে লাগল। তিনি হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, বাপরে, আপনার সঙ্গে পা মিলিয়ে চলা তো দেখছি প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠছে। একটু যদি আস্তে হাঁটেন।

আর আস্তে আর জোরে। নস্যি নস্যি করে আমার প্রাণটা বলে এখন আইঢাই করছে। ওই দেখুন ওই দেখা যাচ্ছে আমার বাড়ি—লোকটা বিজনবাবুকে দেখাল দূরে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে গেটওয়ালা একটা বাড়ি।

আপনি ওই বাড়িতে থাকেন? বিজনবাবু বললেন, আপনার বুঝি নস্যির নেশা?

নেশা বলে নেশা! নস্যি ছাড়া আমি একদণ্ডও থাকতে পারি না। অথচ আজ একমাস হয়ে গেল—

সেকি! একমাস আপনি নস্যি নেননি?

তবে আর শুনছেন কী!

কোথাও বাইরে গিয়েছিলেন বুঝি?

বাইরে তো বটেই।

তা সেখানে কি নস্যি কিনতে পাওয়া যায় না?

নস্যি যদি মিলতো সেখানে তাহলে কি আর আসতাম এমন ছুটতে-ছুটতে! আজ আমার নস্যি চাই-ই চাই।

এখন তো প্রায় পৌঁছে গেছেন, বিজনবাবু বললেন। পরমুহূর্তেই কী যেন খেয়াল হল তাঁর, কিন্তু আপনি যে বলছিলেন, আজই আবার ফিরে যাবেন? এটা যদি আপনার বাড়িই হবে তাহলে—

বাড়ি তো বটেই। তবে এখন আর ওখানে আমি থাকছি কোথায়?

বিজনবাবু এবার একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, মানুষটা আপনি ভালোই, কিন্তু বড্ড হেঁয়ালি করেন।

যা বলেছেন। কথাটা বলেই লোকটা এবার সেই বাড়িটার গেটে দাঁড়িয়ে পড়ল।

বিজনবাবু বললেন, এইটা আপনার বাড়ি?

হ্যাঁ এইটা। দেখেছেন গেটে আমার নাম লেখা আছে! লোকটা বিজনবাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করাল গেটে ঝোলানো নেমপ্লেটটার দিকে।

কিন্তু একি! বিজনবাবু নামটা পড়েই চোখ দুটোকে কপালে তুললেন। এ কার নাম? নেমপ্লেটে লেখা আছে ঁনিতাই চন্দ্র মালাকার।

আপনার নামের আগে চন্দ্রবিন্দু কেন? বিজনবাবু বড় বড় চোখ তুলে লোকটার দিকে তাকালেন।

এখন তো আমার নামের আগে একটা চন্দ্রবিন্দুই বসার কথা! মুখে টেপা হাসি ছড়িয়ে লোকটা বলল, আমার ছেলেরা ঠিকই লিখেছে। যদিও ছেলেগুলো এক একটা ডাহা গাধা!

সেকি, আপনার ছেলেদের গাধা বলছেন কেন? বিজনবাবু প্রশ্ন করলেন।

বলব না! লোকটা রেগে উঠে বলল, অত খরচা করে বাপের শ্রাদ্ধ করলি, অত দানধ্যান করলি, আর তাতে একটা নস্যির ডিবে দিতে ভুলে গেলি! জানিস তো, তোদের বাপ নস্যি ছাড়া একটা মিনিটও থাকতে পারে না। আজ একমাস নস্যি না নিয়ে....উফ্! শরীরের যে কী অবস্থা হয়েছে, সে আর কী বলব—

তার মানে—

আরে হ্যাঁ, ওই নস্যির ডিবেটা নিতেই আজ আমার আসা, ডিবেটা নোব আর কেটে পড়ব। কথাটা বলেই লোকটা যে কোথায় উধাও হয়ে গেল!

বিজনবাবু একবার এদিক-ওদিক তাকিয়েই পাঁই পাঁই করে ছুটতে শুরু করলেন।

—

ভূত বলে কিছু নেই

মনোজ সেন

শ্রীকান্ত বসু আর প্রদীপ গুপ্ত অভিন্নহৃদয় বন্ধু, যদিও দুজনের স্বভাবে কিছুমাত্র মিল নেই। শ্রীকান্ত বা কানু চটপটে, হাসিখুশি, চঞ্চল। আর প্রদীপ বা ভোলা গম্ভীর প্রকৃতি, শান্ত। একটু সুযোগ পেলেই যত্রতত্র অকাতরে ঘুমিয়ে পড়তে পারেন। দুজনেই কলকাতার কাছে একটা কারখানায় চাকরি করেন। প্রত্যেক বছর পুজোর ছুটিতে বেড়াতে বেরিয়ে পড়েন। কানুর একটা পুরোনো মডেলের হিন্দুস্থান গাড়ি আছে, সেটি হল ওঁদের বাহন। এই দুজন, নাকি তিনজন যতবারই বেড়াতে বের হন, ততবারই কোনো না কোনো মারাত্মক অ্যাডভেঞ্চারের অভিজ্ঞতা নিয়ে ফেরেন। কত কী যে ঘটেছে ওঁদের এই ঘোরার সময়—বাঘে তাড়া করেছে, হাতি পথ আটকেছে, ডাকাতে ধরেছে। কোনোরকমে প্রাণ হাতে করে ফিরে এসেছেন প্রত্যেকবার।

সেবার ওঁরা স্থির করলেন নাগাল্যান্ড যাবেন। কোহিমায় ভোলাবাবুর মেজদার বন্ধু পরিতোষ হালদার চাকরি করেন। অনেকদিন থেকেই যেতে বলছেন দুজনকে। মস্ত বাংলোয় থাকেন, একা মানুষ। কাজেই কোনো অতিথি এলে অত্যন্ত খুশি হন, আতিথেয়তার কোনো অভাব হয় না।

পুজোর ছুটির সঙ্গে আরও কিছুদিনের ছুটি যোগ করে, সপ্তমীর দিন দুই বন্ধু বেরিয়ে পড়লেন। কোহিমা পর্যন্ত যেতে কোনো অসুবিধে হল না তেমন। কানুবাবুর গাড়ি চালানোর কষ্ট ভুলিয়ে দিল গুয়াহাটি থেকে কোহিমা যাবার রাস্তার দু'পাশের অপূর্ব দৃশ্য। বর্ষার পর ঘন সবুজ জঙ্গলে ঢাকা পাহাড়ের যে রূপ তা যে কোনো মানুষেরই সমস্ত ক্লান্তি দূর করে দিতে পারে। ভোলাবাবু অবশ্য সমস্ত রাস্তাটাই ঘুমিয়ে কাটালেন। কানুর বেসুরো গলায় উদ্ভট গানগুলো তাঁকে কিছুমাত্র বিরক্ত করতে পারল না।

গোলমাল বাধল ফেরার সময়। পরিতোষবাবুর দিলদরিয়া স্বভাব আর অকৃপণ অতিথিসৎকারের ফলে দুজনে অত্যন্ত সন্তুষ্টচিত্তেই রওনা হয়েছিলেন। কিন্তু ঘণ্টাখানেক যেতে না যেতেই নামল তুমুল বৃষ্টি। যদিও রাস্তা জনহীন, কোনো গাড়ি বা লরির চিহ্নমাত্র নেই, তবুও এরকম বর্ষায় গাড়ি চালানো অত্যন্ত বিপজ্জনক। কানুবাবু কিন্তু গাড়ি চালিয়েই যেতে থাকলেন কারণ থামতে তাঁর মোটেই ভালো লাগছিল না। ঘন জঙ্গলের মধ্যে কোথায় গাড়ি দাঁড় করাবেন? যদিও তখন সকাল আটটা কিন্তু জঙ্গলের নিশাচর জন্তু-জানোয়াররা সবাই যে নিয়ম মেনে শুতে গেছে সে রকম কোনো স্থিরতা তো নেই। তার ওপর বিপজ্জনক মানুষেরও কোনো অভাব নেই। কাজেই খুব সাবধানে হেডলাইট জ্বেলে প্রায় আন্দাজে রাস্তার নিশানা রেখে আস্তে আস্তে গাড়ি চালাতে লাগলেন কানুবাবু। ভোলাবাবুর কোনো বিকারই নেই। তিনি অকাতরে ঘুমোতে লাগলেন।

কিছুটা যাবার পরেই এমন একটা দৃশ্য দেখলেন কানুবাবু যে তাঁকে গাড়ি দাঁড় করাতেই হল। রাস্তার ধারে একটা প্রকাণ্ড গাছের নীচে একটা নাগা মেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার পরনে স্কুল ইউনিফর্ম, পিঠে স্কুলব্যাগ, বয়েস এগারো-বারো হবে। হাপুস নয়নে কাঁদছে মেয়েটি। তার সর্বাঙ্গ ভিজে গেছে আর সেইজন্যেই বোধহয় থরথর করে কাঁপছে।

কানুবাবু গাড়ি দাঁড় করালেন বটে, কিন্তু মেয়েটি এগিয়ে এল না। যেখানে ছিল, সেখানে দাঁড়িয়েই উদ্বিগ্ন চোখে গাড়িটাকে দেখতে লাগল। কানুবাবু ইঞ্জিন বন্ধ করে জানলা নামিয়ে বললেন, 'তুমি কি ইংরিজি জানো?'

মাথা নেড়ে মেয়েটি জানাল যে সে জানে।

'এরকম নির্জন জায়গায় এই বৃষ্টির মধ্যে তুমি একা দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন? কোথায় যাবে তুমি?' জিগ্যেস করলেন কানুবাবু।

এইবার মেয়েটি আস্তে আস্তে এগিয়ে এল। কানুবাবুকে দেখে আর তাঁর কথা শুনে একটু বোধহয় ভরসা পেল। ভাঙা ভাঙা ইংরিজিতে বলল, 'আমি স্কুলে যাচ্ছিলুম। দেরি হয়ে গিয়েছিল তাই বন্ধুরা আগে চলে গেছে। ভেবেছিলুম দৌড়ে ওদের ধরে ফেলব। এখন এমন বৃষ্টি নামল! এ অবস্থায় আমি ইস্কুলেও যেতে পারছি না, বাড়িও ফিরতে পারছি না।' বলে আবার কান্না শুরু করল।

'কোথায় তোমার বাড়ি?' জিগ্যেস করলেন কানুবাবু।

'এখান থেকে মাইল দেড়েক দূরে আমাদের গ্রাম। ঐদিকে।' বলে মেয়েটি কানুবাবুরা যেদিকে যাচ্ছিলেন সেই দিকে আঙুল তুলে দেখাল। 'ঐ টিলাটার ওপাশে।'

'তবে তো আমাদের পথেই পড়বে। তুমি গাড়িতে উঠে এসো। আমরা তোমাকে পৌঁছে দেব। তোমাদের গ্রাম পর্যন্ত গাড়ি যাবে?'

'যাবে। মাঝখানে একটা নদী আছে তবে তার ওপরে একটা ব্রিজ আছে।'

'তবে তো ভালোই হল। উঠে এসো।'

মেয়েটি ইতস্তত করছিল। কানুবাবু বললেন, 'কী হল? দেরি করছ কেন?'

'তোমার সঙ্গে ঐ লোকটি অমনভাবে পড়ে আছে কেন? মাতাল?'

'আরে না না। ও ঘুমোচ্ছে। সব সময়েই ঘুমোয়।' বলে কানুবাবু ভোলাবাবুকে এক ধাক্কা মেরে বললেন, 'অ্যাই ভোলা ওঠ। দ্যাখ, এই মেয়েটি তোকে দেখে মাতাল ভাবছে। ভাববেই। এই সকালে কেউ ঘুমোয়!'

ভোলাবাবু আড়মোড়া ভেঙে উঠে বললেন, 'মেয়ে? আরে তাই তো, এ কে? বৃষ্টিতে আটকে গেছে বুঝি?'

কানুবাবু বললেন, 'ওকে বাড়ি পৌঁছে দেব। কাছেই গ্রাম। ভালোই হল, একটা নাগা গ্রামও দেখা হয়ে যাবে।'

মেয়েটি তখনও ইতস্তত করছে দেখে কানুবাবু একটু অধৈর্য হয়ে বললেন, 'আবার কি হল? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজে কোনো লাভ আছে?'

মেয়েটি বলল, 'আপনার গাড়ির সিট কিন্তু ভিজে যাবে।'

'ভিজুক। সে তোমাকে ভাবতে হবে না।'

অত্যন্ত সঙ্কুচিতভাবে মেয়েটি গাড়ির পেছনের সিটে উঠে বসল। বলল, 'আমি অত্যন্ত লজ্জিত। আপনাদের এরকমভাবে বিব্রত করলুম।'

কানুবাবু বললেন, 'ওসব কথা ছাড়ো। এখন আমাদের রাস্তা দেখাও।' বলে গাড়ির ইঞ্জিন চালু করবার জন্যে চাবি ঘুরিয়ে সেল্ফ স্টার্টারের বোতাম টিপলেন। গাড়ি স্টার্ট হল না। যতবার বোতাম টেপেন কানুবাবু, ততবারই গাড়ি চ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ চ্যাঁ চ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ করে আর্তনাদ করে থরথর করে কাঁপে। কিন্তু তার ইঞ্জিন আর চালু হয় না।

খেয়েছে। ইঞ্জিন নির্ঘাৎ ঠান্ডা হয়ে জমে গেছে। ভাবলেন কানুবাবু, কিন্তু স্টার্ট তো করতেই হবে। এরকমভাবে রাস্তার মাঝখানে তো দাঁড়িয়ে থাকা যায় না।

প্রবল বৃষ্টির মধ্যেই গাড়ি থেকে বেরুতে বাধ্য হলেন কানুবাবু। ভোলাবাবুকে বলে লাভ নেই কারণ তিনি আবার ঘুমিয়ে পড়েছেন। বনেটের ডালা খুলে স্পার্ক প্লাগগুলো নাড়াচাড়া করলেন কিন্তু তাতে আর কি লাভ! আগুন জ্বেলে সেগুলো গরম করা দরকার। কোথায় আগুন জ্বালবেন? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজছেন আর কি করা যায় ভাবছেন কানুবাবু।

এমন সময় দূরে একটা গাড়ির আওয়াজ পাওয়া গেল। এইদিকেই আসছিল গাড়িটা। বৃষ্টির প্রায় নিশ্ছিদ্র পর্দার পেছনে একজোড়া হেডলাইটের ম্লান আলো দেখা গেল। গাড়ি যখন, তখন নিশ্চয়ই সাহায্য পাওয়া যাবে, এই ভেবে কানুবাবু এগিয়ে গেলেন পেছনের

গাড়িটার দিকে। দু'হাত তুলে থামতে বললেন। গাড়িটা থামল। দেখা গেল সেটা একটা জিপ—স্থানীয় পুলিশের।

পুলকিত চিত্তে কানুবাবু জিপের কাছে চলে গেলেন। জানলা খুলে মুন্ডু বের করলেন একজন অফিসার। বললেন, 'কী হয়েছে? গাড়ি খারাপ?'

নাক-চোখ থেকে জল ঝেড়ে ফেলে কানুবাবু বললেন, 'হ্যাঁ। স্টার্ট নিচ্ছে না। তবে সেটা বড়ো কথা নয়। আমার গাড়িতে একটা বাচ্চা মেয়ে আছে। সে বাড়ি ফিরতে পারছে না এইরকম আবহাওয়ায়। আপনারা যদি দয়া করে ওকে পৌঁছে দেন আর সেই সঙ্গে একজন গাড়ির মিস্ত্রিকে যদি খবর দিয়ে দেন তো বড়ো উপকার হয়।'

'মেয়েটির বাড়ি কোথায়?'

'ঐ টিলাটার ওপাশে। এখান থেকে মাইল দেড়েক দূরে।'

'ঐ টিলাটার ওপাশে? মেয়েটি এখনও রয়েছে আপনার গাড়িতে?' বলতে বলতে প্রবল বৃষ্টি অগ্রাহ্য করে লাফ দিয়ে জিপ থেকে নামলেন পুলিশ অফিসার। কোমরের খাপ থেকে রিভলভার বের করে উত্তেজনায় কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, 'চলুন তো।'

কানুবাবু বেশ আশ্চর্যই হলেন। বললেন, 'আপনি এত উত্তেজিত হচ্ছেন কেন? মেয়েটির নিতান্তই অল্প বয়েস, স্কুলে পড়ে।'

অফিসার বিরক্ত গলায় বললেন, 'কোনো কথা বলবেন না। চুপচাপ আসুন।'

অফিসারের পেছনে পেছনে জিপ থেকে তিনজন বন্দুকধারী কনস্টেবলও নেমে এসেছিল। তারা চারজনে মিলে কানুবাবুর গাড়িটা ঘিরে ফেলল। অফিসার গাড়ির ভেতরে উঁকি মেরে বললেন, 'কোথায় মেয়ে? আর এ কে? মরে গেছে না কি?'

কানুবাবু বললেন, 'মেয়েটি নেই? তাহলে আপনাদের দেখে পালিয়েছে। আর ও আমার বন্ধু। মারা যায়নি, ঘুমোচ্ছে।'

'বাব্বা, এমন ঘুম! মেয়েটিকে ঠিক দেখেছিলেন তো?'

'নিশ্চয়ই ঠিক দেখেছি। দেখুন না পেছনের সিট আর তলায় পা রাখার জায়গা ভিজে রয়েছে কিনা।'

অফিসার বললেন, 'না, একেবারেই ভিজে নেই।' বলে কনস্টেবলদের বললেন, 'তোমরা জিপে গিয়ে বসো। আমি আসছি।'

দরজা খুলে পেছনের সিটে বসলেন অফিসার। কানুবাবুকে বললেন, 'আপনি উঠে আসুন। আর আপনার বন্ধুকে ঘুম থেকে তুলুন। ওঁকে বলুন যে আজ সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গেছেন দুজনে।'

এইবার ভয় পেলেন কানুবাবু। ধাক্কা মেরে ওঠালেন ভোলাবাবুকে। বললেন, 'শোন একবার ইনি কি বলছেন।'

অফিসার ভোলাবাবুকে জিগ্যেস করলেন, 'আপনি মেয়েটিকে দেখেছিলেন?'

ভোলাবাবু বললেন, 'কোন মেয়ে? ও সেই যাকে কানু বাড়ি পৌঁছে দিতে যাচ্ছিল? দেখেছি বৈকি? কোথায় সে?'

'সেটা পরে বলছি। আচ্ছা, মেয়েটি কি লাল আর সবুজে চৌখুপী ডিজাইনের স্কার্ট আর সাদা রঙের জামা পরে ছিল? কাঁধে ছিল গাঢ় নীল রঙের স্কুলব্যাগ?'

'ঠিক তাই। গেল কোথায় সে?'

'কোথাও যায়নি। এখানেই সে রয়েছে। একটা শিকার ফস্কেছে, আর একটার আশায় বসে রয়েছে।'

'কী যে বলেন তার ঠিক নেই। শিকার আবার কি? ঐটুকু একটা বাচ্চা মেয়ে...'

'তাহলে শুনুন। ঐ যে টিলাটি দেখছেন যার ওপাশে মেয়েটির গ্রাম, ওটার পেছনে যাবার কাঁচা রাস্তাটি এই হাইওয়ে থেকে বেরিয়ে সামান্য কিছুদূর গিয়েই একটা সূচ্যগ্র বাঁক নিয়ে বিপজ্জনকভাবে

খাড়া নেমে গেছে নীচে পাহাড়ি নদীতে। যারা এইসব পাহাড়ি রাস্তায় গাড়ি চালাতে অভ্যস্ত, তাদের পক্ষেও সেই উৎরাইতে সামলে চালানো প্রায় অসম্ভব। আর যারা অভ্যস্ত নয়, তাদের পক্ষে হুড়মুড় করে গিয়ে অনেক নীচে নদীর প্রচণ্ড স্রোতের মধ্যে আছড়ে পড়া ছাড়া অন্য গতি নেই। আর, সেই পড়ার অর্থ অবধারিত মৃত্যু।'

'ব্রেক কষলে লাভ হয় না?'

'না। গাড়ি তাহলে ডিগবাজি খেয়ে নদীর মধ্যে পড়বে। আর ব্রেক কষবেন কখন? বাঁকটা ঘোরার সঙ্গে সঙ্গেই তো উৎরাই। তার ওপর এই বৃষ্টি। একহাত দূরের গাছটাই ভালো দেখা যায় না তো রাস্তা। ঐ মোড়ে যানবাহনকে সতর্ক করতে বড়ো বোর্ডও আছে। এই বৃষ্টিতে সেটাই কি কারো নজরে পড়তে পারে?'

কানুবাবু বললেন, 'মেয়েটি যে বলল নদীর ওপর একটা ব্রিজ আছে।'

'ছিল। বছর পনেরো আগে সেটা বন্যায় ভেঙে যায়। এখন একটা দড়ির সাঁকো আছে। তার ওপর দিয়ে সাইকেল ঠেলে নিয়ে যাওয়া চলে, আপনার এই গাড়ি নয়।'

'নদীর ওপারে গ্রামটা?'

'সেটা আছে। মেয়েটি ওই গ্রামেই থাকত।'

'থাকত?'

'হ্যাঁ। প্রায় বারো বছর আগে এমনি এক বর্ষার সকালে স্কুলে যাবার সময় দৌড়ে রাস্তা পার হতে গিয়ে গাড়ি চাপা পড়ে। ড্রাইভারের খুব একটা দোষ ছিল তা বলা যায় না। বৃষ্টিটা হচ্ছিল খুব জোরে, বেচারি দেখতে পায়নি। যখন দেখেছে তখন আর সামলাতে পারেনি। তারপর থেকে, এই বারো বছরে প্রায় আট-দশটা গাড়ি ঐ রাস্তা দিয়ে নেমে গিয়ে নদীতে ভেঙে পড়েছে। প্রায় চোদ্দ-পনেরো জন লোকের মৃত্যু হয়েছে। কেবল একজন গুরুতরভাবে আহত হয়েও বেঁচে ছিল কিছুদিন। মারা যাবার আগে সে যে বয়ান দিয়েছিল, তার থেকেই আমরা জানতে পারি কেন এই গাড়িগুলো প্রবল বৃষ্টির মধ্যে হাইওয়ে ছেড়ে ঐ দুর্গম রাস্তায় ভয়াবহ মৃত্যুর দিকে এগিয়ে গেছে। তা না হলে হয়তো এই ঘটনাগুলো একটা রহস্যই থেকে যেত। আমাদের ওপরওয়ালারা অবশ্য এ বয়ানে বিশ্বাস করেননি। তাঁরা বলেন দুর্ঘটনার ফলে লোকটির মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল, তাই উল্টোপাল্টা বকেছে। তাঁরা এই ব্যাপারটায় একটা রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের গন্ধ পেয়ে থাকেন। আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপও বাদ যায় না।'

'অর্থাৎ আপনি বলতে চান যে মেয়েটি ভূত? আর এসব ভূতের প্রতিহিংসার ব্যাপার?'

'অফিসিয়ালি সে কথা আমি আপনাকে বলতে পারি না।'

'আমি ভূতে বিশ্বাস করি না।' ব্যাজার মুখে বললেন কানুবাবু।

'না করতে পারেন। আপনার গাড়িটা কিন্তু করে। আর সেইজন্যেই সে ভয়ে স্টার্ট নেয়নি যে কারণে আপনারা এখনও জীবিত আছেন। যাক গে, এখন বনেটটা একবার খুলুন, দেখি একে স্টার্ট করানো যায় কিনা।' বলে গাড়ি থেকে নামলেন অফিসার।

বনেট খোলার দরকার হল না। কানুবাবু চাবি ঘুরিয়ে সেল্ফ স্টার্টার টেপা মাত্র গাড়ি চড়াৎ করে চালু হয়ে গেল। পুলিশ অফিসার জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বললেন, 'দেখেছেন? কি বলেছিলাম?' বলে পেছনে জিপের দিকে চলে গেলেন।

কানুবাবু সস্নেহে গাড়ির স্টিয়ারিং-এ হাত বুলিয়ে বললেন, 'দূর ব্যাটা ভিতুর ডিম! ভূত বলে কিছু নেই, জানিস না? ভয়ে একেবারে ঠান্ডা হয়ে গেলি?'

আষাঢ় ১৪০৮

বাঁশি হাতে মানুষটি

সুকুমার ভট্টাচার্য

আমার স্কুল খুলে গেছে। আমি আবার ক্লাসে এসে বসেছি। সিস্টার তাঁর টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে পড়া বুঝিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেও আমার মন কিন্তু ভাবছে অন্য কথা। কয়েক সপ্তাহ আগে যা ঘটে গেছে, আমি এখনো ভাবছি সেই কথাই।

ঘটনাটা যেমন আশ্চর্যের, তেমনি উত্তেজনাকর। শুনে সবাই বলবে অসম্ভব, এমন ঘটনা ঘটতেই পারে না। জবাবে আমি শুধু বলব, এমন ঘটনাও ঘটে।

সেই মানুষটি, বাঁশি হাতে সেই বৃদ্ধ মানুষটি, শুধুমাত্র বাঁশি বাজিয়ে আমাকে ঘর থেকে টেনে নিয়ে গেছিলেন বাইরে।

সপ্তাহ তিনেক আগের ঘটনা। বড়দিনের উৎসবের দিনগুলি পার হয়ে গেছে, আমার স্কুলের ছুটি তখনও ফুরোয়নি। আমি বাবা-মার কাছে। তাঁরা তো আর আমার মতো খ্রিস্টমাসের লম্বা ছুটি পান না। তাই দুজনেই সময়মাফিক অফিস বেরিয়ে যান। সমস্ত দিনের মতো ফ্ল্যাটটিতে আমি একলাই থাকি। এমন একলা রেখে যাওয়াটা আমার মা-বাবা কেউই পছন্দ করতেন না। কিন্তু এছাড়া উপায়ও কিছু ছিল না। আমি একলাই থাকতাম, আর বেশ ভালোও লাগত থাকতে। বারো বছর বয়েস হলে হবে কি, নিজেকে বেশ বড় বলেই মনে হত। যেন ফ্ল্যাটটা ভাড়া নিয়ে আমি একাই থাকি।

তা বলে সমস্ত দিন আমি বসে কাটাই না। ব্রেকফাস্টের বাসনপত্তর ধোয়া দিয়ে শুরু করে, বিছানা গোছানো, ঘর পরিষ্কার—সবই করে যাই পরপর। আমার স্কুল থাকলে এসব কাজ মাকেই করতে হত। এখন আমার ছুটি। তাই মাকে আর অত খাটতে দিই না। স্কুল খুলে গেলে, সবই তো আবার করতে হবে তাঁকে।

আর ওই ক'টা কাজ সারতে কত আর সময়ই বা যায়। খুব জোর এগারোটা। তারপর সারাদিনটা সামনে পড়ে। কাজ বলতে কিছুই নেই। অতএব গল্পের বই পড়ো, কিংবা টেপ বাজিয়ে সেটার সঙ্গে গলা মিলিয়ে গান করো। খাওয়া-দাওয়ার পর রেডিওটা দিতাম খুলে। শুনতে শুনতে ঘুম হয়ে যেত কিছুটা। তারপর বিকেল হলে, দরজায় তালা লাগিয়ে বেরিয়ে পড়তাম রাস্তায়। আমার মায়ের আদেশ ছিল, বিকেল হলে ঘণ্টাখানেকের জন্যে আমি যেন নিশ্চয়ই বেড়াতে বেরোই।

এই রকমই একদিন বেড়াতে বেরিয়ে রাস্তায় সেই বাঁশি হাতে মানুষটিকে প্রথম দেখেছিলাম। ফ্ল্যাটের সামনের রাস্তাটা যেখানে গিয়ে ডান হাতে বাঁক নিয়েছে, ঠিক সেখানেই তিনি সেদিন দাঁড়িয়েছিলেন। বয়স্ক মানুষ। রোগা লিকলিকে চেহারা। মাথার সাদা ধবধবে চুলগুলো হাওয়ায় উড়ছে। পরনের জামা-প্যান্ট তেমন অপরিষ্কার না হলেও পুরোনো, রঙচটা। দুটি কঙ্কালসার হাতে একটি বাঁশি। আঙুল ক'টি বাঁশির ফুটোর ওপর ওঠানামা করে সুরের মায়াজাল ছড়িয়ে দিয়েছে।

প্রথম দিন আমি তাঁকে দেখি, কয়েক মিনিটের মতো বাঁশি শুনি, এবং তাঁর দিকে তাকাতে তাকাতে চলে যাই। কি জানি কেন, আমার খুব লজ্জা করছিল তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকতে। দ্বিতীয়, তৃতীয় দিনেও তাই। কিন্তু চার দিনের দিন আমি আর চলে যেতে পারিনি। সাহস করে তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। সেদিন আবার বৃষ্টি পড়ছিল। একে শীত, তায় বৃষ্টি। পথচারীরা যার যা আছে, গায়ে-মাথায় মুড়ি দিয়ে তড়িঘড়ি ছুটে চলেছেন। যাঁদের মাথায় ছাতা, তাঁরাও তেমন কেউ ধীরপদ নয়। শুধু বাঁশি হাতে মানুষটি মোড়ের বাঁকে দাঁড়িয়ে আপন মনে বাঁশি বাজাচ্ছেন, আর আমি সামনে দাঁড়িয়ে শুনছি।

একসময় তিনি থামলেন। হাসি হাসি মুখে তাকালেন আমার দিকে। এমন গভীর মনকাড়া চাউনি যে, এভাবে কেউ কোনোদিন তাকায়নি আমার দিকে। অস্বস্তি বোধ করলাম। তারপরেই মনে হল, একটি বয়স্ক মানুষের পক্ষে এভাবে তাকানোটাই হয়তো স্বাভাবিক।

উনি আমায় দেখছেন। আমিও তাকিয়ে আছি ওঁর দিকে। বৃষ্টি ঝরছে গুঁড়ি গুঁড়ি। একসময় আমি পা বাড়ালাম বাড়ির দিকে। যেতে যেতে পিছু ফিরে তাকালাম। তিনি তখনো সেখানে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছেন আমার দিকে। হঠাৎ আমি খুব জোরে ছুট লাগালাম বাড়ির দিকে। বাঁশিটা আবার বেজে উঠল। বাড়ির সামনাসামনি হয়ে আবার তাকালাম সেদিকে। দেখি, মানুষটি ঠিক আগের জায়গাটিতে দাঁড়িয়ে, আপন মনে বাঁশিতে ফুঁ দিয়েছেন।

তাঁর সম্বন্ধে মা-বাবাকে কিছুই বললাম না। কেন বলিনি, বলতে পারব না। ইচ্ছে করে যে গোপন করেছি, এমন নয়। ব্যাপারটাকে বলার মতো কিছু বলে আমার মনেই হয়নি।

পরের দিন ঠিক সময়ে আমি আবার বেরোতে যাব, ভারী অবাক কাণ্ড, মনে হল, বেড়ানোর থেকে আমি যেন তাঁকে দেখতেই যাচ্ছি! এই ভাবটাই আমাকে পেয়ে বসল! আগের দিনের লাজুক ভাবটা তো ছিলই না, বরং বেশ আনন্দ লাগছিল তাঁর কাছে যেতে।

কিছুটা হাঁটার পর তাঁকে দেখতে পেলাম। রাস্তার বাঁকে পুরোনো জায়গাটাতেই দাঁড়িয়ে। আগের দিনের মতো আবহাওয়া সেদিনও খারাপ ছিল। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি তো ছিলই, তাছাড়া তিনি যেখানে দাঁড়িয়ে, সেখানে পায়ের নীচে বেশ কিছুটা জল জমে। একটু কাছাকাছি হতেই বাঁশির স্বর কানে এল। পাখির গানের মতো সুর ভেসে বেড়াচ্ছে বাতাসে। আমি দেখলাম তাঁর পরনের যা কিছু, সব ভিজে স্যাঁতসেঁতে। জুতোপরা পায়ের পাতাটাও ডুবে আছে জলে।

তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। আর তখনি বড় বড় ফোঁটায় চড়বড়িয়ে বৃষ্টি নামল। কি জানি কেন, ভিজে গেলেও আমি তাঁকে ফেলে চলে যেতে পারছি না। জিগ্যেস করলাম, আপনার কি খিদে পেয়েছে? কিছু খাবেন?

বাঁশি বাজানো বন্ধ করে মাথা নাড়লেন তিনি।

বেশ, তাহলে আসুন আমার সঙ্গে। বিকেলের জলখাবার মা যা রেখে গেছেন, দুজনে ভাগ করে খাব।

বাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করলাম। দেখলাম তিনি পিছু পিছু আসছেন। ডাকলেও, আমার কেমন ধারণা ছিল উনি হয়তো আসবেন না। কিন্তু তা নয়। উনি আসছেন। কিন্তু সেই সময় তাঁকে যেন কেমন রহস্যময় বলে মনে হল। আমি হাঁটছি, রাস্তার ওপর আমার পায়ের ছাপ পড়ছে। লক্ষ করে দেখলাম, ওনার কিন্তু পড়ছে না। ভাবলাম, হয়তো বাঁশির গুণেই এমনটি হচ্ছে। ভগবানদত্ত কিছু একটা না থাকলে এত ভালো বাঁশি বাজানো যায় না। আমি কি করে বুঝব যে এটা সত্যি সত্যিই খুব রহস্যময়। তবে মা-বাবার কাছে শুনেছি, পৃথিবীতে অনেক কিছুই রহস্যময়। আমাদের যে জীবন, তার শুরুতেও সেই একই রহস্যের মায়াজাল। অতএব ছোটখাটো এসব ব্যাপার নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামালে চলে না।

সিঁড়ি দিয়ে আমি তাঁকে দোতলার ফ্ল্যাটে নিয়ে এলাম। মা আমায় যেমনটি শিখিয়েছেন, তেমনভাবে পাপোশে পা মুছে আমি ঘরে ঢুকলাম। কিন্তু তিনি তা করলেন না। সোজা ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। অবাক হয়ে দেখলাম, মেঝেয় কোনোরকম পায়ের ছাপ পড়ল না। বসার ঘরে এসে চেয়ার এগিয়ে দিলাম। তিনি বসলে পর আমি ভেতরের ঘরে চলে গেলাম। আমার জলখাবার থেকে কিছুটা নিয়ে এসে রাখলাম তাঁর সামনে। বসলাম তাঁর বিপরীতের চেয়ারটাতে। দেখলাম, তিনি তখনো তাকিয়ে আছেন আমার দিকে। অস্বস্তিতে মুখ নামিয়ে নিলাম। আবার যখন তুললাম, দেখলাম সেই একই ভাব।

এই সময় খুব শান্তভাবে তিনি জিগ্যেস করলেন, তুমি কি আমায় ভুলে গেছ?

ভুলে গেছি! কখ্খনো নয়। জোর গলায় বললাম, জানেন, কাল থেকে প্রায়ই আপনার কথা আমার মনে পড়ছে।

না, আমি ঠিক এখনকার কথা বলছি না। তারপর বেশ কিছুটা দ্বিধা জড়ানো গলায় বললেন, আমি অন্য আর একসময়কার কথা বলছি।

অন্য আর একসময়!

হ্যাঁ। সে-সময় আমাদের দুজনেরই বয়েস খুব কম ছিল।

এখনি তো আমার বয়েস খুব কম।

উঁহু, আমি এখনকার কথা বলছি না। এখন তুমি নতুন করে কম বয়েস পেয়েছ।

নিন, খেয়ে নিন। ঠিক আমার মা যেভাবে খেতে বলেন, কতকটা সেইভাবে কথাটা আমার মুখ দিয়ে বার হল। আশ্চর্য! সময় বিশেষে আমিও কাউকে এভাবে বলতে পারি, জানা ছিল না।

তিনি কিন্তু কিছুই মুখে দিলেন না। বললেন, আমার মোটেই খিদে পায়নি। আমি শুধু তোমায় কাছে পেতে চেয়েছিলাম। চেয়েছিলাম তোমার সঙ্গে বসে কথা বলতে। তুমি কিন্তু দেখছি কিছুই মনে করতে পারছ না। আমি যা পরীক্ষা করতে চেয়েছিলাম, বিফল হল। আমি ফিরে যাচ্ছি।

সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়লেন মানুষটি। কোনোরকম শব্দ না করে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। কিছুটা দূর হলেও, আমি তাঁর পিছু পিছু গেলাম সদর দরজা পর্যন্ত। দরজা খোলা-বন্ধ কিছুই আমার চোখে পড়ল না, অথচ দেখলাম তিনি নেই। আর পরে পরেই তাঁর সেই পরিচিত বাঁশির সুর খুব মৃদুভাবে আমার কানে এল রাস্তা থেকে। আমি ছুটে গিয়ে জানলা দিয়ে ঝুঁকে পড়লাম রাস্তার দিকে। ডাইনে-বাঁয়ে যতদূর চোখ যায় তাকিয়ে দেখলাম। তাঁকে দেখতে পেলাম না। শুধু বৃষ্টি। আগের মতো একটানা ঝিরঝিরে বৃষ্টি, হালকা সাদা চাদরের আড়াল তৈরি করে ঝরেই চলেছে।

সন্ধের পর মা ফিরলেন অফিস থেকে। বাদলা আবহাওয়ার জন্যে তিনি যেন অন্যদিনের থেকেও ক্লান্ত। এসব ঘটনার কিছুই তাঁকে বললাম না। সত্যিকারের ভালো মেয়েরা মাকে যেমন চা করে খাওয়ায়, বিশ্রাম দেয় মাকে, আমিও তেমন করলাম। মানুষটির অদ্ভুত আচরণ এবং তাঁর কথাগুলি আমার মাথায় ছিল। তাই পরের দিন ভালো করে বিকেল হবার আগেই ফ্ল্যাটে তালা লাগিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। মানুষটির খোঁজে।

সেদিন আর বৃষ্টি ছিল না। পড়ন্ত বিকেলের রোদ সোনা হয়ে ছড়িয়ে রয়েছে রাস্তা, ঘরবাড়ি আর ফুটপাতের ধারের গাছগুলির ওপর। বাঁশি বাজানো মানুষটি সাধারণত যেখানে দাঁড়িয়ে থাকেন, সে-জায়গাটা ফাঁকা। কিন্তু তবু, মৃদু হলেও সেই মিষ্টি বাঁশির সুর আমার কানে এল। মনে হল আর কয়েক পা এগিয়ে গেলেই হয়তো তাঁর দেখা পাব। এগিয়ে গেলাম। আমার কানে বাঁশির আওয়াজ আরো জোর হল। দ্রুত কিছুটা এগিয়েই গেলাম। পরক্ষণেই মনে হল, আওয়াজটা যেন আরো দূরে সরে গেল। বেশ কয়েকবার এমন হবার পর, আমার মনে হল বাঁশির সুরটা কি এক অমোঘ আকর্ষণে আমায় দূরে টেনে নিয়ে চলেছে। কিছুতেই ফিরে যেতে পারছি না আমি। কবি ব্রাউনিং-এর সেই কবিতাটি মনে পড়ল। গত বছর যেটি আমার পাঠ্য ছিল। একজনের বাঁশির আওয়াজে মুগ্ধ হয়ে একসঙ্গে অনেকগুলি শিশু তার পিছু নিয়েছিল। কিন্তু তাদের একজনও ফিরে আসেনি। যেখানে গিয়ে পড়লে মানুষের আর ফেরা নেই, আমিও হয়তো তেমন কোথাও চলেছি। এবার আমার অদৃশ্য হওয়ার পালা। কিন্তু তেমন হওয়াটা আমার ইচ্ছা নয়। তাই মনটা শক্ত করে নিজেকে মুক্ত করতে চাইলাম বাঁশির আকর্ষণ থেকে। পিছু ফিরতে চাইলাম। কিন্তু বাঁশির আকর্ষণের কাছে আমার ইচ্ছাশক্তি কোনো কাজেই এল না। আগের মতো এগিয়ে চললাম। বুঝতে পারছি, বাড়ি থেকে আমি ক্রমশই দূরে সরে যাচ্ছি। কিন্তু আমার কিছুই করার নেই।

ইতিমধ্যে দু'পাশের ঘরবাড়ি আর রাস্তা আমার কাছে অপরিচিত হয়ে উঠেছে। আমি যে কোথায় গিয়ে পড়েছি, কিছুই ধারণা করতে পারছি না। ভয়ে গলাটা শুকিয়ে গেল। তবু হাঁটছি। 'এস, আমার পিছন পিছন এস,' বলে বাঁশি আমায় ডেকে নিয়ে চলেছে। আমিও চলেছি। ঘণ্টা দেড়েক পর, বিকেলের আলো ম্লান হয়ে সন্ধে নামল। আরো কিছু পরে চারদিক একেবারে অন্ধকার। বাঁশি তখনও ডেকে চলেছে। আমি তখনও হেঁটেই চলেছি!

একসময় অবস্থার পরিবর্তন হল। একটানা এতক্ষণ এগিয়ে চলার পর বাঁশির আওয়াজটা এক জায়গায় যেন থেমে দাঁড়াল। আমি কিন্তু যেমন যাবার তেমন এগিয়েই যাচ্ছিলাম। সুরটা যেখান থেকে উঠছিল, অন্ধকারে অনুমান করে তার কাছাকাছি হবার চেষ্টা করলাম। আমার ধারণা, সেখানটায় পৌঁছতে পারলেই মানুষটিকে দেখতে পাব।

ঠিক জায়গায় পৌঁছতে আওয়াজটা আরো জোর আর কাছ থেকে বাজছে বলে আমার মনে হল। ঠিক যেন কানের পাশেই। কিন্তু অন্ধকারে খুব কিছু একটা চোখে পড়ল না। শুধু আবছা একমাথা সাদা ধবধবে চুল আর মিটমিট করে জ্বলা গভীর দুটি চোখ।

এই সময় বাঁশির আওয়াজটা থেমে গেল। আমার সম্মোহন ভাবটাও কেটে গেল সঙ্গে সঙ্গে। তারপরেই মনে হল, জায়গাটা কী ঠান্ডা! হাত-পাগুলো যেন জমে যাচ্ছে। যাকে বলে চলাফেরার শক্তিরহিত অবস্থা। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, তখন রাত্তির হয়ে গেছে। বাড়ি ফিরে মা-বাবা আমায় দেখতে না পেয়ে দারুণ ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। আর একথা মনে হতেই আমার পাগল হওয়ার দশা। অস্থির হয়ে উঠলাম। উপায় কিছু একটা খুঁজে বার করতেই হয়। সামনের যে বাড়িটার দরজায় গিয়ে বাঁশির আওয়াজটা মিলিয়ে গেছিল, সেটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। অন্ধকার হাতড়ে কলিং-বেলটায় চাপ দিলাম। একটু পরে আলো জ্বলে উঠল ভেতরে। দরজাতে এক মহিলার মুখ দেখা গেল। বললেন, কে?

আমি। কিন্তু তারপরের কথাগুলো বলতে গিয়ে আমার গলা কেঁপে গেল। তবু কোনোরকমে বললাম, অন্ধকারে রাস্তা হারিয়ে সেই সন্ধে থেকে ঘুরছি। জানি না, আমি এখন কোথায়? এদিকে শীতে দারুণ কষ্ট হচ্ছে। দয়া করে আমায় যদি—

কথা শেষ হবার আগেই দরজা পুরোপুরি খুলে গেল। মিষ্টি গলায় মহিলা বললেন, আহা রে! এস, এস, ভেতরে এস।

ভেতরে গিয়ে মহিলার ওপর আমার চোখ পড়ল। আমার মার বয়সের এক সুন্দরী মহিলা। পাশের ঘরে তাঁর স্বামী ছিলেন। ডেকে বললেন, শুনছ? তাড়াতাড়ি এস। দেখ, একটি বাচ্চা মেয়ে এই ঠান্ডায় রাস্তা হারিয়ে দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে।

হাত ধরে একটা সোফায় নিয়ে গিয়ে বসালেন তিনি। সেই সময় পাশের ঘর থেকে এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। একমুখ হেসে জিগ্যেস করলেন, কি ব্যাপার, রাস্তা ভুল করেছ নিশ্চয়ই?

আমি উত্তর দেব কি, অবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। একটি মানুষের সঙ্গে আর একটি মানুষের যে এতখানি মিল হতে পারে, ভাবতেই পারি না। বাঁশি-বাজানো সেই বয়স্ক মানুষটির ঠিক একটি অল্পবয়েসি সংস্করণ। ঠিক সেই চোখ, সেই নাক। তাঁর মতন অতটা না হলেও, লম্বা দোহারা চেহারা। শুধু মাথার চুলগুলি কালো আর গায়ের চামড়া টানটান। সঙ্গে সঙ্গে সকল রহস্যের সমাধান হয়ে গেল আমার কাছে। সেই বয়স্ক মানুষটি নিশ্চয়ই এঁর বাবা। আর এখানে এ-বাড়ির দরজায় এসে যখন বাঁশির আওয়াজ থেমেছে, তখন তিনি নিশ্চয়ই এই বাড়িতেই থাকেন। আমি যে তাঁর পিছু পিছু আসছি, এটা হয়তো তিনি টের পাননি।

সব ঘটনা সহজভাবে বললাম সামনের ভদ্রলোককে। সব শেষে বললাম, তিনি নিশ্চয়ই এই বাড়িতেই থাকেন?

শুনে মুখটা যেন কেমন হয়ে গেল ভদ্রলোকের। মহিলা অস্ফুটে কি যে বললেন, কিছু টের পেলাম না। পরে পরেই খুব খুঁটিয়ে দেখার মতো করে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। অনেক পরে ভদ্রমহিলা বললেন, তুমি একটু জিরিয়ে নাও। আমি ততক্ষণে একটু দুধ গরম করে আনি। ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি তোমার আলোয়ানটা বরং ওর গায়ে জড়িয়ে দাও। বেচারা এখনো কাঁপছে থরথর করে।

দ্রুত ভদ্রমহিলা বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

আমি বললাম, আপনাদের দুজনকে কিন্তু একই রকম দেখতে। তিনি কি এ-বাড়িতে থাকেন না?

কোনো উত্তর দিলেন না ভদ্রলোক। আমার খুব খারাপ লাগল। বোধহয় অসঙ্গত কিছু জিগ্যেস করে ফেলেছি। তাই সামলে নেবার জন্যে বললাম, এ ব্যাপারটা কি খুব গোপনীয়? তা যদি হয়, তাহলেও আমাকে নিয়ে ভাবনার কিছু নেই। ওঁর সম্বন্ধে আমি কাউকেই কিছু বলব না।

না! গোপন কিছু নয়। ম্লান হাসি ফুটে উঠল ভদ্রলোকের মুখে। আন্তরিকভাবে আলোয়ানটা আমার গায়ে জড়িয়ে দিতে দিতে বললেন, কিন্তু তুমি এখানে এলে কি করে?

আমি তো আগেই বলেছি, বাঁশির আওয়াজের পিছু পিছু হাঁটতে হাঁটতে এসে পড়েছি। আচ্ছা, উনি কি আপনার বাবা? ঠিক আপনার মতো দেখতে?

আমার বাবা একসময় এই বাড়িতেই থাকতেন। গত বছর এই মে মাসেই তিনি মারা গেছেন।

তাহলে—একটু থেমে বললাম, সে মানুষটি নিশ্চয়ই এ-বাড়িতে থাকেন না। থাকা সম্ভব নয়।

যদিও তখনো পর্যন্ত আমি কাঁপছি শীতে, তবু সেই রহস্যময় মানুষটির ভাবনা আমার মাথায়। মনে পড়ল, গতকালের ব্যাপারটা। মানুষটি যখন আমাদের ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে যান, তখন তাঁর কোনো পায়ের ছাপ পড়েনি মাটিতে। এমনকি দরজা-জানলাগুলো পর্যন্ত খোলা-বন্ধ হয়নি। তাছাড়া আমার দিকে তাকিয়ে থাকার সময় চোখ দুটিতে যে জ্বলজ্বলে ভাব দেখেছিলাম, সেটা কতকটা গল্পের বইয়ে পড়া অন্য কোনো জগতের মতো। তাহলে?

ভয়ে ভয়ে জিগ্যেস করলাম, আচ্ছা, তিনি কি বাঁশি বাজাতেন? আমি আপনার বাবার কথা জিগ্যেস করছি।

হ্যাঁ। তাঁর পেশাই ছিল বাঁশি বাজানো। তবে বয়েস হয়ে যাওয়ার দরুন ইদানিং কোনো প্রতিষ্ঠান বা অনুষ্ঠানে যেতে পারতেন না। বিকালের দিকে বেড়াতে বেরিয়ে এমনিই রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে বাঁশি বাজাতেন। টাকা-পয়সার জন্যে যে নয়, সেটা বুঝতেই পারছ। উদ্দেশ্য, শুধু মানুষকে শোনানো। আমি বা আমার স্ত্রী অনেক বারণ করেছি! কথা কানেই নেননি। গ্রীষ্ম বা বর্ষা, আবহাওয়া যেমনি হোক, তিনি ঠিক বাঁশিটি হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন বাড়ি থেকে। ওই বয়েসে এমনটি করা তাঁর উচিত ছিল না। ফলে যা হবার তাই হল। ঠান্ডা লাগিয়ে বিছানা নিলেন। একেবারে নিউমোনিয়া। মারাই গেলেন শেষ পর্যন্ত। আর আজ তুমি বলছ, তুমি নাকি তাঁকে দেখেছ। পিছু পিছু হেঁটে চলে এসেছ এ-বাড়িতে।

একটু থামলেন ভদ্রলোক। কিছুক্ষণ আমার দিকে অপলক থেকে বললেন, ভালো করে ভেবে তারপরে জবাব দাও। সত্যিই কি আমার মতো দেখতে কোনো বয়স্ক মানুষকে এই বাড়িতে ঢুকতে দেখেছ?

আমি বললাম, দেখুন, ভূত আমি বিশ্বাস করি না। আমি জোর দিয়ে বলতে পারি, মানুষটি এই বাড়িতেই ঢুকেছেন।

ভদ্রলোক চুপ করে রইলেন। আমি আমার অনুভূতির ব্যাপারটা আরও ভালো করে ওঁকে বোঝাবার জন্য বললাম, কি জানি কেন, ওঁর বাঁশির সুর আমার কানে গেলেই মনটা কেমন করে ওঠে! না হলে ভেবে দেখুন না, এখান থেকে আমার বাড়ি ক-তো দূর, অথচ একা তাঁর পিছু পিছু চলে এসেছি। আচ্ছা, সে-সুর কি আপনি একটুও শুনতে পাননি?

বিমর্ষভাবে মাথা নাড়লেন ভদ্রলোক, পেয়েছি। খুব মৃদুভাবে আমি সেটা শুনতে পাই। কিন্তু আমার স্ত্রী একেবারে শুনতে পান না।

আপনি তাঁর ছেলে। আপনাদের ভেতর একটা যোগাযোগ আছে। শুনলে শুনতে পারেন। কিন্তু আমি কেন? আমার শুনতে পাওয়ার কি কারণ থাকতে পারে?

এ প্রশ্ন তুমি করতেই পার। দাঁড়াও, আমার বাবা যখন ছোট ছিলেন, সেই বয়েসে তাঁর বোনের সঙ্গে তোলা একটা ছবি তোমায় দেখাচ্ছি।

ভদ্রলোক উঠে গেলেন। বইয়ের আলমারি থেকে একটা অ্যালবাম নিয়ে এসে বসলেন আমার পাশে। পাতা উল্টিয়ে একটা ছবি ধরলেন আমার সামনে। দেখলাম, বহুদিন আগেকার একটা পুরোনো

ছবি। আগেকার দিনে যেমন বেশবাস ছিল, সেই রকম বেশভূষা পরে একটি ছেলে আর একটি মেয়ে হাত ধরাধরি করে বসে আছে। ছেলেটির বয়েস খুব বেশি হলে চোদ্দ বছর আর মেয়েটির বারো। কিন্তু চেহারার দিক থেকে মেয়েটির সঙ্গে আমার এত মিল যে, অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম ছবিটার দিকে।

তারপরেই বাঁশি বাজানো মানুষটির কথাগুলো আমার মনে পড়ে গেল। তিনি আমার ফ্ল্যাটে বসে প্রথমেই বলেছিলেন, তুমি আমায় ভুলে গেছ—

আমি অন্য আর একসময়ের কথা বলছি। যখন আমরা দুজনেই খুব ছোট ছিলাম—

আমি তোমায় কাছে পেতে চেয়েছিলাম। চেয়েছিলাম কথা বলতে। তুমি আজ কিছুই মনে করতে পারছ না। আমার পরীক্ষা কোনোই কাজে এল না। আমি ফিরে যাচ্ছি—

তারপর আমি আর তাঁর দেখা পাইনি। শুধু বাঁশির আওয়াজ পেয়েছি। আর সেটাই শুনতে শুনতে এসে পৌঁছেছি এ-বাড়িতে।

এই মেয়েটিকে কতকটা আমার মতো দেখতে, তাই না? আমি তাকালাম ভদ্রলোকের দিকে, এখন নিশ্চয় এঁর অনেক বয়েস হয়েছে?

না। এই ছবি তোলার কিছুদিন পরেই তিনি মারা যান।

তাহলে ওই অল্প বয়েসেই মারা গেছেন বলুন?

হ্যাঁ। বোন মারা যাওয়াতে বাবা ভীষণ দুঃখ পেয়েছিলেন। কিছুতেই সামলে উঠতে পারেননি। সারাজীবন বোনের জন্যে আক্ষেপ করেছেন। মারা যাওয়ার মাসখানেক আগেও আমার বাবা যে নতুন সুর রচনা করেছেন, সেটা উৎসর্গ করেছেন তাঁর বোনের নামে। তিনি বিশ্বাস করতেন, নতুন করে জন্ম নিয়ে তাঁর বোন এই অঞ্চলেই কোথাও না কোথাও আছেন। এই বিশ্বাস নিয়ে মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত তিনি বোনকে খুঁজে বেড়িয়েছেন।

এই সময় গরম দুধ নিয়ে ভদ্রলোকের স্ত্রী ঘরের মধ্যে এলেন, বললেন, অতটুকু মেয়ের কাছে কি সব যা-তা গল্প করছ?

তিনি ভদ্রলোকের হাত থেকে অ্যালবামটা প্রায় কেড়ে নিলেন। বিরক্তভাবে বললেন, এর সঙ্গে যদিই বা কারো মুখ-চোখের গড়নের মিল থাকে, তাতেই বা কি আসে যায়! এটা নিয়ে এত মাথা ঘামাবার কি আছে তা তো বুঝি না। তুমি এটুকু খেয়ে নাও তো?

বলে দুধের কাপটা তিনি আমার হাতে ধরিয়ে দিলেন।

তুমি তো শোনোনি, মেয়েটি ওর ভারী অদ্ভুত অভিজ্ঞতার কথা বলছিল।

ভদ্রলোক কথার মোড় অন্যদিকে ঘোরাবার চেষ্টা করলেন। মহিলা আর কিছু বললেন না। একসময় শেষ চুমুক দিয়ে দুধের কাপ নামিয়ে রাখলাম। উঠে দাঁড়ালেন ভদ্রলোক। গ্যারেজ থেকে গাড়ি বার করে আমাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। ফ্ল্যাটের সামনে গাড়ি পার্ক করে উঠে এলেন দোতলা পর্যন্ত। আসল ঘটনাটা যে বাবা-মাকে জানানো হবে না, এ পরামর্শ আমরা আগেই করে নিয়েছিলাম। তাই আসল ব্যাপারে ভদ্রলোক কোনো উচ্চবাচ্য করলেন না। বেড়াতে বেরিয়ে পথ ভুল করে আমি যে তাঁদের বাড়ির কাছে গিয়ে পড়েছিলাম, এটুকুই শুধু বললেন।

আমাকে দেখে মা-বাবা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। বুঝতেই পেরেছিলেন আমার ওপর কম ঝক্কি যায়নি। তাই একেবারে শুয়ে পড়তে বললেন। আমি চলে গেলাম। কিন্তু ওঁরা তিনজনে বসার ঘরে বেশ জমিয়ে গল্প শুরু করে দিলেন। খুব চাপা গলায় হলেও, আমি বুঝতে পারলাম, ওঁরা আমার ব্যাপার নিয়েই আলোচনা করছেন।

পরের দিন সকালে মা বললেন, যে ভদ্রলোক কাল তোকে পৌঁছে দিতে এসেছিলেন, তিনি আমাদের আত্মীয়। যদিও খুব দূরসম্পর্কের। ওঁর প্রপিতামহ ছিলেন আমাদের প্রপিতামহীর নিজের ভাই। তোকে নাকি অবিকল ওঁর পিসির মতো দেখতে। যদিও সে পিসি খুব অল্প বয়েসেই মারা গেছেন।

আমি চুপ করে রইলাম। মা বলেই চললেন, আমরা কেউ কাউকেই চিনতাম না। দু'পুরুষ আগে আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছিল। ভাগ্যিস তুই পথ হারিয়ে ওঁদের বাড়ি গিয়ে পড়েছিলি, তাই দুই পরিবারের আবার যোগাযোগ হল। বল, এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার নয়?

তাইই বটে।

এর বেশি আমি আর কিছু ভাঙিনি। আমি তো জানি, বেড়াতে বেরিয়ে পথ হারিয়ে আমি কখনই ওঁদের বাড়ির সামনে গিয়ে পড়িনি। সেই এক অদ্ভুত বাঁশির সুর আমায় ডেকে নিয়ে গিয়ে তুলেছিল ওঁদের বাড়িতে।

পরের রবিবার নিমন্ত্রণ পেয়ে আমরা আমাদের নতুন আত্মীয়বাড়ি বেড়াতে গেলাম। আমার মা-বাবাকে অ্যালবামের সেই ছবিটি দেখালেন ভদ্রলোক। আমার সঙ্গে আশ্চর্য মিল দেখে মা-বাবা খুবই অবাক হলেন। নানা কথাবার্তার পর আমার বাবা বললেন, হেরিডিটি। যদিও এমনটি বড় একটা দেখা যায় না।

ভদ্রলোক কিন্তু নিজের কোনো মন্তব্য প্রকাশ করেননি। পুনর্জন্মবাদের কথা তো নয়ই। আমি আগাগোড়া চুপ করে ছিলাম। ভদ্রলোকের স্ত্রী বেশ ঘটা করে তাঁর শিল্পী শ্বশুরের গল্প করে গেলেন। আসল ঘটনার ধার দিয়েও গেলেন না। বুঝলাম, বড়রা যত বড়ই হোন, অলৌকিক বা বুদ্ধি দিয়ে যার নাগাল পাওয়া যায় না, তেমন কোনো বিষয়ে আলোচনা করতে ভয় পান।

এখন আমার স্কুল খুলে গেছে। আগেই বলেছি, ক্লাস করছি যথারীতি। তবু মাত্র ক'সপ্তাহ আগের ঘটনাটা আমার কাছে বড়ই রহস্যময়। যদিও জানি এর সমাধান আমার সাধ্যের বাইরে। কিন্তু ঘটনাটা ঘটেছিল বলে আমি খুব খুশি। ওটা আমার মনের দরজা খুলে দিয়ে গেছে। এখন বুঝি, জীবনে ঘটে না কিংবা ঘটতে পারে না এমন কথা বোধহয় জোর দিয়ে বলা যায় না। ভিন্ন জীবন, কিংবা ভিন্ন জগতের কথাও বোধহয় উড়িয়ে দেয়া যায় না।*

---

*রোজ মেরি টিমপার্লির 'দি ম্যান উইথ দি ফ্লুট' অবলম্বনে।

আষাঢ় ১৩৯৪

কাশিমপুরের তিন ভূত

তড়িৎ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

উনিশশো ষোল সাল। শীতের সময় একদিন রাজা মহারাজ তাঁর কয়েকজন ভক্তকে নিয়ে ঢাকার কাশিমপুর জমিদার-বাড়িতে এসে উপস্থিত হলেন। জমিদার সারদাপ্রসাদ রায়চৌধুরী আগে থেকেই জানতেন ময়মনসিংহ থেকে মহারাজ এখানে আসছেন। তাই কাছারিবাড়িতে তাঁদের থাকার সব ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। মহারাজের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছিল কাছারিবাড়ির অফিস ঘরটা, আর আরেকটা ছোট ঘর তাঁর দুই সেবক ব্রহ্মচারীর জন্য।

মহারাজের আগমনে জমিদারবাবু কৃতার্থ! মহারাজ সঙ্গীতরসিক। সেজন্য সারদাবাবু ঢাকা থেকে নামী সঙ্গীতশিল্পী ও বাদ্যযন্ত্রশিল্পীদের আনিয়েছিলেন তাঁকে গান-বাজনা শোনাবেন বলে।

মহারাজ পৌঁছালেন বিকাল নাগাদ। সান্ধ্য জলযোগ সম্পূর্ণ হলে সঙ্গীতের আসর বসল। ভজন গান শুনে মহারাজ খুব খুশি হলেন, ভক্তরাও আপ্লুত। আসর ভাঙলে রাত্রে খাওয়া-দাওয়া সেরে সব শুতে গেলেন।

বিদায় নেবার সময় সারদাবাবু বললেন, মহারাজ, সব ব্যবস্থা আছে। আপনার ঘরে জল আছে। কোনো কিছুর অসুবিধা হলে ডাকবেন। আমি কাছেই আছি। তারপর তিনি চলে গেলেন।

শীতের রাত। শীত বেশ জাঁকিয়েই পড়েছে। গরম কম্বলের তলায় সবাই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। হঠাৎ হরিহর নামে এক ভক্ত তার সঙ্গীকে ধাক্কা দিয়ে বলল, দেখ তো, কে যেন ঘরে টোকা দিচ্ছে। জিজ্ঞাসা করলাম কে, তা কোনো সাড়া দিল না।

সঙ্গীটি উঠে বসল। শুনতে পেল সত্যিই কে যেন দরজায় টোকা দিচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে সে চেঁচিয়ে উঠল, কে? কে?

কোনো উত্তর নেই।

হরিহর ও তার সঙ্গী ভাবল নিশ্চয় চোর, দরজা খুলে কাজ নেই। এই ভেবে তারা আবার শুয়ে পড়ল। কিন্তু শুয়েও হরিহরের ঘুম আসে না। সে এপাশ-ওপাশ করছে। মাথায় কেবল ঘুরছে ঐ শব্দের কথা। হঠাৎ সে শুনতে পেল, কে যেন বাইরে হাসছে। গলা শুনে মনে হল একটি মেয়ে!

হরিহর ভাবল এত রাতে কে বাইরে দাঁড়িয়ে হাসতে পারে। ভাবতে ভাবতেই তার কানে এল কান্নার শব্দ! হরিহরের সব সাহস এবার উবে গেল। ভয়ে কম্বলে মুখ ঢেকে সে ঘুমিয়ে পড়ল।

সকালে মহারাজকে সমস্ত ঘটনা জানাল হরিহর। মহারাজ বললেন, ভয় পাও কেন? ঠাকুর তো আছেন!

পরের দিনও এক অদ্ভুত ব্যাপার! রাত্রে খাওয়া-দাওয়া সেরে দরজা খুলে ঘরে ঢুকতে গিয়েই হরিহর আঁতকে উঠল। দেখল কে যেন তার ঘরে দাঁড়িয়ে আছে, তার হাতে এক চুবড়ি যুঁই ফুল। গোটা ঘর যুঁই ফুলের গন্ধে ম-ম করছে। হরিহর চিৎকার করে উঠল, কে? কে? চিৎকার শুনে তার সঙ্গী হ্যারিকেন নিয়ে ছুটে এল কিন্তু ঘরের কাউকে দেখতে পেল না।

ও কিছু নয়, বলে সঙ্গীটি হরিহরের কথায় গুরুত্ব দিল না। দুজনেই শুয়ে পড়ল। সে রাত্রে কোনোরকমে ঘুমতে পেরেছিল হরিহর।

তার পরের দিন রাতে আর এক ঘটনার সম্মুখীন হল হরিহর। তার শৌচে যাওয়ার প্রয়োজন হয়েছিল। ঠাকুরের নাম স্মরণ করে দরজা খুলে সে বাইরে এল। এসেই বিপত্তি! দেখল ওই গভীর

রাতে কাছারিবাড়ির উঠোনে কে যেন প্রদীপ হাতে ঘোমটা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হরিহর সাহস করে জিজ্ঞাসা করল, কে?

পাশের ঘরেই মহারাজ ছিলেন। জেগেই ছিলেন। হরিহরের কণ্ঠস্বর শুনে বুঝতে পারলেন সে ভয় পেয়েছে। তিনি ঘর থেকেই বললেন, ও কিছু নয়!

আশ্চর্য ব্যাপার! নিমেষে সেই মহিলা মিলিয়ে গেল।

হরিহরের আর শৌচে যাওয়া হল না। বাকি রাতটা জেগেই কাটল। সকাল হলে সে মহারাজকে আগের রাতে যা দেখেছিল সব বলল।

সকালেই সারদাবাবু মহারাজের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। মহারাজ তাঁকে প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা সারদাবাবু, আপনার এ ঘরে কি কেউ আত্মহত্যা করেছে?

সারদাবাবুর চোখ জলে ছলছল করে উঠল। তিনি কান্না মেশানো গলায় বললেন, মহারাজ! গতবছর আমার আঠারো বছরের মেয়ে এই ঘরে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে।

তাঁর অবস্থা দেখে মহারাজ অন্য প্রসঙ্গ তুললেন। দুজনের মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ আলোচনা হল। তারপর জমিদারবাবু চলে গেলে মহারাজ তাঁর সঙ্গীদের বললেন, এই কাছারিবাড়িতে অতৃপ্ত আত্মারা ঘোরাফেরা করছে।

হরিহর বলল, মহারাজ, আমি তিন রাত্তির যা দেখেছি আর শুনেছি, সব ভূতের কাণ্ড। ঐ অতৃপ্ত আত্মারাই করেছিল।

মহারাজ বললেন, আমি তিনদিন দেখেছি একটি মুসলমান আমার কাছে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে থাকে! জমিদারবাবু কেবল তাঁর মেয়ের আত্মহত্যার কথা বলেছেন। আসলে এ বাড়িতে তিনটি আত্মহত্যা হয়েছে, তার মধ্যে অবশ্যই একজন মুসলমান আছে।

জমিদারের গৃহে মহারাজের তিনরাত্রি বাস হয়ে গেল। এবার তিনি অন্যত্র যাবেন। তাই সকাল থেকে ভক্তরা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসছে। ভক্তদের মধ্যে একজন প্রবীণ ব্যক্তিকে পেয়ে মহারাজ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা আপনি তো এই এলাকার প্রবীণ মানুষ, এখানকার অনেক ঘটনাই তো জানেন! বলতে পারেন, এই কাছারিবাড়িতে কে কে আত্মহত্যা করেছে?

বৃদ্ধের চোখে-মুখে বিস্ময়। তিনি বললেন, মহারাজ, একথা কেন জিজ্ঞাসা করলেন?

মহারাজ বললেন, আমার মনে হচ্ছে বেশ কয়েকটি আত্মহত্যা ঘটেছে এই ঘরে।

বৃদ্ধ ইতস্তত করে বললেন, অনেক আগের কথা, রহিম আর রাঘব নামে দুজন প্রজা লাঠির ঘায়ে কাছারিবাড়িতে মারা যায়। কিছুদিন আগে মারা যায় জমিদারবাবুর মেয়ে গলায় দড়ি দিয়ে।

মহারাজ সেবককে বললেন, তাড়াতাড়ি জিনিসপত্র গুছিয়ে নাও। দুপুরের পরই আমরা নারায়ণগঞ্জ রওনা হব।

সেবক আনন্দে মহারাজের পায়ে মাথা রেখে প্রণাম করল।

শ্রাবণ ১৪০৬

আত্মা মরে না

মণিলাল মুখোপাধ্যায়

রোহিণী প্রতিবন্ধী। প্রথমে দুটো সুপুষ্ট পা নিয়েই সে জন্মেছিল। তারপর রাহুর মতো পোলিও গ্রাস করল ডান পায়ের হাঁটুর নীচের দিকটার বেশিটা। স্বাবলম্বী রোহিণী পরগাছার মতো আঁকড়ে ধরল তার বাবাকে। ওরা খ্রিস্টান। শহরের একটা বিশেষ এলাকায় বাসস্থান হলেও পার্টিতে, কি চার্চে গেলে বাবা মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে যেত। সবরকম ঠাট্টা, বিদ্রূপের হাত থেকে মেয়েকে বাঁচাত। মেষপালক যেখানেই থাকুক না কেন তার যেমন মেষের দিকে লক্ষ থাকে, রোহিণীর বাবা স্যাসুনেরও ঠিক তেমনই লক্ষ ছিল মেয়ের ওপর। ওর মা এদেশীয়; এটা ও বাবার কাছ থেকে শুনেছিল। ওর বয়স যখন সবে দুই তখনই মা মারা যান। তাই মাকে ওর মনেই পড়ে না।

রোহিণী স্কুলের শিক্ষা বেশি পায়নি। ওর যা কিছু শিক্ষা সব বাবার কাছে। একটু বড় হতেই ও যখন বুঝতে পারল ওর সহপাঠিনীরা ওর চলনভঙ্গিকে অনুকরণ করে আনন্দ উপভোগ করছে, ও আর স্কুলে গেল না। ওদের নিষ্ঠুর আনন্দ ওর স্বাভাবিক সুস্থ শিক্ষার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াল।

একদিন ও দারুণ মানসিক যন্ত্রণা আর হতাশায় বিছানায় মুখ গুঁজে কাঁদছে, এমন সময় কে যেন সীমাহীন স্নেহের জাদুকাঠি ছোঁয়াল ওর মাথায়। চেয়ে দেখল, সে কেউ নয়, ওর বাবা স্যাসুন। বাবাকে দেখে চিৎকার করে কেঁদে ওঠে রোহিণী, বাবা, আমি যে আর পারছি না।

মাথায় হাত বুলোয় আর সান্ত্বনা দেয় বাবা স্যাসুন, চুপ কর মা, চুপ কর। কাঁদিস নে। যারা অপরকে আঘাত দেয় সেই আঘাত সুদে-আসলে তারা ফিরে পায়। প্রভুর দিকে তাকিয়ে দেখ, মা। কত আঘাত, কত কষ্ট তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে।

রোহিণী কাঁদতে কাঁদতেই বলে, আজ তুমি যখন চার্চে গেলে—

উত্তেজিত হয়ে পড়ে স্যাসুন, তখনই ভেবেছিলাম একটা কিছু না ঘটে। বার বার করে বললাম, আমার সঙ্গে চ। তা তুই কথা শুনলি না।

কী করব, শরীরটা যে খারাপ।

অস্থির হয়ে পড়ে স্যাসুন, শরীর খারাপ! এক্ষুনি চল আঙ্কেলের কাছে। উনি তোকে দেখে ওষুধ দেবেন।

পরে যাব বাবা। এখন কথাটা শোনোই না। তুমি যাবার পর আমি একবার রেবেকার কাছে যাব বলে বেরিয়েছিলাম। আমার বন্ধু রেবেকা।

মেয়েটি বড় ভালো। তোকে খুব ভালোবাসে।

রোহিণী বলে, কিন্তু ওর কাছে তো যেতে পারলাম না। পথে জর্জ আর প্যাটার—

ওকে থামিয়ে দেয় স্যাসুন, জর্জ আর প্যাটার! ও দুটো তো দারুণ বখাটে ছেলে! তা ওরা কী বলেছে?

কান্না থামে না রোহিণীর। কাঁদতে কাঁদতেই বলে, ওরা বলল আমাকে দেখতে পেত্নীর মতো। তুমি নাকি শাইলক।

স্যাসুনের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায়। রাগলে ওর কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। স্যাসুন ওদের বাড়ি গিয়ে এমন কাণ্ড বাধাল যে জর্জ আর প্যাটার চিরকালের মতো শত্রু হয়ে গেল।

রোহিণীর ভয় হয়ে গেল। স্যাসুন বলল, ভয় কী। ও দুটোকে আমি জেল খাটাব। আমাকে যা বলে বলুক, কিন্তু তোকে কিছু বললে আমি সহ্য করব না কোনোদিন।

দু-দিন চুপচাপ। আবার সেই একই ঘটনা। রোহিণী তো আর ঘরের মধ্যে দিবারাত্র থাকতে পারে না। একটু বেরিয়েছিল রেবেকার কাছে যাবে বলে। পথে ঠিক দেখা জর্জ আর প্যাটারের সঙ্গে। ওরা প্রত্যক্ষভাবে কিছু না বললেও পরোক্ষে যা বলল তা মনের মধ্যে আগুন জ্বালানোর পক্ষে যথেষ্ট। রোহিণী বাবাকে কিছু বলল না পাছে শত্রুতা আরও বেড়ে যায়। কিন্তু তাতে হল কি ওদের বাড় আরও বেড়ে গেল। ওর বাবা স্যাসুন এমনিতে ভালো মানুষ কিন্তু মেয়ে রোহিণীকে কেউ মন্দ কথা বললে মাথায় রাগ চড়ে যায়। অবস্থা যখন চরমে উঠল স্যাসুন হয়ে পড়ল অসুস্থ। ডাক্তার এল, চিকিৎসা চলল, অসুখও বেড়ে চলল। অবস্থা যখন আয়ত্তের বাইরে, ডাক্তার রোহিণীকে বলল, আত্মীয়-স্বজনদের খবর দাও, মা। মনে হচ্ছে আর দু-একদিন।

ভেঙে পড়ল রোহিণী কান্নায়, কী হবে বাবা? আমিও আর বাঁচতে চাই না।

স্যাসুন বাধা দেয়, ও কথা বলিস নে মা। তোর কোনও ভয় নেই, আমি বাঁচি আর মরি তোর কথা ভুলব না। তুইই যে আমার সব। তোকে আমি সব বিপদ থেকে বাঁচাব।

কাঁদতে কাঁদতেই বলে রোহিণী, তা কী করে হবে, বাবা! মরার পর তুমি কী করে তোমার মেয়েকে বাঁচাবে! মৃত্যু মানেই তো জীবনের শেষ।

মাথা নাড়ে স্যাসুন, না না, তা নয়, মা। মৃত্যু মানে এই দেহের শেষ, আত্মার নয়। সে ছিল, সে আছে, সে থাকবে। আত্মা মরে না। দেহ পাল্টায়।

বাবা আমি কী করব, বলো না, বাবা।

স্যাসুন সান্ত্বনা দেয়, ভয় পাস নে, মা। পরিশ্রম, সততা আর নিষ্ঠাই জীবনের সাফল্যের চাবিকাঠি। প্রভুকে স্মরণ করবি।

রোহিণী বলল, তুমিই আমার কাছে ভগবান, বাবা। আমি তোমায় জানি।

মেয়েকে ভোলায় স্যাসুন, আমি তোর পাশে পাশেই থাকব, মা। সব বিপদ, সব অমঙ্গলের হাত থেকে তোকে বাঁচাব।

স্যাসুন মারা গেল। রয়ে গেল রোহিণী। বেঁচে রইল বাবার স্মৃতিকে আঁকড়ে ধরে। স্যাসুন যতদিন বেঁচে ছিল জর্জ আর প্যাটার তাকে আর বেশি উত্ত্যক্ত করতে পারেনি। ওরা স্যাসুনের অপমানকে ভুলতে পারেনি। তুষের আগুনের মতো এতদিন চাপা ছিল। এখন স্যাসুন নেই। সমস্ত রাগটা গিয়ে পড়ল রোহিণীর ওপর।

রেবেকার জন্মদিন উপলক্ষে ওদের বাড়িতে একটা পার্টি ছিল। সেখান থেকে ফিরতে রোহিণীর একটু রাতই হয়ে গেল। যাবার সময় ওর খুব একটা ভয় হয়নি, কিন্তু ফেরার সময় ওকে ভয় চেপে ধরল। একে নির্জন রাস্তা, তার ওপর সে একা। কিছুটা যাবার পর ও এল চৌমাথায়। একটা পথ গেছে ওর বাড়ির দিকে, একটা দিয়ে যাওয়া যাবে স্কুলে। একটা রেবেকাদের বাড়ির দিক থেকে সোজা চলে গেছে কবরখানার দিকে। কবরখানা আর ওর বাড়ির দিকের রাস্তা গাছে ঢাকা। টর্চ ছাড়া হাঁটা যায় না। টর্চ নিয়েই এসেছে রোহিণী। আরও কিছুটা হাঁটার পর অন্ধকারটা গাঢ় থেকে হল গাঢ়তর। রোহিণী একটু ইতস্তত করে টর্চ জ্বালল। ফোকাসটা সোজা গিয়ে পড়ল সামনের রাস্তায় যেখানে দুজন ছেলে দাঁড়িয়েছিল। ওদের মুখ দেখেই চিনতে পারল রোহিণী। জর্জ আর প্যাটার। ও খুব ভয় পেয়ে গেল। মনে মনে প্রভুকে স্মরণ করল। তারপর বাবার কথা ভাবতে ভাবতে ধীর পায়ে এগোতে লাগল। জর্জ আর প্যাটারকে এড়িয়ে পাশ দিয়ে চলে গেল। ও ভাবল এ যাত্রায় ও বেঁচে গেল, কিন্তু না, তা হল না। জর্জ একটা পাথর ছুঁড়ল। সেটা রোহিণীর পাশ দিয়ে হাওয়ার বেগে গিয়ে পড়ল সামনের রাস্তার ওপর। রোহিণী থেমে পড়ল। ও বাবার কথা ভাবল, 'তোকে আমি সব বিপদ, সব অমঙ্গলের হাত থেকে বাঁচাব।' ও মনে মনে বাবাকে ডাকতে লাগল। একটু যেন সাহস পেল। জর্জকে বলল, তোমরা ওরকম করছ কেন, জর্জ? আমি তো তোমাদের কোনও ক্ষতি করিনি।

জর্জ বলল, তুই যে দেখছি চার্চের ফাদারের মতো কথা বলছিস। বড় বড় কথা বললে মেরে গায়ের ছাল তুলে নোব।

অসভ্যের মতো কথা বলো না। তোমার বাবা-মা কি তোমাকে ভদ্রভাবে কথা বলতে শিক্ষা দেয়নি?

রোহিণীর মুখ ফস্কে বেরিয়ে আসা কথায় আগুনে ঘৃতাহুতি পড়ে। খ্যাঁক করে ওঠে জর্জ, ওরে শয়তানী, যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! দেখাচ্ছি মজা।

বাঁহাতে জর্জ একটা গিরগিটি ধরে তারপর সেটা ছুঁড়ে দেয় রোহিণীর দিকে। চিৎকার করে ওঠে রোহিণী ভয়ে।

হেসে ওঠে জর্জ, এবার তোকে কে রক্ষা করবে?

কেন আমার বাবা বাঁচাবে, উত্তর দেয় রোহিণী কাঁদতে কাঁদতে।

জর্জ কর্কশ গলায় চিৎকার করে, তোর বাপ? বলিস কি! তার তো দফারফা। প্যাটার তুই কি বলিস?

অস্বাভাবিক, অতি প্রাকৃতিক গাম্ভীর্য এনে প্যাটার বলে, আত্মা মরে না। দেহ পাল্টায়। মানুষের আইন শয়তানকে শাস্তি দিতে না পারলেও আত্মার হাত থেকে তার নিষ্কৃতি নেই।

কথা শুনে প্রথমটায় হকচকিয়ে যায় জর্জ, প্যাটার, এই প্যাটার, তুই এসব কী বলছিস?

প্যাটার কোনও কথা না বলে এগোতে থাকে বাড়ির দিকে। জর্জ প্যাটারকে অনুসরণ করে।

প্যাটারের মুখে বাবার কথা শুনে প্রথমটায় রোহিণীও অবাক হয়ে যায়। এরপর চোখের জল মুছতে মুছতে এগোতে থাকে রাস্তা ধরে। কিছুটা যাবার পর দেখা সেন্ট বেকেট হাই স্কুলের ফাদারের সঙ্গে। ফাদার ওকে দেখেই বলেন, এত রাতে একা একা কোথায় যাচ্ছ মা? একি! তুমি কাঁদছ? কী হয়েছে তোমার?

রোহিণী সব বৃত্তান্ত ফাদারকে শোনাল। ফাদার বললেন, জর্জ আর প্যাটার! ঠিক আছে আমি দেখছি। চলো, তোমায় পৌঁছে দিই।

রোহিণীকে বাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দেন ফাদার। ফিরে আসার সময় ফাদার বলেন, দুঃখ কোরো না, মা। আত্মা মরে না। দেহ পাল্টায়। মানুষের আইন শয়তানকে শাস্তি দিতে না পারলেও আত্মার হাত থেকে তার নিষ্কৃতি নেই।

এবার চমকে ওঠে রোহিণী, এ যে পরিষ্কার তার বাবার গলা! সেই ভাষা! সেই স্বর!

জর্জ আর প্যাটারকে চরম শাস্তি দিলেন ফাদার। দুজনকেই স্কুল থেকে তাড়িয়ে দিলেন। ব্যস্। আর যায় কোথা! খেপে গেল ওরা। দুজনে ঠিক করল, স্যাসুনের কবর খুঁড়ে কফিনটাকে বের করবে। এরপর বডিটাকে বের করে প্রথমেই মুন্ডুটাকে কেটে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। তারপর হাড়গুলোকে হাতুড়ি মেরে মেরে গুঁড়ো করবে। তাহলেই ওর আত্মার সব ক্ষমতা শেষ হয়ে যাবে। ওর মৃত্যু ঘটবে। এরপর রোহিণীর ব্যবস্থা। প্রস্তাবটা অবশ্য প্যাটারের। জর্জও সায় দিল।

শনিবার। সন্ধেবেলা ওরা দেখে গেছে রোহিণী বাড়িতেই আছে। ওরা কোদাল, হাতুড়ি, শাবল এইসব জোগাড় করল। রাত এগারোটার পর সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়বে ওরা বেরোবে।

সন্ধে থেকেই রোহিণীর মনটা খারাপ। মাঝে মাঝেই ও কবরখানায় যায়। বাবার কবরের ওপর ঝরে পড়া পাতাগুলোকে পরিষ্কার করে। তারপর কবরের ওপর ফুল ছড়িয়ে দেয়। বেশ কিছুক্ষণ বাবার জন্যে কাঁদে, তারপর বাড়ি ফেরে। জর্জ আর প্যাটার শাস্তি পাবার পর থেকে ও বাইরে বেরোতে সাহস করে না।

রাত এগারোটা। ঘুমোচ্ছে রোহিণী। স্বপ্ন দেখছে ওর বাবার কবরের ওপর ধুলো, শুকনো পাতা স্তূপাকার হয়ে জমে আছে। বাবার খুব কষ্ট হচ্ছে। ওর ঘুমটা ভেঙে যায়। ও উঠে পড়ে। দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে আসে। চারদিকে গাঢ় অন্ধকার। মিটমিট করে দেখছে তারাগুলো। এই ঠিক সময়। সবাই ঘুমোচ্ছে। কেউ তাকে দেখতে পাবে না। ও তাড়াতাড়ি উঠোনের ফুলগাছগুলো থেকে কিছু ফুল তুলে নিয়ে এগোয় কবরখানার দিকে। ওর মনে ভয় নেই। রোহিণী জানে ওর বাবার আত্মা ওর পাশে পাশেই আছে।

কবরখানায় ঢুকেই ও থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। জর্জ আর প্যাটার! এত রাতে ওরা কী করছে! তবে কি—

জর্জ আর প্যাটার পরিকল্পনা মতো স্যাসুনের কফিনটাকে কবর খুঁড়ে বের করে। এরপর স্যাসুনের দেহটাকে ধরাধরি করে কফিন থেকে বের করে কবরের পাশে রাখে। জর্জ শুধোয়, প্যাটার, কাটারি এনেছিস তো?

প্যাটারের আপসোস হয়, ভুলে গেছি, একবারে ভুলে গেছি। তবে শাবল আর কোদাল দিয়েই হবে। ওগুলোয় খুব ধার। জর্জকে প্যাটার বলে, আর দেরি করিস নে। কাজ শুরু কর।

জর্জ বলল, হ্যারিকেনটা ভালো করে উস্কে দে। আলোটা এদিকে ধর।

জর্জ শাবলটা স্যাসুনের মাথায় আঘাত করার জন্যে তুলবে ঠিক এইসময় ছুটে যায় রোহিণী, কী করছ তোমরা? এখনি দেহটাকে কফিনে ভরে কবরে রেখে দাও, তা নইলে তোমাদের দুজনকেই আমি শেষ করে দোব।

জর্জ রাগে গরগর করে, তবে রে ডাইনি! আগে তোকেই শেষ করব।

জর্জ আর প্যাটার ওকে ধরতে যায়, রোহিণী কবরের চারদিকে চক্রাকারে ঘোরে। মাঝে মাঝে চিৎকার করে, বাবা, বাঁ-চা-ও। কখনও কোনও কবরের পাশে লুকোয়, কিন্তু ওদের চোখকে ফাঁকি দিতে পারে না। লণ্ঠনের আলো এসে পড়ে ওর মুখে বা পিঠে। ওরা ধরে ফেলার আগেই ও ছুটতে শুরু করে এদিক-ওদিক। রোহিণীর গতি এত তীব্র যে জর্জ আর প্যাটার ওর সঙ্গে পেরে ওঠে না। ওরা মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে হাঁপায়। আবার ওরা রোহিণীর পিছু নেয়।

ছুটতে ছুটতে জর্জ ফিরে আসে স্যাসুনের কবরের কাছে। জায়গাটায় চাপ চাপ অন্ধকার। আর সেই অন্ধকারের চারপাশে আতঙ্কের ছায়া। হঠাৎ জর্জের খেয়াল হল পিছনে প্যাটার নেই। সামনে, এপাশে, ওপাশে দেখল, কিন্তু কোথায় প্যাটার! যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। যাক। জর্জ শেষ না দেখে বাড়ি ফিরবে না। ও অন্ধকারের মধ্যেই খুঁজতে থাকে রোহিণীকে। একসময় বিদ্যুৎচমকের মতো মনের মধ্যে ঝলসে উঠল একটা চিন্তা, রোহিণী তো খোঁড়া! তাহলে এত জোরে ছুটছে কী করে!

পিছন থেকে একটা শান্ত, গম্ভীর গলার স্বর ভেসে আসে, আত্মা মরে না। দেহ পাল্টায়। মানুষের আইন শয়তানকে শাস্তি দিতে না পারলেও আত্মার হাত থেকে তার নিষ্কৃতি নেই।

চমকে ওঠে জর্জ। চারপাশে কেউ নেই। একটা অস্বাভাবিক নিস্তব্ধতা ওকে যেন গিলতে আসে। ও চিৎকার করে ওঠে, প্যাটার! এরপরই দেখল কবরের সেই ঘন অন্ধকার ভেদ করে বেরিয়ে আসছে প্যাটার।

চিৎকার করে জর্জ, প্যাটার! ওখানে কী করছিস?

হঠাৎ যেন আলো ঝলসে উঠল, আর সেই আলোয় মুহূর্তের জন্যে হলেও ও স্পষ্ট দেখতে পেল প্যাটারের নাক, কান, মুখ দিয়ে ঝরঝর করে রক্ত ঝরছে। ও মহাশূন্যের দিকে চেয়ে দু-হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসছে জর্জের দিকে। প্রথমটায় জর্জ বিহ্বল হয়ে পড়ে। বিহ্বলতা কাটতেই মনে ঢুকল ভয়। অকল্পনীয় ভয়। মৃত্যুভয়। প্যাটার দৃঢ় পদক্ষেপে, নিশ্চিতভাবে এগিয়ে আসছে ওর দিকে। ও পালাতে চেষ্টা করে, কিন্তু দু-হাত দিয়ে চেপে ধরার মতো অন্ধকারটা ওকে নড়তে দেয় না। প্যাটারের শাবলের মতো দুটো হাত ওর গলাটা চেপে ধরে।

চিৎকার করে ওঠে জর্জ, কে তুমি! স্যাসুন?

উত্তর আসে, আত্মা মরে না। দেহ পাল্টায়। মানুষের আইন শয়তানকে শাস্তি দিতে না পারলেও আত্মার হাত থেকে তার নিষ্কৃতি নেই।

—

অগ্রহায়ণ ১৪১৫

মাতৃস্নেহ

শ্রীসুশীলকৃষ্ণ দাশগুপ্ত

যুদ্ধ তখন পূর্ণবেগে চলেছে—দুর্ধর্ষ জাপানিদের বাধা দেবার জন্যে বাঙলাদেশের নানাস্থানে নতুন নতুন ঘাঁটি তৈরি হচ্ছে; অখ্যাত অঞ্চলগুলো বিখ্যাত হয়ে উঠেছে যুদ্ধের হিড়িকে। আমরা তখন কলকাতার এক মিলিটারি আফিসে চাকরি করি। হঠাৎ উপর থেকে হুকুম এল আমাদের সেকশন থেকে দুজনকে হীরাপুরে রওনা হতে হবে।

হীরাপুর বর্ধমান জেলার একটা কৃষিপ্রধান স্থান—সেখানে নতুন একটা ঘাঁটি বসছে, সেই সূত্রেই আমাদের তলব পড়েছে। না বলবার জো নেই, আমরা মিলিটারি আফিসের চাকুরিয়া,—মুখ বুজে হুকুম তামিল করতে হবে। কাজেই তাড়াতাড়ি যাবার জন্যে তৈরি হতে হল—রাত দশটায় আমাদের ট্রেন।

পরদিন সকালে হীরাপুরে উপস্থিত হয়ে দেখলাম—একটা বিস্তীর্ণ জঙ্গলকে ভেঙে আধুনিক একটা নগরে পরিণত করবার আয়োজন চলেছে। ঘর-বাড়ি এখনো গড়ে ওঠেনি—শ্রমিকদের জন্যে হোগলার ছাউনি দেওয়া বড় বড় চালা-ঘর তোলা হয়েছে; কর্মচারীদের জন্যেও তাঁবু পড়েছে; এরই নাম—ক্যাম্প। ইংরেজ অফিসার আমাদের দুজনকে বললেন ঃ "ক্যাম্পে থাকতে যদি আপনাদের অসুবিধা হয়, কাছেই গ্রাম আছে—সেখানে সুবিধামতো কোনো বাড়ি ভাড়া করেও থাকতে পারেন—রেশন বরং এখান থেকে নিয়ে যাবেন।"

অজয় ও আমি—এই দুজনই কলকাতা আফিস থেকে এসেছি। সাহেব আমাদের দেখেই বুঝেছিলেন যে, কুলিদের সঙ্গে চালা-ঘরে বাস করা যেমন আমাদের পক্ষে অসম্ভব, সাহেবদের সঙ্গে ক্যাম্পে থাকাও তেমনি অসুবিধাজনক। সেই জন্যেই আলাদা বাসা নিয়ে থাকবার যুক্তি দিয়েছিলেন। সাহেবের যুক্তিই আমাদের মনঃপূত হল এবং দুই বন্ধু একত্র সন্নিহিত গ্রামের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লাম।

সরকারি ছাউনি থেকে খানিকটা তফাতে হীরাপুর গ্রাম। পল্লী-অঞ্চলের লোভনীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য থেকে আরম্ভ করে সহজ সরল জীবনযাত্রার পক্ষে যা কিছু প্রয়োজন—কিছুরই অভাব বা অপ্রতুল নেই এই গ্রামে। আমাদের দেখেই গ্রামবাসীদের মধ্যে অনেকে এগিয়ে এসে আমাদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করলেন; তারপর একটি বাড়ির বৈঠকখানায় আমাদের নিয়ে গিয়ে বসালেন। শুনলাম, এই বাড়ির মালিক ব্রাহ্মণ এবং তিনিই গ্রামের ভূস্বামী। নবাগত কেউ এই গ্রামে এলে এই বাড়িতেই ওঠেন এবং গৃহস্বামী আতিথ্য-সৎকারে সর্বদাই প্রস্তুত থাকেন।

একটু পরেই গৃহস্বামী বৈঠকখানায় এলেন। তাঁর নাম সদানন্দ ভট্টাচার্য; বয়স পঞ্চাশ অতীত হয়েছে, দেখলেই শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়। আমরা হেঁট হয়ে তাঁকে প্রণাম করলাম। তিনিও প্রসন্ন মুখে আমাদের সম্বর্ধনা করলেন। কথায় কথায় আমরা আসল উদ্দেশ্য তাঁকে জানালাম। শুনে তিনি বললেন ঃ "কলকাতা শহরের মতো এখানে তো বাড়ি ভাড়া পাওয়া যায় না বাবা, আর ঘর-বাড়ি বলতে দেখছ তো—বেশিরভাগই মাটির দেওয়াল, আর মাথায় তার খড় বা গোলপাতার ছাউনি। এ সব বাড়িতে তোমরা বাস করতে পারবে না। তোমাদের যদি আপত্তি না থাকে, আমার এই বৈঠকখানায় কোনোরকমে মাথা গুঁজে থাকতে পার; তবে, পাঁচজনের সঙ্গে থাকতে হবে—অতিথি-অভ্যাগত এলে তাঁদেরও তো ফেলতে পারব না।"

আমি তাঁকে এই বদান্যতার জন্যে অনেক ধন্যবাদ দিয়ে বললাম ঃ "আপনার কথাতেই মহত্ত্বের

পরিচয় পেয়ে আমরা ধন্য হয়েছি। কিন্তু দেখুন, দু'চার দিনের কথা হলে না হয় এখানে থাকা যেত, কিন্তু আমাদের যে কতদিন থাকতে হবে, তার ঠিক নেই। কাজেই আলাদা একটা যেমন-তেমন বাড়িই আমাদের দেখে নিতে হবে।"

এই সময় ভট্টাচার্য মহাশয় বললেন ঃ "তোমাদের থাকবার মতন বাড়িও ছিল বাবা, কিন্তু সেখানে থাকবার পরামর্শ দিতে পারি না।"

কথাটা শুনেই মনে একটা কৌতূহল জেগে উঠল, সেই সঙ্গে আনন্দও। জিজ্ঞাসা করলাম ঃ "বাড়ি যদি থাকে, তবে আপত্তি করছেন কেন?"

ভট্টাচার্য মহাশয় বললেন ঃ "তার কারণ, সে বাড়িতে কেউ রাত্রিবাস করতে পারে না। সাহস করে যারাই বাস করতে গেছে—তাদেরই বিশেষ রকম হানি হয়েছে—প্রাণও হারিয়েছে অনেকে। এখন ঐ বাড়ির নাম রটেছে ভূতের বাড়ি। কাজেই তোমাদের ঐ বাড়িতে কি করে বাস করতে বলি বলো?"

স্তব্ধ হয়েই আমরা গৃহস্বামীর কথা শুনলাম। অমনি আমাদের দুজনের চোখে চোখে ইশারা খেলে গেল; তারপরই আমরা জেদ ধরে বসলাম, "ঐ বাড়িতেই আমরা উঠব।" আগ্রহের সঙ্গে জানালাম ঃ "আপনি আর আপত্তি করবেন না, আমরা ভূতের ভয় করি না—আমাদের সঙ্গে বন্দুক-পিস্তল-টর্চ থাকবে, আমরা নিরাপদেই ও বাড়িতে বাস করতে পারব।"

ভট্টাচার্য মহাশয় কিন্তু কিছুতেই মত দিতে চান না, আগেকার দুর্ঘটনাগুলির উল্লেখ করে বাধা দিতে থাকেন, অনুযোগের সুরে বললেন ঃ "এমন কাজও করো না বাবাজী, কেন প্রাণগুলো ইচ্ছা করে হারাবে? ও আগ্রহ ত্যাগ কর।"

আমরাও নাছোড়বান্দা—কিছুতেই সংকল্প ত্যাগ করতে প্রস্তুত নই; সবিনয়ে শেষে তাঁকে বললাম ঃ "দেখুন, আমরা কলকাতার ছেলে, ও সব কুসংস্কার বিশ্বাস করি না। যদি আমাদের চেষ্টায় বাড়িখানার ঐ অপবাদ ঘুচে যায়, আপনার গ্রামের পক্ষে সেটা কি মঙ্গলের কথা নয়? আপনি অনুগ্রহ করে সেই বাড়িতে আমাদের যাবার ব্যবস্থা করে দিন, আপনার কাছে আমরা এটা ভিক্ষা বলেই চাইছি।"

অগত্যা তিনি মত দিতে বাধ্য হলেন। তবে বললেন ঃ "তাহলে তোমরা এক কাজ কর; একসঙ্গে দুজনেই বিপদের মুখে ঝাঁপিয়ে না পড়ে বরং একে একে এগিয়ে যাও। এবেলা এখানেই স্নানাহার সেরে, বাড়িখানা দেখে এসো। তারপর তোমাদের মধ্যে একজন যার বেশি সাহস আর আগ্রহ, সেই ঐ বাড়িতে বরং রাত্রিবাস করে দেখুক ব্যাপারখানা কি? এর ফল কি হবে জান? একজনের উপর দিয়েই বিপদটা যেতে পারে।"

তাঁর এ উপদেশ ভালো বলেই মনে হল। ভট্টাচার্য মহাশয়ের বাড়িতে আমরা স্নান ও মধ্যাহ্নভোজন সেরে বাড়ি দেখতে চললাম।

গ্রামের প্রায় শেষ প্রান্তে এই বাড়ি—চারদিকে জঙ্গল ও পতিত জমি। এক ডাকে সাড়া পাওয়া যায় এমন বাড়ি কাছে একখানিও নেই। বুঝতেই পারলাম, লোকালয় থেকে অনেকখানি দূরেই বাড়িখানি পড়ে আছে; কিছু দূরে একটা খাল। বাড়িখানাও ছোট, চারদিকে পাঁচিল ঘেরা। সদর দরজা খুললেই সামনে পড়ে এক ফালি উঠান, তার চারদিকে বড় বড় ঘাস ও আগাছা, তারপরেই কয়েকখানি ঘর। বাড়ির ভিতর ঢুকে আমরা চওড়া লম্বা রক এবং দরদালান পার হয়ে একটা বড় ঘরে এলাম। তার মাঝখানে চৌকি পাতা, পিছনে বড় বড় দুটো জানালা। বড় ঘরের দু'পাশে আরও দুটো ছোট ছোট ঘর। মাঝের ঘরখানা দেখেই আমাদের খুব পছন্দ হল, বেশ আলো-বাতাস রয়েছে। এই হলঘরেই রাত্রিবাস করা যাবে স্থির হল। তক্তপোশের ওপর শতরঞ্চি ও বিছানা পেতে দিব্যি ফরাস করা গেল। ভট্টাচার্য মহাশয় আমাদের সঙ্গে তাঁর বাড়ির দুজন ভৃত্যকে পাঠিয়েছিলেন—তারা উঠানের বন-জঙ্গল পরিষ্কার করে এবং ঘরগুলি ধুয়ে-মুছে বাসোপযোগী করে দিল। কাজ শেষ করেই তারা সবিনয়ে বিদায় নেবার জন্যে ব্যস্ত হল। বুঝলাম, এ বাড়িতে সন্ধ্যার দিকে থাকবার মতো দুঃসাহস

তাদের মোটেই নেই। বললাম ঃ "ভয় নেই, একটু থাক, আমাদের একজনই এখানে থাকবে—আর একজন তোমাদের সঙ্গেই যাবে।"

এখন আমাদের মধ্যে তর্ক বাধল—কে প্রথম দিন রাত্রিবাস করবে? অজয় ও আমি প্রত্যেকেই প্রথম রাত্রি এখানে কাটাবার জন্যেই ব্যাকুল হয়ে উঠেছি। অগত্যা দু'টুকরো কাগজে দুজনের নাম লিখে টুকরো দুটো মুড়ে বিছানার উপর ছড়িয়ে দিয়ে ভৃত্যদেরই একজনকে তার ইচ্ছামতো একটা তুলতে বলা হল। প্রথম মোড়কটি তোলা হতেই সেটি খুলে দেখলাম, তাতে অজয়ের নাম লেখা রয়েছে। আনন্দে অজয় চিৎকার করে উঠল। অগত্যা স্থির হল যে, অজয়কেই আজ এখানে রাত্রিবাস করতে হবে একা। আমিই শেষে পড়ে গেলাম।

এদিকে সন্ধ্যা হয়ে আসছে দেখে ভৃত্যদ্বয় তাড়া দিতে লাগল—তারা আর বেশিক্ষণ এখানে থাকতে প্রস্তুত নয়। তখন আমাকেও তাড়াতাড়ি সব ব্যবস্থা করে উঠতে হল। ভট্টাচার্য মহাশয়ের বাড়ি থেকে একজনের মতো খাবার, সরাই ভরা পানীয় জল, বড় বড় দুটো মোমবাতি আমাদের সঙ্গে এসেছিল। তাছাড়া টোটা-ভরা রিভলভার, চড়া রশ্মির টর্চ, একখানা মাসিকপত্র, একটা প্যাড ও ফাউন্টেন পেনও আনা হয়েছিল। আমাদের মধ্যে কথা হয়েছিল যে, যার অদৃষ্টে রাত্রিবাস ঘটবে, কোনো আশ্চর্য ব্যাপার কিছু দেখলেই সে প্যাডে লিখে রাখবে। কেননা, যদিই কোনো দুর্ঘটনা ঘটে, তাহলে পরদিন ঐ লেখা থেকে ব্যাপারটা বুঝতে পারা যাবে।

এরপর অজয়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এবং কথামতো কাজগুলি করবার কথা মনে করিয়ে দিয়ে আমরা সন্ধ্যার একটু আগেই সেখান থেকে বেরিয়ে এলাম।

ভট্টাচার্য মহাশয় বৈঠকখানায় প্রতীক্ষা করছিলেন। দেখলাম, তাঁর মুখখানা খুব বিমর্ষ, শুষ্ক কণ্ঠে আমাকে আহ্বান করে বসালেন। অনেক কথা হল তাঁর সঙ্গে। একসঙ্গেই আমরা ভোজন করলাম। তাঁর বৈঠকখানায় আমার রাত্রিবাসের ব্যবস্থা হল।

প্রত্যুষে উঠে প্রাতঃকৃত্য শেষ করেই দেখি, ভট্টাচার্য মহাশয় নিজেই এসেছেন আমাদের সঙ্গে করে ভূতের বাড়িতে যাবার জন্যে। বাইরে দেখি, গ্রামের অনেকেই প্রতীক্ষা করছেন। বুঝলাম, সারারাত্রি সবারই দারুণ উৎকণ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে। ভট্টাচার্য মহাশয়কে সামনে রেখে দলবদ্ধ হয়ে আমরা সেই কুখ্যাত বাড়ির দিকে চললাম। বাড়ির সামনে এসে দেখলাম, ভিতর থেকে সদর দরজা বন্ধ। বাইরে থেকে দরজায় ঘা দিয়ে অজয়ের নাম ধরে অনেক ডাকাডাকি করলাম, কিন্তু কোনো সাড়া পাওয়া গেল না তার। তখন অতি কষ্টে পাঁচিল টপকে ভিতরে ঢুকে বাইরের দ্বার খোলবার ব্যবস্থা করতে হল।

আমাদের বুকের ভিতরটা তখন টিপ টিপ করছে, পায়েও যেন আর সে জোর নেই! তবে কি সত্যই কোনো দুর্ঘটনা ঘটেছে? তাই কি অজয়ের কাছ থেকে কোনো সাড়া এল না?

যাই হোক, উঠান পার হয়ে সিঁড়ি বেয়ে দালানে উঠলাম। সেখান থেকে দেখলাম, ঘরের দরজা খোলা রয়েছে। তারপর আমরা সেই হলঘরের মধ্যে ঢুকেই স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে রইলাম—দেখলাম, লম্বা লম্বা বাতি দুটো ইঞ্চি দুই পুড়েই নিবে গেছে। তক্তপোশে বিছানো ফরাসে রয়েছে অজয়ের পিস্তল, সেই প্যাড ও ফাউন্টেন পেন; আর, তক্তপোশের ওদিকে মেঝের ওপরে পড়ে আছে অজয়ের সংজ্ঞাহীন দেহ।

ভট্টাচার্য মহাশয় আর্তস্বরে বললেন ঃ "দেখুন কাণ্ড! ইচ্ছা করে ছেলেটা প্রাণ হারালে!" বলতে বলতেই তিনি এগিয়ে গেলেন অজয়কে তোলবার জন্যে। আমরাও তাঁকে সাহায্য করতে ছুটে গেলাম। সবাই মিলে অজয়কে তুলে তক্তপোশের ওপরে শুইয়ে দেওয়া হল। সঙ্গে সঙ্গে হাতে-মুখে জল দিয়ে সংজ্ঞা ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা চলল। এই সময় বিছানায় রাখা সেই প্যাডখানার ওপরে আমার নজর পড়ল—অজয়ের হাতের লেখা তাতে রয়েছে। তাড়াতাড়ি সেটা তুলে নিয়ে পড়তে লাগলাম। অজয় কয়েক ছত্রে লিখেছে ঃ

"সন্ধ্যা হতেই বাতি দুটো জ্বেলে দিলাম। হাত-মুখ ধুয়ে কিছু খেয়ে নিলাম। তারপর বিছানায়

বসে মাসিক পত্রখানা খুলে একটা গল্প পড়তে আরম্ভ করলাম। খানিক পরে মেয়েলি গলায় একটা কান্না বাইরে থেকে ভেসে এল—এত করুণ তার সুর যে, বুকের ভিতরটা যেন শিউরে উঠল! সেই কান্না ক্রমশই ঘরের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। মনে হল, বন্ধ দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে সত্যিই কে যেন কাঁদছে! ঘরের দরজা ভেজানো ছিল—হঠাৎ খুলে গেল, আর সেই সঙ্গে কান্নার করুণ সুরটাও ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল। অমনি তখন কে যেন কাঁদতে কাঁদতে ঘরের বড় দেয়াল-আলমারিটার দিকে ছুটে গিয়ে আলমারির দুটো দরজাই জোর করে খুলে ফেললে! কাউকে দেখতে পাচ্ছি না, অথচ কান্নাটা আলমারির কাছ থেকেই শোনা যাচ্ছে! কি বুক-ফাটা কান্না! আমি রিভলভারটা তুলে নিয়ে আলমারির দিকে নিশানা করে বললাম—কে কাঁদে, বল, নৈলে গুলি করব। উ! কি আশ্চর্য! সত্যিই একটা মূর্তি আলমারির গায়ে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—তার মুখখানা নারীর মুখের মতো, কিন্তু হাত দুটো খালি হাড়ের—সেই হাতে কি যেন আঁকড়ে ধরে রয়েছে! আরে—মূর্তিটা যে আমার দিকে এগিয়ে আসছে—আর তো কাঁদছে না সে! চোখ দুটো যেন জ্বলছে! মুখখানায় মাংস, কিন্তু হাত দু'খানা খালি হাড় যে! নিশ্চয়ই ভূত! গুলি না করলে আমাকে হত্যা করবে...."

অজয়ের লেখা এইখানেই শেষ হয়েছে। বোঝা গেল, এই সময় সে গুলি ছুঁড়েছিল। রিভলভারটি পরীক্ষা করে দেখা গেল, একটি টোটা কম, আর আলমারির পাশে দেয়ালের অবস্থা দেখে বোঝা গেল যে, গুলিটি সেখানেই পড়েছিল। কিন্তু এরপরে কি হয়েছিল, সে তো এখন রহস্যাবৃত, জানবার উপায় নেই।

ইতিমধ্যে শুশ্রূষার ফলে অজয়ের নাক দিয়ে নিঃশ্বেস পড়ল, দুই চোখের পাতাও অল্প অল্প নড়ে উঠল। তখন আমাকেই ক্যাম্পে ছুটতে হল; এবং প্রকৃত ব্যাপারটা চাপা দিয়ে, অজয় হঠাৎ অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েছে এই কথা জানিয়ে ক্যাম্প থেকে স্ট্রেচার ও দুজন কুলি এনে অজয়কে ক্যাম্পের হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়ে কতকটা নিশ্চিন্ত হলাম। ক্যাম্পের ডাক্তারকে অবশ্য চুপি চুপি ব্যাপারটা বলতে হয়েছিল।

এরপর ভট্টাচার্য মহাশয়ের বাড়িতে ফিরে স্নানাহার করা গেল—তাঁরাও সাগ্রহে আমার প্রতীক্ষা করছিলেন। আহারাদির পর বৈঠকখানায় বসে অজয়ের সম্বন্ধেই আলোচনা হতে লাগল। তাঁকে জানালাম ঃ "ডাক্তারবাবু বলেছেন—প্রাণের ভয় নেই, তবে মাথার গোলমাল হতে পারে।"

ভট্টাচার্য মহাশয় এবার বললেন ঃ "কেমন, আমার কথা ফলল তো? এখন বাবাজী, তোমার আগ্রহ তো ঘুচে গেছে? না, তুমিও শখ করে আবার ওবাড়িতে রাত্রিবাস করতে যাবে আজ?"

কথাটা শুনে চমকে উঠলাম, নিজের সাহসের উপরেও একটা অভিমান জাগল। বললাম ঃ "দেখুন, আমরা এ যুগের ছেলে, চাকরি করি বলে মনুষ্যত্ব হারাইনি। যে আগ্রহ মনে জেগেছিল, একজন তার জন্যে বিপন্ন হয়েছে বলে, আমি যদি আজ ভয় পেয়ে পিছিয়ে যাই, আপনিই তখন আমাকে কাপুরুষ বলে অবজ্ঞা করবেন। আজকের পালা আমার—কালকের মতন আমাকেও যেতে হবে, কালকের মতোই সব ব্যবস্থা আপনাকেই করে দিতে হবে, আর সকালে গিয়ে আমার সন্ধান নিতেও যাবেন, এ আশাও করি।"

ভট্টাচার্য মহাশয় এবং আর সকলে আমার মুখে এ কথা শুনে অবাক হয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন। কিন্তু দেখলাম, আর কোনো আপত্তি করলেন না, বাধাও দিলেন না; আগের দিনের সেই দুই ভৃত্যকে ডেকে যথাযথ ব্যবস্থা করবার হুকুম দিলেন।

বিকেলে যখন সেই বাড়িতে যাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলাম, সেই সময় ভট্টাচার্য মহাশয় বললেন ঃ "বাবাজী, তোমার বন্ধুর হাতিয়ার আমার কাছে আছে, সেটাও কি নিয়ে যাবে?"

মৃদু হেসে বললাম ঃ "আজ্ঞে না, সেটা আপনার কাছেই থাক। আমি আজ বিনা হাতিয়ারেই ভূতের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে যাব। আমার হাতিয়ারও সুটকেসে রেখে যাচ্ছি।"

কথাটা শুনে তিনি স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন শুধু। মনে হল, সেই দৃষ্টি দিয়ে তিনি যেন আমার অভিপ্রায়কে উপলব্ধি করবার চেষ্টা করছেন। সন্ধ্যার আগেই সে বাড়িতে প্রবেশ করলাম।

ভৃত্য দুইজন ঘরগুলি পরিষ্কার করে, বিছানাটি ঝেড়ে-ঝুড়ে, জল, খাবার, বাতি যথাস্থানে রেখে বিদায় নিয়ে চলে গেল।

আমি এখন একা—একাই ঘরগুলি ঘুরে ঘুরে দেখলাম। বাইরের দরদালান, লম্বা রক, উঠান—একে একে প্রত্যেক স্থানটি দেখে পুনরায় হলঘরে ফিরে এলাম। তখন সন্ধ্যা হয়েছে, অন্ধকার গাঢ় হয়ে ঘনিয়ে আসছে। আমি একসঙ্গে দুটো বাতিই জ্বেলে দিলাম। এই সময় হঠাৎ আমার চোখে পড়ল দেওয়ালের সঙ্গে গাঁথা প্রকাণ্ড আলমারিটার দিকে। আমি ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে তার ডালা দুটো খুলে ফেললাম। ভিতরের তাকের তক্তাগুলো জীর্ণ হয়ে গেছে—এলোমেলোভাবে অনেকগুলি জিনিস রয়েছে তার মধ্যে; যেমন—চুলের কাঁটা, ভাঙা চিরুনি, ময়লাপড়া নানা রকমের শিশি-বোতল, বেতের চুপড়ি, এমনি কত কি! নীচের তাকে হাত দিতেই তক্তাটা নড়ে উঠল, বুঝলাম—তার নীচে একটা চোরা খুপরি আছে। বাতির আলোকে সেই খুপরির দিকে চাইতেই দেখতে পেলাম, রঙিন ফ্রক পরানো, পুঁতির মালা দিয়ে সাজানো একটা মোমের পুতুল রয়েছে সেখানে লুকানো। বেশ বড়সড় পুতুল; সেটি দেখেই আমার বুকের ভিতরটা ঝাঁৎ করে উঠল।

পুতুলটিকে নিবিষ্ট মনে দেখছি, এমন সময় বাইরে থেকে অত্যন্ত করুণ সুরে কে যেন কেঁদে উঠল—নারীকণ্ঠের করুণ সুর! ঝাঁ করে মনে পড়ে গেল অজয়ের হাতে-লেখা ছত্রগুলি। তাড়াতাড়ি পুতুলটি যথাস্থানে রেখে তাকের তক্তাটি চাপা দিয়ে আলমারির দ্বার বন্ধ করলাম। কান্না তখন বাইরে আরো গম্ভীর হয়ে উঠছে মনে হতে লাগল, একটু আগে আমি যেমন সমস্ত বাড়িখানা ঘুরে ঘুরে দেখে এলাম, কান্নার শব্দও তেমনি ঘুরে ঘুরে বাড়িময় বেড়াচ্ছে। আমি তখন আলমারির কাছ থেকে সরে গিয়ে ফরাসের উপরে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে চেয়ে রইলাম।

একটু পরেই দরজার ওপাশে কান্নার স্বর সুস্পষ্ট হল; পরক্ষণে দরজার দুটো পাল্লাই একসঙ্গে খুলে গেল, আর সেই সঙ্গে কান্নার শব্দ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল। আমি অবাক বিস্ময়ে আলমারির দিকে চেয়ে রইলাম; বেশ বুঝতে পারছিলাম—কান্না এখন ঐখানেই জমেছে; অজয় সত্য কথাই লিখেছিল তার প্যাডে—কি বুকফাটা সে কান্না!

একইভাবে আমি চেয়ে আছি আলমারির দিকে—হঠাৎ আমার মনে হল, আলমারির গায়ে পিঠ দিয়ে এক নারীমূর্তি দাঁড়িয়ে আছে—তার মুখখানা মাংসল, কিন্তু হাত দু'খানা মাংসহীন, অস্থিময়—ঠিক যেন নরকঙ্কালের দুটি হাত! সেই হাতের মধ্যে কি যেন একটা বস্তু রয়েছে! একটু পরেই সে বস্তুটি আমি চিনতে পারলাম—একটু আগে আলমারির চোরা খুপরির মধ্যে ফ্রকপরা যে মোমের পুতুলটি দেখেছিলাম, সেইটি অস্থিময় উভয় হাতে ধরে মাংসল মুখে মূর্তিটি কাঁদছে! বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে আমি এ দৃশ্য দেখলাম, দু'হাতে দু'চোখ মুছে, তারপর ভালো করে তাকিয়েও সেই একই দৃশ্য দেখলাম।

আমি তখন হাত দু'খানি জোড় করে সবিনয়ে সেই মূর্তিকে লক্ষ করে বললাম ঃ "মা! বুঝতে পেরেছি সন্তানের শোক তুমি আজও ভুলতে পারনি—অতৃপ্ত মাতৃস্নেহ তোমাকে এইভাবে এখানে টেনে আনে প্রতি রাত্রে। আমাকে তোমার সন্তান মনে করে যদি সব বল মা, আমি তোমার মুক্তির ব্যবস্থা করতে পারি!"

আশ্চর্য হয়ে দেখলাম, মূর্তির কঙ্কালময় হাত দু'খানিও এখন মাংসল হয়ে উঠেছে, পুতুলটি এখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে; এখন আর তাঁর মুখে কান্না নেই। কি সুন্দর কমনীয় সৌম্য মাতৃমূর্তি! মানুষের মতো মিষ্ট কোমল স্বরে তিনি বললেন ঃ "এতকাল পরে কে বাবা তুমি আমাকে 'মা' বলে ডাকলে? আমার অনুকে হারিয়ে অবধি এ ডাক তো আর শুনিনি বাবা! আমার কথা শুনতে চাইছ, আমাকে শান্তি দেবে বলছ! কিন্তু কেউ তো এ কথা বলেনি। কি সুখীই না আমি ছিলাম একদিন! কোল জোড়া খোকা অনু! বড় সাধ তার—খোকা নিয়ে খেলা করে। উনি কলকাতা থেকে এই খোকা কিনে আনেন...আমি তাকে অবাক করে দেব বলে আলমারির চোরা খুপরিতে লুকিয়ে রাখলুম। তারপর ছুটলুম খোকাকে খুঁজতে। একি, খোকা কোথায় গেল? তাকে লুকিয়ে আছি আমি, সে কোথায়

লুকাল? খানিক পরে বাইরে গোলমাল শুনে ছুটে গেলুম...ওঁর কান্না বাজল কানে...'খোকারে! বাবারে!' কি সর্বনাশ! কি হল খোকার? ওকি, উনি যে তাকে বুকে করে আনছেন! হে ঠাকুর, কি করলে তুমি?....উনি চিৎকার করে বললেন—'খোকা তোমার খোঁজে বাইরে গিয়ে খালের জলে ডুবে যায়—সব শেষ হয়ে গেছে।'....আমি শুনতে শুনতেই—অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাই। যখন জ্ঞান হল, শুনলুম—খোকাকে বুকে করে উনি চলে গেছেন। আর তিনি ফেরেননি। আমার অবস্থা বুঝতে পারছ—আমি আর সহ্য করতে না পেরে বিষ খেয়ে মরলুম। কিন্তু মরেও কি শান্তি পেয়েছি বাবা? নিত্য আমাকে আসতে হয় খোকার ঐ পুতুলটির আকর্ষণে! ওকে কোলে করলেই খোকার কথা মনে পড়ে, আমি তাকে দেখতে পাই, তাই অমন করে কাঁদি! কিন্তু কেঁদেও নিস্তার নেই বাবা! মাঝে মাঝে অবুঝরা আমাকে জ্বালাতে এসে, আমাকে মারতে চায়, তখনই প্রেতের প্রতিহিংসা ধক ধক করে জ্বলে ওঠে! কিন্তু তোমার মতো কেউ কি জিজ্ঞাসা করেছে বাবা, কেন আমি কাঁদি, আমার কি দুঃখ? তুমি পারবে বাবা আমাকে শান্তি দিতে—আমার দুঃখ ঘোচাতে?"

কথাগুলো শুনতে শুনতে আমি অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। আর্তস্বরে বললাম ঃ "হ্যাঁ মা, আমি তোমাকে শান্তি দেব, যাতে মুক্তি পাও সে ব্যবস্থা করব আমি। তুমি মা, আমাকে তোমার নাম-গোত্র যদি জানাও—"

কথা আমাকে শেষ করতে না দিয়েই মূর্তি তাঁর নাম-গোত্র সবই বললেন, আমি লিখে নিলাম। তারপরে মুখ তুলে দেখি, আলমারির দরজা তেমনি বন্ধ রয়েছে, কেউ সেখানে নেই!

ভোর হবার আগে নিজেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লাম ভট্টাচার্য মহাশয়ের বাড়ির উদ্দেশে। আমার ডাক শুনেই তিনি বাইরে এসে সহর্ষে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন, তারপর বৈঠকখানায় বসিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "ব্যাপার কি? তোমাকে দেখে আমার কি আহ্লাদ যে হচ্ছে!"

সব কথাই তাঁকে খুলে বললাম; তারপর সেই মেয়েটির মুখে শুনে যে নাম-গোত্র প্যাডে লিখেছিলাম, তাঁকে দেখালাম। তিনি পড়ে সবিস্ময়ে বললেন ঃ "ভারী আশ্চর্য তো! ঐ বাড়ি ঘোষালদের, এ কথা সবাই জানে; কিন্তু সে যে ৭০ বছর আগেকার কথা। আমি তখন জন্মাইনি। শুনেছিলাম বটে, ঘোষালদের একটি বউ স্বামীপুত্রের শোকে মারা পড়েছিলেন। অ্যাঁ! তাহলে এই ৭০ বছর ধরে সেই বউটির অতৃপ্ত আত্মা এই কাণ্ড করে বেড়াচ্ছে!"

আমি বললাম ঃ "এইবার তিনি মুক্ত হবেন। আমি সাহেবকে সব কথা বলে ছুটি নিয়ে গয়ায় যাব, সেখানে পিণ্ড দেব।"

সেইদিনই সাহেবকে সব কথা বলে ছুটি চাইলাম, তিনি সানন্দে ছুটি মঞ্জুর করলেন। গয়ায় পিণ্ড দিয়ে ফিরে এসে আমরা দুই বন্ধুই আবার সেই ঘরে রাত্রিবাস করি; কিন্তু আর সে কান্নাও শুনিনি, মূর্তিও দেখিনি। আমরা উভয়ে ঐ বাড়িতেই বাস করতে থাকি।

পৌষ ১৩৫৭

কাটা হাতের লোভে

শ্রীঅমিতাভ ভট্টাচার্য

এম. বি. পাশ করে আমি তখন হাউস-সার্জন—এমন সময় একদিন শুনলাম সমর কাকা ফিরে এসেছেন। ছোটবেলা থেকে তাঁর নাম শুনে আসছি। প্রথম মহাযুদ্ধে মুষ্টিমেয় যে কয়েকজন ভারতীয় চিকিৎসক কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন, সমর কাকা তাঁদের মধ্যে একজন—এবং বেশ বড় একজনই। চাকরি থেকে অবসর নেবার পর তিনি বোম্বাইয়ে প্র্যাকটিস শুরু করেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য যা প্রয়োজন, সেই নাম এবং অর্থ তিনি যথেষ্টই অর্জন করেন।

দীর্ঘকাল পরে হঠাৎ একদিন সমর কাকার একখানা চিঠি পেয়ে সত্যিই আশ্চর্য হয়ে গেলাম। আড়ম্বরহীন বৈজ্ঞানিক জনোচিত স্পষ্ট ভাষায় চিঠি—তাতে আত্মীয়তার মধুর সুরের চেয়ে কাজ সেরে-নেওয়া গোছের ভাবটাই বেশি! যাই হোক, তবু যাওয়া ঠিক করলাম!

বলতে ভুলে গেছি—ওঁরা এসে উঠেছিলেন কলকাতায় নয়। হুগলি জেলার কোনো গ্রামে এক জমিদারের পতনোন্মুখ বিরাট অট্টালিকা কিনে তাঁরা বাস করছিলেন সত্যিকারের অবসরপ্রাপ্ত জীবন। নির্দিষ্ট দিনে সেই অখ্যাত গ্রামে গিয়ে পৌঁছলাম।

শীতের সন্ধ্যা। পথে লোক নেই বললেই চলে। যে কয়েকজন লোক একটা চায়ের দোকানে বসে ছিল, তাদেরই একজনকে পথপ্রদর্শক করে গন্তব্যস্থলে উপস্থিত হলাম।

বিরাট বাড়ি। চারিদিকের উঁচু পাঁচিলের ধ্বংসাবশেষ দুটি স্তম্ভ কোনোরকমে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাদের সঙ্গে লাগানো একটি কাঠের বিরাট দরজা। সঙ্গের লোকটির ডাকাডাকিতে হ্যারিকেন হাতে কে এগিয়ে আসছে দেখলুম।

একটি ভৃত্যশ্রেণির লোক ভিতরে পথ দেখিয়ে চলল। লম্বা বারান্দার মধ্য দিয়ে ঘরের সারি অতিক্রম করে একটি হলঘরে প্রবেশ করলুম। লক্ষ করলুম, বাড়িটির অভ্যন্তর বাহিরের মতো নয়—সংস্কার করে বাসের উপযুক্ত করা হয়েছে।

একটি চেয়ার এগিয়ে দিয়ে চাকরটি টেবিলের উপর লণ্ঠনটি রেখে প্রস্থান করল। লণ্ঠনের আলোতে আমার অনভ্যস্ত চোখ কিছুটা অস্বস্তি অনুভব করতে লাগল। চেয়ার, টেবিল, বইয়ের আলমারিতে সুন্দর সামঞ্জস্য রেখে সাজানো ঘরটি!—সবেতেই একটা অতিপ্রাকৃত ভাবের অস্পষ্ট ইঙ্গিত।

"তুমিই কি ফণীর ছেলে দিলীপ? আরে থাক্ থাক্। বসো, বসো।"

গলার স্বর শুনে যা ধারণা করেছিলাম, তার অধিকারীকে দেখে সে ধারণা দূর হল। ভেবেছিলাম, দেখব একজন রোগা বেঁটে লোককে! দেখলাম প্রায় এক দ্বিতীয় ভীমসেনকে—অবশ্য বৃদ্ধাবস্থায়। বুঝলাম ইনিই সমর কাকা। উঠে প্রণাম করলাম। ছোটবেলায় যে বিরাট মূর্তি দেখেছিলাম, তা আজ আবার দেখলাম।

বাসন্তী কাকীমা এলেন এবং দু'মিনিটেই আমাকে একেবারে আপন করে নিলেন! বন্ধুমহলে বলিয়ে-কইয়ে বলে আমার কিঞ্চিৎ সুনাম ছিল। সুতরাং ঘণ্টাদেড়েক পরে যখন আমরা খেতে বসলাম তখন আমি ঘরের ছেলে। কথাবার্তায় সমর কাকার রসিক মনের পরিচয় পেলাম। বাসন্তী কাকীমাও নেহাৎ কম যান না। কিন্তু মাঝে মাঝে কি জানি কেন তাঁদের কৌতুকময় ব্যবহারের মধ্যে একটা বিষাদমাখা মনের ছায়া উঁকিঝুঁকি মারছিল!

খাবার পর কথায় কথায় কি করে ভূতের কথা উঠল তা আমার মনে নেই; তবে এটুকু মনে আছে, আলোচনা শেষ হলে আমি বেশ কিছুটা আত্মপ্রসন্নভাবে বলে উঠলাম, "আমি এ-বিষয়ে অনেক পড়াশুনো করেছি এবং ভৌতিক উপস্থিতির প্রমাণ-সংগ্রহে একরাত অপর দুজন বন্ধুর সঙ্গে তথাকথিত এক হানাবাড়িতে রাত কাটিয়েছি।"

আমি যখন এমনি সব কথা বলে বাহাদুরি নিচ্ছিলাম তখন কাকা ও কাকীমার মধ্যে অর্থযুক্ত দৃষ্টি-বিনিময় চলছিল। গল্পের শেষে বাসন্তী কাকীমা উঠে গেলেন। ঘরে রইলাম শুধু আমরা দুজন—সমর কাকা এবং আমি।

একটা চুরুট ধরিয়ে সমর কাকা চুপ করে বসে ধোঁয়া ছাড়তে লাগলেন। আমি অনুভব করলাম, আমাকে যেন গুরুত্বপূর্ণ কি বলবেন! আমিও চুপ করে রইলাম যদি কথা বললে বাধা দেওয়া হয়!

অবশেষে একটা বিরাট দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সমর কাকা বললেন, "দেখ দিলীপ, ছোটবেলা থেকেই আত্মীয়বন্ধু ছাড়া। তোমাদের কতটুকুই বা জানি! তবে যা শুনলুম তাতে বুঝলুম, তোমার মতো লোকই আমার দরকার।

তুমি বলছ ভৌতিক ব্যাপার সম্বন্ধে তোমার বিশেষ জ্ঞান আছে। আশা করি, ভূত দেখলে তুমি ভয় পাবে না?"

দৃঢ়স্বরে বললাম, "নিশ্চয়ই না। বরঞ্চ আনন্দিতই হব।"

"এবং ভূতকে একটা বৈজ্ঞানিক সত্য বলেই গণ্য করবে ও তার মৌলিক কারণ অনুসন্ধান করবে যেমন জ্যোতির্বিদ নতুন গ্রহ দেখলে তার অনুসন্ধান করে থাকে।"

"ঠিক তাই।"

"বেশ, তবে এস আমার সঙ্গে।"

সমর কাকা আমাকে নিয়ে চললেন বাইরের বারান্দা ধরে সোজা উত্তর দিকে। অবশেষে পৌঁছলাম একটি বন্ধ ঘরে। বুক-পকেট হাতড়ে একটা চাবি বের করে দরজা খুললেন সমর কাকা। দেখলাম, ঘরটা সমর কাকার ল্যাবরেটরি। বুনসেন বার্নার, টেস্ট টিউব, ফ্লাস্ক, মাইক্রোস্কোপে ভরা, একধারে তাকের উপর বড় বড় জারের সারি, তার মধ্যে রয়েছে শরীরের বিভিন্ন দ্রষ্টব্য বস্তু—শুধু মানুষের নয় নানা জন্তুর।

সমর কাকা বললেন, "এখনও আমি কিছু কিছু বিজ্ঞানচর্চা করে থাকি। এই যে জারগুলো দেখছ এ আর কি! এগুলো আমার যে মিউজিয়াম ছিল তার অবশেষ মাত্র! পাঁচ বছর আগে আগুন লেগে সবই নষ্ট হয়ে যায়। আমার দুর্ভাগ্য! আমার এই সংগ্রহ প্রায় অতুলনীয় ছিল। এখন শুধু এই ক'টিতে পরিণত হয়েছে।"

একবার জারগুলোর উপর চোখ বুলিয়ে নিয়েই বুঝলাম, সত্যই দুর্লভ সংগ্রহ।

সমর কাকার কণ্ঠস্বর আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল, "এইখানে একটা ইজিচেয়ার রয়েছে। বলতে সঙ্কোচ হচ্ছে, কিন্তু তুমি তো ঘরের ছেলে। আজ যদি এখানেই রাতটা কাটিয়ে দাও...."

"না, না, আপনি ব্যস্ত হবেন না! আমার এরকম অভ্যাস আছে। কোনো অসুবিধা হবে না।"

"এই ঘরের দুটো ঘর পরেই আমার ঘর। দরকার হলেই আমাকে পাবে।"

"আশা করি, তার দরকার হবে না," মৃদু হেসে বললাম।

"না হলেই ভালো। তবু যদি দরকার হয়, ডাকতে ইতস্তত করো না। আমার রাত্রে ভালো ঘুম হয় না। সম্ভবত আমি জেগেই থাকব।"

ঘণ্টাখানেক পরে যখন শোবার জন্য ল্যাবরেটরিতে প্রবেশ করলাম তখন সত্যি কথা বলতে কি, কেমন একটা অদ্ভুত উত্তেজনা অনুভব করছিলাম! জোর গলায় বলতে পারি সেটা ভীতিজনিত নয়, কৌতূহলের জন্যই। আমি লণ্ঠনটা নিবিয়ে শান্ত মনে ইজিচেয়ারে শুয়ে পড়লাম।

সারাদিনের ঘোরাঘুরির পর অল্প সময়ের মধ্যেই আমি কখন ঘুমিয়ে পড়লাম!

কি একটা শব্দে আমার ঘুম ভেঙে গেল। তাড়াতাড়ি উঠে বসলাম। অনেকক্ষণ নিশ্চয় ঘুমিয়েছি। কারণ, চাঁদের ফালিটুকু এখন আর জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে না। প্রথমে কিছুই দেখতে পেলুম না। ক্রমে চোখে আলোটা সহ্য হল। মনে হল একটা কিছু আমার দিকে এগিয়ে আসছে! পায়ের অস্পষ্ট আওয়াজ কানে এল। এতক্ষণ বৈজ্ঞানিক মনোভাবের বড়াই করলেও সমস্ত শরীরের মধ্য দিয়ে যেন অজানা ভয়ের স্পন্দন অনুভব করলাম! পদশব্দের অজানা অধিকারীকে এবার দেখতে পেলাম।

একটি বেঁটে লোক, পরনে পাজামা আর আলখাল্লার মতো জেব্বা, মাথার উপরে মেয়েদের মতো খোঁপা বাঁধা। ধীরে ধীরে সে এগিয়ে আসছিল আমারই দিকে। কিন্তু লক্ষ ছিল তার ডাক্তারি

সংগ্রহে ভরা জারগুলোর উপর। একাগ্র দৃষ্টিতে সে প্রত্যেক জারটা দেখছিল। এমনি ভাবে যখন সে শেষ জারটার কাছে পৌঁছল, তখন সে আমায় দেখতে পেল, থামল এবং দু'হাত তুলে হতাশ স্বরে আক্ষেপ করে উঠল। তারপরেই আমার চোখের সামনে থেকে সে শূন্যে মিলিয়ে গেল!

আমি বলেছি সে দু'হাত তুলেছিল, কিন্তু আমার বলা উচিত ছিল দুই বাহু; কারণ তার হাত মাত্র একটি। ডান বাহুর শেষ হয়েছে একটি বীভৎস গোলাকার পিণ্ডে। অন্য সকল প্রকারে এই অতি-প্রাকৃত ব্যক্তিটিকে অনায়াসেই বাড়ির একজন বিদেশি চাকর বলে মনে করা যায়, কিন্তু তার অদৃশ্য হওয়াতেই আমার সন্দেহ হল। ইজিচেয়ার থেকে উঠে লণ্ঠনটা জ্বাললুম। কোথাও কিছু চিহ্ন নেই। সত্যিই অদ্ভুত! সারারাত্রি জেগে রইলাম কিন্তু আর কিছু ঘটল না।

ভোর হতে না হতেই ঘর থেকে বেরোলাম। তারপর সমস্ত ঘটনা সমর কাকাকে খুলে বললাম।

সমর কাকা বললেন, "এই রকম ঘটনা আজ চার বছর ধরে প্রতিরাত্রে ঘটছে। প্রতিরাত্রে এসে ও ঠেলা দিয়ে আমার ঘুম ভাঙিয়েছে, আমার ল্যাবরেটরিতে ঢুকেছে, জারের লাইন ধরে চলেছে তারপর শূন্যে মিলিয়ে গেছে। সুতরাং আমার কি অবস্থা হয়েছে, বুঝতেই পারছ।"

"কিন্তু কেন? কি চায় সে?" আমি জিজ্ঞাসা করি।

"সে চায় তার হাত।" সমর কাকা উত্তর দিলেন।

"হাত?"

"কি হয়েছিল শোনো। বছর দশেক আগে আমি কোনো বিশিষ্ট লোকের চিকিৎসা করার জন্য পেশোয়ারে যাই। সেখানে থাকবার সময় স্থানীয় একজন আদিবাসী আমাকে তার হাত দেখায়। হাতে হাড়ের টিউমারে সে ভুগছিল। তাকে বোঝালাম হাত কেটে বাদ না দিলে সারবার কোনো পথ নেই। অনেক চেষ্টার পরে সে রাজি হল। আমার কি ফি চাই, সে জিজ্ঞাসা করল। লোকটার সাজপোশাক এমন যে আমি বললাম, কোনো কিছু চাই না তবে কাটা হাতটা আমাকে দিতে হবে, আমি ওটা আমার মিউজিয়ামে রেখে দেব।

আশ্চর্য হয়ে গেলাম লোকটার তীব্র প্রতিবাদ শুনে। তার বিশ্বাস, মৃত্যুর পর অঙ্গহীন দেহে আত্মার প্রকৃত শান্তি মেলে না। অবশ্য এই বিশ্বাস নূতন নয়—মিশরের ম্যমি এর ওপর ভিত্তি করেই সৃষ্টি। আমি তাকে বললাম, তোমার হাত তো কাটা হবেই, তুমি নিয়ে কি করবে? সে বললে, কাটা হাতটা নুনে জরিয়ে সে তার সঙ্গে সঙ্গে রাখবে। আমি বললাম, আমিও হাতটা রেখেই দেব এবং বেশ ভালো উপায়েই রাখব। সে কথা শুনে সে অত্যন্ত আশ্বস্ত হল এবং হাত কাটাতে সম্মত হল। হাতটা কাটবার ব্যবস্থা করছি এমন সময় লোকটা বলে উঠল, 'কিন্তু ডাক্তার সাহেব, মরবার পর আমার হাতটা আমার চাই।' আমি কথাটা হেসে উড়িয়ে দিলাম। ব্যাপারটার এইখানেই শেষ হল।

কত বোধ হয় বলেছি পাঁচ বছর আগে বোম্বাই-এ আমার বাড়িতে আগুন লেগে যায়। তাতে যে সব মূল্যবান সংগ্রহ নষ্ট হয়, তার মধ্যে একটি হচ্ছে ঐ লোকটির হাত। তখন বিশেষ লক্ষও করিনি।

একবছর পরে রাত্রে কার ঠেলাঠেলিতে আমার ঘুম ভেঙে গেল! উঠে দেখি, সেই লোকটি! তার কাটা হাতটি আমাকে দেখিয়ে রাগতভাবে তাকিয়ে আছে। সে সময়ে ল্যাবরেটরির সংগ্রহগুলো আমার ঘরেই ছিল। লোকটি জারগুলো পরীক্ষা করে অদৃশ্য হয়ে গেল। বুঝলাম সে সম্প্রতি মারা গেছে, আর তার কথামতো গচ্ছিত হাতটি সে আদায় করতে এসেছে।

এরপর চার বছর ধরে ক্রমাগত এই ঘটনা ঘটেছে। আমি কিছুই ভেবে উঠতে পারিনি। ভয়ে আর উৎকণ্ঠায় আমার ঘুম হয় না, তোমার কাকীমারও প্রায় সেই অবস্থা। তোমাকেই প্রথম এসব বললুম। তুমি যে এতখানি করেছ এজন্য ধন্যবাদ!"

গল্প না সত্যি? খানিকক্ষণ হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। কিন্তু কাল নিজের চোখে যা দেখেছি, তা তো আর অবিশ্বাস করতে পারি না। এখন কি করা যেতে পারে?

চা খাবার পর সহসা উঠে দাঁড়ালাম। তারপর সমর কাকাকে আশ্চর্য করে দিয়ে ঘোষণা করলাম, "দশটার ট্রেনেই আমি কলকাতায় ফিরে যাব। আজই আবার ফিরে আসব আর ল্যাবরেটরিতে রাত কাটাব।"

সমর কাকার বহু প্রশ্ন সত্ত্বেও আমার উদ্দেশ্য আমি কিছুই বললাম না।

কলকাতায় এমার্জেন্সি ওয়ার্ডে আমার সহপাঠী ও বন্ধু ডাঃ অসীম কুমার দে আমারই মতো হাউস-সার্জন। গৌরচন্দ্রিকা না করে তাকে বললাম, "ভাই, আমার একটি মানুষের হাত—কারো একটা কাটা হাত আমায় দিতে পার?"

"হাত?" অসীম আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করল। "হাত নিয়ে তুমি কি করবে?"

"আরে ভাই, সে সব পরে শুনো। এখন দাও তো।"

ঘণ্টা দুই পরে, মর্গ থেকে তারই চেষ্টায় একটা কাটা হাত সংগ্রহ করে আমি সমর কাকার বাড়ি ফিরে এলাম। তারপর সমর কাকাকে কিছু না বলে হাতটি রেখে দিলাম আমার ইজিচেয়ারের কাছে একটি কাচের জারে।

রাত্রে এক মুহূর্তের জন্য চোখের পাতা বুজতে পারলাম না। পাশে একটা ঢাকা লণ্ঠন নিয়ে বসে রইলাম।

আগের দিনের মতো আজও রাতের অতিথি এসে উপস্থিত হলেন। আগের মতোই লোকটি জারের সারি ধরে এগোতে লাগল। অবশেষে সে সেই জারটির কাছে এসে উপস্থিত হল। দুরন্ত আশায় তার সমস্ত শরীর শিহরিত হতে লাগল। ব্যগ্র হয়ে সে জারটা তুলে নিল, বেশ ভালো করে সেটা পরীক্ষা করল। তারপর রাগ এবং হতাশার একটা মিলিত মুখভঙ্গি করে সে সজোরে জারটা আছড়ে মাটিতে ফেলল। চারিদিকে কাচ ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ল।

মুখ তুলে যখন চাইলাম, সে তখন অদৃশ্য হয়ে গেছে।

ছুটতে ছুটতে উৎকণ্ঠিতভাবে ঘরে ঢুকলেন সমর কাকা। উত্তেজিত স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি হয়েছে? ব্যাপার কি?"

তারপর সব শুনে মাথা নাড়তে নাড়তে তিনি বললেন, "দিলীপ, বুদ্ধিটা খুবই ভালো। কিন্তু আমার দুঃখ-কষ্টের অত সহজে কি আর শেষ হবে?"

হঠাৎ একটা কথা বিদ্যুতের মতো আমার মনে উপস্থিত হল। তাড়াতাড়ি হাতটা তুলে নিলাম। ঠিক, আমার ধারণাই ঠিক। হাতটা বাঁ হাত!

পরের ট্রেনেই আবার কলকাতা চলে গেলাম। যতদূর মনে ছিল, লোকটির দু'হাতই বাদ দেওয়া হয়েছিল। কাজেই মর্গে অপর হাতটাও পাওয়া যেতে পারে! পাওয়া গেল ঠিকই। সেটি সংগ্রহ করে আমি আবার নূতন উৎসাহ নিয়ে ফিরে এলাম।

সমর কাকা কিন্তু কিছুতেই আমাকে আর ঐ ভূতুড়ে ঘরে শুতে দিতে চান না। কাজেই আগের মতো একটা কাচের জারে হাতটা রেখে আমি কাছেই আর একটি ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লুম।

মাঝরাতে সমর কাকার সোল্লাস কণ্ঠ শুনে ঘুমের ঘোর একেবারে ভেঙে গেল।

"দিলীপ, দিলীপ! হয়েছে, হয়েছে। কি বলে তোমায় ধন্যবাদ দেব!"

জিজ্ঞাসা করলাম, "কেন কি হয়েছে? আপনি কি কিছু দেখেছেন?"

"যথেষ্ট দেখেছি। অন্যদিনের মতো আজও সে এসে আমাকে জাগিয়ে দিল। আজ যেন ভয়ানক রেগে আছে মনে হল। বোধ হয় কালকের আশায় ছাই পড়ায়। তারপর সে রুটিনমতো চলে। কয়েক মিনিট পরে কিন্তু আবার সে ফিরে এল—চার বছরের ইতিহাসে এই প্রথম। আমি ভয় পেয়ে যাই। কিন্তু সে হেসে উঠল। হাসিমুখে আমাকে সে তাদের প্রথা অনুযায়ী তিনবার কুর্নিশ করল। তারপর তার 'হাত দুটো' আমার চোখের সামনে তুলে ধরল। 'হাত দুটো' বুঝেছ? সে অদৃশ্য হবার সঙ্গে সঙ্গেই আমি বুঝলাম এই তার শেষ আসা! তুমি যে কি উপকার করলে আমাদের!"

মরবার আগে আমার সেই নিঃসন্তান কাকা আমাকেই তাঁর উত্তরাধিকারী নির্বাচিত করে যান!

বৈশাখ ১৩৬১

বেহ্মদৈত্য

জীবনময় গুহ

শোরগোল পড়ে গেছে চৌধুরী বাড়িতে—টুটুলকে পাওয়া যাচ্ছে না দুপুর থেকে।

সে কি কথা! ছ'বছরের শিশু টুটুল। একা একা সে যাবে কোথায়? বাড়ির ভিতরেই হয়তো কোথাও লুকিয়ে আছে। যা দুষ্টু ছেলে!

গ্রামের পুরোনো জমিদার বাড়ি চৌধুরীদের। জীর্ণপ্রায় বাড়ির প্রতিটি ঘর তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখা হল—খাটের নীচে, আলমারির পিছনে, টেবিলের তলায়—কোথাও টুটুলের দেখা পাওয়া গেল না। বাড়ির আনাচে-কানাচে লুকিয়ে থাকবার মতো সবগুলো জায়গা, বৈঠকখানা, ঠাকুরদালান, গোয়ালঘর আতিপাতি করে খুঁজে দেখা হল—কোথাও টুটুলের সন্ধান পাওয়া গেল না। আশংকা ক্রমে ভয়ে পরিণত হল।

খবর শুনে পাড়া-প্রতিবেশীদের অনেকেই ছুটে আসেন চৌধুরী বাড়িতে। বলাবলি করতে থাকেন—কী আশ্চর্য! কোথায় যেতে পারে ছেলেটা এই ভরদুপুরে? ছেলেধরার কাজ হতে পারে সন্দেহ করে কেউ কেউ সংশয় প্রকাশ করতেই, সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে গেল কয়েকজন। গ্রীষ্মের দুপুরে প্রায় জনহীন গ্রামের পথে কয়েক মাইল ঘুরে, পথের ধারের দোকানগুলোতে খোঁজখবর নিয়ে, ফিরে এসে তারা বলল—ছেলেধরার মতো তেমন সন্দেহজনক কাউকেই দেখা যায়নি সে তল্লাটে।

বাড়ির মেয়েদের মধ্যে কান্নার রোল উঠল। ছেলেরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে ভাবতে লাগল—কী করা যায়? একজন বলল—আশপাশের পুকুরগুলো একবার দেখলে হত। অমনি উৎসাহী ছেলের দল জাল নিয়ে নেমে পড়ল পুকুরে।

পুকুর তোলপাড় করে খোঁজাখুঁজি হল। কিন্তু টুটুলের পাত্তা পাওয়া গেল না। সকলেই মাথায় হাত দিয়ে বসলেন—তাজ্জব ব্যাপার! হঠাৎ কোথায় উবে গেল ছেলেটা!

ছোটবেলা থেকে টুটুল যেমন দুরন্ত তেমনি দুষ্টু। ভয়ডর বলতে নেই। পাঁচ মিনিট স্থির হয়ে থাকতে পারে না কোথাও। ওকে নিয়ে বাড়ির সকলেই অতিষ্ঠ। এটা ফেলবে, ওটা ছিঁড়বে, সেটা ভাঙবে—নজরদারি একটু শিথিল হলেই হুলুস্থূল কাণ্ড। তার উপর আরও একটা ব্যাপার ইদানিং লক্ষ করা গেছে টুটুলের মধ্যে, তা হল ওর অদম্য কৌতূহল। কথা বলার কিছু একটা সুযোগ পেলেই কি? কেন? কবে? কোথায়? এইসব প্রশ্নে উত্ত্যক্ত করে তুলবে পরিচিত-অপরিচিত সকলকে। ওর মা একবার বলেছিলেন—তুই একটা বিচ্ছু। অমনি হাজারো প্রশ্ন টুটুলের—বিচ্ছু কি মা? ক'টা হাত, ক'টা পা? কী খায়? কোথায় থাকে? কেন আমাকে বিচ্ছু বললে? ইত্যাদি। শেষে বাধ্য হয়ে ওর মা কাজের ওজর দেখিয়ে সরে যান অন্যত্র।

বর্তমান চৌধুরী পরিবারের একমাত্র বংশধর টুটুল। তাই একটু বেশিমাত্রায় আদর আর প্রশ্রয় পেত সে বাড়ির সকলের কাছ থেকে। ফলে দুরন্তপনা আরও বেড়ে গিয়েছিল তার। দুষ্টুমি করতে গিয়ে কতবার কত আঘাত পেয়েছে, কেটে ছড়ে গেছে। কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ ছিল না তার। চোখ দুটোর দিকে তাকালেই মনে হবে কী একটা মতলব আঁটছে সে মনে মনে।

তবে ঠাকুরমার কাছে গল্প শুনতে পেলে খুব খুশি হত টুটুল। রূপকথার গল্প, রামায়ণ-মহাভারতের গল্প, দৈত্য-দানোর গল্প শুনতে শুনতে সে নিজেই যেন চলে যেত সেই সব রাজ্যে।

সেদিনও দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়ার পর টুটুলকে কোলের কাছে শুইয়ে ঠাকুরমা গল্প বলছিলেন। মনোযোগ দিয়ে সেই গল্প শুনছিল টুটুল। টুটুলের নানারকম প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে গল্প আর

ফুরোয় না। একসময় বিরক্ত হয়ে নাতিকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করেন ঠাকুরমা—ঐ দ্যাখ তালগাছ। ঐ লম্বা তালগাছের মাথায় কি থাকে জানিস?

বিছানার পাশের জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছিল গাছপালা, মাঠ, ক্ষেত, পুকুর, সুপারী বাগান। একটু দূরে আনারস বাগানের কাছে একটা লম্বা তালগাছ। সেই তালগাছের দিকে তাকিয়ে টুটুল প্রশ্ন করে—ওখানে কে থাকে ঠাম্মা?

বেম্মদৈত্য।

সেটা আবার কি?

বিরাট এক দৈত্য।

দেখতে কেমন?

ভয়ঙ্কর। মাথায় দুটো শিং, দাঁতগুলো মুলোর মতো, কান দুটো কুলোর মতো। লম্বা হাত, খাটো পা, বড় বড় নখ। আর চোখ দুটো আগুনের ভাঁটার মতো।

কই, দেখছি না তো।

লুকিয়ে আছে পাতার আড়ালে। ওদের সহজে দেখা যায় না। ওরা কিন্তু সব দেখতে পায়। যে সব ছেলেরা ঘুমোয় না, দুষ্টুমি করে—ওরা চুপি চুপি এসে তাদের ঘাড় মটকে দেয়।

ধ্যাৎ, মিছে কথা।

মিছে নয়। দেখবি, না ঘুমোলে তোকে কী করে।

ঠাকুরমার কথাটা বিশ্বাস করা যায় কি যায় না তাই নিয়ে সন্দেহ জাগে টুটুলের মনে।

ওর সঙ্গে অবিশ্রান্ত বকে বকে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলেন ঠাকুরমা। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল তাঁর। চোখ খুলে দেখেন বিছানায় টুটুল নেই। হুড়মুড় করে খাট থেকে নেমে টুটুলের নাম ধরে ডাকতে ডাকতে এঘর-ওঘর খুঁজতে থাকেন তিনি। বৃদ্ধার ভয়ার্ত কণ্ঠের সাড়া পেয়ে দিবানিদ্রা টুটে গেল সকলের। টুটুলের মা, পিসিমণি, চাকর নিবারণ, ঝি বাসন্তী ধড়মড় করে উঠে পড়ে। ঠাকুরমার কাছে ছুটে এসে প্রশ্ন করে, কী হয়েছে? শঙ্কিত কণ্ঠে বলেন ঠাকুরমা, টুটুলকে পাওয়া যাচ্ছে না।

খোঁজাখুঁজি শুরু করে দিল সকলে। বাড়ির ছাদ থেকে নীচতলার কাঠকুটো রাখবার ঘর পর্যন্ত সব খোঁজা হল। টুটুল কোথাও নেই। কিছুক্ষণের মধ্যেই হৈচৈ, চেঁচামেচি, কান্নাকাটি আর ছুটোছুটিতে একটা শোরগোল পড়ে গেল গোটা পশ্চিম পাড়ায়।

টুটুলের বাবা ওকালতি করেন কাছেই মহকুমা শহর আদালতে। সেদিন বিকেলে তিনটে নাগাদ বাড়ি ফিরেই শুনলেন সব ঘটনা—বিনা মেঘে বজ্রপাত। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, পুলিশে খবর দাও। গ্রাম থেকে মাইল পাঁচেক দূরে থানা। সাইকেল চেপে দুজন প্রতিবেশী ছুটল থানায়।

এদিকে দুপুর গড়িয়ে বিকেল, বিকেল গড়িয়ে সন্ধে হয়ে এল। সকলেই চিন্তিত ও বিষণ্ণ। এই সময়ে পাড়ার এক কিশোরী মেয়ে ছুটতে ছুটতে এসে খবর দিল—টুটুলকে পাওয়া গেছে।

রেলস্টেশনে ট্রেন ঢুকলে অপেক্ষমান যাত্রীদের মধ্যে যেমন একটা সাড়া পড়ে যায়, ঠিক তেমনি চঞ্চল হয়ে উঠে দাঁড়াল সকলে। সকলেরই এক প্রশ্ন—কোথায়?

আনারস বাগানের কাছে। ওকে নিয়ে আসছে দিদিরা। বলল কিশোরীটি।

আনারস বাগানের কাছেই ইউনিয়ন বোর্ডের রাস্তা। রাস্তার ধারে সরকারি টিউবওয়েল। এই টিউবওয়েল থেকেই খাবার জল নিতে আসে পশ্চিম পাড়ার গ্রামবাসীরা। দত্ত বাড়ির কিশোরী মেয়ে বুলা জল আনতে গিয়েছিল সেখানে। হঠাৎ টুটুলকে আনারস বাগান থেকে ধীরপায়ে বেরিয়ে আসতে দেখে চমকে উঠেছিল মেয়েরা। বিস্ময়ের ঘোর কাটতেই ওরা গিয়ে জড়িয়ে ধরল টুটুলকে। এ কি চেহারা হয়েছে! মুখ শুকনো, ক্লান্ত চোখ, সারা গায়ে আঁচড়ের দাগ, লালচে রক্তের ছোপ।

কলসী ঘড়া সব ফেলে রেখেই ওরা টুটুলকে কোলে নিয়ে এল চৌধুরী বাড়িতে। সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক থেকে অসংখ্য কৌতূহলী প্রশ্ন—কোথায় গিয়েছিলি টুটুল? এতক্ষণ কোথায় ছিলি? এত আঁচড়ে গেল কি করে? কেউ কি চুরি করেছিল তোকে? কেউ কি মেরেছে?.....

টুটুল নির্বিকার। কোনো কথা নেই তার মুখে। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে শুধু। টুটুলের অবস্থা দেখে বাবা সুমন্ত্র চৌধুরী বললেন, থাক্, এখন কিছু জিগ্যেস না করাই ভালো। মনে হচ্ছে, ভয় পেয়েছে ও। কেউ কেউ মন্তব্য করেন, ভৌতিক ব্যাপার মনে হচ্ছে। কেউ-বা বললেন, দিনের বেলা নিশিতে পেয়েছে দেখছি।

হারানিধিকে ফিরে পেয়ে ক্রন্দনরতা মা-ঠাকুরমা টুটুলকে নিয়ে চলে গেলেন বাড়ির ভিতরে। ছেলেকে বিছানায় শুইয়ে ডেটল-জলে ধুয়ে দিলেন ক্ষতস্থানগুলো। ঠাকুরমা পাখা দিয়ে মাথায় হাওয়া করতে থাকেন।

রাতের দিকে ধুম জ্বর এল টুটুলের—চড়চড় করে জ্বর উঠল একশো চার। বাড়ির সকলেই ঘাবড়ে গেলেন ছেলের অবস্থা দেখে। ডাক্তার ডাকা হল। ওষুধ, পথ্য, আর শুশ্রূষা চলল সমানে। একরকম যমে-মানুষে টানাটানি। পাক্কা তিনদিন তিনরাত্রির পর সুস্থ হয়ে উঠল টুটুল। বাড়ির পরিবেশ ক্রমে স্বাভাবিক হয়ে এল। কিন্তু বাড়ির লোকেরা অজানা এক আশংকায় সেদিনের ঘটনা প্রসঙ্গে টুটুলকে কোনো কিছু জিগ্যেস করতে সাহস পাচ্ছিল না।

আরও কিছুদিন কাটবার পর, একদিন ঠাকুরমা টুটুলের মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে প্রশ্ন করেন, হ্যাঁরে টুটুল, কী হয়েছিল রে সেদিন তোর?

কী আবার হবে?

কোথায় গিয়েছিলি হারিয়ে?

তালগাছে সত্যি সত্যি বেহ্মদৈত্য আছে কিনা দেখতে গিয়েছিলাম।

ঠাকুরমা যেন একটা হোঁচট খেলেন। একটা হিমশীতল শিহরন বয়ে গেল তাঁর সারা শরীরে। ভয়ে ভয়ে বললেন—তারপর?

তালগাছের নীচে গিয়ে দাঁড়াতেই বেহ্মদৈত্য লম্বা হাত বাড়িয়ে তুলে নিল আমাকে গাছের মাথায়।

ঠাকুরমা বিস্ময়ে হতবাক। যেন বিশ্বাসই করতে পারছেন না টুটুলের কথাগুলো—বলিস কিরে!

স্বাভাবিক সপ্রতিভ ভঙ্গিতে টুটুল বলল, কত কথা হল, কত খাবার খেলাম, কত গল্প শুনলাম।

তাই নাকি? তোর ভয় করল না?

ভয় আবার কি? বেহ্মদৈত্য তো আমাকে ভয় দেখায়নি। শুধু জিগ্যেস করেছিল সে যে ওখানে থাকে, তা কে আমাকে বলেছিল? আমি বললাম—ঠাম্মা।

মনে মনে দুর্গানাম জপ করতে থাকেন ঠাকুরমা। টুটুল নির্ভয়ে বলে যায়, বেশ মজা লাগছিল তালগাছের মাথায় বসে। কত দূর অবধি দেখতে পাচ্ছিলাম, সেই নদীটা পর্যন্ত!...একসময় বাড়ির কথা মনে হতেই বললাম, এবার আমাকে নামিয়ে দাও। অমনি হাত বাড়িয়ে নামিয়ে দিল আর বলল, আবার আসিস, যখন খুশি আসবি।

ঠাকুরমার ভয়মিশ্রিত বিস্ময় বেড়েই যাচ্ছিল। তিনি প্রশ্ন করেন, তোর গা-হাত-পা অমন আঁচড়ে গিয়েছিল কি করে?

বিজ্ঞের মতো বলল টুটুল, আমি তো প্রথমে টেরই পাইনি। ঐ তালগাছে উঠতে আর নামতে, করাতের মতো তালপাতার মোটা ডাঁটিগুলোতে লেগে হয়তো ছড়ে গিয়েছে।

ভয়লেশহীন ডানপিটে নাতির ভয়ংকর কথাগুলো শুনতে শুনতে ঠাকুরমার চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে সেই তালগাছটার মাথায় আটকে গেল। আর পলক পড়ল না।

অগ্রহায়ণ ১৩৯৩

প্রতিধ্বনি

কণা সেন

জয়শ্রী সমিতির সন্ধ্যাবেলার আসর সেদিন বেশ জমে উঠেছে। সভ্যারা সকলেই হাজির। স্বয়ং মণিমোহনও আছেন। পুজোর আর বেশি বাকি নেই। পরপর কয়েকদিন লোডশেডিং-এর সারা দিনরাতের ধাক্কা সামলে বিদ্যুৎদীপ সেদিন বেশ মন দিয়ে জ্বলছে। একবারও কারেন্ট অফ্ হয়নি। ইদানীংকালের লোডশেডিং-এর বাজারে এটি একটি বড় খবর। আশ্বিনের মৃদুমন্দ সমীরণে ফোটা শিউলি ফুলের গন্ধ ভেসে আসছে মিনুদের বাগান থেকে। বেশ একটি মনোরম, স্নিগ্ধ সন্ধ্যারাত্রি।

মণিমোহনকে ঘিরে বসেছিল মিনু, মিঠু, কেয়া, রুবি আর রাত্রি। মণিমোহনের হাতে গত বিরাশি সালের পুজোবার্ষিকীখানা রয়েছে। এতে 'রাত্রির ম্যাজিক' গল্পটি ছাপা হয়েছে। মিনুদের ছবিসহ। মণিমোহনও আছেন। তিনি ছবিতে নিজের চেহারা দেখে খুব হাসছিলেন। মিনু তাই দেখে ভ্রূকুটি করে বলল, হাসছ কেন, বাপি? গল্পটা কি খারাপ লেখা হয়েছে?

মণিমোহন হাসি থামিয়ে বললেন, গল্পটা আমি পড়িইনি। ছবিগুলো দেখছি। তোমরা তো সবাই কলেজে পড়া মেয়ে, এরকম ফ্রক পরা বালিকা হয়ে গেলে কি করে? কারো বয়সই তো দেখছি বারো বছরের বেশি নয়! এও কি ম্যাজিক নাকি? আর—

বলতে গিয়ে আবার হেসে ফেললেন মণিমোহন, আর আমি কি ঐ রকম দেখতে নাকি? একগাদা চর্বির ঢিবি, ঘাড়ে-গর্দানে সমান, মনে হচ্ছে এক্ষুনি স্ট্রোক হয়ে চোখ উলটে পড়ব! না বাপু, আমার কোনো রোগ-টোগ নেই। তোমাদের শিল্পীকে জানিয়ে দিও। আমার হার্ট, স্টম্যাক, কিডনি, লিভার, নার্ভ সব নরম্যাল। শুধু ঘুমটাই যা পাতলা। চিরকালই আমার রাতের ঘুম খুব পাতলা, অর্থাৎ সজাগ। আর তার ফলে একবার এমন এক রহস্যে জড়িয়ে পড়েছিলাম যার জন্য চার দিন চার রাত একেবারে নিদ্রাহীন অবস্থায় কেটেছিল আমার। উঃ, সে একদিন গেছে বটে! বলতে বলতে হাসিখুশি আমুদে মানুষটি হঠাৎ কেমন গম্ভীর আর অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। হাতের বইটা বন্ধ করে টেবিলের উপর রেখে দিয়ে তাকিয়ে রইলেন পুবদিকের খোলা জানালার দিকে; সেখান দিয়ে রাত্রির নক্ষত্রখচিত একখণ্ড আকাশ দেখা যাচ্ছিল।

মিনুরা কেউ কোনো কথা বলছে না, কিন্তু কান খাড়া করে তাকিয়ে আছে মণিমোহনের দিকে। এরপর তিনি হয়তো আরও কিছু বলবেন, হয়তো কোনো অদ্ভুত গল্প, হয়তো কোনো রোমাঞ্চকর স্মৃতির ঘটনা। তারা উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। ঘরের ভিতর শব্দহীন বাতাস এলোমেলো ঘুরে বেড়াচ্ছে, যেন সে-ও মণিমোহনের গল্প শোনবার জন্য ব্যস্ত, শুধু ঠিক কোন জায়গাটায় বসলে ভালো শ্রোতা হওয়া যাবে সেইটে বুঝতে পারছে না!

মণিমোহন হঠাৎই খুব অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন। কিছুক্ষণ পরে মৃদুস্বরে বললেন, মামণি, বাতিটা নিভিয়ে দাও তো।

রাত্রি তড়াক করে উঠে গিয়ে সুইচ অফ্ করে দিল, তারপর আবার নিঃশব্দে ফিরে এসে বসল নিজের জায়গায়।

ঘরে এমন নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। তার ভিতর মণিমোহনের গভীর-গম্ভীর কণ্ঠস্বর শোনা যেতে লাগল, হ্যাঁ, ঠিক এই রকমই একটা অন্ধকার রাত ছিল সেদিন। বাইরে মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। ভরা জুলাই মাস। আমি তখন কর্মোপলক্ষে মেদিনীপুর সদরে কোয়ার্টারে থাকি। একাই আছি। রান্নাবান্না এবং অন্যান্য কাজের জন্য ঠাকুর মহাদেব, ভৃত্য দুঃখহরণ ও দরওয়ান তেওয়ারি ছাড়া অত বড় বাড়িতে আর কেউ ছিল না।

মিঠু ফস্ করে জিজ্ঞাসা করল, কেন, আপনার তখন বিয়ে হয়নি? মিনু জন্মায়নি?

কেয়া অন্ধকারেই ওকে চিমটি কেটে থামিয়ে দিল। এক বছর হল কলেজ ছেড়ে ইউনিভার্সিটিতে পড়ছে, তবু মিঠুটার বুদ্ধিসুদ্ধি হল না। গল্পের মধ্যে বেরসিকের মতো কেউ ও রকম প্রশ্ন করে!

মণিমোহন কিন্তু শুনতে পেয়েছিলেন মিঠুর কথা!

অন্ধকারে মনে হল জানালা থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে তিনি ওদের দিকে ফিরে মুখোমুখি হয়ে বসলেন এবং হাসলেন, না, তখনো আমার বিয়ে হয়নি। মামণি তখন কোথায়, ওর মা-ও আসেনি আমার বাড়িতে। হ্যাঁ, তারপর যা বলছিলাম—

রাত তখন আটটা সাড়ে আটটা হবে। আমি ঠিক ন'টায় রাত্রের খাবার খাই। শোবার ঘরে ইজিচেয়ারে বসে একখানা বই পড়ছিলাম। বিশ্ববিখ্যাত বই, এরিয়া মারিয়া রেমার্কের 'অল কোয়ায়েট অন দি ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট'! প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, যেটা শুরু হয়েছিল ১৯১৪ সালে, তার গল্প। লেখকের প্রত্যক্ষ বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে লেখা। তিনি নিজেই প্রথম যৌবনে যুদ্ধে গিয়েছিলেন একজন সাধারণ ফ্রন্ট সৈন্যরূপে। যুদ্ধক্ষেত্রের ভারী জীবন্ত সব বর্ণনা রয়েছে বইখানাতে। তা ছাড়াও আধুনিক যুদ্ধ যে কি জঘন্য একটা ব্যাপার এবং সভ্যতার কত বড় অভিশাপ, তাও পল বোমারের জবানিতে লেখক জানিয়ে দিয়েছেন পাঠকদের। বিশ্বসাহিত্যে এ বই-এর তুলনা কমই আছে।

হুঁ, কি যেন বলছিলাম! বর্ষার রাত। অন্ধকার রাত। আমি বইখানার ভিতর একেবারে ডুবে গিয়েছিলাম। হঠাৎ কানে এল কে যেন কোথায় ক্ষীণ আর্তনাদের সুরে বলছে, ওঃ! ওঃ! বাঁ-চা-ও!

চমকে উঠলাম আমি। কে—কে এমন আর্তনাদ করে!

প্রথমে মনে হল, ভুল শুনেছি। কিন্তু না, আবার। আবার! বৃষ্টির শব্দ ছাপিয়ে পরিষ্কার সেই কণ্ঠস্বর কানে এসে ধাক্কা মারতে লাগল আমার, ওঃ! ওঃ! বাঁ-চা-ও!

হাত থেকে বইখানা নীচে পড়ে গেল। সেদিকে না তাকিয়ে চেয়ারে খাড়া হয়ে বসে আমি টেবিলের উপর রাখা কলিংবেলটা সজোরে টিপে ধরলাম।

রান্নাঘর থেকে দৌড়ে এল দুঃখহরণ।

মনের উত্তেজনা কোনোমতে দমন করে তাকে বললাম, বাইরে কে কোথায় কাঁদছে দেখ তো।

দুঃখহরণ অবাক হয়ে তাকাল আমার মুখের দিকে, তারপর কিছু না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে এসে বলল, কাউকে তো দেখছি না। বাইরে খুব বিষ্টি হচ্ছে, বাবু।

আমি কিন্তু তখনো শুনছি সেই আর্তনাদ। বাড়ির ভিতর থেকেই আসছে শব্দটা, ঘরের দেওয়াল ভেদ করে কানে এসে সুচের মতো বিঁধছে আমার, ওঃ! ওঃ! বাঁ-চা-ও! বাঁ-চা-ও! একি কাণ্ড! এত কাছে এমন আর্তনাদ আর দুঃখহরণ দেখতে পেল না তাকে। মুখ দেখে তো মনে হচ্ছে কানেও কিছু শুনতে পাচ্ছে না। নাঃ, ওর কর্ম নয়। নিজেই উঠলাম।

দুঃখহরণ চলল আমার পিছু পিছু। আমার হাতে জোরালো বাতির বড় টর্চ।

প্রকাণ্ড কোয়ার্টার। খুব পুরোনো কিন্তু খুব মজবুত বাড়ি। সত্তর বছরের বেশি ছাড়া কম নয় এটার বয়েস। যৌবনের লাবণ্যের জেল্লা অনেক কমে গিয়েছে বটে কিন্তু স্বাস্থ্য ঠিক আছে। সাবেকি আমলের বনেদি প্যাটার্ন, শক্ত ভিত আর কাঠামোর উপর দাঁড়িয়ে আছে বাড়িখানা। সব মিলিয়ে প্রায় বারো-চোদ্দখানা বড় বড় ঘর। লম্বা লম্বা পাঁচ-ছ'টা দরদালান, চওড়া, ঢাকা বারান্দা। বাড়ির ভিতর সিমেন্ট করা প্রকাণ্ড উঠোন। উঠোনের এককোণে একটা পাতকুয়ো, সেটাও প্রকাণ্ড। তার দু'দিকে দুটো বড় পেয়ারা গাছ, ডালপালা মেলে যেন সঙ্গীন উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একটা মানুষ-সমান উঁচু প্রাচীরে ঘেরা বাড়িটার মস্ত খিড়কি দরজাটা বারান্দায় দাঁড়ালে দেখা যায়। সেখানে প্রাচীরের ওপাশে প্রাচীরটার প্রায় গা ঘেঁষে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে দুটো প্রকাণ্ড তেঁতুল গাছ। ওদেরও বেশ বয়েস হয়েছে, কিন্তু স্বাস্থ্যে ঘুন ধরেনি এতটুকু!

কয়েক বছর হল বাড়িটায় 'ইলেকট্রিফিকেশন' হয়েছে। লাইট, ফ্যান সব আছে। জলের ট্যাঙ্ক, ট্যাপ

বসেছে। রান্নাঘরে, খাবার ঘরে, স্নানের ঘরে বেসিনও রয়েছে। এইটুকু আধুনিক স্বাচ্ছন্দ্য ছাড়া কিন্তু বাড়িটার আর বিশেষ কিছু পরিবর্তন করা হয়নি। ভারী ভারী কড়ি-বরগা, দরজা-জানালার গায়ে সেই মান্ধাতার আমলের গন্ধ, থেকে থেকে মনটাকে পিছন দিকে টেনে নিয়ে যেতে চায়; অতীতের বোবা ইতিহাস আর মূক স্মৃতির ভিড়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আধুনিক মন অস্বস্তি বোধ করে।

মেদিনীপুরের ম্যাজিস্ট্রেটরা বরাবর এই বাড়িতেই এসে উঠেছেন, থেকেছেন। আমিও কর্মসুবাদে এখানেই আস্তানা নিয়েছি। মাত্র মাসদুয়েক হল এসেছি। বাড়ি নিয়ে এতদিন মাথা ঘামাইনি। সেদিন একেবারে তার অন্দরমহলে গিয়ে হাজির হলাম।

সব ঘরের আলো জ্বেলে দিয়ে সমস্ত ঘর তন্নতন্ন করে খুঁজলাম, বৃষ্টির ঝালরের ভিতর দিয়ে উঠোনে টর্চের আলো ফেলে যতটা দেখা গেল, তাও দেখলাম। কোথাও কিছু নেই। আর্তনাদটাও তখন থেমে গেছে। একটানা একঘেয়ে বৃষ্টির শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ জেগে নেই কোথাও। দুঃখহরণ আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছিল, আমার হুকুমে বোতাম টিপে টিপে এক একটা ঘরের, বারান্দার বাতি জ্বালিয়ে দিচ্ছিল আর আমার মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল।

এক সময় ঠাকুর মহাদেবও এসে জুটল। দুটিই সমান বুদ্ধু। আমি দেখছি ঘর, আর ওরা দেখছে আমাকে! জানি না ওরা ঠিক কি ভাবছিল আমার সম্পর্কে। কিন্তু কানে বিঁধে থাকা সেই আর্তনাদটা আমি কিছুতেই তাড়াতে পারছিলাম না। কোত্থেকে এল শব্দটা? কোথায়ই বা মিলিয়ে গেল? তবে কি অলৌকিক কিছু? অশরীরী কোনো ব্যাপার? কিন্তু ও-দুটোর একটাতেও আমার বিশ্বাস নেই। আর খামোকা এই রাতে একটা অলৌকিক বা অশরীরী কিছু আমার মতো একজন নিরীহ মানুষের কাঁধে ভর করতেই বা যাবে কেন? আমার নেশার মধ্যে, এখন তোমরা যা দেখ, পাইপ-এ ধূমপান, সে সময় তাও আমি করতাম না। কোনোরকম নেশাই করতাম না। সেই জন্যই আরও দৃঢ় বিশ্বাস হল আমার যে, আমি যা শুনেছি, তা ভুল শুনিনি। কিন্তু প্রমাণ কই? কিছুতেই শব্দটার উৎস বার করতে পারলাম না। এক সময় হতাশ হয়ে ফিরে এলাম নিজের ঘরে।

দুঃখহরণ বলল, বাবু, আপনি খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়ুন। অনেক রাত হয়েছে। মারিয়া রেমার্ক তখনো মেঝেতে গড়াগড়ি যাচ্ছেন। দুঃখহরণ বইখানা তুলে গুছিয়ে রাখল টেবিলে। তারপর আমার অনুমতির অপেক্ষা না করেই মহাদেবকে ডেকে খাবার ঘরে আমার খাবার দিতে বলল।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি, প্রায় পৌনে দশটা বাজে। আমার খাবার সময় অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে।

খেয়ে নিলাম। তারপর ঠিক দশটায় বাতি নিভিয়ে যথারীতি দরজা বন্ধ করে শুয়েও পড়লাম। জানালাগুলো খোলা রইল। আমার বরাবরের অভ্যাস, শোবার ঘরের সব জানালা খুলে রেখে শোওয়া। বৃষ্টির বেগও তখন কমে এসেছে। ঠান্ডা হাওয়া, ঘনঘন বিদ্যুতের চমকানি, মাঝে মাঝে মেঘের মৃদু গম্ভীর ডাক, এইসবের মধ্যে শান্ত মনে এক সময় ঘুমিয়েও পড়লাম।

আগেই বলেছি আমার ঘুম খুব সজাগ, বেড়ালের পায়ের শব্দেও সে ঘুম ভেঙে যায়। কিন্তু ঘুমটা যদি আমার গাঢ় হত, সহজে না ভাঙত, তাহলে সম্ভবত সে রাত্রের ঘটনা আমি ভুলে যেতাম। রাত্রির পৃথিবীতে কত রকম ঘটনাই ঘটে, কতই নৈসর্গিক এবং অনৈসর্গিক উৎপাতের ভিতর দিয়ে কাটে রাত্রির জগৎ। গভীর ঘুমে অভ্যস্ত মানুষরা সে সব কোনো দিন টেরও পায় না। কিন্তু আমার বেলায় সেদিন হল উলটো।

কত রাত তখন জানি না, কোথায় যেন একটা শব্দ হল, খুট্! খুবই মৃদু, ক্ষীণ সেই আওয়াজ, আর সেই আওয়াজেই আমার ঘুম গেল ভেঙে। বালিশের পাশেই টর্চ ছিল, হাত বাড়িয়ে সেটাকে চেপে ধরলাম। আর একটা আওয়াজ হল, খু-ট্!

ঠিকই শুনেছি তাহলে। আমার ঘরের দরজা থেকেই আসছে শব্দটা। শুয়ে শুয়েই টর্চ জ্বালিয়ে মশারির ভিতর দিয়ে তার ফোকাস ফেললাম দরজার উপর। একটা কপাট আধখানা খোলা! অথচ পরিষ্কার মনে আছে আমি দরজা বন্ধ করেই শুয়েছিলাম। গাঢ় অন্ধকার চিরে আলোটা সেখানে পড়তেই সে এক সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার আরম্ভ হয়ে গেল। চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু দরজার কাছ

থেকে প্রথমে ঘুষি এবং তার সঙ্গে একটা 'আঁক' শব্দ, তারপরেই একটা ভয়ানক ঝটাপটির আওয়াজ কানে এল। যেন কেউ কারো সঙ্গে হাতাহাতি যুদ্ধ করছে।

ধড়মড় করে উঠে বসলাম। মশারি তুলে টর্চ হাতে লাফিয়ে নামলাম মাটিতে। চটি দুটো খাটের কাছেই ছিল, কিন্তু খুঁজে পেলাম না। খালি পায়েই ছুটে গেলাম দরজার দিকে। পাশের দেওয়ালেই বাতির সুইচ—টিপলাম, কিন্তু আলো জ্বলল না। ঝটপটির আওয়াজটা তখন আর দরজার কাছে নেই, দূরে চলে গেছে। যেন কেউ কাউকে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছে কোথায়। অতি ক্ষীণ একটা আওয়াজ কানে এসে আবার ধাক্কা মারল, বাঁ-চা-ও! ওঃ! ওঃ!

বাঁচাতেই হবে। লোকটা যেই হোক, ওকে বাঁচাতেই হবে। অধীর উত্তেজনায় পা দিয়ে লাথি মেরে দরজার কপাট দুটো সম্পূর্ণ খুলে ফেলে বাইরের বারান্দায় ছুটে গেলাম আমি।

বৃষ্টি তখন থেমে গেছে, কিন্তু আকাশ জুড়ে থমথম করছে কালো মেঘ। আবার বৃষ্টি হবে। মাঝে মাঝে বিদ্যুতের আলো তীব্রভাবে ঝলসে উঠছে। বারান্দার এ-কোণ থেকে ও-কোণ পর্যন্ত টর্চের আলো ফেলে দেখলাম, কিন্তু কিছুই চোখে পড়ল না। সেই শব্দ, সেই আর্তনাদ সব থেমে গেছে। আশ্চর্য, এইটুকু সময়ের মধ্যে কোথায় গেল ওরা? কে ওরা?

এখন আমি কি করি? কোন দিকে যাই? কাউকে ডাকব? দুঃখহরণ, মহাদেব, তেওয়ারি বেল বাজালেই এসে হাজির হবে জানি, কিন্তু ডেকে কি করব? আমি নিজেই তো কিছু দেখতে পাচ্ছি না, কিছুই বুঝতে পারছি না, ওদের কি বলব? যদিও তখন একজন সঙ্গী আমার খুব দরকার হয়ে পড়েছিল, কিন্তু লজ্জায় কাউকে ডাকতে পারলাম না।

বারান্দার সামনেই সেই বাঁধানো, দশাসই উঠোনটা। বলেছি, উঠোনের এককোণে প্রকাণ্ড একটা পাতকুয়ো ছিল, তার দু'দিকে দুটো পেয়ারা গাছ। ডানদিকের গাছটা খুব বড়; তার মোটা গুঁড়ি সিমেন্টের বেদি করে বাঁধানো; ডালপালা খুব ঘন, কিন্তু গাছটা ফলন্ত নয়; ফুল অজস্র ফোটে, ফল হয় না। বাঁ দিকের গাছটা অপেক্ষাকৃত ছোট হলেও এই ফলের সময়, জুলাই মাসে, তার ফলের বাহার চেয়ে দেখবার মতো। তার কাণ্ড মাটির উপর। সেখানে কিছু ঘাসও গজিয়েছে বর্ষার জল পেয়ে।

আমি সেই অন্ধকার, নির্জন, ভূতুড়ে বাড়ির বারান্দায় কতক্ষণ নিজেও একটা ভূতের মতোই দাঁড়িয়ে রইলাম নিষ্ফলা পেয়ারা গাছটার দিকে তাকিয়ে। সেই অদ্ভুত পরিবেশ আমাকে বোধহয় বেশ আবিষ্ট করে ফেলেছিল। মাঝে মাঝে খুব বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। সেই আলোতে হঠাৎ চোখে পড়ল গাছটার গুঁড়ির গায়ে রক্ত, অনেক রক্ত! টাটকা রক্ত, যেন সদ্য কেউ মাখিয়ে দিয়েছে ওটার গায়ে!

সমস্ত শরীরের ভিতর দিয়ে একটা ঠান্ডা, হিমশীতল স্রোত বয়ে গেল আমার সেই রক্তের দিকে তাকিয়ে। সেই রক্ত আমাকে যেন কি এক অমোঘ আকর্ষণে টানতে লাগল। সম্মোহিতের মতোই আমি বারান্দা থেকে নেমে পড়লাম। পায়ে পায়ে ভিজে উঠোন মাড়িয়ে দাঁড়ালাম গিয়ে সেই গাছটার কাছে।

হাতের টর্চের আলো পুরোটাই গিয়ে পড়েছে গুঁড়ির গায়ে।

কিন্তু কই, রক্ত কোথায়? ভেল্‌কি নাকি? এই দেখলাম, এই নেই!

গাছটার খুব কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম, সত্যিই রক্ত লেগে আছে কিনা দেখবার জন্য গাছটার গায়ে হাত বুলোলাম, তারপর হাতটা চোখের কাছে তুলে ধরলাম। না, রক্ত নয়, আমার হাতে লেগে রয়েছে বৃষ্টির জল।

কিন্তু চোখ তুলতেই এবার চোখে পড়ল সামনাসামনি গাছের গায়ে খোদাই করা একটা লেখা—টর্চের আলোয় পড়ে গেলাম লেখাটা—

রণজয় রায়চৌধুরী
মৃত্যু ১৯২৮ সালে
ম্যাকমিলানের কুঠীতে।

কুয়োতলার এদিকে আগে আসিনি। এ লেখা কখনো আমার চোখেও পড়েনি। কিন্তু...কিন্তু...কে...কে

এই রণজয় রায়চৌধুরী? কে এই ম্যাকমিলান? এত যত্ন করে কে-ই বা বাঁধিয়ে রেখেছে বেদিটা? কেন? কি হয়েছিল এখানে?

—ওঃ! ওঃ!

সচম্‌কে তিন পা পিছিয়ে গেলাম এক লাফে। হাতের টর্চটা পড়ে গেল মাটিতে। একটা জোর শব্দ হল, ভেঙেই গেল বোধ হয়। কিন্তু সেদিকে নজর দেবার সময় ছিল না আমার। আমি দুই চোখ বিস্ফারিত করে তাকিয়ে রইলাম গাছটার দিকে। সেই কণ্ঠস্বর! ওইখান থেকে আসছে! এই সময় একটা বড় আঁকাবাঁকা বিদ্যুতের রেখা ঝিলিক হেনে গেল আমার বাঁ দিকে আকাশে। সেই আলোতে যা দেখবার দেখা হয়ে গেল আমার।

একটা সুশ্রী চেহারার মানুষ। গাছের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে দড়ি দিয়ে বাঁধা। লম্বা শরীরটা বেঁকেচুরে রয়েছে না-বসা না-দাঁড়ানো অবস্থায়; কালো, কোঁকড়ানো চুলে ভর্তি মাথাটা নেমে এসেছে বুকের উপর। দেহের এতটুকু জায়গা বাদ নেই কোথাও, রক্ত, শুধু রক্ত, চাপ চাপ রক্ত! থ্যাঁতলানো নাক-মুখ দিয়ে থেকে থেকে গোঙানির মতো একটা আওয়াজ বেরিয়ে আসছে, ওঃ! ওঃ!

ইস্, ভয়ানক জখম হয়েছে তো লোকটা। এখুনি ওকে হাসপাতালে পাঠানো দরকার, না হলে যে মরে যাবে।

এই সময় আবার বৃষ্টি নামল, বেশ জোরেই নামল।

আমি ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে গেলাম, দু'হাত দিয়ে দড়ি খুলতে লাগলাম আর গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে ডাকতে লাগলাম, মহাদেব, তেওয়ারি, দুঃখ-হ-র-ণ—

সেই মুহূর্তে আর একবার তীব্রভাবে বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল, আর সেই আলোতে আতঙ্ক ভরা চোখে তাকিয়ে দেখলাম, আমি ফাঁকা গাছের গুঁড়িটা দুই হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরেছি, সেখানে কেউ নেই! প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কানে এল মেঘের সুতীব্র গর্জন, খুব কাছেই কোথায় যেন ভীষণ শব্দে বজ্রপাত হল একটা। আমার মাথার ভিতর সব একসঙ্গে দুলে উঠল—আকাশ, বাড়ি, পায়ের নীচের উঠোন, অদৃশ্যলোকের আহত মানুষটি! আমি দু'হাত বাড়িয়ে বোধ হয় আকাশটাকেই আঁকড়ে ধরতে চাইলাম, পরক্ষণেই জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়লাম বেদির উপর।

আমার চিৎকার শুনে সবার আগে ছুটে এসেছিল দুঃখহরণ। মহাদেব এবং তেওয়ারির সাহায্যে আমাকে তুলে নিয়ে এসেছিল ঘরে, ভিজে জামাকাপড় বদলে দিয়েছিল বিছানায় শুইয়ে। ডাক্তারকেও কল দিয়েছিল ওরাই। এসব পরে ওদের মুখে শুনেছি। আমার কোনো আঘাত লাগেনি। বিশেষ কিছুই হয়নি; শুধু অত্যধিক মানসিক উত্তেজনায় চৈতন্য লোপ পেয়ে গিয়েছিল। সে জ্ঞানও ফিরে এসেছিল তাড়াতাড়িই। কিন্তু ডাক্তার পুরো সাতদিন বিশ্রামের নির্দেশ দিয়ে প্রয়োজনীয় ঔষধপত্রের ব্যবস্থাপত্র লিখে দিয়ে গেলেন।

তারপর চার দিন চার রাত। পাগলের মতো কেটেছে আমার সেই দিনরাতগুলো। পরের দিনই ডাক্তারের নির্দেশ অগ্রাহ্য করেই অফিসে গিয়ে ১৯২৮ সালের 'টেররিস্ট' আন্দোলনের মেদিনীপুর জেলার সব পুলিশ ফাইল তলব করেছি। ওরা হেডকোয়ার্টার থেকে আনিয়ে দিয়েছে সেগুলো। বেশি নয়, মাত্র চারটে ফাইলেই আমার প্রয়োজন মিটেছে। কিন্তু পড়তে হয়েছে খুব খুঁটিয়ে। সময়ে নাওয়া-খাওয়া, বিশ্রাম, ঘুম, সব মাথায় উঠেছে। দুঃখহরণ এসে ঘড়ি ধরে ডাক্তারের ওষুধ খাইয়ে দিয়ে যায় আর গজগজ করে, এমন কাজপাগলা মানুষ তো আর দেখিনি বাবু। একটা শক্ত অসুখ বেধে বসলে দেখবে কে এই বিদেশ-বিভুঁয়ে, শুনি? আমি কোনো উত্তর দিই না।

মহাদেব টেবিলে খাবার সাজিয়ে ডেকে ডেকে সাড়া পায় না, হিমশিম খেয়ে যায় আমার মেজাজের তল বুঝতে। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত উদ্ধার করেছি ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে রণজয় রায়চৌধুরীর পরিচয়, এস-পি ম্যাকমিলানের কুকীর্তির ইতিবৃত্ত।

এই বাড়িটায় সেই সময় থাকত এক ইংরেজ পুলিশ সুপার, ম্যাকমিলান ম্যাকডোনালড সাহেব। ১৯২৮ সালের সেই সময়টায় একদিকে অহিংস সত্যাগ্রহীদের দুর্বার আন্দোলন, অন্যদিকে সশস্ত্র সংগ্রামে বিশ্বাসী বাংলার কিছু মৃত্যুভয়হীন যুবকের সন্ত্রাসমূলক ক্রিয়াকলাপ, ইংরেজ নিধন—ইংরেজ সরকারকে অস্থির করে তুলেছিল। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার আন্দোলন ও সংগ্রামকে কোনো দিক থেকেই আর বাগে আনা যাচ্ছে না। সরকারও মরিয়া হয়ে দমননীতি চালিয়ে যাচ্ছে।

মেদিনীপুরে ম্যাকমিলানের আগে দুই পুলিশ সুপারকে, অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে বোমা মেরে আহত করে হাসপাতালে পাঠিয়েছিল রণজয় রায়চৌধুরীর দল। তাদের ধরবার জন্য ম্যাকমিলানের বেপরোয়া দমননীতির চোটে সমগ্র মেদিনীপুর শহরে 'ত্রাহি' রব উঠে গেছে।

জনসাধারণ অকথ্য পীড়ন সহ্য করছে পুলিশের, তবু রণজয়ের ঠিকানা কারো মুখ থেকে বার করা যাচ্ছে না। যারা তাকে এবং তার দলকে চিনত, তাদের ঠিকানা জানত, তাদের কেউ কেউ পুলিশের পীড়নে মৃত্যুবরণ করল, অনেকে আত্মগোপন করল। যারা জানত না কিছুই, তাদেরও অনেকেই পুলিশের লাঠির চোটে পঙ্গু হয়ে হাসপাতালে গেল, কিংবা বিকলাঙ্গ হয়ে রইল জন্মের মতো। সবচেয়ে মারাত্মক এবং বেআইনি কাজ যা করত ম্যাকমিলান তা হচ্ছে, স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য অনেক সময় থানা হাজত থেকে বাছা বাছা 'অপরাধীদের' নিজের কুঠীতে ধরে আনত। তাদের অনেকেই আর জীবিত অবস্থায় বেরোত না কুঠী থেকে। এমন কি মৃতদেহগুলোরও পাত্তা থাকত না।

'টেররিস্ট' রণজয় রায়চৌধুরীর মাথার জন্য ইতিমধ্যেই পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে সরকারের পক্ষ থেকে।

রণজয় সব খবরই রাখত।

অবশেষে একদিন সে নিজেই এল ম্যাকমিলানের কুঠীতে।

না, ধরা দিতে নয়, ধরতে! অত্যাচারী পুলিশ সুপারকে জন্মের মতো পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে এসেছিল সে।

অনুগত অনুগামীদের সনির্বন্ধ অনুরোধ ঠেলে একাই এসেছিল রণজয়, একটা মাত্র পিস্তল সঙ্গে নিয়ে।

সশস্ত্র প্রহরীদের দিয়ে সুরক্ষিত কুঠীবাড়ি। ম্যাকমিলান নিজেও নাকি সর্বদা সশস্ত্র হয়ে থাকে। এমন কি তার শয়নকক্ষের দরজাতেও নাকি রক্ষী পাহারায় থাকে রাত্রে। অনুচররা খবরগুলো সরবরাহ করে বলেছিল, ও-বাড়িতে ঢোকা মানে বাঘের গুহায় মাথা গলানো। কিন্তু ম্যাকমিলানকে হত্যা করতে হলে তার কুঠীতেই যেতে হবে। বাইরে তাকে কোথাও ধরা সম্ভব নয়, রণজয়ের দল অনেক চেষ্টা করেছে, সফল হয়নি। সুতরাং রণজয়কে তার সঙ্কল্প থেকে টলানো গেল না।

দীর্ঘদেহী, অতি সুঠামকান্তি, বছর পঁয়ত্রিশ বয়সের রণজয় দিব্যি এক সেপাইয়ের ছদ্মবেশে ঢুকে গেল বাড়িটার মধ্যে, পাহারাদার রক্ষীদের প্রায় চোখের উপর দিয়েই; কেউ সন্দেহও করল না।

রাত্রি তখন প্রায় দশটা।

সন্ধে থেকে বৃষ্টি পড়ছে, কখনো বেগে, কখনো মন্থর গতিতে। শেষ আষাঢ়ের গাঢ়, কালো মেঘে ছাওয়া আকাশ। একহাত দূরের জিনিসে নজর চলে না। বাতাসে গা শিরশির করা ঠান্ডা আমেজ। সমস্ত বাড়িটা মনে হচ্ছে যেন আরামে লেপ মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে আছে।

মেঘের বুকের মাঝে মাঝে শিথিলভাবে বিদ্যুৎ ঝিলিক হেনে যাচ্ছে। তারও তেমন যেন কাজে গা নেই, মনে হচ্ছে ডিউটি থেকে ছুটি পেলে সেও যেন বাঁচে।

রণজয় নির্ভুল অনুমানে সোজা এসে দাঁড়াল ম্যাকমিলানের শয়নকক্ষের দ্বারপ্রান্তে। বন্ধ দরজায় মৃদু টোকা দিল কয়েকবার, টক-টক-টক। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ভিতর থেকে জড়িত কণ্ঠে সাড়া এল, হু'জ দেয়ার?

হুঁজৌর টেলিগ্রাম—চাপা, সতর্ক অথচ স্পষ্টস্বরে উত্তর পাঠাল রণজয়, খাস হিন্দুস্থানী কনেস্টবলের কণ্ঠস্বর এবং উচ্চারণ নকল করে।

আর ঠিক সেই মুহূর্তেই রণজয়ের দু'পাশে যেন অন্ধকারের পাতাল ফুঁড়ে উঠে দাঁড়াল দুজন লোক। এরা ছিল ম্যাকমিলানের ব্যক্তিগত দেহরক্ষী। রাত সাড়ে দশটা পর্যন্ত তাদের ডিউটি, তারপর

রাতের পাহারাদার এসে চার্জ বুঝে নিত। এ লোক দুটোর কথা রণজয়ের জানা ছিল না। দু'জনের হাতেই পিস্তল উদ্যত এবং দুজনের মুখ থেকে একই সঙ্গে উচ্চারিত হল, হ্যান্ডস আপ! কপাটের জোড়ের ফাঁক দিয়ে সামান্য আলো এসে পড়েছিল সেখানে।

ছদ্মবেশ সত্ত্বেও লোক দুটো তাকে শত্রু বলে চিনে ফেলেছিল সম্ভবত তার আকৃতির জন্য। পুরো সাড়ে ছ'ফুট লম্বা কোনো হিন্দুস্থানী কনেস্টবল সে সময় মেদিনীপুরের আরক্ষাবাহিনীতে ছিল না।

রণজয় বিদ্যুদ্বেগে ঘুরে দাঁড়াল।

ওদিকে দরজায় ছিটকিনি খোলার আওয়াজ হল। ম্যাকমিলান দরজা খুলছে। রণজয় অন্ধকারেই একবার বাঘের চোখে তাকিয়ে দেখে নিল পিস্তল তুলে ধরা কব্‌জি দুটোর অবস্থান, তারপর দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ দুই হাতের উলটো দিক দিয়ে, লোক দুটো কিছু বুঝবার আগেই, সজোরে ঘুষি চালাল তাদের থুতনি লক্ষ করে।

লোকে বলত, রণক্ষেত্রে রণজয়ের দুই হাত চলত ঠিক সব্যসাচীর মতোই। পিস্তলের ট্রিগার টেপার বিন্দুমাত্র অবসর না পেয়েই উলটে পড়ল লোক দুটো দু'দিকে। কিন্তু পড়তে পড়তেও একজন বাঁ হাতের মুঠোয় ধরা বাঁশিটা বাজিয়ে দিল। ঠিক তখনই সশব্দে দরজা খুলে গেল আর দরজার ওপাশে দেখা দিল ম্যাকমিলান।

সাহেব তখন ঠিক স্বাভাবিক অবস্থায় নেই; চোখ দুটো লাল, পা দুটোও বেশ টলছে; বাঁ হাতটা তুলে কেবল নাকের ডগা ঘষছে আর বাংলায় বিড়বিড় করে বলছে, কিসের টেলিগ্রাম, কই টেলিগ্রাম, কে পাঠিয়েছে? সাহেব বেশ ভালো বাংলা বলতে পারত।

দরজার সামনে যে এত কাণ্ড হয়ে গেল, তা বোধ হয় সে খেয়ালই করেনি, করলে নিশ্চয় দরজা খুলত না। অন্তত খালি হাতে কখনোই খুলত না। তার পিস্তলটা ঘরে টেবিলের উপর পড়েছিল।

পরম শত্রুকে একেবারে হাতের কাছে পেয়ে রণজয় আর বিলম্ব করল না, পোশাকের ভিতর থেকে ঝটিতি পিস্তল বার করল এবং ম্যাকমিলান কিছু বুঝবার বা সতর্ক হবার আগেই তার কপাল লক্ষ্য করে ট্রিগার টিপে দিল। ভীষণ গর্জন করে গুলি ছুটল। ঠিক সেই মহেন্দ্র মুহূর্তে সে নিজেও হুমড়ি খেয়ে পড়ল দরজার গোড়ায়।

মাটিতে পড়ে থাকা সাহেবের দেহরক্ষীদের একজন শুয়ে শুয়েই তার পায়ে পা গলিয়ে একটা হ্যাঁচকা টান মেরেছিল। একটুর জন্য গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। সাহেব বেঁচে গেল অক্ষত শরীরে। ওদিকে হুইসেলের শব্দে দৌড়ে আসা রক্ষীবাহিনীর হাতে বন্দী হল রণজয়। সমস্ত ব্যাপারটা ঘটে গেল দেড় মিনিটেরও কম সময়ের মধ্যে।

তারপর অমানুষিক অত্যাচার, অকথ্য নির্যাতন চলল বন্দীর উপর ঘণ্টা তিন-চার ধরে। অত্যাচারটা আগাগোড়া ম্যাকমিলানই চালিয়েছিল নিজের হাতে। রক্ষীরা কেউ রণজয়ের গায়ে হাত দেয়নি। তারা কেবল সাহেবের হুকুমে পাতকুয়োর ডান পাশের পেয়ারা গাছটার সঙ্গে রণজয়কে শক্ত দড়ি দিয়ে বেঁধে দিয়েছিল। বৃষ্টি তখন সম্পূর্ণ থেমে গিয়েছিল।

গুলিটা যদি কপালে লাগত তাহলে কি হত, বোধ হয় সেই চিন্তায় ভয়ে এবং আক্রোশে একেবারে ক্ষেপে গিয়েছিল ম্যাকমিলান। সরকারের তরফ থেকে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা মাথার অধিকারী বন্দীটি প্রথমে রাইফেলের কুঁদো, তারপর অজস্র চাবুকের ঘায়ে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে সেই রাত্রেই মারা গেল। তার দেহটা রাত আড়াইটা নাগাদ ফেলে দেওয়া হল একটা কুয়োর ভিতর। রাত পৌনে তিনটা নাগাদ হেডকোয়ার্টারে গোপনে একটা মেসেজ পাঠিয়ে দেওয়া হল এই মর্মে যে, স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য 'থার্ড ডিগ্রি' প্রয়োগে বন্দীর মৃত্যু ঘটেছে। আরও অনেক রাজবন্দীর মৃতদেহই 'থার্ড ডিগ্রি'তে অর্থাৎ দৈহিক অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে সমাধি লাভ করেছিল ঐ কুয়োর ভেতর। সর্বশেষ যে গেল সে রণজয়।

ঘটনাটা সে সময় সম্পূর্ণ গোপনে পুলিশের 'কনফিডেনশিয়াল রিপোর্ট'-এর ফাইলে রাখা হয়েছিল। গোটা মেদিনীপুর শহর তখন পুলিশের অত্যাচারে ফুঁসছে। এই হত্যার খবর বাইরে পৌঁছলে, বিশেষ করে রণজয়ের দলের কানে পৌঁছলে আর রক্ষা থাকবে না, ম্যাকমিলানের প্রাণ বাঁচানো কঠিন হবে।

কিন্তু এত করেও শেষরক্ষা হল না।

সে এক অদ্ভুত কাহিনি। যে মানুষ মরে গিয়েছে, সে কি আর ফিরে আসে? কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শীদের কারো কারো বিবরণ থেকে জানা যায়, ঐ ঘটনার পর বাড়ির ভিতর গভীর রাত্রে যেখানে-সেখানে নাকি রণজয়ের প্রেতাত্মাকে দেখা যেত। কত লোককেই তো খুন করা হয়েছে। কিন্তু এ রকম নাছোড়বান্দা আর কেউ নয়। সেই যে গুলি ফসকে গিয়েছিল, সেই পিস্তলটা হাতে সে নাকি তাড়া করে বেড়াত ম্যাকমিলানকে। সেই যে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে তার একবার মাত্র প্রাণঘাতী আর্তনাদ, 'বাঁ-চা-ওঃ! ওঃ!' অনেকেই নাকি শুনতে পেত রাত দুটোর পর।

রণজয় হত্যার সাতদিন পরে।

এই সাতদিন ম্যাকমিলান বাড়ি ছেড়ে কোথাও বেরোয়নি, অফিসেও যায়নি। বাড়িতে বসেই অফিসের কাজকর্ম সারত। অফিসাররা প্রয়োজনীয় উপদেশ নিতে তার বাড়িতে আসত। তাদের রিপোর্ট থেকে জানা যায়, ম্যাকমিলানের মনের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। দিনের বেলাতেও মদে চুর হয়ে থাকত এবং মাঝে মাঝে নিজের দুই কান চেপে ধরে চেঁচিয়ে বলে উঠত, কি হরিবল্ চিৎকার! আমি আর সহ্য করতে পারছি না। ওকে থামাও! ওকে থামাও তোমরা!

সে নাকি তিন মাসের ছুটির দরখাস্ত করেছিল এবং হোম-এ অর্থাৎ বিলেতে তার পরিবারবর্গের কাছে এই মর্মে একটা কেব্‌লও পাঠিয়ে দিয়েছিল যে, সে শীগ্‌গিরই দেশে ফিরছে। কিন্তু তার আগেই—

এক সকালে বেড-টি দিতে এসে বাবুর্চি রহমান আবিষ্কার করল, সাহেব রক্তাপ্লুত দেহে বিছানায় লুটিয়ে আছে।

শোচনীয় পরিসমাপ্তি হয়েছিল ম্যাকমিলানের। নিজের পিস্তলের গুলিতে নিজের কপাল ফুটো করে নিজেই আত্মহত্যা করেছিল। পিস্তলটা তার বিছানায় পাওয়া গিয়েছিল।

এসব অনেকদিন আগেকার ইতিহাসের কাহিনি। সেই কাহিনি হঠাৎ সেই বিশেষ রাত্রে আমার চোখের সামনে কেন জীবন্ত হয়ে উঠেছিল, তা আজও আমি জানি না। তবে একটা জিনিস চেতনা ফিরে পাবার পরেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম সেটা হচ্ছে এই যে, আমার চিন্তার এবং কল্পনার অতীত একটা সাঙ্ঘাতিক কিছু ঘটে গিয়েছে কোনো দূর অতীতে ঐ বাড়িটায় এবং আমি যা দেখেছি, যা শুনেছি, সবই তারই ছায়া-সত্য। এ রকম উপলব্ধি, এমন কি প্রত্যক্ষ দর্শন বা শ্রবণ তোমাদেরও হতে পারে, যদি তোমরা খুব পুরোনো, নিস্তব্ধ কোনো জায়গায়, কোনো বাড়িতে কিংবা গুহায় অথবা পাহাড়ে-জঙ্গলে যাও আর প্রকৃতি তোমাদের দয়া করে 'একো' দেখিয়ে দেয়! অবশ্য এই দেখানোটা প্রকৃতির একান্ত স্বেচ্ছাধীন। তার জন্য কতগুলো প্রকৃতির নিয়মের শর্ত পূরণ হওয়া আবশ্যক।

যাই হোক, সরকারি নথিপত্র ঘেঁটে ঐ ঘটনার সব কিছু জানবার সঙ্গে আর একটা জিনিসও আমি জেনেছিলাম, সেটাও বলি। এই রণজয় রায়চৌধুরী আমার আত্মীয় ছিলেন। আমার মায়ের আপন জ্যাঠতুতো ভাই ছিলেন তিনি। ঢাকার কলেজে পড়বার সময়েই বিপ্লবী দলে যোগ দেন, তারপর অনেক ঘটনার নায়ক হয়ে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে আসেন মেদিনীপুরে এবং সেইখানেই তাঁর জীবনান্ত হয় কয়েক বছর পরে।

পাতকুয়োটার পচা, দুর্গন্ধযুক্ত জল সেঁচে কতগুলো নরকঙ্কাল উদ্ধার করা হয়েছিল। তাদের ভিতর কোন কঙ্কালটা রণজয় মামার ছিল বোঝা যায়নি। সম্ভব ছিল না বোঝা। সবগুলো কঙ্কালেরই হিন্দু শাস্ত্রমতে সদ্‌গতির ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তারপর আরও এক বছর আমি ঐ বাড়িতে ছিলাম, কিন্তু আর কখনো কিছু দেখিনি বা শুনিনি।

মামণি, বাতিটা জ্বালিয়ে দাও তো। হঠাৎ গল্পে ছেদ টেনে মণিমোহন বললেন। কিন্তু প্রথমটায় কেউ উঠল না, কেউ সাড়াও দিল না। ভয়ে সবাই জমে গেছে বলে মনে হল। শেষ পর্যন্ত রাত্রিই উঠল। কিন্তু আলো জ্বলল না। কারেন্ট অফ্। লোডশেডিং।

আষাঢ় ১৩৮৬

ভয়ংকর

শচীন দাশ

বেশ কয়েক বছর আগের কথা। আমি তখন গিরিডি-মধুপুর ব্রাঞ্চ লাইনের একটা ছোট্ট স্টেশনের সহকারী স্টেশন-মাস্টার। সবে বদলি হয়ে এসেছি। একা থাকি। খাইদাই। কাজের সময়ে আবার স্টেশনেই পড়ে থাকি। একটু যে কথা বলব তেমন লোকও পাই না। একে নির্জন স্টেশন, সাঁওতাল পরগনার আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকা, তার ওপর আপ আর ডাউন মিলে চব্বিশ ঘণ্টায় মাত্র চারটি ট্রেন। সময় যেন আর কাটতেই চায় না। তবু খানিকটা রেহাই পাওয়া যেত যদি আমার মাস্টারমশাইটি একটু সহজ হতেন। একটু খোলামেলা মনে আমার সঙ্গে মিশতেন।

কিন্তু স্টেশন-মাস্টার খুব রাশভারী স্বভাবের লোক। খুব গম্ভীর। কথা যেন তাঁর মুখ থেকে বেরোয় না। আগে নাকি তবু বলতেন। কিন্তু বছর তিনেক হল ছোট ছেলেটা হঠাৎ মারা যাওয়ায় সেটুকুও হারিয়েছেন। অগত্যা কী আর করা, কাজ করতে করতে কাজের ফাঁকেই বই পড়ি, লোক গুনি আর ট্রেন এলেই উঠে গিয়ে চেকিং-এর জন্য প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াই।

তা সেদিনও দাঁড়িয়েছিলাম। কিন্তু ট্রেনটা চলে যেতেই হঠাৎ একজন কে এসে আমার পায়ের ওপরে হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

'কে—কে তুমি! কৌন হ্যায়?'

বলতে না বলতেই দেখি নন্দ। মুখ তুলে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে। 'এ কিরে নন্দ, তুই! এই বুঝি তোর দশ দিন হল?'

নন্দ লজ্জা পেল।

'আজ্ঞে তা কি করব! দেশের বাড়িতে যেতে না যেতেই ধুম জ্বর। সে জ্বর আর কিছুতেই ছাড়ে না...কেন, মামার চিঠি পাওনি দাবাবু—'

'চিঠি—! কই না তো—!'

'অই দেখ চিঠি পাওনি। তয় আর তুমি বুঝবে কি করে। যাক-গে আমি যখন এসে গেছি তখন আর চিন্তা নেই। তা খাওয়া-দাওয়া ঠিকমতো করছ তো?'

কথার ফাঁকেই আমি বাধা দিলাম।—'হ্যাঁ হ্যাঁ, সবই হচ্ছে...তা তুই কি করে এখানে এলি বল তো? তুই তো জানিস না আমি এখানে বদলি হয়ে এসেছি। নাকি আমাদের বাড়ি থেকেই খবরটা পেয়েছিস!'

'না—না, দাবাবু। তোমাদের বাড়িতে আর যাওয়া হল কই? অসুখ থেকে উঠেই তো সোজা এখানে চলে এলাম। অবিশ্যি আমি নেবেছিলাম তোমার আগের কাজের জায়গায়। তা ওখান থেকেই তো মাস্টারবাবুরা আমাকে এখানে পাঠিয়ে দিলে—'

বলতে বলতে নন্দর মুখে হাসি ছড়িয়ে পড়ল।

ভাবলাম, বুদ্ধি আছে বটে ছেলেটার। আমাকে না দেখে চলে যায়নি। ঠিক খোঁজখবর করে এখানে চলে এসেছে। অবশ্য আমিও আমার সহকর্মীদের বলে এসেছিলাম। বলেছিলাম, নন্দ এলেই যেন এখানে পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু দশ দিনের নাম করে গিয়ে দশ মাসের মাথায়ও ফিরে না আসাতে আমি ওর কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। যদি বা মনে পড়ত, সঙ্গে সঙ্গে রেগে যেতাম ওর ওপরে। ভেবেছিলাম, দেশের বাড়িতে গিয়ে হয়তো বা বিয়ে-টিয়ে করে সংসার পেতে বসেছে। তা বসুক, কিন্তু তাই বলে একটা খবর দিতে কী হয়!

যাই হোক, ভুলেই গিয়েছিলাম আর নতুন জায়গায় এসে নিজেই নিজেরটা করে নিচ্ছিলাম, ঠিক এই সময়ে আজ এখানে এসে হাজির হল নন্দ। ওকে দেখে খুশিই হলাম। যাক, এসে যখন পড়েছে আর আমাকে হাত পুড়িয়ে রেঁধে খেতে হবে না। যা করার ওই নন্দই করবে সব। ওই তো করত আগের জায়গায়।

নন্দ বলল, 'হাঁ করে তাকিয়ে দেখছ কী দাবাবু...নাও চলো তো এখন—দেখি ঘরদোরের হাল কেমন করে রেখেছ?'

আমি এগোবার আগেই হনহন করে এগিয়ে চলল নন্দ। আমি ডাকলাম, 'কীরে অত তাড়াহুড়ো করছিস কেন?'

নন্দ দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর আমার দিকে তাকাতেই দেখি ওর মুখ শুকিয়ে গেছে। চোখের কোলে হতাশা। 'কেন দাবাবু, তুমি কি কাউকে ঠিক করে ফেলেছ নাকি?'

একটু মজা করতে ইচ্ছে হল। বললাম, 'হ্যাঁ, তা তো রেখেছি। পাহাড়ের ওদিক থেকে, ওই দূরের গ্রাম থেকে আসে। কী করব বল, তোর দেরি দেখে ভাবলাম তুই বুঝি আর আসবি না এখানে। তাই—'

মুখ চুন করে ফিরে চলল নন্দ। বলল, 'তাহলে আর গিয়ে কী হবে! দেশেই ফিরে যাই বরং...'

সত্যি সত্যিই প্ল্যাটফর্মের দিকে যাচ্ছে দেখে আমিই টেনে আনলাম। 'দূর বোকা...আমার কথা কি সত্যিই বিশ্বাস করলি নাকি! লোক কোথায় পাব এখানে? নিজেই নিজের হাত পুড়িয়ে রাঁধছি আর বারবার তোর কথাই ভাবছি—'

'তবে—!'

নন্দর মুখে হাসি ফুটে উঠল।

'আমি তো জানতাম দাবাবু, তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে। তাই তো ভালো হতেই সোজা চলে এলাম। নাও, চলো দেখি...কোনদিকে বাড়িটা বলো তো?'

'ওই তো—' আমি হাত তুলে দেখালাম, 'ওই যে লাল রঙের লম্বা বাড়িটা দেখছিস দূরে, ওরই একটায় আমি থাকি।'

হনহনিয়ে কোয়ার্টার লক্ষ করে হেঁটে চলল নন্দ।

কিন্তু তালা খুলে ঘরে ঢুকে সবে জানলা-টানলা খুলছি, নন্দ হঠাৎ লাফিয়ে উঠল, 'আরে ছি ছি—এ কি করে রেখেছ তুমি দাবাবু! এমন ঘরে কেউ থাকতে পারে!'

'কেন দিব্যি তো আছি।'

'হ্যাঁ আছো তো...কিন্তু এমন অবস্থায় থাকলে তো দু'দিনেই অসুখে পড়ে যাবে তুমি। নাও সরো তো এখন। দেখি কতটা কী করা যায়—'

বলতে বলতে আমাকে প্রায় বাইরেই বের করে দিল নন্দ। আমি জানালাম, 'ঠিক আছে, তুই ততক্ষণে ঘরদোর গুছোতে থাক, আমি চট করে স্টেশন থেকে ঘুরে আসি।'

যাবার জন্য পা বাড়িয়েছি, ঠিক এ সময়ে বিপদটা ঘটল। বাঘা কোথায় ছিল, আমাকে দেখেই ছুটে এল। আর এসেই আমার ঘরে অচেনা একজনকে দেখে ভয়ংকর চেঁচামেচি। পারলে নন্দকে প্রায় ছিঁড়ে খায়।

আমি ধমকালাম, 'এই বাঘা, কী হচ্ছে? নন্দ আমারই লোক...ওকে এভাবে ধমকাচ্ছিস কেন?'

চিৎকার একটু থামল; কিন্তু গলার ভেতরে চাপা গরগর একটা আওয়াজ হয়েই চলল। শেষে আওয়াজটা একটু থামতে নন্দ বলল, 'আবার এসব তুমি জুটিয়েছ কেন দাবাবু? বেশ তো ছিলে—'

বললাম, 'আমি কি আর জুটিয়েছি! এক ঝড়ের বিকেলে হঠাৎ কোত্থেকে নিজেই এসে হাজির। আর সেই থেকেই এখানে আছে। করার মধ্যে আমি শুধু খেতে-টেতে দিই আর একটু আদর-টাদর করি। ব্যস, কুকুরটা দু'দিনেই আমার ভক্ত হয়ে গেল।'

'তা কামড়ে-টামড়ে দেবে না তো...যেভাবে চেঁচাচ্ছে—'

'আরে না না—' বাঘার মাথায় হাত রেখে বললাম, 'বাঘা আমার দেখতে যেমন ব্যবহারও তেমনি সুন্দর। এতদিন আমরা দুজনে ছিলাম তো—এখন তোকে দেখে একটু হিংসা হচ্ছে। ও দু'দিন গেলেই ঠিক হয়ে যাবে।...ঠিক আছে, তুই হাত লাগা, আমি ঘুরে আসছি। রান্নাটান্নাও করে রাখিস। জিনিসপত্র সব ঘরেই আছে—'

'সঙ্গে তাহলে ওটাকেও নিয়ে যাও দাবাবু!' নন্দ বলল, 'বাব্বা, কুকুর তো নয় যেন বাঘের বাচ্চা!'

'আচ্ছা, আচ্ছা, তাই নিচ্ছি। চল রে বাঘা—'

কিন্তু বাঘা তবু নড়ে না। বরং বিপুল উদ্যমে আবারও চিৎকার শুরু করে দিল।

পাশের ঘরটাই স্টেশন-মাস্টারের। বাঘার চিৎকারে তাঁর স্ত্রী বেরিয়ে এলেন।

'কী হয়েছে কি সুদীপ...বাঘা আবার আজ এত চেঁচাচ্ছে কেন?'

বললাম, 'নন্দর কথা বলেছিলাম না আপনাদের, সেই নন্দ হঠাৎ উদয় হয়েছে আজ! আর বাঘা ওকে দেখেই—'

'ও তাই বল—' বউদি হাসলেন, 'আমি ভাবলাম কী না কী হয়েছে।'

বলে বউদি আবার ঘরে ঢুকতেই আমিও বাঘাকে টেনে নিয়ে চললাম।

নিলাম বটে, চিৎকার তবু থামাতে পারি না। মাঝে-মধ্যে একটু কমলেও গরগর আওয়াজ করে বিক্ষোভটা জানিয়েই চলল। বুঝলাম, এখন ওকে ছাড়লে ও গিয়ে নির্ঘাৎ নন্দর পেছনে লাগবে। তার চেয়ে যতটা সময় পারা যায়, আটকে রাখাই ভালো।

স্টেশনে এসে অফিসঘরে ঢুকে তাই বললাম, 'নে এবারে এখানে চুপচাপ বসে থাক বাঘা...আমি যখন যাব তখন আমার সঙ্গে যাবি।'

বাঘা আপত্তি করল না। কী ভেবে নীচে বসে আমার চেয়ারের পাশেই চুপচাপ পড়ে রইল।

মাস্টারমশাই বললেন, 'কী ব্যাপার, আজ একেবারে ওকে নিয়ে এখানে?'

সব খুলে বললাম। স্টেশন-মাস্টার জানালেন, 'যাক, তাহলে তুমি হাঁপ ফেলে বাঁচলে এবারে। নন্দ যখন এসে গেছে—'

আমি ঘাড় নাড়লাম; তারপরে আস্তে আস্তে একসময় কাজের ভেতরে ডুবে গেলাম। কাজ করতে করতে যে কতক্ষণ কেটে গেছে খেয়াল নেই; খেয়াল হল হঠাৎ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে। প্রায় একটা বাজে। এখন অন্তত ওঠা দরকার। নন্দটা আজ নতুন এসেছে। তাছাড়া খিদেও পেয়েছে প্রচণ্ড। সকালের দিকে আজ তো খাওয়াই হয়নি।

দুপুরের দিকে ট্রেন থাকে না বলে মাস্টারমশাই এ সময়টা কোয়ার্টারে চলে যান। আমিও খানিকটা কাজ সেরে পোর্টার বোনোয়ারীর ওপর দায়িত্ব দিয়ে বাড়িতে খেতে আসি। খেয়ে-দেয়ে বই বগলে আবার স্টেশনে চলে আসি। আজও সেসব ভেবেই উঠেছিলাম। কিন্তু বেরোবার মুখে খেয়াল হল বাঘা নেই। কোথায় গেল! দিব্যি তো চেয়ারের পাশে চুপচাপ শুয়েছিল।

এদিকে-ওদিকে খুঁজলাম। ডাকলামও বার কয়েক। কিন্তু সাড়া না পেয়ে মনে হল, নিশ্চয় আমার নজর এড়িয়ে কোয়ার্টারেই চলে গেছে। আর গিয়েই এতক্ষণে হয়তো আবার নন্দর ওপর হামলা চালিয়েছে।

তাড়াতাড়ি পা চালালাম।

কিন্তু কোয়ার্টারে ফিরে দেখি সব চুপচাপ। কোথাও কোনো সাড়াশব্দ নেই। নন্দও বহাল তবিয়তে আছে। যাক, তাহলে এখানে আসেনি, অন্য কোথাও গেছে।

নন্দ বলল, 'চটপট চান করে নাও দাবাবু। আমার রান্নাও হয়ে গেছে।'

আমি ততক্ষণে অবাক। ঘরের চারদিকে তাকিয়ে দেখি সবকিছু কেমন ঝকঝকে। মাত্র কয়েকটি ঘণ্টার ব্যবধানে ঘরটা যে এমন সুন্দর হয়ে উঠবে ভাবতেই পারিনি। আরও ভালো লাগল, ফিরে এসে ঠিকমতো রান্নাটা রেডি দেখে।

চটপট মাথায় জল ঢেলে চান সেরে সবে খেতে বসেছি, হঠাৎ কোত্থেকে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল বাঘা। আমার ভাতের থালা, ডিমের কারি, বেগুনভাজা আর ডালটাল উল্টে ফেলে দিয়ে প্রচণ্ড চিৎকারে নন্দকে আক্রমণ করতে গেল।

মুহূর্তে আমার মেজাজটা গরম হয়ে উঠল। খিদের সময় খেতে বসেছি, তার ওপর এমন সাজানো সব খাবার—একটা নির্বোধ জন্তুর গোঁয়ার্তুমিতে তা যদি এভাবে নষ্ট হয় তাহলে কার না রাগ হয়! রাগে উত্তেজনায় দরজার মোটা খিলটা তুলে নিয়ে আমি ছুটলাম। বেশ আচ্ছাসে কয়েক ঘা বসিয়ে দিতে হবে। শিক্ষা না হলে হবে না বাঘাটার।

কিন্তু দৌড়ে গিয়ে রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে খিলটা তোলার আগেই দেখি নন্দ নেই। বাঘাই শুধু চেঁচাচ্ছে।

'নন্দ—নন্দ—কোথায় গেলি?'

আমি কয়েকবার ডাকতেই দেখি আমার পেছনে নন্দ। জ্বলন্ত দৃষ্টিতে বাঘার দিকে তাকিয়ে।

'ওকে সাবধান কর দাবাবু...না হলে ওকে আমি গলা টিপে মেরে ফেলব। বাবা রে বাবা, কুকুর তো নয় যেন বাঘ একটা—'

বাঘা তেড়ে আসছিল, এবারে খিলটা তুলে একটা বাড়ি মারলাম। আঘাতটা কিন্তু বাঘার লেজের ওপরে গিয়ে পড়ল। খিলটা ছেড়ে ডান হাতে সঙ্গে সঙ্গে একটা চড় কষিয়ে দিলাম। চড়টা খেয়ে বাঘা আচমকা চুপ করে গেল। কিন্তু দাঁত বের করে নন্দর দিকে তাকিয়ে রইল।

নন্দ বলল, 'ও থাকলে আর আমার থাকা হবে না দাবাবু। হয় তুমি ওকে বিদেয় কর, না হলে আমিই চলে যাই—'

কী বলতে যাচ্ছিলাম, নন্দ আবার বলে উঠল, 'ছি ছি ছি, খিদের মুখের দুটি ভাত...তুমি বোসো দাবাবু, আমি এখুনি আবার সব করে দিচ্ছি—'

'না—না, থাক। তোর আর কিছু করতে হবে না এখন। বিকেলের গাড়ি আসার সময় হয়ে এল। আমাকে এক্ষুনি স্টেশনে ছুটতে হবে।'

বলে আলমারি থেকে একটা বই তুলে নিয়ে বেরিয়ে এলাম।

কিন্তু স্টেশনে পৌঁছে চেয়ারে বসতে না বসতেই দেখি মাস্টারমশাই ছুটে আসছেন। কি ব্যাপার! মাস্টারমশাই তো আরও পরে আসেন। তার ওপর এমন হন্তদন্ত হয়েই বা আসছেন কেন!

আমি উঠে দরজার কাছে যেতেই মাস্টারমশাই উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, 'শীগগির এসো সুদীপ...তোমার নন্দর সঙ্গে বাঘার আবার তুমুল লেগে গেছে—। বোধহয় এতক্ষণে বাঘা শেষ!'

'মানে—! কি বলছেন দাদা?'

'হ্যাঁ, সেটা বলার জন্যই তো ছুটে এসেছি।...প্রচণ্ড চিৎকার-চেঁচামেচিতে ঘর থেকে বেরিয়ে তোমার বারান্দায় উঁকি দিয়ে দেখি নন্দ বাঘার গলা টিপে ধরেছে।'

'সে কি!'

মাস্টারমশাইকে রেখে আমি দৌড়ে গেলাম। বোনোয়ারীও আমার পেছনে পেছনে ছুটল।

কিন্তু কোয়ার্টারের কাছে পৌঁছে দেখি কোনো কিছু নেই। না নন্দর চিৎকার, না বাঘার তর্জন-গর্জন!

বারান্দায় উঠে নন্দকে ডাকতে ডাকতে ভেতরে ঢুকলাম। কোনো সাড়া নেই। ঘর ফাঁকা। রান্নাঘর ফাঁকা। এমন কি কোয়ার্টারের পেছনে কুয়োতলা, পেয়ারাতলায়ও কেউ নেই।

চেঁচিয়ে আবারও ডাকলাম। বাঘার নাম ধরেও চেঁচালাম।

আমাদের দেখে বৌদি আগেই বেরিয়ে এসেছিলেন। খানিকটা হাঁকডাকের পর এগিয়ে এসে বললেন, 'কী, নেই!'

'নাহ্—' আমি বললাম, 'কোথাও তো দেখছি না।'

বৌদি বললেন, 'আশ্চর্য! এই তো ছিল। দুজনে তুমুল কাণ্ড। তাই তো, আমি তোমার দাদাকে পাঠালাম তোমাকে জানাতে। দেখ তো ভালো করে—'

দেখলাম। বোনোয়ারী আর আমি তন্নতন্ন করে খুঁজলাম। নাহ্, নেই। যেমন নন্দ তেমনি বাঘা—দুজনেই হঠাৎ উধাও। কিন্তু কোথায় গেল! যেতে পারেই বা কোথায়! খুব বেশিক্ষণ তো হয়নি আমি স্টেশনে গেছি। তার ওপর মাস্টারমশাইও তো দেখে গেছেন এই একটু আগে।

এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিলাম, হঠাৎ বোনোয়ারী চিৎকার করে উঠল। কুয়োতলার পেছনে জামগাছের আড়ালে কি যেন দেখে আমাকে ডাকল।

'মাস্টারবাবু...ও ছোটে মাস্টারবাবু...আইয়ে ইধর—'

'কিরে—কি হয়েছে রে বোনোয়ারী?' আমি দৌড়লাম। আর দৌড়ে গিয়ে যা দেখলাম তাতে চোখ কপালে ওঠে আর কি!

জামগাছের পেছনে একটা ঘন ঝোপ। লম্বা লম্বা বাবুই ঘাসে জায়গাটা ছেয়ে আছে। আর তারই ভেতরে বাঘা শুয়ে। শুয়ে ঠিক নয়। যেন কেউ বাঘাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। তাই মুখটা বেঁকানো, জিভটা লম্বা হয়ে বেরিয়ে এসেছে আর চোখের মণি দুটোতে একটা আতঙ্ক। ভয়ংকর কিছু একটা দেখে যেন ভয়ে চুপসে গিয়েছিল।

কিন্তু কি হয়েছিল কি! মাস্টারমশাইয়ের কথা মনে পড়ল, 'নন্দ বাঘার গলা টিপে ধরেছে...'। তবে কি নন্দই মেরে রেখে গেল কুকুরটাকে! একটু আগে আমাকেও তো বলছিল, বাঘাকে সাবধান করে দিতে। না হলে ওর গলা টিপে মারবে। কিন্তু অত বড় দশাসই কুকুরটা! মারল কি করে নন্দ?

বোনোয়ারীকে বললাম, 'এ নন্দরই কাজ। নন্দই মেরে রেখে গেছে কুকুরটাকে।'

'লেকিন কাঁহা গিয়া ওহি লেড়কা?'

কোথায় গেছে তা তো আমিও ভাবছি। বাঘাকে মারলই বা কেন! লাঠি দিয়ে ভয় দেখালে হত না!

দুপুর গেল। বিকেল গেল। সন্ধে গড়িয়ে রাত্রিও হল। নন্দ তবুও এল না। বুঝলাম, আর আসবেও না। অন্যায় করলেও বাঘা আমার আদরের কুকুর। সেই কুকুরকে মেরে ফেলে মুখ দেখাবে কি করে সে! কাজেই ওর আসার আর প্রশ্নই ওঠে না।

বলা বাহুল্য, নন্দ আর এল না। তবে দিন দশেক বাদে এল একটা চিঠি। তাতে নন্দর দেশের ছাপ মারা। পাঠিয়েছে নন্দর মামা।

লিখেছে, দিন কয়েক আগে একটা অ্যাকসিডেন্টে মারা গেছে নন্দ। জ্বর থেকে উঠে সে নাকি আমার কাছেই আসছিল। কিন্তু হাইওয়ে থেকে বাসে ওঠার কিছুক্ষণ বাদেই একটা গাছের সঙ্গে বাসটা ধাক্কা মারে। নন্দ সামনে ছিল। সঙ্গে সঙ্গেই মারা যায়!

চিঠিটা পড়ে চমকে উঠলাম। তাড়াতাড়ি বুকিং-কাউন্টারের পাশের দেয়ালে ক্যালেন্ডারটা দেখতে গিয়ে দেখি নন্দ যেদিন এখানে এল সেটা দিন দশেক আগের সেই দিনটি...যেদিন বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাসে উঠেছিল সে।

বৈশাখ ১৩৯৫

জবানবন্দী

অসিতকুমার চৌধুরী

রিটায়ার করার পর তমালবাবু মামুদপুরের এক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কাজ পেলেন। সেখানেই তাঁকে থাকতে হবে। মামুদপুর ট্রেনে হাওড়া থেকে দু-আড়াই ঘণ্টার পথ। জায়গাটা ভালোই লাগল তমালবাবুর।

প্রকল্পে কাজ করেন চারজন ডাক্তার, একজন টাইপিস্ট, ক্যাশিয়ার, জনা ছয়েক কেরানি। তাছাড়া ক'জন ট্রেনি নার্সও আছেন। তমালবাবুর কাজ হল কেরানিদের কাজকর্ম দেখাশোনা করা।

ডাক্তাররা প্রায় সবাই নতুন পাশকরা ছেলে-ছোকরা মানুষ। দারুণ উৎসাহেই তাঁরা কাজ করেন। প্রকল্পের প্রধান, ডাক্তার সেন থাকেন কলকাতায়। প্রায় সপ্তাহেই ক'দিনের জন্য এসে কাজকর্মের তদারক করেন। সাধারণের চাঁদায় প্রকল্পের কাজ চলে। কিছু সরকারি অনুদানও পান ডাক্তার সেন।

মাসকতক বেশ ভালোভাবেই কেটে গেল তমালবাবুর। লোকজনের ব্যবহার ভালো। কাজেরও তেমন চাপ নেই। তাছাড়া স্থানীয় কেরানিরাও ওঁকে যথেষ্ট সমীহ করে। থাকার ব্যবস্থা ভালো। মেস করে বাইরের সবাই থাকেন।

একদিন ডাক্তার সেন বললেন, তমালবাবু, নার্সদের ট্রেনিং-এর জন্য একটা কঙ্কাল আনতে হবে। ডাক্তার পাত্র যেতে রাজি হয়েছেন। আপনিও তাঁর সঙ্গে যান, ওটা কিনে আনুন গিয়ে।

কঙ্কাল কেনার কথাটা শুনে মনে মনে বেশ ভয়ই পেলেন তমালবাবু। একটা মানুষের আসল কঙ্কাল কিনে বয়ে আনতে হবে সঙ্গে করে! ব্যাপারটা যেন কেমন অস্বস্তি জাগাল ওঁর মনে।

ডাক্তার পাত্রের বয়স খুবই কম। হেসে বললেন, কেন মিছে ঘাবড়াচ্ছেন বলুন তো! নেড়েচেড়ে দেখে তো কিনব আমি। না হয় বাক্সটা বইবও আমি। আপনি শুধু সঙ্গে থেকে দরদামটা করবেন। তাতে অত ঘাবড়াবার কি আছে!

দোকানের মালিক একটার পর একটা কঙ্কাল এনে ওঁদের সামনে স্ট্যান্ডে টাঙিয়ে দিতে লাগলেন। তমালবাবু বিস্ফারিত চোখে সেগুলোর দিকে শুধু তাকিয়েই রইলেন। ওঁর বারবার মনে হচ্ছিল, ওগুলো একদিন মানুষের দেহ নিয়ে চলাফেরা করত। কে জানে ওদেরই কেউ হয়তো একদিন ওঁর পাশ দিয়েই হেঁটে গেছে। মনে মনে শিউরে উঠলেন তমালবাবু।

অনেক দেখাশোনার পর ডাক্তার পাত্র একটা কঙ্কাল পছন্দ করলেন। বললেন, এটা একটি মেয়ের কঙ্কাল। বোধহয় চোট পেয়ে মারা গেছিল মেয়েটি। তা হোক। এটাই নেব আমরা।

দরদাম করে কঙ্কালটা কেনা হল। তারপর ওটাকে বাক্স-বন্দী করে ট্যাক্সিতে তোলার সময় তমালবাবু স্পষ্ট শুনতে পেলেন ব্যথাভরা একটা দীর্ঘশ্বাস। চমকে উঠে উনি তাকালেন বাক্সটার দিকে।

ডাক্তার পাত্র হেসে বললেন, কি অত ভাবছেন বলুন তো? আপনাকে ওটা আর ধরতেই হবে না। স্টেশনে কুলি নিয়ে নেব। আর ওখানে পৌঁছে, ওটা আমিই বয়ে নিয়ে যাব সেন্টারে। মিছিমিছি চিন্তা করবেন না তো। সামান্য একটা কঙ্কাল।

ভয়ে ভয়ে তমালবাবু বললেন, আপনি যাই বলুন আর তাই বলুন, আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে, যার কঙ্কাল তার জীবনটা বড় দুঃখের ছিল।

হাসলেন ডাক্তার পাত্র। বললেন, হতেই পারে। দুঃখীদের কঙ্কালই তো বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। জীবনে সুখী যারা তারা আর এমন ভাবে কঙ্কাল হবে কি করে?

সন্ধ্যাবেলা কেন্দ্রে ফিরে এলেন ওঁরা দুজনে। তখনি গেটের কাছে ছোটখাটো একটা ভিড় জমে গেছে। একটা আসল কঙ্কাল যে আনা হচ্ছে, তা মুখে মুখে চারদিকে রটে গেছিল এর মধ্যে। তাই দেখতে আশপাশের গ্রামবাসীরা এসেছে।

ডাক্তার পাত্র কঙ্কালটাকে অফিস-ঘরের স্ট্যান্ডে ঝুলিয়ে দিলেন। কঙ্কালটা স্ট্যান্ডে দুলতে শুরু

করল। যারা এতক্ষণ বেশি সাহস দেখাচ্ছিল তারা সবাই ছুটে পালাল। বাকিরা থতমত খেয়ে দাঁড়িয়েই রইল।

পরদিন থেকে নার্সদের ক্লাস শুরু হয়ে গেল। পড়াবার সময় কঙ্কালটাকে ক্লাসরুমে নিয়ে যাওয়া হত। অন্য সময় ওটাকে রাখা হত অফিস-ঘরেই।

সেঘরে বসেই তো কাজ করতে হয় তমালবাবুকে। তাই চেষ্টা করেও ওটার কথা কিছুতেই ভুলতে পারছিলেন না তমালবাবু। কাজের ফাঁকে ফাঁকে থেকে থেকেই ওঁর নজর গিয়ে পড়ে কঙ্কালটার দিকে। আর তখনি ওঁর বুকের মধ্যে কেমন যেন একটা অনুভূতি জাগে। ভয় আছে তাতে, তাছাড়া আছে আরও একটা ভাব যা ওঁকে বারবার বলে মেয়েটা জীবনে সুখ পায়নি। ও তাই ওর দুঃখের কথা শোনাতে চায়। এ কথা কাউকে বলতে পারছিলেন না তমালবাবু। মনের মধ্যে একটা অস্বস্তি নিয়েই ওঁর দিন কাটছিল।

ক'দিন পরে টাইপিস্ট মুখার্জিবাবু এসে বললেন, আপনাকে একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। আমি রোজ শেষে অফিস থেকে বার হই। নিজের হাতে তালা লাগাই দরজায়। চাবিটা নাইট গার্ড কিস্কুকে দিয়ে যাই। অথচ রোজ এসে দেখি রাতে কে আমার টাইপরাইটারটা ব্যবহার করেছে। আমার হাতের মেশিন অন্যে ব্যবহার করলে আমি টের পাই।

কিস্কুকে ডেকে তমালবাবু ধমকালেন। বললেন, আর যেন সে টাইপরাইটারটা ব্যবহার না করে। টাইপ শিখতে হলে ও তো বর্ধমানে গিয়ে দিনের বেলা শিখতে পারে। ওর তো রোজ নাইট ডিউটি।

কিস্কু থতমত খেয়ে বলল, স্যার রাতে তো আমি ওঘরে ঢুকি না। মুখার্জিবাবুর খুব সাহস, তাই সন্ধের পর একা ওঘরে বসে টাইপ করেন। কঙ্কালটা দেখলেই আমার ভীষণ ভয় করে।

তমালবাবু ভাবলেন, ধরা পড়ে গিয়ে কিস্কু নিজের দোষ কাটাবার জন্যই এসব কথা বলছে। কিন্তু আজ এই ধমক খাওয়ার পর আর সে নিশ্চয়ই ও মেশিনে হাত দেবে না।

বেশ ক'দিন কিছুই আর ঘটল না। কিন্তু তারপর একদিন মুখার্জিবাবু ভীষণ রাগ করে বললেন, আপনি যদি এখনি ব্যবস্থা না নেন তো টাইপ মেশিনটা খারাপ হলে তার দায়িত্ব আমি নেব না। ও তো আবার রোজ রাতে টাইপ করা শুরু করেছে। বিনা পয়সায় হাত পাকাবার সুযোগ ও ছাড়বে কেন?

অগত্যা কিস্কুকে বদলি করলেন তমালবাবু নিতাইয়ের জায়গায়। আর নিতাইকে আনলেন ওর জায়গায়। নিতাই তেমন লেখাপড়া জানে না। টাইপরাইটার চালাবার প্রয়োজনই হবে না ওর।

দু'দিন পরে নিতাই এল ওঁর কাছে। এদিক-ওদিক দেখে বলল, স্যার আমি অফিস ঘরে রাতে ডিউটি দেব না। আমাকে অন্য কোথাও বদলি করেন।

অবাক তমালবাবু বললেন, কেন ওখানে তোমার অসুবিধাটা কি হচ্ছে?

একটু ইতস্তত করে নিতাই বলল, আজ্ঞে রাতে অফিস ঘরের মধ্যে কেমন যেন এক অদ্ভুত শব্দ ওঠে, খট খট খট খট, একটানা শব্দ। ও শব্দ যে কোথা থেকে আসে কে জানে!

তমালবাবু হেসে বললেন, ইঁদুর-টিঁদুর হবে। ওর জন্য তোমাকে আমি বদলি করতে পারব না।

ব্যস্ত হয়ে নিতাই বলল, না স্যার না, ওঘরে ইঁদুর ঢুকবে কি করতে? তাছাড়া একটানা অমন শব্দ তো ওঠে টাইপ মেশিন থেকে, আমি জানি। শব্দ ওঠে অথচ ঘরের দরজা তো বাইরে থেকে বন্ধ থাকে। তাহলে?

মনে মনে শিউরে উঠলেন তমালবাবু। কে অত রাতে বন্ধ ঘরে টাইপ করে? কই কঙ্কালটা আসার আগে তো এমন কথা কারও মুখে কখনও শোনা যায়নি! তবে কি....

তবুও মুখে হাসি এনে বললেন, বেশ, আজ রাতে যদি শব্দ ওঠে তো দরজাটা খুলে দেখবে। বন্ধ ঘরে ভূতে তো মেশিন চালায় না!

ব্যাজার মুখ করে নিতাই চলে গেল।

মাঝরাতে হঠাৎ কিস্কুর চিৎকার শুনে ঘুম ভেঙে গেল তমালবাবুর। ও ঘরের ডাক্তারবাবুও বার হয়ে এলেন। কিছু বুঝে ওঠার আগেই কিস্কু ছুটতে ছুটতে এসে বলল, শিগ্গির আসুন স্যার। নিতাই অজ্ঞান হয়ে গেছে। আসুন জলদি।

অফিস ঘরের বারান্দায় নিতাই পড়ে আছে। অফিস ঘরের দরজা হাট করে খোলা। তমালবাবু

দেখতে পেলেন রাতের বাতাসে অন্ধকারে কঙ্কালটা অল্প অল্প দুলছে। কেন যেন মনে হল ওঁর, কঙ্কালটা ওঁর কানের কাছে সেই প্রথম দিনের মতোই গভীর দুঃখে নিশ্বাস ফেলল। কি যেন বলল ও। খুব ভয় পেয়ে গেলেন তমালবাবু।

ডাক্তারবাবুরা পরীক্ষা করে দেখলেন। না ভয়ের কিছু নেই। মুখে-চোখে জলের ঝাপটা দিতেই নিতাই চোখ মেলল। খানিকক্ষণ বোকার মতো এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখল। তারপর ভয়ে দু'হাতে মুখ ঢাকল।

ডাক্তার পাত্র জিজ্ঞাসা করলেন, নিতাই, কি হয়েছিল তোমার?

হাউমাউ করে কেঁদে উঠল নিতাই। বহুকষ্টে কান্না থামিয়ে বলল, স্যার রাতে আমি আর এখানে ডিউটি দেব না। ও ঘরে ভূত আছে। মেমসাহেব ভূত।

তার মানে? অবাক ডাক্তার পাত্র জিজ্ঞাসা করলেন, কি হয়েছিল ঠিক করে বল তো! ভূত আসবে কোথা থেকে? কি বলছ তুমি?

কান্না-মেশানো গলায় নিতাই বলল, রোজকার মতো মাঝরাতে ঘরের মধ্যে একটানা খটখট আওয়াজ উঠতেই ও স্যারের কথা মতো মনে সাহস এনে দরজাটা খুলেছিল। বাইরের আলো ঘরের মধ্যে পড়তেই টাইপ মেশিনের সামনে বসে থাকা এক মেমসাহেব ওর দিকে মুখ তুলে তাকিয়েছিল। কি করে মেমসাহেব ঘরে ঢুকল এ কথা যখন ও ভাবছে হঠাৎ মেমসাহেব বদলে গিয়ে সেখানে ওই কঙ্কালটা বসে আছে ও দেখতে পেয়েছিল। আতঙ্কে ও চিৎকার করে উঠেছিল। তারপর ওর আর কিছু মনে নেই।

কিস্কু বলল, সেই চিৎকার শুনেই ও ওর ডিউটির জায়গা থেকে ছুটে এসে দেখে নিতাই অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। কঙ্কালটা কিন্তু হাওয়ায় দুলছিল তার জায়গাতেই।

কেউ কিছু বলার আগেই ডাক্তার মুখার্জি ঘরের মধ্যে ঢুকে গেলেন। একটু পরেই ওঁর মুখে একটা বিস্ময়সূচক শব্দ শোনা গেল। উনি বার হয়ে এলেন একটা কাগজ হাতে। বললেন, কাগজটা টাইপরাইটারে লাগানো ছিল। কেউ কিছু ওতে টাইপ করেছে। আলোয় কাগজটা নিয়ে গিয়ে পড়া হল।

স্পষ্ট ভাষায় লেখা আছে তাতে, আমার নাম সিন্থিয়া ম্যাকডোয়েল। ক'বছর আগে ফ্রেডি ম্যাকডোয়েলের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছিল। আমি ম্যাকগ্রু জনসন কোম্পানিতে টাইপিস্ট ছিলাম। ফ্রেডির সম্বন্ধে কিছুই জানতাম না আমি। ও ছিল ভীষণ লোভী ও অসৎ। আমি অনেক চেষ্টা করেছিলাম ওকে বদলাতে। একদিন ওর সঙ্গে ঝগড়া হবার সময় ও হঠাৎ আমাকে ওর হকি স্টিক দিয়ে প্রচণ্ডভাবে মারে। রাগলে ওর জ্ঞান থাকত না। ওর সেই মারে আমি মরে যাই। টাকার লোভ দেখিয়ে ডাক্তার আলিকে দিয়ে আমার দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে বলে লিখিয়ে নেয়। সেই রাতেই আমাকে কবর দেওয়া হয়। আর সেই রাতেই কবর-চোররা আমাকে কবর থেকে তুলে নিয়ে যায়। আমি বিচার চাই। আমার বাবা খুব গরিব। তিনি থানায় ডায়েরি করেছিলেন, আমার মৃত্যু অস্বাভাবিক বলে। থানা কিছুই করেনি। আমি আপনাদের কাছে আশ্রয় পেয়েছি। আপনারা কিছু করুন দয়া করে। তা না হলে আমার মুক্তি নেই।

ডাক্তার সেনের চেনাজানা ক'জন পদস্থ পুলিশ অফিসার ছিলেন। তাঁরা এ ব্যাপারে নতুন করে খোঁজখবর নিতে শুরু করলেন। কবরখানায় গিয়ে সিন্থিয়ার দেহাবশেষ পাওয়া গেল না। কবর খালি। ফ্রেডি আর আলিকে তখন থানায় এনে জেরা করা শুরু হল। জেরার মুখে ভেঙে পড়ে দুজনেই তাদের দোষ স্বীকার করল।

সিন্থিয়ার কঙ্কালটাকে আবার যথাযথ ধর্মীয় আচারে তাঁর কবরে শুইয়ে দেওয়া হল। এরপর থেকে আর কেউ কখনও ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রাতে টাইপ মেশিনে কাজ করেনি।

—

আষাঢ় ১৪০০

যমজ বোন

বরুণ দত্ত

রানার মাসিমার ছেলে-মেয়ে কেউ নেই। রানাই তাঁর নয়নের মণি। আর সেই সুবাদে আমরা রানার দু'তিনজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুও যথেষ্ট স্নেহ আদর নিমন্ত্রণ পাই রানার মাসিমার কাছ থেকে।

মাসিমাদের বাড়ি আছে বিহার আর ওড়িশাতে—সব স্বাস্থ্যকর স্থানে। উত্তরবঙ্গে জমিজমা ছিল, এবার একটা বাড়িও কিনেছেন সেখানে। গরমের ছুটিতে সেই নতুন বাড়িতে যাবার নিমন্ত্রণ পেয়েছি তাঁর কাছ থেকে। মাসিমার সঙ্গে মায়েরও খুব ভাব হয়ে গেছে। ঠাকুমাও খুব স্নেহ-সহানুভূতির সঙ্গে দেখেন মাসিমাকে। মাসিমার ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে ঠাকুমা বলেছেন, এমন ধনী ও রূপবতী অথচ এমন অমায়িক ভালো মানুষ দেখিনি।

যাই হোক আমরা বেড়াতে যাবার ব্যাপারে বাবার আপত্তি টিকল না। ঠাকুমাই আমার পক্ষ নিয়ে বলে দিয়েছেন—কি এমন জজ-ম্যাজিস্ট্রেটের পড়া পড়ছে! সবে তো ক্লাস এইট। যাক, বেড়িয়ে আসুক। এরপরে উঁচু ক্লাসে উঠলেই বরং যেতে দেওয়া যাবে না। তাছাড়া মেয়ে অমন করে বলে গেছে। মাসিমা তাঁর আন্তরিকতা দিয়ে ঠাকুমাকে এমন মুগ্ধ করেছেন যে ঠাকুমা তাঁকে মেয়েই বলেন।

নির্দিষ্ট দিনে দার্জিলিং মেল-এ আমরা রওনা হলাম। বেড়াতে যাবার আনন্দে-উত্তেজনায় সারারাত ঘুমোতেই পারলাম না। পরদিন ভোরে নামা হল নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে। তারপর জনবহুল রাস্তা ছেড়ে প্রায় মাইলটাক পথ এসে খোয়ামাটির রাস্তার উপরেই মাসিমাদের নতুন বাড়ি।

দোতলা, বেশ বড় বাড়ি, কিন্তু পুরোনো। সঙ্গে আম, জাম, কাঁঠাল, কত রকমের লেবু, পেয়ারা, বেল, কমলালেবু, দুটো বড় স্বর্ণচাঁপার গাছ নিয়ে বিশাল বাগান। চাঁপাফুলের গন্ধ তো রয়েছেই সেই সঙ্গে আরও যেন একটা মিষ্টি কি গন্ধে সারাক্ষণ ম-ম করছে বাতাস। একটু দূরে একা একা দাঁড়িয়ে আছে একটা শিমুল গাছ। কলকাতার ছেলে আমরা এত বড় বাগান পেয়ে আত্মহারা।

এই বিশাল এলাকাসহ বাড়িটা নাকি মেসোমশাই কিনেছেন প্রায় জলের দামে। বাড়িটা অযত্নে অব্যবহারে পড়ে ছিল। তাই সারানো, রঙ করা ইত্যাদিতে অনেক খরচ হয়েছে। জল, ইলেকট্রিকের ব্যবস্থাও করেছেন নতুন করে।

এত সুন্দর বাড়ি, কিন্তু এ বাড়িতে কাজ করার লোক একটাও পাওয়া গেল না। অল্প কয়েকদিনের ব্যাপার বলে হয়তো কেউ গরজ দেখাচ্ছে না। মাসিমার সঙ্গে সব সময়েই দুজন কাজের লোক, রাম আর বাসনা থাকে। এখানেও তারা এসেছে, তাই কোনো অসুবিধা হল না।

নতুন বাড়িতে ঢোকা মানেই তো পুজোপাঠ খাওয়া-দাওয়া। প্রয়োজনের চাইতে মাসিমার আয়োজন থাকে সব সময়েই বেশি। আজও তাই হয়েছে। অথচ অতিরিক্ত খাবার-দাবার বিলিয়ে দেবার মতো গরিব মানুষও পাওয়া যাচ্ছে না।

দুপুরের খাওয়া-দাওয়া সেরে মেসোমশাই কি কাজে দার্জিলিং চলে গেলেন। ফিরে আসবেন আজই। আমরা কলকাতা ফেরার আগে যে দার্জিলিং যাব, সে ব্যবস্থাও করে আসবেন। এটাও দারুণ উত্তেজনার ব্যাপার। কারণ খুব ছোটবেলায় মা-বাবার সঙ্গে কবে দার্জিলিং এসেছিলাম, তা এখন আর মনে নেই।

সন্ধ্যার মুখে পাওয়ার কাট্ হল। মাসিমার কাজের লোক রাম পেট্রোম্যাক্স জ্বেলে ফেলল, বাসনা জ্বালল দুটো বড় হ্যারিকেন। একটা রেখে এল সিঁড়ির মুখে। অন্যটা ড্রইংরুমে। পেট্রোম্যাক্স থাকল ঠাকুরঘরের সামনে। মেসোমশাই আগেই বলেছিলেন জেনারেটরের কথা, মাসিমাই বারণ করেছেন। বলেছেন, পরের বার একটা কিনে নিও। এই ক'টা দিনের জন্য আর এত ব্যস্ত হবার দরকার নেই।

মাসিমা ঠিক কথাই বলেছেন, পরে লাগবেই। কারণ মেসোমশাই তাঁর এরিয়া অফিস করবেন এই বাড়িটা ভবিষ্যতে।

বাড়িতে এখন আমি, রানা, সৌরভ—তিন বন্ধু, মাসিমা আর তাঁর রাম ও বাসনা। এরই মধ্যে বাড়ির সব ক'টা আলোই একসঙ্গে হঠাৎ টুপ করে নিভে গেল। আমরা অন্ধকারে ডুবে গেলাম যেন। মাসিমা চেঁচিয়ে উঠলেন, ও রাম, দেখ তো আলোগুলোয় তেল-টেল আছে কিনা। তোরা একটা কাজও ঠিক করে করতে পারিস না। বাবুর ঘরের বড় টর্চটা নিয়ে আয় চটপট। আলোগুলোর সঙ্গে ক'টা বড় মোমবাতিও জ্বেলে দিস। প্রথম দিনেই দেখ তো কী অবস্থা!

রাম আর বাসনা ব্যস্তহাতে আলোগুলো ফের জ্বেলে ফেলল। সেই সঙ্গে ইয়াব্বড় তিন-চারটে মোমবাতিও। তারপর রাম বলল, মা তেল তো সব বাতিতেই ভরাভর্তি রয়েছে।

মাসিমা ঠাকুরঘরে সন্ধ্যাপ্রদীপ দিয়েছিলেন হঠাৎ তাঁর খেয়াল হল প্রদীপটা কে যেন তুলে নিয়ে গেছে। মাসিমা বিরক্ত হয়ে ভাবলেন এ নিশ্চয়ই বাসনার কাজ। হাতের কাছে দেশলাই না পেয়ে ঐটাই তুলে নিয়েছে। কিন্তু ফিরিয়ে দেবে তো! যতসব অলুক্ষণে কাজকর্ম। ঠাকুরঘর অন্ধকার করে কেউ প্রদীপ নেয়! বিরক্ত কণ্ঠে তাই ডাকলেন, বাসনা, বাসনা?

মাসিমার ডাকে বাসনা রান্নাঘর থেকে হাতের কাজ ফেলে ছুটে এল, বলল, কি বলছ মা?

কি বলছি? প্রদীপটা কোথায় রেখে এলি?

আমি প্রদীপ নিয়েছি! কি যে তুমি বল না মা! তখনই বলেছিলুম, এই শরীলে তুমি এত ধকল নিওনি, কি দেখতে কি দেখছ!

মাসিমা একটু থতমত খেয়ে বললেন, নে আর খবরদারি করতে হবে না, প্রদীপটা কোথায় রেখে এলি তাই দেখ।

ঐ তো পিলসুজের উপরেই রয়েছে মা। বলতে বলতে বাসনা চলে গেল।

বাসনার কথা অবশ্য মিথ্যে নয়, কাজের লোক না পাওয়ায় মাসিমার পরিশ্রম হয়েছে খুবই। না হয়েছে বিশ্রাম, না হয়েছে সময়মতো খাওয়া-দাওয়া। ভুল তো তাঁর হতেই পারে।

আমরা তিনবন্ধু বাগানের দিকের দোতলার বারান্দায় বসে গল্প করছিলাম। মাসিমা, বাসনা ও রামের কথোপকথন কমবেশি শুনেছি, যদিও আমাদের দৃষ্টি ছিল আধো জ্যোৎস্নামাখা বাগানের দিকে। ভারী সুন্দর দুটি মেয়ে, হয়তো আমাদের মতোই বয়স হবে, অনেকক্ষণ থেকে চাঁপাগাছের ওদিকটায় খেলা করছিল। এখন তাদের দেখতে পাচ্ছি না। আমরা অবাক হয়ে ভাবছিলাম, কি দুষ্টু আর সাহসী মেয়ে রে বাবা! কখন সন্ধ্যা পেরিয়ে গেছে তবু বাড়ি ফেরার নাম নেই। ওদের বাড়ির লোকেরা নিশ্চয়ই চিন্তা করছে।

একটু পরে পরিষ্কার জ্যোৎস্নায় ভরে গেল চারিদিক। শুনেছি এখান থেকে নাকি এমন জ্যোৎস্নারাতে কাঞ্চনজঙ্ঘাকে দেখা যায়। কিন্তু আমরা তো দেখতে পাচ্ছি না! কি জানি হয়তো তিন-চারতলা বাড়ির ছাদে উঠলে দেখা যায়।

এতক্ষণে কারেন্ট ফিরে এল। এবার আমরা ঠিক করলাম ছাদে উঠে নগাধিরাজ হিমালয়ের তুষার শোভিত শৃঙ্গগুলো দেখার চেষ্টা করব।

সিঁড়িতে উঠতে গিয়ে দেখলাম সেই মেয়ে দুটি ছাদ থেকেই নেমে আসছে। ছাদের দরজায় তালা দেওয়া। রানা গেছে রামের কাছ থেকে চাবিটা আনতে। অবাক হয়ে জিগ্যেস করতে যাব—ওরা ওপরে কি করছিল, না মেয়ে দুটি আমাদের ধাক্কা দিয়েই নীচে নেমে গেল। আর তক্ষুনি রানাও চাবি নিয়ে দৌড়ে এল। বলল—কি জোর একটা হাওয়া বইল রে! ছাদে আর গিয়ে কাজ নেই, বৃষ্টি আসতে পারে।

ছাদে যাওয়ার গরজ কারুরই আর থাকল না। বসার ঘরে চলে এলাম তিনজনে।

ওদিকে মাসিমা রান্নায় ব্যস্ত টের পাচ্ছি। বাসনা মাসিমার হাতে হাতে যোগান দিচ্ছে। রাম বিছানাপত্র রেডি করছে। এক ঘরে শোব আমরা তিনবন্ধু একই খাটে, সেই ঘরের মেঝেতে একপাশে রামের বিছানা। অন্যঘরে মাসিমা আর তাঁর বাসনা। মেসোমশাইয়ের ঘর আলাদা।

মাসিমা একপ্লেট ফিশ ফ্রাই নিয়ে এলেন, বললেন, খেয়ে দেখো কেমন হল? এখন আর বেশি খেয়ে কাজ নেই। তোমাদের মেসোমশাই এলে খেতে দিয়ে দেব, নাকি আগে খাবে?

না না, মেসোমশাই ফিরে এলে একসঙ্গে খাব, দার্জিলিংয়ের গল্প শুনতে শুনতে। আমরা প্রায় একই সুরে বলে উঠলাম তিনজনেই।

বেশ, তবে তাই হবে। হ্যাঁ, ভালো কথা, তোমাদের সঙ্গে ওদের পরিচয় হয়েছে? ভারী মিষ্টি মেয়ে দুটি। কি লাজুক!

মাসিমার কথায় আমরা মাথা নাড়লাম, হয়নি। রানা বলল, বাগানে ওদের আমরা দেখেছি।

মাসিমা নিজের কাজে চলে গেলেন। কিন্তু আমাদের সবারই কেমন যেন একটা গা-ভারী অবস্থা, সবাই সবাইয়ের গা ঘেঁষে বসতে চাইছি। কেন এমন হচ্ছে! গাছগাছালির মধ্যে এতবড় বাড়িতে মাত্র এই ক'জন লোক বলে হয়তো এমন একটা ভাব হতেও পারে।

পরে জানতে পারি আমাদের চোখ এড়িয়ে মেয়ে দুটো কখন মাসিমার কাছে ঠাকুরঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। মাসিমা ওদের দু'খানা থালায় সাজিয়ে দিয়েছিলেন প্রসাদ মিষ্টি পায়েস। কিন্তু এত লাজুক যে মাসিমার সামনে খেতে বসছিলই না। মাসিমা তাই হেসে ওখান থেকে সরে এসেছিলেন, যাতে ওরা ভালো করে খেতে পারে। বাসনাকে বলেছিলেন, বাসনা যা তো, বলে আয় ওরা যেন যাবার সময় দেখা করে যায়।

বাসনার খুব ভুলো মন। সে তক্ষুনিই ঠাকুরঘরে গিয়েছিল, কিন্তু মেয়ে দুটিকে দেখতে পায়নি। মাসিমাকে সে কথা বলতে ভুলে গিয়েছিল। কাজের ব্যস্ততায় ব্যাপারটাও চাপা পড়ে গিয়েছিল। ঠিক এরকম সময় মেসোমশাই ফিরে এসেছিলেন আর আমরা দার্জিলিংয়ের গল্পে কথায় মশগুল হয়ে গিয়েছিলাম।

মাসিমা যে একা হাতে কত রান্না করেছেন! কোনটা ফেলে কোনটা খাই!

খেতে দিতে দিতেও মাসিমা বার দুয়েক বললেন মেয়ে দুটির কথা। মেসোমশাইকে বললেন, কালই মেয়ে দুটির মা-বাবার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করতে হবে। হাজার হোক প্রতিবেশী তো।

আমরা তিনবন্ধু নীরবে দৃষ্টি বিনিময় করলাম। ভাবলাম মাসিমার পুষ্যি বাড়ল আর কী। একটু হিংসেও যে হল না মনে মনে তা নয়। তবে ভালোও লাগল, ভারী সুন্দর পরী পরী দেখতে। বোধহয় যমজ বোন। যদি বন্ধুত্ব হয় ভালোই।

প্রথম দিন খাওয়া-দাওয়া চুকতে বেশ রাতই হয়ে গেল। সবাই যে যার ঘরে ঢুকলাম নিশ্চিন্ত ঘুমের আশায়। কিন্তু কেউই ঘুমোতে পারলাম না। প্রথমে মনে হল যেন বাড়িতে অনেক লোক ঢুকে পড়েছে, দুপদাপ পায়ের শব্দ। রাম তো 'চোর চোর' বলে চেঁচিয়েই উঠেছিল। মাসিমা-মেসোমশাইকে আমরা ডেকে সব বললাম। সারা বাড়ির সব আলোগুলো জ্বালা হল, তন্ন তন্ন করে খোঁজা হল চারদিক—কেউ কোথাও নেই। দরজা-জানলার ছিটকিনি, খিল, চাবি সব ঠিক আছে।

মেসোমশাই মাসিমাকে বললেন, খাটাখাটনি করে রাম বেঘোরে ঘুমিয়ে ছিল, ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন-টপ্ন দেখে থাকবে। কোথায় কি! চল শুয়ে পড়া যাক।

মাঝরাত পেরিয়ে আবার ঘটল একই ঘটনা। এবার শুধুমাত্র ঠাকুরঘরের দিকেই। আবার সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা হল কোথাও কিছু নেই। মাসিমা খুব ভয় পেয়ে গেলেন। বাসনাকে নিয়ে তিনি ঢুকলেন আমাদের ঘরে। মেসোমশাইকেও বাধ্য করলেন আমাদের ঘরে শুতে। একটা কেমন গা-ছমছম ভাব, একটু একটু করে সবাই তবু ঘুমিয়ে পড়লাম।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম জানি না। হঠাৎ ঘুম ভাঙল সারাবাড়ি জুড়ে দাপাদাপির আওয়াজে। তারপর কখনো দরজা খোলার শব্দ, কখনো পাতকুয়োয় বালতি ফেলে জল তোলার আওয়াজ হতে থাকল। সবাই জেগে উঠেছে, ঘরে হলঘরে আলো জ্বলছে। কি যে করা যায়, করা উচিত আমরা কেউই ভেবে পাচ্ছি না। হাতের কাছে একটা ছোট লাঠি রেখে মেসোমশাই জেগে বসে রইলেন। রামের তো ভয়ে মুখ কালো, বাসনার মুখ ফ্যাকাশে, মাসিমা গুরুর নাম করছেন। আকাশটাও থমথম করছে মেঘে, বৃষ্টি আসবে নিশ্চয়ই। বাতাসে বেশ ঠান্ডার আমেজ।

কখন দু'চোখের পাতা এক হয়ে গিয়েছিল বুঝতে পারিনি। আচমকা মাথার বালিশটা কেউ টেনে

নিতেই ঘুমটা ভেঙে গেল। দেখি সৌরভ ও রানা একে অপরের দিকে উল্টো মাথা করে শুয়ে আছে। ওদের মাথায়ও বালিশ নেই। এ কি রে বাবা! আমাদের বালিশগুলো গেল কোথায়? যেই না এই কথা ভাবা, অমনি সেই মেয়ে দুটো খাটের পাশে উঁকি দিয়ে হেসে উঠল। স্বপ্ন দেখছি নাকি! তাড়াতাড়ি চোখ রগড়ে তাকাতেই দেখি কেউ নেই! তক্ষুনি আবার সেই দুপদাপ শব্দ। এবার ভয়ে কাঠ হয়ে গেলাম। রান্নাঘরে কারা যেন বাসনপত্র এলোপাথাড়ি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ফেলছে। একটু পরে সব শান্ত হয়ে গেল।

মেসোমশাই বললেন, তোমরা শুয়ে পড়। আমি তো জেগেই আছি। রাম বরং টর্চটা নিয়ে আমার সঙ্গে থাক।

পরদিন বেশ বেলায় ঘুম ভাঙল। দিনের আলোতে কাল সন্ধে থেকে প্রায় সারারাত যে তাণ্ডব গেছে বাড়ির উপর দিয়ে তা সবই যেন স্বপ্ন বলে মনে হল। মাসিমা-মেসোমশাইয়ের চোখে-মুখেও রাত্রি জাগরণের ক্লান্তির ছাপ। দুশ্চিন্তাগ্রস্তও বটে।

আমরা তিনবন্ধু ব্রেকফাস্ট করছি এমন সময় মেসোমশাইয়ের এক বন্ধু এলেন। তাঁকে চা দিয়ে মাসিমা-মেসোমশাই তাঁর সঙ্গে নিচু গলায় কথাবার্তা বলতে লাগলেন।

হঠাৎ শুনতে পেলাম ভদ্রলোক বলছেন, বাড়ি কিনছ বলেছিলে। কোথায় কিনছ, কি বৃত্তান্ত তা তুমিও বলনি। আমিও ব্যস্ততার মধ্যে জিগ্যেস করিনি। ভেবেছিলাম অনেকদিন ধরেই খুঁজছিলে, পেয়েছ, ব্যস। কিন্তু এই বাড়ির ব্যাপারে জানলে নিশ্চয়ই বারণ করতাম।

কথাটা শুনে কেমন অস্বস্তি হতে লাগল। একটা গা-ছমছম ভাব যেন ঘিরে ধরল। এই দিনের বেলায়ই একঘরে বন্ধুরা একসঙ্গে থেকেও খালি মনে হচ্ছে, কে যেন আমার পিছনে দাঁড়িয়ে আছে। এ অবস্থা শুধু আমার একার নয়, বাড়িসুদ্ধু সবার।

তারপর শুনলাম, আজ বিকেলেই তিনটে নাগাদ আমরা দার্জিলিং রওনা হব। শুনে মানসিক চাপটা কিছুটা হাল্কা হল। তবু চলছি-ফিরছি, মনে হচ্ছে যে কারুর সঙ্গে যেন ধাক্কা লাগছে। পাছে বন্ধুরা আমাকে ভীতু ভাবে, তাই মনের কথা প্রকাশ করছি না। আর কতক্ষণই বা আছি এ বাড়িতে। রানাকে দেখলাম সারাক্ষণই রামকে ছুঁয়ে আছে।

দুপুরে আমরা তিনবন্ধু আর মেসোমশাই এক টেবিলের চারদিকে খেতে বসেছি। হঠাৎ টেবিলটা খুব জোরে নড়ে উঠল। যেন ভূমিকম্প হল। গ্লাস থেকে জল চলকে পড়ল। মাসিমার মুখ চিন্তায় কালো। মেসোমশাইয়ের সঙ্গে চোখে চোখে যেন কিছু একটা ভাব বিনিময় হল।

গোছগাছ শেষ। বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়াল একটা স্টেশন ওয়াগন। সবাই চড়ে বসলাম। সকলের হাতেই একটা করে গরম পোশাক। ঘণ্টাদেড়েক পরেই, অর্থাৎ কার্শিয়াং থেকেই তো গায়ে চাপাতে হবে।

মেসোমশাই আর তাঁর বন্ধু সব বন্ধ-টন্ধ করে এলেন। অনেকক্ষণ সময় লাগল ওঁদের। কি জানি কেন।

গাড়ি চলছে। আমরা সবাই নীরব। সব চাইতে বেশি মনমরা অবস্থা মাসিমার। এক একবার আমাদের এক একজনের গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন যেন এক পরম নিশ্চিন্ততায়।

এক সময় আমরা সেবক ব্রিজ পেরিয়ে শুকনা ফরেস্টের দিকে এগিয়ে চললাম। মাসিমার একটু বোধহয় তন্দ্রা মতন এসেছে। কাল সারা দিনরাত যা ধকল শরীরে আর মনের উপর দিয়ে গেছে ওঁর!

মাসিমার কান বাঁচিয়ে রানা বলল, রামের কাছে আমি সব শুনেছি। আমরা খুব বেঁচে গেছি। ওটা ভূতের বাড়ি। ওই দুই যমজ বোনকে ডাকাতরা মেরে কুয়োয় ফেলে দিয়েছিল। ওখানে আর ফিরব না আমরা। দার্জিলিং থেকে সোজা কলকাতা।

শ্রাবণ ১৪০০

অশরীরী নিবাসের কাহিনি

মীরা বালসুব্রমনিয়ন

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে ছোটমামা বললেন, বুঝলি বুলি, আমেদাবাদীদের রক্তে রক্তে ব্যবসা। সব কিছু নিয়েই ব্যবসা ফাঁদে ওরা। এমনকি ভূত নিয়েও।

ভূত নিয়ে ব্যবসা? সে আবার কী? অবাক হয়ে প্রশ্ন করি আমি।

কেন, তোদের আমি রমেশ মাডিয়ার গল্পটা বলিনি?

না তো!

তাহলে শোন। কিন্তু তার আগে আরো এক কাপ চা নিয়ে আয় দেখি—

রান্নাঘর থেকে মার গলা শোনা গেল, একটু অপেক্ষা কর বীরু। আমার রান্না হয়ে এল বলে। তারপর আমিও গিয়ে শুনব গল্পটা। চা আনছি।

আমেদাবাদ থেকে কী একটা কাজে ছোটমামা এসেছেন কলকাতায়। রাত্রে আমাদের বাড়ি খাবেন, আমরাও যথারীতি ওঁকে ঘিরে ধরেছি গল্প শুনব বলে। বাবাসুদ্ধু। খানিকবাদে মাও এসে যোগ দিলেন। আরেক পেয়ালা চা ছোটমামার হাতে দিয়ে বললেন, এবার আরম্ভ কর।

শীতের রাত। অনেকদিন বাদে হঠাৎ লোডশেডিং হয়েছে। চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। যে ঘরে আমরা বসেছি সেখানে একটা লণ্ঠন টিমটিম করে জ্বলছে। আমার ছোটভাই পিন্টু আবার একটু ভয়কাতুরে। ও আমার গা ঘেঁষে বসল। ছোটমামা গল্প শুরু করলেন—

রমেশ মাডিয়া বেশ বড় ঘরের ছেলে। ওর বাবার কাপড়ের হোলসেল ব্যবসা ছিল। উনি মারা যাওয়ার পর পৈতৃক ব্যবসা রমেশ আর তার দুই ভাইয়ের মধ্যে ভাগ হয়েছে। কিন্তু পৈতৃক ব্যবসা ছাড়াও প্রত্যেক ভাই-ই নিজেরা অন্য কোনো ব্যবসা করত। রমেশও। ভাইয়ের মধ্যে ও সবচেয়ে চালাক-চতুর—ব্যবসাবুদ্ধিও প্রচুর। তবে একটা দোষ ছিল ওর। কোনো ব্যবসাই একটানা বেশিদিন করতে ভালো লাগত না ওর। যথেষ্ট লাভ হওয়া সত্ত্বেও। কিছুদিন যদি স্ন্যাক্স বার চালাল তো তারপর খুলে বসল ভিডিও ক্যাসেট ভাড়া দেবার ব্যবসা। কিছুদিন পর সেটা গুটিয়ে হয়তো খুলে বসল একটা টাইপিং শেখানোর স্কুল।

একদিন এসে রমেশ বলল, বীরুভাই, টাইপিং স্কুলের ব্যবসা আমার আর ভালো লাগছে না। নতুন একটা কিছু করব ভাবছি। বললাম, বেশ তো, তবে নতুন ব্যবসার উদ্বোধনের নেমন্তন্নটা পাই যেন।

বুঝলি বুলি, রমেশ যে কোনো ব্যবসা শুরু করার আগে ঘটাপটা করে পুজো করবে, আত্মীয়-বন্ধুদের নেমন্তন্ন করে হয় কোল্ড ড্রিংকস কিংবা আইসক্রিম খাওয়াবে। রমেশের সঙ্গে পরিচয় হবার পর ওর তিন-তিনটে ব্যবসার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আইসক্রিম খেয়ে এসেছি।

এর কয়েকদিন পর হঠাৎ বেলা চারটে নাগাদ রমেশের ফোন এল, বীরুভাই, তৈরি থেকো, আধঘণ্টার ভেতর তোমাকে নিতে আসছি।

হাতে তখন তেমন কিছু কাজ ছিল না, তাই রমেশ আসতেই রওনা হলাম ওর স্কুটারের পেছনে বসে। নতুন কেনা স্কুটার সোঁ সোঁ করে ছুটে চলল। আমার আবার এভাবে স্কুটারের পেছনে বসে যেতে বেশ অস্বস্তি হয়। শক্ত করে রমেশের কোমর জড়িয়ে ধরে জিগ্যেস করলাম, কোথায় যাচ্ছি আমরা?

আমি একটা বাড়ি কিনেছি। সেটা দেখাতে চাই তোমাকে।

স্কুটার ততক্ষণে পুরোনো শহরের দিকে বাঁক নিয়েছে। আমি অবাক হয়ে বললাম, সবাই আজকাল বাড়ি কেনে সবরমতী নদীর ওপারে নতুন শহরে। আর তুমি বাড়ি কিনলে এই পুরোনো ঘিঞ্জি এলাকায়?

বাস করার জন্য বাড়ি কিনেছি নাকি? কিনেছি ব্যবসার জন্যে। তাছাড়া ও জায়গাটা ঘিঞ্জি নয় মোটেই। দেখলেই বুঝতে পারবে।

গোটা কয়েক আঁকাবাঁকা রাস্তা পার হয়ে একটা সরু গলিতে পৌঁছলাম আমরা। লোকজন প্রায় নেই-ই সেখানে। গলির দু'ধারের বাড়িগুলো জরাজীর্ণ, মনে হয় এখুনি ভেঙে পড়বে। আরো একটু এগিয়ে যেতেই পেলাম আমেদাবাদের বিখ্যাত সিঁড়ি কুয়ো—দাদাহারিণী ভাও। কয়েকশো বছরের পুরোনো এই সিঁড়ি কুয়োর দেয়ালে নানা কারুকার্য। অনেক বিদেশি টুরিস্ট আসে দেখতে।

সিঁড়ি কুয়ো ছাড়িয়ে আরো খানিকটা গিয়ে স্কুটার থামাল রমেশ। বলল, এসে গেছি আমরা।

অবাক হয়ে দেখলাম ডানদিকে আঙিনাওলা বেশ বড় একটা বাড়ি। অতি জরাজীর্ণ। দেয়ালের পলেস্তারা খসে ইট বার হয়ে গেছে। ছাতের কার্নিশ ভেঙে পড়েছে জায়গায় জায়গায়। আঙিনায় ঢুকলাম আমরা। সামনের বারান্দার কাঠের থামগুলোও পড়োপড়ো। বাড়ির মেন দরজাটা মোটা কাঠের—কিছু কারুকার্য করা। একটু ধাক্কা দিতেই ক্যাঁচ করে খুলে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে নাকে এল চামচিকের গন্ধ।

আমি রমেশকে বললাম, এই বাড়িতে কী বিজনেস করবে তুমি? দেখে তো এটাকে ভূতের বাড়ি বলে মনে হচ্ছে।

রমেশ উল্লসিত স্বরে বলল, মনে হচ্ছে তো? সেইজন্যই তো কিনেছি।

বুঝতে পারলাম না ব্যাপারটা।

বলছি শোন। মাস দুয়েক আগে রিডার্স ডাইজেস্ট পত্রিকায় একটা লেখা পড়েছিলাম, ইংল্যান্ডের হানাবাড়িগুলোর ওপর। তাতে বলা হয়েছে যে ইয়োরোপিয়ান ও আমেরিকান টুরিস্টদের আজকাল পুরোনো গির্জা, প্রাসাদ বা দুর্গ একঘেয়ে লাগছে। ওরা চাইছে নতুন কিছু, নতুন উত্তেজনা। তাই দলে দলে লাইন লাগাচ্ছে পুরোনো ভূতুড়ে বাড়ি দেখতে আর একটা ভৌতিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে। তা আমি ভাবছি, আমাদের দেশেও না কেন, দেশি-বিদেশি টুরিস্টদের একটু ভৌতিক অভিজ্ঞতার ব্যবস্থা করি? বিনে পয়সায় নয় অবশ্য; টিকেট কিনে ঢুকতে হবে।

একটু সন্দেহমাখা স্বরে বললাম, রমেশ, বিলেত-আমেরিকার লোকেরা হয় হুজুগে। ভূত নিয়ে নাচানাচি করতে পারে ওরা। কিন্তু আমাদের দেশের লোকেরা তো সেরকম নয়। পয়সা খরচ করে টিকিট কিনে ভূত দেখতে নাও আসতে পারে কেউ।

ঠিকমতো বিজ্ঞাপন দিতে পারলে কেন আসবে না? ইংরেজ-আমেরিকানরা আসছে এটা শুনলেই এ শহরের হঠাৎ বড়লোক হওয়ার দল পিলপিল করে আসবে। তাছাড়া আজকাল ইন্টারন্যাশন্যাল টুরিজিমের ওপর জোর দিচ্ছে সবাই। বিদেশিরা তো আসবেই।

কিন্তু ভৌতিক অভিজ্ঞতাটা হবে কী করে? বাড়িতে কি সত্যি সত্যি ভূত আছে?

দেখ বীরুভাই, ওসব ভূত-টুতে আমি বিশ্বাস করি না। তবে ভৌতিক অভিজ্ঞতা দেওয়া এমন কিছু একটা কঠিন কাজ নয়। বাড়িটা তো দেখলেই। জনাকয়েক অ্যাসিস্ট্যান্ট, একটা টেপ-রেকর্ডার, খানকয়েক টেপ, গোটাকয়েক টুনি বাল্ব আর একটা কঙ্কাল জোগাড় করলেই যথেষ্ট। দিন দশেকের মধ্যেই সব বন্দোবস্ত করে ফেলব আমি।

কিন্তু তোমার অ্যাসিস্ট্যান্টরা যদি ব্যাপারটা পাবলিকের কাছে ফাঁস করে দেয়?

তা করবে না ওরা। ওদের বেতন ছাড়াও টিকেট সেলের ওপর কমিশন দেব যে!

ঠিক বারোদিন পর রমেশ মাডিয়ার ফোন এল আমার কাছে। বীরুভাই, আমার অশরীরী নিবাস তৈরি। কাল উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। গণেশ পুজো হবে সন্ধে সাড়ে ছ'টায়। অশরীরী নিবাসের দরজা দর্শকদের জন্য খোলা হবে রাত আটটায়। একজন উপমন্ত্রী আসবেন ফিতে কাটতে। এসো কিন্তু। বড্ড ব্যস্ত আছি, তাই নিজে যেতে পারলাম না।

বললাম, ভূতের বাড়ির উদ্বোধন করছ গণেশ পুজো করে! লোকমুখে খবর পেলেও চলে যেতাম ঠিক। আসব নিশ্চয়ই।

পরদিন সকালে খবরের কাগজ খুলতেই বড়বড় হরফে লেখা বিজ্ঞাপন চোখে পড়ল—ভূতের সঙ্গে মোলাকাত করতে চান? তাহলে আসুন অশরীরী নিবাসে। রাত আটটা থেকে সাড়ে দশটা। টিকিট মাথা পিছু দশ টাকা। এরপর অশরীরী নিবাসের ঠিকানা ও পৌঁছুবার হদিস।

অফিসে সেদিন কাজের উপলক্ষে দু'চার জনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। শুনলাম সবাই বিজ্ঞাপনটা দেখেছে। সবার মনেই এক প্রশ্ন—ব্যাপারখানা কী। সবাই ভাবছে একবার গিয়ে দেখতে হবে।

শেষ মুহূর্তে একটা কাজ পড়ে যাওয়ায় আমার যেতে একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল। একখানা অটো-রিকশা নিয়ে যখন সেখানে পৌঁছলাম তখন প্রায় সাড়ে সাতটা। দেখলাম আঙিনায় বেশ ক'খানা স্কুটার, সাইকেল ও খান পাঁচেক মোটরগাড়ি। তার মধ্যে একখানায় সরকারি লেবেল আঁটা। মনে হল মন্ত্রীমশাই এসে গেছেন, কারণ আশেপাশে জনা তিনেক বন্দুকধারী গার্ড ঘোরাফেরা করছে। গেটের কাছেই পর পর দু'খানা তাঁবু গাড়া। একটা তাঁবুতে, পুজো হয়েছে, অন্য তাঁবুতে টিকিট কাউন্টার। গণেশকে একটা নমস্কার ঠুকে বেরিয়ে আসতেই একজন কেশর-পেস্তা আইসক্রিমের কাপ হাতে ধরিয়ে দিল। চারদিকে চেয়ে দেখলাম প্রায় সবার হাতেই আইসক্রিমের কাপ। রমেশের বন্দোবস্ত বেশ ভালোই। বলতে ভুলে গেছি—দুটো তাঁবুতেই ইলেকট্রিকের টেম্পোরারি কানেকশন ছিল। কিন্তু অশরীরী নিবাস একদম ঘুটঘুটে অন্ধকার। একটু দূরে দাঁড়িয়ে রমেশ একজন বেঁটে মোটা লোকের সঙ্গে কথা বলছিল। সঙ্গের লেজুড় ও বন্দুকধারী গার্ডদের দেখে বুঝলাম ইনিই উপমন্ত্রী হবেন।

আমি কাছে যেতেই রমেশ বলে উঠল, যাক, শেষ পর্যন্ত আসতে পারলে তাহলে! বীরুভাই, ইনিই আমাদের নগর-পরিকল্পনার উপমন্ত্রী গিরিশ পটেল।

মন্ত্রীমশাই একটু উসখুস করে বললেন, রমেশভাই কত দেরি—

রমেশ ওর রেডিয়াম-ডায়ালওলা হাতঘড়ি দেখে বলল, আর ঠিক দশ মিনিট স্যার। পুরুতমশাই বলেছেন ঠিক আটটায় সবচেয়ে শুভ মুহূর্ত।

তারপর সমবেত জনতার দিকে তাকিয়ে রমেশ বলল, দশ মিনিট পর ফিতেকাটা হবে। এরপর দশ দশজনের একেকটা দলকে ভেতরে নিয়ে যাবে আমাদের গাইড। তবে আপনারা সঙ্গে কোনো আলো রাখবেন না। টর্চ থাকলে কাউন্টারে জমা দেবেন। টিকেট কেটে নিন সবাই। আর হ্যাঁ, প্রথম দলে থাকবেন মন্ত্রীমশাই, তাঁর সেক্রেটারি আর গার্ডরা—তারপর আমার দিকে ফিরে বলল, আর থাকবে আমার বিশিষ্ট বন্ধু ও উৎসাহদাতা বীরুভাই।

বুঝলি বুলি, বেশ হাসি পেল আমার। আমি আবার ওকে উৎসাহ দিলাম কবে? তবে ভূমিকা যখন একটা দিয়েছে তখন তা পালন করতে হবে। তাই গম্ভীর মুখে এদিকে-ওদিকে তাকাতে লাগলাম, যেন দুনিয়ার সবাইকে উৎসাহ দেবার জন্য তৈরি হয়েই আছি। টিকিট কাটার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। রমেশ কিন্তু আমাকে টিকিট কাউন্টারে যেতে দিল না। বলল, তুমি আমার গেস্ট, তুমি আবার টিকিট কাটবে কী?

আটটা বাজতেই মন্ত্রীসহ সবাই তাঁবুর আলোর সীমানা ছাড়িয়ে অশরীরী নিবাসের অন্ধকারে এসে দাঁড়ালাম। গাইডের হাতে টর্চ। ওটা জ্বালালে দেখলাম পড়োপড়ো দুটো কাঠের থামে বাঁধা একটা লাল ফিতে। রমেশ একটা ছোট কাঁচি মন্ত্রীমশাইকে দিল আর উনিও খচ করে ফিতেটা কেটে দিলেন।

তখুনি শোনা গেল তীক্ষ্ণ শিসের মতো একটা আওয়াজ। অশরীরী নিবাসের দরজাটাও আপনা থেকেই ক্যাঁচ করে খুলে গেল। একটা দমকা ঠান্ডা হাওয়া এসে গায়ে লাগল। নাকে এল বাদুড় আর চামচিকের গন্ধ। যদিও জানতাম সমস্ত ব্যাপারটাই সাজানো—ভেতরে থাকা রমেশের কোনো সহকারী হয়তো শিস দিয়েছে ও দরজা খুলে দিয়েছে তবুও গাটা কেমন ছমছম করে উঠল।

এই সময় উপমন্ত্রী হঠাৎ বলে বসলেন, রমেশভাই, একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল, ভুলেই গিয়েছিলাম। আমাকে তো এক্ষুনি যেতে হচ্ছে।

কিন্তু আপনার ভৌতিক অভিজ্ঞতা?

আরেকদিন হবে'খন, বলে সাঙ্গোপাঙ্গদের নিয়ে তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে গেলেন মন্ত্রীমশাই। অন্যদের কান বাঁচিয়ে রমেশ আমাকে ফিসফিস করে বলল, মন্ত্রীমশাই ভয় পেয়েছেন। বুঝলে তো?

এরপর আমাকে নিয়ে দশজন দর্শকের একটা দল তৈরি হল। গাইডকে সঙ্গে নিয়ে আমরা অশরীরী নিবাসে ঢুকলাম। বলাবাহুল্য দর্শকদের কারুর হাতেই কোনো টর্চ ছিল না। গাইডের হাতে একটা টর্চ আছে বটে তবে আলো মোটেই জোরালো নয়।

ভেতরে ঢুকেই গাইডটি গম্ভীর গলায় বলল, এই বাড়িটা ছিল সুলতান মামুদ বেগড়ার দরবারের একজন বড় ওমরাহের। আপনারা যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন সেটা ছিল ওঁর জলসাঘর। এই বলে মিটমিটে টর্চের আলোটা একবার চারদিকে ঘুরিয়েই নিভিয়ে দিল। মনে হল অন্ধকার যেন আরো বেড়ে গেল তাতে। সেই ঘন অন্ধকার ভেদ করে ভেসে এল তবলার চাঁটি, আর ঘুঙুরের আওয়াজ। শোনা গেল কাচের গেলাসের ঠুনঠুন। আমাদের দলে তিনজন ভদ্রমহিলাও ছিলেন। ওঁরা তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, এ ঘরটা তো হয়ে গেল। এরপর কী আছে দেখলে হত না?

গাইড বলল, চলুন, ওমরাহের শোবার ঘরে নিয়ে যাই আপনাদের।

শোবার ঘরে যাবার আগে একটা টানা বারান্দা পার হতে হয়। আমরা বারান্দায় পা দিতেই শুনতে পেলাম ভারী পায়ের আওয়াজ।

গাইড বললে, এই ওমরাহের অনেক শত্রু ছিল তো! তাই ওঁর শোবার ঘরের সামনে সান্ত্রীরা পাহারা দিত। তাদেরই পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছেন আপনারা।

অন্য দর্শকদের কী প্রতিক্রিয়া হল জানি না, কিন্তু আমি বুঝতে পারলাম সব কিছুই টেপ-রেকর্ডারের কারসাজি।

ওমরাহের শোবার ঘরে ঢুকে ফের টর্চ জ্বালাল গাইড। মাঝারি ধরনের ঘর, দেখবার মতো কিছু নেই। কিন্তু টর্চ নেভাতেই দেখা গেল দেয়ালের গায়ে দুটো চোখ, তার থেকে লাল আলো বেরুচ্ছে। টর্চটা ফের জ্বালল গাইড, সঙ্গে সঙ্গে লাল চোখ দুটো মিলিয়ে গেল। কয়েক সেকেন্ড পর টর্চটা নেভাতেই ফের দেখা গেল লাল চোখ।

আমি যদিও বুঝে নিয়েছিলাম ওটা টুনি বাল্বের কারসাজি—দলের অন্য সবাই উসখুস করে বলে উঠলেন, এটাও তো দেখা হল। এরপর—

গাইড বলে চলল, এই অশরীরী নিবাসের প্রতিটি ইটে লুকিয়ে আছে অতৃপ্ত আত্মার কান্না—

ওর কথা শেষ হয়েছে কি হয়নি, হঠাৎ কোথায় যেন কে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। অশরীরী নিবাসের দেয়ালে দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে সে শব্দ ছড়িয়ে পড়ল সারা বাড়িতে। দলের সকলে চঞ্চল হয়ে উঠলেন। গাইড ঘর থেকে বেরুবার আগেই কয়েকজন বাড়ির বাইরে যাবার জন্য নাচঘরের দিকে পা বাড়াতেই গাইড বলে উঠল, এখনই বাইরে যাচ্ছেন কেন? আপনাদের তো আসল জায়গাটাই দেখানো হয়নি।

সেটা কোনটা? প্রশ্ন করলেন একজন।

এ বাড়ির পেছন দিকে একটা ছোট ঘর আছে। বাঁদির ঘর। শোনা যায় ওমরাহের এক বাঁদি ওখানে আত্মহত্যা করেছিল। বাঁদির সেই ঘরটিই এই অশরীরী নিবাসের প্রধান আকর্ষণ।

মনে হল দলের অনেকেই এই আসল জায়গাটা দেখতে তত উৎসুক নন। দেরি হয়ে যাচ্ছে, এতক্ষণ লাগবে ভাবিনি—ইত্যাদি মন্তব্য কানে এল। গাইড কিন্তু সেসব মন্তব্যে কান না দিয়ে এগিয়ে চলল। অগত্যা আমরাও চললাম পিছু পিছু। আরো গোটাকয়েক ঘর ও টানা বারান্দা পার হয়ে আমরা এসে বাঁদির ঘরের সামনে দাঁড়ালাম। চারদিকে কেমন একটা দমবন্ধ ভাব। সম্ভবত ঘরটা খুবই ছোট আর তাতে কোনো জানালা নেই, এজন্য।

আমরা ঘরে পা দিয়েই চমকে উঠলাম। বিকট হা-হা-হা শব্দের হাসি গায়ের রক্ত হিম করে দিল। পুরো ব্যাপারটাই সাজানো এটা জানা সত্ত্বেও আমার গায়েও কাঁটা দিয়ে উঠল।

দলের ভদ্রমহিলাদের মধ্যে একজন ভয়ার্তকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলেন, আলো জ্বালান শিগগির।

গাইড সঙ্গে সঙ্গে আলো জ্বালাল বটে, কিন্তু না জ্বাললেই বোধহয় ভালো ছিল। কারণ টর্চের

সেই টিমটিমে আলোয় আমরা দেখলাম ওপরের বরগা থেকে ঝুলে আছে একটা কঙ্কাল—বিনা হাওয়াতেই অল্প অল্প দুলছে। হাসির আওয়াজ তখনো শোনা যাচ্ছিল। এবার মনে হল কঙ্কালটাই যেন হাসছে। চক্ষুলজ্জার বালাই না রেখে দলের প্রায় সবাই 'ওরে মা রে, বাবা রে' বলে দরজার দিকে দৌড় লাগালেন। আমিও ওঁদের অনুসরণ করলাম। পেছনে গাইডটি বলতে লাগল, ভয় পাবেন না আপনারা, অশরীরী নিবাসের আত্মারা কারুর ক্ষতি করে না কখনো। কিন্তু কে শোনে ওর কথা!

বাইরে এসে দেখি আরেকদল যাবার জন্য তৈরি। আমাদের দেখে তাঁরা জিগ্যেস করতে লাগলেন, কী, কেমন দেখলেন, দশ টাকা উসুল হবে তো?

বুঝলি বুলি, যাঁরা একটু আগেই 'মা রে বাবা রে' বলে দৌড় লাগিয়েছিলেন তাঁরাই খোলা আকাশের নীচে অন্য লোকজনের সঙ্গ পেয়ে বলতে লাগলেন, নিশ্চয়। একটা ওয়ান্ডারফুল এক্সপিরিয়েন্স।

দ্বিতীয় দলে ছিল একজন মুখফোঁড় ছোকরা। প্রশ্ন করল, ভয় করেনি আপনাদের?

আমাদের দলের একজন মোটাসোটা ভদ্রলোক ভারিক্কী গলায় বললেন, জীবনে সব অভিজ্ঞতাই হওয়া দরকার, বুঝলে হে ছোকরা! ভয়ের অভিজ্ঞতাও।

আমাকে একটু দূরে ডেকে নিয়ে রমেশ জিগ্যেস করল, কী রকম দেখলে বীরুভাই?

তোমার বন্দোবস্ত চমৎকার। সহকারীরাও পারফেক্ট। সব জেনে শুনেও গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল। বিজনেস তোমার ভালোই চলবে মনে হচ্ছে। তবে বেশি ভয় পাইয়ে দিও না, তাহলে দর্শক কমে যেতে পারে।

রমেশ বলল, কঙ্কালের হাসির কথা বলছ নিশ্চয়। ভল্যুমটা একটু কম করে দিতে বলব।

বুঝলি বুলি, রমেশ মাড়িয়ার অশরীরী নিবাসের ব্যবসা বেশ ভালোই চলতে লাগল। দেখা কমই হত ওর সঙ্গে কারণ দিনের বেলা ও ব্যস্ত থাকত পৈতৃক ব্যবসায় আর সন্ধের পর অশরীরী নিবাসে। তবে ফোনে কথা হত প্রায়ই। কাগজে প্রথম দিকে বেশ ফলাও করে বিজ্ঞাপন দিলেও মাসখানেক পর লক্ষ করলাম বিজ্ঞাপন আর দেওয়া হচ্ছে না। একদিন ফোনে ওকে জিগ্যেস করায় ও বলল, বিজ্ঞাপন ছাড়াই যা লোক হচ্ছে সামাল দিতে পারছি না। তাই বিজ্ঞাপন দিয়ে আর পয়সা খরচ করছি না। রমেশ আমাকে আরেকদিন অশরীরী নিবাসে যেতে বলে জানাল, কয়েকটা নতুন জিনিস টেপ করেছি বীরুভাই। মানে ভয়েরও একটা রকমফের করতে হবে তো? হ্যাঁ, কঙ্কালের ঘরে এখন হাসির বদলে দিচ্ছি বুকফাটা কান্না। কিছুদিন পর বদলে দেব অবশ্য।

সেই সময়ে কতকগুলো অর্ডারের ব্যাপারে আমাকে আমেদাবাদের বাইরে যেতে হয়েছিল বেশ কিছুদিনের জন্য। কলকাতাতেও একবার এসেছিলাম, তোদের মনে আছে বোধহয়। আমেদাবাদ ফিরেও ব্যস্ত থাকলাম আরো কিছুদিন। এসবের জন্য অশরীরী নিবাসে আমার যাওয়া হয়নি। রমেশের খোঁজও নিতে পারিনি। ঠিক মনে নেই মাস চার-পাঁচ বোধহয় এভাবেই কেটেছিল।

কাজের বোঝা একটু কমলে ভাবছি রমেশকে একদিন ফোন করি—এমন সময় ও-ই ফোন করল আমার অফিসে। বীরুভাই, অশরীরী নিবাসের বিজনেস তুলে দিলাম।

সে কি, তুলে দিলে কেন? লাভ হচ্ছিল না?

তা নয়, লাভ বেশ ভালোই হচ্ছিল। তবে আমার খাটুনি যাচ্ছিল খুব। দিনের বেলা কাপড়ের ব্যবসা আবার সন্ধে থেকে রাত দশটা অবধি অশরীরী নিবাসে। ছুটিছাটাও নেই, কারণ ছুটির দিনেই ভূতের বাড়িতে লোক হয় বেশি। তাছাড়া নতুন আরেকটা বিজনেসের আইডিয়া মাথায় এসেছে।

বুঝলাম খাটুনি-ফাটুনি বাজে কথা। এক বিজনেস বেশিদিন করতেই পারে না রমেশ। জিগ্যেস করলাম, অতবড় বাড়িটা কিনলে, এখন বিজনেস বন্ধ করে দিলে ক্ষতি হবে না তোমার?

আরে না-না। কম্পাউন্ডসুদ্ধু বাড়িটা এক বিল্ডারের কাছে বিক্রি করেছি—বেশ মোটা লাভে। পুরোনো বাড়িটা ভেঙে ওখানে ফ্ল্যাট বাড়ি তৈরি করবে ও। হ্যাঁ, যেজন্য তোমাকে ফোন করছি। আজ সারাদিনে আমার লোকজন সব সাজ-সরঞ্জাম সরিয়ে নেবে। বিকেল নাগাদ আমি গিয়ে তালা

লাগিয়ে আসব। তুমি আসবে আমার সঙ্গে? বিজনেসের শুরুটা তোমার সঙ্গে হয়েছিল, শেষটাও না হয় তোমার সঙ্গেই হোক। আমি এসে নিয়ে যাব তোমাকে।

ঠিক আছে, আমি তৈরি থাকব, বললাম আমি।

রমেশ এল বিকেল সাড়ে ছ'টার পর। অশরীরী নিবাসে পৌঁছতে পৌঁছতে প্রায় সাতটা বাজল। তবে জানিস তো বুলি, পশ্চিম ভারতে সূর্য ডোবে দেরিতে। তাই সন্ধে সাতটা বাজলেও অন্ধকার হয়নি।

আমরা গিয়ে দেখি রমেশের লোকজন সব মালপত্র একটা অ্যামবাসাডার গাড়িতে ওঠাচ্ছে। একটা লম্বা কার্ডবোর্ডের বাক্স কোথায় ঢোকাবে ভেবে পাচ্ছিল না লোকগুলো। রমেশ ওটাকে গাড়ির মাথায় ক্যারিয়ারে নিতে বলল, তারপর আমায় জানাল, এটা সেই কঙ্কালটা।

এটা দিয়ে কী করবে এখন?

যার কাছ থেকে কিনেছিলাম তাকেই বেচে দেব, সামান্য লোকসানে অবশ্য। তারপর রমেশ ওর সহকারীদের জিগ্যেস করল, সব জিনিস মনে করে এনেছ তো? ক্যাসেট, টেপ-রেকর্ডার—

হ্যাঁ।

ঠিক আছে। তোমরা রওনা হয়ে যাও। জিনিসগুলো আমার বাংলোতে পৌঁছে দিও। আমি আর বীরুভাই তালা-টালা লাগিয়ে ফিরব। হ্যাঁ, টর্চটা দিয়ে যাও।

গাড়িটা চলে গেলে পর আমরা দুজনে ধীরে-সুস্থে অশরীরী নিবাসের বাড়িটার দিকে চললাম। মেন দরজায় তালা লাগাতে গিয়েও থেমে গেল রমেশ। বলল, চল, না হয় ভেতরটা একবার দেখেই আসি। ভূতকে 'বাই বাই' করা যাবে, কী বল।

দরজাটা রমেশ ঠেলে খুলতে যাবে এমন সময় ওটা আপনা থেকেই ক্যাঁচ করে খুলে গেল। রমেশ বলল, দ্যাখো, হাওয়ার কাণ্ড। অমন মোটা দরজাও খুলে গেল।

বুঝলি বুলি, আমি কিন্তু কোনো হাওয়ার অস্তিত্ব টের পাইনি। তবে কথা না বাড়িয়ে বললাম, চল, ভেতরে যাওয়া যাক।

প্রথমেই সেই বড় হলঘরটা। বললাম, এটাকেই তো তোমরা জলসাঘর বলতে, না?

আমরা বলতাম মানে? রমেশ প্রতিবাদের স্বরে বলল, এই অশরীরী নিবাসের ইতিহাস জোগাড় করতে আমাকে কত পুরোনো পুঁথিপত্র ঘাঁটতে হয়েছে জানো! প্রায় রিসার্চের মতো। এ বাড়িটা সত্যিই সুলতান মামুদ বেগড়ার একজন ওমরাহের ছিল। এটা সত্যিই ওনার জলসাঘর। ওপরের ভাঙা ঝাড়লণ্ঠন দেখলেই তা বুঝতে পারবে। এই বলে টর্চটা একবার ওপরের দিকে ঘোরাতেই দেখলাম রমেশের কথাই ঠিক।

তাছাড়া, রমেশ ফের শুরু করল, এই ওমরাহের একজন বাঁদি সত্যি সত্যিই গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছিল। ভৌতিক ব্যাপারটা আমার বানানো হতে পারে, ইতিহাসটা নয়।

শোবার ঘরে যাবার টানা বারান্দায় এলাম আমরা। জানিস বুলি, আমার যেন মনে হল আমাদের দুজনের জুতোর শব্দ ছাড়াও আরো একজোড়া জুতোর আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। তবে ওটা আমার মনের ভুলও হতে পারে।

শোবার ঘরে ঢুকতেই দেখি দুটো টুনি বাল্বের লাল আলো জ্বলছে আর নিভছে। রমেশ বিরক্ত হয়ে বলল, নাঃ, আজকাল কাউকে কোনো কাজের ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হবার জো নেই। বারে বারে বলেছি সব বাল্ব খুলে নিয়ে যেতে, তাও ফেলে গেছে!

বললাম, খালি বাল্ব নয়, কানেকশন তার, সুইচ এসবও রয়ে গেছে নিশ্চয়।

রমেশ বলল, একটু টর্চটা দেখাও তো বীরুভাই। বাল্ব দুটো খুলে নিই।

কিন্তু অবাক কাণ্ড! টর্চ জ্বালিয়েও কোথাও টুনি বাল্বের দেখা পেলাম না। ঘরের দেওয়ালে প্লাস্টার না থাকায় এখান-ওখান থেকে ইট খসে পড়ে ফোকর তৈরি হয়েছে গোটা কয়েক। হয়তো বাল্বগুলো ওখানেই কোথাও লুকানো। রমেশ বলল, অত খোঁজার সময় নেই। যেতে দাও, দুটো টুনি বাল্বই তো।

আবার আমরা এলাম বারান্দায়। এবারও আমার মনে হল আমাদের দুজনের জুতোর আওয়াজ

ছাড়াও তৃতীয় এক জোড়া জুতোর আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। হঠাৎ গা-টা কেমন ছমছম করে উঠল। রমেশকে বললাম, দেখা তো হল, চল এখন বাইরে গিয়ে মেন দরজায় তালা দিয়ে দিই।

রমেশ শুনল না, বলল, কঙ্কালের ঘরটা শেষমেশ একবার দেখে যাই চল। কে জানে হতভাগারা ওখানেও কিছু রেখে গেছে কিনা।

টর্চ জ্বালিয়েই চলছিলাম আমরা, তবু আমার গা-ছমছমানি ভাবটা গেল না। বরঞ্চ কঙ্কালের ঘরের দিকে যত এগুতে লাগলাম ততই বাড়তে লাগল। রমেশও বুঝতে পারলাম—কেমন চুপ মেরে গেছে। তবে ও-ও কি অস্বাভাবিক কিছু উপলব্ধি করেছে!

কঙ্কালের ঘরের দরজায় এসে রমেশ টর্চের আলো ভেতরে ফেলতে নিজের অজান্তেই চেঁচিয়ে উঠলাম আমি। ঘরে ঝুলন্ত একটা কঙ্কাল—আগের মতোই অল্প অল্প দুলছে।

রমেশ বলল, আমাদের কঙ্কালটা তো বাক্সবন্দী করে বাড়ি পাঠিয়ে দিলাম, এটা আবার কোথা থেকে এল? তবে কি অশরীরী নিবাসে সত্যি ভূত আছে? শেষের দিকে গলাটা কেঁপে গেল একটু।

ওর কথা শেষ হতে না হতেই কান-ফাটানো হাসির শব্দ—হা-হা-হা! এত জোরে যা কোনো টেপ-রেকর্ডারের ফুল ভল্যুমেও সম্ভব নয়। সেই হাসি যেন আমাদের তাড়া করে এল। আমরাও পড়িমরি করে দৌড় লাগালাম। এবার স্পষ্ট শুনলাম আমাদের জুতোর আওয়াজের পেছনে আরেক জোড়া জুতোর আওয়াজ ছুটে আসছে।

হলঘরে পৌঁছে প্রায় একলাফে বাইরে বারান্দায় চলে এলাম আমরা। রমেশ জোরে টেনে দরজাটা বন্ধ করে তালা লাগিয়ে দিল। তারপর স্কুটারে উঠে বসতেই জোরে চালিয়ে দিল স্কুটারটা।

ছোটমামা থামলেন। পিন্টু চিঁচিঁ করে বলল, অশরীরী নিবাসে তাহলে সত্যি সত্যি ভূত ছিল ছোটমামা।

ছোটমামা একটু বিরক্তির সুরে বললেন, কতদিন বলেছি অত প্রশ্ন করলে গল্প বলতে পারব না আমি।

ঠিক তখুনি ঘরের আলোগুলো দপ করে জ্বলে উঠল। ছোটমামা মাকে বললেন, কই ছোড়দি, খাবার দেবে নাকি? খিদে পেয়ে গেছে।

—

ভাদ্র ১৪০২

ইম্ফলের ফৌজি গাড়ি এবং অনুপমদা

ডাঃ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী

ইম্ফল। লিরিক মেমোরিয়াল হাসপাতালের গেস্টরুম।

সেদিন হাড়কাঁপানো শীত। সেই সকাল থেকেই জবুথবু হয়ে বসে আমরা চারজন। আমি, ব্রজবিধু, অভয় ও মিহির। সবাই ডাক্তার। ব্রজবিধু, অভয় মণিপুরের ছেলে, আমি কলকাতার, মিহির শিলচরের। একসঙ্গে সবার পড়াশুনা। কনফারেন্সে এসে বছর কুড়ি পর দেখা, কেউ কাউকে চিনতে পারিনি। এখানকার মেডিক্যাল কলেজের সার্জেন প্রফেসার শিবনাথও আমাদের ব্যাচের ছেলে, কলকাতায় শ্বশুরবাড়ি। ওর সঙ্গে প্রায়ই দেখা হয়। শিবনাথই চিনিয়ে দিল আর জানতে পেরে ব্রজবিধু টানতে টানতে নিয়ে এসেছে ওর এই লিরিক হাসপাতালে। ব্রজবিধু এদিককার নামকরা ডাক্তার। গরিবগুর্বোদের চিকিৎসায় নিবেদিত প্রাণ। যে যা দেয় তাই নেয়। আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি তবু ভ্রূক্ষেপ নেই। উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া অগাধ সম্পত্তির মালিক, এদিককার রাজা বললেও চলে—পুষিয়ে যায়।

মিহির এখন থাকে কানাডায়। ও হল এক্স ফৌজি। এক সময় ছিল কর্নেল মিহির দাস। এখন সেই আর্মিমার্কা মোচড়ানো গোঁফটাই শুধু আছে। কোথায় সেই ইস্পাত-কঠিন চেহারা, এখন রীতিমতো মোটা। তবে মনের জোর সাঙ্ঘাতিক। অভয় কাবুই থাকে দিল্লিতে। মোহনবাগানে খেলত এক সময়। আমরা বলতাম অভয় মোহনবাগান। সে এখন দিল্লির বড় ডাক্তার। রোগা ফড়িংমার্কা চেহারা ছিল ব্রজবিধুর—এখন টকটকে ফর্সা রঙ আর কালো মোটা ফ্রেমের চশমায় ভারিক্কি চেহারা। ফিল্মস্টার ড্যানির ডুপ্লিকেট। ভীষণ গম্ভীর। কথা বলতে ভয় হয়। এত বড় নার্সিংহোম চালায়, এরকম চেহারাই মানায়। আর আমি? সুমিত্র, চিরকাল হাড় জিরজিরেই রয়ে গেলাম। সেই ছোটবেলা থেকেই বাতে ভুগি। বেতো সুমি বলেই সবাই ডাকে। আমরা কবে ডাক্তারি পাশ করেছি ভুলেই গেছি যেন। অনেকদিন পর দেখা হলে যা হয়—হৈচৈ, আড্ডা আর পুরোনো সব কথা। গেস্টরুম জমজমাট।

ফৌজি মিহির বলে উঠল, এখানেই উড়েছিল স্বাধীন ভারতের পতাকা, নেতাজির আজাদ হিন্দ ফৌজ পা রেখেছিল ময়রাং-এ। মাত্র তিরিশ কিলোমিটার দূরে। পাশেই 'লোকটাক' লেক। ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় মিষ্টি জলের লেক—চল্লিশ স্কোয়ার কি. মি.। সামনের ঝকঝকে রাস্তা ধরে ছোট্ট শহর 'নামবল' পেরিয়ে বিষেণপুর ছুঁয়ে কিছুদূর গেলেই ময়রাং, ওখানেই আই. এন. এ. মেমোরিয়াল।

একটু থামল মিহির, চোখ দুটো জ্বলে উঠল, এতদূর এসে ময়রাং যাব না তা হয় নাকি! এখন মাত্র তিনটে বাজে, ঘণ্টা দুয়েকের ভেতরই ফিরে আসব। আমার কতদিনের স্বপ্ন ময়রাং-এর আই. এন. এ. মেমোরিয়াল দেখার...

আমরা চুপ করে ছিলাম। গেস্টরুমে বসে শীতে প্রায় জমে যাচ্ছি। রুম হিটার জ্বলছে, তবু কী ঠান্ডা। বাইরে হাওয়া বইছে—সেই সঙ্গে বৃষ্টি। থামবার লক্ষণই নেই। পথঘাট শুনশান। আমি চিরকালই শীতকাতুরে। এখানে তো কথা বলতে গেলেই দাঁতের ঠকঠকানি। বাতের কামড়টাও বেশি বেড়েছে। মিনমিন করে উঠলাম, ভাই মিহির, ক্ষ্যাপামি ছাড়। বাইরে বেরোলে আর দেখতে হচ্ছে না, ব্রংকাইটিস, নিমুনিয়া অ্যান্ড হোয়াট নট।

ধমক দিয়ে উঠল মিহির, কিছুদিন আর্মিতে থাকলে এসব কথা বলতিস না। জানি ওয়েদার খারাপ পাহাড় অঞ্চলে—আই মিন এনটায়ার রিজিয়ান। এখানে বাতাসে সবসময়ই বারুদের গন্ধ, উগ্রপন্থীদের চোরাগোপ্তা আক্রমণ—সো হোয়াট। উই মাস্ট গো—তিনদিন ধরে ওয়েট করছি, ওয়েদার একরকমই।

কালই আমাদের ফেরার কথা। আমি দিল্লি হয়ে কানাডা। অভয় কাবুই, বিধু এদিককারই ছেলে। ওরা অনেকবার ও জায়গায় গেছে। আমাদের জীবনে হয়তো আর আসাই হবে না—এদ্দূর এসেও যাব না?

বিধু ফ্লাস্ক থেকে কাপে চা ঢালছিল। মিহির গলায় মাফলার জড়াতে জড়াতে গুনগুনিয়ে উঠছিল, তাল দিচ্ছিল পা ঠুকে ঠুকে—সেই গান—কদম কদম বাড়ায়ে যা, খুশিকা গীত গাহে যা...

নার্সিংহোমের বড় বড় গাছগুলোর মাথায় গোঁ গোঁ করে উঠছিল বাতাস। আকাশ চিরে আলোর ঝলক, বাজের শব্দে, মেঘের ডাকে, বৃষ্টির সঙ্গে কেমন এক অদ্ভুত পরিবেশ। বাইরে আঁধার নামছে দ্রুত।

সিগ্রেটটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে চায়ের চাপ হাতে মিহির ধমকে উঠল, কীরে! সবাই চুপ করে কেন? এই সুমিত্র, আর মোহনবাগানের ময়দান কাঁপানো অভয়, গরিববন্ধু 'ড্যানি' ব্রজবিধু—ওয়েদার দেখে সবাই ফিউজ মনে হচ্ছে—চোরাগোপ্তা আক্রমণের ভয়? সব কাওয়ার্ডের দল। নার্সিংহোমের জিপটা রয়েছে—এই বেতো সুমি, তুই কোনোদিন ওদিকে যাসনি, আমিও না। বিধু, অভয় ওরা না গেল। তুই চল।

ব্রজবিধু বলল, না-না, ভেরি ব্যাড ওয়েদার—গাড়ি ওল্টাতে কতক্ষণ? বরঞ্চ কাল আর্লি মর্নিং-এ চল—টিভির ফোরকাস্টে বলেছে আজ শেষ রাত থেকেই বৃষ্টি থামবে, ওয়েদার উইল ইমপ্রুভ।

ভেংচে উঠল মিহির, ওয়েদার উইল ইমপ্রুভ! ঘোড়ার ডিম। তা না হয় হল কিন্তু অনুপমদার কাছে মুখ দেখাবি কি করে! অনুপমদা সেই লেকের ধারে আমাদের জন্য ঠিক চারটে থেকে সাড়ে চারটে পর্যন্ত ওয়েট করবে। এখন বেরিয়ে গেলে চারটের ভেতর পৌঁছে যাব। সকালেই টেলিফোন করেছিল অনুপমদা। সে কথা এখন কারো মনে নেই। তাই না?

মিহিরের কথায় অনুপমদার কথা মনে পড়ল আবার। মেজর জেনারেল অনুপম বন্দ্যোপাধ্যায়। কলেজ জীবনে আমাদের সিনিয়র—পাশ করেই আর্মিতে। এখন সর্বোচ্চ পদে—পুরো ইস্টার্ন কমান্ডের আর্মি মেডিক্যাল কোরের ভারপ্রাপ্ত অফিসার। হ্যাঁ, ভোরেই ফোন করেছিল অনুপমদা। আমি ধরেছিলাম। আমরা চারজন এই লিরিক নার্সিংহোমের গেস্ট হাউসে রয়েছি। কী করে জানল? অবাকই হয়ে গেছলাম বলতে গেলে। বছর দুয়েক আগে দেখা হয়েছিল কলেজ রিইউনিয়নে। অনেক বছর পর সেই মাত্র একবার। আমাকে দেখে অনুপমদার কী হাসি, বাত ব্যথায় কাতর। তোর চুল সাদা—মাই গুডনেস। রোজ সকালে ঘণ্টাখানেক দৌড়োবি—তারপর এক বাটি ছোলা, গুড় আর আদা। মাসখানেক পরে তোর বাত-টাত সব হাওয়া। চুল তো আর ভাই কালো হবার নয়, তবে দেখবি জেল্লার ঝিলিক। নিজেই বেতো রুগি—তুই করবি অন্যদের চিকিৎসা! হা হা।

অনুপমদাকে দেখে খুব হিংসে হত আমার। ঝকঝকে অলিভগ্রিন ফৌজি ড্রেসে দারুণ দেখাত। সবসময়ই কেমন যেন বীর বীর ভাব। আমার তো আর্মিতে যাবারই কথা।—শেষ মুহূর্তে সব বানচাল। বাবা হঠাৎ মারা গেলেন। ছোট ছোট সব ভাইবোন, বিধবা মা। বাইরে বাইরে থাকলে এদের দেখবে কে? তাই কলকাতায় পড়ে রইলাম। সরকারি চাকরি—ডাক্তারি। তবু আর্মিতে জয়েন না করার দুঃখ রয়েই গেছে। কলেজ এন. সি. সি.-তে ছিলাম টানা পাঁচ বছর। পর পর দু'বার বেস্ট ক্যাডেট পুরস্কার—'বি' সার্টিফিকেট পাশ করা ছেলে আমি। এই ঠান্ডায় সে সব কথা ভেবে মনটা হুহু করে উঠছিল।

ডাঃ মিহির দাস বলছিল, এই ঠান্ডায় ময়রাং-এর কাছে লেকের ধারে ওয়েট করছে অনুপমদা—কথা শেষ হবার আগে টেলিফোন বাজল। লাফ দিয়ে উঠল মিহির, নিশ্চয়ই অনুপমদা। মেজর জেনারেল এ. পি.—হ্যালো ইয়েস, কী বললেন নো ডেঞ্জার—দাদা আমি এক্স ফৌজি, আর্মিতে ছিলাম, ভয়-ডর আমার নেই, বেতো সুমিত্র ঝামেলা পাকাচ্ছে, অভয়, বিধু এখানকারই ছেলে। ওয়েদার দেখে নার্ভাস—জানে না টানা একবছর লাদাকে পোস্টিং ছিল আমার—হ্যালো হ্যালো।

ধেৎ ফোনটা কেটে গেল। কত কষ্ট করে আর্মির ইনটেলিজেন্স লাইনে ফোন করল অনুপমদা, হি ইজ ওয়েটিং দেয়ার—আর আমরা সবাই ঝিমুচ্ছি বসে বসে। ভাবতেও লজ্জা হয়।

ফোনে অনুপমদার কথায় কেমন যেন একটা উদ্দীপনা ফিরে পেলাম। হটওয়াটার ব্যাগ হাঁটু

থেকে সরিয়ে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম—সাদা চুল আর দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললাম, এই বিধু, তোর গরম ওভারকোট আর লেদার জ্যাকেটটা দে—মাফলার টুপি তো রয়েছে—আই মাস্ট গো।

এমন সময় বাজ পড়ল। বৃষ্টি নামল ঝমঝমিয়ে। আকাশ কালো। নিস্তব্ধ চরাচর। নার্সিংহোমের কুকুর দুটো রক্ত হিম করা গলায় হঠাৎই ডেকে উঠল। হিংস্র ডোভারম্যান। এখানকার অতন্দ্র প্রহরী। বিধু পরদা সরিয়ে বাইরের দিকে তাকাল—আমরাও। হ্যাঁ ঝড়-জলের মধ্যে নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়েছে একটা জিপ।

হাততালি দিয়ে উঠল মিহির, আর্মি ভেহিকল। অনুপমদা নিশ্চয়ই পাঠিয়েছে—তোরা যা ইচ্ছে কর, আমি চললাম। বলতে বলতে জিনস প্যান্ট আর শার্টের ওপর শীতের জ্যাকেট গায়ে দিয়ে পায়ে জুতো গলিয়ে রেডি মিহির। এই নিয়ে দু'বার ফোন করলেন জেনারেল সাব। সেই সকালে আর এখন। প্রথম দিকে যখন লাদাকে ফরোয়ার্ড এরিয়ায় পোস্টিং তখন অনুপমদা ওখানকার ও. সি.। হঠাৎ ট্রান্সফার অর্ডার, এদিকে নেফায়—নর্থ ইস্ট ফ্রন্টিয়ারে পোস্টিং পেয়ে অনুপমদা দারুণ খুশি—যাক নেতাজির জায়গাটা দেখা যাবে—ইট্‌স আ রেয়ার চান্স। বলেছিল, মন খারাপ করিস না মিহির, তোকেও সুযোগ পেলে ওদিকে নিয়ে যাব। দীর্ঘশ্বাস ফেলে মিহির, আর সুযোগ! ওপরঅলার সঙ্গে খিটিমিটি বাধতে প্রি-ম্যাচুওর রিটায়ারমেন্ট নিয়ে চলে গেলাম বিলেতে। কিন্তু দ্যাখ—ঠিকই কথাটা মনে রেখেছে অনুপমদা—এত বছর পরেও ভোলেনি। জায়গাটা আমাকে দেখাবেই—মেজর জেনারেল এ. পি.-এর আর্মির ইনটেলিজেন্স নেটওয়ার্কে আমাদের খবর বের করেছে। অবাক কাণ্ড। এরই মধ্যে দু'বার ফোন আজকে।

কথা ঢাকা পড়ে গেল একটা তীব্র আওয়াজে। ধাতব কণ্ঠস্বর। যেন এক বাচ্চা ছেলের কান্না, আমরা চমকে উঠলাম। মণিপুরের বিধু আর অভয় হো হো করে হেসে উঠল, ঘাবড়াস না, এদিককার এক পাখি। রাত্তিরে ডাকে মাঝে মাঝে। অমঙ্গলের চিহ্ন।

বাইরে জিপের হর্নের শব্দ—মাথার টুপিটা আরো টেনে বসাল মিহির। বলল, না, আর দেরি নয়। বিধু, তুই কী যেন বললি—অমঙ্গল, ব্যাড সাইন-টাইন—পাখির গলায় বাচ্চার আর্তনাদ—যত্তো সব কুসংস্কার। আমি আবার ব্যাড সাইন ভালোবাসি—দেখতে চাই ব্যাড না গুড। আই ডোন্ট কেয়ার অ্যান্ড মাইন্ড।

দূরের পাহাড়গুলো এখন আর দেখা যাচ্ছে না। বৃষ্টির তেজ একটু কম। রাস্তাঘাট ভিজে সপসপে—নির্জন। মাঝে মাঝে ছুটে যাচ্ছে টহলদার পুলিশের গাড়ি। পাহাড়ের আবহাওয়া যেমন হয়। এই রোদ এই বৃষ্টি। কিন্তু এই জলঝড়ে শেষ দুপুরে আঁধার ঘনিয়ে আসছে দ্রুত। পাহাড়ে সন্ধ্যা এমনিতেই নামে তাড়াতাড়ি। শেষ বিকেলেই নিভে আসে আলো।

জানালার পর্দা সরিয়ে রাস্তার দিকে তাকাল মিহির। ঐ তো জিপটা—চালকের আসনে ঢেউখেলানো টুপি আর কম্যান্ডো ড্রেসে বসে আছে—নিশ্চয়ই অনুপমদা। চিরকাল সারপ্রাইজ দেবার স্বভাব। এখনও সেটা গেল না....আমরাও তাকালাম।

লাইট-পোস্টের নিভু নিভু আলোয় রাস্তায় আবছা অন্ধকারে ঠিক বুঝতে পারলাম না। কাচের শার্সি বেয়ে জল নামছিল গড়িয়ে গড়িয়ে।

মিহির ছটফট করে উঠল, এই বেতো সুমিত্র, তোর গিয়ে কাজ নেই, হাঁটুর চাকা জ্যাম—এমনিতেই বাতের রোগি। আই মাস্ট সি দ্য প্লেস অ্যান্ড অনুপমদা।

অভয় কাবুই ফুট কাটল—নীচে অনুপমদাকে একটা ম্যাসেজ পাঠালেই হয়—এই ওয়েদার, বলতে বলতে গায়ের শালটা ভালো করে জড়াল, দুঃখ করার কিছু নেই, ঐ ময়রাং-এর ছবি নার্সিংহোমের নীচে বড় করে টাঙানো আছে—ওটা দেখলেই দেখা হয়ে গেল।

বিধু ড্যানির গলা নকল করে সিনেমার সেই ডায়লগ ছাড়ল—চাই না আমার সোনার নকল চাঁপা, আসল চাঁপা পেলে। নকল ছবিতে কী আসল জায়গার স্বাদ পাওয়া যায়? সিগ্রেটে টান দিল, চোখ দুটো বুজে রইল কিছুক্ষণ। ডুব দিয়েছে যেন মনের ভেতর মনে—সেই কুড়ি বছর

আগেকার বিধু। ভাবুক কবি, আমরা বলতাম ফিলোজফার, পাগল। হ্যাঁ, পাগল তো বটেই—তা না হলে এমন জায়গায় নার্সিংহোম করে! মনে হয় ফাইভ স্টার হোটেল—ঝাঁ-চকচকে চেহারা। মার্বেল প্যালেস। বিলেত থেকে তুলে এনে বসিয়ে দিয়েছে যেন—পাহাড় অঞ্চলে পৌঁছে দিয়েছে উন্নত চিকিৎসা।

এমন সময় সিস্টার এসে দাঁড়ালেন, মণিপুরের ভাষায় কী বলছিলেন বুঝলাম না। বিধু ঘড়ি দেখে উঠে দাঁড়াল—বাইরের দিকে তাকিয়ে কণ্ঠে হতাশা, কত চেষ্টা করেছি, এখানে ডাক্তার থাকতে চায় না, প্রফেসর প্রসাদ—আই মিন শিবনাথ ওর হাউস সার্জেনকে মাঝে মাঝে হেল্প করতে পাঠায়। আজ মস্ত বড় অপারেশন, ও. টি. রেডি—কিন্তু এই বৃষ্টিই ঝামেলা বাধাল। জুনিয়ার ডাক্তারের পাত্তা নেই। অপারেশন একা করা যায় না—হেল্পিং হ্যান্ড দরকার। এই অভয় মোহনবাগান, তুই চল একটু হেল্প করবি। প্রফেসর প্রসাদ নিশ্চয় এসে পড়বেন—এটা ওঁর কেস। আত্মীয়।

হঠাৎ লাইট নিভে গেল। চারদিকে অন্ধকার। আমরা কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছিলাম না। জ্বলে উঠল এমার্জেন্সি লাইট। মিহির কোথায় গেল? মিহির? উবে গেল নাকি? আশ্চর্য! আবার সেই পাখির গলায় বাচ্চার কান্না। আঁধার চিরে কেমন এক ভয়ের স্রোত। নীচে চিৎকার করে উঠল কুকুর দুটো।

বিধু বলল, সুমিত্র, তোর বাতের শরীর, ঘরেই থাক। চল অভয়, এখুনি জেনারেটারে আলো জ্বলবে—ও. টি.-তে নেমে যাই। মিহিরটা সত্যিই অদ্ভুত—এখনও ক্ষ্যাপা। নিশ্চয়ই নীচে নেমে গেছে। বলতে বলতে লম্বা সাত ব্যাটারির টর্চের আলো বাইরের দিকে ফেলল, হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই তো মনে হচ্ছে জিপটা, মিহির হাত নাড়ছে—আঁধার ফুঁড়ে নীচ থেকে মিহিরের কণ্ঠস্বর ভেসে এল—ইয়েস, অনুপমদা ভোলেনি, কথা রেখেছে—গাড়িতেই বসে। উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট।

গাড়ির আওয়াজ শুনতে পেলাম আমরা, জিপটা মনে হল বেরিয়ে গেল। দুরন্ত গতিতে হাওয়া। হেডলাইট জ্বলছিল না। আমি বললাম, ফৌজিদের একরকমের নাইট ভিশন চশমা থাকে, রাত্তিরে সব দেখা যায় দিনের মতো। মাউন্টেন ডিভিশনে ছিল অনুপমদা, পরনে নিশ্চয়ই বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট, হাতে গ্লাভস আর চশমা—

আর ঠিক তখনই হেডলাইটের আলোয় আঁধার সরিয়ে এসে দাঁড়াল একটা মারুতি গাড়ি, বিধু বলল, যাক্ চিন্তা নেই—শিবনাথ এসে গেছে—এখন ডিরেক্ট ও. টি.-তে যাবে। চল অভয় চল, আমরা এগোই।

কিন্তু আবার সেই পাখির আর্তনাদ—ধাতব কণ্ঠস্বরের কান্না, চিন্তার রেখা ফুটল বিধুর কপালে, ভালো লাগছে না রে, আমরা এই অঞ্চলে এই পাখির ডাক খুব মানি। বাঘের আগে যেমন ফেউ-এর ডাক—তেমনি এই আওয়াজ বিপদসঙ্কেত। মিহির না গেলেই ভালো করত, এখন ভালোয় ভালোয় ফিরে এলে বাঁচি। বড় শ্বাস ফেলল, লেট আস প্রে ফর হিম।

বিধুর কথায় কেমন যেন এক অস্বস্তিকর নীরবতার ঘেরাটোপ চারদিকে। ও বড় বড় শ্বাস ফেলে হাঁফাচ্ছিল। মোহনবাগানের প্লেয়ার অভয় তাড়া দিল, তুই এখনও দেখি ভাবুক—অল্পতেই ঘাবড়ে যাস, অনুপমদা সঙ্গে আছে—ভয় কী! চল চল, অপারেশন শুরু করি—এই সুমিত্র, তুই হটব্যাগ হাঁটু আর কোমরে লাগা, ব্যথা কমবে।

অপারেশন শেষ হতে হতে ছ'টা। বাইরে ঝোড়ো হাওয়ার তাণ্ডব। বিশ্রী ওয়েদার। আলো ফিরে এসেছে, তবে টিমটিমে। রাস্তার পোস্টে আলো নেই। নিকষ কালো অন্ধকার—ঠান্ডাটা জাঁকিয়ে নামছে। হাড়-হিম শীতে কাঁপুনি ধরছে বারবার। বাইরে ঝিঁঝিঁর ডাক। নীচের অফিসের জানালা বোধহয় খোলা। বাতাসের দাপটে বন্ধ হচ্ছে, খুলছে বারবার—শার্সির ঝনঝনে আওয়াজ। বাজ চমকালো, কাচ ভাঙার আওয়াজ পেলাম। আবার সেই রাত-পাখির আর্তনাদ, ডোভারম্যানের চিৎকার। কেমন যেন ভয় ভয় ভাব। আমি চমকে উঠছিলাম বার বার। মিহিরের এতক্ষণে ফিরে আসার কথা। অনেকক্ষণ হয়ে গেছে বেরিয়েছে।

'এই শালা বেতো—চুপচাপ শুয়ে, ওরা সবাই কোথায়?' হঠাৎ মিহিরের গলায় স্বস্তি ফিরে পেলাম, ভিজে গেছে মিহির, বলল—দারুণ চান্স মিস্ করলি। গেলি না, আরে অনুপমদা সঙ্গে ছিল—এরকম সুযোগ জীবনে একবারই আসে। মাথার টুপিটা চেয়ারে ছুঁড়ে ফেলে বিছানায় গা এলিয়ে দিল। লেদার জ্যাকেট খুলে ফেলল।

বলল—দেরি হল কেন জানিস। অনুপমদা ওখানেই রয়ে গেল, আমি ড্রাইভ করে জিপটা নিয়ে এলাম। সঙ্গে আর্মি কার ছিল—পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছে আগে আগে। মাঝখানে রাস্তা হারিয়ে একটু যা দেরি—, এই বেতো, লেপ-কম্বল সরিয়ে উঠে বস। বলেই বাইরের দিকে তাকাল, আশ্চর্য তো, জিপটা কোথায় গেল? ওটা তো গেটের বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেছিলাম। অনুপমদা বলে দিয়েছে, এখানকার আর্মি হেডকোয়ার্টারে শিবনাথকে খবর দিতে। ওরা জিপটা নিয়ে যাবে।

বললাম, গুল মারার জায়গা পাস না, অনুপমদা তোকে নামিয়ে দিয়ে গেছে? ফুটানি অন্য জায়গায় দেখাস। অনেকদিন আর্মি ছেড়েছিস—এখনও ওদের জিপ চালাতে পারিস, মেশিনগান, স্টেনগান সব তোর হাতে কথা বলে—থলথলে শরীরেও ফিট—অতখানি রাস্তায় লম্বা ড্রাইভ—

বাইরে তাকিয়ে আছে মিহির, কথা বলছে না। কি যেন ভাবছে—সত্যি বিশ্বাস কর, অনুপমদা আমায় নিয়ে গেছল, ড্রাইভ করে আমি একাই ফিরেছি—কিন্তু জিপটা আশ্চর্য, হাওয়া হয়ে গেল!

আমি হাসলাম, পি. সি. সরকার এখন নতুন ম্যাজিক দেখাচ্ছেন জানিস না। কলকাতায় বসে পৃথিবীর যে কোনো জায়গার গাড়ি-টাড়ি হাওয়া করে দিতে পারেন, ইচ্ছে করলে এই নার্সিংহোমটাও।

কথার উত্তর দিল না মিহির—কেমন যেন এক বোবা দৃষ্টি।

শিবনাথ, বিধু অভয় ফিরে এল একটু পরেই। বিধু বলল, কতক্ষণ ফিরেছিস? আমরা নীচে অপারেশনে ব্যস্ত ছিলাম। খুব চিন্তা হচ্ছিল তোর জন্য। ফ্লাস্ক থেকে চা ঢেলে কাপ এগিয়ে দিল ব্রজবিধু।

মিহির বলল, জিপে ফিরেছি, অনুপমদা বলেছে আর্মি হেডকোয়ার্টারে শিবনাথকে খবর দিতে, কিন্তু জিপটা ঐ রাস্তায় ছিল—গেটটার সামনে। গেল কোথায়?

শিবনাথ অবাক—আর্মি হেডকোয়ার্টার? কিন্তু কেন?

প্রফেসর শিবনাথ কিছুই জানত না। গাড়ি থেকে নেমে সোজা ঢুকে গেছল ও. টি.-তে। খুব ডিফিকাল্ট কেস, অপারেশন করতে সময় নিয়েছে বেশি। এতক্ষণে ফুরসত পেল যেন—চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে সব শুনল। মেজর জেনারেল এ পি—ময়রাং—জিপ এসব। হাসল, দ্যাখ মিহির, এপিদা এখানে আসবে, আমাদের সঙ্গে দেখা হবে না—ইমপসিবল। তোর ওই স্বভাব, কথায় কথায় গুল মারার হ্যাবিট গেল না। কত বছর আগে এপিদা তোকে কথা দিয়েছিল তা যেন এখনও ওঁর মনে আছে। দাম বাড়াচ্ছিস নিজের তাই না? নিশ্চয়ই কাছাকাছি এয়ারপোর্টে সময়-টময় কাটিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ফিরে এসেছিস। গুল মারবি ভালো করে মার—ধরা পড়ে যাস বার বার। যত্তো সব ইয়ে—

মিহির জ্বলে উঠল—হ্যাঁ, অনুপমদা এসেছিল। সময় অভাব, তাই নামেনি। জিপ আমি ড্রাইভ করে নিয়ে এলাম। অনুপমদা এখন এই ফরোয়ার্ড এরিয়া ভিজিটে রয়েছে। যা বলছি তা কর না—তোর তো এদিকে খুব জানাশোনা। এখানকার আর্মি হেডকোয়ার্টারে ফোন করলে সব জানতে পারবি। জিপটা ওদের নিয়ে যাবার কথা, আশ্চর্য, দেখতে পাচ্ছি না। বোধহয় নিয়ে গেছে এর মধ্যেই।

শিবনাথ হো হো করে হেসে উঠল, বেশ, ব্রিগেডিয়ার সিং আমার জানাশোনা। ফোনে কন্টাক্ট করছি। সোফায় হেলান দিয়ে বসে টেলিফোন ধরল।

অনেকক্ষণ ধরে কি কথা হচ্ছিল—ভাষাটা মণিপুরি, ঠিক বুঝলাম না। ফোনের মাউথপিসে হাত চেপে বলল, না, এপিদা আসেনি—কিন্তু কিন্তু, মিহির তুই ঠিক বলছিস অনুপমদার সঙ্গে দেখা হয়েছিল? অদ্ভুত গলা শিবনাথের। আশ্চর্য! নেশা-টেশা করিসনি তো! ওসব অভ্যাস আগে তোর ছিল না—কবে থেকে ধরলি?

নেশা!—ক্ষেপে গেল মিহির, হোয়াট ডু ইউ মিন! কথাটা কানে ঢুকছিল না যেন শিবনাথের, চোখ-মুখ করুণ দেখাচ্ছিল। অভয়, ব্রজবিধু বিছানায় আমার পাশে লম্বা হয়ে শুয়ে।

শিবনাথ ফোনে বলল, ইয়েস কানেক্ট উইথ ক্যালকাটা, ফোর্ট উইলিয়ম, রেসিডেন্স অব জেনারেল এপি—আমার দিকে টেলিফোন এগিয়ে দিল—বৌদির সঙ্গে তোর খুব জানাশোনা, কথা বল।

আমি কথা বলতে বলতে চমকে উঠলাম। বৌদি, কী বলছেন আপনি? না, না—বিশ্বাস করতে মন চাইছে না।

টেলিফোন নামিয়ে গম্ভীর হয়ে বসে রইলাম। অভয়, বিধু উঠে বসল, কী বলল? সামথিং সিরিয়াস—

ঘরের আবহাওয়া কেমন যেন থমথমে। বৃষ্টিটা হঠাৎই বেড়ে উঠল। বাতাসের শব্দে বাজের সঙ্গে অদ্ভুত এক পরিবেশ। আবার সেই রাত-পাখির চিৎকার।

আমি বড় শ্বাস ফেললাম, হ্যাঁ অনুপমদা, বলতে বলতে কান্না পাচ্ছিল, দিন পনেরো আগে অফিসে কাজ করতে করতে বুকে একটু ব্যথা—তারপর নেই হয়ে গেছে। গলাটা ধরে এল আমার।

নিঃশব্দে ঘরে বসে আছি আমরা চারজন। সেই টেলিফোন—এপিদা—জিপ—কথা রাখতে অনুপমদার আসা—ভাবতে ভাবতে গা কাঁটা দিচ্ছিল। হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল মিহির, অ্যাটেনশান ভঙ্গিতে ফৌজি কায়দায় স্যালুট জানাল, টুপি খুলে বলল, অনুপমদা কথা রাখতে এসেছিল।

তারপর কাটা কাটা গলায় বলল, গুল মেরেছি তাই না,—ঐ যে রাস্তার দিকে তোরা সবাই তাকা, সেই জিপ, ফৌজি ড্রেস, মাথায় ঢেউখেলানো টুপি—আমাদের অনুপমদা—বলতে বলতে হাঁফাচ্ছে এক্স ফৌজি কর্নেল দাস।

আমরা সবাই উঠে দাঁড়ালাম—হ্যাঁ, সত্যি দাঁড়িয়ে আছে একটা জিপ, আবছা দেখাচ্ছে এই জল-ঝড়ের রাত্তিরে, এমন সময় বিদ্যুৎ চমকাল, সেই আলোয় পরিষ্কার দেখতে পেলাম জিপটা একঝলক, বলে উঠলাম, ইয়েস ঐ তো অনুপমদা। স্টিয়ারিং ধরে বসে রয়েছে, মুখে সেই বাঁকা হাসি।

আমাদের অবাক করা দৃষ্টির সামনে একটা ঘন কুয়াশার আস্তরণ সাদা মেঘের মতো ঢেকে ফেলল গাড়িটাকে,—ধোঁয়া হয়ে পাক খেয়ে উঠে যেতে লাগল উপরে—সেই সঙ্গে অদৃশ্য হয়ে গেল জিপ আর অনুপমদা।

আমাদের কারো মুখে কথা নেই। দাঁড়িয়ে আছি হাত ধরাধরি করে। পাশাপাশি। আমাদের আঙুলগুলো কাঁপছিল। হঠাৎ আলো নিভে গেল ঝুপ করে। লোডশেডিং। চারদিক নিস্তব্ধ। ছমছমে ভৌতিক অন্ধকার। আমাদের সকলেরই মনে একটাই কথা, অনুপমদা সত্যিই এসেছিল। মিহির মিথ্যে কথা বলেনি।

শ্রাবণ ১৪০৪

নির্জন ফরেস্ট বাংলোয়

নির্মলেন্দু গৌতম

দু'ধারের ঘন বনের জমাট অন্ধকারের ভেতর থেকে হাওয়ার একটা অদ্ভুত শব্দ গাড়ির শব্দকে ছাপিয়ে বুঝি জেগে উঠছে। তীক্ষ্ণ একটা শিস দিয়ে শব্দটাকে কেউ বুঝি আরও তীব্র করে তুলছে। গাড়িটাকে একবার থামিয়ে স্টার্ট বন্ধ করে কোথা থেকে সেই শব্দটা আসছে সেটা ভালো করে অনুভব করবার চেষ্টা করেছিল সজল, কিন্তু শব্দের উৎসটা ধরতে পারেনি। সেই শব্দ এখন সারা শরীরে আশ্চর্য একটা স্রোত হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। না, এরকম অদ্ভুত আর অস্বস্তিকর শব্দ আগে কখনো শোনেনি সজল।

গাড়ির হেডলাইটে যতটুকু দেখতে পাচ্ছে, ততটুকু স্থির হয়ে আছে। হাওয়ার কোনো খেলা কোনোখানে নেই।

কী জানি, হয়তো বনের ভেতর রাতে এরকম অস্বস্তিকর শব্দই জেগে ওঠে। বলতে গেলে জীবনে এই প্রথম রাত্রিবেলায় এভাবে এরকম গভীর একটা বনের ভেতর দিয়ে সজল গাড়ি চালাচ্ছে।

দু'দিন আগে ডুয়ার্সের দমনপুরে এসেছিল সজল। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে বড়সড় চাকরি করে পিসতুতো ভাই সুরঞ্জন। বছর দেড়েক হল সুরঞ্জন দমনপুর ফরেস্ট অফিসে বদলি হয়ে এসেছে। বদলি হয়ে এসেই সজলকে বেড়াতে আসবার জন্য চিঠি লিখেছিল সুরঞ্জন। আসলে, সজল ছোটবেলা থেকেই অ্যাডভেঞ্চার পছন্দ করে। দমনপুরে এলে হয়তো সেই অর্থে অ্যাডভেঞ্চার হবে না, কিন্তু ডুয়ার্সের অরণ্যের যে সবুজ সৌন্দর্য তা দেখা যাবে। অ্যাডভেঞ্চারের চাইতে সেটা এতটুকু কম নয়। একথা লিখেছিল সুরঞ্জন।

'সময় পেলেই যাব।' সুরঞ্জনের চিঠির উত্তরে লিখেছিল সজল। কিন্তু কিছুতেই যাবার মতো সময় করতে পারছিল না। এবার একসঙ্গে কয়েকদিনের ছুটি পেয়েই চলে এসেছিল দমনপুরে। আসবার একটা কারণও আছে। মাসখানেক আগে একটা গাড়ি কিনেছে সজল। গাড়ি নিয়ে লম্বা দৌড়ে বেরিয়ে পড়ার মতো মজা নেবার ইচ্ছেটাও খেলা করছিল সজলের মনের ভেতর।

দু'দুটো দিন সুরঞ্জনের সঙ্গে বনের ভেতর বেড়িয়ে ডুয়ার্সের নিবিড় অরণ্যের সৌন্দর্য উপভোগ করেছে সজল। সুরঞ্জন যাই বলুক, বনের ভেতর সেই বেড়ানো অ্যাডভেঞ্চারের চাইতে কম আনন্দ দেয়নি সজলকে।

বনের ভেতর বেড়াতে বেড়াতেই জয়ন্তীর গল্প করেছিল সুরঞ্জন। ছোট্ট একটা শহর জয়ন্তী। পাহাড়ের মজা আছে সেই ছোট্ট শহরে। একসময় জমজমাট ছিল জয়ন্তী। লাইম-স্টোন কোম্পানির অফিস ছিল বলেই প্রচুর লোকের যাওয়া-আসা ছিল জয়ন্তীতে। প্রচুর গাড়িও চলাচল করত। এখন সেই অফিস আর নেই। নির্জন হয়ে গেছে জয়ন্তী। সেই নির্জনতার জন্যেই এখন জয়ন্তীকে আরও ভালো লাগবে সজলের।

কিন্তু থাকবার জায়গা কি পাওয়া যাবে? প্রশ্ন করেছিল সজল।

জয়ন্তীতে একটা ফরেস্ট ডাকবাংলো আছে। সত্যিই যদি সজল যেতে চায়, সুরঞ্জন তাহলে ব্যবস্থা করে দিতে পারবে। বলেছিল সুরঞ্জন।

সজল যেতে চেয়েছিল আর সুরঞ্জনও ব্যবস্থা করে দিয়েছিল ডাকবাংলোর।

সকালের দিকে বেরিয়ে পড়বার কথা বলেছিল সুরঞ্জন। কিন্তু রাতের বন দেখবার জন্যেই সজল সন্ধের পর গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছে।

বেশ ভালোই লাগছিল প্রথমটা। গাড়ির হেডলাইট, বনের পথ আর ড্যাশবোর্ডের নীল আলোয় পুরো ব্যাপারটাকেই অ্যাডভেঞ্চার-অ্যাডভেঞ্চার মনে হচ্ছিল।

কিন্তু এখন বনের ভেতর থেকে উঠে আসা হাওয়ার শব্দের সঙ্গে সেই শিসের শব্দ খানিকটা অস্বস্তি তৈরি করেছে বলে তাড়াতাড়ি জয়ন্তীতে পৌঁছবার একটা তাড়া অনুভব করছে সজল।

ক'টা বাজল? ঘড়ির কাঁটায় চোখ রাখল সজল। সাতটা দশ।

বনের ভেতর সন্ধ্যার পরই বুঝি গভীর রাত নেমে আসে। মনে মনে ভাবল সজল। গাড়িটা থামিয়ে সব আলো নিভিয়ে দিয়ে একটু সময় বনের অন্ধকারটুকু উপভোগ করতে ইচ্ছে হচ্ছিল সজলের। কিন্তু এখন সেই ইচ্ছেটাকে মনের ভেতরই রেখে দিল। সামনের দিকে চোখ রেখে হেডলাইট থেকে ছড়িয়ে পড়া আলো দেখতে দেখতে আর সেই অস্বস্তিকর শব্দটা শুনতে শুনতে গাড়ি চালাতে থাকল নিঃশব্দে।

সুরঞ্জন যেভাবে জয়ন্তীর ফরেস্ট ডাকবাংলোয় যাবার পথটা বলে দিয়েছিল, ঠিক সেভাবে ফরেস্ট ডাকবাংলোয় পৌঁছোতে খুব একটা অসুবিধে হল না সজলের।

ফরেস্ট ডাকবাংলোর নেপালি গার্ড সজলের গাড়িটা দেখেই একটা টর্চ হাতে কাছে এসে দাঁড়াল।

স্টার্ট বন্ধ করে গাড়ি থেকে নেমে এল সজল। গার্ডের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমার আসবার খবরটা নিশ্চয়ই তোমার কাছে আছে।'

'হ্যাঁ, সাব। চলুন, আপনার ঘরটা দেখিয়ে দিচ্ছি।' গার্ড বলল।

সজল বলল, 'একটু দাঁড়াও।'

বলে গাড়ি থেকে ব্যাগটা বের করে গার্ডের হাতে ধরিয়ে দিয়ে গাড়িটাকে লক করল। তারপর ফিরে গার্ডের হাত থেকে ব্যাগটা নিয়ে বলল, 'নাও, চল।'

চারদিকের গাছপালা আর অন্ধকারের মধ্যে বাংলোটাকে কেন যেন ভৌতিক একটা বাড়ি মনে হচ্ছে। খুব কম পাওয়ারের যে আলোটা বারান্দায় জ্বলছে, সে আলোটা বুঝি যেকোনো মুহূর্তে হারিয়ে যাবে অন্ধকারে। মনে হচ্ছে, হারিয়ে যাবার জন্যেই যেন জ্বলছে আলোটা।

'এখন কি আর কেউ বাংলোয় আছে?' গার্ডের দিকে তাকিয়ে প্রশ্নটা করল সজল।

'না সাব। আজ কেউ নেই।' গার্ড বলল।

গার্ডকে আর কোনো প্রশ্ন করল না সজল। ফিরে গার্ডের সঙ্গে পায়ে পায়ে বাংলোর বারান্দায় উঠে এল।

বারান্দার প্রথম ঘরটাই সজলের জন্য। গার্ড সেই ঘরটার দরজার তালা খুলতেই বুঝতে পারল সজল।

'আসুন সাব।' ঘরে ঢুকে আলোটা জ্বালিয়ে সজলকে ডাক দিল গার্ড।

ঘরে ঢুকল সজল। দেখল ঘরটাকে। এগিয়ে গিয়ে তারপর টেবিলের ওপর রাখল ব্যাগটা।

গার্ড বলল, 'খানা বলতে হবে সাব?'

'না। রাতের খানা আমি রাস্তায় খেয়েই এসেছি।' সজল বলল।

'ঠিক আছে। কোনো দরকার হলে ডাকবেন। আমি ওপাশের ঘরটাতে থাকি।' গার্ড বলল।

সজল বলল, 'ঠিক আছে।'

আর দাঁড়াল না সে। 'চলি সাব', বলে চলে গেল।

ব্যাগটা থেকে জিনিসপত্র বের করতে হবে।

ব্যাগের ওপর ঝুঁকে পড়ে চেনটা টানল সজল। ঠিক সেই মুহূর্তেই সেই তীব্র শিসের সঙ্গে বনের ভেতরের সেই হাওয়ার শব্দ যেন দরজা দিয়ে ঘরের ভেতর লাফিয়ে নেমে পড়ল। ঝনঝন করে উঠল কাচের জানালাগুলো। কম পাওয়ারের আলোটার ওপর কেউ যেন কালো একটা ওড়না দোলাতে থাকল।

চমকে উঠে ফিরে দাঁড়াল সজল। চোখ রাখল দরজায়।

দেখল, একটা কালো ছায়া দরজায় স্থির হয়ে আছে।

মনে হল, জমাট সেই কালো ছায়ার মুখে তীক্ষ্ণ দুটো দাঁত তীব্র কোনো আকাঙ্ক্ষায় একটুখানি ফাঁক হয়ে আছে।

পাথরের মতো স্থির হয়ে গেল সজল। মৃত্যুর মতো একটা আতঙ্ক মেরুদণ্ডের ভেতর দিয়ে শীতল স্রোত হয়ে তরঙ্গিত হতে থাকল।

নিজের অজান্তেই হঠাৎ তীব্র গলায় চেঁচিয়ে উঠল সজল। দু'হাত মুঠো করে শূন্যে তুলল।

বাইরে থেকে উঁচু গলায় গার্ডের চিৎকার ভেসে এল, 'কেয়া হুয়া সাব?'

সঙ্গে সঙ্গে সেই জমাট কালো ছায়া দুটো ডানা তৈরি করল। দুলে উঠল সেই ডানাদুটো। তীব্র সেই শিসের শব্দ তীব্র হল আরও। সেই হাওয়ার শব্দ ঝড়ের ভয়ংকর গর্জন হয়ে চুরমার করে দিতে থাকল সব কিছু।

চোখ বন্ধ করে সজল। বড় বড় শ্বাস নিতে নিতে একটু একটু করে ঝুঁকে পড়তে থাকল।

ফের গার্ডের সেই চিৎকার ভেসে এল, 'সাব, কেয়া হুয়া সাব?'

ঝুঁকে পড়া সজল বুঝি উত্তর দেবার ক্ষমতাটুকুও হারিয়ে ফেলেছে।

সিঁড়ি বেয়ে পায়ের শব্দ কি উঠে আসছে? হ্যাঁ, সিঁড়ি বেয়ে সত্যিই উঠে আসছে পায়ের শব্দ।

সেই পায়ের শব্দের সঙ্গে সঙ্গে সজলের মধ্যে একটু একটু করে বুঝি চেতনা ফিরে আসছে।

দরজায় এসে থামল সেই শব্দ।

সোজা হয়ে দাঁড়াল সজল। খানিকটা আচ্ছন্নভাবে চোখ রাখল দরজায়। গার্ড এসে দাঁড়িয়েছে।

সজলের দিকে স্থিরচোখে তাকিয়ে থাকল গার্ড। তারপর দরজা পেরিয়ে পায়ে পায়ে ভেতরে এসে দাঁড়াল সজলের সামনে। খানিকটা উদ্‌বিগ্ন গলায় বলল, 'আপনার কি শরীর ঠিক নেই সাব?'

'না না, শরীর আমার ঠিক আছে।' কোনোমতে বলল সজল।

গার্ড বোধহয় বিশ্বাস করল না কথাটা। সজলের মনে হল।

কিন্তু যা ঘটেছে খানিক আগে, সজল কিছুতেই তা বলতে পারবে না গার্ডকে। ভাববে, কোনো কারণে ভয় পেয়েছে সজল। এই বাংলোয় সেরকম কোনো ভয়ের ব্যাপার থাকলে গার্ড নিশ্চয়ই এই নির্জন ডাকবাংলোয় একা থাকতে পারত না।

শরীর যে ভালো আছে সেই কথাটা বোঝাবার জন্য সজল ফের কিছু একটা বলবার চেষ্টা করল। কিন্তু তার আগেই গার্ড বলল, 'সাব, আপনি কি কিছু দেখে ভয় পেয়েছেন?'

'কেন, আমার আগে কি কেউ এখানে এসে কিছু দেখে ভয় পেয়েছে?' খানিকটা চমকে উঠে প্রশ্নটা করল সজল।

গার্ড হাসল। বলল, 'না সাব, এখানে এসে কেউ কখনও ভয় পাবার মতো কিছু দেখেনি। আমি এখানে পনেরো বছর আছি। মাঝে-মধ্যেই একা থাকতে হয় আমাকে। আমিও সাব কোনোদিন কিছু দেখিনি।'

তাহলে দারুণ ভয়টা কি তাকেই অনুসরণ করে ফরেস্ট বাংলো পর্যন্ত এসেছে? খানিক আগে দরজায় ভয়ংকর যে কালো ছায়াটাকে দুলতে দেখেছে সজল, দেখেছে তার তীক্ষ্ণ সাদা দুটো দাঁত, সেই কালো ছায়াটাই কি সেই ভয়?

তীব্র একটা ভয়ের তরঙ্গ সজলকে নিয়ে বুঝি আছড়ে পড়ল। কোনোরকমে দু'পা এগিয়ে এসে খাটের ওপর বসল সজল।

খাটের পাশেই রাখা ছিল জলের বোতল-ভরা ব্যাগটা। হাত বাড়িয়ে সেটা তুলে নিয়ে জলের বোতলটা বের করল সজল। ঢকঢক জল খেল অনেকটা।

স্থির-চোখে সজলের জল খাওয়াটা দেখল গার্ড। তারপর হঠাৎ সজলের দিকে ঝুঁকে পড়ে বলল, 'একটা কথা বলব সাব?'

সজল জলের বোতলটা ব্যাগে ভরে রাখতে রাখতে বলল, 'বলো।'

'আমি যতক্ষণ আছি ততক্ষণ আপনার ভয় পাবার কিছু নেই।' গার্ড বলল।

সজল যে ভয় পেয়েছে, গার্ড সেটা ঠিক ধরতে পেরেছে। স্পষ্টই বুঝতে পারল সজল।

এবারে হঠাৎই গার্ড টানটান হয়ে দাঁড়াল। হাত বাড়াল সজলের দিকে। বলল, 'জলের বোতলটা আমায় দিন সাব, জল ভরে এনে দিচ্ছি।'

সত্যিই বোতলটাতে জল ভরে আনা দরকার। যতটা জল আছে বোতলে সারাটা রাত তাতে চলবে না।

ব্যাগ থেকে জলের বোতলটা বের করে গার্ডের হাতে ধরিয়ে দিল সজল।

বোতলটা হাতে নিয়ে তীক্ষ্ণ চোখে সজলকে আর একবার দেখে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল গার্ড।

ভয়ে ভয়েই দরজার দিকে চোখ রাখল সজল। ভেতরে ভেতরে অসহায় একটা অস্থিরতা বুঝি বিপন্ন করল সজলকে।

এরকম একটা ভয় যে তাকে তাড়া করে ফিরবে, সজল তা ভাবতেই পারছে না।

সজল যদি এখান থেকে বেরিয়ে পড়ে এখন?

কিন্তু বেরিয়ে পড়ার মতো সাহস এই মুহূর্তে বুকের মধ্যে খুঁজে পাচ্ছে না সজল।

অচেনা বন-পাহাড়ের পথ। অন্ধকারে ডুবে আছে চারদিক। হঠাৎ যদি জমাট কালো ছায়াটা গাড়ির উইন্ড-স্ক্রিনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে? যদি এলোমেলো করে দেয় ফেরার পথ?

সত্যিই, সজল ভয়ের এক অন্ধকার শূন্যতার মধ্যে একটু একটু করে তলিয়ে যাচ্ছে।

জলের বোতল নিয়ে তাড়াতাড়িই ফিরে এল গার্ড।

বোতলটা বেডসাইড টেবিলের ওপর রেখে সজলের দিকে তাকিয়ে গার্ড বলল, 'একটা কথা বলব সাব?'

কী জানি কী বলবে গার্ড। মনে মনে ভাবল সজল। বলল, 'বলো।'

'বাংলোর ভেতর কিছু একটা হয়েছে সাব। সেজন্যেই ভয় পেয়েছেন আপনি। কিন্তু সেটা আমাকে বলছেন না।' কথাটা বলতে গিয়ে গার্ডের মুখের রেখায় বুঝি কয়েকটা ভয়ের রেখা জেগে উঠতে দেখল সজল।

চমকে উঠল সজল। বলল, 'কী করে বুঝলে কিছু একটা হয়েছে বাংলোর ভেতর?'

'সেটা ঠিক আপনাকে আমি বোঝাতে পারব না।' বলে একটু থামল গার্ড। চাপা একটা উত্তেজনায় বড় করে একটা শ্বাস নিয়ে ফের বলল, 'কিছু ভাববেন না সাব। বন্দুক নিয়ে সারারাত আমি পাহারা দেব।'

কথাটা শেষ করে আর দাঁড়াল না গার্ড। 'আচ্ছা চলি সাব। গুড নাইট।' বলে প্রায় ছুটেই বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

আর এক মুহূর্ত দেরি করল না সজল। খাট থেকে উঠে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিল। কিছু সময় দাঁড়িয়ে রইল সেখানেই। তারপর পায়ে পায়ে এসে খাটের ওপর বসে হাতঘড়িটা চোখের সামনে তুলে ধরল।

মাত্র সাড়ে আটটা।

কিন্তু সাড়ে আটটাতেই যেন মধ্যরাত্রের নৈঃশব্দ্য জমাট হয়ে হিমশীতল একটা নির্জনতা তৈরি করেছে। সেই নির্জনতা আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে সজলের সমস্ত অস্তিত্বকে।

বেডসাইড টেবিলটা থেকে জলের বোতলটা নিয়ে ফের খানিকটা জল খেল সজল।

গার্ড তার ভয় পাবার কারণটা স্পষ্ট করে সজলকে বোঝাতে পারেনি।

তাহলে কি সজল যা দেখেছে, গার্ডও তাই দেখেছে! সেইজন্যেই ঠিক বোঝাতে পারেনি!

সজলের সারা শরীরে বিদ্যুতের মতো একটা ভয় খেলা করে গেল।

মস্ত বড় কাচের জানালার দিকে চোখ ফেরাল সজল। অন্ধকারে ডুবে থাকা গাছপালাগুলো বুঝি অশরীরী একটা ভয়ংকর ভয়ের অস্তিত্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

চোখ বুঁজল সজল। তারপর জুতোসুদ্ধ পায়েই চিৎ হয়ে শুয়ে অন্য কিছু ভাবতে চেষ্টা করল।

কাল দিনের আলো ফুটবার সঙ্গে সঙ্গেই এখান থেকে বেরিয়ে পড়বে সজল। এক মুহূর্তও আর থাকবে না এখানে। এখন রাতটা শুধু ভালোয় ভালোয় কেটে গেলে হয়।

অবশ্য একটা ব্যাপারে নিশ্চিন্তি। রাতটা জেগেই পাহারা দেবে গার্ড। তেমন কিছু ঘটে যাবার আগেই সাহায্য পাওয়া যাবে তার।

এসব ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়ল সজল, তা সে নিজেও টের পেল না।

হঠাৎ প্রবল একটা কিসের শব্দে লাফিয়ে উঠে বসল সজল। নিজের অজান্তেই দু'হাত মুঠো করে নিজেকেই বুঝি আঁকড়ে ধরতে চেষ্টা করল। স্পষ্টই বুঝতে পারল বাংলোটার চারদিকে কিছু একটা উড়ে বেড়াচ্ছে। ডানার শব্দে ছড়িয়ে পড়ছে ঝোড়ো হাওয়ার শব্দ।

দারুণ একটা আতঙ্কে কাচের জানালার দিকে চোখ রেখে সেই শব্দটাকে বোঝার চেষ্টা করল সজল।

ঠিক সেই মুহূর্তেই কালো একটা জমাট ছায়া বিশাল ডানা মেলে আছড়ে পড়ল জানালার কাচের ওপর। ঝন্‌ঝন্‌ করে ভেঙে পড়ল জানালার কিছু কাচ। সেই ভাঙা কাচের ভেতর দিয়ে তীক্ষ্ণ সাদা দুটো দাঁত বেরিয়ে এল।

কী তীব্র, কী দারুণ ভয়ংকর সেই দুটো দাঁত! সজলের সমস্ত শরীর শব্দহীন, বোধহীন গভীর এক শূন্যতার ভেতর ডুবে যেতে থাকল একটু একটু করে।

সেই ভয়ংকর দাঁত দুটো ক্রমশ বুঝি এগিয়ে আসছে সজলের দিকে। দারুণ তৃষ্ণায় যেন অধীর হয়ে উঠেছে দাঁত দুটো।

চিৎকার করে সজল গার্ডকে ডাকতে চাইল। কিন্তু গলা দিয়ে কোনো শব্দ বেরোল না। লাফ দিয়ে নামতে চাইল খাট থেকে। নামতে পারল না কিছুতেই।

হঠাৎ একটা গুলির শব্দ রাতের অন্তহীন নৈঃশব্দ্যকে খানখান করে ভেঙে দিল। নিজের অজান্তেই লাফিয়ে উঠল সজল। জানালার দিকে তাকিয়ে দেখল, কাচের ওপরের সেই জমাট অন্ধকার তার ডানাদুটো ঝাপটে শূন্যে উঠল মুহূর্তের জন্য। তীব্র সেই শিসের শব্দ তীব্রতর হল। ফের ঝোড়ো হাওয়ার শব্দ ভয়ংকরভাবে বাংলোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

না, আর সহ্য করতে পারছে না সজল। নিজের অজান্তেই দু'চোখ বুঁজল।

নিশ্চয়ই সেই কালো অন্ধকারকে ওপর থেকে নেমে আসতে দেখেছে গার্ড। দেখেছে, জানালার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে। গুলিও ছুঁড়েছে জানালার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বার পরই। সেই গুলির শব্দই শুনেছে সজল।

কী জানি, কী হবে শেষ পর্যন্ত! অদ্ভুত একটা শব্দ বেরিয়ে এল সজলের বুকের ভেতর থেকে।

কত রাত এখন?

চোখ খুলল সজল। অসম্ভব ভয়ে ভয়ে জানালার দিকে চোখ ফেরাল। না, জানালায় সেই জমাট অন্ধকারটা আর নেই। ভাঙা কাচের ভেতর দিয়ে বাইরের অন্ধকারটুকুই শুধু দেখা যাচ্ছে। এবার নিজেকে ফিরে পেতে চেষ্টা করল দারুণভাবে।

ঠিক তখুনি বাইরের অন্ধকারের ভেতর থেকে রক্ত-জল-করা তীব্র একটা আর্ত চিৎকার ভেসে এল। মনে হল, কেউ যেন ভয়ংকর মৃত্যুর মুঠোর ভেতর থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে।

জীবনে এরকম চিৎকার কখনো শোনেনি সজল। ঝুঁকে পড়ে দু'হাতে কানদুটো চেপে ধরল। কিন্তু সেই ভয়ংকর চিৎকার থেকে মুক্তি পেল না। দারুণ রকমের একটা দুঃস্বপ্নের ভেতর ক্রমশ ডুবে যেতে থাকল।

তবু কোনোরকমে খানিকটা স্থির রাখতে চেষ্টা করল নিজেকে।

অমনিভাবে হঠাৎ মৃত্যুযন্ত্রণায় চিৎকার করছে কে?

আচ্ছা, গার্ডের কি কিছু হয়েছে?

না, গার্ড ছাড়া এখানে এই মুহূর্তে আর কারো থাকবার কথা নয়। এরকম চিৎকার সে ছাড়া কে করবে।

আর কিছু ভেবে উঠবার আগেই হঠাৎ থেমে গেল সেই চিৎকার।

সেই শিসের শব্দ যেন জান্তব উল্লাসে অদ্ভুত এক ছন্দে দোল খেতে থাকল এবার। কিছুক্ষণ দোল খেতে খেতে থেমে গেল সেই শিসের শব্দও। তারপর এক অনন্ত নৈঃশব্দ্য খেলা করতে থাকল চতুর্দিকে।

সজলের মনে হল, সে এবার ঠিক মরে যাবে!

দারুণ একটা কান্নায় গলার ভেতরটা ব্যথা করতে থাকল সজলের।

চোখ তুলে ছাদের দিকে তাকাল সজল। কী যেন খুঁজতে চেষ্টা করল সেখানে।

জানালায় ঝুলতে থাকা কাচের একটা টুকরো হঠাৎ মেঝের ওপর শব্দ করে পড়ল।

অনন্ত নৈঃশব্দ্যের মধ্যে যেন ঘরের ভেতরের চার দেয়াল, ছাদ আর মেঝের ওপর প্রতিধ্বনিত হল সেই শব্দ।

সঙ্গে সঙ্গে কি যেন ঘটে গেল সজলের ভেতর।

টানটান হয়ে বসল সজল। হাত বাড়িয়ে তুলে নিল জলের বোতলটা। ঢক ঢক করে বেশ খানিকটা জল খেল। বাকি জলটুকু ঢেলে দিল মাথায়।

একটু একটু করে নিজেকে কি ফিরে পাচ্ছে সজল?

হ্যাঁ, একটু একটু করে সত্যিই সজল নিজেকে ফিরে পাচ্ছে।

নিজের অজান্তেই সজল চোখের সামনে হাতটা তুলে চোখ রাখল ঘড়ির ওপর। দুটো বেজে কুড়ি।

সজল এবার একটু সরে এসে খাট থেকে নেমে দাঁড়াল। অনেকদিন অসুখে ভুগে উঠলে যেমন মনে হয়, তেমনি মনে হচ্ছে এখন!

গার্ডের খবরটা একবার নেওয়া উচিত। হঠাৎই কথাটা মনে হল সজলের। দরজার দিকে তাকাল একবার। বড় করে শ্বাস নিল একটা। তারপর পায়ে পায়ে এসে দাঁড়াল দরজার সামনে।

উত্তেজনায় তোলপাড় হচ্ছে বুকের ভেতরটা। তবু নিজেকে নিজেই অতিক্রম করল সজল। হাত বাড়িয়ে দরজাটা খুলল।

সঙ্গে সঙ্গে একরাশ এলোমেলো ঝোড়ো হাওয়া বুঝি ঝাঁপিয়ে পড়ল সজলের শরীরে। শিউরে উঠল সজল। স্থিরভাবে দরজায় দাঁড়িয়ে চোখ বাড়াল বাইরে।

নির্জনতা যেন ভয়ংকরভাবে তরঙ্গিত হচ্ছে চারদিকে। এভাবে যে ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারে নির্জনতা, সজল বুঝি তা ভাবতেও পারছে না!

বারান্দার মৃদু আলোটুকু রাতের হালকা কুয়াশায় ডুবে আছে। বারান্দা ছাড়িয়ে বাংলোর প্রাঙ্গণে নামতে পারছে না আলোটুকু। দরজা দিয়ে লাফিয়ে পড়া ঘরের আলোটুকুও বারান্দায় এসে থমকে গেছে।

কিন্তু গার্ড কোথায়?

গুলি ছুঁড়ে কখনোই সে মিলিয়ে যেতে পারে না! দরজা খুলে সজলকে বেরিয়ে আসতে দেখে নিশ্চয়ই তার কাছে এসে জিগ্যেস করা উচিত ছিল কেন সজল দরজা খুলেছে।

গার্ডকে কি চেঁচিয়ে একবার ডাকবে সজল?

ডাকাই তো উচিত। মনে মনে কথাটা ভেবে সজল দু'পা এগিয়ে এল।

তারপর ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে ডাকল গার্ডকে।

সঙ্গে সঙ্গে বাংলোর প্রাঙ্গণ থেকে তীব্র সেই শিসের শব্দ চারদিকের ভয়ংকর নির্জনতাকে যেন ঝড়ে উত্তাল সমুদ্রের মতো অস্থির গর্জনে ভরে দিল। কোনোরকমে দু'পা এগিয়ে এল সজল। বারান্দার রেলিঙ ধরে সামলে নিল নিজেকে। তারপর দু'চোখ বুঁজে বড় বড় করে শ্বাস নিল বার কয়েক।

কয়েক মুহূর্ত সেইভাবে দাঁড়িয়ে থেকে আস্তে আস্তে চোখ খুলল সজল। রেলিঙের ওপর আরও খানিকটা ঝুঁকে পড়ে অন্ধকারের ভেতরই চোখ বাড়াল কিছু বুঝবার জন্য।

সঙ্গে সঙ্গে বুঝি নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল সজলের।

সেই জমাট অন্ধকারটা প্রাঙ্গণের ওপর কী যেন একটা জিনিসকে তার দুটো ডানায় চেপে ধরে আছে। ধীরে ধীরে দুলছে ডানাদুটো। অলৌকিক একটা ছন্দে যেন দোলাচ্ছে প্রাঙ্গণের পুরো অন্ধকারটাকেই।

ফের তেমনি ভাঙা গলায় গার্ডকে ডাকল সজল। না, কোনো উত্তর এল না।

খানিকটা সময় কীভাবে যেন গড়িয়ে গেল।

হঠাৎ সজল দেখল, সেই ডানাদুটো আরও জোরে দুলতে দুলতে ভেসে উঠল আস্তে আস্তে। চতুর্দিকের সমস্ত অন্ধকার যেন ভর করেছে সেই ডানায়। বাতাস যেন সেই ডানার সঙ্গী হল। গাছপালার ভেতর অসংখ্য পাখি ডেকে উঠল একসঙ্গে।

ডানাদুটো উড়তে উড়তে দু'বার প্রদক্ষিণ করল বাংলোটাকে। তারপর হঠাৎই তীব্র বেগে উত্তরের পাহাড়ি অরণ্যের কুয়াশায় হারিয়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দিক পাল্টে গেল আশ্চর্যভাবে। কুয়াশায় ঢেকে থাকা রাত্রিটা ভারহীন একটা অনুভবে ভরে দিল সজলকে।

এবার বাংলোর প্রাঙ্গণের দিকে চোখ রাখল সজল।

প্রাঙ্গণের অস্বচ্ছ অন্ধকারে চিৎ হয়ে কে শুয়ে আছে? তীব্র একটা ভয়ে সজল ঝুঁকে পড়ল সেদিকে।

মাথার টুপিটা দেখে মুহূর্তে চিনে ফেলল গার্ডকে।

তাহলে গার্ডকেই ঢেকে রেখেছিল সেই ডানাদুটো।

না, আর এক মুহূর্তও দেরি করল না সজল। টানটান হয়ে দাঁড়াল। তারপর দ্রুতপায়ে বারান্দা থেকে নেমে এল। ফের একবার চিৎ হয়ে শুয়ে থাকা গার্ডকে দেখে নিয়ে পায়ে পায়ে সামনে এসে ঝুঁকে পড়ল গার্ডের শরীরের ওপর। ঝুঁকে পড়েই আতঙ্কে লাফিয়ে উঠল।

মৃত্যুযন্ত্রণায় বিস্ফারিত গার্ডের চোখদুটো আকাশের দিকে স্থির হয়ে আছে। হাঁ হয়ে আছে মুখটা। বন্দুক আর টর্চটা পড়ে আছে পাশে।

না, গার্ড আর বেঁচে নেই। স্পষ্টই বুঝতে পারল সজল।

প্রবল একটা আতঙ্কে পালাতে গিয়েও সজল পালাতে পারল না। কোনোরকমে পাশে পড়ে থাকা গার্ডের টর্চটা তুলে গার্ডের মুখের ওপর আলো ফেলল। চমকে উঠল সঙ্গে সঙ্গে।

গার্ডের গলার দু'দিকে গভীর দুটো ক্ষত। রক্তের দাগ লেগে আছে সেই ক্ষত দুটোয়। মুহূর্তে সেদিক থেকে চোখ সরিয়ে নিল সজল।

তাহলে ডানাওয়ালা জমাট অন্ধকারের মতো যেটা এতক্ষণ ধরে ভয়ংকর শিসের শব্দ বাজিয়ে সজলের পেছনে ছুটে বেড়াচ্ছিল, সেটা একটা ভ্যাম্পায়ার—রক্তচোষা বাদুড়! শেষ পর্যন্ত গার্ডের গলায় নিষ্ঠুর দাঁত বসিয়ে সে তার তৃষ্ণা মিটিয়েছে! অথচ আশ্চর্য, বনের ভেতর ঢোকার পর থেকেই তো সে অনুসরণ করে এসেছিল সজলকে। তাহলে কি জানালায় জমাট অন্ধকারটাকে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখে গুলি ছুঁড়তেই ক্রোধে সজলকে ছেড়ে গার্ডের ওপরই ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সেই রক্তচোষা বাদুড়টা? সজলের বদলে গার্ডের রক্তেই সে কি তার তেষ্টা মিটিয়েছে!

ভেতরে ভেতরে দারুণ একটা ভয়ে শিউরে উঠল সজল!

না, নিজেকে বুঝি আর ধরে রাখতে পারছে না সজল। ফের একবার গার্ডের গলার সেই ক্ষত দুটোর দিকে তাকাল। তাকাল আতঙ্কে আর যন্ত্রণায় বিস্ফারিত হওয়া গার্ডের মুখের দিকে। কখন যে অবশ হয়ে যাওয়া হাত থেকে জ্বলন্ত টর্চটা খসে পড়ল সজল তাও টের পেল না।

অন্ধকারে ডুবে থাকা নির্জন ফরেস্ট বাংলোর প্রাঙ্গণে আকাশের দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে একটা রৌদ্রময় সকালের জন্য অসহায়ভাবে অপেক্ষা করতে থাকল সজল।

আষাঢ় ১৪১১

অশরীরিণী

বামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

মানুষের মুখ ঠিক যেন খবরের কাগজের হেডলাইন। দেখার মতো চোখ থাকলে ঠিক পড়ে নেওয়া যায় সে সব খবর। এই যেমন অরুণের মুখ দেখে আমার মনে হল। হ্যারিকেনের নরম আলোয় ওর চোখ-মুখ দেখেই আন্দাজ করলাম ওর পেশেন্টের অবস্থা ভালো নয়। পেশেন্টের বাড়ির লোকেরা ওকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসছে গাড়িতে তুলে দেওয়ার জন্য। গ্রামের পথঘাট সন্ধে হতেই শুনশান। তায় আবার ঘোর বর্ষা। এ গ্রামটার নাম চাঁপারুই। হাওড়া-বর্ধমান মেইন লাইনে খন্যান স্টেশনে নেমে যেতে হয়। অরুণ অবশ্য তার গাড়িতেই গেছিল। শহরের ব্যস্ত ডাক্তার হলে কী হয়, সাধ্যে কুলোলে এমন সব গাঁ-গঞ্জে রোগী দেখতে যেতে সে কখনও দু'বার ভাবে না। ও মুখে বলে, তবু তো রাতের পথে একটু গাড়ি চালানোর সুযোগ পাই। আসলে অরুণকে তো আমি জানি। রোগীর সেবা করতে পেলে ও বর্তে যায়।

তা আজ অবশ্য সে সুযোগটা আমি পাচ্ছি। অরুণের মারুতি এস্টিমের স্টিয়ারিং-এ আমাকে জোর করে ওই বসিয়েছে। ওর ড্রাইভারকে ছুটি দেওয়ার পরপরই 'কল'টা আসাতে ও আমাকে ফোন করে। তারপর জানায়, কাল হঠাৎই হাতে চোট পাওয়ায় সে আজ গাড়ি চালাতে অপারগ। তাই আমিই যদি—

আমি গাড়ি চালাতে ভালোই পারি। তবে আমার গাড়ি হল লঝঝড়ে মার্কা একটি অ্যামবাসাডার। যার হর্ন ছাড়া আর সবকিছুই বাজে। তবু সেটা হল আমার নিজের গাড়ি। আর এটা বন্ধুর। তাও আবার মহামূল্যবান। যাই হোক, অরুণের সঙ্গের লোভে আমি আর না করিনি। কলকাতা থেকে সোজা চলে এসেছি এই ষাট কিলোমিটার দূরে।

চাঁপারুই গ্রামে অবশ্য বিদ্যুৎ আছে। তবে ঝড় উঠলে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া হয়। আজও তেমনই হয়েছে। সন্ধে থেকেই ঠান্ডা ঝোড়ো হাওয়া আর বিদ্যুৎ-এর ঝলকানির মধ্যে বেশ একটা যুগলবন্দী চলছিল। এখানে পৌঁছবার আগেই জোরে ঝড় উঠেছিল। তারই নীটফল চাঁপারুই-এর ঘন অন্ধকার পথ এবং সামনে ঐ হ্যারিকেন হাতে রোগীর বাড়ির লোকজন। অরুণ গাড়িতে এসে বসতেই সবাই ওকে নমস্কার করল। রোগীর অবস্থার ইতর বিশেষ হলেই তারা যে ওকে জানাবে সে কথা হতেই অরুণ ইশারায় আমাকে গাড়ি ছাড়ার নির্দেশ দিল।

গাড়ি ছাড়তে না ছাড়তেই চড়বড়িয়ে বৃষ্টি এল। গাড়ির ঝকঝকে সাদা আলোর সামনে শুরু হল বৃষ্টির উদ্দাম নাচ। একটু পরেই গ্রাম থেকে গাড়ি বড় রাস্তা মানে জি টি রোডে এসে পড়ল। অরুণের দিকে একবার আড়চোখে চাইলাম। দেখলাম ও নরম সিটে একেবারে গা এলিয়ে বসে আছে। অন্য সময় ও কত হাসি-তামাশা করে, অজস্র কথা বলে যায় কিন্তু আজ ওর মুড দেখছি সত্যিই খুব খারাপ।

কেমন দেখলি পেশেন্টকে?

একটা সিগারেট ধরিয়ে অরুণ উত্তর দিল, ক্লিনিকালি ভালো। একটা মাইল্ড অ্যাটাক হয়ে গেছে। ওষুধ দিয়ে দিয়েছি। এ ওষুধে কাজ অবশ্যই হয়, তবু—

আমি অবাক হয়ে বললাম, তবু মানে? পেশেন্টের অবস্থা ভালো হওয়া সত্ত্বেও তোর মুখে ঐ আষাঢ়ে মেঘ? নাঃ, তোকে নিয়ে আর পারা গেল না। রোগী নিয়ে তুই বড্ড বেশি ভাবিস। চল ফেরার পথে আজ দিল্লি রোডের জোড়া হোটেলে রুটি আর চিকেন-তড়কা খাই।

অরুণ মাথা নাড়ল। বলল, না রে—তুই বরং খা। আমার ইচ্ছে করছে না একদম। আসলে

মাঝবয়সি একটা লোক তার সাজানো সংসার ফেলে হুট বলতে চলে যাবে এ বড় দুঃখের। আমি ডাক্তার হলেও আমার এসব দুঃখ-টুঃখ বোধ এখনও রয়ে গেছে।

কিন্তু অরুণ, তোর কথাটা আমি ঠিক বুঝলাম না। একবার বলছিস রোগী ভালো আছে। অথচ বলছিস চলে যাবে। এটা কি একটা ধোঁয়াশা মার্কা ব্যাপার নয়?

অরুণ কী একটা বলল, আমার কানে গেল না। কেননা চারদিক কাঁপিয়ে ভয়ংকর গতিতে তখন একটা মেল ট্রেন বেরিয়ে যাচ্ছে। আমরা ততক্ষণে মগরা লেভেল ক্রসিং-এর সামনে পৌঁছেছি।

ট্রেনটা চলে যেতেই আবার বৃষ্টির নূপুর শোনা গেল গাড়ির ছাদের ওপর। গাড়ির গতি কমিয়ে দিয়েছি। অরুণ বলল, চালাতে অসুবিধে হলে কোথাও দাঁড়িয়ে যা। এমন দুর্যোগের রাত। পেশেন্টের বাড়ির লোকগুলোকে আবার দৌড়ঝাঁপ করতে হবে। আঃ কী যে করি!

আমি গাড়িটা থামিয়েই দিলাম রাস্তার ধার করে। তারপর অরুণের কাঁধে হাত রেখে বললাম, ডাঃ দাস, প্লিজ এভাবে নিজেকে কষ্ট দেবেন না। আমি আপনার বন্ধু। আমি কি কোনও সাহায্যই আপনাকে করতে পারি না?

কথার মাঝে অরুণ এরকম হঠাৎ করে নাটকীয়তা খুব পছন্দ করে। তাই কথাটা এভাবে বললাম। ও আমার দিকে মাথাটা ঘুরিয়ে বলল, বলতেই তো চাই রে কিন্তু এসব কথা উঠলে, তোরা আমাকে পাগল বলবি। হয়তো বলবি, অরুণটার ডাক্তারি ছেড়ে দেওয়া উচিত। তবু বামা, আজ বোধহয় তোকে সব বলতেই হবে। বহু বছর ধরে একা বয়ে বেড়াচ্ছি এই আতঙ্ক। রোগী দেখতে গেলেই এ আতঙ্ক আমার নিত্যসঙ্গী।

গাড়ির জানালাগুলো খুলে দিলাম বোতাম টিপে। মুহূর্তে ঠান্ডা বাতাস লন্ডভন্ড করে দিয়ে গেল আমাদের। বাইরে বৃষ্টির শব্দের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তাইরে নাইরে না গাইছে ব্যাঙ আর ঝিঁঝির দল। থেকে থেকে আকাশ গম্ভীর স্বরে বলছে, উঁহুঁ তাল মিলছে না যে।

বিদ্যুতের ঝলক অরুণের মুখে পড়তেই দেখলাম সে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছে উইন্ডস্ক্রিনের দিকে। বুঝলাম ও খুব কষ্ট পাচ্ছে। হঠাৎই ও আমার হাতটা চেপে ধরে বলল, লোকটা মরবেই। পৃথিবীর কোনো বদ্যি, কোনো ধন্বন্তরি ওকে বাঁচাতে পারবে না। কেননা আজ পেশেন্টের ঘরে মিসেস চট্টরাজকে দেখলাম। এই বলে অরুণ চুপ করে গেল।

এবার হতবাক হওয়ার পালা আমার। ঐ গ্রামে পেশেন্টের বাড়ি মিসেস চট্টরাজ নামে কে আসতে পারেন? আর যিনিই আসুন না কেন তিনি কেনই বা খামোকা সেই লোকটির মৃত্যুর কারণ হবেন?

অরুণ বলল, মিসেস চট্টরাজের পুরো নামটা ছিল মিসেস সুমিতা চট্টরাজ। ওঁর স্বামী ছিলেন সে আমলের দুঁদে আই. এ. এস. অফিসার, মিস্টার শোভন চট্টরাজ। সময়টা ছিল সেভেন্টি টু-এর ডিসেম্বর মাস। আমি তখন পিজি হাসপাতালে ইনটার্নি।

মিসেস চট্টরাজ ঐ হাসপাতালের উডবার্ন ওয়ার্ডে ছিলেন। ওঁর মাথায় একটা আন-আইডেন্টিফায়েড পেইন হত। সেটার ইনভেস্টিগেশনের জন্যই তিনি ভর্তি হয়েছিলেন ঐখানে। আর আমার ওপর ভার ছিল তাঁর দেখাশোনা করার।

তারপর?

ভদ্রমহিলা বয়সে আমার দিদির মতোই ছিলেন। প্রথম দিন থেকেই ওঁর ব্যবহার আমাকে মুগ্ধ করত। তাঁর কথাবার্তা এবং অপরূপ রূপরাশির কথা তখন চাউর হয়ে গেছিল হাসপাতালে। ভি. আই. পি.-র স্ত্রী বলে আমার ওপর নির্দেশ ছিল ডিউটির সময়টুকু যেন মুহূর্তের জন্যও ওঁর ঘরছাড়া না হই। দিনে আমি থাকতাম আর রাতে আর একজন।

মিসেস চট্টরাজের মাথাব্যথা কি সব সময়েই হত? আমি জিগ্যেস করলাম অরুণকে।

হ্যাঁ, ব্যথাটা ছিল চাঁদের বাড়া-কমার মতো। তবে দিনের দিকে কম থাকত, রাতে বাড়ত। বেদনা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণায় উনি পাগলের মতো আচরণ করতেন। ওঁকে তখন ব্যথানাশক ও ঘুমপাড়ানি ইনজেকশন দিতে হত। একটা টেবিলফ্যান রাখা থাকত ওঁর মাথার ঠিক পাশেই। সেটা অন করে

দেওয়া হত এবং মাথায় হাত বুলিয়ে দেওয়া ছাড়া আমাদের আর করার কিছু ছিল না। তবে ব্যথাটা যখন কম থাকত উনি গল্প করতেন। ওঁর ছেলেবেলার কথা, বেড়াতে গেছেন যে সব জায়গায় সেইসব গল্প বলতে ভালোবাসতেন খুব। আর ভালোবাসতেন তাঁর পাঁচ বছরের মেয়ে মিষ্টুনিকে। বিকেলে মেয়ে এলে ওঁর যন্ত্রণাকাতর মুখেও একটা অন্যরকম খুশির ছোঁওয়া থাকত।

কথা বলার ফাঁকে অরুণ একটু থামতেই আমার হাতঘড়িটা শব্দ করে জানান দিল, 'সময় চলিয়া যায়'। আমি হাতঘড়ি দেখলাম রাত ন'টা। বৃষ্টি প্রায় ধরে এসেছে। বদলে যাচ্ছে আকাশের ছবি। মেঘেরা সব জল হয়ে ঝরে পড়তেই আকাশের দখল নিচ্ছে চাঁদ। এক ফ্যাকাশে সাদা আলোয় ধীরে ধীরে ঢেকে যাচ্ছিল চারপাশের চরাচর। অরুণ বলল, একটু আলোর দিকে গেলে হয় না? চারপাশের আঁধার যেন গলা টিপে ধরছে। আর একটু চা-ও খেতে হবে।

অগত্যা আবার গাড়ি ছাড়লাম। বৃষ্টির রাতে দোকানপাট সব বন্ধ। চায়ের খোঁজ করতে করতে এসে পড়লাম ব্যান্ডেলে। গরম চা পাওয়া গেল স্টেশনের বাইরেই। চায়ে চুমুক দিতেই অরুণের মোবাইল বাজল। ফোন করছে ওর স্ত্রী জনা। অরুণের মুখচ্ছবি আবার খবরের কাগজের হেডলাইন হতে থাকল। দু'চারটে হুঁ, হ্যাঁ, আচ্ছা বলে ফোন ছেড়েই সে বলল, মিসেস চট্টরাজ ওঁর ডিউটি করে গেছেন। চাঁপারুইয়ের পেশেন্ট মারা গেছে। আমার মোবাইল রেঞ্জের বাইরে ছিল বলে খবরটা এতক্ষণ পাইনি। ওঃ কী ভয়ঙ্কর! এতগুলো বছর পরও—

গাড়ি নিয়ে দিল্লি রোডে এসে পড়তেই অরুণ শুরু করল তার না-বলা কথা। একদিন সুমিতাদি আমাকে বলেছিলেন, জানো অরুণ আমি বেশ বুঝতে পারি আমি আর বাঁচব না। আমাকে চলে যেতে হবে। কোথায় যাব বা কীভাবে যাব তা জানি না। কিন্তু সেই সঙ্গে ভাই, কিছু মনে করো না, তোমাদের ওপর আমার খুব রাগ হচ্ছে। কেন তোমরা আমার ব্যথা সারিয়ে দিচ্ছ না! দরকার হলে মাথাটা কেটে দ্যাখো না! কিন্তু প্লিজ আমাকে বাঁচিয়ে দাও। পৃথিবীতে সবাই থাকবে, কেন আমাকে চলে যেতে হবে? আমার কী মরার বয়স হয়েছে? এরপর অরুণ দম নেওয়ার জন্য একটু থামল তারপর ধীরে-সুস্থে একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, আবার শরীর ভালো থাকলে আমাকে তুই-তোকারিও করতেন। বলতেন, তোদের কাছে কত ঋণ রয়ে গেল। ভালো হলে তোকে ভাইফোঁটায় নেমন্তন্ন করব, আর বড় বড় গলদার মালাইকারি খাওয়াব। কিন্তু মানুষের কোন ইচ্ছেই বা সবসময় পূরণ হচ্ছে? দিনটার কথা আজও স্পষ্ট মনে পড়ে। নাইনটিনথ জানুয়ারি, নাইন্টিন সেভেনটি থ্রি। আমি বেলা দশটা নাগাদ ডিউটিতে জয়েন করতে যাচ্ছি ওঁর ঘরে। লম্বা করিডোরটার মোড় ঘুরতেই দেখি সিস্টার মালবিকা, খুব জোরে দৌড়ে আসছেন। আমায় দেখেই আর্তনাদ করে বললেন, শিগগির মিসেস চট্টরাজের ঘরে যান।

তারপর?

দৌড়েই ঢুকলাম ওঁর ঘরে। দেখলাম, শুয়েই আছেন। তাকিয়ে দেখছেন আমাকে। ওঁর চানের সময় বলে মাথার চুল খোলা ছিল। ওঁর চুল ছিল মেয়েদের কাছে ঈর্ষণীয়। মাঝে মাঝে বলতেন, অরুণ বল্ তো ভাই, এত চুলের জন্যই কি আমার এত ব্যথা? যাই হোক ঘরে ঢুকে আমার সাইড ব্যাগটা টেবিলে রাখতে রাখতে ওঁকে বললাম, গুড মর্নিং দিদি। ভালো আছেন তো?

হুঁ। উনি সংক্ষেপে উত্তর দিলেন।

ব্যথা আছে?

হুঁ।

তাহলে ফ্যান বন্ধ কেন? দাঁড়ান ফ্যানটা চালিয়ে দিই। বলে পাখাটা চালিয়ে দিলাম। ওঁর চিকিৎসা ব্যবস্থার চার্ট দেখতে দেখতে জিগ্যেস করলাম, রাতে খেয়েছেন?

উত্তর নেই।

দিদি, কাল খেতে ভালো লেগেছিল?

উত্তর নেই।

দিদি বলে ঘুরে দাঁড়াতেই, বামা তোকে বলব কি আমি আতঙ্কে নীল হয়ে গেলাম। দেখলাম উনি আমার দিকে বিস্ফারিত নেত্রে তাকিয়ে আছেন। কিন্তু শরীর নিস্পন্দ। শুধু মাথার চুলে ঘূর্ণি তুলেছে পাখার বাতাস। সেই প্রবল বেগে আলোড়িত চুল দেখে মুহূর্তের জন্য আমার মনে হয়েছিল, উনি উঠে এগিয়ে আসবেন আমার দিকে। আমি টেনে দৌড় লাগালাম। এমন ঘটনা শুনেছিস কখনও? বাইরে বেলা দশটার ঝলমলে রোদ্দুর, সর্বত্র জীবনের প্রবল উপস্থিতি, আর মৃতদেহকে ভয় পেয়ে ছুটছে এক ডাক্তার!

তাহলে ওঁর ঐ উত্তরগুলো কি তুই ভুল শুনেছিলি?

অসম্ভব। আমার কানে আজও ঐ হুঁ বাজে। শুধু তাই নয়, পরে যখন সকলের সঙ্গে আবার ঐ ঘরে ঢুকি তখন কী দেখেছিলাম জানিস? ওঁর দু'চোখ বোজা। বড় পরিশ্রান্ত হয়ে যেন ঘুমিয়ে পড়েছেন তিনি। পরে জেনেওছিলাম মৃত্যুর সময় ওঁর চোখ বন্ধই ছিল। তাহলে কি উনি আমাকে দেখতেই চোখ খুলেছিলেন ঐরকম ভয়ংকরভাবে? ঐ প্রথম। ঐ শেষ। ডাক্তারি জীবনে আর কখনও অমন আতঙ্কের শিকার হইনি। তবে এখনও আতঙ্কের কারণ হয়েই আছেন সুমিতাদি। রোগী দেখতে দেখতে চেষ্টা করি যেন ঘরের অন্য কোথাও আমার চোখ না পড়ে। কিন্তু তিনি এলে আমার চোখে পড়বে না, এ কি তাঁর সহ্য হবে? যে রোগীর মরণ নিশ্চিত শুধু তারই শিয়রের পাশে তিনি এলোচুলে দাঁড়িয়ে থাকেন এবং বিস্ফারিত নেত্রে তাকিয়ে থাকেন রোগীর দিকে। আজ অবধি বহু লোকের নিদান হেঁকেছি শুধু ওঁকে দেখে। এর মধ্যে আমার নিজের আত্মীয়স্বজনও ছিলেন বৈকি। এখন তুই-ই বল, এসব ঘটনা কি কাউকে বলার?

আমি কোনো উত্তর দিলাম না। তবে মনে মনে ঠিক করলাম আমার কিছু হলে অন্তত ওকে ডাকব না। পরমায়ু থাকুক বা না থাকুক তা আগেভাগে জেনে, বাঁচার আনন্দ নষ্ট করতে চায় কোন আহাম্মক?

আষাঢ় ১৪১১

সীতা বামনী

ধর্মদাস মুখোপাধ্যায়

সীতা বামনী মরে বাঁচল। স্বামী-হারানো সীতা অনেকদিন বাপের ভিটে আগলে পড়ে ছিল। ওর দাপটে কেউ কুটোগাছি পর্যন্ত নড়াতে পারত না ওদের উঠোন থেকে। ওপাশের আমবাগানে কেউ কাঠ ভাঙতে এলে সীতা টের পেত। বাড়ি থেকে রে রে করে এমন চিৎকার করে তেড়ে যেত সেদিকে যে ছেলেটা পড়ি কি মরি করে লাফ দিয়ে পড়ত উঁচু ডাল থেকে। পড়েই ভোঁ দৌড়। লাগলে ব্যথা পেলে ওর নাগালের বাইরে গিয়ে পায়ে হাত বুলোত।

মরার পরও সীতার দাপট কমেনি। উঠোনের তুলসীগাছটা যেমন ছিল তেমনই আছে বরং জল পেয়ে ফনফনিয়ে উঠেছে চারদিকে ফ্যাকড়া কচি পাতা ছেড়ে। অশরীরী সীতার ভয়ে কেউ আসে না ওর খোলামেলা বাড়িতে। কোন এক দুষ্টু ছেলে মায়ের নিষেধ না শুনে এসেছিল তুলসীগাছটাকে তুলে নিয়ে তাদের বাড়িতে বসাবে বলে। গাছটাকে তুলতে যাবে এমন সময় হঠাৎ কাছ থেকে ভীষণ শব্দ ভেসে এল, 'কোন হ্যায়!' 'ওরে বাবা রে' বলে সেই ছেলে প্রাণপণে ছুটে গিয়ে থামল একেবারে বাড়ির দরজায়।

'কি হল রে ন্যাপলা?'

মায়ের কথার জবাব দেবে কে! সে তখনও হাঁপাচ্ছে আর ঘামছে দরদর করে।

আসলে আবুল ক্ষ্যাপা কোনো বাড়িতে ভিক্ষে না পেলে বা খেতে চেয়ে খাবার না পেলে তার মেয়েমানুষের মতো চুল টেনে দু'একটা ছিঁড়ে ফেলবে নয়তো লম্বা কালো দাড়ি টানতে টানতে চিৎকার করবে 'কোন হ্যায়' বলে।

একদিন তো জেলেপাড়ার একটা বউ সীতার সন্ধ্যামণি ফুলগাছটায় লাল-সাদায় দোরাঙা বিচিত্র সুন্দর ফুল ফুটতে দেখে লোভ সামলাতে পারেনি। সন্ধ্যা নামার আগেই যদুবাবুর পুকুর থেকে গা ধুয়ে ফেরার পথে সুন্দর ফুল দেখে হাত বাড়িয়েছিল তা তুলতে। হাত বাড়িয়েছে এমন সময় মনে হল কে যেন তার পাশে এসে দাঁড়াল। তার দীর্ঘশ্বাসের শব্দ কানে এল। সে দীর্ঘশ্বাস যেন বউটির চোখে-মুখে হাওয়ার কাঁপন ধরিয়ে তপ্ত বাতাস ছুঁড়ে দিল।

'ও মাগো' বলেই বউটি এলিয়ে পড়ল উঠোনে ভাঙা রকের ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ইঁটের গাদার ওপরে। পিছনে আসা তার গা-ধোওয়ার সঙ্গিনীরা তাকে ধরে ধরে নিয়ে আসে বাড়িতে। সে রাতে আর কেউ শুধোয়নি তার ভয় পাওয়ার কারণ। সবারই তা জানা। তবু তার অন্তরঙ্গ বউটি নাছোড়বান্দা হওয়ায় চুপি চুপি বলেই ফেলল সকলের কান বাঁচিয়ে, 'সীতা বামনীকে দেখলাম।'

সীতা বামনীকে কি অবস্থায় কোন রূপে দেখল তার আর প্রশ্ন করার সাহস হয়নি। সবটা শুনলে সেই মূর্তি আবার তার কাঁধে ভর করে এটাই ভয়।

গঙ্গার ঘাটে স্নান করতে যাবার সময় মেয়ে-বউরা একটু দাঁড়ায় সীতার ঘরের সামনেটায়। অবাক হয় ওর উঠোনটা দেখে। কেউ যেন ভোরবেলায় ঝাঁটপাট দিয়ে রেখেছে। ছোট্ট উঠোনটা পরিষ্কার ঝকঝকে তকতকে।

সীতা বেঁচে থাকতেও সকালে উঠে ওটাই ছিল ওর প্রথম কাজ। মাজা পড়ে এসেছিল। ঠিকমতো খেতে না পাওয়া শীর্ণ হাড়গোড় বার করা শরীরটা হেঁট হয়ে উঠোন ঝাঁট দেওয়ার মতোও ছিল না। তবু বাড়ি-ঘর সব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখাই ছিল তার কাজ।

গঙ্গা-স্নানার্থিনীদের ওখান দিয়ে যাবার সময় একবার কথা না বলে যাওয়ার উপায় ছিল না। এক মিনিট দাঁড়িয়ে বলত, 'ও দিদি, কি করছ গো!'

এই সুযোগে একটু খাড়া হয়ে দাঁড়াবার সুযোগ পেত সীতা বামনী। বলত, 'মরণ নেই তো! তাই পরের উঠোন ঝেঁটিয়ে মরচি!'

'পরের কেন! এখন তোমারই! তুমি বাস করচো, আগলে রেকেচো!'

'ঝাঁটা মারো আমার কপালে, একুনই আসবেন বাবুরা! বড়বাবু থাকতে বলেন তো ছোটবাবু ঘাড় ধরে বের করে দেন দুপুর রাতে! ওই কাকাবাবু আচেন পাশেই, তাই ঠাঁই জুটেছে এই ভাঙা ঘরে। ঘর সারিয়ে দেবার মুরোদ নেই কোনো বাবুর, তাড়িয়ে দেবার বেলায় আচে সবাই।'

ওর ভাই আর দাদা দুজনেই চায় ভাঙা বাড়িটা বেচে দিয়ে তাদের শহরবাসের বাড়ি সেই টাকায় সাজিয়ে-গুছিয়ে তুলতে।

পাশের বাড়ির কাকাবাবু ছাড়া আর একজন ছিল সীতার সহায়। সে ওই আবুল ক্ষ্যাপা। এখনও মধ্যে-মধ্যে ঘুরে-ফিরে আসে এখানে। বসে ওই উঠোনটায়। সীতা ক্ষেপী আর সে ক্ষ্যাপা।

ওদের মধ্যে খুব যে কথাবার্তা হত তা নয়। সীতা ওকে খেতে দিয়েছে এমনও নয়। তবু আবুল আসত, বসত। কেউ কেউ মনে করত আবুল তুকতাক মন্ত্রতন্ত্র জানে। সেই সুবাদেই দুজনের ভাব। সময়ে সময়ে আবুল হাসত অট্টহাসি হা হা করে ওপর দিকে মুখ তুলে। তার বড় বড় হলদে দাঁতগুলোয় সূর্যের আলো পড়ে ঝকঝক করে উঠত। ডাগর চোখ দুটো ছোট হয়ে বুঁজে আসত। গলায় রুদ্রাক্ষের মালাটা দুলে উঠত আর রুদ্রাক্ষের ঠোকাঠুকিতে আওয়াজ উঠত একটা সুরেলা। আলখাল্লাটা হাওয়ায় কাঁপত ঝিরঝির করে। পাশেই নামিয়ে রাখা তার ছেলেধরার ঝোলাটার ওপর ঝরে পড়ত দাড়ি চুঁইয়ে টপটপ করে ঘামের ফোঁটা।

তাই সেই শিশুদের কাছে সাক্ষাৎ যম ও ভীষণদর্শন আবুল ক্ষ্যাপা এখনও আতঙ্ক। সীতা ক্ষেপীর উঠোন ছিল সময় সময় শিশুদের খেলার জায়গা। হয়তো খেলছে আপন মনে এমন সময় আবুল ক্ষ্যাপা ওদের খেলা দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল হাসি হাসি মুখ করে। দাঁত বার করে সেই হাসি চোখে পড়া মাত্র শিশুরা হাওয়া হয়ে যেত নিমেষে।

'তোমায় ভয় পায় কেন গো বাচ্চারা?' সীতাই প্রশ্ন রেখেছিল আবুলের সামনে।

'কি জানি মাসি, কেন ওরা ভয় পায়।'

'তোমার ওই ঝোলা দেখে বোধহয়। বলে ধরে নিয়ে যাবে ঝোলায় পুরে।'

এবার আবার সেই পাগলা অট্টহাসি। 'এর মদ্যে আছে আমার একটা কম্বল। গায়ে দিই আবার কোথাও পেতে বসি খেতে দিলে।'

সীতাকে ভয় পাবার কারণ তার মুখের বাক্যি। কাক-চিল পর্যন্ত বসতে ভয় পায় সীতার ভাঙাঘরের ছাদে। 'মর মর কাখট্টে পাখি! একেই আমার ভাঙা ঘর তার ওপর আবার তোদের উপদ্রব!'

সীতা নিজের বাপকেও ছেড়ে দেয়নি গালাগালি দিতে। 'সব্বোনেশে বাপই তো আমায় ফাঁসিয়েচে! দেখে দিতে পারেনি মেয়ের বিয়ে!'

ওর বাড়ির পেছনে জেলেপাড়ার মেয়ে-পুরুষের পায়খানা করার জায়গা। চোখে পড়লে মুখ ছুটত না তুবড়ি ছুটত! 'ওরে বাঁশবুকো, ওলাউটোরা, ঝাড়েবংশে নিববংশ হবি! ওখানে যে আপনাদের পুব্বপুরুষের ঠাকুরদালান ছিল? নরকে যাবি, ওলাউটোয় পাড়া উজাড় হয়ে যাবে!'

এই মানুষটার আবার গুণও ছিল। মানুষের বিপদে এগিয়েও যেত। ওই দজ্জাল ঝগড়ুটে কর্কশকণ্ঠী সীতার মুখে মধু ঝরত, 'ও দিদি ভয় কি! আমরা তো আছি!'

অসুস্থ সেই দিদির পাশে বসে তাকে জল এগিয়ে দিয়েছে। পরের গাছ থেকে লেবু তুলে এনে সরবত করে খাইয়ে তবে ছুটি মিলেছে সীতার। তার আগে পাড়াতুতো দিদির ঘরদোর সাফ করতে এতটুকু কুণ্ঠা হয়নি। তার নোংরা কাঁথা-কাপড় পর্যন্ত সাফ করে শুকিয়ে আবার তাকে শুইয়ে দিয়ে এসেছে বিছানা করে।

এই ক্ষেপী সীতাই একদিন মরল যখন কেউ ছিল না পাশে। দাদা আর ভাই আগেই মরেছিল। ভাইপোদের ঠিকানাও জানা ছিল না কারও। পড়শী পাশের বাড়ির যে কাকিমা তাকে ভালোবাসতেন,

সময় সময় তাঁর নামেও সীতা নিন্দা করে আসত পাড়ায়। ভালোবাসার কাঙাল ছিল মেয়েটা। কোথাও একটু খুঁত দেখলে মার মতো কাকিমার নামে যা-তা বলতেও বাধত না বলেই লোকে তাকে বলত ক্ষেপী।

সেই ক্ষেপীর মৃত্যুতে আপনজন হল পর। ভাইপোরা খোঁজ নিতে আসেনি যেহেতু বিক্রি করার মতো কোনো সম্পত্তি অবশিষ্ট ছিল না গ্রামের বাড়িতে। আমবাগান, জমি বিক্রি করলে পাড়া-পড়শীর অনুরোধে দু'দশ টাকা ফেলে দিয়ে যেত বোনকে। কাকিমার বাড়ি কখনও অন্য বাড়িতে কাজকর্ম করে চলছিল। শয্যাশায়ী হবার পর অবশ্য কেউ কেউ দু'এক মুঠো ভাত দিয়ে যেত ওর ভাঙা বাক্সটায় কিংবা কালো তেলচিটে বালিশটার তলায় জমানো গোপন টাকার আশায়। চিকিৎসা হয়নি। যেটুকু হয়েছে তার বেশি সাধ্য ছিল না পাড়ার লোকের।

হাত-পা ফুলে অশেষ কষ্ট পেয়ে যখন মারা গেল সীতা, একটি-দুটি করে এল আশপাশের মানুষই। সম্পত্তির মধ্যে ছিল একটা চেয়ার, তোবড়ানো আদ্যিকালের একটা রঙচটা টিনের বাক্স যা খুলে বার হল ছেঁড়া শাড়ি, একটা শীতের চাদর, কিছু খুচরো পয়সা, মার একখানা পোকায় কাটা ফোটো।

একে-ওকে ডাকতে হাঁকতে সকালের মড়া উঠল সন্ধ্যায়। মুখটা ছিল হাঁ করা মরার সময়। বোধহয় একটু জল খেতে চেয়েছিল। দু'চারটে দাঁত যা ছিল অবশিষ্ট তা বেরিয়ে পড়ায় মুখটা হয়ে উঠেছিল ভয় পাবার মতোই, চোখ দুটো ছিল খোলা ঘরের মায়ায় আবদ্ধ।

জোয়ান ছেলেরাই নিয়ে গেল মৃতদেহ দাহ করতে। সন্ধ্যারাতে নেমেছে অমাবস্যার অন্ধকার। টিমটিম করা গোটা দুই লণ্ঠনের আলো। হরিধ্বনিতে মুখরিত হল ভ্যাপসা বদ্ধ ঘরের চার দেওয়াল আর বাইরের খোলা আকাশ।

'বল হরি, হরি বোল।'

মনে সাহস যোগাতে ঘন ঘন হরিধ্বনিতে মুখরিত পাড়ার নিস্তব্ধ পরিবেশ। শ্মশানযাত্রীরা ভীত সন্ত্রস্ত। গ্রামের বাইরে পা দিতেই মৃতদেহের ভার হয়ে উঠল অসহ্য। ঘন ঘন কাঁধ বদল করেও রেহাই নেই। সীতার মৃতদেহটা ক্রমেই চেপে বসল ওদের কাঁধে। মনে হল ওকে শেষ অবস্থায় ভালো করে দেখভাল না করার শোধ নিচ্ছে ক্ষেপী বামনী।

'বল হরি, হরি বোল' ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। সবাই চুপচাপ। যেটুকু হাওয়া ছিল, ঘাটের পথে তাও বন্ধ হয়ে গেল কারও নির্দেশে।

থমথমে ভাব। ভয় কাটাতে ঘন ঘন হরিধ্বনি শ্মশানযাত্রীদের মুখে। দুর্বিষহ ভার লাঘবে কাঁধ বদল চলল। দোলানিতে আর অপটু বাঁধনে দড়ি আলগা হয়ে পচা মাদুর ছিঁড়ে মাটিতে পড়ে গেল সীতা বামনীর মৃতদেহ।

শ্মশানযাত্রীরা ছিটকে পড়ল এদিক-ওদিকে আতঙ্কে। বামনী মরেনি নাকি? নাকি অপদেবতায় ভর করল? মড়া খাটুলি ছিঁড়ে পড়ে যাওয়াটা ভীষণ অমঙ্গলের। আবার গাঁয়ের বাইরে স্নান করতে যাওয়া ঘাটে পড়ে থাকাটা আরও ভয়ঙ্কর ব্যাপার।

তাই কাঁধে উঠল মৃতদেহ আবারও। দাহ না করা পর্যন্ত শান্তি নেই।

বৃষ্টি নামল ঝিরি ঝিরি। দুটোর একটা লণ্ঠন কোন সময়ের দমকা বাতাসে নিভে গিয়েছে। অন্যটাও ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন। তেল ফুরিয়েছে বোধহয়, শুধু পুড়ছে সলতে। এই অন্ধকারের মধ্যেই হঠাৎ জুটল নতুন শ্মশানযাত্রী—একটা কালো বেড়াল পায়ে পায়ে বাধা সৃষ্টি করে চলল তার মিউ মিউ শব্দে নিস্তব্ধতাকে ভঙ্গ করে।

চিলু সাজিয়ে আগুন দিতেই পাটকাঠি জ্বলে উঠল দাউ দাউ করে। চিতা জ্বলল কিন্তু তা নিভু নিভু হল মৃতদেহের ফোলা শরীর থেকে বার হয়ে আসা জলে। কোনোরকমে আধপোড়া করে শ্মশানযাত্রীরা ফিরে এল রাত গভীরে সারা গ্রাম সচকিত করে 'বল হরি হরি বোল' ধ্বনিতে। হরিধ্বনিতে ভয় পেয়ে ঘুমন্ত শিশু কেঁদে উঠল মাকে জড়িয়ে ধরে।

সীতা ক্ষেপীর সৎকার হল কিন্তু সীতা বাড়ি ছাড়ল না। তার প্রতিনিধি হয়ে কালো বেড়ালটা

বন্ধ ঘরের একপাট খোলা জানলা দিয়ে ঘরে ঢুকে কাঁদতে বসল করুণ সুরে। ওরই একটা বড় মরচে ধরা তালা ঝুলিয়ে দিয়ে ঘরের সম্পত্তি হল সুরক্ষিত।

রাতে পাশের বাড়ির মানুষজন হঠাৎ ঘুম ভেঙে উঠে পড়ে বেড়ালের কান্নার শব্দ শুনে। কখনও জেগে উঠে শোনে ওর ঘরের তালা খোলার শব্দ। ঘরের মধ্যে গোঙানির আওয়াজ। বেঁচে থাকতে রোগের যন্ত্রণায় যে কাতর আর্তনাদ শোনা যেত, মরার পরও অবিকল তাইই।

সীতা বামনীর এক বোন আসত মাঝে-মধ্যে দিদির কাছে দেখা দিতে। সে অনেকদিন দিদির কোনো খোঁজ না পেয়ে চলে এল হঠাৎই।

তিন ঘণ্টা ট্রেন লেট। মিতা চারটের জায়গায় এল সাতটায়।

অন্ধকার রাত। আগের মতোই সোজা গিয়ে দাঁড়াল উঠোনে।

রাত দশটা পর্যন্ত আলো জ্বলে দিদির ঘরে। আজ কোনোরকম আলোর ইশারা নেই। জানলার ফাঁক দিয়ে শুধু অন্ধকারই বেরিয়ে এসে তাকে অভ্যর্থনা জানাল। আর এল দিদির প্রতিনিধি হয়ে একটা কালো চোখকটা বেড়াল তার জ্বলন্ত চোখ নিয়ে। ঘুরতে লাগল ওর চারপাশে গোঁ গোঁ শব্দ করে।

'দিদি! দিদিরে!'

ওর কথায় সাড়া দিল না কেউ।

আবারও বলল, 'দিদি! আমি মিতা! এলাম তোকে দেখতে!'

সাড়া দিয়ে বেড়ালটা কেঁদে উঠল ঠিক মানুষের মতো করুণ সুরে মিউ মিউ শব্দে।

একটু পরে বেড়ালটা তাকে ছেড়ে ঘরে ঢুকে গেল জানলা দিয়ে। ঘর থেকেই বেরিয়ে এল সাদা কাপড় পরা তার দিদি। তার সামনে এসে দাঁড়াল ঘরের বন্ধ দরজার কাছে।

'কি হল রে দিদি! আলো জ্বালাসনি!'

ওর কথায় সাড়া না দিয়ে দিদি নিঃশব্দে চলে গেল রক ডিঙিয়ে ঘরের কোণ দিয়ে একেবারে গলিপথ ধরে ঘরের পিছনে।

কি যেন মনে হল। গোলমালের মতো। তবু ডাকল 'দিদি!'

কেউ এল না। শুধু গোঙানি শুনল বেড়ালটার। কিছু একটা ধরেছে অথবা ওটাকে কেউ ধরেছে গলা টিপে।

এ বাড়ির কেউ এলে ভরসা সেই পাশের বাড়ির কাকিমা। 'কাকিমা, দিদির সাড়া পেলাম না! আমার সামনে দিয়েই চলে গেল ঘরের পিছনে। অনেকদিন আসিনি, রাগ হয়েছে বোধহয় তাই সাড়া দিল না।'

কাকিমার মুখেই দিদির মৃত্যুর খবরটা শুনল মিতা। বাড়ির উঠোনের ঘটনাগুলো মনে পড়তেই গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল তার। কালো বেড়ালটা তখনও একটানা ঠিক মানুষের মতো সুর করে বিলাপ করে চলেছে। মনে হল যেন কানের কাছেই।

মিতা 'রাম রাম' বলতে বলতে জড়িয়ে ধরল কাকিমাকে।

কার্ত্তিক ১৪০৫

দেখা হবে মাঝরাতে

শুভমানস ঘোষ

সুপারভিউ টিভি কোম্পানির কলকাতা জোনের এজেন্ট হিসেবে গ্রাম বাংলায় ঘুরে বেড়াতে হয় সুমনকে, চষে বেড়াতে হয় এক শহর থেকে অন্য শহর, এক জেলা থেকে অন্য জেলা। এইরকমই ঘুরতে ঘুরতে সে অনেক দিন পরে এসেছে পানিপাতিনিতে।

পানিপাতিনি বাসস্ট্যান্ডের কয়েক হাত তফাতে মা জগদম্বা লজে বছরকাবারি ঘর রাখা থাকে সুমনের, কোম্পানিই পেমেন্ট করে। কোম্পানির আরও অনেক এজেন্ট আছে। বছরভরই তাদের যাতায়াত চলে পানিপাতিনিতে।

জাতীয় সড়ককে মেরুদাঁড়ার মতো মাঝে রেখে গড়ে ওঠা ছোট জনপদ পানিপাতিনি। ঠিক শহর না হলেও ভিডিও পার্লার, ইন্টারনেট পার্লার, বিউটি পার্লার আর মোবাইল ফোন পরিষেবা পুরোপুরি ঢুকে গেছে পানিপাতিনিতে।

ক'দিন ধরে বেশ ঠান্ডা পড়ে গেছে। হোটেলের কাউন্টারে গলায় মাফলার জড়িয়ে বসে ছিলেন হোটেলের মালিক শ্যামবাবু, সুমনকে দেখে খুশি হলেন, বললেন, আসুন সুমনভাই, আসুন। এবার অনেক দিন পরে যে!

শ্যামবাবুর বয়েস পঞ্চাশের আশেপাশে, গায়ের রং দু'পোঁচ কালো কম করে, মাথাখানা বিরাট, ফালা ফালা চোখমুখ, মুখভর্তি দাড়ি-গোঁফ—দেখলেই মন আপনা-আপনি সম্ভ্রমে ভরে ওঠে। আজ আবার কপালে লাল টিপ লাগিয়েছেন। হোটেল ব্যবসার পাশাপাশি তিনি এখানে-সেখানে টুকটাক পূজা-আর্চাও করে থাকেন।

হুঁ, নিয়ার অ্যাবাউট এক বছর হবে। সুমন শ্যামবাবুকে নমস্কার করে জানতে চাইল, আপনারা কেমন আছেন শ্যামবাবু?

শ্যামবাবু চোখ বুজে নমস্কারের প্রত্যুত্তর দিয়ে বললেন, মা মহামায়ার আশীর্বাদে তা একরকম আছি। আপনার সব খবর ভালো তো ভাই?

সুমনের বয়েস বেশি নয়, চল্লিশের আশেপাশে। মাঝারি হাইট, গায়ের রং ফরসার দিকে, মুখ-চোখ ভালো। কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, ফাইন!

পানিপাতিনির কাজ একদিনের মধ্যে শেষ হয়ে গেল সুমনের। পরের দিন আর বেরোল না, হোটেলে বসে ডিস্ট্রিবিউটরের ঘর থেকে কালেক্ট করে আনা তথ্যগুলো এক করে রিপোর্ট তৈরি করে ফেলল। তারপর সন্ধের পরে জ্যাকেটটা গায়ে চড়িয়ে বেরিয়ে পড়ল ঘুরতে।

পানিপাতিনি জায়গাটা বেশ মনোরম। লোকজন, গাড়ি-ঘোড়া, দোকানপাট থাকলেও গ্যাঞ্জাম নেই। এখানকার চমচমের খুব সুনাম আছে। একটা দোকানে বড় দেখে খান পাঁচেক চমচম গপাগপ গিলে মন খুশ হয়ে গেল সুমনের।

হাঁটতে হাঁটতে বাসস্ট্যান্ড ছাড়িয়ে চলে এল ন'দিঘার মোড়ে। এখান থেকে মিনিট পাঁচ ডাকাতে কালীবাড়ি, তারপর মিনিট দুই হাঁটলেই ছায়াচিত্র সিনেমাহল। পানিপাতিনিতে এলে ছায়াচিত্র হলে নাইট শো-এ একটা করে ছবি বাঁধা সুমনের। বাংলা-হিন্দি-ইংরেজি যখন যেমন হয়।

জীবনে ছবি অনেক দেখেছে সুমন, তার উপর এখন টিভির দৌলতে ঘরে বসেই রিমোট টিপে যত খুশি ছবি দেখা যায়, তাই ছবি দেখাটা তার লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য হল, টাইম পাস। বাড়তি হল, সিনেমাহলের মালিক রবিবাবুর সঙ্গে একটু আড্ডা মেরে আসা। টিভি আর

সিনেমা নিজেরা ভাই ভাই না হলেও ভায়রাভাই তো বটেই। অতএব রবিবাবু বলতে গেলে তার লাইনেরই লোক।

কিন্তু হাঁটতে হাঁটতে ছায়াচিত্র হলের সামনে পৌঁছে সুমন হতাশ হল। টিভির দাপটে সিনেমা ব্যবসার হাল দিনে দিনে খারাপ হচ্ছে সে জানে, তার জন্য রবিবাবু তাকে খোঁচা মেরে কথাও শোনান, কিন্তু তাই বলে এই অবস্থা?

সার্চলাইট, ডে-লাইট দূরের কথা, টিমটিম করে একটা লো-ভোল্টেজের বাতি জ্বলছে। তাতে হলের গায়ে লাগানো ছবির পোস্টারটাও ঠিক মতো পড়া যাচ্ছে না। লোকজনও আশেপাশে বিশেষ চোখে পড়ছিল না।

কাউন্টারে মুখ পর্যন্ত চাদরে ঢেকে একজন বসে বসে ঝিমোচ্ছিল। লোকটাকে চিনতে পারল না সুমন। গেটে যে লোকটা দাঁড়িয়ে আছে, সেও অপরিচিত। তার চেয়ে বড় কথা, গেটকিপারের পাশে রবিবাবু দাঁড়িয়ে থাকেন, কীরকম কী টিকিট বিক্রি হল নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তদারক করেন, আজ নেই।

রবিবাবু কই? রবিবাবু? সুমন জিগ্যেস করল।

গেটকিপার মুখ তুলে তাকাল সুমনের দিকে। এরও আপাদমস্তক ঢাকা চাদরে। বেশ রোগা, তবে চোখ দুটো জ্বলজ্বলে। পাল্টা প্রশ্ন করল, কোন রবিবাবু?

হাউসের মালিক রবিবাবু। রবিরঞ্জন দাস।

উনি তো আজ আসেননি।

আসেননি?

নাহ! উনি ব্যস্ত আছেন কাজে।

লোকটা মুখ ঘুরিয়ে নিল। শুধু ছবি হবে আজ, আড্ডাটা আর হবে না। ভারী রসিক মানুষ এই রবিবাবু, মুখ-চোখের নানান ভঙ্গি করে এক-একটা এমন মজার কথা বলেন হাসি চাপা দায়। ব্যবসার এই দুরবস্থার মধ্যে কী করে এত হাসি খুঁজে পান কে জানে।

মনটা দমে গেল সুমনের। কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে আস্তে আস্তে সে এগিয়ে গেল ছবির ডিসপ্লে বোর্ডের দিকে।

বাংলা বই চলছে। স্টিল ফোটোগ্রাফ দেখে স্পষ্ট বোঝাই যাচ্ছিল ভূতের বই। কিন্তু অসম্ভব বোকা বোকা নাম, 'দেখা হবে মাঝরাতে'। বাংলা সিনেমার সাধে এই হাল! যাক গে, তার তো সময় কাটানো নিয়ে কথা।

সুমন এগিয়ে গেল টিকিটঘরের দিকে। ব্যালকনির একটা টিকিট কেটে ঢুকে পড়ল হলে। গেটকিপার টিকিট ছিঁড়ে অর্ধেকটা তার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, লাইটম্যান নেই, আপনি আপনার মতো জায়গা বেছে নিয়ে বসে পড়ুন।

যাচ্চলে লাইটম্যান নেই। নাহ, এইভাবে বেশিদিন রবিবাবু টানতে পারবেন বলে মনে হয় না। যে কোনওদিন হাউসে তালা পড়বে!

দোতলার সিঁড়ির মুখে একটা জিরো পাওয়ার জ্বললেও ব্যালকনি পুরোপুরি অন্ধকার। অনেক কাল ধরেই এখানে সুমনের যাতায়াত, তাই লাইটের স্যুইচ খুঁজে পেতে অসুবিধে হল না তার। আলো জ্বালিয়ে পিছনের দিকে ভালো জায়গা দেখে বসে পড়ল সে। সারি সারি সিট ফাঁকা পড়ে আছে, একটা লোক নেই, দেখতে দেখতে গা'টা হঠাৎ কীরকম ছমছম করে উঠল তার।

মিনিট পনেরো কেটে গেল, ওয়ার্নিং বেল পড়ে গেল, ব্যালকনির গেট ঠেলে ভিতরে ঢুকে এল কয়েকজন লোক, তারা নিজেদের মতো জায়গা খুঁজে নিয়ে বসে পড়ল ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। তাদের মধ্যে একজন লুঙ্গিপরা লোকও দেখা যাচ্ছিল। সিটে বসে পা তুলে বেমালুম বিড়ি খেতে শুরু করল। ইন্ডাস্ট্রিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এটুকু কম্প্রোমাইজ না করলেই নয়।

দেখে গা জ্বলে যাচ্ছিল। কী আর করবে—সুমন চুপ করে রইল।

বই শুরু হয়ে গেল। গেট থেকে উপরে এসে ব্যালকনির লাইটটা নিভিয়ে দিয়ে গেট টেনে চলে গেল গেটকিপার। কয়েকটা বোকা বোকা অ্যাডের পর পর্দায় রক্তপানরত হায়নার মুখ ভেসে উঠল। ব্যাকগ্রাউন্ডে শ্মশান, দাউ দাউ করে চিতা জ্বলছে। নানান সাইজের মড়ার মাথা সটাসট নাচতে নাচতে ফুটিয়ে তুলছে বইয়ের টাইটেল, 'দেখা হবে মাঝরাতে'।

বাহ, হেভি টেকনিক তো! নামটা যা-ই হোক, গল্পটা জমে যেতে পারে। সুমন পিঠ টান টান করে বসল।

গল্প শুরু হয়ে গেল। এক বয়স্কা ভদ্রমহিলার উপর ভূত ভর করেছে। ভদ্রমহিলার বাঁশির মতো সরু নাক, জোড়া ভুরু। বয়েস চলে গেলেও এখনও অসামান্যা সুন্দরী। চোখ কপালে তুলে অপ্রকৃতিস্থের মতো তিনি সারা ঘর ঘুরে বেড়াচ্ছেন, চিৎকার করে বলছেন, আমায় রক্ত দাও। আমি রক্ত খাব! বড্ড খিদে আমার! কতদিন না খেয়ে থাকব?

কে বলে বাংলা সিনেমার মান পড়ে গেছে! ভদ্রমহিলা দুর্দান্ত অ্যাক্টিং করছেন, এমন জীবন্ত যে রীতিমতো ভয় ভয় করে উঠল সুমনের। আচমকা সারা শরীর প্রচণ্ডভাবে ঝাঁকি দিয়ে উঠল ভদ্রমহিলার। আস্তে আস্তে চোখ দুটো নর্মাল হয়ে এল তাঁর, তারপর এদিকে-ওদিকে ঘুরতে ঘুরতে ঠিক যেন সুমনের চোখে এসে স্থির হয়ে গেল। ওরে বাবা রে, কী ভীষণ সে চোখের দৃষ্টি! সুমন সহ্য করতে পারল না, সরিয়ে নিল চোখ।

ভদ্রমহিলা খলখল করে হেসে উঠলেন, হাসতে হাসতে বললেন, কী রে আমায় রক্ত দিবি নে? আমার সব রক্ত চেটেপুটে খেয়েছিস, আমায় রক্ত দিবি নে?

সিনেমার ছবি কখনও কথা বলে দর্শকের সঙ্গে! মাথাটা কীরকম ভোঁ ভোঁ করে উঠল সুমনের। আর তার পরে সে চোখের সামনে যা দেখল, মাথাটাই খারাপ হয়ে যাওয়ার জোগাড় হল তার।

সুমন দেখল, ভদ্রমহিলা সিনেমাহলের পর্দা থেকে সটান বেরিয়ে পা-পা করে হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে আসছেন। হাত নাড়িয়ে স্পষ্ট তাকে লক্ষ করেই যেন বলছেন, দাঁড়া, আমি আসছি। তোর শরীরে অনেক রক্ত। গরম গরম, টাটকা টাটকা রক্ত। আআফ! উসসস!

ভদ্রমহিলা জিব চাটতে শুরু করলেন। শুধু কথাই বলে না, পর্দা থেকে ছবির মানুষ নেমেও আসে? নাহ, এতটা বাড়াবাড়ি কিছুতেই সম্ভব নয়। নির্ঘাত কিছু গোলমাল আছে এর মধ্যে। সিট থেকে তড়াক করে উঠে পড়ল সুমন। সঙ্গে সঙ্গে ব্যালকনির দর্শকরা সকলে একসঙ্গে গলা মিলিয়ে হেসে উঠল। সুমন চমকে উঠে তাকিয়ে দেখল, দর্শক কই, পাঁচটা সিটে স্রেফ পাঁচটা কঙ্কাল বসে আছে।

নাহ, যথেষ্ট হয়েছে! মাথায় থাকুক আমার সিনেমা, মাথায় থাকুক টাইম পাস, আর্তনাদ করে সুমন হুড়মুড়িয়ে ব্যালকনির গেট ঠেলে ছুটল সিঁড়ির দিকে। সিঁড়ি ভেঙে নীচে নেমে প্রাণপণে ছুটতে লাগল। ছুটছে ছুটছে! তারপর আর কিছু মনে নেই তার।

দুই

কতক্ষণ ঠিক বলতে পারবে না, আস্তে আস্তে জ্ঞানটা ফিরে এল সুমনের। চোখ মেলে দেখল, সে শুয়ে আছে। তখনও বুকটা তার উঠছে পড়ছে। আতঙ্কে গায়ের লোমগুলো খাড়া খাড়া হয়ে আছে। ধড়মড় করে উঠে বসল সে।

উঠবেন না সুমনভাই! উঠবেন না! ভারী গলায় কে যেন বলে উঠলেন, আর একটু শুয়ে থাকুন।

এই গলা সে চেনে। সুমন বাঁ দিকে ঘাড়টা কাত করতেই দেখল, মা জগদম্বা লজের শ্যামবাবু। সঙ্গে সঙ্গে বুকটা হাল্কা হয়ে এল তার। বলল, না না, ঠিক আছে। আমি কোথায় শ্যামবাবু?

শ্যামবাবু বললেন, মন্দিরে।

সুমনের মাথাটা পরিষ্কার হয়ে এল। তাকিয়ে দেখল, ঠিক তাই। ডাকাতে কালীবাড়ি মন্দিরের নাটমন্দির এটা। দূরে টিমটিম করে একটা প্রদীপ জ্বলছে। তার সামনে চাদরে গুটিসুটি মেরে বসে আছে একজন লোক।

এই লোকটা শ্যামবাবুর চেলা। একটু আগে এই পথ দিয়ে সুমন যখন আতঙ্কে পাগলের মতো ছুটছিল তখন সে-ই ছুটে গিয়ে তাকে ধরেছিল, তারপর মন্দির থেকে বেরিয়ে শ্যামবাবুও তার সঙ্গে হাত লাগান। শ্যামবাবু মন্দিরে তখন নিশীথ পূজায় বসেছিলেন। সুমন তারপরেই অজ্ঞান হয়ে যায়।

শ্যামবাবু জিগ্যেস করলেন, কী ব্যাপার, সুমনভাই? এদিকে কোথায় গিয়েছিলেন এই রাতবিরেতে? কে তাড়া করেছিল আপনাকে?

সুমন থরথর করে কেঁপে উঠল। শ্যামবাবু তাকে ভরসা দিয়ে বললেন, আপনি এখন মায়ের মন্দিরে, সম্পূর্ণ নির্ভয়ে সমস্ত খুলে বলুন।

আরও কিছুক্ষণ লাগল সুমনের নিজেকে সামলাতে। তারপর ভয়ে ভয়ে ঢোক গিলতে গিলতে সমস্ত খুলে বলল। সব শুনে শ্যামবাবু যেন আকাশ থেকে পড়লেন, বললেন, করেছেন কী! ছায়াচিত্র হল তো মাস ছয়েকের ওপর বন্ধ, আপনি গিয়েছিলেন সেখানে বায়োস্কোপ দেখতে? যাওয়ার আগে আমাকে বলবেন তো!

ছায়াচিত্র বন্ধ! কী বলছেন আপনি? সুমন চেঁচিয়ে উঠল।

সে খুব দুঃখজনক ঘটনা। শ্যামবাবু মাথা নাড়াতে নাড়াতে বললেন, জানেন তো সিনেমার ব্যবসার হাল—ছায়াচিত্র হলের মালিক রবিবাবু হাউস চালাতে গিয়ে ধারদেনায় পুরো ডুবে গিয়েছিলেন। মহাজনদের জ্বালায় পানিপাতিনি থেকেই পালান তিনি। শোকে-দুঃখে বিছানা নেন তাঁর স্ত্রী। পরে সুইসাইড করে মারা যান। এ তল্লাটে তাঁর মতো সুন্দরী আর একটি ছিল না। মরার পরও দেখতে গিয়ে চোখ ফেরাতে পারছিলুম না, বুঝলেন?

দাঁড়ান দাঁড়ান। সুমন হঠাৎ কীরকম উত্তেজিত হয়ে উঠল, ভদ্রমহিলার কি জোড়া ভুরু ছিল?

ঠিক ঠিক! শ্যামবাবু অবাক হলেন, আপনি কী করে জানলেন, সুমনভাই?

সুমন সিনেমার কথা বলল। শুনে শ্যামবাবুর চোখ গোল হয়ে গেল, কপালে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম নিবেদন করে বললেন, জোর বাঁচান বেঁচেছেন আপনি। মা মহামায়াই আপনাকে রক্ষা করেছেন।

সুমন উঠে পড়ল। ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখল, রাত দশটা বেজে গেছে। হোটেলের সারাদিনের হিসেব বুঝে নিয়ে এই সময় রোজই মন্দিরে চলে আসেন শ্যামবাবু। নিশীথ পুজো সেরে এখান থেকেই নিজের বাড়ি চলে যান। কিন্তু আজ আর বাড়ি না ফিরে সুমনকে হোটেলে পৌঁছে দিতে চললেন। সুমনও না করল না, এখনও ভয়ে চমকে চমকে উঠছে বুকটা তার।

ন'দিঘা মোড়ের দিকে স্টার্ট করার আগে শ্যামবাবু হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেলেন, আঙুল তুলে দূরে দেখিয়ে বললেন, ওই আপনার ছায়াচিত্র হল। দেখতে পাচ্ছেন কিছু?

সুমন ভয়ে ভয়ে তাকাল। এখান থেকে ছোট একটা মাঠ পেরিয়ে তারপর ছায়াচিত্র সিনেমা হল। কিন্তু কোথায় হল? চিহ্নমাত্র দেখা যাচ্ছে না। অন্ধকার ঘুটঘুট করছে। শ্যামবাবু ঠিকই বলেছেন। মা মহামায়ার কৃপা ছাড়া আজ বেঁচে ফিরতে হত না তাকে।

হোটেলে ফিরে মুখে কিছু রুচল না সুমনের। বড় একঘটি জল খেয়ে শ্যামবাবুকে গুডনাইট জানিয়ে তাড়াতাড়ি লেপ টেনে শুয়ে পড়ল। রাতটা কাটিয়ে ভালোয় ভালোয় এখান থেকে পালাতে পারলে বাঁচে।

কিন্তু সব হিসেব কি আর মানুষের ঠিকঠাক থাকে, না ঠিকঠাক হয়? মাঝরাতে হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেল সুমনের। চোখ মেলে চেয়ে হাড় হিম হয়ে গেল তার। মশারি ঠেলে কালো একটা গোল অন্ধকার ঝুঁকে পড়েছে তার মুখের উপর। মাথায় উঠল ঘুম, লেপ ছুড়ে মশারি ছিঁড়ে নেমে পড়ল সে নীচে। চিৎকার করে বলল, কে কে?

চেঁচাবেন না, সুমনবাবু। অন্ধকারের ভিতর থেকে কে যেন বলে উঠলেন, লাইটটা জ্বালান আগে।

সুমন ছুটে গিয়ে লাইটটা জ্বালিয়ে ভয়ে শিউরে উঠল। ঘরে দাঁড়িয়ে আছেন রবিবাবু। ছায়াচিত্র হাউসের জলজ্যান্ত মালিক রবিবাবু! সেই মাঝারি হাইট, ফর্সা রং, চোখে হাই পাওয়ার রিমলেস চশমা, ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসি।

এ কি আপনি? আপনি এখানে কী করে এলেন? সুমন বলল, আপনি আমার ঘরে ঢুকলেন কী করে, অ্যাঁ?

বলছি। রবিবাবু বললেন, কিন্তু তার আগে বলুন, পালিয়ে এলেই কি বাঁচা যায়, সুমনবাবু? আমার স্ত্রীর হাত থেকে বেঁচেছেন, কিন্তু এবার যে আমার টার্ন! তার জন্যই তো কীরকম দেখা হয়ে গেল আমাদের মাঝরাতে! হা হা হা!

রক্ত জল হয়ে গেল সুমনের। কাঁপতে শুরু করল গলা, আ-আ-আপনি—

হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন, শ্যামবাবু আপনাকে রং ইনফরমেশন দিয়েছেন, সুমনবাবু। হাসতে হাসতে নিজের স্টাইলেই কথা বলে চললেন রবিবাবু, আমি বাড়ি থেকে পালাই-টালাইনি, বুঝলেন? আমিও আমার মিসেসের মতো সুইসাইডই করেছিলাম। নদীতে ডেডবডি ভেসে গিয়েছিল বলে কেউ ট্রেস করতে পারেনি আমাকে। হা হা হা!

সুমন কাঠ হয়ে গেল। একবার বেঁচে ফিরেছে, কিন্তু এবার বড় কঠিন চক্করে পড়েছে। মাথার চুলগুলো একটা একটা করে দাঁড়িয়ে যেতে লাগল তার, আ-আ-আ—

কী আ আ করছেন তখন থেকে! গলা সাধছেন নাকি? হা হা হা।

সুমন চেয়ে রইল। হঠাৎ রবিবাবু গম্ভীর হয়ে গেলেন, গলা বদলে বললেন, শুনুন মশাই, আপনাকে একটু হেল্প করতে হবে!

আ-আ-মাকে?

রাইট। আপনার সঙ্গে একটু পুরোনো হিসেব চোকানোর আছে। এর জন্য আপনি পানিপাতিনিতে আসবেন বলে কবে থেকে হাঁ করে বসে আছি, জানেন?

হিসেব?

এই তো এতক্ষণে গোটা শব্দ ফুটেছে! রবিবাবু বলে চললেন, যত নষ্টের গোড়া আপনারাই, আপনাদের টিভি কোম্পানিই আমাদের পথে বসিয়েছে, আমাদের এতদিনের সাধের ব্যবসা ডকে তুলে দিয়েছে, শেষ করে দিয়েছে আমাদের। কিন্তু আমরা একা শুধু শেষ হব কেন চাঁদু, আপনাকেও আমাদের পার্টনার হতে হবে, বুঝলেন? ব্যস, হিসেব সমান সমান!

রবিবাবু অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন। সুমন চেয়ে রইল। চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ তার মনে হল, আর ভয় পাচ্ছে না সে। আসলে খুব বেশি ভয় পেলে মানুষের ভয়বোধটাই কীরকম অসাড় হয়ে যায়। সুমনেরও তাই হয়েছে।

কী সুমনবাবু, আমার প্রস্তাবটা পছন্দ হল না বুঝি? রবিবাবু বললেন, হাঁ করে কী দেখছেন বলুন তো আমার মুখের দিকে? আপনি আমার পার্টনার হলে দুজনে মিলে আমার হাউসে বসে প্রাণভরে আড্ডা মারব, হ্যাঁ?

সুমন চেয়ে রইল।

আরে কী ভাবছেন, মশাই? কীসের ধ্যান করছেন?

আসলে মাথা থেকে সব ভয়, সব টেনশন বেরিয়ে গেলে তখন আসল কথাটাই মনে পড়ে যায় মানুষের। সুমনেরও মনে পড়ল। মা মহামায়া! একবার না বলতেই বাঁচিয়েছ, আর একবার নয় বাঁচালে! মায়ের কাছে ছেলে কি এইটুকু আবদার করতে পারে না?

সুমনের চোখ জলে ভরে উঠল। সে মনপ্রাণ দিয়ে মাকে ডাকতে লাগল।

—

অগ্রহায়ণ ১৪১৫

লাটসাহেবের ছায়া

রমেন দাস

কলকাতা ছিল তখন ইংরেজ শাসিত ভারতের রাজধানী। আমরা এদেশের মানুষ হলেও আমাদের সব ব্যাপারে খবরদারি করত বিদেশি সাহেবরা। আর বিলেত থেকে সাহেব-মেমরা তো হরদমই আসত কলকাতা বেড়াতে।

দেশের বড়লাট থাকতেন এখানে। তাঁর জন্য নির্দিষ্ট ছিল লাটভবন। লাটভবন থেকেই চলত ভারত শাসন। ফলে কলকাতা ছিল পুরোদস্তুর সাহেবি শহর। বারো মাসে তেরো পার্বণের মতো শহরে সাহেব-মেমদের আমোদ-আহ্লাদ লেগেই থাকত। আর লাটভবনের তো কথাই ছিল না। এলাহি খানাপিনা, নাচগানের আসর প্রতিদিনই জমজমাট সেখানে।

মিস আইভিকে এখনকার কলকাতা ভুলে গেছে। তিনি ছিলেন ইংলন্ডের বনেদি এক লর্ড পরিবারের আদুরে কন্যা। অপূর্ব সুন্দরী। দুধে-আলতা গায়ের রং। উজ্জ্বল নীল চোখে স্বপ্নের আবেশ। আর মাথাভর্তি একরাশ সোনালি চুল। মাঝবয়সি আইভি বিয়ে-থা করেননি। ছবি আঁকা আর কবিতা লেখা নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন, সখ্যতা ছিল লন্ডন শহরের প্রায় সব অভিজাত পরিবারের সঙ্গে। তাঁর রূপগুণ আর নম্র ব্যবহারের জন্য সকলেই তাঁকে ভালোবাসতেন।

কলকাতা সম্পর্কে মিস আইভি অনেক কথা শুনেছিলেন। শুনেছিলেন যে কলকাতার 'লাটভবন' বিশ্বসেরা রাজপ্রাসাদগুলোর অন্যতম। এই শহরটাকে একবার নিজের চোখে দেখার ইচ্ছে প্রায়ই আলোড়ন তুলত তাঁর মনে।

লর্ড লিটন তখন ভারতের বড়লাট। লিটন সাহেবের গিন্নি মিস আইভির দারুণ বন্ধু। লন্ডনে একসঙ্গেই লেখাপড়া, খেলাধূলা, ওঠাবসা করেছেন। বান্ধবী আইভির কলকাতা দর্শনের আগ্রহের কথা লাটগিন্নি জানতেন। তাই তিনি নিজে কলকাতা আসার পর বান্ধবী আইভিকেও একবার কলকাতা ঘুরে যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। আমন্ত্রণ পেয়ে আইভি খুব খুশি। বড়লাটের বিবি হওয়া সত্ত্বেও তাহলে পুরোনো বান্ধবী তাঁকে ভোলেননি!

ছবি আঁকা আর কবিতা লেখার বাতিক ছাড়াও মিস আইভির আরও দুটি নেশা ছিল। সুযোগ পেলেই দেশ ঘোরা, আর ফুলফলের বাগিচায় হাত লাগানো। অতএব রাজ-অতিথি হয়ে কলকাতা আসার আমন্ত্রণ তিনি সঙ্গে সঙ্গে লুফে নিলেন।

এদিকে লাটভবনেও তোড়জোড় শুরু হয়ে গেল। সাজানো-গোছানো বিশাল প্রাসাদে নতুন করে ঝাড়পোঁছ শুরু হল। মালিদের কাজও বাড়ল। লাটগিন্নির হুকুমে কারও আর বিশ্রামের ফুরসত নেই। কানাঘুষায় তারা জানতে পারল, লাটগিন্নির এক বান্ধবী লন্ডন থেকে কলকাতা আসছেন বেড়াতে। বেশ কিছুদিন থাকবেন এখানে।

তখনকার দিনে উড়োজাহাজ আবিষ্কার হয়নি। লন্ডন থেকে কলকাতা আসতে হত সাতসমুদ্র পাড়ি দিয়ে, জাহাজে চেপে। দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রার শেষে কলকাতা পৌঁছে মিস আইভির সে কী আনন্দ। বিলেতে বসে কলকাতার লাটভবন সম্পর্কে যত শুনেছেন, বাস্তবে তার রূপ রঙ সৌন্দর্য শোভা যেন আরও অনেকগুণ বেশি। এদেশে আসার মাত্র সপ্তাহ কয়েক আগে মিস আইভি ইংলন্ডের বিখ্যাত শহর ডার্বিশায়ারে গিয়েছিলেন। সেখানকার ঐতিহাসিক কেডেলস্টোন রাজপ্রাসাদের ছবি তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠল। কলকাতার লাটভবনের সঙ্গে ঐ রাজপ্রাসাদের সামান্যতম তফাৎ চোখে পড়ল না। পরাধীন ভারতে এমন সুন্দর একটি রাজপ্রাসাদ দেখে তিনি বিমোহিত হলেন। বিস্মিত হয়ে মন্তব্য করলেন, কলকাতার এই লাটভবন যেন ঠিক ডার্বিশায়ারের রাজপ্রাসাদের আদলেই তৈরি।

বান্ধবী আইভির মন্তব্য শুনে লাটগিন্নি খুশি হলেন। বললেন, তুমি ঠিকই ধরেছ আইভি, শুনেছি, ডার্বিশায়ারের ঐতিহাসিক প্রাসাদের নক্‌শা ধরেই এই লাটভবন তৈরি হয়েছে।

মিস আইভি তৃপ্তির হাসি হাসলেন। তারপর চুপচাপ বেশ কিছুক্ষণ খোলা জানলার পাশে দাঁড়ালেন। অনেকক্ষণ ধরে লাটবাগানের চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, কিন্তু ডার্বিশায়ারের রাজপ্রাসাদের বাগানের তুলনায় এখানকার কলকাতার লাটবাগানের বাগানটা আরও অনেক বেশি বড়, অনেক বেশি সাজানো এবং সুন্দর।

বুঝতে পেরেছি, লাটভবনের বিশাল এই বাগান তোমার মন কেড়ে নিয়েছে—বললেন লাটবিবি।

আইভি বান্ধবীর কথায় সায় দিয়ে মুচকি হাসি হাসলেন। বললেন, ফুলে ফলে লতাগুল্মে সাজানো এমন বাগান কার না মন জয় করে বলতে পারো? এমন সাজানো বাগান সচরাচর দেখা যায় না!

শীতের সকাল। শিশিরে ভেজা লাল-হলুদ-নীল রঙের ডালিয়া ফুলগুলোর উপর ভোরের নরম রোদ ছড়িয়ে পড়েছে। হালকা ডানার বিচিত্র রঙের প্রজাপতি আর মৌমাছিদের আনাগোনা। মুগ্ধ আইভির দৃষ্টি যেন আর ফেরে না। আপন মনেই বলে ওঠেন, নীল রঙের ডালিয়া ফুল! এর আগে আর কোথাও তো নীল ডালিয়া দেখিনি!

লাটগিন্নি বললেন, শুধু ডালিয়া কেন, নানা জাতের নানা রঙের বিচিত্র সব ফুলের পাশাপাশি এই বিশাল বাগানে আছে দেশবিদেশ থেকে আনা হরেক রকমের গাছ-গাছালি, লতা-গুল্ম আরও কত কী! কিন্তু অনেক বেলা হল চলো এবার। অনেক সময় পাবে এসব ঘুরে দেখার। বান্ধবীকে নিয়ে লাটভবনের অন্দরমহলে চলে গেলেন লাটগিন্নি।

বিকেলের রোদ সবে নিস্তেজ হতে শুরু করেছে। নীল-আকাশের পশ্চিম অংশে রক্তিমাভা। গাছে গাছে পাখিদের কূজন। দিনের আলো আর একটু পরেই বিদায় নেবে। বাগানের মালিরা যে যার হাতের কাজ শেষ করতে ব্যস্ত। এরই মধ্যে মিস আইভি রাজভবনের অন্দরমহল ছেড়ে কখন বাগানে নামলেন, কেউ তা খেয়াল করেনি। বিশাল বাগান চত্বরে হাঁটতে হাঁটতে আইভি আপন মনে বললেন, বাগান তো নয়—সবুজ কার্পেটে মোড়া এক বিশাল অঙ্গন। লাটভবনের পশ্চিম দিকের কোণে বড় কনকচাঁপা গাছটার দিকে চোখ পড়তেই মিস আইভি সেদিকটায় এগোলেন। চাঁপাফুলের মিষ্টি গন্ধ। মুগ্ধ বিদেশিনী দুটো চাঁপা তুলে নিলেন। ভারী আনন্দ হল। বারবার ঐ দুটি চাঁপাফুলের গন্ধ নিলেন। কনকচাঁপার মিষ্টি সুবাস আইভির মুখমণ্ডল আরও স্নিগ্ধ আরও মধুময় করে তুলল।

সামনে তাকিয়ে আইভি দেখলেন, অদূরে একটা ছোট্ট পুকুর। সার সার নারকেল আর পাম গাছের ছায়া ঐ ছোট্ট পুকুরের জলে কাঁপছে। ভারী সুন্দর। ছবির মতো মনে হল। একটু এগিয়ে গিয়ে থমকে দাঁড়ালেন। তারপর পুকুরটার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

বাগানের বুড়ো মালি রামশরণ পুকুরপাড়ের গাছপালা পরিষ্কার করছিল। মেমসাহেবের গলার আওয়াজে তার চমক ভাঙে। রামশরণ লাটভবনের দীর্ঘকালের কর্মী। সেই কিশোর বয়সে বাবার হাত ধরে লাটভবনে যাওয়া-আসা। তারপর একটু বড় হতে এখানেই চাকরি। কাজ করতে করতে সাহেব-মেমদের ভাষা কিছুটা রপ্ত হয়ে গেছে তার। ভাঙা ভাঙা ইংরাজি আর আকার-ইঙ্গিতে সাহেবদের সঙ্গে কথা বলতেও আটকায় না। মিস আইভির ইঙ্গিতে সে তাঁর দিকে এগিয়ে গেল।

কী সুন্দর এই পুকুরটা! মিস আইভি স্বগত উক্তি করলেন। রামশরণ জানে, এই মেমসাহেব আর কেউ নন, খোদ বড়লাটের মাননীয় অতিথি। সামনে হাজির হয়ে হাঁটু গেড়ে কিছুটা নিচু হয়ে বিদেশিনী অতিথিকে সেলাম জানাল। বলল, ম্যাডাম, একটা নয়, দুটো পুকুর।

একগাল হেসে মিস আইভি কয়েক পা এগিয়ে গেলেন। দেখলেন, সত্যি সত্যিই পাশাপাশি একজোড়া পুকুর। বললেন, ভারী সুন্দর তো এই লিলিপন্ডস।

মনেপ্রাণে একজন শিল্পী বলেই বোধহয় মিস আইভি আবেগমুখর হলেন। রামশরণ তাঁর মন বুঝতে পেরে বলল, ম্যাডাম, বহু বছর আগে আপনার মতোই এক মেমসাহেবের অনুরোধে এই জোড়াপুকুর কাটা হয়েছিল বলে শুনেছি।

মিস আইভি রামশরণের তারিফ করলেন। বললেন, তুমি তো দেখছি অনেক খবর রাখো, থ্যাঙ্ক ইউ—তোমাকে ধন্যবাদ।

রাজ-অতিথির ধন্যবাদ পেয়ে রামশরণ মহাখুশি। লাটভবনের নানা ইতিহাস যেন মুহূর্তে তার কাছে উঠে এল। মেমসাহেবের কাছে তা সে ঢেলে দিতে চায়।

মিস আইভি একপা দু'পা করে এগোতে লাগলেন। রামশরণও তাঁর পিছুপিছু। জোড়াপুকুরের মাঝখানে একটি সাঁকো। খুব সাবধানে সাঁকো পার হয়ে মিস আইভি সামনের কৃত্রিম পাহাড়টির কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। ঝরঝর করে ঝর্নার জল ঝরে পড়ছে। মুগ্ধ মেমসাহেব বলে উঠলেন, ও, বিউটিফুল!

রামশরণ আর এগোয় না। বুঝতে পারে মেমসাহেব সন্ধ্যার হালকা আলোয় পাহাড় লাগোয়া শান-বাঁধানো চত্বরে কিছুক্ষণ নিরিবিলিতে কাটাতে চান। সবুজ গাছে ঘেরা চারদিক। গাছে গাছে শুরু হয়েছে ঘরেফেরা পাখিদের কলকাকলি, মেমসাহেবের মন খুশির আনন্দে যেন পাখিদের মতোই গুঞ্জন করে উঠতে চায়। চোখে-মুখে ভরা আবেগের ছাপ। জোড়াপুকুর আর ঝর্নার জলের দিকে নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে ততক্ষণে আইভি উদাসীন।

রামশরণ তার বাকি কাজ সারতে তাড়াতাড়ি হাত চালাল। শীতের বাতাসে ঠান্ডা আমেজ। গঙ্গার ওপারে অনেকক্ষণ সূর্য ডুবে গেছে। আকাশের রক্তিম আভাও ম্লান। সন্ধ্যার আবছা আলো আর হাল্কা কুয়াশায় সব কিছু ঝাপসা হয়ে এল। লাটবাগানের সাজানো বাতিস্তম্ভের আলোগুলো জ্বলে উঠল। হাত-মুখ ধুয়ে রামশরণ তার ঘরে ফিরল।

অন্যদিন এসময় লাটভবনের তিনতলার 'বল রুম' নাচ-গান আর যন্ত্রসঙ্গীতে মুখর হয়। কিন্তু আজকের সন্ধ্যা যেন একটু অন্যরকম। অদ্ভুত ধরনের একটা নীরবতা। আর তার মধ্যে রহস্যজনকভাবে কিছু লোকের ছুটোছুটি এবং ডাক্তারদের গাড়ির ভিড়। রামশরণের মনটা উসখুস করে। তা হলে কি লাট-পরিবারের কেউ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন? অজানা আশঙ্কা তাকে উতলা করল।

এরই মধ্যে লাটবাগানের গার্ডেন অফিসার রামশরণের কাছে ছুটে গেল। রামশরণ তাকে দেখে চমকে উঠল। রামশরণকে সে বলল, মিস আইভি ভয়ানক অসুস্থ। লাটগিন্নি তাকে জলদি তলব করেছেন।

এরকমই একটা আশঙ্কায় ছটফট করছিল রামশরণ। সে লাটভবনে ছুটে গেল। দেখল, মেম-সাহেবকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছেন লাটসাহেব, লাটগিন্নি আর কয়েকজন নামী ডাক্তার। মেমসাহেবের চোখ আধবোজা। তখনও ভয়ে কাঁপছেন। অদ্ভুত এক আতঙ্কের ছাপ তাঁর চোখে-মুখে। ডাক্তার রোগটা ঠিক ধরতে পারছেন না।

রামশরণের গলা পেয়ে মিস আইভি আধবোজা চোখ খুললেন। তারপর ভয়ার্ত স্বরে বলে উঠলেন, রামশরণ চলে যাওয়ার পর বিশাল একটা ছায়া আমার সামনে.....বলতে না বলতেই আবার প্রায় অচৈতন্য। আবার একটা গোঙানির শব্দ। ডাক্তাররা চিন্তিত হয়ে পড়লেন। লাটসাহেব এবং লাটগিন্নির চোখ-মুখও ততক্ষণে শুকিয়ে গেছে।

বান্ধবীর অসুস্থতায় ঘাবড়ে গেলেও লাটগিন্নি বেশ শক্ত ধাঁচের মানুষ। এতক্ষণ ব্যাপারটা লক্ষ করছিলেন। এবার ইশারায় তিনি রামশরণকে পাশের ঘরে ডাকলেন। তার কাছে জানতে চাইলেন, মিস আইভিকে লাটবাগানের কোথায় এবং কখন সে শেষবারের মতো দেখেছে।

রামশরণ বলল, ম্যাডাম, আমার মনে হয় মেমসাহেবের অন্য কোনও অসুখ নয়। সন্ধ্যার পর বাগানের পুকুরধারে একা থাকায় বোধহয় তিনি ভয় পেয়েছেন।

অবাক লাটগিন্নি বললেন, সে কী কথা! শহরের মাঝখানে এই লাটভবন। কত আলো, কত প্রহরী—তার মধ্যে ভয় পাবে কী করে?

যদি অনুমতি করেন একটা কথা বলতে চাই—রামশরণ নিচু গলায় লাটসাহেবার কাছে আর্জি রাখে।

লাটগিন্নি কিছুটা বিভ্রান্ত। কিছুই যেন বুঝে উঠতে পারছেন না। অভয় দিয়ে রামশরণকে বললেন, কী বলতে চাও, খুলে বলো।

রামশরণ এবার ঢোঁক গিলে মাথা চুলকাতে চুলকাতে বলে, বেশ কয়েক বছর আগের কথা। এই লাটভবনে বড়লাট হয়ে লন্ডন থেকে এলেন লর্ড মেয়োসাহেব। বেশ উঁচু লম্বা সুপুরুষ। এই ভবন-বাগান তাঁর খুব প্রিয় ছিল। সময় পেলেই একা একা সারা বাগানে পায়চারি করতেন। দেশবিদেশ থেকে

পছন্দমতো কত বিচিত্র ধরনের গাছগাছালি যে তিনি আনিয়েছিলেন তার হিসেব নেই। মনোমতো গাছ এনে বাগানে লাগাতেন আর আমাদের ডেকে ডেকে বলতেন, একটা গাছেরও যেন অযত্ন না হয়।

আমরাও তাঁকে খুব ভালোবাসতাম। দেখতে উঁচু লম্বা বলে অনেকেই তাঁকে লঙ্‌সাহেব বলে ডাকত। লঙ্‌সাহেব সম্বোধনে তিনি খুশিই হতেন। পরে জানলাম লাটসাহেবাও তাঁকে লঙ্‌সাহেব বলে ডাকতেন। এই লাটবাগনের উপর তাঁর বেশ মায়া পড়ে গিয়েছিল। বলতেন, যখন আমি থাকব না—এই বিশাল এবং সুন্দর সাজানো বাগান আমার স্মৃতি ধরে রাখবে।....বলতে বলতে রামশরণ একটু আনমনা হল। চোখে-মুখে বিষণ্ণতার ছাপ ফুটে উঠল। লাটগিন্নি ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন না। একটু বিরক্তি প্রকাশ করে ধমকের সুরে বললেন, তারপর?

তারপরের ঘটনা খুবই দুঃখের এবং শোকের। রামশরণ আবার বলতে শুরু করল। সেবার কী একটা জরুরি কাজে লঙ্‌সাহেব সুদূর আন্দামান দ্বীপে গেলেন। যাওয়ার আগে আমাদের ডেকে বলে গেলেন, বাগানের যেন অযত্ন না হয়। তিনি চলে যাওয়ার পর বাগানটা কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা মনে হত। আমরা সকলে লঙ্‌সাহেবের ফেরার আশায় কাল গুনছি। একদিন খবর এল, লঙ্‌সাহেব, অর্থাৎ বড়লাট মেয়োসাহেব আর নেই! আন্দামানের বন্দি শিবিরের এক আফগান কয়েদির আক্রমণে তিনি মারা গেছেন।...

এবার লাটগিন্নি তাঁর ধৈর্য হারালেন। ধমকের সুরে বললেন, এ গল্প তো আমরা আগেই শুনেছি। তোমার কাছে পুরোনো ইতিহাস শুনতে চাইছি?

লাটগিন্নির ধমক প্রায় অগ্রাহ্য করেই রামশরণ বলে উঠল, ম্যাডাম, এ কথা মোটামুটি সকলেরই জানা। কিন্তু...

আবার কিন্তু কিসের? যা বলার তাড়াতাড়ি খুলে বলো—লাটগিন্নির ফের ধমকের মেজাজ।

রামশরণ কিছুটা হতভম্ব। নিচু স্বরে সে বলে, তারপর থেকেই আমরা যারা রাতবিরেতে লাটবাগানে কোনও কাজে একা বেরোই, বিশাল একটা ছায়া আমাদের চোখে পড়ে। দু'একজন কর্মী ঐ ছায়া দেখে ভয়ে মূর্ছাও গেছে।....

রামশরণের কথা শেষ হতে না হতেই লাটসাহেবার দু'চোখ ছানাবড়া। আতঙ্কিত কণ্ঠে বলেন, কই আগে তো কখনো একথা জানাওনি।

রামশরণ মাথা নিচু করে নীরব। তারপর সে তার আঙুল তুলে ধরে লাটভবনের উত্তরের বিশাল সিঁড়ি বারান্দার দিকে। বলে, লঙ্‌সাহেবের মৃতদেহ আন্দামান থেকে কলকাতা আনা হয়। স্থির হয় তাঁর মরদেহ কলকাতার লাটভবনে একদিন রাখা হবে। তারপর সেই দেহ তাঁর স্বদেশভূমি বিলাতে পাঠানো হবে। সে সময় পুরো চব্বিশ ঘণ্টা লঙ্‌সাহেবের দেহ ঐ সিঁড়ি বারান্দায় রাখা হয়েছিল। বলতে বলতে রামশরণের গলা ভার হয়ে এল। লাটগিন্নি তা বুঝতে পারেন। তাঁর চোখে-মুখেও ফুটে ওঠে বিষণ্ণতার ছাপ।

রামশরণের চোখের সামনে অতীত স্মৃতি ভেসে উঠল। বলল, লাটসাহেবের মৃতদেহ নিয়ে সেবার লাটভবন চব্বিশ ঘণ্টা জেগেছিল। কলকাতার মানুষও সেদিন শোকে ভেঙে পড়েছিল। রামশরণের কথা শুনে লাটগিন্নিও বাক্‌রুদ্ধ। তাঁর মুখেও কোনো ভাষা নেই। কিছুক্ষণ নীরবতা—দু'পক্ষই চুপচাপ। তারপর রামশরণই নীরবতা ভাঙল। বলল, ম্যাডাম, মনে হচ্ছে, লঙ্‌সাহেবের মৃত্যুর পরও তিনি তাঁর এই বাগান, প্রিয় গাছগাছালির কথা ভুলতে পারেননি। রাতবিরেতে তাঁর অতৃপ্ত-আত্মা হয়তো ছায়া হয়ে এই বাগানে ঘুরে বেড়ায়।

আতঙ্কিত লাটগিন্নির কণ্ঠে হঠাৎ আর্তচিৎকার ঃ ইট্‌স অ্যা ঘোস্ট? তাহলে কি লঙ্‌সাহেবের প্রেতাত্মার ছায়া দেখেই মিস আইভির এই দশা? বলতে বলতেই তাঁর সারা শরীর যেন কাঠ হয়ে গেল। তাঁর স্থির দৃষ্টি তখন রামশরণের দিকে প্রসারিত।

রামশরণের মুখে আর কোনও কথা সরল না। নতমস্তকে সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

ফাল্গুন ১৪০১

কালো বিভীষিকা

কাঞ্চনকুন্তলা মুখোপাধ্যায়

বুকু গোল গোল চোখে তাকিয়ে আছে তো আছেই। গল্প বলতে হবে। ভূতের গল্প।

'ভূত কি এখন আছে রে বোকা? বিজলি বাতির আলোয় কোথায় পালিয়ে গেছে। আর তাকে কোনোদিন পাবি না।'

ঠাম্মা ভাবলেন এতেই বোধহয় বুকু ক্ষান্ত দেবে। কিন্তু বুকু কি এত সহজে ছাড়বার পাত্র?

'সে তো বড়বাবুও এখন বেঁচে নেই। কিন্তু একদিন তো ছিলেন? তোমার মুখে তাঁর গল্পের তো শেষ নেই। তেমনি দু'চারটে গল্প ভূতেদের সম্বন্ধেও তো....'

ঠাম্মা বুঝলেন বুকু গল্প না শুনে ছাড়বে না। তিনি একটা বড় হাই তুলে বুকুকে নিরস্ত করার শেষ চেষ্টা করেন।

'রাত্রে ভয়-টয় পাবে না তো? দেখো, তখন ঠাম্মাকে দোষ দিও না কিন্তু।'

ঠাম্মাকে একেবারে নিশ্চুপ করে দিয়ে বুকু বলে উঠল, 'কি যে বলো ঠাম্মা, ভয় পাব না তো কি? ভয় পেতেই তো ভূতের গল্প শুনতে চাইছি। ভয় পেতে কি মজা বলো তো?'

এরপর আর কথা চলে না। ঘুমলাগা গলায় ঠাম্মা বলতে শুরু করলেন—

'আমরা তখন খুবই ছোট। গ্রামে আমাদের বিরাট এজমালি বাড়ি। আমাদের ঠাকুর্দার বাবার আমলে তৈরি। যেন একখানা গোটা পাড়া। ঠাকুর্দা ছিলেন জমিদার। ছেলেপুলে-নাতিনাতনি-নায়েব-গোমস্তা-রাখাল-বাগাল সব মিলে বাড়িতে রোজ সত্তর-আশি জনের পাত পড়ত। ভোজযজ্ঞি লেগেই থাকত। জনা দশেক পোষ্য আমাদের বাড়িতে সব সময়েই থাকত। কেউ পাঠশালার মাস্টারমশাই, কেউ টোলের পণ্ডিতমশাই, কেউ বা মেধাবী দরিদ্র ছাত্র। এ ব্যবস্থা ছিল আমার বড় জ্যাঠাইমার। জ্যাঠাইমাকে আমরা সকলেই ভয় করতাম। গ্রামের লোক তাঁকে জানত 'বড়গিন্নি' বলে।

বড়গিন্নির মতো দানশীলা, সেবাপরায়ণা মহিলা সচরাচর দেখা যেত না। তিনি ছোট ছেলেকে নিয়ে সারা ভারত তীর্থদর্শন করেছিলেন। পুজোআচ্চা, দানধ্যান এ-সব নিয়েই তিনি থাকতেন সব সময়। তাঁর সাধনার স্থল ছিল ঠাকুরবাড়ি। দেবতা রাধাগোবিন্দ। ঠাকুরদালান, দরদালান, দোলমঞ্চ, রাসলীলামঞ্চ, চণ্ডীমণ্ডপ সব মিলিয়ে সেও যেন এক পাড়া।

গ্রামের গরিব-দুঃখীর ছেলেপিলেরা ঠাকুরবাড়িতে দু'বেলা পাত পেড়ে খেত। সকালে হত ঘিয়ের লুচি-মোহনভোগের ভোগ। সাধারণ লোকে সে ভোগ খেতে পেত না। মধ্যাহ্নে ডাল-ভাত, কচুর ঘ্যাঁট কিংবা লাবড়া দিয়ে দরিদ্রনারায়ণ সেবা হত।

সন্ধেয় হত শেতল আর ক্ষীর-চাঁচি-মালপোয়ার ভোগ। শেতল ছিল সকলের জন্যে। বিরাট পেতলের গামলায় করে তৈরি হত গুড়ের জল। সুবিধা থাকলে তাতে কখনো-সখনো লেবু পড়ত। শেতলের সেই শরবত খাবার জন্যে ছেলেপিলেরা, বৌ-ঝিরা সকলেই ঘটি-গেলাস নিয়ে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ত। বড়গিন্নি বেশিরভাগ দিন নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সে-সব বিলি-ব্যবস্থার তদারকি করতেন। এ-সব মিটে গেলে ছাল্‌টির কাপড় গায়ে জড়িয়ে তিনি ঠাকুরবাড়ি চলে যেতেন। সন্ধে-রাত পর্যন্ত সেখানে সাধনভজন করতেন তিনি।

ঠাকুরবাড়ির একপাশ ঘেঁষে চলে গেছে শহরে যাবার সরাণ অর্থাৎ রাস্তা। খুব সম্ভব 'সরণী' থেকেই কথাটা এসেছিল। যাই হোক, সরাণের অন্যপাশে বারিপুকুর। দু'মানুষ গর্তের নীচে সবুজ জল। চারদিকে বড় বড় গাছ।

ঠাকুরবাড়ির অতিথিশালার একসারি ঘরের পাশ দিয়ে সরাণ ঘুরে গিয়েছে। তার পরেই বারিপুকুর। চারপাশে আশ্‌শেওড়া, নিশিন্দের ঝোপ-জঙ্গল।

জমিদারবাড়ির জোয়ান গাড়োয়ান তারক অনেক দিন ধরেই জ্বরে ভুগছিল। সান্নিপাতিক জ্বর। ক্রমাগত দু'মাস ধরে সে যেন মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করে চলেছিল। আত্মীয়-স্বজন বলতে গ্রামে তার কেউ ছিল না। কে সেবা করবে আর কে মুখে দু'ফোঁটা ওষুধ দেবে? বড়গিন্নির কানে গেল সে খবর। তারকের সেবা-শুশ্রূষার যথাসাধ্য ব্যবস্থা করলেন তিনি। কিন্তু এতদিন তাকে যারা দেখাশোনা করছিল, তারা হঠাৎ বেঁকে বসল—রাত্রে ও ঘরে তারা থাকতে পারবে না।

গ্রামের মূল রাস্তা বাবুপাড়ার ভিতর দিয়ে বাঁক নিয়ে ঠাকুরপাড়ার দিকে চলে গেছে। যেখানে রাস্তা বাঁক নিয়েছে সেই মোড়েই জমিদারবাড়ির আস্তাবল। ঐ আস্তাবলের ওপরের একখানা ঘরে তারকের থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন বড়গিন্নি। তাঁর খাস দারোয়ান ভূপ সিং দেখাশোনা করত তারককে। রাত্রে সে ঐ ঘরেই শুত। সারা দিনটা কাজের ফাঁকে ফাঁকে এসে ওষুধ খাইয়ে যেত। বিলাসিনী এসে সময়মতো খাবার দিয়ে যেত। রাত আটটা নাগাদ খেয়ে-দেয়ে ঐ ঘরে এসে আবার শুয়ে পড়ত ভূপ সিং। সামনে ঠাকুরপাড়ার দিকের জানলাটা খোলা থাকত।

একদিন হঠাৎ মাঝরাত্রিতে সেই কান্না শোনা গেল। আঁ...আঁ...করে অনেক দূর থেকে কান্নার স্বর ভেসে আসছে। সরু তীক্ষ্ণ-তীব্র ট্রেনের বাঁশির মতো সে স্বর যেন কান থেকে ক্রমশ বুকে বিঁধে যেতে লাগল। স্বরটা ক্রমশ এদিকে এগিয়ে আসছিল। তারক তো জ্বরে তখন বেহুঁশ। কিন্তু ভূপ সিংয়ের সমস্ত গা কাঁপছিল আতঙ্কে। ওটা যে কান্নাই এ বিষয়ে তার কোনো সংশয়ই ছিল না। কিন্তু ও হলফ করে বলতে পারে ও কান্না কোনো মানুষের নয়। কার কান্না ভূপ সিং জানে না। খোলা জানলার কাছে দাঁড়িয়ে দেখার সাহস তার হয়নি। কান্নাটা এগিয়ে যখন মোড় বরাবর এসেছে, ভূপ সিং ভয়ে উপুড় হয়ে মেঝের ওপর পড়ে তখন রামনাম জপ করছিল।

সেই অবস্থাতেই ও অনুভব করল, কান্নাটা রাস্তার বাঁক ঘুরে এবার ঠাকুরবাড়ির পাশের সরাণ দিয়ে বেরিয়ে গেল। ঐ আস্তাবলের পাশ দিয়ে ওটা চলে যাবার সময় এক ঝলক হিম ঠান্ডা হাওয়া ভূপ সিংয়ের মেরুদণ্ড কাঁপিয়ে দিয়ে গেল। ঠাকুরবাড়ির পাশ দিয়ে গিয়ে সেই কান্নার পাহাড় বারিপুকুরের জলে আছড়ে পড়ল।

পরের দিন গ্রামের ঘরে ঘরে ফিসফিস কানাকানি। কথাটা বড়গিন্নিরও কানে উঠল। তাঁর খাস দাসী বিলাসিনীকে পাড়ার বৌ-ঝিরা খোঁচায়—'বলেছ তোমার বড়গিন্নিমাকে?'

বিলাসিনীর সাহসে কুলোয় না।

এরপর দিন সাতেক ধরে প্রতিরাত্রে এই ঘটনা ঘটে যেতে লাগল। এতদিনে বিলাসিনীও বড়গিন্নির কাছে এই কথা বলবার একটা উপযুক্ত সুযোগ পেল। 'ভূপ সিং যে আর তারকের ঘরে শুতে রাজি হচ্ছে না বড়মা—'

'কেন?' বড়গিন্নি ভাগবত থেকে মুখ না তুলেই জিগ্যেস করলেন।

'সে কী বলব বড়মা—'

ভরা কলসি থেকে যেমন গব গব শব্দ করে জল বেরোয়, তেমনি জমে থাকা সব কথাগুলো বিলাসিনীর মুখ দিয়ে গলগল করে বেরোতে লাগল।

'গাঁয়ের লোকের মুখে তো এখন শুধু ঐ একটাই কথা। ঘোর অমঙ্গল মা ঘোর অমঙ্গল। সুয্যি পাটে বসলেই এখন সকলের বুক টিপটিপ। ঠাকুরপাড়ার দিককার জানলা-দরজা আমরা সন্ধের পর থেকে কেউই আর খুলে রাখি না।'

'কি হয়েছে?'

বড়গিন্নি এবার ভাগবত থেকে মুখ তুললেন। কথাটা বোধহয় সত্যি সত্যি এতক্ষণে তাঁর কানে গেল। মুখ তুলে তীক্ষ্ণ চোখে তাকাতেই বিলাসিনীর বুক ধড়াস করে উঠল। তামাটে ফর্সা মুখে টিকলো

নাক। নাকের ওপর সোনার সরু ফ্রেমের চশমা। তার ভিতর দিয়ে একজোড়া তীক্ষ্ণতর চোখ। ভূতের থেকে বড়গিন্নিকে ওরা কম ভয় পায় না।

'কি রে কথা বলছিস না যে?'

বড়গিন্নির ধমকে বিলাসিনী ঢোক গিলে বলে, 'হ্যাঁ বলচি বড়মা। আজ সাতদিন ধরে সরাণের ওপর রোজ রাতদুপুরে পেত্তার কান্না শোনা যায়। আঁ...আঁ...করে সে কী চিৎকার—শুনলে মনে হয়—'

'চুপ কর। ওটা রেলের বাঁশি। ঘুমের ঘোরে তোদের—'

'বল কি বড়মা?'

বিলাসিনী সেদিন প্রথম বড়গিন্নির কথার ওপর কথা বলল। বড়গিন্নির প্রতিটি কথার পেছনে 'যা বলেচ', বা 'বটেই তো' বলে সায় দিতে দিতেই সে বুড়ি হয়ে গেল।

বিলাসিনীর প্রতিবাদে বড়গিন্নির চোখে একবার বিস্ময় দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল। এবার সত্যিই তিনি বিলাসিনীর কথার গুরুত্ব দিলেন। 'কি হয়েছে?' তেপায়ার ওপর ভাগবতখানা মুড়ে রেখে তিনি বললেন, 'কি ব্যাপার পরিষ্কার করে খুলে বল।'

গেল সাতদিন ধরে প্রতিটি রাত্রে গ্রামে যে অশরীরীর কান্না শোনা গেছে, সে সব কথা খুলে বলল বিলাসিনী। বলল, 'তারককে সেবা-শুশ্রূষা করার জন্যে কেউ আর ওঘরে থাকতে রাজি হবে না। শত বখশিসের লোভেও না।'

'ভূপ সিংকে ডেকে পাঠা। বলবি আমি ডেকেছি।' বড়গিন্নি খুবই আত্মনিশ্চিতির স্বরে কথাগুলো বললেন।

তার উত্তরে বিলাসিনী তাঁকে অবাক করে দিল। 'ভূপ সিং তো নেই বড়মা।'

'নেই! কোথায় গেছে?'

'সে আজ ভোর না হতেই পাঁচটার গাড়ি ধরে মুল্লুকে পালিয়েচে।'

'সে কি! পালাল কেন?'

'যদি তুমি জোর করে আবার ওকে ঐ ঘরে শুতে বলো, তাই—'

বড়গিন্নি হতভম্ব হয়ে বিলাসিনীর মুখের দিকে তাকিয়েই ছিলেন। সেই নিষ্পলক চাউনির দিকে তাকিয়ে বিলাসিনী হাউমাউ করে কেঁদে বড়গিন্নির পায়ে লুটিয়ে পড়ে বলল, 'মা গো, তোমার পায়ে গড় করি মা। আমার কোথাও পালাবার ঠাঁই নেই। আমাকে যেন ওই ঘরে শুতে বলোনি। তাহলে আমি—'

'আমিই থাকব।'

'তুমি!' বিলাসিনীর চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইল।

'না না শোন—' দু'মিনিট বড়গিন্নি কি ভেবে নিয়ে বললেন, 'ঐ আস্তাবলের ঘরে নয়। ঠাকুরবাড়ির একতলার একখানা ঘরে তারককে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা কর। রামবিলাস আর যোগীন্দরকে আমার নাম করে বল ওরা যেন তারককে ধরাধরি করে ঐ ঘরে শুইয়ে দেয়। আর যতক্ষণ পর্যন্ত আমি না আসি, ঐ ঘরেই তারা যেন অপেক্ষা করে। তুই আমার ময়না ঠাকুরবাড়ির ঘরখানা পরিষ্কার করে, বিছানা ঠিকঠাক করে, জলের ব্যবস্থা করে রাখ। যা আর কথা বাড়াস না।'

বিলাসিনীর চোখ গোল হয়ে গেছে। 'সে কি মা! এ যে ভূতের ভয়ে উঠলাম গাছে, ভূত বলে আমি পেলাম কাছে, হয়ে গেল। ঐ অতিথিশালার পাশের সরাণ দিয়েই তো সেই মড়াকান্না চলে যায় গো মা!'

বড়গিন্নি চোখ তুলে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে একবার শুধু তাকালেন বিলাসিনীর দিকে। তারপর আবার ভাগবত তুলে নিয়ে পড়তে বসলেন। বিলাসিনী 'যাই' বলে একেবারে হাওয়া হয়ে গেল।

তখনকার দিনে রাত আটটা বাজতে না বাজতে গ্রাম নিঃঝুম হয়ে যেত। গ্রামে বিজলি বাতি এসেছে আরো প্রায় পঞ্চাশ বছর পর।

বিলাসিনী আর ময়না সন্ধে সাতটার মধ্যে দুটো জোরালো হ্যারিকেন জ্বালিয়ে রেখে অতিথিশালার

ঘর থেকে বেরিয়ে পালাল। বড়গিন্নি এসে পড়লেন আটটার আগেই। এসেই রামবিলাস আর যোগীন্দরকে বিদেয় করলেন। তারা দুজনে ভয়ে তারকের চৌকির তলায় শতরঞ্চি পেতে শুয়েছিল। বড়গিন্নি এসে পড়তেই তারা সেলাম করে একরকম ছুটেই পালাল।

তারক জ্বরের ঘোরে আচ্ছন্ন। বড়গিন্নি দেখলেন সে ঘুমোচ্ছে। তিনি একটা হেলানো আরাম চেয়ার নিয়ে বসলেন। সামনে একটা তেপায়া। তাতে একখানা বই, পানের বাটা আর ছোট জগে জল।

তারক শুয়েছিল চৌকিতে। তার চৌকির পাশে একটা টেবিলে মিক্সচারের শিশি। গেলাসে ঢাকা দুধসাগু। পাশে বালির কুঁজোয় ঠান্ডা জল।

মাঝে মাঝে বড়গিন্নি গিয়ে তারকের কপালে হাত ছুঁয়ে দেখে আসছেন।

ঠাকুরবাড়ির পেটা ঘড়িতে ন'টা বাজা মাত্র বড়গিন্নি তারককে মাথা ধরে তুলে দুধসাগু খাইয়ে দিলেন। আবার শুইয়ে দিয়ে গায়ের ওপর ভালো করে চাদর টেনে দিলেন। তারপর আবার নিজের চেয়ারে গিয়ে বসলেন। তেপায়া থেকে কৃত্তিবাসী রামায়ণখানা তুলে নিলেন হাতে। হ্যারিকেনের সলতে বাড়িয়ে দিলেন এক চিলতে।

অতিথিশালার একেবারে গাঁ-ঘেষে চলে গেছে লালমাটির কাঁচা রাস্তা। স্থানীয় লোকে বলে সরাণ। সারা গাঁ-খানার ভেতর দিয়ে ইনিয়ে-বিনিয়ে চলে গেছে সরাণ।

তারকের ঘরে সরাণের দিকের জানলা পুরো খোলা। বন্ধ করতে দেননি বড়গিন্নি। রাত্রে অনেকক্ষণ পর্যন্ত বই পড়েন তিনি। কথা আছে ভোর চারটে বাজার আগেই যোগীন্দর চলে আসবে। তখন বড়গিন্নি অতিথিশালার ওপরে তাঁর নিজের ঘরটিতে বিশ্রাম নিতে চলে যাবেন। সে ঘরে মেহগিনির পালঙ্কে ধবধবে বিছানা পাতা। জানলায় বাহারে পর্দা।

বই পড়তে পড়তে রাত একটার ঘণ্টা পর্যন্ত শুনেছিলেন বড়গিন্নি। তারপর বোধহয় একটু চোখ লেগে গিয়েছিল। হঠাৎ এক ঝটকা ঝোড়ো হাওয়া গায়ে লাগতে ঘুম ভেঙে গেল তাঁর। বাইরে ঝড় উঠেছে। প্রচণ্ড ধুলোর ঝড়। শাঁ শাঁ একটা শব্দ আসছে হাওয়ায়। এটা হাওয়ার শব্দ না অন্য কিছু? তীক্ষ্ণ কান্নার মতো! দূরাগত ঘূর্ণি হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে শব্দটা কানে এসে লাগছে। ক্রমশ সে স্বর তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে।

কি ভয়ানক শোকার্ত কান্নার মতো। কিন্তু এ স্বর যার কানে যাবে, শোকের পরিবর্তে ভয়ে তার গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠবে। নিশ্চিত করে বলা যায়—এ কোনো মানুষের কান্না নয়। অমানুষিক এক শব্দের ঘূর্ণি। সমস্ত আকাশকে কণ্টকিত করে, বাতাসের গলা টিপে শ্বাসরুদ্ধ করে এরপর শুধু সেই আঁ...আঁ...কান্নায় চারদিক থেকে ভরে গেল।

বড়গিন্নি ঠাওর করলেন স্বরটা ঠাকুরপাড়া ছাড়িয়েই এদিকে এগিয়ে আসছে। ক্রমশ সেটা একেবারে ঠাকুরবাড়ির কাছে, একেবারে পাশে এসে পড়ল। সেই অমানুষিক তীব্র শব্দের তরঙ্গ তারকের দুর্বল মস্তিষ্কে আঘাত করতেই বিকট চিৎকার করে তারক বিছানার ওপর উঠে বসল। বিকারের ঘোরে সে এমন হাত ছুঁড়ল যাতে টেবিলের ওপর থেকে হ্যারিকেনটা মাটিতে পড়ে ভেঙে নিভে গেল। আর একটা হ্যারিকেন আগেই নিভে গিয়েছিল। সমস্ত ঘর দুঃসহ অন্ধকারে ছেয়ে গেল।

দৌড়ে এসে অসুস্থ ভীত তারককে চেপে ধরলেন বড়গিন্নি। 'তারক তারক, ভয় পাস না। কি হল তারক—'

তারক তখন অজ্ঞান হয়ে গেছে। ফটাস শব্দ করে জানলার পাল্লা দুটো সপাটে বন্ধ হয়েই আবার হাওদা হয়ে খুলে গেল। জানলাটা বন্ধ করা দরকার। তারককে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে দৌড়ে জানলার ধারে এলেন বড়গিন্নি। এক পলক শুধু তাকিয়েছিলেন তিনি রাস্তার দিকে। শুধু এক নিমেষের দেখা।

নিদারুণ দুঃসাহসী মহিলা ছিলেন তিনি। কিন্তু তারপর তিনদিন-তিনরাত্রি কথা সরেনি তাঁর মুখ দিয়ে। বোবা হয়ে গিয়েছিলেন। সম্পূর্ণ বাক্‌রোধ। কি দেখেছিলেন তিনি তাঁর মুখ থেকে কেউ বের করতে পারেনি। জিগ্যেস করলেই তাঁর ভয়-বিস্ফারিত চোখে ফুটে উঠত অমানুষিক বিভীষিকার

ছায়া। মুখ থেকে মাত্র ক'টি কথাই শোনা যেত—'কালো....কি বিরাট কালো....বরফ-ঠান্ডা....কেউ বাঁচবে না....কেউ বাঁচবে না.....

তারককে বাঁচানো গেল না। আর জ্ঞানই ফিরল না তার। পরদিন থেকেই গ্রামে কলেরা দেখা দিল। ঠাকুরপাড়ার দীনু মিস্ত্রির ছোট ছেলেটা প্রথম মারা গেল ভেদবমি করে। তারপর থেকে রোজই একটি-দু'টি করে।

কলেরা মহামারীর আকার নিল। ঘরে ঘরে মানুষ মরতে লাগল। সেই অমানুষিক কান্না তারপর আর শোনা যায়নি। কিন্তু মানুষের বুকফাটা কান্না হয়ে তা সারা গ্রামে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। জমিদার-বাড়ি ঝেঁটিয়ে চলে গেল গ্রাম ছাড়িয়ে তাদের বিশ্রামগৃহ 'আরামকুটিরে'। গ্রাম হয়ে উঠল শ্মশান। বেশিরভাগ ঘরেই চুলো ধরে না। রান্না চাপে না। শুধু কান্না, কান্না আর কান্না। এই মরণলীলার শেষ হল বড়গিন্নির ছোট নাতিটির শেষকৃত্য দিয়ে। সেদিন সারা আরামকুটিরের বাহারে গাছগুলো বড়গিন্নির কান্নার ঘূর্ণি হাওয়া লেগে শুধু কাঁপছিল আর কাঁপছিল।

বড়গিন্নি এরপরেও বহুবছর বেঁচে ছিলেন। থুত্থুড়ি বুড়ি অবস্থাতেও তাঁকে কেউ যদি জিগ্যেস করত সেই অভিজ্ঞতার কথা, বহুদিন পরেও তাঁর ত্রাস-বিস্ফারিত চোখে ফুটে উঠত কালান্তক বিভীষিকার ছায়া।

ভাঙা ফিসফিসে গলা থেকে সেই ক'টি কথাই শুধু ঝরে পড়ত, 'কালো...কি বিরাট কালো...বরফ-ঠান্ডা...কেউ বাঁচল না...কেউ বাঁচল না...হায় রে...'

ঠাম্মা আড়চোখে দেখলেন বুকুর মুখ এতটুকু হয়ে গেছে। তিনি বললেন, 'কি ভাই, বেশ মজার গল্প, না?'

'হ্যাঁ, তা মজারই তো...' বলতে গিয়ে বুকুর গলা কেঁপে গেল। জড়সড় হয়ে লেপের তলায় ঢুকে পড়ে বলল, 'ঠাম্মা, চট করে পশ্চিমের জানলাটা বন্ধ করে দিয়ে এসো।'

আষাঢ় ১৪০৫

শয়তানের জাগরণ

ধ্রুবজ্যোতি চৌধুরী

বহু বছর হয়ে গেল, কিন্তু ঘটনাটা এখনো স্মৃতিপটে পরিষ্কার হয়ে ফুটে আছে। সেই ভয়ংকর দিনটির কথা যখনই মনে পড়ে তখনই আতঙ্কে শিউরে উঠি। এত বছর পরে আজও সেই আতঙ্কের হাত থেকে মুক্তি পাইনি, বোধহয় কোনোদিন পাবও না। অথচ ঘটনাটা এমনই যে, কেউ সেটা বিশ্বাস করতেই চায় না। ভাবে, আমার বোধহয় ভুল বকার অভ্যেস আছে। কি করে তাদেরকে বোঝাই যে ঘটনাটা একেবারে অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। একজন সাক্ষীও ছিল, কিন্তু সে আর ইহজগতে নেই।

আমি তখন ছিলাম সেনাবাহিনীর একজন ক্যাপটেন। কিছুদিন আগেই প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে একদফা জোর লড়াই হয়ে গেছে। সে লড়াইয়ে আমাদের অপ্রস্তুত সেনাবাহিনীকে প্রচুর ক্ষয়-ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে। তাই লড়াই শেষ হওয়ার পরই আমাদের সেনাবাহিনীকে ঢেলে সাজানোর ব্যবস্থা হল, আর আমাকে পাঠানো হল সীমান্তের এক সামরিক ঘাঁটিতে। ঝড়ের ঠিক পরেই যেমন প্রকৃতি শান্ত হয়ে যায় তেমনি লড়াইয়ের উত্তেজনার পর আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রাও তখন হয়ে পড়েছিল খুবই নিরুত্তাপ, একঘেয়ে। রুটিন বাঁধা কাজকর্মের পর বাকি সময়টা আমরা সবাই মিলে খাওয়া-দাওয়া গল্পগুজব করে আর তাস খেলেই কাটিয়ে দিতাম। বিশেষত তাস খেলাটা খুবই চলত।

আমি যে ব্যারাকটায় থাকতাম সেটা ছিল বেশ বড়সড়, দোতলা, ঠিক ইংরেজি 'এল' অক্ষরের মতো। আশেপাশে কিছুটা দূরে দূরে আরো অনেকগুলো ব্যারাক। ব্যারাকগুলোর সামনে ও পেছনে অনেকখানি ফাঁকা মাঠ, সেখানে আমাদের ড্রিল, প্যারেড, খেলাধুলো এইসব হত। আমাদের তাসের আসর বসত একতলার ঠিক মধ্যিখানে একটা বড় ঘরে, যাকে আমরা বলতাম ক্লাবঘর। এই তাসের আসরে সবচাইতে পাকা খেলোয়াড় ছিল আমাদের ব্যারাকের মাইকেল জন। তাসের যে কোনো রকম খেলাই হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত দেখা যেত সেই জিতেছে। আমাদের ব্যারাকের সব তাসুড়ে তো বটেই, অন্যান্য ব্যারাক থেকে যারা খেলতে আসত, তারাও যে যার পকেট ফাঁকা করেই ফিরত। প্রথম প্রথম কেউ কিছু মনে করেনি, হাসিঠাট্টা করেই ব্যাপারটা উড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু যতই দিন যেতে লাগল, ততই জনের জেতার বহর বেড়ে চলতে লাগল। ওর অবিশ্বাস্য তাসের হাত আর ভাগ্য নিয়ে শুরু হয়ে গেল ফিসফাস, চাপা গুঞ্জন। একজন তো আবার ওর সম্বন্ধে খোঁজখবর নিয়ে আমাদের জানাল জনের ভাবগতিক মোটেই সুবিধের নয়। বেহিসেবী খরচ করাটা নাকি ওর মজ্জাগত অভ্যেস আর সব সময়েই নাকি ও ধারদেনায় ডুবে থাকে। এসব জানা সত্ত্বেও কিন্তু জনের আড্ডা মারা বা তাসের আসর বসানো বন্ধ হল না। তার কারণ, জনের চেহারায় আর বাহ্যিক আচার-ব্যবহারে এমন একটা অমোঘ আকর্ষণ আর সম্মোহনী শক্তি ছিল যে ওকে চট করে কেউ এড়িয়ে যেতে পারত না। মজার মজার গল্প বলে, গান করে মজলিশ জমাতেও জন ছিল সিদ্ধহস্ত। তবে আস্তে আস্তে কিন্তু ওর ওপর সকলের মোহ কেটে যেতে লাগল। অনেকেই নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারল যে, তাস ভাঁজবার সময় ও বিলি করার সময় জন হাতের কায়দায় কিছু তাস সরিয়ে ফেলে। আমাদের মধ্যে কয়েকজন তক্কে তক্কে রইল জনকে হাতেনাতে ধরার জন্য।

ঘটনাটা যেদিন ঘটল, সেদিনটা ছিল রবিবার। সবে শীত পড়তে শুরু করেছে, বেলা ছোট হয়ে এসেছে। সেদিন আমাদের ব্যারাকের মাঠে সারাদিন ধরে খেলাধুলোর আয়োজন করা হয়েছিল। সব অনুষ্ঠান যখন শেষ হল তখন প্রায় সন্ধে ঘনিয়ে এসেছে। জন একদল বন্ধুবান্ধব নিয়ে সকাল থেকেই ক্লাবঘরে তাসের আসর জমিয়ে বসেছে। আমার কয়েকজন বন্ধুবান্ধব এসেছিল। তাদের এগিয়ে দিতে

গিয়ে গল্প করতে করতে আমিও বেশ খানিকটা চলে গিয়েছিলাম। যখন ফিরে এলাম, তখন অন্ধকার নেমে এসেছে ভালোভাবে। আমাদের ব্যারাকের মাঠ একদম ফাঁকা হয়ে গিয়েছে। গেট দিয়ে ঢুকে হাঁটতে হাঁটতে সামনের দিকে মুখ তুলে তাকাতেই দেখলাম ক্লাবঘরের বাইরে একটা জানালার সামনে দীর্ঘদেহী একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। লোকটার সারা শরীর কালো পোশাকে ঢাকা। মাথাটা একটু ঝুঁকিয়ে কান পেতে ক্লাবঘরের কথাবার্তা একমনে শুনছিল সে। লোকটা আমার সহকর্মীদের মধ্যে কেউ নয়, উপরন্তু ঐরকম পোশাকপরা অত দীর্ঘদেহী লোক আমাদের বা আশেপাশের ব্যারাকে কখনো দেখিছি বলেও মনে হল না।

ওর হাবভাব দেখে বেশ একটু খট্‌কা লাগল আমার। কোনো সৈনিক ছাউনির একেবারে ভেতরে এরকম একজন অচেনা লোক থাকাটা মোটেই নিরাপদ নয়। বিপদের আভাস পেয়ে মনটা চঞ্চল হয়ে উঠল।

ইতিমধ্যে ক্লাবঘরে খুব চড়াগলায় তর্কাতর্কি শুরু হয়ে গিয়েছিল। একাধিক লোক একসঙ্গে চেঁচাচ্ছিল, তাদের মধ্যে জনের গলাই শোনা যাচ্ছিল বেশি। সে যেন খুব উত্তেজিতভাবে কি একটা কথার প্রতিবাদ করে চলেছে। আরো কয়েক পা এগিয়ে যেতেই ক্যাপটেন মাথুরের গলা কানে এল। সে খুব রাগতভাবে বলছে, 'দেখ জন, বেশি চেঁচিও না। অনেক দিন ধরেই আমাদের সন্দেহ হচ্ছিল যে তুমি তাস হাতসাফাই কর। আজ একেবারে হাতেনাতে ধরেছি। এখুনি তাস দেবার সময় তুমি কড়ে আঙুল দিয়ে প্যাকেটের তলার দিক থেকে তাস টেনেছ, স্বচক্ষে দেখেছি। সবার হাতের তাস গোন। তোমার কাছে একটা তাস নিশ্চয়ই বেশি পাওয়া যাবে। শীগগির তাস দেখাও।'

জন অবশ্য অত কাঁচা ছেলে নয়, সে প্রাণপণে প্রতিবাদ করতে লাগল। কিন্তু দেখা গেল, মাথুরকেই সবাই সমর্থন করছে। তারা সবাই চাইছে যে জনের হাতের তাস পরীক্ষা করে দেখা হোক।

হঠাৎ সকলের মিলিত কণ্ঠস্বর ছাপিয়ে জনের গলা শোনা গেল। যে ভয়ংকর শপথ সে করল তা লিখতে এখনো আমার কলম কেঁপে যাচ্ছে। সে বলে উঠল, 'শোন সবাই, আমি মোটেই তাস চুরি করিনি। যে কোনো শপথ আমি করতে পারি। যদি আমি তাস সরিয়ে থাকি, তাহলে এখুনি যেন অন্ধকারের রাজা, নরকের প্রভু শয়তান এসে আমাকে চিরদিনের জন্য নিয়ে চলে যায়।'

জনের মুখ থেকে এই কথাগুলো বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে যেন একটা ভোজবাজি ঘটে গেল। চমকে উঠে দেখলাম, দীর্ঘদেহী লোকটা এক লাফে খোলা জানালা দিয়ে ক্লাবঘরের ভেতরে ঢুকে গেল। ভেসে এল জনের তীব্র, তীক্ষ্ণ আর্তনাদ। তারপরেই একটা ঘড়ঘড় আওয়াজ। কয়েক সেকেন্ড মাত্র, আবার সেই দীর্ঘদেহী লোকটা এক লাফে জানালা দিয়ে বেরিয়ে এল। বিস্ফারিত চোখে দেখলাম তার কাঁধে ঝুলন্ত অবস্থায় জন ছটফট করছে।

আমি তখনো কিছুটা দূরে ছিলাম। তাড়াতাড়ি পা ফেলে ওদের কাছে গিয়ে পৌঁছবার আগেই লোকটা একদৌড়ে ব্যারাকবাড়িটার কোণ ফিরে আমার চোখের আড়ালে চলে গেল। একবার, এক পলকের জন্য ওদের দুজনের মুখটা দৃষ্টিগোচর হয়েছিল। দেখেছিলাম জনের মুখ একদম ফ্যাকাশে। এক অসহ্য যন্ত্রণায় আর আতঙ্কে ওর দুই চোখ যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। আর দীর্ঘদেহী লোকটার দুই জ্বলন্ত চোখের তীব্র দৃষ্টিতে ফুটে বেরোচ্ছে চরম হিংস্রতা আর নিষ্ঠুরতা।

কয়েক মুহূর্তের জন্য কি একটা অজানা ভয়ে আমার সারা শরীর অবশ হয়ে গেল। কোনোরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে ওদের ধরব বলে দৌড়লাম। কিন্তু ব্যারাকের বাঁক ঘুরে দেখলাম, কেউ কোথাও নেই, চারিদিক ফাঁকা, নির্জন।

আবার দৌড়ে ফিরে এলাম সামনের দিকে। গেটের প্রহরীকে চেঁচিয়ে ডেকে জিগ্যেস করলাম, কেউ এইমাত্র বেরিয়ে গিয়েছে কিনা। সে জানাল, না। অগত্যা উদ্‌ভ্রান্তের মতো ক্লাবঘরে ফিরে গেলাম।

ভিতরে যে দৃশ্য অপেক্ষা করছিল তার জন্য আমি মোটেও প্রস্তুত ছিলাম না। দেখলাম, যে জনকে মাত্র কয়েক সেকেন্ড আগে দীর্ঘদেহী অচেনা লোকটার কাঁধে ছটফট করতে দেখেছি সে সশরীরে

ঘরের একটা ইজিচেয়ারে চিৎ হয়ে পড়ে আছে। ভাগ্যক্রমে ক্লাবে সেই সময় আমাদের এক ডাক্তার বন্ধু ছিল, সে পরীক্ষা করে জানাল জন মারা গিয়েছে।

হতবুদ্ধি হয়ে একটা চেয়ারে বসে পড়লাম। চোখের সামনে তখন সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দুলছে। ঘরের ভেতরে অত লোকের চিৎকার-চেঁচামেচি যেন কানে যাচ্ছিল না। একটু ধাতস্থ হওয়ার পর ঘরে কি ঘটেছে শুনতে চাইলাম। সবাই একসঙ্গে যা বলল, তার সারমর্ম করলে দাঁড়ায় ঃ জন যথারীতি তাস বিলি করার সময় প্যাক থেকে তাস সাফাই করেছিল। ক্যাপ্টেন মাথুর সেটা দেখতে পেয়ে জনকে চ্যালেঞ্জ করেছিল। তাই নিয়ে দুজনের মধ্যে তর্কাতর্কি বেধে যায়, যেটা আমি ঘরের বাইরে থেকেই শুনেছি একটু আগে। এই সময় জন হঠাৎ ঐ ভয়ংকর কথাগুলো বলে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গেই নাকি বাইরের জানালা দিয়ে একটা দম্‌কা হাওয়া ঘরে ঢুকে টেবিলের তাসগুলোকে উড়িয়ে দেয়। আর জন আর্তচিৎকার করে চেয়ারে ঢলে পড়ে। একটুখানি ছটফট করেই তার দেহ স্থির হয়ে যায়।

সব শোনার পর আমার মুখ দিয়ে আর কথা সরল না। ভাবলাম তাহলে একটু আগে আমি কি দেখেছি আর কেনই বা দেখেছি? যা দেখেছি তা অন্য কাউকে কি বলা যায়? অনেক ভেবে-চিন্তে শেষ পর্যন্ত আশেপাশে যারা ছিল, তাদের আমার দেখা ঘটনাটা বলতে গেলাম। ফল হল বিপরীত, তারা বিশ্বাস তো করলই না উল্টে ভাবল হঠাৎ প্রচণ্ড শক খেয়ে আমার মাথা বোধহয় গোলমাল হয়ে গেছে। আমাকে সুস্থ করার জন্যই তখন আবার কেউ কেউ ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ব্যাপারটা এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছল যে আমারও সন্দেহ হতে লাগল, তাহলে কি সবটাই আমার চোখের আর মনের ভুল!

আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ক্যাপ্টেন ভার্গব কখন একসময় কাছে এসে দাঁড়িয়েছে টের পাইনি। ক্লাবঘরের ঠিক ওপরের কামরাটাতেই থাকত ও। শরীরটা বেশ কিছুদিন ধরে খারাপ যাচ্ছিল বলে সারাদিন ভার্গব ওপর থেকে নামেনি। আমার কথা শুনে উদ্‌ভ্রান্তের মতো সে জিগ্যেস করল, 'চৌধুরী তুমি দেখেছ? জনের জন্যে যে অপেক্ষা করছিল, তাকে দেখতে পেয়েছ তাহলে?'

ভার্গবের কথা শুনে এই চরম বিভ্রান্তির মধ্যে যেন অকূলে কূল খুঁজে পেলাম। যাক তাহলে আমি পাগল হয়ে যাইনি, ভুলও দেখিনি। ভার্গব দোতলার ঘরের জানালাতেই বসেছিল। রহস্যময় দীর্ঘদেহীকে সেও ভালোভাবেই লক্ষ করেছে। কোন এক অদৃশ্য শক্তির বিচিত্র খেয়ালে আমরা দুজনই ক্ষণিকের জন্যে অতিপ্রাকৃত কিছু একটা দেখতে পেয়েছি। তার ফলে যে অভিজ্ঞতা আমাদের হয়েছিল তার অভিশাপ থেকে সারা জীবনেও মুক্তি পেলাম না।

আমাদের দুজনের মুখে হুবহু একই ঘটনার বর্ণনা শুনে ব্যারাকের অন্যান্য লোকেরা প্রথমে একটু থমকে গিয়েছিল। কেউ কেউ ভয়ও পেয়েছিল, কিন্তু বেশিরভাগ সহকর্মীই আমাদের পাগল আর মিথ্যেবাদী বলে বিদ্রূপ করেছিল।

যাই হোক, এরপর থেকে ব্যারাকে তাস খেলা একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। ঐ দিনের ঘটনা নিয়ে কেউ খোলাখুলিভাবে আলোচনাও করত না। তবে চাপা গুঞ্জন তল্লাটের সব কটা ব্যারাকেই চলত। আমাকে আর ভার্গবকেও সবাই যেন এড়িয়ে যেতে লাগল। ভার্গব অবশ্য এর অল্প কয়েকদিন পরেই এক জিপ দুর্ঘটনায় মারা যায়। কিন্তু আমি এখনো বেঁচে আছি, আর সেদিনের দুঃসহ স্মৃতির বোঝা বয়ে চলেছি। এখনো মাঝে মাঝে সেই ভয়াবহ দৃশ্যটি স্বপ্নে দেখে ঘুম ভেঙে যায় আর আতঙ্কে হিম হয়ে উঠে বসে বিনিদ্র রজনী কাটাই।

আষাঢ় ১৪০০

মায়ার টানে

অনিন্দ্য গোস্বামী

আঈয়ে, আঈয়ে। ম্যাল মেঁ জিনকো উতারনা হ্যায়, সামনে আ জাঈয়ে।

বাসজার্নির শেষ পর্যায়ে চোখটা আবার লেগে এসেছিল, কন্ডাক্টরের চিৎকারে চটকা ভেঙে গেল। শান্তনু উঠে দাঁড়াল। বাসটা হাঁইমাই করে দৌড়চ্ছে ছবির মতো সুন্দর শৈলশহরটার মধ্যে দিয়ে। চড়াই শেষ হয়ে এখন একটু ঢালু রাস্তা। শান্তনু আড়মোড়া ভাঙে, তারপর পাশ থেকে ছোট সাইডব্যাগটা তুলে নেয়। রুকস্যাকটা ডিকিতে আছে। ও সিটের মাথার ওপরের র‍্যাকটা থেকে প্লাসটিকের প্যাকেটটা নামিয়ে নেয়। মা প্যাক করে দিয়েছেন, মন্দিরে নিয়ে যেতে হবে।

শান্তনুরা দিল্লিতে থাকে, ওখানে ওর বাবা কেন্দ্রীয় সরকারি অফিসে কাজ করেন। ও এবার প্লাস-টু পরীক্ষা দিয়েছে। রক ক্লাইম্বিং, বেসিক মাউন্টেনিয়ারিং কোর্স ও আগেই করেছে, এবার এসেছে একটা লং ডিসটান্স ট্রেকিং-এ যোগ দিতে। আসবার পথে এই কাজ—মা বলেছেন মহাদেবীর মন্দিরে পুজো দিয়ে যেতে।

গতকাল স্টেশনে নেমে মাঝরাতের বাসটা ধরে ভালোই হয়েছে, কি সুন্দর সকাল সকাল পৌঁছে গেল। এবার হোটেল খোঁজা। বাসস্ট্যান্ডে নেমে, রুকস্যাকটা কাঁধে নিয়ে, চারদিক দেখে, শান্তনুর মনটা খুশিতে ভরে গেল। যাক বাবা, স্বস্তি, সেই হোটেল দালালরা ছেঁকে ধরে না এখানে। ও আস্তে আস্তে হেঁটে ম্যালের ওপর দিকে যায়। পিঠে রুকস্যাক, কাঁধে ব্যাগ, আবার হাতে এই প্যাকেটটা—জিনিসগুলো কোথাও রেখে হোটেল খুঁজতে হবে। মহাদেবীর মন্দিরে নাকি এই এত মিটার লম্বা লাল কাপড় নিয়ে যাওয়ার নিয়ম—ভারী আছে প্যাকেটটা।

একটা চায়ের দোকানের পাশে এস টি ডি বুথ। তার সামনে বেঞ্চের ওপর রুকস্যাকটা রেখে শান্তনু ভাবছে কোন রাস্তাটায় যাবে। সামনে রাস্তা দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। এমন সময় নীচের রাস্তার বাঁক ঘুরে প্রৌঢ় লোকটি ওর দিকে এগিয়ে আসেন। একি! এসে গেছ? এত সকালে? বাঃ বাঃ। রাতের বাস ধরেছিলে বুঝি? পারোও বটে বাবা, তোমরা। একালের ছেলেপিলে। দাও, দাও, হাতের প্যাকেটটা আমাকে দাও।

ভদ্রলোকের হাবভাবে মনে হয়, যেন কতদিনের চেনা। শান্তনু একটু অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে দেখে উনি বলেন, চিনতে পারলে না তো? পারবে কি করে? আমি হচ্ছি—

বিমলকাকা। শান্তনু অস্ফুট স্বরে বলে।

অ্যা-ই তো! একজ্যাক্টলি। তোমার বাবার বন্ধু। বিমল চ্যাটার্জি।

বাবার চিঠি কবে পেলেন? শান্তনু প্রণাম করতে নিচু হয়। বিমলকাকা হাত ধরে ওকে বাধা দিয়ে বলেন, অ্যা-ই দ্যাখো। আরে এসব আবার কি? আজকের ইয়াং ম্যান। মাথা নোয়াবে শুধু ওপরওয়ালার সামনে। অফিসের নয়, দুনিয়ার ওপরওয়ালা। হ্যাঁ, যা বলছিলাম। দীপকের চিঠি কয়েকদিন আগেই পেয়েছি। কিন্তু গণ্ডগোলটা কি জান, ওরা সকলে খোকার মামাবাড়ি গেছে। আমার ছেলে, মানে খোকা, এই তোমার চেয়ে বছর দুয়েকের ছোট, এবার বোর্ডের পরীক্ষা দিল তো। তাই সক্কলে গেছে। সে ঘাবড়িও না। তোমার জন্যে একটা লজে ব্যবস্থা করেছি। এসো না, এই নীচে, পাঁচ মিনিটের রাস্তা। দাও, দাও, প্যাকেটটা আমার হাতে দাও। হুঁ, বৌদির কাজ দেখছি। পুজোর ব্যাপার তো—ফাঁক থাকে না।

শান্তনু মনে মনে হাসল। ভদ্রলোক একটু বেশি বকবক করেন। তার ওপর ভদ্রলোকের বাড়ি

থাকতে উনি লজে শান্তনুর থাকবার ব্যবস্থা করলেন বলে আরো অবাক হল ও। তবে ওর মাথায় এখন শুধু একটাই চিন্তা। তাড়াতাড়ি পুজো দিয়ে আজ দুপুরের মধ্যেই ফাইভ মাইল চেকপোস্টে পৌছোন। ওখানে কোনো এক ক্যাপ্টেন সাহেবের সঙ্গে দেখা করে পারমিট নিতে হবে। তবেই ভাণ্ডারনাথ ট্রেকিং দলে নাম দেওয়া যাবে। ইয়ুথ হোস্টেলের তত্ত্বাবধানে এই টিমটা যাচ্ছে।

হবে, হবে। সব হবে। আমি আছি। চিন্তা নেই। চিনার লজ নামক সুন্দর একতলা বাংলো প্যাটার্নের হোটেলটার বারান্দায় চেয়ারে বসে হুপ হুপ করে চা খেতে খেতে বিমলকাকা বললেন, তাড়াতাড়ি চান করে নাও। পুজোটা দিয়ে এস আগে। গরম জলের গিজার আছে ঘরে।

চান করে বেরিয়ে শান্তনু জামাকাপড় পরছে, এমন সময় বেয়ারা এল। বলল, ডাক্তারসাহেব বললেন, শান্তনু যেন পুজো দিতে মন্দিরে চলে যায়। সাহেব গেছেন ইয়ুথ হোস্টেলে খবর দিতে।

তুমি ওনাকে চেন?

ডাক্তারসাহেবকে কে না চেনে?

মহাদেবীর মন্দিরে পুজোর বিশাল লাইন। কত দূর দূর থেকে লোকজন এসেছে। ফোঁটাকাটা সাউথ ইন্ডিয়ানেরা দল বেঁধে এসেছে, এসেছে সর্দারজীরা। পাগড়িধারী রাজপুত, টুপিপরা গোর্খা, কুর্তার ওপর জ্যাকেট পরা ডোগরা। গাড়োয়াল কুমায়ুনের পাহাড়িরা দলে দলে এসেছে। ক্যালর-ব্যালর করা বাঙালির সংখ্যাও কম নয়। খুবই নাকি জাগ্রত দেবী।

মা, ফিজিক্স সেকেন্ড পেপারটা তেমন জুতসই হয়নি, রেজাল্টটা যেন ঠিকমতো হয় মা। প্রার্থনাটুকু সেরে শান্তনু অবাক চোখে নীল আকাশের গায়ে সুউচ্চ মন্দিরশীর্ষ থেকে লাল ফিতের মালা টাঙানো দেখতে লাগল। তারপর প্রসাদের চ্যাঙাড়িটা হাতে বাইরে বেরিয়ে আসতেই ও বিমলকাকাকে দেখতে পেল। উনি গম্ভীরমুখে দাঁড়িয়ে আছেন।

ব্যাড নিউজ, বুঝলে, হে? তোমাদের ট্রেকিংটা হচ্ছে না। মানে, ঠিক ক্যানসেল হয়নি, তবে পোস্টপোন্ড হয়েছে। একটা বড় ল্যান্ডস্লাইড হয়েছে। নামগিয়াল বলল, আগামী বুধবারের আগে প্রোগ্রাম শুরু হবার কোনো চান্স নেই।

নামগিয়াল কে?

আরে ইয়ুথ হোস্টেলের অফিসার-ইন-চার্জ। ক্যাপ্টেন নামগিয়াল। ও-ই তো সব অ্যারেঞ্জ করে। আমার পুরোনো পেশেন্ট তো। তোমার নামটাও দেখলাম লিস্টে, এগারো নম্বর বোধহয়, তাই না?

হ্যাঁ।

মোট আটত্রিশজন আছে, তোমাদের। ফরেনার আছে জনা চৌদ্দ। তাদের মধ্যে আবার জনা তিনেক নাম ক্যানসেল করিয়ে দিল। ওরা দেরি করতে পারবে না। সে যাক। তুমি কি করবে? এখনও তো পাঁচ দিন। নাম ক্যানসেল করাবে নাকি?

আমি যাবই।

অ্যা-ই। গুড। একেই বলে ডিটারমিনেশন। যাকগে তুমি তাহলে এক কাজ করতে পারো। দুপুরে খাবার পর বাসে পালানপুর চলে যাও। ওখানে রিজার্ভ ফরেস্ট দেখো। তারপরে ভক্তিগড়ে বাঁধ, ট্রাং ক্যাম্প এসব ঘুরে-ফিরে দিন দুয়েক কাটিয়ে ফিরে এসো। সব ক'টা জায়গাতেই ইয়ুথ হোস্টেল আছে, অসুবিধে হবে না। ইতিমধ্যে আমি ক্যাপ্টেন রামরাজ সিং-এর কাছ থেকে তোমার পারমিটটা করিয়ে রাখব। হ্যাঁ, ভালো কথা, হোটেলের বিল-ফিল আমি দিয়ে দেব, তবে তুমি ইচ্ছে করলে বেয়ারাকে বকশিসটা দিতে পারো।

ফিরে এসে আপনাকে কোথায় কনট্যাক্ট করব?

আমি রোজ দু'বেলা লজে খবর নেব। আর তাছাড়া, ঐ বেয়ারা কিংবা....হেসে ফেলেন বিমলকাকা, যে কোনো লোককে জিগ্যেস করলেই আমার চেম্বারের কিংবা বাড়ির রাস্তা দেখিয়ে দেবে। চলো, এখন দেখি তোমার খাবার কি ব্যবস্থা হল?

দু'দিন নয়, তিনদিন পর শান্তনু আবার ঐ শহরে ফিরে এল। ও আশা করেছিল বিমলকাকা

ওর নামে চিনার লজে ঘর বুক করে রাখবেন। কিন্তু বুকিং ছিল না, ফলে ও ঘর পেল না। রিসেপশানের লোকটা ওকে বলল, একটু অপেক্ষা করুন। ন'নম্বরের পার্টি আজ চলে যাচ্ছে। ঐ ঘরটা আপনাকে দিয়ে দেব।

মালপত্রগুলো ওদের অফিসে রেখে কমন বাথরুমে চানটান করে তৈরি হয়ে শান্তনু বলল, আমি একটু ইয়ুথ হোস্টেলে যাচ্ছি। ফিরে এসে যাহোক দেখা যাবে।

আপনি কি ওখানেই থাকবেন? লোকটা বলল, মানে, বলছি যে ন'নম্বর এখনি খালি হয়ে যাবে।

আমি এখানেই থাকব। মালপত্র তো রেখে গেলাম।

ইয়ুথ হোস্টেলের অফিসার-ইন-চার্জ ক্যাপ্টেন চন্দন নামগিয়ালের চেহারাটা প্রকাণ্ড। প্রায় সাড়ে ছ'ফিটের ওপর লম্বা তিব্বতি ভদ্রলোক। অফিসে বসেছিলেন। শান্তনুর কথা শুনে উনি প্রায় খেঁকিয়ে উঠলেন, হোয়াট ডু ইউ মিন? ভাণ্ডারনাথ ট্রেকিং, সেটা ক্যানসেল হবে কেন? যথাসময়ে রওয়ানা হয়েছে।

রওনা হয়েছে? শান্তনুর মাথা গোলমাল হয়ে যায়, যথাসময়ে?

ইয়েস। এবং তারপর অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে।

অ্যাক্সিডেন্ট!

ইয়েস। তোমার নাম কি, ইয়াং ম্যান?

শান্তনু গাঙ্গুলি।

ও, আই সি। নাম্বার ইলেভেন তো? থ্যাংক গড। ভগবানকে ধন্যবাদ দাও তুমি, প্রাণে বেঁচে গেছ। বিরাট অ্যাভালাঞ্চে পড়েছে পুরো দলটা। তুষারধস। রেসকিউ ওয়ার্ক চলছে। এয়ারফোর্স, আর্মি। এখনও একজনকেও উদ্ধার করা যায়নি।

শান্তনুর মাথা ঘুরতে থাকে। ও ক্যাপ্টেনের সামনের চেয়ারে বসে পড়তে পড়তে বলে, কিন্তু বিমলকাকা যে বললেন—

কে বললেন?

ডাঃ বিমল চ্যাটার্জি। আপনি তো ওনার পুরোনো পেশেন্ট।

ননসেন্স। চন্দন নামগিয়াল কোনোদিন ডাক্তার দেখায় না। দেখাতে হয় না। স্যরি ইয়াং ম্যান, কোনো ডাক্তার চ্যাটার্জিকেই আমি চিনি না।

হতভম্ব শান্তনু লজে ফিরে আসে। নাঃ, বিমলকাকা এখনো এখানে আসেননি। ও সেই বেয়ারাটাকে খোঁজে। ম্যানেজার বলে, সে দিনদুয়েক হল ছুটি নিয়ে দেশে গেছে। শান্তনু লজ থেকে বেরিয়ে ম্যালে আসে। ওষুধের দোকানে খোঁজ করে। দোকানি বলে, না সাব। কোনো ডাক্তার চ্যাটার্জিকে তো আমরা চিনি না। এই তো ছোট্ট শহর...আচ্ছা আপনি বরং ডাক্তার গুলেরিয়াকে একবার জিগ্যেস করুন।

চেম্বারের মধ্যে বসে ডাক্তার গুলেরিয়া ম্যাগাজিন পড়ছিলেন। গম্ভীর মুখ করে বললেন, শহরের সব ডাক্তারকেই তো চিনি। চ্যাটার্জি কেউ নেই।

সারাটা দিন চেষ্টা করেও শান্তনু বিমলকাকার কোনো খোঁজ পায় না। যেন হাওয়ায় উবে গেছেন ভদ্রলোক। ও আবার ইয়ুথ হোস্টেলে যায়। নামগিয়াল বলেন, এখন বাড়ি ফিরে যাও। পরে আবার কবে প্রোগ্রাম হবে, তা কনট্যাক্ট করে জেনে নেবে। আপাতত ওদের মেজাজ খুব খারাপ। এখনও একটাও বডি উদ্ধার হয়নি।

পরের দিন দিল্লি পৌঁছয় শান্তনু! বাড়ি ফিরতে ফিরতে রাত দশটা। ওর ট্যাক্সি বাড়ির সামনে থামতেই একটা হৈ-চৈ পড়ে যায়। কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে আসেন মা, চেঁচাতে চেঁচাতে ঠাকুমা। শান্তনু দেখে, বাড়িভর্তি লোক, আত্মীয়স্বজন। মা ওকে জড়িয়ে ধরেন।

এ কি! তোমরা এরকম করছ কেন? ও জিগ্যেস করে।

বাবা তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসেন। ওর হাত ধরে ভেতরে নিয়ে যেতে যেতে বলেন, সরো, সরো। ওকে আগে বসতে দাও।

ও বসবার পর সকলে গোল হয়ে চারদিকে দাঁড়ায়। টিঙ্কুও সোফার পাশ থেকে গোল গোল চোখে ওকে দেখছে। ওদের কথায় ও ব্যাপারটা বুঝতে পারে। টিভিতে ভাণ্ডারনাথ অভিযাত্রী দলের দুর্ঘটনা সম্পর্কে বিশাল কভারেজ দিয়েছে। খবরের কাগজের প্রথম পাতায় রিপোর্ট। একজনও বেঁচে নেই অভিযাত্রী দলের।

হ্যাঁ। কেউ বাঁচেনি। তবে আমার তো যাওয়াই হল না। বিমলকাকার জন্যে।

বিমলকাকার জন্যে? ঘরের হৈ-হট্টগোল হঠাৎ থেমে যায়। একটা সূচীভেদ্য নিস্তব্ধতা গ্রাস করে সকলকে। শান্তনু অবাক হয়। ও বলে, কি হল?

বিমলকাকার জন্যে—মানে? বাবা জিগ্যেস করেন।

বিমলকাকাই তো আমাকে এসে বললেন, প্রোগ্রামটা পিছিয়ে গেছে। পাঁচ দিন পরে শুরু হবে। উনি ব্যবস্থা করে আমাকে পালানপুর পাঠিয়ে দিলেন।

তাই?

হ্যাঁ। ওখানে পৌঁছবার মুহূর্তেই উনি আমাকে পাকড়াও করলেন। থাকবার ব্যবস্থা করলেন। পুজো দেবার—সবকিছু। কিন্তু পালানপুর থেকে ফিরে এসে আর ওঁকে খুঁজে পেলাম না।

মা হু-হু করে কেঁদে উঠলেন আবার। সেই সঙ্গে ঠাকুমাও। বাকি ঘরভর্তি লোক চুপ করে আছে। বাবা চশমা খুলে চোখের কোণটা মুছলেন পাঞ্জাবির হাতায়। তারপর একটু কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বললেন, শোন, তুই এখান থেকে রওনা হবার পরের দিনই আমরা বিমলের স্ত্রীর লেখা পোস্টকার্ড পাই। আমার চিঠির উত্তরে উনি জানিয়েছেন, দেড় মাস আগে বিমল আমাদের ছেড়ে চলে গেছে।

—

আষাঢ় ১৪০৩

আমাদের ভুবন স্যার

রণেন বসু

রাতের খাওয়া-দাওয়া বেশ কিছুক্ষণ আগে সারা হলেও যে যার বার্থে যাওয়ার আগ্রহ কারোরই প্রায় নেই। সবাই ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে জটলা করছে। মাস্টারমশাইরাও নিজেদের মধ্যে গল্পগুজব করছেন। পুরো বগিটাই আজ আমাদের দখলে। দার্জিলিং মেল বেশ কিছুক্ষণ হল বর্ধমান ছেড়ে বোলপুরের দিকে ছুটে চলেছে। বাইরের অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। মাঝে মাঝে স্টেশন বা রেল ক্রসিং-এর গুমটি ঘরের আলোর নিশানাগুলো ছিটকে পিছন দিকে ছুটে যেতে থাকে।

স্যার, একটা গল্প বলুন না। এখুনই শুতে যেতে ইচ্ছে করছে না। ক্লাস টেনের ফার্স্ট বয় জয় হঠাৎই অনুরোধ করে বসে। অনুরোধ করার কারণও আছে। গল্প-বলিয়ে হিসেবে স্কুলে আমার সুনাম এবং দুর্নাম দুই আছে।

মুহূর্তের মধ্যে একটা সাড়া পড়ে যায়। অন্য ছেলেরাও ধুয়ো তোলে, হ্যাঁ স্যার, বলুন না একটা গল্প। অতটা অনুরোধ-উপরোধ করার অবশ্য প্রয়োজন ছিল না, কারণ একটি বিশেষ ঘটনার কথা বলার জন্য তখন আমার প্রাণটা আইঢাই করছিল, গল্পের জন্যে যেন আমি মুখিয়ে ছিলাম। তাই বেশ গুছিয়ে আরম্ভ করি, হ্যাঁ, গল্প একটা তোমাদের বলব বটে, তবে সেটা নিছক গল্প নয়, বাস্তব ঘটনা যা আমি নিজে প্রত্যক্ষ করেছি।

ততক্ষণে আশপাশের কিউবিকল থেকে মাস্টারমশাইরাও চলে এসেছেন। এসেছে আরো ছাত্র। অবস্থা দেখে নিজের আসন ছেড়ে আমি গিয়ে বসি জানালার ধারে একটা সিঙ্গল বার্থে, যাতে বগির এমাথা থেকে ওমাথা পর্যন্ত সবাই আমার গল্প শুনতে পায়। তারপর শুরু করি—

সে প্রায় তিরিশ বছর আগেকার ঘটনা। আমি তখন তোমাদের মতো ছাত্র ছিলাম। সেবার আমাদের স্কুল থেকেও এইরকম শিক্ষামূলক ভ্রমণে দার্জিলিং নিয়ে যাওয়া হবে। মাস্টারমশাইরা সঙ্গে যাবেন। ভূগোলের মাস্টারমশাই ভুবন স্যারেরও আমাদের সঙ্গে যাওয়ার কথা ছিল।

আমরা সবাই শিয়ালদহ স্টেশনে উপস্থিত হয়েছি। তখন অবশ্য এ-গাড়িটার নাম দার্জিলিং মেল ছিল না, ছিল নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেস। আর এখনকার মতো সোজাসুজি শিলিগুড়িতে যেত না, কারণ মাঝে গঙ্গার ওপরে ফারাক্কা ব্যারেজ তখনও হয়নি। তবে কাজ শুরু হয়ে গেছে। প্রথমে ফারাক্কা পর্যন্ত ট্রেনে গিয়ে স্টিমারে গঙ্গা পার হয়ে ওপারে একটা গাড়িতে চেপে যেতে হত।

যা হোক, কথা ছিল ভুবন স্যার তাঁর চেতলার বাড়ি থেকে সরাসরি স্টেশনে এসে আমাদের সঙ্গে মিলিত হবেন।

তখন ট্রেন ছাড়ত দুপুরে। ট্রেন ছাড়া পর্যন্ত অধীর আগ্রহে ওনার জন্যে অপেক্ষা করা সত্ত্বেও উনি আর এলেন না। শেষ পর্যন্ত তাঁকে ছেড়েই আমাদের যাত্রা শুরু হল। গাড়ি তো আর আমাদের জন্য অপেক্ষা করবে না। ঠিক সময়মতোই গাড়ি ছেড়ে দিল। স্যারেরা তাঁর কথা কিছুক্ষণ আলোচনা করলেন। একসময় তা চাপা পড়ে গেল। সবাই ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে কেউ গল্পগুজব, কেউ কেউ লুডো বা তাস খেলতে শুরু করে। আমরা ক'জন জানালার ধারে বসে দেখতে দেখতে চলেছি। আমার জীবনে এর আগে ট্রেনে চেপে খুব বেশি দূর কোথাও যাওয়া হয়নি তাই ট্রেনজার্নি আমার খুব ভালো লাগছিল।

বর্ধমান পেরোতেই উৎসুক হয়ে উঠি বোলপুর-শান্তিনিকেতন দেখার জন্য। কখন দেখব কবিগুরুর শান্তিনিকেতন! কিন্তু বর্ধমান থেকে বোলপুর তো কম দূর নয়! গাড়ি চলছে তো চলছেই!

আমাদের সব প্রতীক্ষার অবসান করে বোলপুরে গাড়ি এসে দাঁড়াল কিন্তু ততক্ষণে প্রায় সবাই গাড়ির দুলুনিতে দুপুরের ভাতঘুমে তলিয়ে গেছে।

ট্রেন দাঁড়াতেই আমি প্ল্যাটফর্মে নেমে গেলাম চারদিকটা দেখব বলে। আর নেমেই অবাক হলাম, ভুবন স্যার প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে মুচকি মুচকি হাসছেন।

স্যার, আপনি এখানে! আর আমরা....

তিনি কথা শেষ করতে দিলেন না। তার আগেই ঠোঁটে আঙুল ঠেকিয়ে বললেন, হঠাৎ একটা জরুরি কাজে গতকাল রাতেই আমাকে এখানে চলে আসতে হল। তাই ঠিক করলাম এখান থেকেই তোমাদের সঙ্গে যোগ দেব।

তাহলে গাড়িতে চলুন স্যার, বলে জানালার দিকে মুখ করে অন্যদের ডাকতে যাব, তিনি ইশারায় আমাকে নিষেধ করলেন। তারপরেই আমার কাঁধে হাত রেখে বলতে শুরু করলেন, স্টেশন থেকে শান্তিনিকেতন দেখা যায় না। আশ্রমটা বেশ ভিতরে, এর পরের স্টেশন প্রান্তিকের কাছাকাছি। রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রথমে শান্তিনিকেতন নামে খুব ছোট্ট একটা আশ্রম স্থাপন করেছিলেন। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ সেই আশ্রমকেই বড় করে শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে তোলেন। পরবর্তীকালে তা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করেন। এখানে তিনি বিশ্বভ্রাতৃত্বের মিলনসেতু গড়তে চেয়েছিলেন। তাছাড়া বিদ্যাদেবীর আর এক নাম তো ভারতী, তাই এর নাম রেখেছিলেন বিশ্বভারতী।

হঠাৎ গাড়ি ছাড়ার বাঁশি বাজতেই আমি তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠে পড়ি। ভাবলাম স্যারও বোধহয় আমার সঙ্গেই গাড়িতে উঠেছেন, কিন্তু পিছন ফিরে দেখলাম স্যার নেই। ট্রেন ততক্ষণে ছেড়ে দিয়েছে। দরজায় মুখ বাড়িয়ে দেখলাম স্টেশনে তিনি নেই। হয়তো অন্য কামরায় উঠেছেন।

অন্যদের ব্যাপারটা বলতেই ভুবন স্যারের আচরণে সবাই অবাক হল। স্যারেরা আমাকে ডেকে সব জানতে চাইলেন। ঠিক হল পরের স্টেশনে নেমে অন্য কামরায় তাঁকে খোঁজা হবে। সেইমতো পরের স্টেশনেই আমরা ক'জন উঁচু ক্লাসের ছেলেরা তাঁকে খুঁজতে নামলাম, কিন্তু তাঁকে আর পাওয়া গেল না।

প্রভাত স্যার তো সোজাসুজি আমাকে মিথ্যেবাদীই বললেন। বললেন, ভুবনবাবুর সঙ্গে নাকি আমার দেখাই হয়নি। ছেলেরাও জানতে চাইল চিৎপুরের কোন দোকানের সুরমা চোখে লাগিয়েছি! একসময় প্রসঙ্গটা চাপা পড়ে গেল। বাইরে অন্ধকার নেমে এসেছে।

আমরা ফারাক্কায় নেমে স্টিমারে উঠেছি। সেই দুপুর থেকে মনটা খারাপ হয়ে আছে। এখন নিজের ওপরেই আর বিশ্বাস রাখতে পারছি না। স্টিমারের দোতলার রেলিঙের ধারে দাঁড়িয়ে আছি, সঙ্গে রবীন নামে আর একজনও ছিল। তন্ময় হয়ে দূরে নির্মাণরত ফারাক্কার আলোর মালা দেখছি। ওখানে যেন গঙ্গার বুকে আলোর বন্যা বইছে।

হঠাৎ কাঁধের ওপর মৃদু স্পর্শে মুখ ফিরিয়ে দেখলাম ভুবন স্যার আমার কাঁধে হাত রেখে মৃদু মৃদু হাসছেন। মনে ক্ষোভ ছিল তাই একটু অনুযোগের সঙ্গে বললাম, স্যার, আপনি হঠাৎ বোলপুর স্টেশনে কোথায় চলে গেলেন? সারা ট্রেনে আপনাকে খুঁজে পেলাম না! স্যারেরা আমাকে মিথ্যেবাদী বললেন!

বলতে দাও, এ একধরনের মজার খেলা। দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে।

স্যার, নীচে চলুন, সবাই আপনাকে খুঁজছে।

অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? দেখবে হঠাৎ কেমন সারপ্রাইজ ভিজিট দেব। তার পরেই তিনি অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলেন, এই যে নদী দেখছ, এটাই হচ্ছে গঙ্গার মূল ধারা। ভূগোল পড়েছ, রাজমহলের কাছে গঙ্গা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে মূল ধারা পদ্মা নামে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে এবং অন্য ধারা প্রধান শাখারূপে ভাগীরথী নামে পশ্চিমবঙ্গের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গঙ্গাসাগরে মিলিত হয়েছে। আমরা কিন্তু ভাগীরথীকেই গঙ্গা বলি, পদ্মাকে নয়। তার কারণও আছে। প্রকৃতপক্ষে ভাগীরথীই গঙ্গার মূল ধারা ছিল আর পদ্মা ছিল প্রধান শাখা। কিন্তু প্রায় চারশত বছর আগে এক ব্যাপক

ভূমিকম্পে তৎকালীন পূর্ববঙ্গ প্রায় তিরিশ ফুট বসে যায়। তাতেই জলের ধর্ম অনুসারে গঙ্গার মূল ধারা পদ্মায় প্রবাহিত হতে শুরু করে। পূর্বের মূলধারা ভাগীরথী ক্রমশই শুকোতে থাকে এবং তাতেই পরবর্তীকালে কলিকাতা মহানগর ও বন্দরের বিপদ ঘনিয়ে আসে। ভারতে তখন ইংরেজ সরকার। তারা মুর্শিদাবাদ জেলার তিলডাঙার কাছে ব্যারেজ তৈরি করে গঙ্গা তথা ভাগীরথীর পূর্বের অবস্থা ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিল কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী বণিক সরকার বিশাল অঙ্কের টাকা খরচের ভয়ে শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে আসে। স্বাধীনতার পরে আমাদের জাতীয় সরকার এই ব্যারেজ তৈরি করতে এগিয়ে এসেছেন। মনে রেখো এটা ব্যারেজ হচ্ছে, ড্যাম নয়। এখানে জল ধরে রাখার ব্যবস্থা হচ্ছে না। এখানে জলের গতিপথ পরিবর্তন করিয়ে ভাগীরথীতে ফেলা হবে। সেই সঙ্গে উত্তরবঙ্গের সঙ্গে রেলপথ ও স্থলপথের সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হবে। তখন আর স্টিমারে....

কোথায়? কোথায় ভুবনবাবু? বলতে বলতে তিন-চারজন স্যারের সঙ্গে অন্যেরাও উপরে উঠে এসেছে। আমাদের কথার মাঝেই রবীন নীচে চলে গিয়ে খবর দিয়েছে।

স্যারদের চিৎকারে ওঁদের দিকে তাকিয়ে আবার মুখ ফিরিয়েই দেখলাম ভুবন স্যার নেই। ভিড়ের মধ্যে তিনি আবার গা ঢাকা দিয়েছেন।

কি হে ছোকরা, কোথায় ভুবনবাবু? স্যারেরা এবার রবীনকে চার্জ করেন।

স্যার, একেই জিগ্যেস করুন। ভুবন স্যার একটু আগে আমাদের সঙ্গে কথা বলছিলেন।

স্যারেরা এমন দৃষ্টিতে প্রথমে রবীন তারপর আমার দিকে তাকালেন যে ভয়ে কুঁকড়ে গেলাম। সেই সঙ্গে ভুবন স্যারের এই ধরনের আচরণে তাঁর ওপরও আমাদের খুব অভিমান হল।

ওপারে খেজুরিয়া ঘাটের ট্রেনে এবং তার আগে স্টিমারে আবার আমরা ভুবনবাবুকে তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখেছিলাম কিন্তু তাঁকে পেলাম না।

পরের দিন সকালে আমরা নিউ জলপাইগুড়ি থেকে টয় ট্রেনে দার্জিলিং যাব। টয় ট্রেনে যে যার জায়গায় বসে আমরা গল্পগুজব করছি। গাড়ি ছাড়তে তখনও বেশ কিছু দেরি আছে। এমন সময় ক্লাস টেনের ফার্স্ট বয় পরেশ হাঁফাতে হাঁফাতে এসে সংবাদ দিল ভুবন স্যারের সঙ্গে তার দেখা হয়েছে।

কোথায়, কোথায় তিনি? কোথায় তাঁকে দেখলে? স্যারেরা একসঙ্গে বলে ওঠেন। পরেশ উত্তর দেয়, বুকস্টলের সামনে দাঁড়িয়ে বই পড়ছেন। শুনেই পরেশকে নিয়ে স্যারেরা ছুটে গেলেন এবং যথারীতি ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেই পরেশকে ধরলেন। পরেশ ছেলেটি অতিশয় শান্ত গোবেচারা, তাই প্রথম চোটে সে বেশ ঘাবড়ে গিয়েছিল। কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে জোর দিয়ে জানায়, স্যারের সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল।

কোথায় দেখা হয়েছিল?

প্রথমে ওভারব্রিজের ওপরে তারপর কথা বলতে বলতে আমরা নীচে নেমে বুকস্টলের সামনে আসি।

কী কী কথা হল, বলো তো।

স্যার ওভারব্রিজের ওপর থেকে নীচের তিন রকম লাইন দেখিয়ে বললেন, পৃথিবীর আর কোনো স্টেশনে এরকম তিন মাপের রেললাইন আর পাবে না। তোমরা যে গাড়িতে এলে, ওকে বলে ব্রডগেজ লাইন। দুই রেললাইনের মাঝের দূরত্ব হচ্ছে এক দশমিক ছয় সাত ছয় মিটার। একে ব্রডগেজ বলে। আর বাঁদিকের ঐ ছোট ছোট গাড়িগুলো দেখছ, ওকে বলে মিটারগেজ লাইন। আসামে ঐ লাইন গেছে। ওর মাপ কত জান? আমি দুম করে বলে দিলাম, মিটারগেজ যখন তখন এক মিটারই হবে। তিনি বললেন, গুড। ঠিকই বলেছ। আর তোমরা যে ট্রেনে যাচ্ছ তা টয় ট্রেন, একে ন্যারো গেজ বলে। এর মাপ হল মাত্র একষট্টি থেকে তেষট্টি সেন্টিমিটার। সবচেয়ে অকেজো লাইন অথচ সবচেয়ে জনপ্রিয়। এই টয় ট্রেন প্রথম চলেছিল ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দের ১১ মার্চ তারিখে শিলিগুড়ি থেকে তিনধরিয়া পর্যন্ত। প্রথম যাত্রার যাত্রী ছিলেন ভাইসরয় লর্ড লিটন, সঙ্গে বাংলার গভর্নর স্যার হ্যাডলি

ইডেন। সেই সঙ্গে ছিলেন এই রেলপথের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম জেনারেল ম্যানেজার ফ্রাঙ্কলেন পেসটেজ। সেদিন সেকি উত্তেজনা! সাহেবরা যেন তাঁদের স্বদেশে চলেছেন। ব্রিটিশ আমলে তৈরি সেই ইঞ্জিন ও সেলুন এখনও চলছে, আমরা তাতে চেপেই যাব। সাহেবদের জন্য ছিল জমকালো সেলুন এভারেস্ট, কাঞ্চনজঙ্ঘা, আর সাধারণ যাত্রীদের জন্য নন্দাদেবী ও ধবলগিরি। এই লাইনেই পৃথিবীর সর্বোচ্চ রেল স্টেশন ঘুম সাত হাজার চারশো সাত ফুট উঁচুতে। সেই স্টেশন দিয়েও আমরা যাব।

পরেশের কথার মাঝেই আমাদের টয় ট্রেন ছেড়ে দিতেই প্রসঙ্গ চাপা পড়ে গেল। সেদিন আর কোনো অঘটন ঘটল না। ছ'-সাত ঘণ্টার মধ্যেই আমরা দার্জিলিং পৌঁছে গেলাম।

পরের দিন ভোরে ঘুম ভাঙতে চোখের সামনে ভেসে ওঠে কাঞ্চনজঙ্ঘা। অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকি। আবার সেই স্নেহস্পর্শে ফিরে দেখি স্যার। মুখে সেই মৃদু মৃদু হাসি। আমি একাই ছিলাম, কিন্তু আমাকে কথা বলতে দিলেন না। বললেন, এখন এই পবিত্র মুহূর্তে অন্য প্রসঙ্গ নয়। পাহাড়িদের উপাস্য দেবতা কাঞ্চনজঙ্ঘাকে শুধু দু'চোখ ভরে দেখ। বলেই তিনি স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। আমিও মন্ত্রমুগ্ধের মতো চেয়ে রইলাম। ভোরের অরুণ-আলোয় গলন্ত সোনালি রঙের চূড়াগুলো ঝলমল করছে। ভূগোল বইয়ের পাতা থেকে চোখের সামনে উঠে এসেছে বিশ্বের তৃতীয় উচ্চতম গিরিশৃঙ্গ! ভাবতেই সারা শরীর জুড়ে এক অদ্ভুত শিহরন খেলে যেতে থাকে।

কাং-চেন-জি-ইয়াঙ্গা, স্যারের গভীর কণ্ঠস্বর আমার কানে আসতেই ওনার দিকে চাইলাম। উনি বললেন, আমরা বাঙালিরা কাং-চেন-জি-ইয়াঙ্গার নামটা সঠিক উচ্চারণ করি না। অথচ এই নামের ভিতরে কত গভীর অর্থ লুকিয়ে আছে। নামের প্রতিটি অংশের নিজস্ব অর্থ আছে। লেপচা ভাষায় 'কাং' শব্দের অর্থ তুষার, 'চেন' হল বিশাল, 'জি' ভাণ্ডার আর 'ইয়াঙ্গা' মানে পাঁচ। অর্থাৎ সম্মিলিত পাঁচটি শৃঙ্গ নিয়ে তুষারমণ্ডিত বিশাল ভাণ্ডার পাহাড়ের মানুষদের, বিশেষ করে লেপচাদের উপাস্য দেবতা। আমাদের প্রিয় কাঞ্চনজঙ্ঘা।

আমি জিগ্যেস করি, স্যার, কাং-চেন-জি-ইয়াঙ্গার চূড়ায় কেউ ওঠেনি?

স্যার বললেন, তোমার এ প্রশ্নের উত্তর এককথায় দেওয়া যাবে না। তবে জেনে রাখো, যদিও এ শৃঙ্গ আর অজেয় নয় তবুও এটাই বিশ্বের একমাত্র শৃঙ্গ যার সর্বোচ্চ শিখরে এখনও মানুষের পদচিহ্ন পড়েনি। একটু থামলেন স্যার, তারপর আবার শুরু করলেন, আগেই বলেছি কাং-চেন-জি-ইয়াঙ্গা লেপচাদের উপাস্য দেবতা। সেই দেবতাকে জয় করতে একদিন হাজির হলেন এক অভিযাত্রী দল। তাঁদের নেতৃত্বে বিখ্যাত পর্বতারোহী চার্লস ইভেন্স। দেবতার পৃষ্ঠে চড়ার আগে তাঁরা অনুমতি চাইলেন সিকিমের তৎকালীন মহারাজার কাছে। মহারাজ অনুমতি দিলেন, তবে শর্তসাপেক্ষে। সেই শর্ত অনুযায়ী দলের দুই সদস্য জো ব্রাউন ও জর্জ ব্র্যান্ড প্রকৃতপক্ষে কাং-চেন-জি-ইয়াঙ্গা শৃঙ্গ জয় করলেও সর্বোচ্চ শেষ বিশ ফুট তাঁরা ওঠেননি। কারণ তাঁরাও চাননি, পাহাড়িদের উপাস্য দেবতা মানুষের পায়ের স্পর্শে অপবিত্র হোক।

তাঁরা বলেছিলেন, সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিনি বলে আমাদের কোনো দুঃখ নেই বরং আনন্দিত ও গর্বিত যে আমরা ধর্মপ্রাণ মানুষের বিশ্বাসের অমর্যাদা করিনি।

আরে তুই এখানে! আর আমরা সবাই তোকে খুঁজছি! চল চল নীচে চল, বলতে বলতে রবীন উঠে আসে। রবীন ভুবন স্যারকে দেখেছে বলে মনে হল না। তার আগেই ভুবন স্যার সরে গেছেন। এবার আর বিস্মিত হলাম না তাঁর আচরণে বরং বেশ মজাই পেলাম। তবে এ প্রসঙ্গ আর কাউকে বলে নিজে বোকা হতে চাইলাম না।

সকালের খাবার খেয়ে সবাই ম্যালে বেড়াতে গেছি। ঘোড়া দেখে অনেকেই উৎসাহভরে ছুটল তাতে চড়তে। বাকিরা ইতস্তত ঘোরাঘুরি করতে লাগল। ক্লাস সেভেনের তন্ময় ছিল আমাদের মধ্যে বয়সে সবচেয়ে ছোট। সে ঘোড়ায় চড়ে ঘুরছে। পাশে পাশে চলেছে সহিস। হঠাৎই কেন যেন ঘোড়াটা ক্ষেপে গিয়ে প্রচণ্ড গতিতে ছুটতে শুরু করে। সহিস তাকে ধরে রাখতে পারল না। ঘোড়ার লাগাম তার হাত থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল। ঘোড়াটা ম্যালের এপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত খাদের কিনারা

ধরে ছুটতে থাকে। তন্ময় প্রাণভয়ে ঘোড়ার গলা জড়িয়ে ধরে আর্তনাদ করে চলেছে। আমরা সবাই অসহায়ের মতো তাকিয়ে আছি কিচ্ছু করার নেই।

হঠাৎ দেখলাম, এবার শুধু আমি নই, সবাই দেখতে পেল, ভুবন স্যার কোথা থেকে ছুটে এসে ঘোড়াটার পাশে পাশে ছুটছেন আর চিৎকার করে তন্ময়কে আশ্বাস দিচ্ছেন, ভয় নেই তন্ময়, কোনো ভয় নেই। ঘোড়াটা যখন সত্যি সত্যিই গভীর খাদের দিকে ঝাঁপ দিতে যাবে, ঠিক সেই মুহূর্তে দেখলাম প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে তিনি হাত বাড়িয়ে একরকম ছোঁ মেরে তন্ময়কে নিজের বুকে টেনে নিলেন। ঘোড়াটা ততক্ষণে গভীর খাদে গড়িয়ে নীচে নেমে গেল।

আমরা ছুটে গিয়ে দেখলাম ভুবন স্যার নেই। তন্ময় ভয়ে জ্ঞান হারিয়ে রাস্তায় শুয়ে আছে। তার কোনোরকম আঘাত লাগেনি।

তারপর যে ক'দিন দার্জিলিং-এ ছিলাম কেউ আর ভুবন স্যারকে দেখেনি। কিন্তু তাঁকে নিয়ে আলোচনা রোজই চলত।

দেখতে দেখতে ফেরার দিন এসে গেল। শিয়ালদহ স্টেশনে দেখলাম হেডস্যার ও আরো কয়েকজন মাস্টারমশাই দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁদের চোখে-মুখে গভীর বেদনার ছাপ। ওঁদের মুখেই শোনা গেল যাবার দিন ভুবন স্যার তাঁর চেতলার বাড়ি থেকে ঠিক সময়েই বেরিয়ে বাসে আসছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বাস উল্টে ঘটনাস্থলেই তিনি প্রাণ হারান।

আজও তাঁর ছাত্রপ্রীতি দেখে শ্রদ্ধায় আমার মাথা নত হয়ে আসে।

অগ্রহায়ণ ১৪০৩

রাজাপুরের দীঘি

কুমার মিত্র

বটুদের গ্রামে বেড়াতে এসে হীরকের যা যা ভালো লাগল তা হল বটুর বুড়ো দাদু, বটুদের বাড়ির আন্তরিক আদর-আপ্যায়ন, আর ওদের বাড়িরই ফাইফরমাশখাটা ছেলে দুলুকে। সবচেয়ে মনে ধরল ওই দুলুকেই। বছর পনেরো বয়স। রোগা-রোগা গড়ন। হাতে-গলায় একরাশ মাদুলি-তাবিজ দেখে বোঝা যায় দুলু আরো যখন ছোটটি ছিল তখন খুব ভুগেছে। যত সব কবরেজ-বদ্যি আশপাশের গাঁ-গেরামে আছে তাদের সবার নাম ওর মুখস্থ। দুলুর শরীরে ফরসা বলতে শুধু ওর দাঁতগুলোই। আঁধারের মধ্যে চেনা মুশকিল—এত কালো! বটুর দাদু ঠাট্টা করে বলেন, 'দুলুটা চেষ্টা করলে ভালো চোর হতে পারত। একেবারে পয়লা নম্বরের।' শুনে ছেলেটা কেবল দাঁত ছড়িয়ে হাসে।

বটুর দাদু যা বলেই ঠাট্টা করুন, সত্যি সত্যি চুরির অভ্যেস ওর নেই। বটুদের বাড়ি কাজে লেগেছে বছর দুই হল। খুবই করিৎকর্মা, এক লহমা বসে থাকে না। হীরকের সঙ্গে ওর খুব জমে গেল। বয়সটাও দুজনের কাছাকাছি, হীরক সামান্য বড় হতে পারে। এখন ও ক্লাস টেনে পড়ছে।

বটুর দাদুর বয়স সেই কবে ষাট পেরিয়ে গেছে। ভুরুতে পর্যন্ত পাক ধরেছে। এইসব পুরোনো আমলের লোকের কাছে সাবেককালের সুখ-দুঃখের গল্প শুনতে বেশ লাগে। উনিও যারা নাতি-নাতনিদের বয়েসি তাদের কাছে অতীত দিনের গপ্পোগাছা করতে খুবই ভালোবাসেন। সন্ধে হলেই সদরঘরে আয়েস করে গল্প জমান। হীরক ইতিমধ্যেই ওঁর কাছ থেকে দামোদরের ইলিশ, দেবীপুরের ডাকাতে কালীবাড়ি আর পদ্মনগরের জমিদারবাড়ির মুখরোচক কাহিনি শুনে ফেলেছে। এসব কাহিনির মধ্যে কতটা রঙ আর কতখানি সত্যি তা বোঝা কঠিন। তবে এটা সত্যি যে শুনতে দারুণ ভালো লেগেছে হীরকের। দাদু গল্পও বলেন চমৎকার। বিশ্বাস করা না-করা ব্যাপারটা হীরকের হাতে। আর সে হচ্ছে একালের পড়াশুনো করা শহুরে ছেলে। দাদুর ফেনিল গল্প বিশ্বাস না করার দিকেই ঝোঁক তার।

দুলু ছেলেটা সাংঘাতিক চালাক। হীরকের মুখ দেখে ওর মনের কথা পরিষ্কার বুঝে ফেলে। আড়ালে একসময় বলে, 'হীরুদা, তোমার এসব বিশ্বাস হচ্ছে না, কেমন? দাদুর কথা সব সত্যি কিন্তু। এই পাড়াগাঁয়ে কত কি যে ঘটে, তুমি শহরের ছেলে কল্পনাও করতে পারবে না। খোকাদাকে শহরের হাওয়া লেগেছে। তোমাদের সঙ্গেই তো পড়ে। খোকাদাও তোমার মতো অনেক কিছু বিশ্বাস করে না।' বটুর ডাকনাম খোকা।

হীরকের অবিশ্বাসী মুখখানার দিকে তাকিয়ে দুলু আবার বলে, 'এসে অব্দি গাঁয়ের কতটুকুই বা তুমি দেখেছ! তুমি কি রাত নিশুতিতে দামোদরের ধারে শ্মশানে গেছ? গিয়েছ সাঁঝবেলায় দেবীপুরের ডাকাতে কালীর মন্দিরে? যেতে পারবে গলাদড়ের মাঠের জোড়া অশ্বত্থতলায়? সাহস আছে মাঝরাতে কেঠো পুলের ধারে হারু বৈরাগীর আস্তানায় যাবার?'

হীরক মজা পাওয়ার ভঙ্গি করে বলে, 'কেন, গেলে কি হবে?'

'কি হবে না তাই বলো!'

'তুই গেছিস?'

'যাইনি মানে? আরে, ওসব জায়গাতেই তো মাছ।'

'তার মানে?'

মানেটা দুলু পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিল। 'শ্মশানটা দামোদরের ধারে, প্রায় আধ মাইল দৈর্ঘ্য জুড়ে। বর্ষার মরশুমে আর কোথাও মাছ না থাক, দামোদরের ওই জায়গাটায় বিস্তর মাছ মিলবে কোনো আশ্চর্য কারণে। ডাকাতে কালীবাড়ির পাশে একটা কুমুদ-শাপলাভরা প্রকাণ্ড পুকুর আছে, তাতে অঢেল মাছ। গলাদড়ের মাঠে ঝিলটাও যেন মাছের আড়ত। এসব জায়গায় এত মাছ কেন তার কারণ নিশ্চয় আছে। ওসব জায়গায় মানুষজন ঘেঁষে না ভয়ে। কেন ঘেঁষে না তারও কারণ আছে বৈকি।'

'কেন ঘেঁষে না, ভয় কিসের?' শুধোয় হীরক।

হীরকের অজ্ঞতায় রহস্যময় ভঙ্গিতে হাসে দুলু, 'গ্রাম হল মানুষের। আর ওসব নদীর ধার, ঝিল-বিল, শ্মশান, কেঠো পুলের পাশটা মানুষের যারা বার তাদের।'

হীরক বুঝতে পারে দুলু 'মানুষের বার' বলতে ভূতপ্রেতের কথা বলতে চাইছে। বুঝেও সে না বোঝার ভান করে বলে, 'চোরেদের বুঝি?'

দুলু আহত গলায় বলে, 'আহা, চোরও তো মানুষ। না, মানুষ নয়; শেয়াল-খটাস, পেঁচা—এমনকি সাপও নয়। তাহলে বাকি থাকছে কি?'

'ভূত নিশ্চয়।'

'ঠিক তাই। ওদেরই। ওদের ভয়েই মানুষ এড়িয়ে চলে ওসব জায়গা।'

'তুই যাস কি করে? ভয় করে না?'

দুলু সগর্বে বলে, 'আমার মন্তর দেওয়া কবচ আছে না? আছে না তাবিজ? আশু ওঝার কবচ, যা-তা জিনিস নয়।'

হীরক মনে মনে বিরক্ত হয়। ঘুরে-ফিরে সেই ভূত। গাঁয়ের ছেলেদের ভূতের বিশ্বাস জন্মগত। বেলগাছে ঠ্যাঙ-ঝোলানো ব্রহ্মদত্যি আর পেত্নির হাত বাড়িয়ে বিশ হাত দূরের লেবুগাছ থেকে লেবু ছেঁড়ার গপ্পো এরা বলবেই। তবে দুলু ছেলেটা যে খুব সাহসী তাতে সন্দেহ নেই। ছেলেটা বনবাদাড় শ্মশান-মশান কিছু মানে না। ছিপ ফেলার নেশা প্রচণ্ড। গহীন জঙ্গল থেকে ঠিক দুপুরেও পিঁপড়ের ডিম জোগাড় করে আনতে বুক কাঁপে না। সন্ধের মুখ পর্যন্ত দামোদরের শ্মশানধারে বসে ট্যাংরা মাছ ধরে। সে মাছ তো হীরকও খেয়েছে। দেখাদেখি হীরকেরও খুব ছিপ ফেলার ইচ্ছে করে। আর ফেলতে হলে ওই ডাকাতে কালীবাড়ির পুকুরে, নয়তো গলাদড়ের মাঠের ঝিলে। কিছু না হোক, গা-ছমছমে পরিবেশটা তো উপভোগ করা যাবে। হ্যাঁ, ওই পরিবেশটুকুই যা মজা! নচেৎ মাছ যা সে ধরতে পারবে সেটা তো সে নিজেও জানে। আর ভূতের কথা যদি বলো—ওসব গাঁজাখুরিতে বিশ্বাস করবার মতো অশিক্ষিত নিশ্চয়ই সে নয়।

এইসব সাত-পাঁচ ভেবে-টেবে সে বলে, 'আমাকে ছিপ ফেলতে নিয়ে যাবি দুলু? আমার মাছ ধরার ভারী ইচ্ছে। তবে ওসব বেলে-পুঁটি-ট্যাংরা নয়। পেল্লায় পেল্লায় রুই-কাতলা হওয়া চাই।'

দুলু অবাক চোখে তাকাল, 'তুমি ছিপ ফেলবে? সত্যি বলছ?'

'কেন নয়? যত মজা একাই লুটবি?'

'খোকাদা জানতে পারলে বকবে। দাদুও রাজি হবে না।'

'আরে বোকা, ওরা জানতে পারবে কেন? শুধু তুই আর আমি—ব্যস, আর কেউ নয়।'

'সে তো হল। তুমি যে আবার রুই-কাতলার বায়না ধরলে! সে তো যেখানে-সেখানে হবে না। তবে সেরকম জায়গা আছে। বেশ দূর, ক্রোশখানেক যেতে হবে। জায়গাটার নাম রাজাপুর। দিনের বেলা হবে না, সবাই জানতে পেরে যাবে। রাতবিরেত ছাড়া উপায় নেই। সাহস আছে?'

হীরক ধমকে ওঠে, 'আমার সাহস নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। তুই নিয়ে যাবি কিনা বল্।'

হীরকের ধমকে কাজ হয়। দুলু বলে, 'ঠিক আছে, তাহলে আজ রাতেই। না, আজ নয়, কাল। ছিপ, মশলা-টশলা জোগাড় করতে হবে তো! তাহলে কথা পাকা হয়ে গেল, কেমন?'

হীরকের শোবার ব্যবস্থা ভিতর বাড়িতে, বটুর সঙ্গে। আর দুলু শোয় সদরঘরে। রাত জাগতে হবে বলে দিনের বেলা কষে ঘুম লাগিয়েছিল হীরক। রাতের খাওয়া-দাওয়া একটু তাড়াতাড়িই চুকে যায় গ্রামাঞ্চলে। বাড়ির আলো যখন নিভে গেল তখন সাড়ে ন'টাও বাজেনি। বটু প্রচণ্ড ঘুমকাতুরে। বিছানায় যাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই বটু আর একতাল কাদার মধ্যে কোনো তফাৎ রইল না। হীরক সহজেই ঘর ছেড়ে বেরোতে পারল। এখন তার মনের অবস্থা কোনো রোমাঞ্চকর অভিযানে বেরোবার মতো।

দুলু সময়মতোই ওর সঙ্গে যোগ দিল। বাড়ি ছেড়ে ওরা যখন বাইরের রাস্তায় পা দিল তখনও দশটা বাজতে মিনিট পনেরোর মতো বাকি। বিকেলের দিকে এক পশলা বৃষ্টি হয়েছিল। হাওয়া বেশ ঠান্ডা। আকাশে ছেঁড়া-ছেঁড়া মেঘ। চাঁদ মাঝে মাঝে উঁকি মেরে মেঘের আড়ালে সরে যাচ্ছে। চাঁদের এই লুকোচুরি খেলার দৌলতে রাস্তায় কখনও ঘুরঘুট্টি আঁধার, কখনও ঝুঁঝকো অন্ধকার। সব মিলিয়ে হীরকের পক্ষে একটা নতুন অভিজ্ঞতা—তার বুক ঢিব ঢিব করছে।

দুলু যাচ্ছে আগে আগে। তার হাতে ছিপ ফেলার সরঞ্জাম আর একটা কালি-পড়া ক্ষুদে হ্যারিকেন। চারপাশের অন্ধকার ঝেঁপে এসে হ্যারিকেনটার গলা টিপে মারতে চাইছে যেন। হীরকের সঙ্গে দু'সেলের টর্চ আছে। কিন্তু বিশেষ দরকার ছাড়া সেটা জ্বালতে মানা করে দিয়েছে দুলু। এরকম ফাঁকা মাঠে টর্চের আলো বহুদূর থেকে চোখে পড়ে কিনা!

মেঠো রাস্তা, বাঁধ, উঁচু সড়ক—এভাবে কত রাস্তা যে হাঁটতে হল তার ঠিকঠিকানা নেই। দুলু কিন্তু সমানে হাঁটছে, ওর ভ্রূক্ষেপই নেই। হীরক অন্তত পাঁচবার শুধিয়েছে, 'আর কদ্দূর রে দুলু?' প্রতিবার একই উত্তর পেয়েছে, 'এই তো, এসে গেলাম বলে।' হীরক শেষদিকে জিগ্যেস করাই ছেড়ে দিল। গাঁয়ের দেড় ক্রোশ বড্ডো বেশি দীর্ঘ, এটুকুই সে বুঝেছে।

'আমরা এসে গেছি হীরুদা', দুলুর ফিসফিসে গলা শুনে চমক ভাঙল হীরকের। প্রথমে কিছুই ঠাহর হল না। অন্ধকারটা ধীরে ধীরে সয়ে আসতে একটা জলাশয়ের চেহারা আবছা ধরা পড়ল হীরকের চোখে। অনেকখানি জুড়ে ফাঁকা জায়গা—দীঘিই বটে। থিকথিকে অন্ধকারের সঙ্গে গাছগাছালির জটলা একাকার হয়ে আশপাশটা এমন হয়ে আছে যে কোনোদিকেই বেশিদূর নজর চলে না। ঝিঁঝিঁদের বিটকেল চেঁচামেচি ছাড়া কোথাও কোনো শব্দ নেই। এই অন্ধকারের মধ্যে কোথায় বসে ছিপ ফেলবে?

দুলু যেন ওর মনের কথা বুঝতে পেরেই বলল, সেই বাতাসের মতো ফিসফিসে গলায়, 'আমরা ঘাটলায় বসে মাছ ধরব। ফাঁকা জল অন্য কোথাও পাওয়া যাবে না। সবই কলমীদামে ভরা, ঘাটলার কাছটায় যা একটু ফাঁকা। ঘাটলাতে বসেই মাঝে মাঝে ছিপ ফেলে কিনা রাজাবাবু।'

'রাজাবাবু আবার কে?'

'যার দীঘি। রাজাবাবুরা মস্ত জমিদার ছিল কিনা। লোকে বলত রাজাবাবু। সেই থেকেই গাঁয়ের নাম রাজাপুর। ওই যে ডানদিকে গাছপালার মাথা ছাড়িয়ে মস্ত একটা কোঠাবাড়ি দেখা যাচ্ছে—ওটাই রাজাবাড়ি। ভালো করে নজর করে দেখো। চোখে পড়তে পারে।'

মরা ফ্যাকাশে জ্যোৎস্নায় একটা বাড়ির চুড়ো নজরে পড়ল বটে হীরকের। ওটাই তাহলে রাজবাড়ি—মানে জমিদারবাড়ি! কিন্তু এত বড়ো মহলে আলো-টালো জ্বলছে না কেন? মানুষের সাড়াশব্দই বা নেই কেন? সে কথাই শুধোতে দুলু জড়ানো গলায় কি যে বলল ভালো করে বুঝতে পারল না হীরক। 'ওসব কথা এখন থাক'—এইরকমই কিছু একটা বলল যেন। থাক তো থাক।

রাতঘাঁটা দুলুর চোখ কি অন্ধকারের মধ্যেও খটাসের মতো জ্বলে? না হলে ছিপ ফেলার সব ব্যবস্থা করছে কি করে? অন্ধকারেই চার ফেলল, বসার জায়গা খুঁজে বের করল। হীরক ভাবছিল ফাৎনা কি করে দেখা যাবে! তারও বন্দোবস্ত হয়ে গেল। বলল, 'হীরুদা, ফাৎনায় জোনাক পোকা লাগিয়ে দিয়েছি। ওরই আলোয় একরকম করে বুঝে নিতে হবে মাছে ঠোকরাচ্ছে কিনা। এই দীঘির মাছ রাক্ষুসে। টোপ গিলেই ছোটে ওরা। মাছ খেলাবার দরকার নেই।

পনেরো পাউন্ডের নাইলন সুতোস্রেফ টেনে তোলা যাবে চার-পাঁচ কেজি পর্যন্ত। আর একটা কথা। একদম চুপচাপ থাকবে। কেলো আর ভুলো টহল দিয়ে বেড়ায় কিনা। কথার আওয়াজ পেলে কাঁক করে ধরবে।'

'কেলো আর ভুলো? কুকুর বুঝি?' হীরক চাপা গলায় জিগ্যেস করল।

'না।'

'তাহলে?'

'তুমি অতশত বকো না তো হীরুদা। জায়গা খারাপ।'

বকুনি খেয়ে মনটা একটু খারাপ হয়ে গেল হীরকের। তারপর বুঝল দুলু ঠিকই বলেছে। হাজার হোক তারা তো সাধু সংকল্প নিয়ে আসেনি, চোর বলে কথা। এসব সেকেলে রাজা-জমিদাররা লোক ভালো নয়। জমিদারি এখন হয়তো নেই, কিন্তু মেজাজটা যাবে কোথা? ধরা পড়লে কি শাস্তি দেবে ভাবলেও হাত-পা ঠান্ডা হয়ে আসে। যাই হোক, দুশ্চিন্তা তাড়িয়ে ছিপ ফেলায় মন দিল সে। দুলু মিথ্যে বলেনি। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার মতো আনাড়ির হাতেও গুটি তিন মাছ ধরা পড়ল। অবশ্য ছোটখাট চেহারার। দেড়-দু'কেজি করে হবে। অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার, দুলুর মতো অমন পাকা মেছুড়েও চুপচাপ বসে আছে। তার ফাৎনা নট নড়ন-চড়ন।

মাছের নেশা বড্ড নেশা। হীরক এতেই মশগুল হয়ে গিয়েছিল সেই নেশায় যে ছিপ ছাড়া আর কোনোদিকেই তার মনোযোগ ছিল না। এমন কি দুলুর কথা পর্যন্ত মনে ছিল না তার। হঠাৎ একটা মাছ ডাঙায় তুলে বঁড়শি থেকে ছাড়াতে গিয়ে ছিপটাকে মাটিতে রাখতে হল। তারপর অবাক হয়ে দেখল ছিপও নেই, মাছও নেই। মানে দুটোই আছে, তবে অন্যের হাতে। হ্যারিকেনের ধূম্রধূসর আলোয় হীরক হতভম্ব হয়ে দেখল দুজন দশাসই চেহারার লোক সামনে দাঁড়িয়ে, তাদের একজনের হাতে ছিপ, অন্যের হাতে মাছ। হীরক ফ্যালফেলে চোখে ওদের দিকে তাকাতে ওরা কেমন অদ্ভুত মিহি সুরে হেসে উঠল। সুরটা মিহি হলেও ওটা যে অট্টহাসি সেটা বুঝতে খুব একটা বুদ্ধির দরকার হয় না।

লম্বা চেহারা চেহারার লোকটা বুক বাজিয়ে বলে উঠল, 'আমি কেলো।'

মাঝারি আকৃতির চওড়া ছাতির লোকটা বুকে থাপ্পড় কষিয়ে বলল, 'আমি ভুলো।'

তারপর উভয়ে সমস্বরে বলল, 'আমরা দুটি ভাই, শিবের গাজন গাই। আমরা রাজাবাবুর পাইক। রাজাবাবুর যখন—সেপাইও বলতে পার।'

এরপর কেলো বলল, 'অনেকদিন ঘুরে ঘুরে এবার মক্কেলকে আমরা পাকড়েছি। ভুলো, একে নিয়ে কি করা হবে?'

'নিয়ে যাওয়া হবে রাজাবাবুর কাছে। তারপর উনি যা করেন।'

'তাহলে আমি একে নিচ্ছি, তুই মাছগুলো নে।'

বলতে না বলতেই একখানা গা-শিরশির করা ঠান্ডা হাত মুঠো করে ধরল হীরকের ডান হাতটা। হীরকের ব্যায়াম করা শরীরে শক্তির অভাব নেই। আত্মরক্ষার প্রবল তাগিদে একবার ভাবল নিজেকে ছিনিয়ে নিয়ে যেদিকে পারে দৌড় দেয়। পরমুহূর্তে বুঝতে পারল জাঁতাকল ভেঙে ইঁদুরের পক্ষে পালানো অসম্ভব। তার চেয়ে অন্তত এক ফুট বেশি লম্বা যে লোকটা তার হাত ধরে আছে তার থাবাটা সাঁড়াশির মতো কঠিন পেষণে আঁকড়ে আছে তাকে। হঠাৎ দুলুর কথা মনে পড়ে যেতে সে চেঁচিয়ে উঠল, 'দুলু-উ-উ।' আশ্চর্য, একটা ফ্যাঁসফেঁসে আওয়াজ ছাড়া কিছুই বেরুল না গলা থেকে।

এরপর কিভাবে যে ঝোপঝাড়ের ওপর দিয়ে হিঁচড়ে টেনে, ঠিক কোনপথ দিয়ে কোথায় নিয়ে গেল খেয়ালই করতে পারল না হীরক। খেয়াল রাখবে কি, সে কি আর তার মধ্যে আছে? শুধু বেহুঁশ হতেই যা বাকি!

সম্বিৎ ফিরতে দেখল সে দাঁড়িয়ে আছে একটা প্রকাণ্ড ঘরের মধ্যে। রক্তের মতো লাল টকটকে

পালিশ করা মেঝে। ছাদের তলা থেকে কতকগুলো বাহারি কাচের ঝাড় ঝুলছে। অতগুলো ঝাড়বাতি অথচ আলো তেমন জোরালো নয়। গোটা ঘরটার মধ্যে কেমন আলো-আঁধারি। ঘরের একদিকে পুরু কার্পেট পাতা। কার্পেটে মোটা মোটা তাকিয়া। তাকিয়ায় আধ-শোওয়া হয়ে অনেকগুলো পরিচ্ছন্ন পোশাক-পরা লোক চুপচাপ পটে আঁকা ছবির মতো বসে। দু'সারি লোকের মাঝখানে ভারিক্কি চেহারার একজন মাঝবয়সি লোক ময়ূরপঙ্খী হাতলওয়ালা প্রকাণ্ড চেয়ারে বসে। তাঁর ভাবভঙ্গি আর পোশাকের জলুস দেখে বুঝতে বাকি থাকে না যে ইনিই এই নৈশ আসরের মধ্যমণি। খোদ রাজাবাবু। সবারই চোখ হীরকের দিকে।

'কি সংবাদ কালুরাম?' রাজাবাবুর গলা। হীরক একটু অবাক হল। অমন গোলগাল ভারী মানুষটার কণ্ঠস্বর কেমন সুরেলা আর পাতলা। যেন বাতাসের মতো হাল্কা।

কালুরাম অর্থাৎ কেলো ঘাড় ঝুঁকিয়ে সেলাম বাজাল। বলল, 'সংবাদ গুরুতর রাজাবাবু। আপনি বলেন দীঘির মাছ যায় কোথায়? যায় এদেরই খপ্পরে।' হীরকের দিকে একবার চেয়ে নিয়ে বলল, 'আজ একেবারে হাতে-নাতে ধরেছি।'

রাজাবাবু নরুন-চেরা চোখে একবারটি তাকালের হীরকের দিকে, দেখলেন তার আপাদমস্তক। নিজের মনে ঘাড় নেড়ে বললেন, 'হুঁ, এ-অঞ্চলের নয় বলে মনে হচ্ছে। শহর থেকে আসা হয়েছে বুঝি?'

রাজাবাবুর দিকে চেয়ে ঘাড় নাড়ল হীরক। অর্থাৎ তিনি ঠিকই ধরেছেন।

'মাছ চুরি করছিলে কেন?'

হীরক চুপ করে রইল।

'কথা বলছ না যে! একলা ছিলে, না আর কেউ ছিল সঙ্গে?'

হীরক এবারও চুপ।

'ভুলুরাম, ছোকরাটা পাকা বদমাশ। দুটো কোঁৎকা দে তো, ঠিক কথা বের হবে।'

কোঁৎকা শব্দটা কখনও শোনেনি হীরক। কিন্তু ওটা যে প্রহার-জাতীয় কিছু হবে সেটা বুঝতে পেরে সে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'না, না, বলছি। সঙ্গে আর একজন ছিল—দুলু।'

'তা সে ছেলেটা কোথা গেল হে কালুরাম?'

কালুরাম আবার সেলাম ঠুকল, 'গোস্তাকি মাপ করবেন হুজুর। সে ছেলেটা মাছ ধরেনি, শুধু বসেছিল। তাকে আমরা ধরিনি। পালের গোদা এই ছেলেটাই।'

রাজাবাবু বললেন, 'তুমি লেখাপড়া নিশ্চয় জানো, তাই নয় ছোকরা?'

'জানি।' হীরক উত্তর দিল।

'আর এও জানো যে চুরি করা অপরাধ। কেমন কিনা!'

হীরক কথা বলল না।

'রাত দুপুরে পরের পুকুরে মাছ ধরাকে চুরি করাই বলে—ঠিক তো! কি, উত্তর দেবে না? ভুলুরাম, কোঁৎকা লাগা।'

কোঁৎকার ভয়ে হীরক স্বীকার করল, 'চুরিই বলে।'

'চুরি জিনিসটা অসততা। অসাধু মানুষ শাস্তি পায়, কি বলো হে?'

'পায়।'

রাজাবাবু এবার নড়ে-চড়ে বসে উপস্থিত সভাজনদের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর গলায় বললেন, 'তোমরা এতক্ষণ সওয়াল-জবাব শুনলে। চোর তার অপরাধ স্বীকার করেছে। করেছে তো?'

'হ্যাঁ, করেছে, আলবৎ করেছে।' লোকগুলো ঘাড় হেলিয়ে সমস্বরে বলে উঠল। বেশ একটা দরবারি কায়দা সবার আচরণে।

রাজাবাবু বলে চললেন, 'তোমরা আমার দীর্ঘদিনের পার্শ্বচর। নিশ্চয় জানো রাজবাড়ির দীঘির মাছ রাজবাড়ির লোকজন ছাড়া কারো খাবার নিয়ম নেই!'

'না, নেই।' সেই একই রকম ঘাড় হেলানো আর সমস্বরে জবাব।

'অথচ এই পাজি শহুরে ভূতটা সেই নিয়ম ভাঙতে যাচ্ছিল। ওর প্রথম অপরাধ চুরি, দ্বিতীয় অপরাধ নিয়ম ভাঙতে চাওয়া, আর তৃতীয় অপরাধ—সেটা তোমরাই বরং বলো।'

'তৃতীয় অপরাধ, আমাদের রাতের বেলার আমোদ নষ্ট করা। জমজমাট জলসার সুর কেটে গেল, এ কি কম অপরাধ!' এক সুরে বেজে উঠল লোকগুলো।

'তাহলে এই তিন অপরাধের শাস্তি কি সেটাও তোমাদেরই মুখে শুনতে চাই।'

'রাজাবাবুর রাজ্যে একসঙ্গে তিন অপরাধ মানে তো ঠান্ডাঘরের ব্যবস্থা। সেটাই চলে আসছে বরাবর।'

'নিজের কানেই তো শুনলে হে ছোকরা', রাজাবাবু তাকালেন কঠিন চোখে হীরকের দিকে, 'তোমার শাস্তি হচ্ছে ঠান্ডাঘর। হুঁ, হুঁ, বাবা, আমার রাজ্যে অন্যায়ের কোনো ক্ষমা নেই। ঠান্ডাঘর ব্যাপারটা বুঝতে পারছ না বুঝি, তাই মজা লাগছে। একটু পরেই বুঝবে বাছাধন। ওহে, তোমরা একটু বুঝিয়ে দাও।'

পার্শ্বচররা সুর মিলিয়ে বলে উঠল, 'ঠান্ডাঘর হল ঠান্ডা করে দেওয়ার ঘর। ওখানে ঢুকলে চিরকালের জন্যে গা ঠান্ডা হয়ে যায়। আজ পর্যন্ত কত চোরেরই তো ওরকম হয়েছে। তারপর তারা কোনোদিন আর চুরি করার সুযোগ পায়নি, কেউ তাদের খোঁজও পায়নি কোনোদিন।'

রাজাবাবু প্রসন্নমুখে বললেন, 'অতি চমৎকার বিশ্লেষণ। সকলের সমর্থন ছাড়া আমি কোনোদিন কাউকে শাস্তি দিয়েছি কেউ বলতে পারবে না। পাঁচজনের মতামত ছাড়া বিচার চলে কি! জুরি বেঞ্চ তাহলে রয়েছে কি করতে? তাহলে তোমরা একমত যে ঠান্ডাঘর?'

'একেবারে।'

'কালুরাম, ওকে নিয়ে যাও সেখানে।'

কালুরাম রাজাবাবুর আদেশমতো কাজ করার আগেই হঠাৎ একজন বলে উঠল, 'অভয় দিলে একটা কথা বলি কর্তাবাবু।' হীরক দেখল একজন ভদ্র চেহারার প্রবীণ মানুষ জোড়হস্তে রাজাবাবুর দিকে তাকিয়ে।

'অভয় দিলাম, বলো তোমার কি আর্জি?'

'এই চোর বয়সে বালক মাত্র। এর কাঁচা বয়সের কথা ভেবে লঘুদণ্ড দিন। ঠান্ডাঘর পাকা অপরাধীদের জন্যে।'

'হ্যাঁ, তা কথাটা মন্দ বলনি। অপরাধী নাবালকই বটে। তোমার বিচক্ষণতা প্রশংসাযোগ্য। কিন্তু অন্যান্যরা কি বলে সেটাও দেখতে হবে। এই ছেলেটি বাস্তবিকই ভালো, নাকি হঠাৎ একটা মন্দ কাজ করে ফেলেছে সেটা জানতে পারলে বেশ হত। মানুষকে দেখে তার ভেতরের কথা বুঝতে পারে এমন কেউ এখানে আছে কি? ভটচাজ, তুমি তো জ্যোতিষচর্চা করো, একবার বাজিয়ে দেখো দিকি ছোকরাকে।'

রাজাবাবু যাকে ভটচাজ বললেন সে উঠে দাঁড়াল। সিড়িঙ্গে চেহারার একটা লোক, মাঝবয়সি। হীরকের দিকে তীব্র চোখে তাকিয়ে নিজের মনে বিড়বিড় করে কিসব বলতে লাগল সে। ক্ষণে ক্ষণে তার মুখের ভাব বদল হতে লাগল।

কিছু পরে বলল, 'কর্তাবাবু, এ ছোকরা অতিশয় সাংঘাতিক।'

রাজাবাবু নড়েচড়ে বসে বললেন, 'কিরকম?'

'ছোকরা ভূতপ্রেত-দত্যিদানা কিচ্ছু বিশ্বাস করে না। ওর মনের সবটা আমি দেখতে পাচ্ছি। সেখানে ভূত-প্রেতদের প্রতি ঘোরতর ঘৃণা আর তাচ্ছিল্য।'

রাজাবাবুর এতক্ষণকার সৌজন্যপূর্ণ আচরণ মুহূর্তে উপে গেল। দাঁতমুখ খিঁচিয়ে চিৎকার করে উঠলেন, 'কি, এত বড়ো আস্পর্ধা! ভূত-প্রেত বিশ্বাস না করা মানে তো আমাদেরও অবিশ্বাস করা। কালুরাম, ঠান্ডাঘর। জলদি।'

বলতে বলতে হঠাৎ ঘরের মধ্যে যেন একটা ঝড় উঠল, ঝাড়বাতিগুলো নিভে গেল দপদপ করে। অন্ধকারের ভেতর থেকে ভেসে এল হল্লা। সেটা অনেকটা অট্টহাসির মতো। হীরক ভয় পেল, সাংঘাতিক ভয়। তার ব্যায়ামপুষ্ট সতেজ শরীরটা ঘরের দরজা দিয়ে স্প্রিংয়ের মতো লাফিয়ে পড়ল। কালুরামের খপ্পর থেকে বাঁচতে গেলে পালানো ছাড়া পথ নেই। একসময় বাইরের খোলা হাওয়ার ভিজে-ভিজে স্পর্শ থেকে বুঝতে পারল একটা ফাঁকা জায়গার মধ্যে এসে পড়েছে সে। অজ্ঞান হয়ে যাবার আগে অনুভব করল একটা মাংসহীন হাতের আঙুল কঠিন হয়ে বসে যাচ্ছে তার গলায়। তারপর আর কিছু মনে নেই।

বটুর দাদু বললেন, 'একটানা ঘণ্টা সাত ঘুমিয়েছ। শরীরটা এখন বেশ ঝরঝরে লাগছে তো হীরু?'

হীরক লজ্জা পেয়ে বিছানায় উঠে বসল। ঘরের মধ্যে বটুর দাদু, বটু, দুলু ছাড়াও আরো দুজন অচেনা লোক রয়েছেন। পাড়া-প্রতিবেশী হবেন আর কি! সবাই তার দিকে এমনভাবে চেয়ে আছেন যে সে যেন একটা আজব দ্রষ্টব্য।

'দুর্বল-দুর্বল লাগছে? একটু গরম দুধ খাবে? ওরে বটু, একটু দুধ আন।' বটুর দাদু বলে যেতে লাগলেন, 'সেই সকাল আটটায় তোমাকে আনা হয়েছে এখানে। রাজপুরের দীঘির ধারের মাঠে অজ্ঞান অবস্থায় পড়েছিলে। তারপর জ্ঞান যদি বা ফিরেছিল, সঙ্গে সঙ্গে ঘুমে এলিয়ে পড়লে। দুলুটা ভোর রাতে এসে খবর দিতে বটু ওর দলবল নিয়ে ছুটল। বাঁশের পাটায় করে এখানে যখন বয়ে আনল, বেলা আটটা-টাটটা হবে তখন। ব্যাপারটা বলো তো ভাই কি ঘটেছিল!'

বটু দুধ আনলে খেয়ে-টেয়ে শরীরে বল পেল হীরক। কিছু গোপন না করে সব খুলে বলল সে। শুনে কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে দাদু বললেন, 'তুমি খুব জোর বেঁচে গেছ দাদুভাই। নেহাৎ ভাগ্যের জোরে বেঁচে গেছ। তুমি যার খপ্পরে পড়েছিলে সে হল রাজাপুরের শেষ জমিদার কন্দর্প রায়। মস্ত জমিদারি ছিল বলে লোকে ওদের রাজাবাবুই বলত। তা এসব হল পঁয়ত্রিশ-চল্লিশ বছর আগেকার কথা। আমি নিজেই তখন যুবক। কন্দর্প রায় মারা গেলে খুব সমারোহের সঙ্গে দাহ করা হয়েছিল। মণ মণ চন্দনকাঠ পুড়েছিল। রাজাপুর থেকে দামোদরের তীর পর্যন্ত তিন মাইল রাস্তা রুপোর আধুলি ছড়াতে ছড়াতে এসেছিল। এ-অঞ্চলে এসব গল্প হয়ে আছে। তাহলে বুঝে দেখো কাদের হাতে তুমি পড়েছিলে!' একটু থেমে দাদু আবার বলতে লাগলেন, 'আর কেলো-ভুলোর নামও এ-দিগরের কে না জানে? কন্দর্প রায়ের ডান-বাঁ হাত ছিল ওরা। হেন দুষ্কর্ম নেই যা ওরা কন্দর্প রায়ের হুকুমে করত না। আর ওই যে ঠান্ডাঘরের কথা বললে ওটা আসলে ছিল অপরাধীদের খুন করার ঘর। কেলো ওখানে তাদের খুন করত। ঘরের মধ্যে একটা কুয়ো আছে, মেরে তার মধ্যে ফেলে দিত। একবার নাকি কুয়ো থেকে অনেক কঙ্কাল আর খুলি বের করেছিল পুলিশ। এ অবশ্য শোনা কথা, সত্যি-মিথ্যে বলতে পারব না।'

হীরক চুপ করে শুনে যাচ্ছিল। এই দিনের আলোয় একঘর লোকের মধ্যে গতরাতের স্মৃতি কেমন অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছিল তার। বটুর দাদু এক টিপ নস্যি নেবার জন্যে থামলে সে বলল, 'আচ্ছা দাদু, আমাকে কেলো-ভুলো যেখানে নিয়ে গিয়েছিল ওটা কোন ঘর?'

'ওটা হল গিয়ে জলসাঘর। মানে প্রমোদকক্ষ। ইয়ার-বক্সী নিয়ে কন্দর্প রায় ওখানে আমোদ-আহ্লাদ করত। জমিদারমহলের সবচেয়ে সুন্দর ঘর ওটা। সারি সারি ঝাড়বাতি সাজানো—তাই তো? তাহলে সন্দেহ নেই, ওখানেই নিয়ে গিয়েছিল। তা ওই কন্দর্প রায়ের পর থেকে ও বাড়িতে বাস করে না কেউ, পাহারা দেবারও কোনো লোক নেই। তিরিশ বছরেরও ওপর ওটা পোড়ো বাড়ি। তোমার এসব হয়তো বিশ্বাস হতে চাইছে না। পাড়ার দুজন ভদ্রলোক, আমারই বন্ধু এঁরা, উপস্থিত আছেন। এঁদেরই জিগ্যেস করে দেখো না কেন!'

অন্য দাদুরা ঘাড় নেড়ে বটুর দাদুর কথায় সায় দিলেন, 'এক বর্ণও মিথ্যে নয়, সব সত্যি। ও-বাড়িতে বহুকাল কেউ বাস করে না। রায়-গুষ্টিটাও শেষ হয়ে গেছে।'

দাদু আর ওঁর বন্ধুরা বেরিয়ে গেলে বটু মুচকি হেসে বলল, 'কিরে হীরু, কি বুঝলি?' বটুর হাসিতে কেমন একটা গা-জ্বালানো ঠাট্টার ভাব।

হীরক হাসল বটে, তবে তাতে তেমন প্রাণ নেই। মিনমিনে গলায় বলল, 'ওসব ইল্যুশনও হতে পারে।'

বটু চোখ বড়ো বড়ো করে বলল, 'ইল্যুশন মানে তো মায়া। অর্থাৎ এখনো তোর অবিশ্বাস গেল না!'

এ কথার উত্তর না দিয়ে হীরক বলল, 'দুলুটাই তো সর্বনাশের গোড়া। ওর কিছু কেন হল না বল্ তো!'

দুলু বলল, 'বাঃ, আমার কাছে যে আশু ওঝার কবচ ছিল!'

বটু বলল, 'এক কাজ করা যাক হীরু। আজ রাতে বরং কেঠো পুলের ধারে বৈরাগীর আখড়ায় যাওয়া যাক। আমিও থাকব সঙ্গে।'

হীরক হঠাৎ কেমন ব্যস্ত হয়ে উঠল। বলল, 'পড়াশুনোর ভীষণ ক্ষতি হচ্ছে। বাবা-মাও ভাবছে আমার জন্যে। কাল সকালেই চলে যাচ্ছি আমি। আজ আবার রাত জাগা সম্ভব নাকি?'

এই বলে হীরক আড়চোখে দুলু আর বটুর দিকে তাকাল। ওদের মুখে সেই গা-জ্বালানো হাসি। হীরকের ইচ্ছে করছিল দুলুটার গালে সপাটে একটা চড় বসিয়ে দেয়। বটুর কাছে ভূত নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করার সব দরজা ওই ক্ষুদে শয়তানটাই বন্ধ করে দিয়েছে।

জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৮

আমার বন্ধু বিল্ব

প্রলয় সেন

বিল্ব যে একদিন আমারই গল্পের নায়ক হয়ে উঠবে একথা কখনো স্বপ্নেও ভাবিনি। আমার ছেলেবেলার বন্ধুদের মধ্যে মোটামুটি সকলেই জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত। কয়েকজন তো বেশ নামটামও করেছে। কেউ বিলেতফেরত ডাক্তার, কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী অধ্যাপক, কেউ বা আবার নামী ইঞ্জিনিয়ার। ব্যতিক্রম একমাত্র বিল্ব। ছেলেবেলা থেকে ওকে একই রকম দেখছি। যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রয়ে গেছে। কোনো পরিবর্তন হয়নি। না স্বভাবের, না চালচুলোর। মোদ্দা কথা, ওর জীবনে এমন কোনো নাটকীয় উত্থান-পতন ঘটেনি যা নিয়ে একটা জুতসই গল্প বানানো যায়। অথচ, বিধাতাপুরুষের কি নিষ্ঠুর পরিহাস, সেই বিল্বই আজ আমাকে খাতা-কলম নিয়ে বসতে বাধ্য করেছে।

বিল্বর সঙ্গে আমার পরিচয় অনেকদিনের। সেই আটচল্লিশ সাল থেকে। আমি তখন ক্লাস এইটের ছাত্র। সেই সময় বিল্ব ওপার বাংলা থেকে এসে আমাদের ক্লাসে ভর্তি হয়। মাঝারি লম্বা। চেহারার বাঁধুনিটা মজবুত। গায়ের রঙ মিশকালো। মাথার চুল ছোট ছোট করে ছাঁটা। পরনে কলার ছাড়া বুক খোলা ছিটের জামা, দেখতে অনেকটা ফতুয়ার মতো। আর তাপ্পি মারা খাকির হাফপ্যান্ট। খালি পা, গোড়ালি অব্দি শুকনো কাদার প্রলেপ। দেখে মনে হয়, এই বুঝি চাষবাসের কাজ সেরে মাঠ থেকে উঠে এল। সারা মুখে শিউলির ছোপ। গজদন্ত। বোকা বোকা চাউনি। জিভ পুরু বলে কথায় ঈষৎ জড়তা। সেই সঙ্গে আবার পূর্ববঙ্গের টান।

এ হেন গেঁয়ো ভূতকে পেয়ে আমরা তো আহ্লাদে আটখানা। আমাদের উল্লাস দেখে কে! প্রথম দিন থেকেই ক্লাসসুদ্ধু সবাই ওর পেছনে লাগলাম। একটু অন্যমনস্ক হল কি অমনি আমরা ওর খাতা-বই হাতিয়ে নিতাম। পেছনের বেঞ্চে বসে টিপ করে ইটের টুকরো ওর মাথায় ছুঁড়ে মারতাম। জামায় কালি ছিটোতাম। স্কুল ছুটির পর ছলছুতা করে ঝগড়া বাধাতাম। আর সেই সুযোগে চড়চাপড় কষিয়ে কিংবা গাঁট্টা মেরে হাতের সুখ করে নিতাম।

আমাদের দেখাদেখি মাস্টারমশাইরাও প্রথম দিকে বিল্বর প্রতি নির্দয় ছিলেন। পড়াশুনোয় মনোযোগ থাকলেও মগজে তেমন বুদ্ধি ছিল না ওর। তার ওপর আমাদের লাগানি-ভাঙানি। ফলে প্রায় প্রত্যেক পিরিয়ডেই বিল্বকে তুচ্ছ কারণে গুরুদণ্ড ভোগ করতে হত। কখনো জুটত বেত বা ডাস্টারের বাড়ি। কখনো বা নীলডাউন হয়ে থাকত গোটা পিরিয়ড। কখনো আবার দু'কান ধরে ক্লাসরুমের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে হত ওকে।

বাইরে থেকে দেখে হাঁদা গঙ্গারাম বলে মনে হলে কি হবে, বিল্বর ভেতরটা কিন্তু ছিল এক আশ্চর্য ধাতু দিয়ে তৈরি। যে কোনো অত্যাচার আর অবজ্ঞা নীরবে সহ্য করার মতো এক দুর্লভ গুণ ছিল ওর। ফলে যা হয়! প্রতিপক্ষ যদি সব নিপীড়ন হাসিমুখে হজম করে নেয় তাহলে লড়াই বেশিদূর এগোয় না। যে-কারণে মাস দেড়-দুয়ের মধ্যেই আমাদের উৎসাহে ভাটা পড়তে লাগল।

গ্রীষ্মের ছুটির পর গোটা ব্যাপারটাই উল্টোমুখো হয়ে গেল। যেন এক জাদুমন্ত্রবলে বিল্ব আমাদের রাতারাতি জয় করে ফেলল। আসলে ওর স্বভাবে এমন একটা আন্তরিকতার সজল স্পর্শ ছিল যে ওকে উপেক্ষা করে কার সাধ্য! পাত্তা না দিলেও ও আমাদের সঙ্গ ছাড়ত না। বলতে গেলে একরকম

জোর-জবরদস্তি করেই বিল্ব আমাদের ভালোবাসা আদায় করে নিয়েছিল। এর-ওর খাতা কেড়ে নিয়ে রুল টেনে দেওয়া, প্রত্যেকের ক্ষয়ে যাওয়া পেন্সিলের শিস সুন্দর করে কেটে দেওয়া থেকে ছেঁড়া বই কিংবা ফেঁসে যাওয়া ছাতা বাড়িতে নিয়ে গিয়ে চমৎকার করে বাঁধাই-সেলাই করে ফেরত দেওয়া—এমনি টুকিটাকি উপকার করত আমাদের। তাছাড়া কথায় অল্প জড়তা থাকলেও দারুণ সব গল্প জানত বিল্ব। সেগুলো কোনো বইয়ে পড়া মামুলি গল্প নয়, একেবারে টাটকা শাকসব্‌জির মতোই গ্রাম থেকে আমদানি করা। তার কোনটা ভূতের, কোনটা মজার, কোনটা আবার বিচিত্র অভিজ্ঞতার। টিফিনের সময় আমরা হই-হুল্লোড় মুলতুবি রেখে ওর চারপাশে গোল হয়ে বসে সেইসব গল্প গিলতাম গোগ্রাসে। সত্যি বলতে কি, শেষের দিকটায় এমন হয়ে গিয়েছিল যে বিল্ব কোনো কারণে স্কুলে না এলে সারাটা দিন আমাদের কেমন যেন আলুনি আলুনি লাগত।

পীড়নের মতো ভালোবাসা ব্যাপারটাও সম্ভবত ছোঁয়াছে। মাস্টারমশাইরাও ধীরে ধীরে বিল্বকে ভালো চোখে দেখতে শুরু করলেন। সরস্বতী পুজো আসছে। হেড স্যার দরোয়ানের হাতে চিরকুট ধরিয়ে দিয়ে বিল্বকে ডেকে পাঠালেন। পুজোর মূল দায়িত্ব ওকে দেওয়া হল। দক্ষিণ কলকাতা স্কুল লিগের ফুটবল খেলা। গেম টিচার অসুস্থ। কে ছেলেদের নিয়ে খেলতে যাবে লেক মাঠে? তলব করা হল বিল্বকে। দলের দেখাশোনার ভার পড়ল ওর ওপর। স্কুলের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী উৎসব। ভলানটিয়ার ইনচার্জ করা হল বিল্বকে। পড়াশুনোয় তেমন ভালো না হলেও জনপ্রিয়তায় এক সময় ও স্কুলের সকলকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

বিল্বর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতার একটা বড় কারণ, ওরা থাকত আমাদের বাড়ির খুব কাছেই। আমাদের বাড়ির পেছনে চৌধুরীদের বাগান। তারপর মস্ত একটা পুকুর ছাড়ালে রেলগুমটির লাগোয়া এক মাঠকোঠায় থাকত ওরা।

মনে পড়ে, ছুটির দিনে প্রায়ই ঢুঁ মারতাম সেই মাঠকোঠায়। পরপর দু'খানা ঘর। একখানা ঘর ভাড়া নিয়েছিল এক ছুতোর মিস্ত্রি। আরেকটায় থাকত বিল্বরা। সেটাকে ঘর না বলে অন্ধকূপ বলাই ভালো। ছোট একটা ফোকর ছাড়া জানলা-টানলা ছিল না কিছু। দিনের বেলাতেও ভেতরটা তাই কেমন ভূতুড়ে লাগত। তিনটি প্রাণী নিয়ে বিল্বদের সংসার। ওর মা, দাদা আর ও নিজে। বাবা মারা গিয়েছিলেন আগেই। ওর দাদা ছিল আমাদের থেকে বছর দুয়েকের বড়। ওপার থেকে এসে দাদা আর স্কুলে ভর্তি হয়নি। ট্রেনে মশলামুড়ি বিক্রি করত। আর বিল্বর মা, যখনই গেছি, দেখেছি—দরজার সামনে উবু হয়ে বসে হয় কাঁচি দিয়ে কাগজ কাটছেন, নয় তো আবার খুরি নিয়ে বসে ঠোঙা বানাচ্ছেন। ভারী ভালোমানুষ ছিলেন তিনি। যখনই গেছি একগাল হেসে কাজ ছেড়ে উঠে দাঁড়াতেন। ভেতর থেকে একটা ছোট তালপাতার চাটাই নিয়ে এসে পেতে দিতেন সামনের দাওয়ায়। তারপর প্রতিদিনই, একটা চটা-ওঠা কলাইয়ের বাটিতে করে তিলের নাড়ু, ছোলাসেদ্ধ কিংবা চালভাজা—যা হোক একটা কিছু আমার হাতে দিতেন।

তখনো ঢাকুরিয়া পুরোপুরি শহর হয়ে ওঠেনি। বাড়ি-ঘরের মাঝে মাঝে বাঁশঝাড় ফলের বাগান মাঠ পুকুর এসব ছিল বেশ কিছু। বিল্বই আমাকে সাঁতার কাটা শিখিয়েছিল। ভোরবেলা ঘুম থেকে ডেকে তুলে বিল্ব আমাকে নিয়ে যেত সেলিমপুরে। নেতাজি সংঘের মাঠের পেছনের তালবাগানে। থলি বোঝাই করে তাল নিয়ে ফিরে আসতাম আমরা। জামরুল গাছে উঠে লাল পিঁপড়ের বাসা ভেঙে ডিম সংগ্রহ করতাম। তারপর সেই ডিম বঁড়শিতে গেঁথে মাছ ধরতাম পুকুরে। তখন ঢাকুরিয়া আর যাদবপুরের সীমানা বরাবর একটা বড় গড়খাই ছিল। গড়খাইয়ের ওধারে ধানক্ষেত। পুজোর পর হেমন্তের শুরুতে ধান পাকতে শুরু করলে সেই ক্ষেতে উড়ে আসত ঝাঁকে ঝাঁকে বনটিয়া। বিল্ব কঞ্চিতে টোন সুতো দিয়ে এক ধরনের ছোট জাল তৈরি করত। তারপর আমরা দুজন গড়খাই ছাড়িয়ে চলে যেতাম ওধারে। ধানক্ষেতে জাল পেতে চলে আসতাম। বেশ খানিকক্ষণ বাদে ফিরে

গিয়ে দেখতাম—জালে একটা-দুটো, কখনো বা তিনটে পর্যন্ত পাখি ধরা পড়েছে। বিল্ব একটা করে পাখি জাল থেকে বের করত। তারপর সেটাকে আলতো করে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে কিছুক্ষণ আদর করে এক সময় উড়িয়ে দিত শূন্যে। পাখিটা ডানা মেলে কিছুটা আকাশের দিকে উড়ে গিয়ে প্রথমটায় নিজেকে সামলে নিত। তারপর যতক্ষণ না ধানক্ষেতের দিগন্তে হারিয়ে যায় ততক্ষণ বিল্বর সে কী উল্লাস! মুখে একটা অদ্ভুত শব্দ তুলে ক্রমাগত হাততালি দিতে থাকত। এমনি করে পাখিগুলিকে উড়িয়ে দিয়ে ও যে কী আনন্দ পেত জানি না। একবার শীতকালে আমাদের বাড়ির ছাঁচতলায় একটা সুন্দর ছোটখাট ফুলের বাগান তৈরি করে দিয়েছিল বিল্ব। কোত্থেকে জোগাড় করে এনেছিল নানা জাতের মরসুমি ফুলের গাছ, পাতাবাহার, বনঝাউয়ের ডাল আর রঙকচুর চারা। বাগানটা দেখে আমার বাবার মতো রাশভারী মানুষটি পর্যন্ত থ। একবারের কথা খুব মনে পড়ে। তখন আমরা ক্লাস টেনে পড়ি। নষ্টচন্দ্রার রাত। আমরা দুজন পাঁচিল ডিঙিয়ে চৌধুরীদের বাগানে ঢুকেছি। বিল্ব একটা লিচু গাছে উঠে পড়েছে। আমি নীচে দাঁড়িয়ে। ডালপালা ভাঙার শব্দ শুনে এক সময় হঠাৎ বাগানের মালি লাঠি হাতে ছুটে এল। আমি তো সঙ্গে সঙ্গে ভোঁ-দৌড়। বাবা জানতে পারলে আর আস্ত রাখবেন না। বিল্ব সে রাতে ধরা পড়ে বেধড়ক পিটুনি খেয়েছিল। কিন্তু কিছুতেই আমার নাম বলেনি।

ক্লাস এইট থেকে নাইনে সেকেন্ড চান্সে এবং নাইন থেকে থার্ড চান্সে টেনে উঠলেও বিল্ব টেস্ট পরীক্ষায় অ্যালাউ হতে পারেনি। সেই সময় ওরা মাঠকোঠা ছেড়ে রেললাইনের ওধারে বেশ কিছুটা দক্ষিণে এক উদ্বাস্তু কলোনিতে চলে যায়। সামনে ফাইনাল পরীক্ষা। বলতে সেই সময় থেকেই বিল্বর সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। আমি ম্যাট্রিক পরীক্ষায় পাশ করে চলে যাই পাটনায়, মামাবাড়িতে। সেখানে কলেজের পড়া শেষ করে বদলির চাকরি নিয়ে দশ-বারো বছর হিল্লি-দিল্লি ঘুরে যখন বাড়ি ফিরে আসি তখন ঢাকুরিয়া রীতিমতো শহর।

হঠাৎ একদিন রেল স্টেশনের কাছে বিল্বর সঙ্গে দেখা। সাইকেলে চেপে ব্যাঙ্ক-প্লটের দিক থেকে ও আসছিল। পেছনের কেরিয়ারে দুটো টিনের বাক্স দড়ি দিয়ে বাঁধা। চমকে উঠলাম। দেখি, একই রকম রয়ে গেছে বিল্ব। পরনে ফতুয়ার মতো ছিটের জামা, খাকির হাফপ্যান্ট। খালি পা, গোড়ালি অব্দি শুকনো কাদা। শুধু রোদে ঝলসে যাওয়া মুখটাতে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। আর শরীরের তুলনায় পেটটা একটু ফোলা। এইটুকু যা পরিবর্তন।

বিল্ব সাইকেল থেকে নেমে পড়ে ছেলেবেলার মতোই সারা মুখে স্নিগ্ধ হাসির আভা ছড়িয়ে বলল, 'নীলু, তুই! কদ্দিন বাদে দেখা। বল্, কেমন আছিস?'

'ভালোই। এই তো মাসখানেক হল ব্যাঙ্গালোর থেকে ফিরেছি। তা, তুই এখন কী করছিস?'

'কী আর করব। তোদের মতো লেখাপড়া তো আর হল না।'—নির্বিকার গলায় উত্তর করে বিল্ব, 'দোকানে দোকানে টফি আর লজেন্স সাপ্লাই দিই।'

ওর কথা শুনে মুহূর্তের জন্য থতিয়ে গেলাম। তারপর প্রসঙ্গটাকে পাশ কাটাবার জন্য শুধোলাম, 'তোর বাড়ির সবাই ভালো আছে তো?'

'তুই যাদের দেখেছিস তারা কেউ বেঁচে নেই।'—আবার ভাবলেশহীন গলায় উত্তর করল বিল্ব, 'দাদা মারা যায় চুয়ান্ন সালে। চলন্ত ট্রেনের কামরা বদল করতে গিয়ে পা হড়কে নীচে পড়ে যায়। আর মা, গত বছর—'

এরপর আর কী প্রশ্ন করা যায় ভেবে উঠতে পারলাম না। তাই তাড়াতাড়ি হাতঘড়িতে চোখ নামিয়ে শশব্যস্ত হয়ে বললাম, 'এখন চলি রে। অফিসের তাড়া। হাতে সময় নিয়ে ছুটির দিনে একবার বাড়িতে আয়। চুটিয়ে গল্প করা যাবে।'

'উঁহু', মাথা ঝাঁকাল বিল্ব, 'তা হবে না। আগে তোকে আমার বাড়িতে আসতে হবে।'

'ঠিক আছে'—এইটুকু বলে আমি ট্রেন ধরবার জন্য ছুট লাগালাম।

তারপর যা হয়। প্রাইভেট কোম্পানির চাকরি। সকাল থেকে সন্ধ্যা অব্দি অফিসে থাকি। তারপর বাড়ি ফিরে সংসারে হাজারো ঝামেলা। কথা দিয়েও বিল্বর বাড়িতে যেতে পারি না।

শেষে একদিন আবার রাস্তায় বিল্বর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আমি ঝিল রোড ধরে নিউল্যান্ডের দিকে যাচ্ছিলাম এক আত্মীয়র বাড়ি। ছুটির দিন। বিকেল বেলা। বিল্ব ফিরছিল পালের বাজার থেকে। হাতে একটা থলি। এগিয়ে এসে শক্ত মুঠোয় আমার একটা হাত ধরে বলল, 'অ্যাদ্দিনে পাকড়াও করেছি তোকে। চল আমার বাড়িতে—'

আত্মীয়ের বাড়িতে একটা জরুরি খবর দেওয়ার ছিল তবু নীরব হেসে সম্মতি জানালাম। কী আর করি বিল্বকে উপেক্ষা করার সাধ্য নেই আমার।

কাছেই শহীদনগর কলোনি। চার নম্বর ব্লকে বিল্বর বাড়ি। চারপাশের বড় বড় দালানের মাঝখানে ওর বাড়িটা খুবই বেমানান। টালিচাল, দরমার বেড়া, মেটে ভিত। বাড়ি না বলে একটা বড় ঝুপড়ি বলাই ভালো।

ভেতরে ঢুকতে সামনে একটা ছোট ঘর। ছোট ঘর থেকে ভেতরের বড় ঘরে ঢুকতে কপাটবিহীন দরজায় ঝুলছে রোঁয়া ওঠা একখানা বড় চট। আমার সাড়া পেয়ে কোত্থেকে বিল্বর ছেলেমেয়েরা ছুটে এল। ওর পর পর দুই মেয়ে। তারপর এক ছেলে। ছেলের বয়স বছর দশেক হবে। সকলেরই চেহারা রোগা, কাঠি কাঠি।

একটু বাদেই ভেতরের ঘর থেকে হাতল ভাঙা কাপে করে চা আর দু'খানা নোনতা বিস্কুট নিয়ে বিল্বর বউ সামনের ঘরে ঢুকল। চিবুক অব্দি ঘোমটায় ঢাকা। পরনে রঙচটা ময়লা শাড়ি। বেঁটেখাটো, রোগাটে। আমাদের কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়েই চায়ের কাপটা তক্তপোশে রেখে ভেতরের ঘরে ছুট লাগাল।

আমি শুধোলাম, 'তারপর, তোর ব্যবসা কেমন চলছে বিল্ব?'

'মন্দ নয়', বিল্ব হাসল, 'দিনে আট-দশটা টাকা আয় হয়। তাতে সংসার তো মোটামুটি চলে যাচ্ছে। আবার কি—'

আট-দশ টাকায় এত বড় সংসার চালানো! ভাবতে বিষম খেলাম। তারপর চায়ের কাপটা নামিয়ে দু'চারটে হাল্কা কথা বলে উঠে দাঁড়িয়ে প্যান্টের হিপ পকেটে হাত ঢোকালাম। মানিব্যাগ খুলে দুটো দশ টাকার নোট বের করলাম। তারপর যেই টাকা ক'টা ছেলেটার দিকে এগিয়ে দিতে গেছি, অমনি বিল্ব লাফিয়ে পড়ল আমাদের মাঝখানে। বলল, 'কী করছিস নীলু?'

'কী আবার! এই প্রথম তোর ছেলেমেয়েদের দেখছি। তাই মিষ্টি খাবার জন্য—'

'না'—বিল্বর কণ্ঠস্বর ধারালো হয়ে উঠল, 'কাঁচা পয়সা পেলে বাচ্চারা নষ্ট হয়ে যায় একথা তুই জানিস না! তুই আবার যেদিন আসবি, সঙ্গে মিষ্টি নিয়ে আসিস, তাহলেই তো হল।'

সত্যি, কত বছরের পরিচয়! তবু তখনো বিল্বর স্বভাবের. অনেকটাই আমি জানতে পারিনি।

এর ঠিক মাস দুয়েক বাদে বিল্ব একদিন সন্ধ্যার সময় আমাদের বাড়িতে এসে হাজির। দেখে চমকে উঠলাম। শরীরের কী হাল হয়েছে! চেনাই যায় না। উষ্কখুষ্ক চুল। গর্তে ঢুকে যাওয়া দু'চোখ পাকা করমচার মতো লাল। একমুখ কাঁচাপাকা গোঁফদাড়ি। পেট আর পা দুটো শরীরের অন্যান্য অংশের তুলনায় বেশ ফোলা।

ভেতরে ঢুকে কোনো ভণিতা না করে সরাসরি বিল্ব বলল, 'গোটা পঞ্চাশেক টাকা হবে তোর কাছে? মাস দুয়েকের আগে কিন্তু ফেরত দিতে পারব না।'

'নিশ্চয়ই হবে।'—বন্ধুকৃত্য করার এমন সুযোগ কেউ ছাড়ে! ওকে আশ্বস্ত করে বললাম, 'আগে বোস তো। এ কী চেহারা হয়েছে তোর!'

বিল্ব বিশদ জানাল। মাস দেড়েক আগে হঠাৎ ওর পেটে জল জমতে থাকে। তারপর বাড়াবাড়ি হতে হাসপাতালে ভর্তি হয়। সবে বাড়ি ফিরেছে। এদিকে সুযোগ বুঝে দোকানদারেরা বকেয়া পয়সা

দিতে গড়িমসি করছে। তাই মহাজনও নতুন করে মাল দিতে চাইছে না। তাছাড়া কঠিন ব্যাধি। রোদে রাস্তায় ঘোরা একদম বারণ। তাই ও ঠিক করেছে, বাড়ির সামনে রাস্তার ধারের ফাঁকা জায়গাটায় একটা চা-তেলেভাজার দোকান দেবে। কিন্তু মূলধন বলতে হাতে কিছুই নেই।

সব শুনে সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চাশটা টাকা ওকে দিয়ে দিলাম।

ঠিক তার দু'মাস বাদে, আমি তখনো অফিস থেকে ফিরিনি, বিল্ব টাকা ক'টা বাড়িতে এসে বাবার হাতে দিয়ে গিয়েছিল।

আবার বেশ কিছুদিন চুপচাপ। বিল্বর আর কোনো পাত্তা নেই। শেষে গত ডিসেম্বর মাসের শেষের দিকে এক রবিবার সকালে বিল্ব এল। আমি তখন বাইরের ঘরে বসে খবরের কাগজ পড়ছি। ওর চেহারা আরো ভেঙে গেছে। রীতিমতো ধুঁকছিল। আমি হাঁক পেড়ে বাড়ির চাকরকে দু'কাপ কফি করতে বলে শুধোলাম, 'তারপর বল, দোকান কেমন চলছে?'

'কলোনির ভেতর দোকান। বেশিরভাগ ধারের খদ্দের।'—থেমে থেমে অর্ধমনস্কের মতো বলতে লাগল বিল্ব, 'চালিয়ে যাচ্ছি কোনোরকমে—'

ওর কথায় আগেকার স্বাভাবিক জোর ছিল না। ছেলেবেলার বন্ধু। ওর চোখের ভাষাটাও বুঝতে তাই অসুবিধে হল না। প্রশ্ন করলাম, 'কিছু বলবি বিল্ব?'

'না, মানে—'

'বলেই ফ্যাল্ না। আমাকে লজ্জা!'

'মেয়েটা মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে—', আমতা আমতা করে বিল্ব, 'জানুয়ারির ছ'তারিখের মধ্যে ফি জমা দিতে হবে। এদিকে টাকাটা কিছুতেই জোগাড় করে উঠতে পারছি না—'

আমি উত্তরে কিছু না বলে উঠে দাঁড়ালাম। ভেতরের ঘরে ঢুকে স্টিলের আলমারি খুলে একশো টাকার একখানা নোট বের করলাম। তারপর বাইরের ঘরে এসে টাকাটা বিল্বর হাতে গুঁজে দিয়ে জোরের সঙ্গে বললাম, 'তোর মেয়ের পরীক্ষা। আগেই বলে রাখছি, এ টাকা আমি ফেরত নেব না।'

শুনে কয়েক মুহূর্তের জন্য থম্ মেরে গেল বিল্ব। তারপর কাঁপা কাঁপা হাতে টাকাটা নিয়ে মাথা নিচু করে নিস্তেজ গলায় বলল, 'ঠিক আছে।'

'আর একটা কথা।'—আবার বললাম।

'কী?'—মুখ তুলল বিল্ব।

'মেয়ের ফল বেরুলে খবরটা দিস কিন্তু।'

'নিশ্চয়ই।'—বিল্বর ভাঙাচোরা মুখে ম্লান হাসি ছড়িয়ে পড়ল।

তারপর টানা পাঁচ-ছ'মাস বিল্বর দেখা নেই। অবশ্য এর মধ্যে আমিও ব্যস্ত ছিলাম। অফিসের কাজে বার কয়েক কলকাতার বাইরে যেতে হয়েছিল। বহুদিন বাদে, এই তো গত সপ্তাহের গোড়ার দিকে, জুন মাসের পঁচিশ কি ছাব্বিশ তারিখ হবে, রাত করে বাড়ি ফিরতে ভাইপো অন্তু জানাল, কে একজন নাকি সন্ধ্যার পর বার দুই আমার খোঁজে এসেছিল। চেহারার বর্ণনা শুনে মনে হল বিল্ব। নিশ্চয়ই কোনো জরুরি প্রয়োজনে এসেছিল। ভাবলাম, ছুটির দিন সময় করে একবার ঢুঁ মারব ওর বাড়িতে।

কিন্তু তার আর দরকার হল না। জুন শেষ হয়ে জুলাই মাস পড়তে না পড়তে পর পর তিন দিন রাস্তায় দেখা হয়ে গেল বিল্বর সঙ্গে। প্রতিবারই সন্ধ্যার পর। কিন্তু কোনো কথা হয়নি। ব্যাপারটা সত্যি অদ্ভুত। প্রথম দেখা হল সেলিমপুর রোডের মুখে। বিল্ব বাস স্টপের ধারে একটা স্টেশনারি দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে। আমাদের ছেলেবেলায় ওই দিকটায় ছিল তালবাগান। আমি রাস্তার উল্টোদিকে। যোধপুর পার্কের এক চিনে লন্ড্রি থেকে কাপড়ের প্যাকেট নিয়ে ফুটপাতে নামছি। হঠাৎ ওকে রাস্তার ওধারে দেখতে পেয়ে সামনের দিকে পা বাড়ালাম। কিন্তু একটা ডবল-

ডেকার এসে দাঁড়িয়ে পড়ল মাঝখানে। রাস্তা পার হতে আধ মিনিটের মতো সময় লাগল। ওধারে পৌঁছে দেখি বিল্ব নেই। সেলিমপুর রোডের ভেতরে ঢুকলাম। ফের বড় রাস্তায় ফিরে এলাম। তাকালাম এদিক-সেদিক। আশ্চর্য, জলজ্যান্ত মানুষটা তো আর হাওয়ায় মিলিয়ে যেতে পারে না। শেষে খেয়াল হল, বিল্ব হয়তো বাস ধরে যাদবপুরের দিকে কোথাও গেছে। আমাকে দেখতে পায়নি। পেলে নিশ্চয়ই দাঁড়াত।

পরের দিন দেখা আমাদের পুরোনো স্কুলবাড়ির সামনে। অফিসফেরতা আমি ট্রেন থেকে নেমে স্টেশন রোড ধরে বাড়ির দিকে আসছি। বিল্ব স্কুল গেটের ধারে দাঁড়িয়েছিল। আমি দূর থেকে হাত নেড়ে ওকে ইশারায় ডাকলাম। তারপর পাশের দোকান থেকে পাঁউরুটি কিনে ঘুরে দাঁড়াতে দেখি বিল্ব নেই। ভাবলাম, কোনো কারণে হয়তো ভেতরে ঢুকেছে। একটা সিগারেট ধরিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। দেখতে দেখতে মিনিট দশ-বারো কেটে গেল। শেষে এগিয়ে যেতে দেখি, স্কুল গেটে তালা ঝুলছে। ভেতরটা অন্ধকার, কোনো আলো-টালো জ্বলছে না। এবারেও মনে হল, বিল্ব হয়তো আমাকে দেখতে পায়নি।

তৃতীয়বার দেখা আমাদের বাড়ির পেছনের রাস্তায়। এক সময় ওদিকটাতেই ছিল চৌধুরীদের মস্ত ফলের বাগান। এখন ওখানে হাল ফ্যাশানের বাড়ির ভিড়। অফিস থেকে বাড়ি ফিরে তুলসীবাবুর বাড়িতে যাচ্ছি। ভদ্রলোক খুব আড্ডাবাজ। মাঝে-মধ্যে ওর বাড়িতে গিয়ে গল্পগুজব করি। ওদের রাস্তায় ঢুকতে দেখি, একেবারে কোনায় ডাক্তার দত্তর বাড়ির সামনের চাঁপাফুল গাছটার নীচে বিল্ব দাঁড়িয়ে। ডাক্তার দত্তর চেম্বার বাড়িতেই। আবছায়ায় দাঁড়িয়ে থাকলেও বিল্বকে চিনতে ভুল হল না। বুঝলাম, ও ডাক্তার দত্তকে দেখাতে এসেছে। চেঁচিয়ে বললাম, 'এই বিল্ব, দাঁড়া—'। আমার ডাক শুনে বিল্ব নড়েচড়ে উঠল। কাছে যেতে দেখি গাছতলায় ও নেই। ডাক্তার দত্তর চেম্বারে ঢুকলাম। সেখানেও বিল্বকে দেখতে পেলাম না। রাস্তায় নেমে পাশের গলিতে গেলাম। কানাগলি। সুনসান রাস্তা। সেখানেও কাউকে দেখতে পেলাম না। মনটা দমে গেল বিল্বর ব্যবহারে। বারবার আমাকে দেখেও ও কেন যে পালিয়ে যাচ্ছে বুঝতে পারলাম না। তুলসীবাবুর ডেরায় আর যাওয়া হল না। বাড়িতে ফিরে এলাম।

পরের দিন খুব ভোরে বহরমপুর থেকে আমার এক দূরসম্পর্কের কাকা তার ছোট ছেলে আর এক বাক্স মিষ্টি নিয়ে আমাদের বাড়িতে হাজির। ছেলেটি মাধ্যমিকে ভালো ফল করেছে। কাকার ইচ্ছে, ছেলেকে কলকাতার কোনো নামী কলেজে ভর্তি করা। সঙ্গে সঙ্গে আমার বিল্বর কথা মনে পড়ে গেল। মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে জুন মাসের তেইশ তারিখে। বিল্বর মেয়ে মাধ্যমিক দিয়েছিল। তবে কি মেয়েটা ফেল করেছে! তাই বিল্ব লজ্জায় আমাকে এড়িয়ে চলছে। কিন্তু তাই বা কেন হবে? মেয়ের পাশ-ফেলের সঙ্গে আমাকে এড়িয়ে যাবার কী সম্বন্ধ? বিল্ব তো সে ধরনের নয়। তাহলে আর কী হতে পারে? হঠাৎ আমার চিন্তায় ছেদ পড়ল। তবে কি বিল্ব মিথ্যে বলে টাকা ক'টা আমার কাছ থেকে নিয়ে গেছে? সত্যি কি ওর মেয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষা দেয়নি! অসম্ভব নয়। বিল্ব আমার ছেলেবেলার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু হলেও রক্তমাংসের মানুষ তো। অভাবে স্বভাব নষ্ট হয়, এ কথা কে না জানে।

কিন্তু তখনো আমার বিল্বকে জানতে কিছুটা সময় বাকি। কাকা ভেতরের ঘরে যেতে আমি ফের সোফায় গা এলিয়ে খবরের কাগজে চোখ বোলাতে লাগলাম। খানিক বাদে আবার কলিং বেলের আওয়াজ। বিরক্ত হয়ে দরজা খুলতে দেখি, এক মাঝবয়সি ভদ্রলোক। সঙ্গে দশ-এগারো বছরের একটি ছেলে। ছেলেটির গায়ে একটা আনকোরা মার্কিনের কাপড় জড়ানো। খালি পা। হাতে একটা পাকানো কুশের আসন। গলায় ধড়া। তাতে ঝুলছে একটা লোহার চাবি।

ভদ্রলোক বললেন, 'আপনি আমাকে চিনবেন না। শহীদনগর থেকে আসছি। আগামীকাল বিল্ববাবুর কাজ। ওঁর স্ত্রী বারবার করে বলে দিয়েছেন, আপনাকে একবার যেতে হবে।'

'সে কী, বিল্ব মারা গেছে! কবে?'—বলতে গিয়ে আমার গলার স্বর চিরে গেল।

'গতমাসের পঁচিশ তারিখ, সকাল আটটায়। তার আগের দিন মাঝরাত থেকে হঠাৎ রক্তবমি শুরু করলেন। হাসপাতালে নিয়ে যাবার আগেই সব শেষ—'

আমি বজ্রাহতের মতো খানিকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর এক সময় নিজেকে সামলে নিয়ে জিগ্যেস করলাম, 'ওর বড় মেয়ে কি পাশ করেছে?'

'হ্যাঁ, সেকেন্ড ডিভিশনে।'—একটু থেমে মলিন হাসলেন ভদ্রলোক। ফের বললেন, 'বিল্ববাবু মারা যাবার আগে মেয়ের পরীক্ষার ফল জেনে গিয়েছিলেন। এইটুকু যা সান্ত্বনার—'

শুনে আমার মাথার ভেতর বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল। তবে কি বিল্ব নিজের কথা রাখবার জন্য মৃত্যুর পরেও গত ক'দিন মেয়ের পরীক্ষায় পাশের খবরটা জানাবার জন্য রাস্তায় আমাকে দেখা দিতে চেয়েছিল? আর ভাবতে পারছিলাম না আমি। সব কেমন যেন আস্তে আস্তে তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছিল আমার ভেতরে।

—

জ্যৈষ্ঠ ১৩৯১

চচ্চড়ি-ভূত

ভূপতি ভট্টাচার্য

এক হাতে পুঁইশাকের চচ্চড়ি আরেক হাতে পটল-আলুর ডালনা নিয়ে রুমি যাচ্ছিল বিন্নিমাসির বাড়ি। মুনকিদের বাঁশের সাঁকোটা পেরিয়ে যেই না বাঁক নিয়েছে অমনি কেউ কোত্থাও নেই, আচমকা নাকীসুরে কে যেন বলে উঠল,—কেঁ রেঁ—সাঁঝের বেঁলায় আঁতাগাঁছের তঁলা দিঁয়ে কেঁ যাঁচ্ছিস? শোঁন্—শোঁন্—ইঁদিকে আঁয়...

চোখ তুলে চাইবার আর ফুরসত হল না রুমির। তার আগেই ডালনার বাটিটা মাটিতে পড়ল ছিট্‌কে। থরথর করে কাঁপতে লাগল রুমি। ছুটে ওখান থেকে পালাবার সাহসটুকুও তখন ওর বুকে নেই।

একটু পরেই আতাগাছের মাথা থেকে সুড়সুড় করে নেমে এল একগাছি কালো সুতো রুমির একেবারে হাতের কাছে।

ওরে বাবা! মন্ত্র পড়ে সুতোয় জড়িয়ে ওপরে তুলবে নাকি? কী জাহাঁবাজ ভূতের পাল্লায়ই না পড়েছে আজকে! ভয়ে ঘেমে চুপসে উঠল রুমি।

ভূতটা আবার বললে আগের মতোই নাকীসুরে,—অ্যাঁই দুঁষ্টু মেঁয়ে, পাঁলাচ্ছিঁস কোঁথা? আঁগে প্রঁণামীঁটা দিঁয়ে যাঁ আঁমার।

প্রণামী! সে আবার কি?

আচমকা রুমির মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল।

হ্যাঁ রেঁ হ্যাঁ—প্রঁণামীঁ। ভূঁত দেঁখলি, ভূঁতের কঁথা শুঁনলি আঁর প্রঁণামীঁটা দিঁবিনেঁ? দেঁ—দেঁ—চটপঁট দিঁয়ে দেঁ দিঁকিনি.....

মহা ফাঁপরে পড়ল রুমি। সঙ্গে তো একটাও পয়সাকড়ি নেই। এখন উপায়? নচ্ছার ভূতটার কাছ থেকে ছাড়া পাবে কি করে আজকে?

ভূতটা ফের তাড়া দিলে,—কিঁরেঁ, এঁখনঁও দিঁলি নেঁ যেঁ বঁড়! খিঁদেয় আঁমার পেঁট চুঁ-চুঁ কঁরছে আঁর তুঁই কিঁনা এঁখনঁওঁ দাঁড়িয়েঁ রঁয়েছিস্? ওঁই সুঁতোটাঁর গোঁড়ায় চঁচ্চড়ির ডাঁটাগুঁলো গেঁথে দেঁ শিঁগ্‌গিরি।

বলেই ফ্যাঁচ্ ফ্যাঁচ করে বারকয়েক হাঁচলে ভূতটা। রুমির সারা গা শিরশির করে কাঁটা দিয়ে উঠল। ভূত বলে ভূত। অন্ধকারেও দেখতে পায় সবকিছু। চচ্চড়ির বাটিটার দিকেও চোখ পড়েছে তাহলে। যাক্‌গে, চচ্চড়ি খাইয়েই যদি পার পাওয়া যায় ওর হাত থেকে মন্দ কি! একটু নিশ্চিন্ত হল রুমি।

কালো সুতোটা হাতে টেনে নিলে। সুতোর গোড়ায় একটা ছুঁচোলো পেরেক বাঁধা। চচ্চড়ির ডাঁটা আর আলু-বেগুনের টুকরোগুলো রুমি এক এক করে গেঁথে দিতে লাগল পেরেকটার মাথায়। ভূতটা আতাগাছের মগডালে বসে সুতোটা টেনে টেনে মুখে পুরতে লাগল সেগুলো।

খেতে খেতে বললে ভূতটা,—বাঁঃ বাঁঃ! খাঁসা রেঁধেঁছে তোঁ! অঁনেকদিঁন এঁমনি রাঁন্না খাঁইনি। আঁর এঁকদিঁন আঁনবি কিঁন্তু—বুঁঝলি?

ভূতটার খাওয়ার রকম-সকম দেখে এবার রুমির ভয় কেটে গেল অনেকটা। শেষ টুকরো-টাকরাগুলো পেরেকের গায়ে গেঁথে দিতে দিতে জিগ্যেস করলে,—আচ্ছা, তুমি কী ভূত গো? মামদো ভূত, না গেছো ভূত, না উড়ুক্কু ভূত?

রুমির কথায় খিল খিল করে হেসে উঠল ভূতটা। হাসতে হাসতে বললে,—নাঁ রেঁ নাঁ, ওঁসব কিঁচ্ছু নাঁ। আঁমি হঁচ্ছি চঁচ্চড়ি-ভূঁত।

বলেই আবার খিক্ খিক্ করে হাসি।

চচ্চড়ি-ভূত!.......রুমির যেন বিশ্বেসই হল না একদম। খানিকক্ষণ **ভেবে** নিয়ে বললে,—যাঃ! তাই কি আবার হয় নাকি? আমার সঙ্গে চালাকি! বলবে না তো বলবে না, বয়েই গেছে আমার!

অভিমানে রুমি মুখ ফিরিয়ে নিলে আতাগাছের দিক থেকে।

হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ.......বিঁশ্বেস হঁচ্ছে নাঁ বুঁঝি?......হাসতে হাসতে বললে ভূতটা,—আঁচ্ছা তোঁর নাঁমটা কিঁ শুঁনি। হেঁজি না পেঁজি? হিঁ-হিঁ-হিঁ-হিঁ-হিঁ.......

আবার সেই বিটকেল হাসি। রুমির রাগ হল বড্ড ভূতটার ওপর! আর কথাটি না বলে এক ছুটে পালাল বাড়িতে।

পরদিন রাত্তিরে লাউ-চিংড়ির ঘণ্ট রাঁধছিলেন মা। রুমি চুপি চুপি এসে একটা বাটি এগিয়ে দিলে।

মা বললেন,—যাঃ পালাঃ! এখন আর চেখে দেখতে হবে না।

না মা, চাখব না। একটা কথা.....আস্তে আস্তে বললে রুমি,—আমি বলছিলুম কি, বুক্কাদের বাড়ি একটু দিয়ে এলে হয় না! সেদিন ওরা বলছিল—

ও—এই কথা! তা বেশ তো। রান্না হয়ে যাক আগে। দিয়ে আসিস্‌গে একবাটি।

খুশিতে দৌড়োল রুমি রান্নাঘর ছেড়ে। চিরুনি নিয়ে চুল আঁচড়াতে বসল তখ্‌খুনি। চুল আঁচড়ে লাল রিবন দিয়ে বিনুনি বাঁধল দুটো। কুঙ্কুমের টিপ পরল একটা কপালের ঠিক মাঝখানে। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মুখটা দেখল আয়নার দিকে চেয়ে। তারপর গোলাপি রঙের তুলতুলে শাড়িটা পরল পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে।

রান্নাঘর থেকে মা ডাকতেই পায়ে পায়ে এগিয়ে এল রুমি। টুক্ করে লাউ-চিংড়ির বাটিটা নিয়ে চলে যাচ্ছিল, হঠাৎ চোখ পড়তেই বলে উঠলেন মা,—এ কী রে? রাত্তিরবেলা এত সাজগোজ করে যাচ্ছিস কোথা?

লজ্জায় কান দুটো রাঙা হয়ে উঠল রুমির। কোনোমতে পালাল বাটিটা হাতে নিয়ে।

পায়ে পায়ে শাড়ি জড়িয়ে যাচ্ছিল। মনে হচ্ছে, এই পড়ল বুঝি হোঁচট খেয়ে। বাঁশের সাঁকো পেরিয়ে এল রুমি। আতাগাছের নীচে এসে দাঁড়াল। অন্ধকারে ছেয়ে গেছে তখন চারদিক। ঝিঁঝি আর জোনাকির দৌরাত্ম্যি বেড়েছে বড্ড। খানিকক্ষণ এদিক-ওদিক উঁকিঝুঁকি দিয়ে ডেকে উঠল রুমি,—চচ্চড়ি-ভূত—ও চচ্চড়ি-ভূত—!

আতাগাছের ডালগুলো দুলে উঠল হঠাৎ। খসখস শব্দে শুকনো পাতা ঝরে পড়ল কয়েকটা। তারপর উত্তর এল নাকীসুরে,—অ্যাঁই—অ্যাঁই—অ্যাঁই—এঁসেছিস তুঁই? আঁমি জাঁনি তুঁই আঁসবি—হিঁ—হিঁ—হিঁ.....তাঁই তোঁ বঁসে আঁছি সেঁই থেঁকে। বঁসে বঁসে কঁখন যেঁ ঘুঁমিয়ে পঁড়েছি......

একটা লম্বা হাই তুললে চচ্চড়ি-ভূত। রুমি বললে, বল তো তোমার জন্যে কি এনেছি আজকে? উঁ-হুঁ, বলব না। নীচে না নামলে দেবই না আমি!

লাউচিংড়ির বাটিটা দু'হাতে চেপে ধরে রইল রুমি।

চচ্চড়ি-ভূত হাসবার চেষ্টা করে বললে,—অ্যাঁ! নীঁচে নাঁমব? তঁবে যেঁ জাঁত যাঁবে আঁমাদের! অ্যাঁ! নাঁ-নাঁ-নাঁ-নাঁ, এঁখান থেঁকেই খাঁব। তুঁই শুঁধু ওঁই সুঁতোটাঁর গোঁড়ায় গেঁথে দেঁ।

ওসব আর হচ্ছে না বাপু আজকে। নীচে নেমে এস শিগ্‌গিরি। নইলে কিচ্ছু মিলবে না। জাত যাবে না ছাই! খালি মিথ্যে কথা তোমার—মিথ্যুক কোথাকার! নেমে এস শিগ্‌গিরি—লাউচিংড়িটা জুড়িয়ে গেল যে—

লাঁউঁচিংড়িঁ!.......পেটুক বটে ভূতটা। লাউচিংড়ির নামে সুড়সুড় করে নেমে এল আতাগাছের মগডাল থেকে একেবারে রুমির পায়ের কাছে।

এবার সত্যি সত্যি ভূত দেখতে পেল রুমি। আঁতকে উঠে পেছিয়ে গেল তিন পা। বুক ঢিপঢিপুনি শুরু হল ওর।

ভূত নয়তো কী? মুখের অর্ধেকটা মাংস নেই, আর যা-ও বা আছে, চিম্‌সে জটলা পাকিয়ে রয়েছে এক এক জায়গায়। ঠোঁটের ওপর শুধু দুটো কালো গর্ত ছাড়া নাকের আর কোনও বালাই নেই! চোখ দুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে এসেছে নিজেদের থাকবার জায়গা থেকে। নীচের গোটা চোয়ালটাই দেখা যাচ্ছে বাইরে থেকে। কোদাল কোদাল দাঁতগুলো উঁচিয়ে রয়েছে ত্রিশূলের মতো। একটা কিম্ভূতকিমাকার চেহারা। একেই বলে ভূত! আতাগাছের ডালে ডালে ঘুরে বেড়ায় আর নাকী-সুরে কথা কয়! অবাক হয়ে ওর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল রুমি।

চচ্চড়ি-ভূত বললে,—হঁল তোঁ ভূঁত দেঁখা। এঁবার আঁমি গাঁছে উঁঠি। কেঁউ দেঁখে ফেঁললে আঁবার গোঁল বাঁধবে।

রুমি বললে—না—না, যেও না এখন। লাউচিংড়ি খাবে না? তোমার জন্যে এনেছি যে।

লাঁউঁচিংড়িঁ!

খুশিতে ওর চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে উঠল। রুমি লাউচিংড়ির বাটিটা এগিয়ে ধরলে। চচ্চড়ি-ভূত গপ্‌গপ্ করে খেয়ে নিলে সবটা। খেতে খেতে বললে,—সুঁন্দর হঁয়েছেঁ। খাঁসা হঁয়েছেঁ! আঁমার মাঁ-ও ঠিঁক এঁমনি রাঁধত......

তোমার মা!

রুমি যেন আকাশ থেকে পড়ল। ভূতের আবার মা-ও আছে নাকি?

হ্যাঁ-রেঁ হ্যাঁ। আঁমার মাঁ। তোঁর যেঁমনি মাঁ আঁছে, ঠিঁক তেঁমনি এঁকটা মাঁ ছিঁল আঁমার। যাঁক্ গেঁ ছাঁই, আঁমি এঁবার যাঁই!

না-না, এখুনি যেও না। আচ্ছা তুমি ভূত হলে কেমন করে?

চচ্চড়ি-ভূতের গায়ের কাছে সরে এসে জিগ্যেস করল রুমি।

সেঁ অঁনেক কঁথা। তুঁই ছোঁট্ট খুঁকি। ওঁসব বুঁঝবিনেঁ—

হ্যাঁ বুঝব—খুব বুঝব। তুমি বল তো!

নাছোড়বান্দা রুমি। চচ্চড়ি-ভূতকে ধরে বসল। খানিক পরে চচ্চড়ি-ভূত বলতে শুরু করল। বলতে বলতে ওর চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল টপটপ করে।

সে অনেকদিন আগেকার কথা। কতদিন আগে ঠিক মনে নেই। পলাশডাঙায় সেনপাড়ার পাশেই ছিল ওদের খড়ের চালা। ওখানেই থাকত একটি পনেরো-ষোল বছর বয়সের ছেলে তার মা আর একটি বোনকে নিয়ে। ছেলেটির নাম মদন। ওর বাবা মারা গিয়েছিল অনেকদিন আগেই। সে কথা ওর মনে পড়ে না একদম। মা আর একটি বোন নিয়ে মদনদের ছোট্ট সংসার বেশ কেটে যাচ্ছিল। কিন্তু ঠাকুরের কোপ পড়ল হঠাৎ।

সে রাতটার কথা বেশ মনে আছে মদনের। ঘুমে অচেতন সবাই। আচমকা একটা চিৎকারে ধড়মড় করে উঠে বসল বিছানায়। উঠেই তার চক্ষুস্থির। আগুন লেগেছে বাড়িতে। বাইরে লোকজন জড় হয়েছে অনেক। কিন্তু কেউই সাহস করে ঘরে ঢুকতে পারছে না। এদিকে আগুনের শিখা লকলক করে এগিয়ে আসছে খড়ের চালা আর দরমার বেড়া ডিঙিয়ে ঘুমন্ত মানুষগুলোর দিকে। মুহূর্তে মন স্থির করে ফেলল মদন। ঘুমন্ত মাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিল। তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই আগুনের ভেতর। কোনোরকমে দেয়াল হাতড়ে হাতড়ে দরজার কপাট খুলে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। মার সংজ্ঞাহীন দেহকে ঘিরে ধরেছে তখন লোকজন।

কিন্তু মদন? ওর যে তখনও আর একটা মস্ত কাজ বাকি! নিশ্বেস ফেলবার সময় নেই তার। তখ্খুনি সে ঢুকে পড়ল সেই আগুনের কুণ্ডলীর ভেতর। আবার কিছুক্ষণ এলোপাথাড়ি খোঁজা। তারপর

একসময় পেয়ে গেল ছোট্ট বোনটিকে। ওকেও ঠিক আগের মতো নিয়ে এল বাইরে। শেষ হল তার কর্তব্য। কিন্তু সে নিজে তখন সম্পূর্ণ কাহিল হয়ে পড়েছে। চেহারাটা তার হয়ে গেছে বীভৎস। কিছুক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল করে এদিক-ওদিক চেয়ে থেকে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। তারপর আর কিচ্ছু মনে নেই তার।

জ্ঞান যখন ফিরল তখন নিশুতি রাত। চারদিক থেকে অবিশ্রান্ত শেয়াল-কুকুরের ডাক ভেসে আসছে। ধীরে ধীরে ওর মনে পড়ল সব কথা। বুঝতে পারল, মৃত মনে করে গ্রামের লোকেরা তাকে ফেলে গেছে শ্মশানে। ভয়ে গা ছমছম করে উঠল তার। এখন যাবে কোথায়? গ্রামে ফিরে যাবার পথ বন্ধ। সবাই জানে সে মৃত। কয়েকদিন খিদের তাড়ায় এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়াল। যারা ওকে দেখতে পেল, ভয়ে পালাল দুদ্দাড় করে। এদিকে খিদের জ্বালায় সে পাগল। শেষকালে একটা উপায় ঠিক করল সে। আগুনে পুড়ে চেহারাটা তো বীভৎস হয়েই ছিল, নাকটা না থাকায় গলার স্বরও পাল্টে গিয়েছিল তার। এবার এক গাছ থেকে আর এক গাছে ঘুরে বেড়াতে লাগল ভূত সেজে। নাকীসুরে কথা আর ওই ভয়ংকর চেহারা! যারাই সামনে পড়ত ভয়ে পালাত তল্পিতল্পা ছেড়ে। কেউ কেউ আবার পুজোও দিতে শুরু করল ওর নামে বেলগাছের তলায়। এমনি ভাবেই কাটতে লাগল তার দিনগুলো।

শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে গেল রুমি। অনেকক্ষণ পর্যন্ত কোনো কথাই বেরুল না ওর মুখ দিয়ে। শুধু বড় বড় দুটো জলের ফোঁটা টলমল করতে লাগল ওর দু'চোখের কোনায়।

চৈত্র ১৩৬৬

আজব দোকান

শৈলেশ ভড়

দোকানের নাম 'কিউরিও শপ্'।

বাইরে থেকে বোঝা যায় না কিছুই, কিন্তু দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলেই চোখ ধাঁধিয়ে যায়। সাদা আর রঙিন আলোর বন্যায় থৈ থৈ করছে সমস্ত ঘরটি।

শো-কেসগুলিতে থরে থরে সাজানো অদ্ভুত সব জিনিস। থালা, বাসন, খেলনা, পুতুল, ফুলদানি, বাতিদান, ঝাড়লণ্ঠন আর জন্তু-জানোয়ারের যেন নিঃশব্দ হট্টগোল।

ঘরের মাথায় রঙিন কাগজের শিকল ঝুলছে এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত অবধি। তার ফাঁকে ফাঁকে রুপোলি জরির ফিতে ঝুলছে লম্বা হয়ে।

সব মিলিয়ে সুন্দর সাজানো দোকান।

দোকানটি মিস্ উইলটনের। বয়স অল্প হলেও বেশ চটপটে। সারাদিন কলেজে পড়াশোনা করেন আর বিকেলে দোকান খুলে বসেন। একাই বিক্রি করে আর দাম নেন।

দোকানের একটু দূরেই গলির মধ্যে পিটার উডের বাড়ি। তিনি আদালতে ওকালতি করেন। কিন্তু এখনো পেশায় ঠিকমতো জমিয়ে বসতে পারেননি। তবে আশা আছে একদিন বড় হবেনই।

সেদিন সন্ধ্যায় তিনি ফিরছিলেন এই দোকানের পাশ দিয়ে। হঠাৎ মনে হল পরশু তাঁর এক বন্ধুর বিয়ে এবং একটা কিছু উপহার দেওয়া দরকার।

কথাটা মনে হতেই দরজা ঠেলে ঢুকে পড়লেন দোকানের মধ্যে।

সত্যি মুগ্ধ হবার মতো। শুধু দোকানের চেহারা নয়, মালিকের চেহারাও।

'আসুন আসুন'—স্বাগত জানালেন উইলটন।

হাসিমুখে কাছে এসে পিটার উড তাঁর আগমনের উদ্দেশ্যটা জানালেন।

উইলটন একটা শো-কেস থেকে একটা ফুলদানি নিয়ে এসে বললেন, 'এটা দিলে কেমন হয়? ভারতবর্ষের জয়পুরের জিনিস। কী সুন্দর সূক্ষ্ম কাজ দেখেছেন?'

হাতে নিয়ে দেখলেন পিটার উড।

'বাঃ, ভারী সুন্দর। এইটাই দিন।'

দোকানে ভিড় ছিল না। তাই আলাপও জমে উঠল। জিনিসটা কাগজে মুড়ে প্যাক করতে করতে উইলটন বললেন, 'আপনি কাছেই থাকেন অথচ একদিনও এখানে পদার্পণ করেননি। জানেন, আমার বাবা এই দোকানটি করেন। প্রথমে তেমন চলত না। তারপর একটা দুষ্প্রাপ্য জিনিস ভারতবর্ষের এক রাজাকে বিক্রি করে প্রচুর লাভ করেন। আর সেই থেকে আমাদের ভাগ্য খুলে যায়। হাজার হাজার বছরের পুরোনো ভাস্কর্য শিল্প বিক্রি করা বাবার এক অদ্ভুত নেশা ছিল।'

'আমার অবশ্য ওসবে কোনো নেশা নেই।' বললেন পিটার উড। 'তবে আলাপ যখন হল তখন মাঝে মাঝে আসব নিশ্চয়ই।'

ফুলদানিটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে এলেন পিটার উড।

প্রায় এক সপ্তাহ পরে একদিন সন্ধ্যায় লন্ডন শহরে হঠাৎ শুরু হল তুষারপাত। আর সেই সঙ্গে প্রচণ্ড ঝোড়ো হাওয়া আর জোলো ঠান্ডা। বাইরে বেরোনো তো দূরের কথা, ঘরের মানুষদের হাড়কাঁপুনি লেগে যাবার জোগাড়।

আদালত থেকে ফেরার পথে ভারী মুশকিলে পড়লেন পিটার উড।

হাওয়ায় এক পা এগোয় কার সাধ্য, আর তুষারের গুঁড়োগুলো কাঁটার মতো বিঁধছে চোখে-মুখে। পরনের প্যান্ট-কোট ভিজে সপসপে হয়ে যাচ্ছে।

এভাবে বাড়ি অবধি পৌঁছনো যাবে না কিছুতেই।

পাশেই সেই কিউরিও শপ। অতএব.....

কিন্তু ঢুকতে গিয়ে থেমে গেলেন পিটার উড।

'দোকান বন্ধ' নোটিশ ঝুলছে দরজার হাতলে। আর হাতল থেকে হাতটা সরিয়ে নেবার আগেই একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটল।

হাতলটা ঘুরছে আস্তে আস্তে। বোধহয় আপনা থেকেই অথবা ভিতর থেকে কেউ ঘোরাচ্ছে।

ক্লিক্? এবার দরজাটা খুলছে। একটু একটু করে সবটা খুলে গেল।

ঘরের মধ্যে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। কাউকে দেখা যাচ্ছে না।

ব্যাপার কী?

না, এই অন্ধকারের মধ্যে তিনি ঢুকবেন না। কিছুতেই ঢুকবেন না। চলে যাবেন। কিন্তু আশ্চর্য, তিনি একটুও নড়তে পারলেন না। তাঁর মনে হল ভিতরের অন্ধকার তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে— এসো, এসো, এসো।

এদিকে বাইরে ঝড়-জলে দাঁড়ানো যাচ্ছে না। অবশেষে পিটার ঢুকে পড়লেন সেই দোকানের কালো জমাট অন্ধকারের মধ্যে। আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে হল, বাইরের অপেক্ষা ঘরের মধ্যে যেন আরো বেশি ঠান্ডা।

তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসবার জন্য ঘাড় ফেরাতেই দেখলেন খোলা দরজাটা ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

ক্লিক্। শব্দ করে দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল।

পিঠের শিরদাঁড়া বেয়ে রক্তের একটা ঠান্ডা স্রোত বয়ে গেল পিটারের। অজানা আতঙ্কে বুকটা একটু থরথরিয়ে উঠল যেন।

তাঁর মনে হল ভেতরে আসা ঠিক হয়নি।

বেশ তো, দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে গেলেই তো হয়। কে আটকে রেখেছে তাঁকে?

ইচ্ছে হচ্ছে খুবই। কিন্তু পারছেন কই? পা দুটো কে যেন মাটির সঙ্গে গেঁথে দিয়েছে।

'মিস্ উইলটন, আপনি কোথায়? আমি পিটার উড।'

এই কি পিটার উডের গলা?

আদালতে সওয়াল করার সময় যে গলায় বাজ ডাকত সে গলায় এখন বিড়াল ডাকছে।

কোনো সাড়া নেই। প্রতিধ্বনি ফিরে এল পিটারের নিজের কাছেই।

আর ঠিক সেই সময় তাঁর কানের পাশে কে যেন বলে উঠল, 'একটু অপেক্ষা করুন আমি এখনি আসছি।'

না, এ কণ্ঠস্বর উইলটনের তো নয়ই, কোনো মানুষেরই নয়। নিশ্চয়ই কোনো অশরীরীর।

পিটার ভেবে পাচ্ছেন না, তিনি কী করবেন। আর করবার কীই বা আছে। কোনো এক প্রচণ্ড শক্তির আকর্ষণে তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

বাদুড়ের মতো কালো কালো কুৎসিত অন্ধকার ঝুলছে ঘরের মধ্যে। দরজার কাচের মধ্যে দিয়ে দেখা যাচ্ছে বাইরেও সেই নীরন্ধ্র অন্ধকার। ঝড়-জলে সমস্ত লন্ডন শহরটাই বোধ হয় নিষ্প্রদীপ হয়ে গেছে।

এবার ক্ষীণ একটা আলোর রেখা দেখা গেল।

বাতি জ্বালিয়ে কে যেন আসছে কাউন্টারের ভিতর থেকে। আর সেই ক্ষীণ আলোয় দোকানটা আরো রহস্যময় হয়ে উঠল।

আলো হাতে লোকটা সামনে এসে দাঁড়াতে রীতিমতো চমকে উঠলেন পিটার।

মুখে স্পষ্ট বলিরেখা। সর্বাঙ্গে লোলচর্ম। বার্ধক্যে কুব্জ তার পিঠ। হাতের প্রদীপের আলোর মতো চোখ দুটি স্তিমিত। মড়ার মতো নিষ্প্রভ। যেমন রুগ্ন তেমনি ক্লান্ত।

'কী নেবেন?' মাকড়সার জালের মতো সূক্ষ্ম কণ্ঠস্বর।

'এসেছি যখন তখন কিছু একটা নিতেই হয়'—কোনোরকমে বলতে পারলেন পিটার, 'দিন যা হয়।'

বাতিটা শো-কেসের ওপর তুলে ধরে লোকটি বললে, 'এইটে নিন।'

'কী ওটা?'

'চুনা পাথরের তৈরি একটা ব্যাঙ।'

'ব্যাঙ?' পিটারের মনে হল তাঁর মুখটাও যেন ঐ ব্যাঙের মতো হয়ে গেল।

'হ্যাঁ, এটা নিয়ে যান।'

'কত দাম?'

'আট পেনি।'

'কি বললেন,' নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলেন না পিটার।

লোকটি এবার হাসল। না, হাসি ঠিক বলা যায় না। ঠোঁটটা ফাঁক করল একটু।

ভয়ে রক্ত জল হয়ে গেল পিটারের। এমন বিশ্রী হাসি তিনি জীবনে কারোর দেখেননি। অন্তত কোনো জীবিত মানুষ এমনভাবে হাসতে পারে বলে মনে হয় না।

'আট পেনি।' লোকটি আরো স্পষ্ট করে বলল।

পকেট থেকে পয়সা বার করে তিনি লোকটির হাতে দিলেন। হাত তো নয় যেন বরফের কাঠি।

জিনিসটা পকেটে নিয়ে পিটার দোকান থেকে বেরিয়ে এলেন।

বাইরে এখনো সমানে ঝড় আর তুষারপাত হচ্ছে। আর তেমনি হাড় কাঁপানো ঠান্ডা। তবু রক্ষে, ঐ ভয়াবহ লোকটার সঙ্গ ত্যাগ করা গেছে।

না, হয়নি।

পিটারের মনে হল লোকটার দৃষ্টি এখনো তাঁকে অনুসরণ করছে। কথাটা মনে হতেই তিনি ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন, দরজার কাচের ওপর দুটো মরা চোখ রেখে লোকটা একদৃষ্টে তাঁর দিকে চেয়ে আছে।

পিটার তড়িঘড়ি গলির ভিতর ঢুকে পড়লেন।

সম্প্রতি পিটারের সময়টা খুব খারাপ যাচ্ছে। টাকা-পয়সার খুবই টানাটানি। কী যে করবেন ভেবে কূল পাচ্ছেন না কিছু।

সেদিন সকালে হঠাৎ ওঁর এক বন্ধু এসে হাজির।

চা খেতে খেতে পিটারের আলমারির মধ্যে ব্যাঙের মূর্তিটা দেখে সে রীতিমতো চমকে উঠল। কি একটা নামী পুরোনো শিল্প সামগ্রীর বেচা-কেনার ব্যবসায়ে সে বেশ ফেঁপে উঠেছে।

মূর্তিটা দেখে বন্ধু বললে, 'আমার যদি ভুল না হয় তাহলে বলতে হবে ওটা বিখ্যাত সিয়া আমলের ভাস্কর্য এবং ওর দাম এখন দু'হাজার পাউন্ড।'

'ফুঃ' তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলেন পিটার। 'আমার কাছে দাম নিয়েছে আট পেনি। তা ভাই, তুমি ওটা নিয়ে গিয়ে আমাকে দু'হাজার পাউন্ড পাঠিয়ে দিও।'

আশ্চর্য। এক সপ্তাহের মধ্যে পিটার তাঁর বন্ধুর কাছ থেকে সত্যিই দু'হাজার পাউন্ডের একটা ড্রাফ্‌ট্ পেলেন। আর পিটারের মনে হল, এই সব টাকা তাঁর একলার নয়। কিছু উইলটনের প্রাপ্য।

মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি দোকানে এসে হাজির।

'আসুন আসুন' উইলটন তাঁকে সাদর আহ্বান জানালেন, 'বলুন আপনার জন্যে আমি কি করতে পারি।'

পিটার সে রাত্রের সমস্ত ঘটনা তাঁর কাছে খুলে বললেন।

অবাক চোখে উইলটন সব শুনলেন। তারপর বললেন, কলেজের ফাইনাল পরীক্ষার জন্য তিনি পনেরো দিন দোকান বন্ধ রেখেছিলেন। তিনি ও জিনিস বিক্রি করতেই পারেন না। পিটার নিশ্চয়ই ভুল করেছেন।

'না আমি ভুল করিনি।' জোর গলায় বললেন পিটার, 'এই দোকান থেকে আমি কিনেছি। যিনি বেচেছেন তাঁকে অস্পষ্ট দেখেছি।'

'ছবি দেখলে চিনতে পারবেন?'

'পারব।'

উইলটন ড্রয়ার থেকে একটি অ্যালবাম বার করে পিটারের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'এর মধ্যে আমাদের আত্মীয়ের ছবি আছে। বার করুন তো, কে আপনাকে দরজা খুলে দিয়ে জিনিস বেচেছে?'

পাতা ওলটাতে ওলটাতে এক সময় থেমে গিয়ে বললেন পিটার, 'এই সেই লোক। আমি জোর দিয়ে বলতে পারি, এই সেই লোক।'

ছবিটার দিকে চেয়ে উইলটনের চোখের পাতা ক্রমশ ভারী হয়ে এল। দু'এক ফোঁটা জলও গড়িয়ে পড়ল গাল বেয়ে।

'কে ইনি?'

'আমার বাবা!' ভেজা গলায় বললেন উইলটন, 'আজ দশ বছর আগে তিনি মারা গেছেন। এই কিউরিও শপ তিনিই প্রতিষ্ঠা করেন।'

ঠিক এমনি সময় বাইরে থেকে একটা ঝোড়ো হাওয়া ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। দরজাটা কখন খুলে গেছে ওঁরা জানতেই পারেননি। এবার দেখা গেল দরজাটা ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ক্লিক!

শ্রাবণ ১৩৮৩

গল্প নয়

অজিত কুমার হাইত

কেউ যখন রুদ্ধশ্বাসে ছোট ছোট শ্রোতাদের কাছে বড় বড় চোখে কাঁপা গলায় নিজের ভূত দেখার গা-ছমছম-করা অভিজ্ঞতার গল্প শোনায়, তখন আমাদের সরকার দাদুর কথাই শুধু আমার মনে পড়ে। দাদামশায়ের আমল থেকে, হাওড়ায় আমার মামার বাড়িতে তিনি সরকারের কাজ করতেন। সেই সূত্রে তিনি ছিলেন বুড়োদের সরকার মশাই, বড়দের সরকার জেঠা আর আমাদের ছোটদের সরকার দাদু।

ভারী সুন্দর করে গল্প বলতে পারতেন তিনি। আর কত গল্পেরই যে পুঁজি ছিল তাঁর, তার লেখা-জোখা নেই। যদিও বিদ্যে তাঁর স্কুলের মাইনর ক্লাসের বেশি আর এগোয়নি, তবুও আজ ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে—আমাদের নিত্যকার নানা বিষয়ের তর্কের ও ঝগড়ার মীমাংসা তিনি কি অদ্ভুত ভাবেই না গল্পের মধ্যে দিয়ে করে দিতেন!

একদিনের কথা এখনও আমার মনে আছে। শ্রাবণ মাসের অঝোর ধারা ঝরছে। আমাদের স্কুলের সেদিন রেনি ডে হয়েছে। মামারা সব মালকোঁচা মেরে হাঁটু পর্যন্ত কাপড় তুলে, তার ওপর রোঁয়া ওঠা বিলিতি মোটা তোয়ালে জড়িয়ে, শুধু পায়ে ছাতা মাথায় পান চিবুতে চিবুতে রওনা হয়েছেন অফিসমুখো। আর আমরা জ্যান্ত-ভূতেরা—মানে আমি, দিদি, কালু মামা, মেন্টি মাসি বাইরের সাজানো বড়দের বৈঠকখানায় বসে প্রচণ্ড তর্ক জুড়েছি—ভূত আছে, না নেই, এই নিয়ে। গলা চড়তে চড়তে ছিঁড়ে যাবার মতন অবস্থা হয়েও যখন তর্কের আর শেষ হচ্ছে না,—সেই সময় আমাদের চিৎকারেই বিরক্ত হয়ে ঘরে ঢুকলেন সরকার দাদু। রণে ক্ষান্তি পড়ল, আমরা শান্ত হলুম।

তিনি বললেন—তোদের সব কথাই কানে গেছে আমার। একটা গল্প বলি চুপ করে বসে মন দিয়ে শোন, আমার নিজের জীবনের গল্প।

তখন আমার বয়স তের কি চোদ্দ বছর হবে। দেশে থাকি মায়ের সঙ্গে। বাবা গঞ্জের বাজারে আমাদের যে দোকান ছিল তাই নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন সব সময়, বাড়ি আসবার সময় পেতেন না মোটেই। ন'মাসে ছ'মাসে আসতেন মাঝে মাঝে। আর ছিল একটা বাগদিদের ছেলে—ফ্যালা। মাঠে গরু নিয়ে যাওয়া, তাদের জাবনা দেওয়া, দোকান-বাজার করা, ফাই-ফরমাস খাটা, এইসব টুকি-টাকি কাজ করে সে সন্ধের আগেই চলে যেত তার নিজের বাড়ি। আমাদের বাড়ির একদম লাগোয়া বাড়িটা ছিল রাঙাদিদিদের। সেখানে থাকতেন শুধু তিনি আর রাঙাদাদু। তাঁদের ছেলেরা বউ নিয়ে শহরে থেকে চাকরি করত, ছুটি-ছাটায় মাঝে মাঝে আসত দেশে। তাই তাঁদের প্রায় সমস্ত রকম ফাই-ফরমাশগুলো করে দিতে হত আমাকে আর ফ্যালাকে।

যেদিনের কথা বলছি, সেদিনও ঠিক এই আজকের মতোই সারাদিন বৃষ্টি পড়ছিল ঝুপ্ ঝুপ্ করে, কামাই নেই একদম। জলের জন্যে সেদিন স্কুলের ছুটি, সারা সকাল-দুপুরটা একলা খুট-খাট করে কোনোরকমে কাটালুম। বিকালে রান্নাঘরে বসে আছি মায়ের কাছে, এমন সময় ভিজতে ভিজতে এলেন রাঙাদিদি। বললেন—খোকা, তোর দাদুর হাঁপানিটা আজ আবার বেড়েছে, একবার কবরেজ মশায়ের বাড়িতে গিয়ে খাবার আর মালিশের ওষুধটা এনে দিবি?

কবরেজ মশায়ের বাড়ি আমাদের বাড়ি থেকে প্রায় মাইল দুয়েক দূরে। মাঝপথে পড়ে একটা সাংঘাতিক ভয়ের জায়গা—ভূতুড়ে ডাঙা। সন্ধের আগেই সে পথে লোক চলাচল কমে যায়, যার যত কাজই থাক সন্ধের পর আর কেউ ওপথ সহজে মাড়াতে চায় না। মা বললেন—যা না খোকা, সন্ধের এখনও ঢের দেরি, এখন গেলে বেলা থাকতে থাকতেই ফিরে আসতে পারবি। নইলে তোর রাঙাদাদু আজ সারারাত হাঁপানিতে কষ্ট পাবে। যা বাবা, লক্ষ্মীটি।

সত্যি কথা বলতে কি আমার যাবার ইচ্ছে ছিল না একটুও। একে এই প্যাচপেচে বর্ষার জল-কাদা তায় আবার একলা। এমন কপাল, ফ্যালাটাও আবার সেদিন সময় বুঝে আসেনি। কাউকেও সঙ্গী পাওয়া তো দূরের কথা, পথে একটা গরু-বাছুরের মুখও দেখতে পাব কিনা সন্দেহ। কিন্তু না বলতেও পারলুম না, রাঙাদিদি আর দাদু আমায় ভালোবাসেন ভীষণ। কলকাতা থেকে ছেলেরা যখনই যা খাবার-দাবার পাঠায় তার সবটাই প্রায় আমার ভাগ্যেই জোটে। কৃতজ্ঞতা বলেও তো একটা জিনিস আছে মানুষের! তাছাড়া মাও বলছেন যেতে, কী আর করি—ভগবানের নাম নিয়ে তো বেরিয়ে পড়লুম দুরু দুরু বুকে।

কবরেজ মশাই যদি বাড়িতে থাকতেন, তাহলে ওষুধ নিয়ে ফিরে আসতে পারতুম সন্ধের আগেই, কিন্তু কপালের গেরো খণ্ডাবে কে? তিনি গেছলেন রোগী দেখতে পাশের গাঁয়ে। যত রোগী যেন আজকের জন্যেই বসে ছিল। ভীষণ রাগ হচ্ছিল সকলের ওপর, ব্যাজার মুখে বসে থেকে থেকে ওষুধ নিয়ে যখন বেরুলুম তখন বেলা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ভয়ে আধমরা হয়ে রাম রাম করতে করতে, যতটা সম্ভব জোরে জোরে পা চালালুম বাড়ির দিকে। বেশি জোরে চলতে পারছি না, কাদায় পা-পিছলে আলুর দম হবার সম্ভাবনা প্রতি মুহূর্তেই।

কোনোদিকে না চেয়ে সোজা চলেছি, হঠাৎ কোথা থেকে একটা দমকা হাওয়া ছুটে এসে ছাতিটাকে দিলে উল্‌টে, সঙ্গে সঙ্গে আমিও পড়ে গেলুম পা পিছলে বাঁধের গা-বেয়ে গড়াতে গড়াতে একদম নীচে। কনুইটা ছড়ে গেল কাঁকুরে মাটিতে, হাঁটুতেও বেশ চোট লাগল পড়ে গিয়ে। প্রথমটায় খানিকটা হকচকিয়ে গেছলুম, পরে আঘাতটা সামলে নিয়ে বাঁধে ফের উঠতে যাব, আবার পড়ে গেলুম কাঁপতে কাঁপতে। এবারে আর পা পিছলে নয়—ভয়ে। যেখানে আছাড় খেয়ে পড়েছি সেটা সেই ভয়ানক ভূতুড়ে ডাঙা, সেপথে সহজে কেউ একলা হাঁটতে চায় না। বুঝতে পারলুম হাওয়ায় নয়, ভূতুড়ে ডাঙার ভূতেই আমাকে ফেলে দিয়েছে ধাক্কা মেরে। বার দুয়েক প্রাণপণে চেষ্টা করলুম আবার ওঠবার, কিন্তু উঠব সে সাধ্যি কি আর আমার আছে! মনে হল শরীরে যেন এক কড়াও বল নেই আমার! সব নিঃশেষ হয়ে গেছে!

হঠাৎ সেই ফাঁকা ডাঙায় কে যেন উঠল শিস দিয়ে। কারা যেন ঝমঝম করে হাততালি দিলে বার কয়েক। আমার গায়ের ওপর যেন কার ঠান্ডা-গরম নিঃশ্বাস পড়ল। তখনও আবছা আবছা আলো আছে—সেই আলোয় দেখতে পেলুম আমার কিছু দূরেই কি যেন একটা কালো ছায়ার মতন, সটান লম্বা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে আকাশে মাথা ঠেকিয়ে। দেখেই আমার হয়ে এসেছে ততক্ষণে, আমাতে আর আমি নেই। চোখ দুটো টপ করে আপনা থেকেই বুজে গেল, ভগবানের নাম-টাম গুলিয়ে গেল মনের মধ্যে। ভিরমি যেতে যেতে শুনতে পেলুম আবার সেই শিস, হাততালির ঝমঝম শব্দ।

সেদিন সেই ভূতুড়ে ডাঙায় মরণ আমার হত নির্ঘাতই, সে সম্বন্ধে কোনো ভুল নেই। তবে ভগবান যাকে বাঁচান তাকে মারবার শক্তি কারও নেই এটাও ঠিক। আর ভগবান কখন যে কার রূপ ধরে মানুষের মনে উদয় হন, সে কথাও কেউ বলতে পারে না।

মরে যেতে যেতে হঠাৎই আমার মনে পড়ে গেল সূর্য মাস্টারমশাইকে। আমি স্কুলে তাঁর কাছে পড়েছিলুম বছর দুয়েক, স্বদেশী করবার জন্যে তারপর তাঁর চাকরি যায়। আমরা ছেলেরা তাঁকে ভালোবাসতুম খুব, তিনিও আমাদের খুব স্নেহ করতেন। ক্লাসে বসে কত যে সুন্দর সুন্দর গল্প বলতেন তার ইয়ত্তা নেই। আমরা পাড়াগাঁর ছেলে, বাপ-পিতামহর কাছ থেকে বংশ-পরম্পরায় ভূতের ভয়টাকেও পেয়ে এসেছি তাঁদের অন্যান্য দোষ-গুণের সঙ্গে। ভূত-প্রেতের ওপর আমাদের সেই অহেতুক ভয় দেখে তিনি প্রায়ই বলতেন—দেখো, তোমাদের ভূতের ভয় কেন তা আমি বুঝতে পারি না। ভূত বলে কোনো জিনিস নেই, ভূতের সৃষ্টি আমাদের মন থেকে, মনের ভয় থেকে। বাঙলায় একটা প্রবাদ আছে সেটা তোমরা জান কিনা জানি না—

"ভূত নেই বনে,
ভূত আছে মনে।"

ভূতের বাস আমাদের এই মনেতে, সে ভূতের নাম হচ্ছে ভয়। আর ঝোপে-ঝাড়ে বনে-বাদাড়ে,

মাঠে-ঘাটে বাড়ির আনাচে-কানাচে যারা থাকে তারা ভূত নয়, তারা সব অদ্ভুত। রাতের অন্ধকারে চাঁদের আলোছায়ায় ঐ সব অদ্ভুতেরা আমাদের চোখের সামনে নানা রূপ নিয়ে দেখা দেয়, আর তখনই আমরা ভয় পাই। ছোটবেলা থেকে শুনে আসা সেই সব নানারকম ভূতের ভয়। কিন্তু তখন যদি তোমরা সাহস না হারাও, তাহলে দেখবে ভূত-টুত পালিয়ে গেছে কোথায়। যাকে দেখে ভয় পেয়েছ—সে হচ্ছে অদ্ভুত। যে সব বিজ্ঞজনেরা ভূত দেখেছেন বলে বড়াই করেন, সত্যিকারের ভূত তাঁরা দেখেননি কেউই—সকলেই দেখেছেন ঐ অদ্ভুতকে। তাঁরা যদি সাহস না হারিয়ে ভূতের মুখোমুখি দাঁড়াতেন, তাহলে নিজেরাই লজ্জা পেতেন ভূতের আসল চেহারা দেখে। তাই তোমাদের বলি—ভূতের ভয় তোমরা কোরো না, কেননা ভূত বলে সত্যিকারের কোনো জিনিস নেই।

কথাগুলো শুনে শুনে আমাদের প্রায় মুখস্থ হয়ে গেছল। মনে পড়তে একটু একটু করে আমি যেন আবার চেতনা ফিরে পেলুম। শুনতে পেলুম কানের কাছে কে যেন ফিস্ ফিস্ করে বলছে—মরতে যদি হয়ই, তবে আর ভয় কিসের। মরবার আগে একবার ভালো করে চোখ মেলে দেখে নে, ভূত কেমন দেখতে। প্রাণে সাহস এনে মন থেকে ভয়ের ভূতটাকে তাড়িয়ে দিয়ে ভালো করে চোখ চাইলুম ভূতুড়ে ডাঙার সেই ভয়ানক জীবটাকে দেখবার জন্যে। কী দেখলুম জানো—

আমাদের সকলের মুখের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে সরকার দাদু নিভে আসা গড়গড়াটার দিকে মন দিলেন। গল্প শুনতে শুনতে তখন আমাদের বড় বড় হয়ে উঠেছে চোখ, দম বন্ধ হয়ে যাবার মতো অবস্থা। উত্তেজনায় সমস্বরে চিৎকার করে উঠলুম—কী দাদু? কী?

দেখলুম—একটা বিরাট তালগাছ, বাজ পড়ে মাথাটা তার পুড়ে গেছে, দু'পাশে ঝুলে আছে দুটো শুকনো পাতা দু'খানা হাতের মতন। দমকা ঝোড়ো হাওয়ায় শুকনো পাতা দুটো নড়ে উঠে ধাক্কা লাগাচ্ছে গাছের সঙ্গে, আর তার থেকেই উঠছে অমন ঝমঝম শব্দ। আর জানিস বোধ হয়—ফাঁকা মাঠের ওপর দিয়ে হাওয়া বয়ে গেলে একরকম শব্দ ওঠে মাঝে মাঝে, মনে হয় ঠিক যেন কেউ শিস দিয়ে সরু গলায় হাসছে?

অনেকক্ষণ ধরে ভালোভাবে লক্ষ করলুম ভূতটাকে, কিংবা অদ্ভুতটাকে যাই বল না কেন। তারপর আস্তে আস্তে বাঁধের ওপর উঠে, ওলটানো ছাতাটাকে কুড়িয়ে নিয়ে কাঁধে ফেলে, বীর বিক্রমে পা চললুম বাড়ির দিকে। সেদিন থেকে ভূতের ভয় দূর হয়ে গেল আমার মন থেকে, ভূতকে আর কোনোদিনই আমি ভয় করিনি। সরকার দাদু দু'হাত জোড় করে কপালে ঠেকালেন। ভগবান কী সূর্য মাস্টারমশাই, কার উদ্দেশ্যে জানি না।

সরকার দাদু আজ আর নেই।

আমরাও বদলেছি। বয়সের ছাপ আজ আমাদের সারা দেহ-মনে। মামারা বুড়ো হয়েছেন, আমরা বড় হয়েছি। আবার একদল ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে এসে দখল করেছে আমাদের স্থান। সময়ের অলঙ্ঘ্য নিয়মে আমরা পরস্পর পরস্পরের শূন্যস্থান পূরণ করে চলেছি। কিন্তু, সরকার দাদুর মতো লোক আজ কোথায়? তাঁদের শূন্যস্থান বুঝি কোনোদিনই পূর্ণ হবার নয়?

তাই কাউকে যখন রুদ্ধশ্বাস ছোট ছোট শ্রোতাদের কাছে, কাঁপা কাঁপা গলায়, বড় বড় চোখে, ভূত দেখার গা-ছমছম-করা অভিজ্ঞতার গল্প বলতে শুনি, তখন আমার শুধু ঘুরে-ফিরে তাঁরই কথা মনে পড়ে। সেদিনের সেই গল্পের মধ্য দিয়ে তিনি আমাদের কয়েকটি কিশোর মন থেকে ভূতের ভয় দূর করে দিয়েছিলেন।

একটু ভুল বললুম—শুধু ভূতেরই নয়, অদ্ভুতেরও।

আশ্বিন ১৩৬৫

জলার ভূত

শৈলেন্দ্রনাথ গুঁই

ষষ্ঠীচরণ ক'দিন দিদির বাড়ি বেড়াতে এসেছিল। বহু আদর-যত্ন করে দিদি তাকে খাইয়েছে। আরো দু'দিন থাকতেও বলল কিন্তু ষষ্ঠীচরণের আর থাকার সময় নেই, কেননা আজ বাদে কাল তাদের গাঁয়ের ছেলেদের সঙ্গে পাশের গাঁয়ের ছেলেদের ফুটবল ম্যাচ। গতবার ষষ্ঠীচরণরা হেরেছিল এবার জিতবে বলে শপথ করে বসে আছে। অতএব দিদির বাড়ি আর থাকা চলে না। আজ এই পাঁচ ক্রোশ পথ হেঁটে বাড়ি ফিরে বিশ্রাম নিয়ে কাল ম্যাচ খেলতে হবে। তাকে নাহলে তাদের টিম দুর্বল হয়ে পড়বে। অগত্যা দিদি ভাইয়ের কোঁচড়ে একরাশ মুড়ি ঢেলে দিলেন আর দিলেন খান চারেক অমৃতি, জিলিপি। দিদির গাঁয়ের বিখ্যাত জিনিস। পথ হাঁটতে হাঁটতে ভাইকে খেতে হবে তো।

দিদি-দাদাবাবুর পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে ষষ্ঠীচরণ সাতসকালেই রওনা হল। পাঁচ ক্রোশ পথ যেতে আর কতক্ষণ। সরকারি সড়ক দিয়ে বেশ খানিকটা গিয়ে তারপর মেঠো রাস্তা। বেশ পা চালিয়েই চলল ষষ্ঠীচরণ। দিদি বলে দিলেন—আবার তাড়াতাড়ি আসিস একদিন।

গাঁয়ের পাঁচ ক্রোশ পথ আর ফুরোয় না। বাড়ি ফেরার তাগাদায় কোঁচড়ের মুড়ি আর জিলিপির কথা ষষ্ঠীচরণ প্রায় ভুলেই বসেছিল। মেঠো পথে নেমে বেশ খানিক দূর এসে সামনে একটা জলা আর তার ধারেই একটা ছায়াঘন গাছ দেখে ষষ্ঠীচরণের হঠাৎ মুড়ি আর জিলিপির কথা মনে পড়ে গেল। আর ক্রোশখানেক হাঁটলেই তাদের গাঁ। খিদেটাও পেয়েছে বেশ, অতএব ষষ্ঠীচরণ জলার ধারে এসে হাতে-মুখে একটু জল দিয়ে গাছতলায় গিয়ে বসল তারপর কোঁচড় থেকে মুড়ি নিয়ে জিলিপির সঙ্গে খেতে শুরু করল। এমন সময় ঠিক তার সামনেই জলের ওপর বেশ খানিকটা বুজকুড়ি কেটে উঠল। নিশ্চয়ই মাছ হবে। ষষ্ঠীচরণ উঠে দাঁড়িয়ে ভালো করে লক্ষ করল কিন্তু ফুট কেটেই চলেছে। অতএব ষষ্ঠীচরণ মাছকে খাওয়াবার জন্য দু'চার মুঠো মুড়ি সেখানে ফেলে দিল, অন্যমনস্ক থাকায় খানিকটা জিলিপির টুকরোও গিয়ে পড়ল সেই মুড়ির সঙ্গে।

ষষ্ঠীচরণ অবাক হয়ে দেখল জিলিপির সঙ্গে মুড়িগুলোও টুপটাপ জলের মধ্যে ডুবে গেল। মুড়ি তো ভাসে, তা ডুববে কেন? আর মাছ হলে তো টুপটুপ করে খেয়ে নেবে, অন্তত মাছের নাকটাও দেখা যাবে। হাঁ করে ভাবছে ষষ্ঠীচরণ এমন সময় সেই যেখানে ফুট কাটছিল ঠিক সেখান থেকেই একটা প্রকাণ্ড চুল সমেত মাথা ভুস করে ভেসে উঠল। এই মরেছে! ষষ্ঠীচরণ পালাতে গিয়েও পালাতে পারল না। মাথাটা তখন গলা পর্যন্ত উঠে পড়েছে। কি বিদ্‌কুটে গোঁফওলা মুখটা! খ্যাক্‌খ্যাক্ করে হেসে সে বলল—তোর জিলিপি, খুব ভালো রে—দে আর একখানা ফেলে দে...তখনও দু'খানা গোটা জিলিপি ছিল, ষষ্ঠীচরণের খাওয়া তখন মাথায় উঠে গেছে। সে তখন টপাটপ দু'খানা জিলিপিই ছুঁড়ে দিল সেই বিদ্‌কুটে মুখটার দিকে। মুখ বাড়িয়েই ধরে নিল সেই জিলিপি দুটো আর চিবিয়ে খেয়ে বলল—খুব ভালো, তুইও খুব ভালো রে—শুধু হাতে যাসনি, এই নে। এই কথা বলে ঝপাং করে একটা সের আড়াই রুই মাছ একেবারে ষষ্ঠীচরণের সামনে ফেলে দিল আর বলল, নিয়ে যা, মাছের দরকার হলে আবার আসিস, কিন্তু জিলিপি আনতে যেন ভুলিসনি—এই কথা বলেই ভুস করে ডুব দিল সেই মাথাটা। মাছটা তখনও লাফাচ্ছে, তাকে বাগিয়ে ধরে কাপড়ে বেঁধে ষষ্ঠীচরণ এবার নিজের গাঁয়ের দিকে ছুট দিল।

মা মাছ দেখে বললেন—দিদি পাঠিয়েছে বুঝি? তা এখনও মাছটা নড়ছে যে রে—

ষষ্ঠীচরণ কোনো কথাই জানাল না। কোথা থেকে মাছ পেয়েছে জানালে, মা কি এমন সরেস মাছটা আর রাঁধতেন?

বেশ মিষ্টি মাছ। মাছ ভাজা, মাছের ঝাল বেশ তৃপ্তির সঙ্গে খেল সকলে। ভাগ্যের জোরে এবার ষষ্ঠীচরণের গাঁয়ের ছেলেরা ফুটবল ম্যাচে জিতে গেল।

এদিকে গাঁয়ে হারুবাবুর মেয়ের বিয়ে। গত বছর এক মেয়ের বিয়ে দিতে নিজের পুকুরের মাছ প্রায় নিঃশেষ হয়ে গেছে। মাছের জন্য মহা ভাবনা, কম করে দু'মণ মাছ চাই—এ গাঁয়ে আর তেমন পুকুর নাই, ভিন গাঁ থেকে মাছের ব্যবস্থা করতে হবে।

খবর শুনে ষষ্ঠীচরণ গিয়ে হাজির হল—কোনো ভয় নেই জেঠু, দু'মণ মাছ আমিই দিয়ে দেব। আপনি আমায় গোটা দশেক টাকা দেবেন আর আপনাদের গরুর গাড়িটা মাছ আনতে। সঙ্গে কিন্তু কেউ যেতে পারবে না।

হারুবাবু কেমন সন্দেহের চোখে দেখলেন, দশ টাকায় দু'মণ মাছ! শেষ পর্যন্ত ষষ্ঠীচরণের কথায় রাজি হয়ে গেলেন। ছেলেটা যখন বলছে, দেখাই যাক। কিন্তু মাছটা বিয়ের আগের দিন দিতে হবে, কড়া করে ভাজিয়ে রাখবেন। ঠান্ডার দিনে পচার ভয় নাই। যদি ছেলেটা একান্তই না পারে, হাতে একদিন সময় থাকবে।

ষষ্ঠীচরণ বিয়ের দু'দিন আগে দশ টাকা নিয়ে বেশ ভালো অমৃতির জিলিপি কিনে এনে লুকিয়ে রাখল, তারপর বিয়ের একদিন আগেই ভোর ভোর জলার ধারে এসে হাজির হয়ে টুপটাপ করে জিলিপি ফেলতে লাগল। একটু পরেই ভুস করে সেই মাথাটা ভেসে উঠল—খাসা জিনিস এনেছিস রে। বাঃ বাঃ সবই আমার জন্যে নাকি রে? তা কি চাস বল?

ষষ্ঠীচরণ বলল—জেঠুর মেয়ের বিয়ে, দু'মণ মাছ চাই—

দু'মণ! তাহলে তো আর জলায় মাছ থাকবে না রে, তা তোকে দিচ্ছি নিয়ে যা, কিন্তু দু'দিন বাদে কিছু চারামাছ ছেড়ে দিয়ে যাস, আমি তাড়িয়ে তাড়িয়ে বড় করে দেব—কি রাজি তো?

ষষ্ঠীচরণ আর কি করে? মাছ দেখিয়ে হারু জেঠুর কাছ থেকে আরো বিশ টাকা আদায় করে নিতে হবে।

তারপর টপাটপ মাছ পড়তে লাগল জলার ধারে মাঠের ওপর। ষষ্ঠীচরণ মাছ ভরার জন্য বেশ তৈরি করেই এনেছিল গাড়িটাকে, সেও টপাটপ গাড়ির ভেতর মাছ তুলতে লাগল। দু'মণের জায়গায় বোধহয় চার মণই হবে বা। ষষ্ঠীচরণ চেঁচিয়ে উঠল—আর না, আর না, গাড়িতে জায়গা নেই।

অতএব মাছ পড়া থামল। ষষ্ঠীচরণ জিলিপিগুলো জলায় ঢেলে দিয়ে গাড়ি ছুটিয়ে একেবারে হারু জেঠুর বাড়ি নিয়ে এল। সকলে মাছ দেখে তো অবাক! এত মাছ! ষষ্ঠীচরণ তখনই আরও বিশ টাকা চেয়ে নিল আর নিজের বাড়ির জন্য একটা মাছ নিয়ে এল।

সেই জলায় জেলেরা যেত না। কেননা জলায় জাল ফেললে আর উঠত না। কে যেন টেনে নামিয়ে নিত। এমন করে বিশখানা জাল হারিয়ে জলায় ভূতের আড্ডা মনে করে কেউ আর বড় ও-পথ মাড়াত না।

ষষ্ঠীচরণ কথামতো চারামাছ ছেড়ে দিয়ে এসেছিল, এখন দরকার হলে জিলিপি ফেলে সে লুকিয়ে মাছ নিয়ে আসে। কেউ জানতে পারে না। মায়ের প্রশ্নে বলে, আমার এক বন্ধু দেয়।

বছর ঘুরে দুর্গাপূজা এসে গেল। বিসর্জনের দিন ঠাকুর নিয়ে সকলে মাঠে ঘোরে তারপর হারুজেঠার পুকুরে বিসর্জন দেয়। মাঠে ঘোরার অর্থ মায়ের কৃপায় পরের বছর ভালো ফসল হবে। সেবারে ঘুরতে ঘুরতে সকলে দিক ভুল করে ঠাকুর নিয়ে সেই জলার ধারে এসে পড়ল। সঙ্গে আলো থাকে, পটকা ফাটে, খুব হৈচৈ হয়। জলা দেখে সকলে মত করল আর অতদূর ঠাকুর ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে কি হবে। এ-ও তো জল, মাকে এইখানেই এ বছর বিসর্জন দেওয়া হোক।

অতএব সেই জলাতেই ঠাকুর বিসর্জন দিয়ে সকলে হৈ-হল্লা করে গাঁয়ে ফিরে এল। হারুজেঠু একটু মনঃক্ষুণ্ণ হলেন।

সেদিন শুতে ষষ্ঠীচরণের বেশ রাত হয়ে গেল। সবে ঘুমটা আসছে এমন সময় জানলায় আওয়াজ হল খট্ খট্ খট্। মা পাশে শুয়ে ঘুমোচ্ছেন। এত রাতে আওয়াজ করে কে? আবার আওয়াজ হতেই ষষ্ঠীচরণ বিছানা ছেড়ে জানলার কাছে চলে এল। সে তো ঘরের ভেতর, তার ভয় কি? ইঁদুর-বেড়াল তো হতে পারে। না দেখে ঘুমতে ইচ্ছা হল না তার। বাইরেটা চাঁদের আলোয় ঝকমক করছিল। ষষ্ঠীচরণ জানলার কাছে এসে যা দেখল তাতে ভয়ে তার গলা শুকিয়ে উঠল। সেই জলার ভূতটা এসে দাঁড়িয়েছে একেবারে জানলার কাছে।

তাকে দেখেই ভূতটা বলে উঠল—ওরে ষষ্ঠী, মা দুর্গার দয়ায় আমি আজ উদ্ধার হয়ে গেলুম রে—তোরা মাকে জলায় ফেললি সেই জল গায়ে লেগেই আমার ভূত জন্ম শেষ হয়ে গেল। তাই তোকে খবরটা জানিয়ে গেলুম। তাড়িয়ে তাড়িয়ে পোনার ছানাগুলো বেশ বড় হয়েছে রে, আমি তো আর তোকে মাছ দিতে পারব না। তুই ইচ্ছামতো ধরে খাস।—এই কথা বলামাত্রই সেখানে যেন একটা ঝড় উঠল আর সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে গেল। ষষ্ঠী ভাবল, বাবাকে মত করিয়ে তারা জলাটা ইজারা নিয়ে নেবে তারপর জলার ভূতের কথাটা সকলকে জানিয়ে দেবে। ষষ্ঠী বিছানায় ফিরে এসে ভূতটার কথা ভাবতে ভাবতে একসময় ঘুমিয়ে পড়ল।

শ্রাবণ ১৩৯৪

রাঙাদিদা ও ফুলকুমারী

বিরাজ ভদ্র

ভূতের গল্প তোমরা শুনতে ভালোবাস। কত নামেই না তোমরা তাদের চেন—ব্রহ্মদত্যি, মামদো ভূত, পেত্নি, শাঁকচুন্নি। 'গুপী গাইন-বাঘা বাইন'-এ আবার ভূতের নাচও তোমরা দেখেছ। আমি একটা মেয়ে ভূতের কথা শুনেছি ছোটবেলায়। তার নাম সে বলেছিল 'ফুলকুমারী'।

ভূত যদি পোড়োবাড়ি, বনে-জঙ্গলে থাকে তবে থাক না। বিশেষ কিছু আসে যায় না। অমাবস্যার রাত্রে, ঘোর দুপুরে অথবা ভর সন্ধেবেলায় তেনারা তোমাদের ভয় দেখাতেও পারেন। ঐ সব জায়গায় যখন-তখন না গেলেই হল।

তবে বনের ভূতের থেকে মনের ভূতকে আমরা বেশি ভয় পাই। একদিন দুপুর রাত্রে চাঁদের আলোয় একটা কলাগাছকে আমার মনে হয়েছিল সাদা শাড়ি পরা একটা ভূত যেন। এদিকে-ওদিকে হাওয়ায় আবার হেলছিল দুলছিল। ওমা! ওটা যে বাগানের চেনা কলাগাছ সেটা বুঝতে কয়েক সেকেন্ড লেগেছিল। আর তার মধ্যেই বুকটা একবার ধক্ করে উঠেছিল।

লোকে বলে বিজলি-আলো আসার পর থেকে ভূতেরা কোথায় সব পালিয়ে গেছে। এখন আর ভূত দেখার বা ভূতে-ধরার গল্প তেমন শোনা যায় না। কিন্তু বহু বছর আগে গ্রামে গ্রামে ভূতের বেশ দৌরাত্ম্য ছিল। মনে কর ষাট-সত্তর বছর আগে ভূতের রাজত্ব না থাকলেও তেনাদের খুব হম্বিতম্বি ছিল।

আমার এক দূরসম্পর্কের ঠাকুমাকে একবার ভূতে ধরেছিল। বাবা-মার কাছে সেই ঘটনা শুনেছি। সেই ঠাকুমাকে আমরা ডাকতাম 'রাঙাদিদা' বলে। খুব ছোটবেলায় তাঁকে দেখেছি। বুড়ো বয়সেও তাঁর গায়ের রঙ ছিল রাঙা-রাঙা ফরসা। সেই রাঙাদিদাকে ভূতে ধরেছিল। তখন তাঁর বয়স কুড়ি-একুশ হবে।

আমাদের গ্রামের বাড়িটা আগে ছিল ছোটখাটো একটা জমিদার বাড়ির মতো। অনেক লোকজন থাকত। একদিন সন্ধ্যাবেলায় রাঙাদিদার বর রাঙাদাদু এক গ্লাস জল চাইলেন। ঘরে জল নেই তাই রাঙাদিদা একটু দূরে রান্নাঘরে জল আনতে গেলেন তাড়াতাড়ি।

সেই যে গেলেন রাঙাদিদা আর আসেন না। দু'একবার ডেকে রাঙাদাদু নিজেই বাইরে এলেন। কি কাণ্ড! রাঙাদাদু দেখলেন রাঙাদিদা বকুল গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন চুপচাপ। কাছে গিয়ে রাঙাদাদু বললেন, 'কি হল এভাবে দাঁড়িয়ে আছ কেন?'

'খবরদার! আমায় ছুঁবিনি', খোনাগলায় রাঙাদিদা বকলেন। তারপর খিলখিল করে জোরে হাসলেন।

দাদু অবাক হয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন। অনেকে ছুটে এল। রাঙাদিদা বড়দের দেখে ঘোমটা টানলেন না। বরং শাড়ির আঁচল গাছকোমর করে বেঁধে সবাইকে শাসাতে লাগলেন, 'কেউ আমায় ছুঁবিনি। ছুঁলে শেষ করে দেব। আমায় তোরা চিনিস না।'

যাঁরা একটু বয়স্ক ছিলেন তাঁরা যা বোঝার বুঝে গিয়েছেন। তখনকার দিনে ভূতে ধরার প্রাথমিক লক্ষণগুলি এরকমই ছিল। রাঙাদিদাকে জোর করে ধরে ঘরে নিয়ে যাওয়া হল। কিন্তু ঘরে তিনি

থাকতে চাইলেন না। বার বার সকলকে সাবধান করছেন, বেরিয়ে যেতে চাইছেন। তখন তাঁকে একটা খুঁটিতে বেঁধে রাখা হল। সে সময় এত গায়ের জোর হয়েছিল রাঙাদিদার যে দু'তিন জনে হিমশিম খেয়ে গিয়েছিল তাঁকে বাঁধতে।

বাড়ির লোকেরা পরামর্শ করে ঠিক করলেন ভূত ছাড়াবার ওঝা ডাকতে হবে। সে রাত্রেই পাশের গ্রামের এক ওঝা এল। তাকে দেখে রাঙাদিদা খিলখিল করে হেসে উঠলেন।

'তুই, তুই কেন এসেছিস? তুই কি করবি আমার? যা পালা নইলে মেরে ফেলব।'

ওঝা কিছুক্ষণ চেষ্টা করে বলল, 'না বাবু! এ আমার কম্ম নয়। আপনারা বড় ওঝা ডাকুন। এটা সহজ পাত্র নয়।'

'যা, যা। তোর গুরুকে নিয়ে আয়'—খিলখিল হাসি রাঙাদিদার।

পরদিন সকালে আরও দু'একজন ওঝা এল, তারাও হার মেনে গেল। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল। সারারাত ঘুম নেই, বসেও নেই, সমানে বকবক করে যাচ্ছেন, তবু একটুও ক্লান্তি ছিল না রাঙাদিদার। সব সময় বাঁধন খোলার চেষ্টা করেছেন।

আমাদের গ্রাম থেকে দশ-বারো মাইল দূরে একজন বিখ্যাত ওঝা থাকত। তার নাম ছিল মহেন্দ্র শীল। তাকেও খবর দেওয়া হল। সন্ধে হতে যায়, সবাই তার অপেক্ষায় বসে রইল। কখন আসে!

আমাদের বাড়ি ছিল আড়িয়াল খাঁ নদীর তীরে। বাড়ি থেকে এক মিনিটের পথ নদীর ঘাট। নৌকোয় করে ওঝা আসবে। কেউ দেখেনি কখন মহেন্দ্র ওঝা নদীর ঘাটে নেমেছে। কিন্তু ঘরের মধ্যে থেকে রাঙাদিদা ঠিক চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ওকে কে আনল? ওকে ফিরে যেতে বল। ও আমার কিছুই করতে পারবে না।'

বার বার চিৎকার করছেন রাঙাদিদা। যত কাছে আসছে ওঝা তত বেশি ছটফট করছেন আর হাত-পা ছুঁড়ে চেঁচাচ্ছেন, 'তুই কেন এসেছিস? তোকে মেরে ফেলব।'

রাঙাদিদার কাণ্ডকারখানা দেখে মহেন্দ্র ওঝা এতটুকু ঘাবড়াল না। বরং গম্ভীর গলায় বলল, 'হ্যাঁ! এলাম। তুই আমায় আসতে বাধ্য করলি। দেখি, কে কাকে মারে।'

এবার সব জিনিসপত্র জোগাড় হল। ওঝা মন্ত্র পড়ে রাঙাদিদার গায়ে জল ছিটিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে রাঙাদিদা চিৎকার করে উঠলেন। সারারাত ধরে চলল ওঝা আর ভূতের ক্ষমতার লড়াই। না দেখলে, না শুনলে সেসব বিশ্বাস করা যায় না।

একসময় ওঝা রাঙাদিদার চারদিকে অদৃশ্য গণ্ডি কাটলেন মন্ত্র পড়ে। তারপর রাঙাদিদার বাঁধন খুলে দেওয়া হল। এক অদ্ভুত কাণ্ড দেখা গেল তখন। রাঙাদিদা চেঁচাচ্ছেন, শাসাচ্ছেন কিন্তু গণ্ডির বাইরে যেতে পারছেন না।

'তুই গণ্ডি তুলে নে। তা নইলে ঘাড় মটকাব। আমায় যেতে দে।'

'তুই কে? কেন এসেছিস আগে বল, তবে তোকে যেতে দেব,' ওঝা বলে।

'না না, বলব না, তুই আমার কী করবি?'

'দেখ না, কি করি', ওঝা মন্ত্রপড়া জল ছিটিয়ে দিল।

'জ্বলে গেলাম, পুড়ে গেলাম! আর দিবি না।'

'তবে বল, কে তুই? কেন চেপেছিস মা লক্ষ্মীর ঘাড়ে? বল?' ওঝা বলে।

'না না, বলব না, তুই কে রে আমায় প্রশ্ন করছিস?'

'দেখাচ্ছি—আমি কে', ওঝা মন্ত্র পড়ে ক্রমশ রাঙাদিদার চারদিকের অদৃশ্য গণ্ডি ছোট করতে শুরু করল। একসময় গণ্ডি রাঙাদিদার দু'পায়ের পাতায় যতটুকু জায়গা ধরে, ততটুকু হয়ে গেল। অথচ বার বার জিজ্ঞাসা করাতেও বলছে না সে কে, কেন ভর করেছে রাঙাদিদাকে।

প্রতিবার গণ্ডি ছোট করার সময় ওঝা প্রশ্ন করেছে কিন্তু উত্তর পাচ্ছে না। কয়েকবার এরকম করার পর ওঝার চোখ জবাফুলের মতো লাল হল রাগে। সে বলল, 'যখন বলবি না তুই কে, তখন দাঁড়া এক পায়ে দাঁড়া। দেখি কতক্ষণ থাকতে পারিস।'

রাঙাদিদা একপায়ে দাঁড়াতে বাধ্য হলেন। কিছুক্ষণ এই ভাবে দাঁড়িয়ে থেকে চিৎকার করে উঠলেন, 'আমি আর পারছি না! উঃ কি কষ্ট! দু'পায়ে দাঁড়াতে দে।'

'আগে বল, তুই কে? তবে দু'পায়ে দাঁড়াতে দেব।'

'বলছি, বলছি।'

'তবে দাঁড়া দু'পায়ে', ওঝা বলে।

দু'পায়ে দাঁড়িয়েই রাঙাদিদা বললেন, 'না বলব না।'

বার কয়েক এভাবে এক পা থেকে দু'পায়ে দাঁড়াতে পেয়েই কিছু বলতে অস্বীকার করায় ওঝা ভয়ানক রেগে গেল।

'অনেকক্ষণ জ্বালিয়েছিস! তুই একটা পেত্নি। তোকে কী করে জব্দ করতে হয় আমার জানা আছে। দাঁড়া তুই, এবার বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুলের উপর দাঁড়া', ওঝা বলে।

ওঝার আদেশ অমান্য করার ক্ষমতা নেই। বুড়ো আঙুলের উপর দাঁড়াতে হল রাঙাদিদাকে।

সে দৃশ্য চোখে দেখা যায় না। কোনো নর্তকীও বেশিক্ষণ ওভাবে দাঁড়াতে পারে না।

'আমি আর পারছি না। আমায় ভালোভাবে দাঁড়াতে দে। সব বলছি।'

'নে, তবে দাঁড়া এক পায়ে', ওঝা জল ছিটিয়ে দেয়।

'দু'পায়ে দাঁড়াতে দে।'

'নে, দু'পায়ে দাঁড়া', ওঝা বলে।

দু'পায়ে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে রাঙাদিদা বলেন, 'আমার কী দোষ! আমি কি সাধে ওর ঘাড়ে চেপেছি! ও যখন বাপের বাড়ি গিয়েছিল একদিন সন্ধেবেলায় এলোচুলে বাইরে ঘুরছিল, তখন থেকে ওর দিকে আমার নজর পড়েছে। ওর সঙ্গে আমি এখানে আসি, রান্নাঘরের পেছনে যে চালতে গাছ আছে ওর ডালে আমি থাকি। ওকে রোজ দেখি। কাল সন্ধেবেলা আবার এলোচুলে রান্নাঘরে যাচ্ছিল। আমি তখন ওর ঘাড়ে চাপি। আমার কি দোষ!'

'তা তো বটেই, তোর দোষ কোথায়! মা লক্ষ্মীর ঘাড়ে চেপেছিস তবু দোষ হয়নি, তাই না? কিন্তু কে তুই?' ওঝা বলে।

'বলব না।'

'আবার বুড়ো আঙুলের উপর দাঁড় করাব।'

'না, না, না! আর না। আমি বলছি।'

'বল, তাড়াতাড়ি বল', ওঝা বলে।

'আমি ফুলকুমারী। ওর বাপের বাড়ির দেশে ছিলাম।'

'বেশ! এবার তোকে এখান থেকে চলে যেতে হবে। অনেক দূরে', ওঝা আদেশ করে।

'না না, তা কেন যাব?'

'তবে দাঁড়া রে পেত্নি, মজা দেখাচ্ছি', ওঝা মন্ত্রপূত জল গায়ে ছিটিয়ে দেয়।

'মরে গেলাম, মরে গেলাম। যাব যাব। আমি যাব। আর কষ্ট দিস না।'

'তুই এই গ্রামে থাকতে পারবি না। মা লক্ষ্মীর বাপের বাড়ির দেশেও না', ওঝা আদেশ করে।

'তবে কোথায় যাব?'

'তা আমি কি করে জানব! তবে আর যেন তোর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ না হয়। সাবধান করে দিচ্ছি।' ওঝা বলে।

'আমি তোকে দেখে নেব। আমি কোথাও যাব না। এখানেই থাকব।'

'তবে রে পেত্নি! বার বার ওই এক কথা। মজা দেখাচ্ছি।' ওঝা অনেকক্ষণ মন্ত্র পড়ে জল ছিটিয়ে দেয়।

'উঁ! মরে গেলাম। মরে গেলাম। আমি যাব। রেহাই দে, রেহাই দে। যা বলবি তাই করব।'

'তবে যা! দূর হয়ে যা! যাবার আগে কি প্রমাণ দিবি বল? যা, ঐ চালতে গাছের মগডাল ভেঙে দিয়ে যা।' ওঝা কঠিন আদেশ করে।

'তাই হবে।'

ওঝা রাঙাদিদার চারদিকের গণ্ডি তুলে নিল। মন্ত্র পড়ে জল ছিটিয়ে দিল রাঙাদিদার গায়। রাঙাদিদা এক দৌড়ে ঘরের বাইরে যেতে গিয়ে দরজার বাইরে আছাড় খেয়ে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে বিরাট শব্দ করে বাইরে কোনো গাছ ভেঙে পড়ল।

রাঙাদিদাকে ধরে ধরে নিয়ে যাওয়া হল। এদিকে রাত ভোর হয়েছে। সকলে বাইরে এসে দেখল পুরোনো বিরাট চালতে গাছের মগডাল ভেঙে পড়েছে।

তারপর থেকে মেয়ে ভূত 'ফুলকুমারী'র কথা আর কেউ শোনেনি।

শ্রাবণ ১৩৯৯

অদ্ভুত ভূতের গল্প

প্রবোধ নাথ

চল্লিশ বছরের লেখকজীবনে এমন বিপদে কখনও পড়েননি দিব্যেন্দুবাবু। তিনি বড়দের জন্যেই লিখে থাকেন। তবে ছোটদের জন্যে একেবারে যে লেখেন না তা নয়। কিন্তু আজ পর্যন্ত ভূত নিয়ে একটা গল্পও লেখেননি। আসলে ভূত, প্রেত, পরলোক, আত্মা—এসব নিয়ে তিনি কোনোদিন কিছু ভাবেননি। তেমন অভিজ্ঞতাও নেই। কাজেই দু'দিন আগে যখন ছোটদের নামকরা মাসিক পত্রিকা 'অঙ্কুরে'র সম্পাদকমশায় পুজোসংখ্যার জন্যে একটা ভূতের গল্পের ফরমাইশ দিলেন, তখন সত্যি বিপদে পড়লেন দিব্যেন্দুবাবু। একবার আমতা আমতা করে বলেওছিলেন, এটা অন্য কাউকে দিয়ে লেখালে হয় না?

লিখছেনই তো, সম্পাদকমশায় জানিয়েছিলেন, আপনি বাদে আর তিনজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক এ বছর 'অঙ্কুরে' ভূতের গল্প লিখছেন।

শুনে দিব্যেন্দুবাবু আরও ঘাবড়ে গেলেন। এর অর্থ তাঁকে অন্য তিন সাহিত্যিকের সঙ্গে অলিখিত প্রতিযোগিতায় নামিয়ে দেওয়া। তা হলে কি করবেন দিব্যেন্দুবাবু! তখনই মনে পড়ল নিত্যপ্রিয়র কথা। নিত্যপ্রিয় তাঁর বহু গল্পের প্লট সাপ্লায়ার। টাকার বিনিময়ে মাঝে মাঝে প্লট বিক্রি করে যায়। সে দিনই তিনি নিত্যপ্রিয়কে ডাকিয়ে এনে বললেন, আমি ভারী বিপদে পড়েছি হে। আমায় একটা জমাটি ভূতের গল্প দিতে পারো? বুঝতেই পারছ জীবনের প্রথম ভূতের গল্প, যেন দাঁড়িয়ে যায়।

পাবেন। তার আগে আমি দত্তপুকুরটা ঘুরে আসি।

দত্তপুকুর কেন? দিব্যেন্দুবাবু জানতে চাইলেন।

দত্তপুকুরে আমার মাসির বাড়ি। আজ সকালে মাসতুতো ভাই এসে খবর দিয়ে গেছে, ঘনশ্যাম কাল রাতে অপঘাতে মারা গেছে। ঘনশ্যামকে আমি চিনতাম, আলাপ ছিল। অপঘাতে মৃত্যু মানেই তো ভূত। আমি আপনাকে ওই ঘনশ্যামের কাহিনিখানাই এনে দেব।

সেই যে নিত্যপ্রিয় গেল দু'দিন কোনো পাত্তা নেই। এ দুটো দিন যে দিব্যেন্দুবাবুর কি অস্বস্তিতে, ভাবনায় কেটেছে বলার নয়।

দু'দিনের দিন সন্ধেবেলায় অবশ্য নিত্যপ্রিয় এসে হাজির। এসে একগাল হেসে বলল, হ্যাঁ, হয়েছে। আপনি যেমনটি চেয়েছিলেন ঠিক তেমনই পেয়েছি। একেবারে ফ্রেশ জিনিস। শিল্পী ঘনশ্যাম সবে তিন দিন হল মরে ভূত হয়েছে। আর সত্যি বলতে কি, আজকাল আমি সব ছেড়ে এই ভূত নিয়েই পড়ে আছি। দেখছি ইদানিং ভূতের গল্পের প্লটের খুব চাহিদা।

সে কি হে? দিব্যেন্দুবাবু জানতে চান।

তাই। আপনি বাদে আরও তিনজন ভূতের গল্পের প্লট চেয়ে খবর পাঠিয়েছেন।

শুনে বুঝতে পারেন দিব্যেন্দুবাবু এই তিনজন কারা।

তা তোমাকে এ প্লটের জন্যে কত দিতে হবে? দিব্যেন্দুবাবু জানতে চান।

পাঁচশো।

বল কি হে! ওটাকে লিখেও পাঁচশো পাব কিনা সন্দেহ।

সে আপনার ব্যাপার। তবে এসব অরিজিনাল জিনিস বাজারে সাত-আটশোতে কাটবে। বেশ, আপনার সঙ্গে আমার বহুদিনের সম্পর্ক, নয় চারশোই দেবেন।

একটু ভাবলেন দিব্যেন্দুবাবু, বললেন, বেশ, তবে শুরু করো, শুনি। না, দাঁড়াও তার আগে তোমাকে চেকটা দিয়ে নিই।

চারশো টাকার চেক পকেটে ভরে নিত্যপ্রিয় কাহিনি শুরু করল।

আমার মাসির বাড়ি দত্তপুকুরে। বারাসাতের দু'স্টেশন পরে। জায়গাটা ক'বছর আগেও বেহদ্দ গ্রাম ছিল। এখন অবশ্য লোকজন বেড়েছে, নতুন নতুন বাড়িঘর উঠেছে, উন্নতি হয়েছে। তবে সে ওই স্টেশনের কাছটুকুতে। কিছু ভেতরে গেলে সেই আগের দশা। আমার মাসির বাড়ি অবশ্য স্টেশন থেকে বেশ ভেতরে, প্রায় দেড় মাইল।

ওই একই পাড়ায় থাকত ঘনশ্যাম। বয়েস প্রায় আমারই মতো—পঁচিশ-ছাব্বিশ। ঘনশ্যামের সংসারে দুজন লোক। সে আর বিধবা মা। আরও ভেতরে তাদের কিছু চাষের জমি আছে। লোক দিয়ে জমি চাষ করাত। দুজনের সংসার চলে যেত। তবে ওদের বসতবাড়িখানা ছিল বড় রাস্তার ওপরেই। বাড়ির সঙ্গে বিঘে কয়েক জমি। সে জমিতে আম, জাম, নারকেল, কাঁঠাল নানারকমের ফলের গাছ।

ঘনশ্যামের একমাত্র নেশা ছিল গান গাওয়া। বারাসাতে এক গুরু ধরে গান শিখত। কেউ গান শুনতে চাইলে ডেকে বসিয়ে গান শোনাত। আমি ঘনশ্যামের গান শুনেছি, এমন কিছু নয়। কিন্তু তার স্বপ্ন ছিল গান গেয়ে সে নাম পাবে, যশ পাবে, একদিন সকলে তার গানের প্রশংসা করবে।

ক'দিন আগে ও পাড়াতেই একটা বেশ বড় গানের জলসা হল। উদ্যোক্তারা ঘনশ্যামকে গান গাইবার আমন্ত্রণ জানায়। আমন্ত্রণ পেয়ে তো ঘনশ্যাম খুব খুশি। সেদিন সন্ধেবেলায় সেজেগুজে আসরে গেল গান গাইতে। গানও শুরু করেছিল। সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক থেকে হাততালি। ঘনশ্যাম ভাবল, বাবাঃ, গান শুরু করতে না করতেই এত! পুরোটা শুনলে না জানি কি করবে। সে আরো মেজাজ দিয়ে গান গাইতে লাগল। এবার চারিদিক থেকে ইঁট-বৃষ্টি আরম্ভ হল। আর গালাগাল। ওরে ব্যাটা গান গাইতে এসেছিস না শিঙে ফুঁকতে এসেছিস? তোর চেয়ে গরু, ছাগল, গাধা, মহিষের গলাও ভালো। তোর ও-গলায় গান হবে না রে! তার চেয়ে ঘরে গিয়ে গলায় দড়ি দে!

দুঃখে-অপমানে চোখের জল ফেলতে ফেলতে ঘনশ্যাম বাড়ি ফিরে গেল। সে রাতে সত্যি সত্যি ঘনশ্যাম কড়িকাঠে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করল।

তারপর? দিব্যেন্দুবাবু জানতে চান।

ঘনশ্যামের বাড়িতে একটা বিরাট গাব গাছ আছে। অপঘাতে মৃত্যু মানেই তো ভূত। ঘনশ্যাম আজ দু'দিন হল ওই গাব গাছে আশ্রয় নিয়েছে। পাড়ার লোক এখন প্রতি রাতে শোনে ওই গাব গাছে পা ঝুলিয়ে বসে ঘনশ্যাম গান গাইছে।

দিব্যেন্দুবাবু বুঝলেন শেষ দিকটা নিত্যপ্রিয় ভেজাল মেশাল। ওটুকু বাদ দিতে হবে। তবে এর থেকেই যা হোক কিছু দাঁড় করানো যাবে।

নিত্যপ্রিয় চলে যেতে দিব্যেন্দুবাবু ভাবতে বসলেন গল্পটা কি ভাবে শুরু করা যায়। ঘরের ফোনটা বেজে উঠল। টেলিফোনটা ধরতে ধরতে দিব্যেন্দুবাবু ভাবলেন নিত্যপ্রিয়ই হয়তো ফোন করেছে।

কে, নিত্যপ্রিয়?

না। নিত্যপ্রিয় তো আপনার কাছে গিয়েছিল একটা ভূতের গল্প বেচতে?

হ্যাঁ।

আপনি ওই ভেজালে জিনিসটা কিনলেন?

ভেজালে জিনিস মানে!

দেখুন, নিত্যপ্রিয়কে আমি বহুদিন থেকেই চিনি। ওর মাসির বাড়ি দত্তপুকুরে—আমাদেরই পাড়ায়। আমার সঙ্গে আলাপও আছে। পরশুদিন এসেছিল ভূতের গল্পের খোঁজে। আপনার নাকি একটা আনকোরা, ফ্রেশ ভূতের গল্প দরকার। তখনই জানতাম ঘনশ্যামের অপঘাত মৃত্যুটাকে নিয়ে একটা ভূতের গল্প বানাবে। ভূত ভূত করে নিত্যপ্রিয় এমনই ক্ষেপেছে যে বলা যায় না কোনোদিন ও নিজে মরে আপনাদের সামনে গল্প হয়ে না হাজির হয়! সে যাকগে, নিত্যপ্রিয় যে প্লটটা আপনাকে দিয়েছে তাতে তো দেখিয়েছে ঘনশ্যাম গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে!

হ্যাঁ। দিব্যেন্দুবাবু বলেন।

টেলিফোনের ওধারে খিকখিক করে হাসি শোনা যায়। হাসি থামিয়ে সে বলে, সত্যি! নিত্যপ্রিয় পারেও বটে! ঘনশ্যাম অপঘাতেই মারা গেছে বটে তবে সে আত্মহত্যা করেনি, সে খুন হয়েছে।

খুন!

হ্যাঁ, তাকে খুন করা হয়েছে। অবশ্য চারিদিকে প্রচার যে সে আত্মহত্যা করেছে। এ প্রচার করেছে অবশ্য নারায়ণ মুৎসুদ্দি।

আশ্চর্য! কে তাকে খুন করল?

সেটা বলার জন্যেই তো আপনাকে এত রাতে ফোন করা। তবে শর্ত আছে।

জানি, মূল্য তো?

মূল্য তো বটেই। কারণ আমার কাছ থেকে যা শুনবেন তা সাজিয়ে যদি গল্পটা লেখেন তবে সেটা হবে সত্যিকারের ভূতের গল্প।

ওঃ, তা এই সত্যিকারের কাহিনিটুকুর জন্যে কত দিতে হবে?

নিত্যপ্রিয় যেভাবে টাকাপয়সা নিয়ে আপনার কাছে গল্প বেচেছে, আমি সে চাই না। আমার দাবি অন্য।

কি রকম?

আমি চাই যারা শিল্পী ঘনশ্যামকে এমনভাবে খুন করেছে তারা যত ক্ষমতাবানই হোক না কেন—তাদের চরম শাস্তি হোক। আর আপনি এর জন্যে সামনে এগিয়ে আসুন।

অর্থাৎ? দিব্যেন্দুবাবু জানতে চান।

আপনি সমাজের মানী লোক। আপনার সঙ্গে উঁচুমহলের কত মানুষদের জানাশোনা! আপনি যদি একবার তাদের বোঝাতে পারেন এটা আত্মহত্যা নয়, খুন, ঘনশ্যামকে খুনই করা হয়েছে এবং শীঘ্র তদন্ত শুরু না করলে হত্যাকারীরা বেঁচে যাবে—তাহলে দেখবেন প্রশাসন কেমন নড়েচড়ে বসে।

দেখুন, দিব্যেন্দুবাবু বলেন, শুধু আপনি কেন, আপনি আমি সমাজের প্রত্যেক সৎ ব্যক্তিই চাইবে এসব অপরাধীরা শাস্তি পাক। আপনি বলছেন ঘনশ্যাম খুন হয়েছে, যদি হয়েই থাকে তবে অকাট্য প্রমাণ না পেলে আমি কাকে কি বলব বলুন, আর সে কথা তারা শুনবেই বা কেন?

আছে, সেরকম অকাট্য প্রমাণই আছে।

তা যদি থাকে তবে খুনিদের ধরার ব্যবস্থা করা আমার পক্ষে অসুবিধে হবে না।

সে আমি জানি। এবার তবে কাহিনির অজানা অংশটুকু শুনুন। নিত্যপ্রিয় প্রথম দিকটা যা বলেছে ঠিকই আছে। বলেনি যেটা সেটা হচ্ছে নারায়ণ মুৎসুদ্দি এবং তার দুই শাগরেদের কথা।

নারায়ণ মুৎসুদ্দিটা কে? দিব্যেন্দুবাবু জানতে চান।

ঘনশ্যামকে খুন করানোর আসল নায়ক। থাকে ঠিক ঘনশ্যামের বাড়ির পাশের বাড়িতে। বিরাট পয়সাওলা মানুষ। সবাই জানে মানুষটার তেজারতি ব্যবসায় এত পয়সা। আসলে বাংলাদেশের চোরাই মাল কেনাবেচা করেই তার এত রমরমা। নারায়ণ মুৎসুদ্দি লোভীও বটে, অসৎও বটে। তার বহুদিনের সাধ ঘনশ্যামের চার বিঘে জমি দখল করে নিজের প্রাসাদতুল্য বাড়িকে রাজপ্রাসাদ বানানোর। কিন্তু ঘনশ্যামের জেদের জন্যে কিছুতেই তা পারছিল না। শেষে সুযোগ পেয়ে একটা মিথ্যে মামলায় ঘনশ্যামকে জড়াল। ঘনশ্যাম নারায়ণ মুৎসুদ্দির দু'নম্বরী ব্যবসার খবর জানত। একদিন বাড়ি বয়ে নারায়ণ মুৎসুদ্দির মুখের ওপর বলে এল, হয় মিথ্যে মামলা তুলে নাও, নয় তো তোমার দু'নম্বরী ব্যবসার খবর পুলিশকে জানাব। ভয় পেয়ে নারায়ণ মুৎসুদ্দি মামলা তুলে নিল, কিন্তু সুযোগের অপেক্ষায় রইল। সে সুযোগ পেয়ে গেল গানের আসরে। জলসার উদ্যোক্তাও সে, সভাপতিও সে। লোক পাঠিয়ে সে ঘনশ্যামকে গান গাইবার জন্যে আমন্ত্রণ জানায়। আবার আসরে নিজের লোক লাগিয়ে তাকে বিশ্রীভাবে অপমান করে। ঘনশ্যাম কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরে যায়। নারায়ণ মুৎসুদ্দি সে রাতে দুজন লোক পাঠিয়ে ঘনশ্যামকে খুন করিয়ে কড়িকাঠে ঝুলিয়ে রাখে। সবাই জানে ঘনশ্যাম আত্মহত্যা করেছে।

এ পর্যন্ত বলে ওপাশের কণ্ঠস্বর চুপ করল। দিব্যেন্দুবাবু জিগ্যেস করলেন, এর মধ্যে অকাট্য প্রমাণ কোথায়?

আছে, এবার সেটা বলছি। ঘনশ্যাম সে রাতে বাড়ি ফিরে ক্যাসেট রেকর্ডার চালিয়ে গান গাইতে বসেছিল। হয়তো দুঃখ ভুলতে। এর মধ্যেই নারায়ণ মুৎসুদ্দির দুজন লোক আসে তাকে খুন করতে। খুনের আগে ঘনশ্যাম আর লোক দুজনের কথাবার্তা, তর্কাতর্কি, ঘনশ্যামের আর্ত চিৎকার সবই রেকর্ড করা আছে রেকর্ডারে। এটা শুনলেই পরিষ্কার বোঝা যাবে ঘনশ্যামের হত্যাকারী কারা এবং কার্যকারণই বা কি!

সে রেকর্ডারখানা এখন কোথায়?

ঘনশ্যামের ঘরে চৌকির তলায় একটা বাক্সের ওপরে আছে। ঘরখানা তালা দেওয়া। পুলিশই তালা লাগিয়ে গেছে। তবে খুব বেশিদিন দেরি হলে ওটা সেখানে থাকবে না। ঘরের তালাও খুলে যাবে। কারণ নারায়ণ মুৎসুদ্দি এর মধ্যেই বুঝতে পেরেছে তার বিরুদ্ধে কেউ গোপনে লড়াইয়ে নেমেছে। সেও চারিদিকে নিজের লোক নামিয়েছে। আমি বাদে আরও একজন পাহারা দিচ্ছে ঘনশ্যামের ঘরখানা। সে ঘনশ্যামের পোষা কুকুর টাইগার। কেউ কাছে গেলেই দাঁত খিঁচিয়ে তেড়ে আসছে।

আপনার পরিচয়? দিব্যেন্দুবাবু জিগ্যেস করেন, আর সে রাতে যে ঘটনা ঘটেছে ঘনশ্যামের বন্ধ ঘরের ভিতরে, উপস্থিত ছিল ঘনশ্যাম বাদে আর মাত্র দুজন, সে ঘটনার খবর আপনি জানলেন কি করে?

ফোনের ওপাশে পুরোনো খুকখুকে হাসি শোনা গেল। একটা শিহরন দিব্যেন্দুবাবুর সারা শরীরে বয়ে গেল।

বেশ, পরিচয় না হয় না-ই দিলেন, কিন্তু একবার কি দেখা-সাক্ষাৎ হতে পারে না?

পারে। পাবেন। যে দিন নারায়ণ মুৎসুদ্দি আর তার দু'শাগরেদ ধরা পড়বে, শাস্তি পাবে, সেদিন আমি শুধু দেখা দেব না, আপনাকে অর্থমূল্যে পুরস্কৃত করব।

ফোনটি যেমন হঠাৎ এসেছিল তেমনই হঠাৎ কেটে গেল। তা যাক। তবে আজ আর গল্প লেখা এগোবে না। কালকেও হবে কিনা বলা মুশকিল। বারাসাতের পুলিশ সুপার অবনী বসু তাঁর স্কুলজীবনের বন্ধু। সকালের দিকে একবার তার কাছে যাওয়া দরকার। আপাতত শুয়ে পড়া যাক।

বাতি নিভিয়ে শুতে যাবেন দিব্যেন্দুবাবু, ফোনটা আবার বেজে উঠল। ফোনটা ধরে বললেন, হ্যালো, কাকে চাই?

আমি নিশ্চয়ই সাহিত্যিক দিব্যেন্দুবাবুর সঙ্গে কথা বলছি! অপরিচিত কণ্ঠস্বর।

হ্যাঁ। কিন্তু আপনি?

নিত্যপ্রিয় যে গল্পখানা রমাপদবাবু, মুক্তিবাবু, শক্তিবাবুর কাছে চালাতে পারেনি, আপনি সে ভেজালটা কিনলেন?

তখন ভেজাল ছিল বটে, এখন আর নেই। একজন শুধরে দিয়েছে।

জানি, তাতে অনেকটাই শুধরেছে বটে কিন্তু গলদ রয়েই গেছে। আসলে ইচ্ছে করেই সে ওটুকু জানায়নি। অথচ সেটুকু না জানতে পারলে কাহিনি নির্ভেজাল হবে না। তিনজন অপরাধী ধরা পড়লেও চতুর্থজন, যে প্রকৃত হত্যাকারী, ধরা পড়বে না।

শুনে দিব্যেন্দুবাবু চিন্তিত হলেন। একটু আগে ফোনে একজন জানিয়েছে হত্যায় জড়িত তিনজন। অথচ এ ব্যক্তি বলছে চারজন। অপরজন এল কোথা থেকে? সে যাই হোক, এ লোকটিও একটি ভূতের কাহিনি বেচে কিছু উপার্জন করতে চায়। তাই প্রথম থেকেই খুব সাবধানে কথাবার্তা শুরু করলেন। বললেন, দেখুন ভূতের গল্প আমি একটা চাইছি বটে এবং তার জন্যে খরচও করব কিন্তু জেনুইন লোক ছাড়া অন্য কারও কাছ থেকে গল্প কিনব না ঠিক করেছি।

জেনুইন লোক মানে? ওপাশের কণ্ঠস্বর প্রশ্ন করল।

মানে যার সঙ্গে ভূতের যোগাযোগ আছে, ওঠাবসা আছে, চাইলে আমাকে ভূতও দেখাতে পারবে তেমন একজন।

তা হলে তো আপনাকে ওঝা-গুণিনের কাছে যেতে হয়। শুনেছি ওরা বস্তায় ভরে ভূত পোষে। লেখকদের লেখায় যত ভূতের বর্ণনা সব বুঝি ওদের কাছ থেকেই পাওয়া। ভূতের চেহারা কঙ্কালের মতো, সমস্ত শরীর শুধু কাঠি কাঠি হাড় দিয়ে তৈরি। মাড়িহীন দু'পাটি দাঁত, চোখের জায়গায় বিরাট দুটি গর্ত! আসলে কি জানেন, ভূত আর ভগবান—এদের কেউ দেখার ইচ্ছে করেছে, অমনি দেখা পেয়েছে তা কোনোদিন হয়নি। ওভাবে ওদের দেখা যায় না। ওদের অন্তর দিয়ে অনুভব করতে হয়, ইন্দ্রিয় দিয়ে উপলব্ধি করতে হয়। আপনি তো লেখক মানুষ, সাধারণের চেয়ে দৃষ্টি, বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা অনেক বেশি। আশা করি আপনি পারবেন।

আপনার পরিচয়টা কি একবার জানতে পারি? দিব্যেন্দুবাবু জানতে চান।

না, সেটাও আপনাকে খুঁজে নিতে হবে, বুঝে নিতে হবে। তাছাড়া নারায়ণ মুৎসুদ্দি চারিদিকে নিজের লোক নামিয়েছে সাক্ষী-প্রমাণ লোপাট করার জন্যে। এখন বলুন আপনি রাজি আছেন কিনা, থাকলে ভালো, নইলে আমাকে অন্য কারও কাছে ছুটতে হবে।

আগের ফোনে দিব্যেন্দুবাবু তিনজন ষড়যন্ত্রকারীর কথা জেনেছিলেন। একজন নারায়ণ মুৎসুদ্দি, অন্য দুজন তার চেলা। অথচ এ বলছে চারজনের কথা। এই চতুর্থজন কে? তার আগে অবশ্য জেনে নেওয়া দরকার এই গল্পের প্লটের জন্যে এর আবার চাহিদা কত!

এ কাহিনির জন্যে আপনাকে কত দিতে হবে? দিব্যেন্দুবাবু জানতে চান।

দক্ষিণা? হ্যাঁ, তা চাই বৈকি! তবে অর্থমূল্যে নয়। আমি চাই হত্যায় জড়িত চারজনই ধরা পড়ুক। চারজনই শাস্তি পাক।

আপনি বলছেন হত্যাকারী চারজন। অথচ আমি জানি হত্যাকারী মোট তিনজন। আর সে রাত্রে হত্যার আগে দুজনের কথাবার্তা একটা রেকর্ডারে রেকর্ড করা আছে।

না, হত্যাকারী চারজন। ওই রেকর্ডারখানা চারজনের বিরুদ্ধেই সাক্ষী দেবে। কিন্তু আর কতদিন ও প্রমাণ থাকবে বলা মুশকিল। এর মধ্যেই হয়তো অদৃশ্য হয়ে যেত, পারেনি শুধু টাইগারের জন্যে। ঘনশ্যাম মারা যাওয়ার পর থেকেই টাইগার ঘনশ্যামের তালা দেওয়া ঘরের সামনে থাবায় মুখ রেখে দিনরাত পাহারা দিচ্ছে। কেউ কাছে যাওয়ার চেষ্টা করলেই দাঁত খিঁচিয়ে তেড়ে যাচ্ছে। আমার কাজ যতদিন না খুনি চারজন ধরা পড়ে, সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে টাইগারকে সময়মতো খাবার জুগিয়ে যাওয়া।

অকাট্য প্রমাণ থাকলে চারজনের বিরুদ্ধে শাস্তির ব্যবস্থা নেওয়ানো আমার পক্ষে অসুবিধে হবে না। বেশ, এবার আপনার কাহিনিটা বলুন।

ঘটনার প্রথম অংশ নিত্যপ্রিয় ঠিকই বলেছে। পরের জন বাকি অংশটা ঠিক বললেও বলেনি একজনের কথা, সে চতুর্থজন। আমার কাহিনিতে থাকবে সেই চতুর্থজনের কথা, তার কাহিনি।

ঘনশ্যাম সে রাতে বাড়ি ফিরে শোকে-দুঃখে-হতাশায় প্রথমে ঠিক করেছিল এই গলা নিয়ে গান গেয়ে যখন শিল্পী হওয়া এ জন্মে সম্ভব নয় তখন কি লাভ এ জীবন রেখে! পরে ভাবল, কৈ তার গুরু তো এত বছরের মধ্যে একদিনও বলেননি যে তার গলা এত খারাপ! তবে বলতেন, আরও রেওয়াজ দরকার। বলতেন, গলায় একটু সুর কম বটে তবে নিয়মিত রেওয়াজ করলে ওটুকু ঠিক হয়ে যাবে। একটা রেকর্ডার কিনে নাও। এমন উপকারী বন্ধু গাইয়ে-বাজিয়েদের দ্বিতীয় আর নেই। মাঝে মাঝে নিজের গান রেকর্ড করে নিজে শুনবে, গানের ভুল-ত্রুটিগুলো নিজে শুনে শুনে সংশোধন করার চেষ্টা করবে।

আসর থেকে ফিরে সেই রাতে ঘনশ্যাম ক্যাসেট রেকর্ডারখানা চালিয়ে রেওয়াজে বসেছিল। এমন সময় দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ। ঘনশ্যাম উঠে দরজা খুলে দিতেই তিনজন লোক হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে দিল। এই তিনজনের একজন নারায়ণ মুৎসুদ্দির ভাইপো, অন্য দুজন নারায়ণ মুৎসুদ্দির শাগরেদ। ভাইপোকে নারায়ণ মুৎসুদ্দি সঙ্গে পাঠিয়েছিল কাজের তদারকি

করতে। ভাইপো তার কাকার গুণগুলো সব তো পেয়েছিল, উপরি আরও কিছু গুণ ছিল। কাকার ড্রাগের নেশা ছিল না, ওর সেটা ছিল।

ঘনশ্যাম ঘরে অল্প পাওয়ারের আলো জ্বালিয়ে গান গাইতে বসেছিল। ঘরে ঢুকেই শয়তান ভাইপোর চোখ পড়ে চলন্ত রেকর্ডারখানার ওপরে। প্রথমে ওটা বন্ধ করবে বলে ঠিক করেও পরমুহূর্তে মত পাল্টায়। ও অতি ধূর্ত ছেলে। সঙ্গে সঙ্গে একটা পরিকল্পনা ছকে নেয়। কাকাকে জেলে পাঠিয়ে বিষয়-সম্পত্তি দখলের এমন একটা সুযোগ সে ছাড়তে চায় না। প্রথমে সে রেকর্ডারখানা আড়াল করে দাঁড়িয়ে থাকে। পরে দুজন মানুষ আর ঘনশ্যামের কথাবার্তা, তর্কাতর্কির সাক্ষীকে এক ফাঁকে সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে সাবধানে খাটের তলায় সরিয়ে দেয়। নিজে মুখ ফুটে একটা কথাও বলে না।

শাগরেদের দুজনের মধ্যে একজন একটা কাগজ বার করে ঘনশ্যামের সামনে মেলে ধরে বলে, নে, এ খানায় সই কর।

লোকগুলো যে কোনো বদ মতলব নিয়ে এসেছিল ঘনশ্যাম সেটা আন্দাজ করেছিল, তবু কাগজখানা নিয়ে পড়ল। কাগজে লেখা ছিল, শ্রোতাদের কাছে আজ চরম অপমানিত হয়ে বুঝলাম এই গলা নিয়ে শিল্পী হওয়া, নাম-যশ পাওয়া এ জন্মে সম্ভব নয়, তাই উদ্‌বন্ধনে আত্মহত্যা করলাম।

কাগজখানা ঘনশ্যাম ফিরিয়ে দিয়ে বলল, অসম্ভব, সই আমি করব না।

দ্বিতীয় লোকটি এগিয়ে এসে বলল, সই যে তুই করবি না তা আমরা জানি। তাই তোর সই আর হাতের লেখা নকল করে জবানবন্দি একেবারে তৈরি করেই এনেছি। যাক, এবার তবে ঝুলে পড়।

ঝুলে পড় মানে? ঘনশ্যাম জানতে চেয়েছিল।

ঝুলে পড় মানে—কড়িকাঠের সঙ্গে গলায় দড়ি বেঁধে ঝুলে পড়। আমরা হারমোনিয়মের ওপর খাতা চাপা দিয়ে এই কাগজখানা রেখে যাব। সকালে এসে সবাই জানবে তুই আত্মহত্যা করেছিস।

আত্মহত্যা আমি করব না। ঘনশ্যাম রুখে দাঁড়ায়। কখনও করব না।

করতেই হবে। নারায়ণ মুৎসুদ্দির বে-আইনি চোরাচালানের খবর জানার পর সে তোকে বাঁচিয়ে রাখবে ভেবেছিস! আজ পর্যন্ত কেউ বেঁচেছে! এর আগে আরও দুজন এভাবেই আত্মহত্যা করেছে। নে এবার তৈরি হয়ে নে।

শয়তান ভাইপো এতক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে ওদের কথাবার্তা শুনছিল। ওদের কথাবার্তা তর্কাতর্কিগুলো রেকর্ড হওয়ার সময় দিচ্ছিল। এবার মনে হল যথেষ্ট হয়েছে। রেকর্ডারে যা রেকর্ড হয়ে গেছে, তিনজনের যাবজ্জীবন তো বটেই, ফাঁসি হওয়াও অসম্ভব নয়। এবার সে নিজেই পিছন থেকে একটা দড়ির ফাঁস ঘনশ্যামের গলায় জড়িয়ে চেপে ধরে। ঘনশ্যাম একটু গোঙায়, ছটফট করে, পরে নিস্তেজ হয়ে যায়। লোক দুজন কড়িকাঠের সঙ্গে বডি ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়ে।

পরদিন পুলিশ আসে, নারায়ণ মুৎসুদ্দি আসে। পুলিশের হাতে কিছু টাকা গুঁজে নারায়ণ মুৎসুদ্দি বোঝাল কেসটা যখন বোঝাই যাচ্ছে পরিষ্কার আত্মহত্যা তখন মিথ্যে বডি নিয়ে টানা-হ্যাঁচড়ায় লাভ কি!

একটু পরেই এক ডাক্তারের ডেথ-সার্টিফিকেট এসে গেলে নারায়ণ মুৎসুদ্দি নিজেই এগিয়ে এসে বডি পোড়ানোর ব্যবস্থা করল।

এ পর্যন্ত বলে ওপাশের কণ্ঠস্বর একটু নিশ্চুপ হল। দিব্যেন্দুবাবু জিগ্যেস করলেন, তারপর?

ও পক্ষ একটু হেসে উত্তর দিল, এর পরের যা করার তো আপনি করবেন। আচ্ছা আমি এবার আসি। টাইগারের খাবার সময় হয়েছে। সময়মতো খাবার না পেলে ও ভারী চিৎকার করে!

ফোনটা ওপাশ থেকে কেটে গেল। রিসিভার রেখে দিব্যেন্দুবাবু আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লেন। শুয়ে শুয়ে ঘটনাটা বিশ্লেষণ করতে লাগলেন। প্রথম ফোনটা যে শয়তান ভাইপোটা করেছিল এ

ব্যাপারে তিনি একশো ভাগ নিশ্চিত। কাকাকে এবং তার দুই শাগরেদকে জেলে পোরার জন্যে ও নিজেই আগ বাড়িয়ে ফোনে প্রমাণের কথা জানিয়ে দিল। একেবারে অকাট্য প্রমাণ। শয়তানটার কথামতো রেকর্ডারে যদি সব রেকর্ড করা থাকে তবে তিনজনের যাবজ্জীবন অবধারিত। কিন্তু দ্বিতীয় ফোনটা করল কে? সে জানাল রেকর্ডারে এমন প্রমাণ আছে যাতে শয়তান ভাইপোটাকে হত্যাকারীর অন্যতম একজন প্রমাণ করা মোটেই অসুবিধে হবে না! কি সে প্রমাণ যা শয়তান ভাইপোটার অজান্তে এখনও ও ঘরে রয়ে গেছে?

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই দিব্যেন্দুবাবু ছুটলেন বারাসাতে। অবনী বসুর সঙ্গে এখনও বন্ধুত্বের সম্পর্ক অটুট আছে। নিজের কোয়ার্টারেই পাওয়া গেল অবনীকে। সব শুনে অবনী বসু বলল, তাই! ওটা তো আমারই জুরিসডিকশনে হে। চলো, চলো, এখুনি তবে বেরুতে হয়।

দিব্যেন্দুবাবুকে জিপে পাশে বসিয়ে তখনই সোজা লোকাল থানায়। পুলিশ সুপারকে অসময়ে আসতে দেখে ও. সি. ব্যস্ত হয়ে ছুটে এসে স্যালুট ঠুকে বলল, স্যার, আপনি!

হ্যাঁ, শুনুন। এখানে নারায়ণ মুৎসুদ্দি বলে কেউ থাকে?

থাকে স্যার।

তার পাশের বাড়িতে একজন ক'দিন আগে মারা গেছে?

হ্যাঁ, স্যার, সুইসাইড কেস।

তবে পোস্টমর্টেম করেননি কেন?

চেয়েছিলাম স্যার। কিন্তু পাড়ার সবাই এসে বাধা দিল, বলল, বিধবা বুড়ি মা এমনিতেই শোকে আধখানা, কাটাছেঁড়া ছেলের শরীর দেখলে আর বাঁচবে না। ওরা আবার ডাক্তারের সার্টিফিকেট এনে দিল। তাই আর আটকাইনি।

ঘরে কি তালা দেওয়া আছে?

হ্যাঁ, স্যার।

বেশ, চাবি নিয়ে আমার সঙ্গে একবার চলুন।

গাড়ি ঘনশ্যামের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াতে দিব্যেন্দুবাবু দেখলেন একটা কুকুর তালা দেওয়া ঘরের সামনে দরজা আগলে শুয়ে আছে। ওরা এগিয়ে কাছে যেতে কুকুরটা কিন্তু কিছু বলল না। বরং ভদ্রতা করে দরজা ছেড়ে পাশে গিয়ে শুল।

অবনীবাবু নিজের হাতে তালা খুলে ঘরে ঢুকল। সঙ্গে ও. সি. আর দিব্যেন্দুবাবু। খাটের নীচে উঁকি দিয়ে ভালো করে লক্ষ করতে রেকর্ডারখানা দেখতে পেল। একটা স্যুটকেসের ওপরে রেকর্ডারখানা রাখা। অবনীবাবু ফিরে দিব্যেন্দুবাবুর দিকে তাকিয়ে নিচু হয়ে রেকর্ডারখানা বার করতে যেতেই কী বিভ্রাট! টাইগার বিকট আওয়াজ করে অবনীবাবুর হাত কামড়াতে গেল। ভয় পেয়ে অবনীবাবু লাফিয়ে উঠল, বলল, বাবাঃ! ও. সি. এগিয়ে এসে বলল, দাঁড়ান স্যার, আমি দেখছি। ও. সি. উবু হয়ে বসে হাত বাড়াতেই টাইগার এমন দাঁত বার করে খেঁকিয়ে উঠল ও. সি.-র হাতের ছড়িগাছা পড়ে গেল মাটিতে।

দেখে দিব্যেন্দুবাবু বললেন, দাঁড়ান আমি দেখছি। ও. সি. বাধা দিয়ে বললে, এমন ভুল করবেন না স্যার! কামড়ালেই চোদ্দটা ইঞ্জেকশন।

দিব্যেন্দুবাবু শুনলেন না। নিচু হয়ে রেকর্ডারখানা আনতে হাত বাড়ালে টাইগার এমনভাবে তাঁর পায়ে মাথা ঘষতে লাগল যে উঠে দাঁড়াতে বাধ্য হলেন।

অবনীবাবু বন্ধুর দিকে তাকিয়ে বলল, এটা কি রকম হচ্ছে দিব্যেন্দু! শেষে কি কুকুরটাকে গুলি করতে হবে?

একটু অপেক্ষা করো, দিব্যেন্দুবাবু বললেন। ভাবলেন টাইগার যদি তার প্রভুর এতই প্রিয় হবে এবং সাক্ষী-প্রমাণ আগলে বসেই থাকবে তবে সে কেন ওটা বার করতে বাধা দিচ্ছে? ওটাতেই তো তিনজনকে ধরার মতো যথেষ্ট প্রমাণ লুকোনো আছে। অবশ্য দ্বিতীয়জন ফোনে জানিয়েছে

চারজন। তবে! হঠাৎ একটা সম্ভাবনা মাথায় এল দিব্যেন্দুবাবুর। কথাটা মাথায় আসতে টাইগারের দিকে তাকালেন। এবার নিচু হয়ে বসে স্যুটকেসটায় হাত দিলেন। আস্তে টেনে স্যুটকেসটা বাইরে বার করে আনলেন। টাইগার জুলজুল চোখে দেখছিল বটে তবে কিছু বলল না। স্যুটকেসের ওপরে ছোট্ট একটা ন্যাশনালের ক্যাসেট রেকর্ডার। রেকর্ডারখানা চলে চলে আপনা থেকে বন্ধ হয়ে গেছে। অবনীবাবুর কাছ থেকে ডট পেন চেয়ে নিলেন দিব্যেন্দুবাবু। রিফিলের সরু মাথা দিয়ে বোতাম চেপে ক্যাসেটখানা রি-ওয়াইন্ড করে আবার ফরোয়ার্ড করলেন। ঘরের তিনজন মানুষ আর টাইগার নিশ্চুপ হয়ে শুনল ঘনশ্যাম আর দুজন মানুষের কথাবার্তা। এসব অবশ্য দিব্যেন্দুবাবু শুনেছিলেন দ্বিতীয় জনের ফোনে।

ক্যাসেট শেষ হতে অবনীবাবু বলল, কৈ হে দিব্যেন্দু! এ তো সেই তিনজন! শয়তান ভাইপোকে ধরব কি করে?

কেন, এখনও বুঝতে পারোনি? বুঝতে পারোনি, কেন টাইগার ওটাতে হাত দিতে বাধা দিচ্ছিল?

এবার অবনীবাবু লাফিয়ে উঠল, বলল, বুঝেছি, রেকর্ডারের গায়ে শয়তানটার আঙুলের ছাপ আছে। রেকর্ডারখানা সরিয়ে রাখার সময় নিজের অজান্তেই ছাপ রেখে গেছে। শয়তানটার হয়তো এ কথাটা একবারও মনে হয়নি। হলে নিশ্চয়ই ফোন করে রেকর্ডারের কথা জানাত না।

ও. সি.-র দিকে তাকিয়ে অবনীবাবু বলল, যান শয়তান ভাইপোটাকে গ্রেফতারের ব্যবস্থা করুন। দেখবেন যেন পালাতে না পারে। আর ফিংগার-প্রিন্ট এক্সপার্টকে খবর পাঠানোর ব্যবস্থা করুন।

দিব্যেন্দুবাবু অবনীবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, দেখলে টাইগারের বুদ্ধি আর প্রভুভক্তি! মানুষ হয়তো বেইমানি করে, কুকুর করে না।

তা নয় বুঝলাম, কিন্তু দ্বিতীয় ফোনটা তোমায় করেছিল কে? অবনীবাবু জানতে চাইল।

দিব্যেন্দুবাবু কোনো উত্তর দিলেন না। তিনিও ভাবছিলেন।

বেলা বেড়েছে। পুবের জানলা দিয়ে তির্যক রোদের আলো এসে ঘরের মেঝেতে লুটিয়ে পড়েছে। দক্ষিণের দেওয়ালে কাচের ফ্রেমে বাঁধানো একটা ছবি। দিব্যেন্দুবাবু ছবির সামনে এসে দাঁড়ালেন। বছর পঁচিশেকের একটি যুবক হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান গাইছে। পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি। বুঝলেন এই ঘনশ্যাম। ছবিতে ঘনশ্যামের চোখ দুটি কি উজ্জ্বল! মুখে অমলিন হাসি। যেন একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে দিব্যেন্দুবাবুর দিকে। দিব্যেন্দুবাবুও কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন ঘনশ্যামের চোখে চোখ রেখে।

ঘনশ্যামের চোখে কি কৃতজ্ঞতার দৃষ্টি! মুখের হাসিতে কি তৃপ্তির ছোঁয়া! কিসের কৃতজ্ঞতা? কিসের তৃপ্তি? দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন দিব্যেন্দুবাবু। মনে মনে ভাবলেন ঠিকই বলেছিল সে ফোনে। ভূত আর ভগবানকে বোধহয় চর্মচক্ষে দেখা যায় না। তাকে অনুভব করতে হয়, উপলব্ধি করতে হয়।

অগ্রহায়ণ ১৪০২

ম্যাজিশিয়ান

চন্দ্রভানু ভরদ্বাজ

ঘরের মধ্যে ঢুকতে ঢুকতে কিরণ উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, আজই প্রমাণ হয়ে যাবে সত্যি কি মিথ্যে! একেই বলে যোগাযোগ।

কিরণের কথায় ঘরের মধ্যে কিছুটা গুঞ্জন শোনা গেল। রমেশ বললে, সে যেন হবে, কিন্তু তোর যে এত দেরি হল? আমরা কখন থেকে বসে আছি।

রহস্য মাখানো হাসি হাসতে হাসতে বললে কিরণ—সেজন্যেই তো বলছি—যোগাযোগ। বলে চেঁচিয়ে উঠল—অতীন ভেতরে আয়।

আবছা অন্ধকারে আধখোলা দরজার ফাঁক দিয়ে ভিতরে ঢুকলে একটি ছেলে। দেখতে সুন্দর, ভালো স্বাস্থ্য, অথচ কেমন একটু মেয়েলি মেয়েলি নিরীহ ভাব চোখে-মুখে। সাদা শার্ট, কালো ট্রাউজার আর কাঁধে একটা ঝোলানো ব্যাগ।

কিরণ পরিচয় করিয়ে দিলে, এই হল সুজিত, রমেশ আর চঞ্চল। আর অতীন, আমার কলেজের বন্ধু।

দু'হাত তুলে নমস্কার বিনিময় করে অতীন বললে, আপনারা কেউই তাহলে ভূত কিম্বা প্রেতাত্মার কথা বিশ্বাস করেন না।

সুজিত বললে, আপনি করেন?

করি শুধু নয়, অতীন বললে—এমন প্রমাণ আমি দিতে পারি—কিন্তু তার বোধহয় প্রয়োজন হবে না। সত্যি বলতে কি আমার এখানে আসার কারণ এটাই—কিরণ আমাকে এই রাতের বৈঠকের কথা সবই বলেছে।

আসলে কিরণের কথা কেউ বিশ্বাস করেনি। ওদের চারজনের আড্ডায় সকলেই সাহসী। ভূত আছে কি নেই—এই তর্কের মীমাংসা হয়নি কোনোদিনই। শেষকালে কিরণই প্রস্তাব দিয়েছিল, একদিন প্ল্যানচেট করা হোক। সুজিত বলেছিল, ওটাই তো সবচেয়ে বড় ধাপ্পা। তবু শেষ পর্যন্ত সকলেই রাজি হয়েছিল। এবং সুজিতের কথা অনুসারে বোসপাড়া থেকে প্রায় মাইলটাক দূরে গঙ্গার ধারের এই ভাঙা পোড়ো বাড়িতে গভীর রাত্রে ব্যাপারটা ঘটবে বলে ঠিক হয়েছিল।

ঘরটা পরিষ্কার করা হলেও ঘরের মধ্যে কেমন একটা ভ্যাপসা সোঁদা সোঁদা গন্ধ—ধূপের গন্ধেও সে গন্ধ মরেনি। দেয়ালের প্লাস্টার বহুকাল ঝরে গেছে। নোনাধরা নুড়ি ইঁটের গাঁথনি দাঁত বার করে আছে। জানলার ফাঁক আছে—জানলা নেই। মাথার ওপরে কড়িকাঠ ঝুলে আছে। তবু সারা বাড়ির মধ্যে এই ঘরটাই আস্ত আছে কিছুটা। অনেক ভেবেচিন্তেই জায়গাটা বেছেছে সুজিত। ভূতের পক্ষে আদর্শ পরিবেশ।

ঘরের এককোণে টিমটিম করে জ্বলছে একটিমাত্র হ্যারিকেন, তাতে যেন অন্ধকার আরো বেড়ে গেছে। মাঝে মাঝে গঙ্গার ধার থেকে ছুটে আসা ঠান্ডা হাওয়ায় হ্যারিকেনের শিখা দপ্‌দপ্‌ করে উঠছে।

মাঝখানে জলচৌকিটা রেখে তার চারপাশ ঘিরে ওরা বসে আছে। আরো এক গোছা ধূপ জ্বালিয়ে দিলে কিরণ। কাগজ-পেন্সিলটা রাখলে জলচৌকির ঠিক মাঝখানে। বললে, এবার তবে শুরু করা যাক।

একমুহূর্ত কী যেন ভাবলে অতীন। তারপর বললে, প্ল্যানচেট করবার দরকার নেই। দেখি এমনিতেই আপনাদের কাছে কোনো প্রমাণ রাখতে পারি কিনা।

অবিশ্বাসী, উৎসুক মুখগুলোর ওপর দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিলে অতীন। আবছা হলদেটে আলোয় ওর মুখটা কেমন ফ্যাকাশে লাগল। অথচ চোখদুটো যেন জ্বলজ্বল করছে। অতীন বললে, আপনারা জানেন না, কলেজের পড়া শেষ করবার পর থেকে বিশেষভাবে এই ব্যাপারে গবেষণা করছি আমি। কলকাতা এবং আশপাশের ভূতুড়ে বাড়ি আমার নখদর্পণে। আমি ওদের গন্ধ পাই। বুঝতে পারি। কেমন করে তা বলতে পারব না। কিন্তু আপনারা হয়তো বিশ্বাস করবেন না, সত্যিই আমি বুঝতে পারি।

বলতে বলতে অতীন তার ঝোলা ব্যাগ থেকে এক টুকরো গুটনো ময়লা কাগজ বের করে রাখলে চৌকির ওপর। তারপর মৃদু হেসে বললে, আপনারা ভূত-প্রেত বিশ্বাস করেন না যখন, মন্ত্রতন্ত্রও নিশ্চয় বিশ্বাস করেন না। উত্তরের অপেক্ষা না করেই বলতে থাকলে অতীন—আমি কিন্তু করি। এই যে কাগজটা দেখছেন, এটা তুলট কাগজে লেখা একটি প্রাচীন পুঁথির অংশ। এটা আমি বহরমপুরে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোকের কাছে পেয়েছিলুম। কাগজটা মন্ত্রপূত। এটা পাবার পর থেকে আমার কাজ অনেক সহজ হয়ে গেছে।

সুজিত বললে, কোন কাজ? ভূত খোঁজা, নাকি ভূত দেখা?

তীক্ষ্ণ চোখে সুজিতের দিকে তাকিয়ে বললে অতীন, ঠিকই বলেছেন, দুটোই, তারপর আবার বললে, ভূত মানে আসলে অতীত। আমরা আমাদের অতীতকে ভয় পাই। আমার মনে হয়—

আবার বাধা দিলে সুজিত। বললে, এসব কথায় কী হবে অতীনবাবু! আমরা সকলেই এসব জানি। আপনার যদি সত্যি কিছু দেখাবার থাকে দেখান, নইলে আমরা বাড়ি চলে যাই। বাড়ি গিয়ে ঘুমুলে বরং—

অতীন আবার বড় বড় চোখ তুলে দেখলে সুজিতকে। বললে, বেশ, তাই হোক।

কাগজটা হাতে নিয়ে চোখ বন্ধ করে অতীন চুপ করে রইলে কিছুক্ষণ, যেন ধ্যান করছে। একটা প্যাঁচা কর্কশস্বরে ডেকে উঠল কোথাও। সকলেই একটু নড়ে-চড়ে বসলে। চোখ খুলে অতীন বললে, এই বাড়িতে আমি এর আগেও এসেছি। আমি জানি এ বাড়ির ইতিহাস। বছরের একটি বিশেষ দিনে এখানে এলে অনেক কিছুই দেখা যায়, শোনা যায়, আপনাদের কাছে যা অবিশ্বাস্য মনে হবে। আজকে অবশ্য সেই দিন নয়। তবু আজো আপনারা যা দেখবেন, প্রমাণ হিসেবে সে-ই যথেষ্ট।

আজ থেকে তিনশো বছর আগে এক নিরীহ নিরপরাধ লোককে কোনো কারণে এই ঘরে জ্যান্ত পুঁতে ফেলা হয়। তার আত্মা আজো প্রতিশোধের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে এখানে। এই কাগজটার ওপর সকলে হাত রাখুন—বলতে বলতে লম্বা কাগজটা অতীন বিছিয়ে দিলে চৌকির ওপর।

একে একে সুজিত, কিরণ, রমেশ আর চঞ্চল সকলেই হাত রাখলে কাগজটার ওপর। অদ্ভুত পরিবেশের জন্যই হোক বা অতীনের বলার গুণেই হোক—কেউই অতীনের কথা অমান্য করলে না।

নিশুতি অমাবস্যার রাত্রি তার কালো আঁচল বিছিয়ে দিয়েছে চারদিকে। অবিশ্রাম ঝিঁঝির ডাক আর মাঝে মাঝে প্যাঁচার ডাক ভেসে আসছে। কখনো বা দূর থেকে রাতজাগা কুকুরের ডাক শোনা যাচ্ছে।

বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেছে। কিছু একটা ঘটবে এমনি প্রতীক্ষায় সকলেই চুপচাপ বসে আছে। অথচ কিছুই ঘটেনি। অধৈর্যভাবে সুজিত বললে, দূর মশাই, কিছুই তো—

চাপা ফ্যাসফেসে গলায় অতীন বললে, চুপ, ঐ দেখুন—বলে আঙুল তুলে ঘরের একটা কোণ দেখালে।

কোথায় একটা খুলে আসা জানলার কবাট বন্ধ হবার শব্দ হল। সকলে রুদ্ধশ্বাসে ফিরে তাকালে ঘরটার কোণের দিকে। কিরণ ভয়ে ভয়ে একবার নিজের পিছনটা দেখবার চেষ্টা করলে। একরাশ অন্ধকার ছাড়া কিছুই দেখতে পেলে না।

হু হু করে রাতের গঙ্গার এক ঝলক ঠান্ডা হাওয়া ছুটে এল ঘরের মধ্যে। কে যেন ফুঁ দিয়ে হ্যারিকেনটা নিভিয়ে দিলে। কেউই কোনো কথা বললে না। শুধু চঞ্চলের গলা শোনা গেল—এই যাঃ!

চাপা ধমকের সুরে কাগজের ঘষটানির মতো গলার স্বরে অতীন বললে, চুপ করুন! কিছু দেখতে পাচ্ছেন না?

ধূপের লাল হয়ে জ্বলা অংশগুলো শুধু দেখা যাচ্ছে চাপ চাপ অন্ধকারের মধ্যে। হঠাৎ সেই কোণের দিকের অন্ধকারের পর্দা যেন দুলে উঠল। আস্তে আস্তে ফিকে হয়ে এল অন্ধকার। ঘরের মেঝের দিক থেকে যেন কিছুটা কুয়াশা উঠে এল ওপরের দিকে, মিলিয়ে গেল মিশকালো অন্ধকারে। খুব মৃদু সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ল সারা ঘরে, ভ্যাপসা গন্ধ আর ধূপের গন্ধ ছাপিয়ে যেন খুব দামি আতর মেখেছে কেউ। তার ঠিক পরে পরেই সকলের নাকে এল কদর্য এক কটু গন্ধ।

ঘরের মধ্যে কারো মুখে কোনো কথা নেই। এই অপার্থিব আশ্চর্য পরিবেশে সকলেই চুপ করে গেছে। সবচেয়ে বড় অবিশ্বাসী সুজিত পর্যন্ত যেন বুঝতে পারছে না কী ঘটছে।

ঠিক এই সময়েই হঠাৎ সমস্ত নিস্তব্ধতাকে ভেঙেচুরে বহুদূর থেকে কার যেন কান্নার শব্দ ভেসে এল। কোনো লোক প্রচণ্ড যন্ত্রণায় গুমরে গুমরে কাঁদছে। সেই কান্নার শব্দ কমা-বাড়া হতে হতে সারা ঘরময় ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

অদ্ভুত এক ভয় ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করে ফেলছে চার বন্ধুকে। অতীনের কোনো সাড়া নেই। ওরা এখনো হাত দিয়ে রেখেছে সেই মন্ত্রপূত কাগজটার ওপর। সে হাত ওরা যেন কোনো দিন নাড়তে পারবে না।

ওরা সামনের দিক থেকে চোখও যেন সরাতে পারছে না। ফিকে ধূসর অন্ধকারে ওরা দেখলে সেই কোণের মেঝেটা একটু একটু করে ফাঁক হয়ে যাচ্ছে। সেই ফাঁকের মধ্যে থেকে উঠে আসছে একটুকরো ঘন অন্ধকার। ঘন অন্ধকারটুকু রূপ নিল এক বিচিত্র বীভৎস মূর্তিতে। যেন একটা কংকালের ওপর শুকনো চিমসে চামড়ার মোড়ক। কোটরাগত চোখদুটোতে দৃষ্টি নেই—সামনের দিকে দু'হাত বাড়িয়ে সেই বীভৎস মূর্তি উঠে দাঁড়াল বাদামি কুয়াশার মধ্যে। আর উৎকট এক ভীষণ আর্তনাদ ছড়িয়ে পড়ল সারা পোড়ো বাড়িটাকে কাঁপিয়ে দিয়ে। সে চিৎকার কোনো মানুষের নয়। অমানুষিক সেই ভয়ানক শব্দ ফিরে ফিরে আসতে লাগল বার বার।

মূর্তিটা এক পা এক পা করে এগিয়ে আসছে এদের দিকেই।

সুজিত সাহসী ঠিকই, কিন্তু এমনি একটা অস্বাভাবিক পরিবেশে সুজিতের শিরদাঁড়ার মধ্যে দিয়ে ভয়ের এক ঠান্ডা কাঁপুনি নেমে গেল। ওর ঠিক পাশেই বসেছিল চঞ্চল। চঞ্চলও ভীতু নয়, কিন্তু হঠাৎ অস্ফুটে গোঁ গোঁ একটা আওয়াজ করে চঞ্চল গড়িয়ে পড়ল মাদুরের ধারে। চিৎকার করে উঠল রমেশ। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে যেন একটা ঘূর্ণিঝড় বয়ে গেল পোড়োবাড়ির সেই ভাঙাঘরে।

কতক্ষণ এভাবে কেটেছে ওরা জানে না। সবচেয়ে আগে নিজেকে সামলাতে পারল সুজিতই। উঠে বসে পকেট হাতড়ে টর্চটা বার করলে সে। অন্ধকারের পুরু চাদরের তলায় সবকিছু ঢেকে আছে।

গঙ্গার দিকে জানলা দিয়ে একফালি আকাশ দেখা যাচ্ছে। আকাশে বোধহয় মেঘ করেছে। মেঘের দিকে তাকিয়েই সুজিতের মনে পড়ল বীভৎস মূর্তিটার কথা। আরেকবার ওর শরীরটা কেঁপে উঠল। শরীরের সব শক্তি এক করে টর্চটা জ্বেলে ফেললে সুজিত। চৌকিটা উল্টে গেছে। একপাশে চিৎ হয়ে পড়ে আছে চঞ্চল। অজ্ঞান হয়ে গেছে নিশ্চয়, মুখ দিয়ে গেঁজলা উঠছে। পাশেই মুখ থুবড়ে পড়ে আছে রমেশ। চৌকির আরেকদিকে অতীন বসে আছে ধ্যানস্থ মূর্তির মতো।

এদের দেখে সুজিতের ভয়ের ভাবটা অনেকটা কেটে গেল। টর্চটা ঘুরিয়ে দেখলে সারা ঘরটাই ফাঁকা—কুয়াশাও নেই, সে মূর্তিও নেই, মেঝেতে কোনো ফাঁকও নেই। টর্চের আলোয় ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে কয়েকটা বাদুড় উড়ে বেরিয়ে গেল কড়িকাঠের দিক থেকে। নিশ্চয় ওদের স্থায়ী আস্তানা

এটা। দরজার দিকে আলোটা ফেলতেই সুজিত দেখলে কিরণ দু'হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে বসে বসে কাঁপছে থরথর করে। সুজিত উঠে গিয়ে ডাকলে—অ্যাই কিরণ—কিরণ—

প্রচণ্ড ভয়ে কিরণ বোবা হয়ে গেছে। মুখ তুলে তাকালে কিন্তু কোনো কথা বললে না। এতক্ষণে সুজিত পুরো সাহস ফিরে পেয়েছে। কিরণকে ধরে প্রচণ্ড জোরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললে, ওঠ, ওঠ—ওরা অজ্ঞান হয়ে গেছে! কিরণ সম্বিত ফিরে পেয়ে বললে, কী হয়েছে?

টর্চের আলোয় দেশলাইটা খুঁজে পেয়ে ঘরের কোণে রাখা হ্যারিকেনটা জ্বাললে সুজিত। তারপর বোতল থেকে জল নিয়ে কিছুক্ষণ ঝাপটা দিতেই চঞ্চল আর রমেশের জ্ঞান ফিরে এল। ওদের হতভম্ব ভাবটা কেটে গেল আস্তে আস্তে।

ততক্ষণে মুখে মৃদু হাসি নিয়ে চোখ খুলে নড়ে-চড়ে বসলে অতীন। মিষ্টি গলায় বললে, আপনাদের এখানে আসাই উচিত হয়নি।

সকলেই অপ্রস্তুত হল। কোনো উত্তর দিলে না। অতীন উঠে দাঁড়াল। বললে, আসল ঘটনাটাই তো আপনারা জানতে পারলেন না—তার আগেই—

চঞ্চল বাধা দিয়ে বললে, আর জানবার দরকার নেই মশাই। খুব হয়েছে।

রমেশ বললে, আমিও। অনেক হয়েছে। এর পরেও দেখবার কিছু ছিল নাকি অতীনবাবু?

দরজার দিকে এগোতে এগোতে অতীন বললে, নিশ্চয়। দেখবার ছিল বৈকি।

কিরণ বললে, অতীন, তুই নিজে ভালো মিডিয়াম ছিলিস, একথা জানতুম। কিন্তু এমন ভেল্কি দেখাবি ভাবিনি। ভাগ্যিস ভয় পেয়েছিলুম—নইলে এতক্ষণে ও নিশ্চয় আমাদের ঘাড় মটকে দিত!

হো হো করে হেসে উঠলে অতীন—দূর—তোরা দেখছি সত্যি ভীতু। আমি যতক্ষণ সঙ্গে আছি, কেউ তোদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

কথা বলতে বলতে ওরা পোড়োবাড়ির চৌহদ্দি পেরিয়ে এল।

সুজিত এতক্ষণ কোনো কথা বলেনি। এখন মেঘলা আকাশের দিকে তাকিয়ে বললে, সত্যি বলতে কি, ঘরের ভিতরে তখন ভয় পেয়েছিলুম, এখন খোলা আকাশের নীচে একটুও ভয় করছে না।—বলেই হঠাৎ নাটকীয় ভঙ্গিতে অতীনের দিকে ফিরে বললে, গুরুদেব লোক ভাই আপনি, পায়ের ধুলো দিন! শুনেছি, পি সি সরকার এমনিভাবে সম্মোহন করতে পারতেন। আপনি আমাদের মতো চার চারটে জোয়ান ছেলেকে হিপনোটাইজ করে একেবারে শুইয়ে দিলেন? কেন মিথ্যে মিথ্যে ভূতের পিছনে ঘুরছেন—তার থেকে ম্যাজিক শো করলে সারা দেশে নাম ছড়িয়ে পড়ত আপনার!

অতীন কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, অতীনকে থামিয়ে দিয়ে কিরণ বললে, ঠিক বলেছ সুজিত। ও কিন্তু সত্যি ম্যাজিক জানে। কলেজে শো-ও করেছিল একবার।

আত্মতৃপ্তির হাসি হেসে সুজিত বললে, চেহারা আর কথা বলবার কায়দা দেখেই আমি ধরেছি। এ হিপনোটিজম না হয়েই যায় না। এমন গুণী ছেলের সঙ্গে আগে পরিচয় করাসনি কেন, কিরণ?

কিরণ বললে, খোঁজখবরই তো ছিল না। আমরা যে এখানে চলে এসেছি তাই অতীন জানত না। সেই কলেজ ছাড়বার পর এই গত কালকে ওর সঙ্গে দেখা। পাক্কা তিন বছর। ওকে বললাম তোমাদের কথা। ও এক কথায় রাজি হয়ে গেল। বললে, এ জায়গাটা চেনে—মোটর সাইকেলে আসতে বড়জোর মিনিট কুড়ি লাগবে, সময়মতো পৌঁছে যাবে।

মোটরবাইকে এসেছেন অতীনবাবু, কোথায় রেখেছেন বাইক?

কেমন অন্যমনস্কভাবে অতীন বললে, ব্রেকটা গোলমাল করছিল, বাইকটা রেখেছি ইঁটখোলার পাশে।

সে কি? এখানে তো জনমানব নেই—বাইকটা খামোকা ওখানে রেখে এলেন কেন?

উপায় ছিল না। বলে বেশ গম্ভীরভাবে অতীন বললে, আপনি বিশ্বাস করছেন না সুজিতবাবু—আমি কিন্তু আপনাদের সম্মোহন করিনি। যা সত্যি তাই দেখেছেন আপনারা।

দূর—অতীনের কথা একেবারেই উড়িয়ে দিলে সুজিত—কেন মিথ্যে বলছেন? এত ভালো ম্যাজিশিয়ান আপনি, সেটা স্বীকার করতে আপত্তি কিসের?

ওরা সামনের মোড়টা পেরিয়ে গেল। রাস্তাটা একেবারেই ফাঁকা। মেঘলা আকাশের আলোয় সবকিছু একরকম দেখা যাচ্ছে। আরো বেশ কিছুটা গিয়ে জি টি রোড।

হঠাৎ অনেকগুলো কুকুরের সমবেত ডাকে ওরা সকলেই চমকে উঠল। একটু দূরে পরিত্যক্ত ইঁটখোলার পাশে পথের ওপর পড়ে থাকা কিছু একটা ঘিরে কুকুরগুলো ডাকছে আর জিনিসটা নিয়ে খামচা-খামচি করছে।

কী বল তো? কিরণ বললে।

সুজিত টর্চটা জ্বেলে ছুটে গেল কুকুরগুলোর দিকে। সুজিতের পিছনে পিছনে বাকি সকলে। মানুষ দেখে কুকুরগুলো সরে গেল। একটা লোক মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। লোক নয়—লাশ। জমাটবাঁধা কালচে চাপ চাপ রক্ত শুকিয়ে আছে রাস্তার ওপর। কুকুরগুলো অনেক জায়গাতে কামড় বসিয়েছে। রাস্তার ধারে বিশাল অশ্বত্থ গাছের গুঁড়ির পাশে দোমড়ানো-মোচড়ানো একটা মোটরবাইক পড়ে আছে।

একি রে?—বলতে বলতে নিচু হয়ে লাশটাকে উল্টে দিলে সুজিত আর চমকে উঠে অস্ফুট আর্তনাদ করে ছিটকে পিছিয়ে এল। কিরণ দু'হাতে মুখ ঢেকে বললে, এ যে অতীন!

অশ্বত্থ গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে থ্যাঁতলানো বাইকটার পাশে দাঁড়িয়ে অতীন হাসছে!

জ্যৈষ্ঠ ১৩৯২

ভূত মানেই ভয়ঙ্কর নয়

ডাঃ অরুণ কুমার দত্ত

অভীক থাকে উত্তর কলকাতার বিধান সরণীতে। সে কিন্তু দক্ষিণ-পূর্ব কলকাতার এক নামজাদা স্কুলে ক্লাস সেভেনে পড়ে। সেবার ক্লাসের বার্ষিক পরীক্ষা দিয়ে অভীক তার মামাবাড়ি টালিগঞ্জে বেড়াতে এসেছিল। ইচ্ছে ছিল সেখানে কিছুদিন থাকবে।

সেদিন অভীক গিয়েছিল কাঁকুলিয়া রোডে, তার সহপাঠী সায়ম রায়চৌধুরীর বাড়িতে। সন্ধ্যার দিকে তাদের স্কুলের ক্লাস এইটের ছাত্র সৌনক মুখার্জি সায়মের বাড়িতে এল। কিছুক্ষণ গল্পগুজব করে সৌনক সায়মকে বাড়ির বাইরে ডেকে আনল। সায়মদের বাড়ির পাশে একটা বস্তি ছিল। সায়মরা সেদিক দিয়ে যাতায়াত করত না। বাড়ি থেকে বেরিয়ে বিপরীত দিকের রাস্তা ধরে তারা পাড়ার রেশনের দোকানের কাছে এসে পৌঁছল। সেখানে দাঁড়িয়ে সৌনক জানাল, তাদের স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষার ফল বেরিয়ে গিয়েছে। সায়ম, সৌনক ভালো ফল করলেও অভীক কিন্তু পাশ করতে পারেনি।

খবরটা শুনে অভীকের মুখ শুকিয়ে আমসি হয়ে গেল। সে হন হন করে তার মামার বাড়ির উদ্দেশ্যে হাঁটা দিল। সায়ম পেছন থেকে চেঁচিয়ে উঠল, অভীক শোন...শোন...পরীক্ষার ফল আবার যাচাই করা হবে। মন খারাপ করিস না। কিন্তু অভীক আর দাঁড়াল না।

মামার বাড়িতে এসে কোনোরকমে হাত-মুখ ধুয়ে অভীক বেরিয়ে পড়ল। মামীমা পেছন থেকে ডাকল, অভীক, না খেয়ে কোথায় যাচ্ছিস? ফিরতে রাত করিস না।

অভীক উদ্দেশ্যহীনভাবে এ রাস্তা ও রাস্তায় ঘুরতে লাগল। ক্রমে রাত বাড়ল। বৃষ্টিও শুরু হল। এক সময় অভীক আবিষ্কার করল, সে টালিগঞ্জের আদিগঙ্গার কাছে একটা গাছের নীচে দাঁড়িয়ে আছে। বৃষ্টির জন্য লোক চলাচল কমে গেছে, রাস্তাটা কেমন নির্জন। অভীক এ অঞ্চলের বাসিন্দা নয় বলে রাস্তাঘাট চিনত না। আদিগঙ্গার ঘোলা জলের দিকে তাকিয়ে তার মনে পড়ল যখন প্রথম সে আদিগঙ্গার নাম শুনেছিল তখন ভেবেছিল, এটা বোধহয় এককালে আসল গঙ্গা ছিল। পরে কিন্তু জেনেছিল, স্থানীয় পাণ্ডারা এই নামকরণ করেছে। আসলে টালি নামে এক ইংরেজ ইঞ্জিনিয়ার মাল পরিবহনের জন্যে এই খাল কেটেছিলেন। সেই টালি সাহেবের নাম থেকে টালিগঞ্জ নামকরণ হয়েছে। এসব সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে, অভীক ডাঙা থেকে নেমে গঙ্গার ধারের ভিজে মাটি ধরে হাঁটছিল।

হঠাৎ নিজের নাম শুনে অভীক চমকে উঠল। জলে দাঁড়িয়ে কেউ বলছে, অভীক, এত রাত্তিরে কোথায় যাচ্ছ?

উদ্‌ভ্রান্তের মতো চোখ তুলে অভীক প্রশ্নকর্তার দিকে তাকাল। মিশকালো লোকটার গায়ের রং রাতের অন্ধকারের সঙ্গে মিশে গিয়েছে। পরনে সাদা ধুতি আর উত্তরীয়। গলায় উপবীত ঝুলছে।

অভীক আনমনে উত্তর দিল, কোথায় যাচ্ছি জানি না; কিন্তু আপনি কে? আপনি আমার নাম জানলেন কি করে?

অভীকের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে লোকটি আবার বলে উঠল, অভীক, পরীক্ষার রেজাল্ট খারাপ হয়েছে বলে মুষড়ে পড়ো না। অনেকেই জীবনে ওভাবে অকৃতকার্য হয়েছেন। পরে সাধনা আর অধ্যবসায়ের জোরে তাঁরা আবার বড় হয়েছেন। তুমি আমার কথাগুলো মন দিয়ে শোন। তুমি এখান থেকে সোজা পশ্চিম দিকে চলে যাও। পথে যে যেখানে যা প্রস্তাব দেয়, তা মেনে নিও। আমার কথা শুনলে আখেরে তুমি সুখী হবে।

অভীক ততক্ষণে ধাতস্থ হয়েছে। পারিপার্শ্বিক অবস্থা তখন অনুধাবন করতে পারছিল। সে একি

করছে? কোথায় চলেছে? তার মনে এতক্ষণ বাদে ছায়া ছায়া ভয় নামল। কাঁপা গলায় অভীক জিগ্যেস করল, কিন্তু আপনি কে? এত রাত্তিরে জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে আপনি কি করছেন?

অভীকের প্রশ্ন শুনে, অন্ধকারের মধ্যে সেই লোকটির সাদা দাঁতগুলো ঝকঝক করে উঠল। শান্ত, মধুর কণ্ঠে লোকটি বলে উঠল, আমি ভূত.....ভূত মানে কী অভীক?

অভীকের আর ভয় করছিল না। এই অদ্ভুত ভূতের কথাবার্তা শুনে তার মনে সাহস আর আস্থা ফিরে এসেছিল। অকম্পিত গলায় অভীক উত্তর দিল, ভূত মানে অতীত অর্থাৎ যা ঘটে গিয়েছে। আর ভবিষ্যৎ মানে যা ঘটবে।

শান্ত, উদাত্ত কণ্ঠে ভূতটি বলে উঠল, সঠিক উত্তর দিয়েছ অভীক। আমি বেশ কিছুদিন আগে মারা গিয়েছি। যদিও একদিন আমি এই পৃথিবীতে ছিলাম। ফের বলছি—আমার কথাগুলো যদি অক্ষরে অক্ষরে পালন করো, তাহলে আমার বরে তুমি সুখী হবে। আজ রাত্তিরে তোমাকে যে যা প্রস্তাব দেবে তুমি তা পালন করবে। কথাগুলো বলে মিশকালো ভূতটি অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

অভীক আর দাঁড়াল না। পশ্চিম দিক ধরে সে হাঁটতে শুরু করল। রাস্তার ওপারে একটা ঝাঁকড়া গাছের তলায় তিনজন লোক দাঁড়িয়েছিল। অভীককে একলা এভাবে আসতে দেখে, তারা চঞ্চল হল। নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে পরামর্শ করে তিনজনের মধ্যে একজন এগিয়ে এসে জিগ্যেস করল, খোকা, এত রাত্তিরে তুমি একলা কোথায় চলেছ?

কোনো দ্বিধা না করে অভীক চটপট উত্তর দেয়, আজ আমার স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে। আমার রেজাল্ট ভালো হয়নি। তাই কিছু না বুঝে গঙ্গার জলের ধারে গিয়েছিলাম।

ওহ্হো!—এতক্ষণে পুরো ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছি। কথাগুলো বলে তিনজন হেসে উঠল। অন্য একজন জিগ্যেস করল, খোকা তোমার নাম কী? অভীক নাম বলতে সে প্রস্তাব দিল, তুমি আমাদের কাজে যদি সাহায্য করো, তাহলে আমরা তোমাকে আমাদের ভাগের কিছুটা দেব।

অভীক চুপ করে শুনে যাচ্ছিল। লোকটি বলে চলে, ওই যে কোণের পাঁচিলঘেরা বাড়িটা দেখছ, ওই বাড়িটায় আজ আমরা ঢুকতে চাই। তোমাকে আমরা পাঁচিলের ওপর তুলে দেব। তুমি লাফ দিয়ে নীচে পড়ে, ভেতরে ঢুকবে। তারপর ডান দিকের করিডর দিয়ে এসে খিড়কির দরজা খুলে দেবে। আমরা বাড়ির ভেতর ঢুকে কাজকর্ম চালিয়ে চুপচাপ ফিরে আসব। বাইরে বেরিয়ে তোমাকেও আমাদের ভাগের কিছু দেব।

তীক্ষ্ণকণ্ঠে অভীক উত্তর দিল, তার মানে তোমরা সবাই চোর? চুরির বখরা আমি কখনও নেব না। আচমকা অভীকের সেই ভূতের কথা মনে পড়ল। ভূত বলেছিল, আজ রাত্তিরে কারোর প্রস্তাব ফিরিয়ে দিও না। ইতস্তত করে অভীক আবার বলল, তাছাড়া আরও একটা ব্যাপার আছে। দোতলার ওদিকের ঘরে আলো জ্বলছে। বাড়ির ভেতর আমাকে দেখতে পেলে কেউ ছেড়ে কথা বলবে না।

অভীকের যুক্তি শুনে তিনজনের একজন নিম্নস্বরে বলল, না না, তোমার কোনো ভয় নেই। পাকা খবর না নিয়ে আমরা প্রোগ্রাম করি না। বাড়ির সবাই পুরীতে বেড়াতে গিয়েছে। যে ঘরে আলো জ্বলছে সেখানে একজন লেখক পেয়িং গেস্ট হয়ে থাকে। রাতদিন বই পড়ে, প্লট ভাবে আর লেখে। কারুর কোনো খোঁজখবর রাখে না। তুমি নিশ্চিন্তে বাড়ির ভেতর ঢুকে, আমাদের উপকারটুকু করে চলে যেও।

ভূতের কথা ভেবে অভীক আর দ্বিধা করল না। পাঁচিল টপকে সে বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়ল। তারপর সিঁড়ির মুখে এসে থমকে দাঁড়াল। ওপর থেকে গুনগুন করে কেউ গাইছে—মুক্ত কর ভয়। নিজের পরে করিতে ভর না রেখ সংশয়।

অভীকের আর খিড়কির দরজা খোলা হল না। কবিগুরুর গান তাকে ওপরের দিকে টেনে নিয়ে চলল। পায়ে পায়ে সিঁড়ি বেয়ে অভীক ঘরের দরজার মুখে এসে দাঁড়াল। বছর চল্লিশের এক ভদ্রলোক খাতা খুলে কিছু লিখছিলেন। কলমটা ধরে ভাবছেন। ঘরের বইয়ের তাকে অভীকের পরিচিত একগাদা গল্পের বই।

হঠাৎ ভদ্রলোক অভীককে দেখতে পেয়ে চমকে উঠে জিগ্যেস করলেন, কে তুমি? এখানে কী করে এলে?

নিঃসঙ্কোচে এগিয়ে এসে অভীক তার নাম ও পুরো ব্যাপার খুলে বলল। পরীক্ষার রেজাল্টের কথা, ভূতের কথা, এমনকি চোরের কথা কিছুই সে লুকোল না। অভীকের কথা শুনতে শুনতে ভদ্রলোকের চোখ দুটো বড় হয়ে উঠল। সব শুনে তিনি হেসে বললেন, আমার নাম নিরূপ মিত্র। আমি বেলুড়ের এক কলেজে ইতিহাস পড়াতাম। এখন অবসর নিয়ে গল্প আর নাটক লিখি। প্লট খুঁজে পাচ্ছিলাম না। তুমি মূর্তিমান দেবদূতের মতো এসে, আমাকে গল্পের ভালো প্লট দিয়ে গেলে। যাকগে চোরগুলো এখন কোথায়?

অভীক মৃদু কণ্ঠে বললে, নীচে দাঁড়িয়ে আমার জন্যে অপেক্ষা করছে।

চোয়াল শক্ত করে নিরূপ বলেন, ওদের একটা ব্যবস্থা করা উচিত। তারপর তোমার কথা ভাবব। কথাগুলো বলে টেবিল থেকে মোবাইল ফোনটা তুলে নিরূপ টালিগঞ্জ থানায় ফোন করেন। কিছুক্ষণের মধ্যে নীচে একটা গাড়ি থামার শব্দ পাওয়া গেল। তারপর ভীত, উত্তেজিত কণ্ঠস্বর ভেসে এল, পুলিশ এসেছে, পালা পালা।

নিরূপ নীচে গিয়ে খিড়কি-দরজা খুলে দেন। ততক্ষণে তিনজন চোরকে পাকড়াও করে পুলিশ-ভ্যানে তোলা হয়েছে। পুলিশ অফিসার গটগট করে ওপরে এসে প্রশ্ন করলেন, হোয়ার ইজ দ্যাট ওয়ান্ডার বয়?

অভীকের পিঠ চাপড়ে বললেন, আমি এখনই তোমার মামার বাড়িতে ফোন করছি। চন্দ্রমণ্ডল লেন থেকে তোমার মামা মিঃ বোস, তোমাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না বলে থানায় ডায়েরি করে গিয়েছেন।

অভীক তার মামার বাড়িতে ফিরে এল। খবর পেয়ে তার মা-বাবা উত্তর কলকাতা থেকে মামার বাড়িতে সে রাত্তিরেই চলে এলেন। পরে জানা গেল, অভীকের পরীক্ষার রেজাল্টে ভুল ছিল। আসলে সে ভালোভাবেই পাশ করেছে। এর পরের পরীক্ষাগুলোয় অভীক আশাতীত ভালো ফল করে পাশ করতে লাগল। তার এই বিস্ময়কর উন্নতিতে সবাই অবাক হলেও, নিরূপ মিত্র কিন্তু হননি। অভীক কারোর কাছে কিন্তু গঙ্গার ধারের সেই ভূতের কথা ভাঙেনি।

ফাল্গুন ১৪০৯

জাতিস্মর ভূত

প্রিয়রঞ্জন মৈত্র

মাথাটা লাট্টুর মতো সাত পাক ঘুরিয়ে পিপিং বলল, এমন ব্যবস্থা করব যে আর কোনোদিন আমাদের অপমান করতে সাহস পাবে না মানুষের ছেলেগুলো।

লেংকু তার ঠ্যাংয়ের একটা আঙুলকে চুয়িং-গামের মতো চিবোতে চিবোতে বলল, আসলে ওরা কোনোদিন ভূত-পেত্নি দ্যাখেনি, তাই আমরা যে সত্যিই আছি বিশ্বাস করে না। যদি একবার—

ওকে থামিয়ে দিয়ে হাড়ে হাড়ে শব্দ তুলে খটখটি বলল, নিজেরা না দেখুক, বইতে তো পড়েছে। আমাদের নিয়ে তো অনেক বই লিখেছে মানুষরা।

লেংকু এবার বলল, ওদের বইতে যা লেখা রয়েছে তার প্রায় সবটাই আজেবাজে। এই তো সেই সেদিন বেড়াতে বেড়াতে যখন মুখুজ্জে বাড়ি গিয়েছিলাম তখন সেই বাড়ির ছেলেটা তার বোনকে একটা গল্প পড়ে শোনাচ্ছিল। গল্পটা আমাদের নিয়েই, কিন্তু এমন লিখেছে যে হাসতে হাসতে মরে যাই আর কি! তা ওসব অবাস্তব গল্প সাহসী ছেলেরা বিশ্বাস করবে কেন?

পিপিং বলল, বিশ্বাস করুক না করুক, তাই বলে অপমান করবে? বলবে ভূত-টুত কিছু নেই, সব বুজরুকি? একটা ছেলে আবার বলে কিনা, যদি সত্যিই কোনো ভূত দেখতে পেতাম তো তাকে চেন দিয়ে বেঁধে কুকুর পোষার মতো পুষতাম। কী সাংঘাতিক কথা! কী অপমান—

ভূতদের এইসব কথাবার্তার মাঝখানে আগের ঘটনাটুকু বলি।

ঝন্টু, দীপু, হরি, জয়—এরা সবাই ঠাকুরপাড়ার ছেলে। প্রতিদিনই স্কুল-মাঠে খেলতে যায় ওরা। ফেরে সন্ধ্যার সময়।

গতকাল খেলা শেষে ময়নাপাড়ার সঙ্গে ফুটবল ম্যাচের ব্যাপারে আলোচনা করতে করতে ফিরছিল। সবার আগে হাঁটছিল হরি।

কামারপাড়া ছাড়িয়ে মাটির রাস্তাটা গিয়ে উঠেছে খালের ওপরে কাঠের পোলটায়। পোলটার আগে একটা বহুদিনের বটগাছ।

ওই বটগাছের কাছাকাছি এসেই থমকে দাঁড়িয়েছিল হরি। সে দাঁড়াতেই দাঁড়িয়ে পড়েছিল দলের আর সবাই।

একদিন আগে ওই বটগাছেই গলায় দড়ি দিয়েছিল হারুর বাবা মতি। মতির সেই জিভ বেরিয়ে আসা বীভৎস মুখটা মনে পড়তেই ভয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল হরি।

দীপু জিগ্যেস করেছিল, কিরে দাঁড়ালি কেন?

হরি বলেছিল, ওই গাছে ভূত আছে।

দীপু বলেছিল, ধুৎ, ভূত-টুত বলে কিছু নেই। ওসব বুজরুকি।

জয় বলেছিল, ঠিক বলেছিস।

ঝন্টু বলেছিল, আমি যদি সত্যিই কোনো ভূত দেখতে পেতাম তো তাকে চেন দিয়ে বেঁধে কুকুর পোষার মতো পুষতাম।

ওরা যখন এই রকম কথাবার্তা বলছিল তখন পিপিং নামে ভূতটা ঠ্যাং দিয়ে বটগাছের একটা ডাল আঁকড়ে ধরে মাথা নিচু করে দোল খাচ্ছিল।

ওদের কথা শুনে রেগে গিয়েছিল সে। একবার ভেবেছিল তাড়া করে ছেলেগুলোকে। কিন্তু ঠিক

সাহস পায়নি। যদি সত্যিই ধরে নিয়ে গিয়ে চেন দিয়ে বেঁধে রাখে? মানুষকে বিশ্বাস নেই।....ছুটে চলে এসেছিল ওদের আস্তানা হাজিরগড়ে।

হাজিরগড় বলতে একটা ছোট্ট টিলার মতো। যার ওপরে ঝোপঝাড় আর ভাঙাচোরা ইট-পাটকেল ছড়ানো-ছিটানো। একটা বড় বেলগাছও রয়েছে সেখানে। যে গাছে কোনোদিন বেল ফলেনি।

গতকাল পিপিং ঘটনাটা বলেনি কাউকে। ওই ভয়ে পালিয়ে আসার জন্য যদি অন্য সব ভূতেরা তাকে ভীতু বলে, ছি-ছি করে?

যাই হোক, আজ আর চেপে থাকতে পারেনি। বলে ফেলেছে বন্ধুদের কাছে। তারপর তাদের মধ্যে কি কি কথা হচ্ছিল সেগুলো আগেই বলেছি।

কিছুক্ষণ পরামর্শ করে পিপিং, লেংকু আর খটখটি ঠিক করল, আজ যখন খেলে ফিরবে ঠাকুরপাড়ার ছেলেরা তখন ওরা এমন ভয় দেখাবে যে আর কোনোদিন ভূতদের হেলাফেলা করতে সাহস পাবে না।

সব ঠিকঠাক করে সন্ধ্যার আগেই ওরা গেল সেই বটগাছতলায়। একজন উঠল গাছে। অন্য দুজন লুকিয়ে রইল ধানক্ষেতে।

ঠাকুরপাড়ার ছেলেরা আজও একসঙ্গে ফিরছিল। বটগাছের কাছে এসে গতকালের মতোই থমকে দাঁড়াল হরি। বলল, গা-টা কেমন ছমছম করছে রে।

ওর পিঠে একটা চাপড় মেরে দীপু বলল, তুই এক নম্বরের ভীতু। বলেছি না ভূত-টুত বলে কিছু নেই। ওসব বুজরুক—

ওর কথা শেষ হল না। সকলেই চমকে উঠল তিনটি অদ্ভুত মূর্তি দেখে। তিনটি মূর্তিরই চোখগুলো জ্বলছে-নিভছে। আর একই সঙ্গে হাসছে তারা—খিঁক্-খিঁক-খিঁক-খিঁক্—। আকাশ-বাতাস কাঁপানো হাসি।

হাসি থামিয়ে এক ছায়ামূর্তি বলল, আঁমরাঁ বুঁজরুঁক? আঁমাদেঁর চেঁনে বেঁধে রাঁখবি? আঁয়, নেঁ বাঁধ দেঁখিঁ—

ঝন্টু-দীপু-জয়-হরির দিকে এগিয়ে আসতে লাগল অদ্ভুত কিম্ভুত দেখতে পিপিং, লেংকু আর খটখটি।

এতক্ষণ ও অবাক চোখে ওদের দেখছিল ঠাকুরপাড়ার ছেলেরা। যখন দেখল খুবই কাছে এসে পড়েছে তখন পড়ি-মরি করে ছুটল সকলে। ছুটতে ছুটতেই আবার সেই আকাশ-বাতাস কাঁপানো বিচ্ছিরি হাসি শুনতে পেল—

খিঁক-খিঁক-খিঁক-খিঁক—

ওর মধ্যে হঠাৎ দীপু শুনতে পেল কোনো এক ভূত তার নাম ধরে ডাকছে। বলছে, দীপুঁ-দীপুঁ-পাঁলাঁস নে, পাঁলাঁস নেঁ, আমি তোঁর—

শেষে কী যে বলল ভূতটা শুনতে পেল না দীপু—

ঠাকুরপাড়ার ছেলেরা পালিয়ে যাবার পর পোলটার কাছে ভাঙা দোকানটার পেছনে হঠাৎ হাত-পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসল পিপিং। কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগল, হায়, এ কি করলাম, দীপুর যে মৃগীরোগ আছে। ভয় পেয়ে যদি ওর রোগ বেড়ে যায় তবে কী হবে? হায়-হায়-হায়, এ কী করলাম আমি—

পিপিংয়ের কথা শুনে অবাক হল লেংকু, খটখটি। ওরা যত থামাতে চায় পিপিংকে ততই কাঁদে সে। ওরা বুঝতে পারছে না আসলে কী বলতে চাইছে পিপিং।

ওরা ভাবল, নিশ্চয়ই মাথা খারাপ হয়েছে পিপিংয়ের। নইলে এসব আবোল-তাবোল বকবে কেন? এখুনি ওকে বিছুটি পাতার রস খাওয়ানো দরকার। বিছুটি পাতার রস পাগল ভূতদের মহৌষধ। তবে ওই রস সহজে খেতে চায় না কেউ। ভীষণ ভয় পায়।

লেংকু খটখটিকে বলল, চল রে খটখটি, বগলদাবা করে নিয়ে যাই পিপিংকে। ওকে বোধহয় বিছুটি পাতার রস খাওয়াতে হবে।

বিছুটি পাতার কথা কানে যেতেই কান্না থামিয়ে উঠে দাঁড়াল পিপিং। বলল, আমি পাগল হইনি রে। হঠাৎ গতজন্মের কথা মনে পড়ে গেছে আমার। গতজন্মে আমার নাম ছিল তারাপদ। বাড়ি ছিল ঠাকুরপাড়ায়। বাড়িতে আমার মা, বউ, ভাই, ভাই-বউ সবাই ছিল। হয়তো এখনো আছে। আমি নারকেল পাড়তে গিয়ে গাছ থেকে পড়ে গিয়ে মরেছিলাম। ওই যে ছেলেগুলো—ওর মধ্যে একটা ছেলের নাম দীপু। ও আমার ভাইপো। আজ হঠাৎ চিনে ফেলেছি ওকে।

খটখটি বলল, তোর মাথাটা সত্যিই খারাপ হয়ে গেছে রে পিপিং। গতজন্মে কে কী ছিল বলতে পারে কেউ? চল-চল, বাড়ি চল।

গড়ে ফিরতে ফিরতে গতজন্মের আরো অনেক কথা বলতে লাগল পিপিং। তবে তার কোনো কথাই বিশ্বাস করল না লেংকু-খটখটি। তারা গিয়ে এ অঞ্চলের ভূতদের ডাক্তার জিরজিরেকে বলল সব।

জিরজিরে বলল, সবে পাগলামিতে ধরেছে। এখন থেকেই বিছুটি পাতার রস খাওয়ালে অল্পেই সেরে যাবে।

পিপিংয়ের প্রবল বাধাদান সত্ত্বেও ওকে জোর করে বিছুটি পাতার রস গেলানো হল। সেই রস খেয়ে ছটফট করতে লাগল পিপিং। কাঁদতে কাঁদতে বলল, আমি পাগল হইনি। আমার কথা সত্যি কি মিথ্যে ঠাকুরপাড়ায় গেলে প্রমাণ পাবে তোমরা।

কিন্তু ওর কোনো কথাই গ্রাহ্য করল না কেউ। পরদিনও আবার জোর করে বিছুটি পাতার রস গেলাল।

পিপিং ভাবল, এখান থেকে না পালালে বাঁচবে না সে। কিন্তু কোথায় যাবে? অনেকক্ষণ ভেবে সে স্থির করল বাড়িতেই ফিরে যাবে। বাড়ির সবাইকে বুঝিয়ে বলবে সে-ই তারাপদ। দীপুর জেঠুমণি। মরে গিয়ে ভূত হয়েছে। বুঝিয়ে বললে নিশ্চয়ই বুঝবে সবাই। তারপর আবার সকলের সঙ্গে একসঙ্গে থাকতে পারবে সে।

এইসব ভেবে বিকেল বেলা সকলের অলক্ষ্যে গড় থেকে বেরিয়ে পড়ল পিপিং।

দিনের আলোয় মানুষের চোখ ভূতদের সহজে দেখতে পায় না বলে রাস্তা দিয়ে যেতে অসুবিধা হল না পিপিংয়ের। যতই সে ঠাকুরপাড়ার দিকে এগোতে লাগল ততই পুরোনো দিনের কথা মনে পড়তে লাগল তার।

....ওই তো কেষ্ট ডাক্তারের ডাক্তারখানা। ওই তো ভবনাথ পণ্ডিতের বাড়ি।

বাড়ি চিনতে অসুবিধা হল না তারাপদ ওরফে পিপিংয়ের।

রান্নাঘরের পেছনে একটা বড় চালতা গাছ আছে। এই গাছ থেকে বাড়ির ভেতরের প্রায় সবটাই দেখা যায়। সেই গাছে গিয়ে উঠল পিপিং।

সেখান থেকে সে দেখতে পেল তার গতজন্মের বউ লতা বারান্দায় বসে বসে চাল বাছছে। আর তার ভাই-বউ অর্থাৎ দীপুর মা কী যেন সেলাই করছে।

মাকে এবং দীপুকেও দেখতে পেল পিপিং। দুজনে লুডো খেলছে। তার মানে ভয়ে দীপু আজ আর খেলতে যায়নি। দীপু ভালো আছে দেখে নিশ্চিন্ত হল পিপিং। ওর ইচ্ছে হল তখনই লাফ দিয়ে নামে উঠোনে। সবাইকে চমকে দিয়ে বলে, আমি এসেছি। আমিই এ বাড়ির বড় ছেলে তারাপদ,... কিন্তু দিনের আলো রয়েছে। তাই আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। তাছাড়া ওভাবে সবাইকে চমকে না দিয়ে আলাদা আলাদাভাবে বুঝিয়ে বলাই হয়তো ভালো হবে—এইসব যখন ভাবছে পিপিং, ঠিক তখনই বাড়িতে ঢুকল দীপুর বাবা শ্যামাপদ। বারান্দায় দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে কী যেন বলছে সে, শুনতে পেল না পিপিং।

একটু বাদেই এল অঘোর। সঙ্গে তার ভাই টগর।

ওদের চিনতে পারল পিপিং। এই অঘোরদের সঙ্গেই জমিজমা ইত্যাদি নিয়ে বহুদিনের ঝগড়া।

অঘোরকে দেখতে যেমন মোষের মতো তেমনি গায়ে শক্তি। একবার ঝগড়ার সময় তারাপদকে দারুণ মেরেছিল সে।

শ্যামাপদর সামনে দাঁড়িয়ে উত্তেজিতভাবে কথা বলতে লাগল অঘোর। মাঠ-পুকুরের মাছ ধরা নিয়ে বলছে সে।

শ্যামাপদও বেশ গলা চড়িয়ে কথা বলছে।

ওদের দুজনের কথা বলার ধরন দেখে পিপিংয়ের মনে হল এখুনি হাত চালাবে চিরকালের মারকুটে ছেলে অঘোর। শ্যামাপদর যা চেহারা, দুটো চড় খেলেই শুয়ে পড়বে মাটিতে।

হঠাৎ পিপিং ভাবল, এই একটা সুযোগ। আমাকে দেখতে পাচ্ছে না কেউ। এই সুযোগে আমাকে মারার শোধ নেওয়া যায় অঘোরের ওপর।

কথাগুলো ভাবতে না ভাবতেই পিপিং দেখল শ্যামাপদকে একটা চড় কষিয়েছে অঘোর। আচমকা চড় খেয়ে দু'পাক ঘুরে গিয়ে কোনোমতে টাল সামলাল শ্যামাপদ। তারপর তেড়ে এল অঘোরের দিকে। এবার দুটো ঘুষি ঝাড়ল টগর। ঘুষি খেয়ে পেট চেপে বসে পড়ল শ্যামাপদ।

কান্নাকাটি পড়ে গেল বাড়িতে। মা কাঁদতে কাঁদতে কী যেন বললেন অঘোর-টগরকে। ওরা শুনল কি শুনল না, পা দাপিয়ে বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে।

লাফ দিয়ে গাছ থেকে নামল পিপিং। ছুটে গেল ওদের দিকে। আবার লাফ দিয়ে উঠে দুজনের ঘাড়ে দুটো পা রেখে চুলের মুঠি ধরল। মাথায় মাথা ঠুকতে ঠুকতে বলতে লাগল, আর মারবি শ্যামাপদকে? বল, আর মারবি?

অঘোর-টগর বুঝতে পারল না কে ওদের মাথা ঠুকছে। যন্ত্রণায় চিৎকার করতে লাগল তারা। বলতে লাগল, এবারের মতো ছেড়ে দাও। আর কোনোদিন মারব না।

পিপিং বলল, আমি শ্যামাপদর দাদা তারাপদ। এখন থেকে বাড়িতেই থাকব। যদি আর কোনোদিন এ বাড়ির সঙ্গে গোলমাল পাকাবি তো ঘাড় মটকে দেব তোদের, মনে থাকে যেন। এই কথা বলে ওদের ঘাড় থেকে নেমে দুজনের পিঠে দুটো লাথি কষাল সে।

এরপর সন্ধ্যা হল।

মা আহ্নিকে বসলেন। শ্যামাপদ পড়াতে বসল দীপুকে। শ্যামাপদর বউ রান্নাঘরে ঢুকল। আর লতা গেল তুলসীতলায়, প্রদীপ দিতে।

লতাকে একা পেয়ে ওর কাছে গেল পিপিং।

লতা তুলসীতলায় প্রণাম সেরে মাথা তুলতেই পিপিং বলল, লতা, আমি আবার ফিরে এলাম।

চমকে পেছন ফিরল লতা। তারপর পিপিংয়ের অদ্ভুত বিচ্ছিরি চেহারা দেখে ভয়ে চিৎকার করে ছুটল শ্যামাপদর ঘরের দিকে। পিপিংও গেল পেছন পেছন।

শ্যামাপদর ঘরে ঢুকে কাঁপতে কাঁপতে লতা বলল, ঠাকুরপো, ভূ-ভূত—

শ্যামাপদ জিগ্যেস করল, কোথায় ভূত? কোথায়?

তুলসীতলায়।

লণ্ঠন হাতে বাইরে এল শ্যামাপদ। বাইরে এলেন শ্যামাপদর মা, বউ, দীপুও। কেউ কিছু দেখতে পেল না।

দীপু জিগ্যেস করল, জেঠি, ভূতটা কেমন দেখতে গো?

লতা যেমন দেখেছিল পিপিংকে তার বর্ণনা দিলে দীপু আবার বলল, আমরাও তো প্রায় ওই রকমই দেখেছিলাম। তখন তোমরা বলেছিলে চোখের ভুল। এখন দেখলে তো? কিন্তু একটা ভূত আমার নাম ধরে ডেকেছিল কেন বলো তো?

দীপুর প্রশ্নের উত্তর দিল না কেউ।

শ্যামাপদর মা লতাকে কাছে বসিয়ে সবকিছু খুঁটিয়ে শুনলেন। তারপর কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গেলেন।

ওদের অলক্ষ্যে সবই শুনল পিপিং। ঠিক করল সবাই ঘুমিয়ে পড়লে মায়ের কাছে যাবে সে। মায়ের বরাবরই খুব সাহস। তিনি নিশ্চয়ই ভয় পাবেন না। আর তিনি যদি বুঝিয়ে বলেন তাহলে কেউই আর ভয় পাবে না। এইসব ভেবে রান্নাঘরের চালে বসে অপেক্ষা করতে লাগল সে।

মা আজ লতার ঘরে শুতে গেলেন। তিনি দরজা বন্ধ করার আগেই ঘরে ঢুকল পিপিং। আলমারির পাশের কোণটায় গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

লতা ঘুমনোর আগেই ঘুমিয়ে পড়ল মা। লতা ঘুমল তার একটু পরে। লণ্ঠনটা খাটের নীচে জ্বলতে লাগল।

পিপিং গিয়ে দাঁড়াল খাটের পাশে। মায়ের মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে ফিসফিসিয়ে ডাকল, মা-মা, মা-মা—

কয়েকবার ডাকতেই চোখ মেললেন মা, তারপরই ভয়ার্ত চিৎকার।

মায়ের চিৎকারে ঘুম ভেঙে গেল লতার। সেও চিৎকার করে উঠল পিপিংকে দেখে।

ততক্ষণে পিপিং বলতে শুরু করেছে, মা, আমি তারাপদ, তোমার ছেলে। আমি মরে গিয়ে ভূত হয়েছি। আমি—

কিন্তু বেশি কিছু বলতে পারল না পিপিং। দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে শ্যামাপদ আর তার বউ। মা আর লতার চিৎকারে ঘুম ভেঙে গেছে তাদের। ছুটে এসেছে তারা।

এত সব হৈচৈ-এ ভয় পেয়ে গেল পিপিং। সে তাড়াতাড়ি লুকিয়ে পড়ল অন্ধকার কোণটায়।

উঠে গিয়ে দরজা খুললেন মা। তারাপদর কথা বললেন।

শ্যামাপদর বউ বলল, আমি বইতে পড়েছি অপঘাতে যার মৃত্যু হয়, তার আত্মা যদি আত্মীয়দের কাছে ঘোরাফেরা করে তাহলে অনেক সময় ক্ষতি হয়।

মা বললেন, বেঁচে থাকতে যাকে খুব বেশি পছন্দ করত, ভালোবাসত, তাকে কাছে পেতে চায়।

লতা বলল, অতৃপ্ত আত্মার অসাধ্য কিছু নেই।

শ্যামাপদ বলল, তাহলে ব্যবস্থা কিছু করা দরকার, দীপুও তো সেদিন খুব ভয় পেয়েছিল।

এবার মা বললেন, সকালে গিয়ে ঠাকুরমশায়কে ডেকে আনিস। তিনি কী বলেন দেখি।

বাড়ির সকলের কথা শুনে মন খারাপ হয়ে গেল পিপিংয়ের। সে বুঝল যা ভেবেছিল তা হবে না। এ বাড়ির কেউ তাকে আর আপন করে নেবে না।

তাই সেই রাতেই সেখান থেকে বেরিয়ে পড়ল সে। তবে হাজিরগড়ে ফিরে গেল না। গেল না অন্য কোনো ভূতের আস্তানায়। চলতে চলতে অনেক অ-নেক দূরে চলে গেল।

মাঘ ১৩৯১

একটা চাবির জন্য

অজিত পূততুণ্ড

চাকুলিয়ার কাছাকাছি এসেই ট্রেনটা ঘচাং করে থেমে গেল। থামল তো থামলই। আর নড়াচড়ার নাম নেই। যেন যাওয়ার কথা ভুলেই গেছে সে। কিন্তু ট্রেনটা যাওয়ার কথা ভুলতে পারে, তাই বলে যাত্রীরা যাওয়ার কথা ভুলতে পারে না। তাই সবাই সবাইকে প্রশ্ন করতে লাগল, 'ব্যাপার কি?'

নীলেন্দুও কৌস্তভকে প্রশ্নটা করল, 'ব্যাপার কি, রিন্টু? গাড়ি কি আর যাবে না?'

কৌস্তভ তখন বাইরের দৃশ্য দেখছিল। অবিশ্যি কিছু দেখার খুব একটা সুযোগ ছিল না। কারণ, তখন সন্ধের অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। আকাশেও ঘন মেঘ। বাইরে তাই তেমন করে দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না কিছুই। কেবল দূরে দূরে কতগুলো আলোর বিন্দু দেখা যাচ্ছে। সে-সব আলো নিঃসন্দেহে গৃহের আলো। ওইরকম একটা আলোর বিন্দুর ওপর চোখ রেখেই কৌস্তভ বলল, 'নীলু, ব্যাপারটা আমার ভালো ঠেকছে না। কোথাও কোনো গোলমাল হয়েছে।'

এদিকে ততক্ষণে অনেকেই ট্রেন থেকে নেমে পড়েছে। তাদের সকলেরই কারণটা জানার তাগিদ।

যারা নেমেছিল তারা যে খবর সংগ্রহ করে নিয়ে এল তা খুবই হতাশার। সামনের লাইনে বড় রকমের ত্রুটি ধরা পড়েছে। সারাতে কতক্ষণ লাগবে তা বলা কঠিন। ঘণ্টা পাঁচেকের আগে যে কিছু হবে না সে বিষয়ে সকলেই নিঃসন্দেহ। তবে অভিজ্ঞ লোকের অনুমান, সকালের আগে কিছুই হচ্ছে না। এর একটাই অর্থ। সারা রাত ওই কামরায় বসে থাকতে হবে।

ট্রেনটা টাটানগর অব্দি যাবে। কৌস্তভ-নীলেন্দুরও গন্তব্যস্থান টাটানগর। কাছাকাছি স্টেশনে যাদের যাওয়ার কথা তাদের সকলেই নেমে গেল। দেখতে দেখতে কামরাটা প্রায় ফাঁকা হয়ে গেল। কামরায় ওদের কাছাকাছি একটা লোকও রইল না।

এদিকে আকাশে তখন ঘন মেঘ। যে-কোনো সময় বৃষ্টি নামতে পারে। নীলেন্দু ওই মেঘলা আকাশ এবং প্রায় অন্ধকার কামরার দিকে তাকিয়ে কৌস্তভকে বলল, 'পরিবেশটা ভূতের গল্পের পক্ষে জমাটি। তাছাড়া আমাদেরও সময় কাটানো প্রয়োজন। কাজেই পাল্লা দিয়ে ভূতের গল্প বলা যাক।'

কৌস্তভ হেসে বলল, 'আবার ভূতের কথা বলছিস? দিলীপদার কথা তোর মনে নেই?'

নীলেন্দুও হেসে বলল, 'তা আবার মনে নেই? যা একখানা চড় খেয়েছিলাম! আজো বোধহয় ব্যথা আছে।'

'তাহলে?' হেসে বলল কৌস্তভ।

'আরে সে তো ভূতের ভয় পেয়েছিলাম বলে দিলীপদা রাগ করেছিলেন।' নীলেন্দু উত্তর দিল।

দিলীপদা অর্থাৎ দিলীপ মিত্র একসময় নীলেন্দুকে পড়াত। নীলেন্দু তখন সিক্স-এ পড়ে, আর দিলীপ তখন বি. এসসি পড়ছে। দিলীপ খুব ভালো ক্রিকেট খেলত। ওদের কলেজের হয়ে কয়েকবার খেলেছে। ইচ্ছে ছিল বাংলার হয়ে খেলবে। কিন্তু তা আর হয়ে ওঠেনি। খেলাটা তেমন করে চালাতে পারেনি। বি. এসসি পাশ করার পরই ঘাটশিলায় কপার মাইনস-এ চাকরি নিয়ে চলে গিয়েছিল। তারপর থেকে ওদের সঙ্গে আর কোনো যোগাযোগ নেই।

দিলীপদার কথা মনে হলেই নীলেন্দুর সেদিনের ঘটনা মনে পড়ে। সেটা ছিল কৃষ্ণপক্ষের রাত। বাড়িতে একজন কাজের লোক ছাড়া আর কেউ ছিল না। বাইরের ঘরে একা বসে পড়ছিল নীলেন্দু। সেদিনই একটা ভূতের গল্প শেষ করেছিল। ফলে তার মনের মধ্যে গল্পের রেশ থেকে গিয়েছিল।

এদিকে হঠাৎ পাড়ার সব আলো একসঙ্গে নিভে গিয়েছিল। হয়তো লোডশেডিং অথবা অন্য যে-কোনো কারণ ছিল। আচমকা ঘরটা অন্ধকার হতেই বুকের মধ্যে ভূতের ভয়টা গাঢ় হয়েছিল। আর ঠিক তখনই পড়াবার জন্যে দিলীপদা এসে দাঁড়িয়েছিল বাইরের ঘরের দরজার সামনে। দিলীপদাকে দেখেই নীলেন্দু 'ভূত ভূত' বলে চিৎকার করতে শুরু করেছিল।

দিলীপ মিত্র এক মুহূর্তও দেরি করেনি। ঘরে ঢুকেই নীলেন্দুর গালে এক চড় বসিয়ে দিয়েছিল। বলেছিল, 'ভূত? বোকা কোথাকার, ভূত বলে কিছু আছে? চোর-ডাকাতের ভয় পাওয়ার একটা মানে আছে। তা নয়, ভূত। জীবনে যদি আর কখনো ভূতের কথা বলেছিস তাহলে মজা টের পাবি।'

দিলীপদার কথা উঠতেই নীলেন্দু বলল, 'কত দিন দিলীপদার সঙ্গে দেখা হয়নি। সত্যিই আমাকে উনি খুবই ভালোবাসতেন।'

কৌস্তভ মুখের এক বিচিত্র ভঙ্গি করে বলল, 'তোকে একা? আর আমাকে ভালোবাসতেন না?'

নীলেন্দু হেসে বলল, 'ভবিষ্যতে তুই গোয়েন্দা হতে চাস জেনে দিলীপদা তোকে তো গোয়েন্দা কৌস্তভ বলেই ডাকতেন।'

নীলেন্দুর কথা শেষ হতে না হতেই ওদের কামরায় এক ভদ্রলোক উঠলেন। তাঁর গায়ে রেইন-কোট। মাথায় কান-ঢাকা টুপি। ভদ্রলোক কোনো দিকে না তাকিয়ে সামনের একটা খালি সিটে বসে পড়লেন।

ভদ্রলোককে দেখে নীলেন্দু ফিসফিস করে বলল, 'ভদ্রলোকের ভাবভঙ্গি দ্যাখ। যেন কোনো ইংরেজি ছবির গোয়েন্দা।'

কৌস্তভ মৃদু হেসে বলল, 'সত্যিকারের গোয়েন্দাও তো হতে পারে। হয়তো কোনো ইনভেসটিগেশনের ব্যাপারে এসেছে।'

'রিয়্যালি?' নীলেন্দুর চোখ দুটো চকচক করে উঠল।

ঠিক তখনই ভদ্রলোক মাথা থেকে কান-ঢাকা টুপিটা খুলে ফেললেন। টুপিটা খুলতেই ভদ্রলোকের মুখটা স্পষ্ট দেখতে পেল ওরা। মুখটা দেখার সঙ্গে সঙ্গে ওরা দুজনেই প্রায় একসঙ্গে বলে উঠল, 'আরে, এ যে দিলীপদা স্বয়ং।'

দিলীপ ওদের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলল, 'তোরা কৌস্তভ আর নীলেন্দু তো?'

'যাক চিনতে পেরেছেন তাহলে?' বলল ওরা। একটু থেমে নীলেন্দু বলল, 'জানেন দিলীপদা, একটু আগেই আপনার কথা হচ্ছিল। আপনার আলোচনা শেষ হতেই আপনি এসে উপস্থিত। আশ্চর্য যোগাযোগ।'

দিলীপ মিত্র হাসল না। গম্ভীরভাবে বলল, 'এরকম তো হয়। অনেক সময় টেলিপ্যাথির মাধ্যমে এরকম ব্যাপার হতে পারে। আসলে আমিও তোদের কথাই ভাবছিলাম।'

কৌস্তভ কেমন একটা সন্দেহের চোখে তাকাল দিলীপের দিকে। কিন্তু কিছু বলল না। নীলেন্দু বলে উঠল, 'সত্যি?'

দিলীপ সে-কথার উত্তর না দিয়ে বলল, 'তোরা যাচ্ছিস কোথায়?'

'টাটানগর' উত্তর দিল কৌস্তভ।

'কিন্তু ট্রেন তো আগামীকাল দুপুরের আগে ছাড়বে না।' বলল দিলীপ।

'তাহলে?' নীলেন্দুর কণ্ঠে উদ্বেগ।

দিলীপ সামান্য হাসল। তারপর বলল, 'আসলে তোদের দেখেই আমি এই কামরায় উঠে এসেছি। তোদের আমার বাড়ি নিয়ে যাব বলে। আমার বাড়ি তো বেশিদূর নয়। ধলভূমগড়। গল্প করতে করতে হেঁটেই যাওয়া যাবে। রাতটা আমার বাড়িতে কাটিয়ে আগামীকাল যে-কোনো সময় টাটানগর চলে যাবি।'

'কথাটা মন্দ বলেননি। এত দিন পর দেখা হল, কয়েক ঘণ্টা একসঙ্গে থাকতে ভালোই লাগবে।' বলল নীলেন্দু।

'হ্যাঁ, তা বটে। কতদিন পর তোদের সঙ্গে দেখা।' ছোট্ট দীর্ঘশ্বাস ফেলল দিলীপ। তারপর যোগ করল, 'তোরা তো জানিস, জামাইবাবু হঠাৎ মারা না গেলে আমাকে ক্রিকেট খেলা ছাড়তে হত না। তা সে কথা যাক। বুঝলি আমি বিয়ে-টিয়ে করিনি। দিদি আর তার ছেলে কাবুলই আমার সব। ওরা ধলভূমগড়ে আমার কাছেই থাকে। আমি অনেক আগেই চাকরি ছেড়ে দিয়ে বিল্ডিং তৈরির কনট্রাকটরি করছিলাম। টাকা-পয়সা খারাপ করিনি। ধলভূমগড়ে নিজে একটা বাড়িও করেছি। সেটা ভালোই। তাছাড়া কাবুল এবার ভালোভাবে হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করেছে। ইচ্ছে ছিল, তাকে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়িয়ে আমেরিকায় পাঠাব।'

'ইচ্ছে ছিল বলছেন কেন? কাবুল যেতে রাজি নয়?' প্রশ্ন করল কৌস্তভ।

দিলীপ মৃদু হেসে বলল, 'এই জন্যেই তোকে গোয়েন্দা কৌস্তভ বলি। তুই সঠিক প্রশ্নই করেছিস। 'ইচ্ছে ছিল' কেন বলছি? এর উত্তর পরে দেব। এখন চল আমার সঙ্গে।'

দিলীপ উঠে পড়ল। উঠে পড়ল ওরাও।

পথে নেমে একরকম কোনো কথাই হল না। দিলীপ এত দ্রুত হাঁটতে লাগল যে, তাকে অনুসরণ করতে গিয়ে মাঝে-মধ্যে সামান্য দৌড়তে হল। দিলীপ একসময় ভালো স্পোর্টসম্যান ছিল বলে তার হাঁটার ধরনই ওইরকম। এটা অবিশ্যি কৌস্তভ এবং নীলেন্দুর জানাই ছিল। কাজেই এই নিয়ে দিলীপ মিত্রকে তারা কোনোরকম মন্তব্য করল না।

বেশ কিছুটা হাঁটার পর ওরা ধলভূমগড়ে পৌঁছে গেল। একপাশে সুবর্ণরেখা নদী, আর অন্যদিকে লাল মাটির বুকে শাল-পিয়ালের বন। চমৎকার কাব্যিক মেজাজের পরিবেশ।

দিলীপ মিত্র হাঁটতে হাঁটতে রাস্তায় একটা আলোর নীচে দাঁড়িয়ে পড়ল। সেখানে গোটা তিনেক বড়সড় পাথর পড়ে আছে। যেন পথিকের বিশ্রামের জন্যই সাজিয়ে রাখা। দিলীপ পাথরগুলো দেখিয়ে বলল, 'অনেকটা হাঁটা হল, এবার একটু জিরিয়ে নেওয়া যাক।'

কথাটা শেষ করেই দিলীপ নিজেই একটা পাথরের ওপর বসে পড়ল। কৌস্তভ এবং নীলেন্দুর যদিও বিশ্রামের কোনো প্রয়োজন ছিল না, তবু দিলীপের জন্য তাদেরও বসতে হল।

পাথরের ওপর বসে দিলীপ সামান্য সময় কি একটু ভাবল। তারপর অন্যদিকে তাকিয়ে খুব ঠান্ডা গলায় বলল, 'বুঝলি নীলু, এই মুহূর্তে তোদের মতো পরিচিত লোকের খুব প্রয়োজন ছিল। তোদের মতো মানে, কাবুল আর দিদিকে যারা চেনে। আবার দিদি এবং কাবুলও যাদের চেনে।'

'কেন?' কৌস্তভ প্রশ্নটা না করে পারল না।

দিলীপ সে কথার উত্তর না দিয়ে বলল, 'তোদের কাছে নিশ্চয় পেন এবং কাগজ আছে? থাকলে বের কর। ছোট্ট কাজ আছে, সেরে ফেলি।'

কৌস্তভ পেন এবং কাগজ ছাড়া কোথাও বেরোয় না। সুতরাং সে তাড়াতাড়ি কাগজ এবং পেন বের করে দিলীপের দিকে এগিয়ে দিল। দিলীপ সেগুলো না নিয়ে মৃদু হেসে বলল, 'তুই তো গোয়েন্দা হতে চাস। আমার হয়ে তুই-ই বরং কাজটা কর। কাজটা করে মজা পাবি। আমার জবানিতে দিদিকে একটা চিঠি লেখ। আমি ডিকটেশন দিচ্ছি, তুই লিখে যা।'

কৌস্তভ ব্যাপারটা ভালো করে বুঝবার জন্যে দিলীপের মুখের দিকে তাকাল। দিলীপ অদ্ভুত দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে রইল কৌস্তভের চোখের দিকে। কতকটা সম্মোহনী দৃষ্টি যেন। সেই দৃষ্টির সামনে কৌস্তভ অথবা নীলেন্দু কেউ কোনো প্রশ্ন করতে সাহস পেল না। কৌস্তভ কাগজ এবং পেন নিয়ে লেখার জন্য প্রস্তুত হল।

দিলীপ বলতে শুরু করল, 'বড়দি, আমার সমস্ত স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তির মালিক হবে কাবুল, অর্থাৎ তোমার ছেলে। কিন্তু যতদিন সে নাবালক থাকবে ততদিন তুমিই সবকিছু দেখাশোনা করবে। এসব কথা আমি আমার 'উইলে' পরিষ্কারভাবে বলেছি। কিন্তু উইলটা এমন জায়গায় আছে যে জায়গার কথা আমি তোমাকে কোনোদিনও বলিনি। ফলে তুমি সেটা কবে খুঁজে পাবে তা বলা মুশকিল। যা হোক, আমার যে স্টিলের আলমারিটা আছে তার একেবারে নীচে, 'ফ্লোরের' সঙ্গে

প্রায় মিশে-যাওয়া একটা লকার আছে। লকারটা বিশেষভাবে তৈরি। জানা না থাকলে ধরা যায় না। ওই লকারের চাবিটা সাধারণত আমার টেবিলের ড্রয়ারেই রাখা থাকত। কিন্তু সেদিন ভুল করে সঙ্গে এনেছিলাম এবং রেখেছিলাম আমার রেইন কোটের পকেটে। যা হোক, ওই লকারের ভেতরে 'উইল' এবং ইনসিওরেন্সের পলিসিসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র আছে। চাবিটাও সঙ্গে রইল, তোমার কোনো অসুবিধে হবে না।'

ডিকটেশন দেওয়া শেষ করে দিলীপ কৌস্তভের দিকে তাকিয়ে বলল, 'নীচে আমার নাম লেখ—দিলীপ মিত্র। আমি নিজে সই করব না। কেন সই করব না, কেন আমার পক্ষে সই করা সম্ভব নয়, একটু পরেই তা বুঝতে পারবি। তুই গোয়েন্দা মানুষ, কাজেই তোকে বুঝিয়ে বলতে হবে না।'

কথাটা শেষ করেই আবার সম্মোহনী চোখে তাকিয়ে রইল দিলীপ মিত্র। কৌস্তভও আর কোনো প্রশ্ন না তুলে দিলীপ মিত্রের নামটা লিখে দিল।

চিঠির কাজ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দিলীপ উঠে দাঁড়াল। তারপর সামনে আঙুল দেখিয়ে বলল, 'ওই যে গোলাপি রঙের বাড়িটা দেখছিস ওটাই আমার বাড়ি। গেটে আমার নামও লেখা আছে।'

কৌস্তভ এবং নীলেন্দু দেখল, গোলাপি রঙের একটা একতলা বাড়ি। বাড়িটা সুন্দর। বাড়ির সংলগ্ন একটা ফুলের বাগান। দূর থেকে দেখে মনে হয়, বাড়িটা যেন কোনো বিলিতি বই-এর ছবি থেকে উঠে এসেছে। বাড়িটার দিকে তাকিয়ে দুজনেই প্রায় একসঙ্গে বলে উঠল, 'বাঃ, চমৎকার!'

দিলীপ আবার যোগ করল, 'নীলেন্দু, এই মুহূর্তে তোদের একটু অস্বস্তিতে ফেলতে হচ্ছে। তোরা কিছু মনে করিস না।'

'অস্বস্তি?' কৌস্তভের চোখ সূক্ষ্ম হল।

'আমার অন্য একটা জরুরি কাজ আছে। সেই কাজটা না সেরে আমার বাড়িতে যাওয়া সম্ভব নয়। অথচ সেখানে তোদের নিয়ে যেতে পারছি না। আমার খুবই খারাপ লাগছে, কিন্তু আমি নিরুপায়। তাই বলছি, তোরা আমার এই চিঠি আর রেইন কোটটা নিয়ে বাড়িতে চলে যা। রেইন কোটের পকেটে লকারের চাবি আছে, তা তো শুনেছিস। দিদি এবং কাবুলকে তোরা চিনিস, আর তোদেরও ওরা চেনে। অতএব কোনো অসুবিধে হবার কথা নয়। সো গুড বাই।'

দিলীপ ওদের প্রত্যুত্তরের জন্য এতটুকু অপেক্ষা করল না। রেইন কোটটা পাথরের ওপর রেখে দ্রুত পায়ে হাঁটা দিল। যেদিকে সুবর্ণরেখা নদী সেই দিকেই হাঁটতে শুরু করল।

নীলেন্দু গলার স্বর সামান্য উঁচু করে বলে উঠল, 'দিলীপদা, আপনার দিদির সঙ্গে কোনোরকম মনোমালিন্য হয়নি তো?'

দিলীপ সে-কথা শুনতে পেল বলে মনে হল না।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে দিলীপ অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। অগত্যা ওরা নিজেরাই গোলাপি বাড়িটার উদ্দেশ্যে হাঁটতে বাধ্য হল। রেইন কোটটাও সঙ্গে নিল। পকেটে হাত দিয়ে দেখে নিল চাবিটা পকেটে সত্যি সত্যিই আছে কিনা। চাবিটা আছে দেখে কিছুটা নিশ্চিন্তও হল।

কৌস্তভ তবু পুরোপুরি স্বস্তি পেল না। সে বলল, 'নীলু, আমি কিন্তু স্বস্তি পাচ্ছি না। আমার মনে হচ্ছে কোথাও কোনো গোলমাল আছে। দিলীপদা সুস্থ নন। শারীরিকভাবে হয়তো সুস্থ। তবে মানসিকভাবে কিছুতেই সুস্থ নন। বাড়িতে গেলেই অবিশ্যি সব পরিষ্কার হয়ে যাবে।'

কৌস্তভরা বাড়িটার গেটের সামনে এসে দেখল, দরজার গায়ে সুন্দর করে 'দিলীপ মিত্র' নামটা লেখা।

ডোরবেলটা টিপতেই দরজা খুলে গেল।

দরজা যিনি খুললেন তিনিই দিলীপের দিদি। তাঁকে দেখে কৌস্তভ এবং নীলেন্দুর মনে হল, কেমন যেন বিপর্যস্ত চেহারা। যেন ভদ্রমহিলার মনের ওপর দিয়ে অনেক ঝড় বয়ে গেছে। কৌস্তভদের দেখে খুবই অবাক হয়ে বললেন, 'একি, তোমরা?'

নীলেন্দু হাসিমুখে বলল, 'দিদি, আমাদের চিনেছেন তাহলে?'

দিদি উত্তর দেবার আগেই কাবুল তার মায়ের পেছনে এসে দাঁড়াল। কাবুলের পেছনে আরো দুই মহিলা। ওদের প্রতিবেশিনী।

কাবুলকে চিনতে পারল দুজনেই। কাবুলের চোখ দেখে বোঝা গেল সে-ও চিনতে পেরেছে নীলেন্দু এবং কৌস্তভকে। কিন্তু সেই সঙ্গে ওদের দেখে সে-ও অবাক হয়েছে খুব।

নীলেন্দু সামান্য হেসে বলল, 'কাবুল, আমাদের চিনতে পারছ তো? নীলেন্দুদা এবং কৌস্তভদা। কলকাতায় তোমার মামা আমাকে পড়াতেন। তোমার মামা এতক্ষণ আমাদের সঙ্গেই ছিলেন। কি একটা কাজে ওদিকে গেছেন। এসে পড়বেন এক্ষুনি। অন্তত আমাদের সে-কথাই বললেন।'

নীলেন্দুর কথায় ওরা চারজনই চমকে উঠে প্রায় একসঙ্গে বলল, 'অসম্ভব।'

'অসম্ভব? কেন?'

নীলেন্দু 'অসম্ভব' কথাটার মাথামুন্ডু কিছুই বুঝল না।

কৌস্তভ ব্যাপারটাকে আরো একটু পরিষ্কার করবার জন্য বলল, 'কোনটা অসম্ভব? দিলীপদার সঙ্গে আমাদের দেখা হওয়া, না তাঁর এখানে ফিরে আসাটা?'

দিলীপের দিদি তাড়াতাড়ি বললেন, 'তোমরা ভেতরে এসো ভাই। পরে সব কথা হবে।'

কৌস্তভরা ঘরে বসবার পর দিলীপের দিদি বললেন, 'দুটোই অসম্ভব ভাই। দিলীপের সঙ্গে তোমাদের দেখা হওয়া এবং তার এখানে ফিরে আসা, কোনোটাই সম্ভব নয়।'

'মানে?' কৌস্তভ এবং নীলেন্দু প্রায় একসঙ্গেই বলে উঠল।

'মানে, তোমাদের দিলীপদা আর নেই।' দিলীপের দিদির গলা কান্নায় ভারী হয়ে এল।

'তা কি করে সম্ভব?' কৌস্তভরা হতভম্ব।

এবার দিলীপের দিদি কান্না-জড়ানো গলায় যা বললেন তার অর্থ করলে মোটামুটি এই রকম দাঁড়ায়—

দিন সাতেক আগে ধলভূমগড় থেকে কিছুটা দূরে ট্রেন থেকে পড়ে গিয়ে দিলীপ দারুণভাবে আহত হয়। তারপর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার অল্পক্ষণ পরেই মারা যায়। মারা যাওয়ার আগে অল্প সময়ের জন্য তার জ্ঞান হয়েছিল। তখন সে কেবল বলেছিল, 'আমার রেইন কোটের পকেট' আর বলেছিল 'কাবুল আমার কাবুল'। হয়তো আরো অনেক কথাই বলতে চেয়েছিল দিলীপ, কিন্তু বলতে পারেনি।

কৌস্তভ-এর কাছে দিলীপদার ব্যাপারটা একটু একটু করে যেন পরিষ্কার হতে লাগল। দিলীপদার আচরণটা কেমন অদ্ভুত ঠেকেছিল তার চোখে। বিশেষ করে সারাক্ষণ রেইন কোটটা গায়ে দিয়ে থাকা। যদিও তখন সে কিছুই বলেনি। আসলে বলতে দ্বিধা হয়েছিল। কৌস্তভ যা অনুমান করল তা কিন্তু পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছিল না। তার যুক্তিবাদী মন বিশ্বাস করতে বাধা দিচ্ছিল।

কৌস্তভ তাড়াতাড়ি হাতের ভাঁজ-করা রেইন কোটটা মেলে ধরে বলল, 'দিলীপদা কি এই রেইন কোটের কথাই বলেছিলেন?'

'আরে এই তো মামার সেই রেইন কোটটা। হাতের কাছে সেই ফুটোটা পর্যন্ত আছে। নেংটি ইঁদুর কেটেছিল।' কোটটা হাতে নিয়ে বলল কাবুল।

কাবুলের মা অর্থাৎ দিলীপের দিদি বললেন, 'দিলীপের অ্যাকসিডেন্টের পর এই রেইন কোটটা আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। অথচ আমরা জানতাম, এই কোটটা সেদিন দিলীপের সঙ্গেই ছিল।'

নীলেন্দু গম্ভীর মুখে বলল, 'আপনাদের নিশ্চয়ই কোথাও কোনো ভুল হয়েছে। আমরা তিনজন এতক্ষণ একসঙ্গেই ছিলাম। আমরা তিনজন মানে, রিন্টু অর্থাৎ কৌস্তভ, আমি এবং দিলীপদা। তাছাড়া দিলীপদা আপনাকে একটা চিঠিও দিয়েছেন। অবিশ্যি দিলীপদা ডিকটেশন দিয়েছেন, আর কৌস্তভ লিখেছে।'

'সেকি? কোথায় সেই চিঠি?' কাবুল এবং কাবুলের মা প্রায় একসঙ্গেই প্রশ্ন করল।

কৌস্তভ পকেট থেকে চিঠিটা বের করল। কিন্তু চিঠিটা খুলে সকলের সামনে মেলে ধরে সে নিজেই চমকে উঠল। একি! এ তো তার হাতের লেখা নয়। এ তো অন্য হাতের লেখা।

দিলীপের দিদি কেমন ভীতস্বরে বললেন, 'হাতের লেখা যে দিলীপেরই! আশ্চর্য!' কৌস্তভের দিকে তাকিয়ে যোগ করলেন, 'অথচ বলছ, তুমি নিজের হাতে লিখেছ?'

'হ্যাঁ। সত্যিই আমি নিজের হাতে লিখেছি। অদ্ভুত! খুবই অদ্ভুত ব্যাপার। বিশ্বাস করতেই কষ্ট হচ্ছে।' কৌস্তভ কাঁধে একটা দোলা দিয়ে কথাটা বলল।

চিঠিটা অবিশ্বাস্য হলেও চিঠির বিষয়বস্তুতে কিন্তু অবিশ্বাসের কিছু ছিল না। দিলীপ চিঠিতে যা যা বলেছিল সবই মিলে গিয়েছিল। লকারের ভেতর থেকে পাওয়া গিয়েছিল 'উইল'সহ অন্যান্য কাগজপত্র।

দিলীপের দিদি চোখের জলের ভেতর দিয়ে অস্ফুট স্বরে কেবল বলেছিলেন, 'দিলীপ আমাদের এত ভালোবাসত? মৃত্যুর পরেও আমাদের কথা ভেবে তার শান্তি নেই? ঈশ্বর, তুমি কেন এমন নিষ্ঠুর খেলা খেললে?'

কৌস্তভের যুক্তিবাদী মন এই ঘটনার কোনো ব্যাখ্যা খুঁজে পেল না।

কার্ত্তিক ১৩৯৮

আগুন লাঠি, সোনার মোহর ও কালো বেড়ালছানা

মুস্তাফা নাশাদ

আজ থেকে প্রায় একশো বছর আগের কথা। সবটাই মায়ের কাছে শোনা। মা আবার শুনেছিলেন তাঁর মায়ের কাছে। তাঁর মা আবার শুনেছিলেন তাঁর মায়ের কাছে। কাজেই, এ কাহিনি বানানো না সত্যি, সে বিষয়ে কোনো প্রশ্ন তুললে, আমি তার উত্তর দিতে পারব না; তা আগেই বলে রাখছি।

যখনকার কথা বলছি তখন কিন্তু আজকের এই কলকাতাটা ফুলে-ফেঁপে এত মোটাসোটাও হয়নি, আর শহর ছাড়িয়ে গাঁ-গেরামের দিকে তার হাত-পাও ছড়াতে-ছিটাতে শুরু করেনি।

তখন সন্ধে নামার বহু আগে থেকেই যে-যার ডেরায় ফিরে যেত। সন্ধে মানেই ডাকাতের রাজত্ব! শহরের কয়েকটি বনেদি রাস্তায় মিটি-মিটি গ্যাসের বাতি জ্বলত। বাকিগুলোতে টিমটিম করত রেড়ির তেলের বাতি। তারপরও যেগুলি বাকি থাকত, তাতে কিছুই জ্বলত না!

শহরকে বেড় দিয়ে বাগবাজারের মুখ থেকে টানা মারাঠা ডিচ নামে খাল। খালের ওপর যে পোলগুলো ছিল, তার ওপর রেলওয়ে লেভেল ক্রসিংয়ের মতো লোহার মোটা-মোটা থামের গেট করা ছিল। রাত হলেই গেট ফেলে রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হত, যাতে পোলের ওপার থেকে ডাকাত দল গাড়ি হাঁকিয়ে বা ঘোড়া ছুটিয়ে এপারে এসে খুন-জখম, ডাকাতি না করতে পারে।

রাজাবাজার মোড় থেকে সরু একফালি রাস্তা ধুঁকতে-ধুঁকতে অল্প কিছুটা পুবে গিয়েই, আজকের ফুলবাগানের কাছে মুখ থুবড়ে পড়ে পথ হারিয়েছিল। তারপর যত দূর দু'চোখ যায়, শুধু ধু-ধু মাঠ—জলা জায়গা; তাল-সুপারির গাছ আর মাঝে-মধ্যে, দূরে-কাছে ছড়ানো-ছিটানো গুটিকয়েক ঘর। ওখানেই ছিল দিদিমার মায়ের মামার বাড়ি।

হপ্তায় তিনদিন অর্থাৎ একদিন অন্তর একদিন জলগাড়ি আসত খাবার জল নিয়ে। তখন সবাই হামলে পড়ে যে যার কলসি, জালা, ডাবর, ডেকচি ভরে রাখত। অনেকে আবার জলগাড়ির জল নিতও না। ভয়ে। বাঁচার তাগিদে। জল থেকে কিরকম একটা গন্ধ বেরুত বলে! বলা তো যায় না, জলে বিষ-টিষ মিশিয়েও দিতে পারে। কালা আদমিদের যা ঘেন্না করে লালমুখো সাহেবরা! তা কি আর কারো জানতে বাকি আছে? তাই অনেকে পুকুরের বা কুয়োর জলই খেত।

সকাল হলেই ধোপার দল আসত গাধার পিঠে ডাঁই করে নোংরা জামাকাপড় নিয়ে। গোটা মাঠ জুড়ে সেদ্ধ করত, কাচত ও শুকোত। তারপর বেলা না গড়াতেই, সবাই ফিরে যেত। যতক্ষণ তারা থাকত, ততক্ষণ একটু হই-চই, গুলজার হত। তারপর আবার সব সুনসান। নিঝুম। সন্ধে নামতে না নামতেই ডাকাতের ভয়ে সবাই দোরে খিল এঁটে বসে থাকত।

অবিশ্যি, তাদের এই উটকো আপদের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে একদিন সবাইকে দারুণ চমকে দিয়ে দলবল নিয়ে ছুটে এসেছিল একদল লালমুখো গোরা সাহেব। তারা গ্রামে সারাদিন রইল। বন-বাদাড়, ঝোপ-ঝাড় সব ঘুরে-ফিরে দেখল। তাদের নোংরা মেটে দাওয়ায় বসল। আর এনামেলের তোবড়ানো মগে জল চেয়ে খেল এবং যাবার সময় ষণ্ডামার্কা একজন গুঁফো লাল পাগড়িঅলাকে দেখিয়ে বলল যে, এবার থেকে রোজ সন্ধে হলেই আগুন লাঠি নিয়ে তোমাদের রাতপাহারা দিতে আসবে এই লোকটি! তোমরাও বাপু রাতের বেলা একটু সজাগ থাকার চেষ্টা কর। কেমন?

তারপর থেকে সবাই যে যার কুঠুরিতে রাতের বেলা পালা করে জেগে থাকতে শুরু করল। আর চোখ থেকে ঘুম তাড়াবার জন্য, হয় কোরান নয়তো গীতা পাঠ শুরু করল। বেশ নিশ্চিন্তেই দিন কাটতে লাগল তাদের। কোনো ঝুট-ঝামেলা নেই। সন্ধে হলেই বেঁটে বোঁচা এসে রেড়ির তেলের

বাতিগুলো জ্বালিয়ে দিয়ে যেত। আর তার যাবার পরই সেই ষণ্ডামার্কা লোকটা আগুন লাঠি হাতে হাজির হত। চুরি-ডাকাতি, ভয়-ভাবনা কাকে বলে যখন সবাই প্রায় ভুলতে বসেছে, ঠিক তখনই পাকা গুটি কেঁচে দিল ঐ জনমকুঁড়ে কেলো শেখের বিবি—ফুলি!

কেলো শেখ শহরে গিয়ে পাড়ায়-পাড়ায় নকশা কাটা খড়ম ফিরি করত। বাড়ি বসে দু'তিন দিন ধরে তৈরি করত তো একদিন শহরে গিয়ে ফিরি করে আসত। খুব কষ্টের সংসার তার। কোনোরকমে খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে চলছিল। সাত-আটটা ছেলেপুলের চ্যাঁ-ভ্যাঁতে তার ঘর সব সময় সরব। কখনও কামড়া-কামড়ি তো, আবার কখনও চুলোচুলি। যদি তাও না হয় তো খাবার জন্য আছাড়ি-পাছাড়ি। কান্নাকাটি। চিল-চিৎকার। অগত্যা কেলো শেখের বউ পাড়ায় বেরুত মালসা নিয়ে ফ্যান চাইতে। তখন এত মাগ্‌গী গণ্ডার দিন ছিল না। তাই লোকে ফ্যানের সঙ্গে মুঠো চুটকি ভাত, একটু নুন ও দু'চার ফোঁটা সর্ষের তেল দিতেও ভুল করত না।

সেই কেলো শেখেরই হাড়জুড়োনো ব্যামো হল। সব সময় তার শীত-শীত করে আর মুখ দিয়ে ভাল্লুকের মতো হুঁ-হুঁ শব্দ ছাড়ে। কত কবচ-তাবিজ, জলপড়া-তেলপড়া; যে যা বলল তাই করা হল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না যখন, তখন আবাদে গিয়ে নামী ওঝা গুলু গুণিনকেও এনে দেখানো হল। সর্ষেপড়া, কড়িচালা, বাণমারা কত কিছুই না করল ওস্তাদ। তবে ঐ অবধিই। কিছুই হল না। তাই দেখে পাড়াপড়শি সৎ পরামর্শ দিল যে গরুর গাড়িতে শুইয়ে ওকে কলকাতায় নে যা। সাহেব গোরাদের হাসপাতালে একটি বার দেখা। দেখিস ভালো হয়ে যাবে। তোর এতগুলো কাচ্চা-বাচ্চা। খোদা না করে, কিছু একটা হয়ে গেলে তখন কী করবি রে? কথা শোন। জেদ ছাড়।

তা কেলো শেখের বউ ফুলি কিছুতেই কারো কথা শুনল না। উল্টে লালমুখো গোরাদের শাপ-শাপান্ত করে সাফ জানিয়ে দিল যে সে ওপথে কিছুতেই যাবে না। এমন কি তার খসম মারা গেলেও না। ঐ মুখপোড়াদের দেয়া রুটি-জল খেয়েই না আজ ওর এই বিপদ! দরকার হলে বাবার থানে যাবে। পীরের দরগায় যাবে। পাঁচ বাড়ি ভিক্ষে করে ছেলেপুলেদের মানুষ করবে, বড় করবে। খসমকে সারিয়ে তুলবে। তবেই না দুলু ঘরামির বেটি! ভাঙবে তবু মচকাবে না। শুনে রাখ সবাই।

তা সত্যি বলতে কি, ফুলি তার জেদ বজায় রেখেও ছিল। খসমকে এক আশ্চর্য মন্ত্রবলে সুস্থ করে তুলল। নিজেদের দৈন্যদশাও ঘোচাল। দরমা ঝেড়ে ফেলে মেটে ঘর তুলল। শহরের লোকেদের মতো করগেটের চাল চাপাল। আর পড়শিদের জন্য গাঁটের কড়ি খরচ করে একটা টিপকল বসিয়ে দিল। তার এ হেন ব্যাভারে সবাই দারুণ খুশি। একবাক্যে সকলে তার তারিফ করল। আর আড়ালে-আবডালে প্রশ্ন তুলল—কী করে এত সব করল ও?

দিন যায়। মাস যায়। বছরও যায়। পড়শিদেরও কারো কারো দীন দশা পালটাচ্ছে। মেটে দেওয়ালের উপর খড়ের চালও চাপিয়েছে কেউ-কেউ। তবে ফুলির মতো অন্য আর কেউ তাদের দৈন্যদশা সাত-তাড়াতাড়ি ঘোচাতে পারেনি, এই যা!

সেদিন—হঠাৎ যেন গোটা গ্রামের মাথায় দুর্যোগ ঘনিয়ে এল। সন্ধে না হতেই শুরু হল মুষলধারে বৃষ্টি আর বৃষ্টি এবং তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে একটু পরেই শুরু হল বাতাসের তাণ্ডব নৃত্য। তাল-সুপারির গাছগুলো মাটি থেকে উপড়ে দূরে, অনেক দূরে গিয়ে ছিটকে ছড়িয়ে পড়ল। কারো খড়ের চাল বাতাসে উড়িয়ে নিয়ে গেল তো আবার কারো মেটের দেওয়াল ধসে পড়ল। লোকজন সব দিশেহারা। সবকিছুই লণ্ডভণ্ড। রেড়ির তেলের খুঁটি—বাতিগুলো কাটা কলাগাছের মতো মাটিতে শোয়ানো। চারিদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। মনে হচ্ছিল মোটা কালো কম্বলে গোটা গ্রামটাকেই কে যেন আগাপাশতলা ঢেকে রেখেছে। সবাই কিংকর্তব্যবিমূঢ়। এমন সময় শুরু হল বাতাসের গোঙানি। ভয়ে সবাই শিউরে উঠল। কান খাড়া করে শোনার চেষ্টা করতে বাতাসে ভেসে এল দূর থেকে ঘোড়ার খুরের শব্দ। টগবগ-টগবগ-টগবগ-টগবগ।

তারপর বাতাসে খুরের শব্দ মিলিয়ে যেতে না যেতেই, মানুষের ঘোর কাটতে না কাটতেই সবাই অবাক হয়ে দেখল যে তাদের আশপাশের সমস্ত মাঠ ঘোড়সওয়ারে ভরে গেছে। এক একটা ঘোড়ার

ওপর এক-একজন ইয়া লম্বা-চওড়া দশাসই চেহারার টকটকে ফর্সা মানুষ বসে রয়েছে। রাগে আর ক্ষোভে তাদের চোখগুলো দপ্-দপ্ করে জ্বলছে। লালমুখো গোরা সাহেবগুলোও তাদের কাছে নেহাৎই শিশু বলেই তাদের মনে হল আর কি!

একটু পরেই দু'জোড়া ঘোড়ায় টানা একটা মস্ত চৌঘুড়ি গাড়ি এসে থামল ফুলির বাড়ির দোরগোড়ায়। গাড়ি থেকে নামলেন কালো বোরখা-পরা একজন সেই রকম তালঢ্যাঙা ফর্সা মহিলা। আর তাঁর পিছু-পিছু নামল আরো দুজন তাঁর মতোই লম্বা ফর্সা মহিলা; চামর দিয়ে তাঁকে বাতাস করতে-করতে। তারপর অতি কষ্টে মাথা হেঁট করে কোনো মতে তাঁরা বাড়ির ভিতর ঢুকলেন। কৌতূহল চেপে রাখতে না পেরে পাড়া-পড়শিরাও দু'চারজন ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল রহস্যটা জানার জন্য।

সেই কালো বোরখা পরা-ভদ্রমহিলা ফুলির চুলের মুঠি ধরে রাগে দাঁত পিষতে-পিষতে কড়কে বললেন—

"ওরে নেমকহারাম; তোর এত সাহস যে আমার বাচ্চার গায়েও হাত তুলিস! তোর এই বাড়-বাড়ন্ত কার জন্য রে? তা এরই মধ্যে ভুলে গেলি! সত্যি! তোরা সবই পারিস। মানুষের পো কিনা, তাই তোদের পক্ষেই এমনটি করা সম্ভব!"

ফুল কেন—ফুলির চোদ্দ পুরুষেও এমন ব্যাপার-স্যাপার কস্মিনকালেও দেখেনি। তাই ফুলি বেচারি মূর্ছা যেতে-যেতে অতি কষ্টে ঢোক গিলে বললে, "কী বলছেন কী আপনি? আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি নে! আপনার বাচ্চাকে কোন দুঃখে মারতে যাব আমি? সে তো কোনো কসুর করেনি! কোনো ক্ষতিও করেনি আমার!"

"মারিসনি তুই?" চোখ পাকিয়ে ভদ্রমহিলা জিগ্যেস করলেন।

"কি মুশকিল! বলছি তো মারিনি!" ফুলি ভয় কাটিয়ে একটু ধাতস্থ হতে-হতে বললে, "মিথ্যে বলতে যাব কোন দুঃখে? আপনি নিশ্চয় ভুল করছেন। এ বাড়িতে আজ সারাদিনে অন্য কারো কোনো ছেলেপুলেই আসেনি!"

"আবার চোপা? মিথ্যে কথা বলছিস মুখের 'পরে!" ভদ্রমহিলা রাগ সামলাতে না পেরে ঠাস করে ফুলির মুখে এক চড় কষিয়ে দিলেন। ফুলি চোখে সর্ষে ফুল দেখল। চড় খেয়ে দালান থেকে ছিটকে গিয়ে উঠোনে পড়ল। ভদ্রমহিলা বোরখার ভিতর থেকে একটা ফুটফুটে সুন্দর বছর তিন-চারের গোলগাল বাচ্চা বার করে ফুলিকে দেখিয়ে বললেন, "একে চিনতে পারছিস। ভালো করে দ্যাখ! এর ঘাড়ে আঁশবঁটির পুরোনো দাগ আছে কিনা?"

আর অমনি ফুলির কথা মনে পড়ে গেল হপ্তাখানেক আগের দুপুরবেলার একটা সামান্য ঘটনা।

ফুলি তখন কেলো শেখের জন্য ঝোল চাপাবে বলে একমনে মাছ কুটছিল। বড্ড বেলা হয়ে গেছে আজ। আর তার হাতের কাছে কাছেই ঘুরঘুর করছিল একটা কালো বিড়ালছানা। তাড়ালেও নড়তে চাইছিল না। তাই বিরক্ত হয়ে আঁশকোটা বঁটির একটা আলতো ঘা দিয়ে দিয়েছিল ঘাড়ে!

বাচ্চাটার ঘাড়ের 'পর চোখ পড়তেই ফুলির ভিরমি খাওয়ার মতো অবস্থা হল। যেন ভূত দেখল। ফুলি ঢোক গিলে বললে, "আমি তো একটা ছোট্ট বেড়ালছানাকে মেরেছিলাম। আমাদের বাড়ি ওটি রোজই আসে। আমার ছেলের সঙ্গে সারাদিন খেলাধুলো করে। তারপর সন্ধে নামলে কোথায় যে চলে যায় কে জানে! আপনার ছেলেকে আমি মারিনি তো। তাছাড়া এ ছেলে তো কোনোদিন আমার বাড়ি আসে না। আসেওনি।"

"তুই যাকে বেড়ালছানা ভাবছিস, আসলে ওটা বেড়ালছানা নয় রে মুখ্যু! আমারই একমাত্র আদরের সন্তান, এই জিশান!" ভদ্রমহিলা রাগে ও ক্ষোভে ফুঁসতে-ফুঁসতে বললেন, "আমরা জিন! খেয়াল-খুশিমতো চেহারা পালটাতে পারি। আমরা আগুন দিয়ে তৈরি আর তোরা মাটি দিয়ে। তাই আমরা তোদের দেখতে পাই। কিন্তু তোরা আমাদের দেখতে পাস না!"

ভদ্রমহিলা একটু থামলেন। তারপর আবার বলতে শুরু করলেন, "জিশান সেদিন পুকুরধারে

খেলা করছিল। আর ওকে সাধারণ বেড়ালছানা ভেবে আব্দুল খানসামার কুকুর ঘাড় মটকাবার জন্য তাড়া করেছিল। তাই দেখতে পেয়ে তোর ছেলে ছুটে গিয়ে ওকে বাঁচিয়েছিল। সেই থেকেই তোর ছেলের সঙ্গে ওর খুব দোস্তি। তাই পাতাকুড়োনি বুড়ির রূপ ধরে রোজ সকাল হলেই ওকে তোদের বাড়ি ছেড়ে দিয়ে যাই। সারাদিন ও তোদের বাড়ি থাকে। এটা-ওটা ঘাঁটে, নষ্ট করে—বলেই না রোজ সকালবেলা বালিশের তলা থেকে একটা-দুটো করে সোনার মোহর ও বেশ কিছু খোবানি পাস। সেই খোবানি খেয়েই না তোর খসমের রোগ সারল। আর আমারই দেওয়া মোহরের দৌলতেই না তোদের আজ এই বাড়বাড়ন্ত! আর সেই তুই-ই কিনা....''

এমন সময় চেঁচামেচি হৈ-হট্টগোলের আওয়াজ শুনে কাঁচা ঘুম থেকে জেগে বাইরে বেরিয়ে এল ফুলির ছোট ছেলে। সে অবাক বিস্ময়ে চোখ বড় বড় করে সবাইকে দেখছে। তার মুখে ভয়ে কোনো কথা সরছে না। তাকে দেখতে পেয়েই বোরখার ভিতর থেকে মিঁউ-মিঁউ করতে-করতে বেরিয়ে এল একটা ছোট্ট কালো বেড়ালছানা। ক'দিন পরে হাতের নাগালের কাছে প্রাণের বন্ধুকে পেয়ে ফুলির ছেলে ট্যাপা কিন্তু তার মায়ের মতো তাকে চিনতে ভুল করল না। সে তাকে কোলে তুলে আদর করতে শুরু করল। আর সেই অভাবনীয় দৃশ্য দেখে সবাই চুপ। কেউই কোনো কথা বলছে না। কী যেন ভাবছে। চিন্তা করছে। আর ঠিক সেই সময় ফুলি হাউমাউ করে কেঁদে ভদ্রমহিলার পায়ে লুটিয়ে পড়ে বললে—

''আমার ঘাট হয়েছে মা গো। বুঝতে পারিনি। আমায় এবারকার মতো ক্ষ্যামা দাও।''

''তা হবে না! দোষ যখন করেছিস, শাস্তি তখন পেতে হবে।'' ভদ্রমহিলা একটুও নরম না হয়ে সপ্তমে গলা চড়িয়ে বললেন, ''এই কে আছিস, একে গাড়িতে নিয়ে গিয়ে তোল।''

তাঁর হুকুম শোনামাত্র সঙ্গী দুজন মহিলা হিড়হিড় করে তাকে টেনে নিয়ে চলল বাইরে দাঁড় করানো জুড়ি গাড়ির দিকে। ফুলি কেঁদে বুক ভাসাল। কত আছাড়ি-পাছাড়ি খেল। নাকে-কানে খত দিল। তাতেও ভদ্রমহিলার মন গলল না। রাগ পড়ল না একটুও। এমন সময় জিশান ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে বললে, ''আমার বন্ধুর মাকে যদি তুমি ক্ষমা করে ছেড়ে না দাও তাহলে আমিও তোমার সঙ্গে আর বাড়ি যাব না!''

অগত্যা ছেলের জেদের কাছে মাকে হার স্বীকার করতে হল। ফুলিকে শেষতক ক্ষমা করে ছেড়ে দিলেন তিনি। আর যাবার সময় শাসিয়ে বলে গেলেন, ''তোদের বাড়বাড়ন্তর এখানেই ইতি। যেমন আছিস তেমনি থাকবি। এর চেয়ে বেশিও হবে না, কমও হবে না!''

তারপর আবার বাতাসে টগবগ-টগবগ-টগবগ-টগবগ শব্দ ছড়িয়ে পলকে সবাই কর্পূরের মতো সেখান থেকে উপে গেল। আর সেই দৃশ্য দেখে রাত পাহারাদার লাল পাগড়ি আগুন লাঠিঅলা বাবাগো, মাগো বলে ভিরমি খেয়ে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

তারপর থেকে কেউ আর লাল পাগড়িঅলা বা কালো বেড়ালছানাটাকে ও তল্লাটে দেখেনি।

ফাল্গুন ১৩৯৫

হোইচির গল্প

শ্যামলী বসু

অনেক, অনেক দিন আগেকার কথা। জাপানের হন্‌সু দ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তের ছোট্ট শহর শিমোনোসেকির আমিদাজি মন্দিরে থাকত হোইচি। বেচারা হোইচি, জন্ম থেকেই সে অন্ধ। চোখে দেখতে পায় না। কিন্তু তার গলায় ছিল সুর। বড় মিঠে গলা ছিল তার। তারের বিওয়া যন্ত্র বাজিয়ে সে যখন গান করত, লোকে সব কাজ ফেলে অবাক হয়ে তার গান শুনত। আমিদাজি মন্দিরের প্রধান পূজারীর দয়ায় হোইচি মন্দিরে আশ্রয় পেয়েছিল।

আমিদাজি মন্দিরের একটা ইতিহাস আছে। হন্‌সু আর কিয়ুসু দ্বীপের মাঝে শিমোনোসেকি প্রণালী। এইখানে একবার ক্ষমতার অধিকার নিয়ে জোর লড়াই হয়েছিল টাইরা আর মিশাকোটা গোষ্ঠীর লোকেদের মধ্যে। সেই যুদ্ধ জাপানের লোককথায় দানৌরার যুদ্ধ নামে খ্যাত হয়ে আছে। দানৌরার নৌযুদ্ধে টাইরা গোষ্ঠীর লোকেরা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। শত্রুর হাতে বন্দী হওয়ার চাইতে মরা ভালো—এই কথা ভেবে টাইরা গোষ্ঠীর বীরেরা তাদের শিশু সম্রাট আনটোকুকে কোলে নিয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আত্মহত্যা করে সম্রাটের মা আর ঠাকুমাও। অপমৃত্যুর ফলে তাদের আত্মা শান্তি পায়নি। শিমোনোসেকি প্রণালীতে তাদের অতৃপ্ত আত্মা নানারকম ভৌতিক উপদ্রব করে বেড়াত। তাই তাদের আত্মার তৃপ্তির জন্য শিমোনোসেকি নগরে গড়ে উঠল বিরাট আমিদাজি মন্দির। মন্দিরের কাছে একটি সমাধিক্ষেত্র তৈরি করে সেখানে টাইরা যোদ্ধা আর রাজপরিবারের সকলের নামে স্মারকস্তম্ভ তৈরি করা হল।

দানৌরার যুদ্ধে টাইরাদের বীরত্ব ও শোচনীয় পরাজয়ের কথা নিয়ে গান বেঁধেছিল হন্‌সুর চারণকবিরা। তবে আমিদাজি মন্দিরের অন্ধগায়ক হোইচি এ ঘটনা নিয়ে সব চাইতে ভালো গান গাইত। জাপানের চারপাশ থেকে যেসব লোক আসত মন্দির আর সমাধিক্ষেত্র দেখতে তারা হোইচির চারণ গান শুনত। শুনে খুব প্রশংসা করে যেত।

হোইচির দিনগুলো এমন করেই কেটে যাচ্ছিল। বিকেল হলে সে তার বিওয়া যন্ত্রটি হাতে করে এসে বসত মন্দিরের চাতালে। আপন মনে গান করে যেত।

একদিন সন্ধ্যার সময় মন্দিরের চাতালে বসে গুনগুন করে গান গাইছিল হোইচি। সেদিন মন্দিরের প্রধান পূজারী কি একটা জরুরি কাজে বাইরে গেছেন, অন্য পূজারীরা যে যার কাজে ব্যস্ত। এমন সময় হোইচির কাছে এসে দাঁড়াল এক আগন্তুক। চোখে না দেখলেও কানে শুনে হোইচি বুঝতে পারল এ আগন্তুক কোনো সৈনিক পুরুষ হবে। কারণ বর্ম আর তলোয়ারের ঝনঝন শব্দ তার কানে গেছে।

আগন্তুক পুরুষটি গম্ভীর গলায় বলে উঠল, 'গায়ক হোইচি, আমি আসছি আমার প্রভু এক সামন্তরাজার কাছ থেকে। দানৌরার যুদ্ধের উপরে গাওয়া তোমার গানের সুখ্যাতি তাঁর কানে গেছে। আমার প্রভু এসেছেন এই অঞ্চলে দানৌরার যুদ্ধ যেখানে ঘটেছিল নিজের চোখে সেই জায়গাটা দেখবেন বলে। তোমার গানও শুনতে চান তিনি। তুমি আমার সঙ্গে চল তাঁর কাছে।'

তার গানের খ্যাতি রাজারাজড়ার কানেও উঠে গেছে জেনে খুবই খুশি হল হোইচি। সে সঙ্গে সঙ্গে তার তারের যন্ত্রটি নিয়ে উঠে দাঁড়াল। তার হাত ধরে অদেখা আগন্তুক তাকে নিয়ে চলল মন্দির থেকে সামন্তরাজার কাছে। ঠিক কোনদিকে, কতখানি গেল তা বুঝতে পারল না হোইচি। তবে সে বুঝতে পারল মস্ত একটা লোহার গেটের ভিতর দিয়ে ঢুকে তাকে একটা বিশাল সভার

মধ্যে নিয়ে আসা হয়েছে। কারণ চারদিক থেকেই অনেক লোকের গলার স্বর, জামাকাপড়ের খসখসানি আর অস্ত্রের ঝনঝনানি কানে ভেসে এল হোইচির।

একজন মহিলা যেন তার দিকে এগিয়ে এসে মিষ্টি গলায় বলে উঠলেন, 'এস, এস, হোইচি। তোমার গানের সুখ্যাতির কথা আমাদের কানে এসেছে। আজ তোমার গান শুনব আমরা। টাইরা যোদ্ধাদের বীরত্বের আর দানৌরা যুদ্ধের অমর কাহিনির গান গেয়ে শোনাও আমাদের।' এই বলে মহিলাটি তাকে বসিয়ে দিলেন একটি পাথরের বেদির উপরে।

এমন শ্রোতা পেয়ে, মন-প্রাণ ঢেলে গান শেষ করল হোইচি। অনেকক্ষণ ধরে গান গেয়েছিল সে। গান শেষ হতে চারদিক থেকে প্রশংসা কানে এল তার। গর্বে আনন্দে হোইচির মন ভরে উঠল। সেই মহিলাটিও মধুর গলায় বলে উঠলেন, হোইচি, তোমার গান শুনে আমরা খুব খুশি হয়েছি। আমাদের রাজাও অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছেন। রাজা আরো কয়েকদিন এখানে থাকবেন। তাঁর ইচ্ছা এই ক'দিনই তুমি রোজ সন্ধ্যাবেলায় এসে আমাদের গান শুনিয়ে যাও। তুমি রাজি আছ তো?'

'এ তো আমার পরম সৌভাগ্য।' আনন্দে গদগদ হয়ে বলে উঠল হোইচি।

'কিন্তু একটা শর্ত আছে।' বলে উঠলেন মহিলাটি, 'তুমি কাউকে বলতে পারবে না আমাদের কাছে এসে গান শোনানোর কথা। কারণ রাজা চান না, তাঁর এই অঞ্চলে থাকার কথা জানাজানি হয়ে যায়। তাহলে তিনি নিশ্চিন্তে শান্তিতে থাকতে পারবেন না এখানে।'

'ঠিক আছে। এ কথা আমি কাউকেই জানাব না।' বিনীতভাবে বলল হোইচি।

'কাল আবার সৈনিককে পাঠাব তোমাকে নিয়ে আসার জন্য। তুমি প্রস্তুত থেকো।' জানিয়ে দিলেন মহিলা।

পরের দিন সন্ধ্যাবেলায় সৈনিকটি এসে আবার হোইচিকে নিয়ে গেল সামন্তরাজার সভায়। সেদিনও তার গান শুনে সকলে কত প্রশংসা করলেন।

'কাল আবার তোমাকে আনতে লোক পাঠাব', বলে দিলেন সেই মহিলা।

পরপর দু'দিন সন্ধ্যায় হোইচি মন্দিরে যে নেই, এটা লক্ষ করেছিলেন এক পূজারী। তিনি প্রধান পূজারীকে জানিয়ে দিলেন সে কথা। অন্ধ গাইয়ে হোইচিকে প্রধান পূজারী খুবই ভালোবাসতেন। তিনি ব্যস্ত হয়ে হোইচিকে ডেকে বললেন, 'কি হয়েছে তোমার হোইচি? দু'দিন সন্ধ্যায় তুমি মন্দিরে ছিলে না? তোমার শরীর ভালো আছে তো।'

হোইচি একটা এলোমেলো উত্তর দিল।

হোইচির দায়সারা উত্তরে সন্তুষ্ট হলেন না প্রধান পূজারী। তিনি সবাইকে ডেকে বলে দিলেন হোইচির উপরে যেন সবাই কড়া নজর রাখে। বেচারা অন্ধ হোইচি যেন কোনো বিপদে না পড়ে।

পরের দিন সন্ধ্যায় আবার সেই সৈনিকটি নিতে এল হোইচিকে। বিনা বাক্যব্যয়ে তারের যন্ত্রটি হাতে নিয়ে তাকে অনুসরণ করে মন্দির ছেড়ে চলে গেল হোইচি।

সেদিন সন্ধ্যা থেকেই প্রবল ঝড়-জল শুরু হয়ে গেল। হোইচিকে মন্দিরে না দেখে অন্য পূজারী আর লোকজনদের ডেকে প্রধান পূজারী চললেন তার খোঁজ করতে। এই ঝড়-জলে অন্ধ হোইচি কোথায় গেল?

সকলে লণ্ঠন নিয়ে খুঁজতে বেরোলেন হোইচিকে। খানিক খোঁজাখুঁজির পর হোইচিকে পাওয়া গেল আমদাজি মন্দিরের সমাধিক্ষেত্রে। টাইরা যোদ্ধাদের স্মারক সমাধিগুলোর কাছে, একমনে গান গেয়ে চলেছে সে। এত ঝড়-বৃষ্টি, কোনোদিকেই হুঁশ নেই তার। আর তাকে ঘিরে জ্বলছে অদ্ভুত অপার্থিব আলো।

মন্দিরের লোকজনেরা তাকে জোর করে উঠিয়ে নিল সমাধি থেকে। বেজায় রেগে গিয়ে হাত-পা ছুঁড়ে প্রতিবাদ করতে লাগল হোইচি, 'কেন তোমরা আমাকে বিরক্ত করছ? এখানে কেন এসেছ তোমরা? জান না, রাজা ভীষণ রাগ করবেন?'

তাকে অনেক করে বুঝিয়ে সবাই মন্দিরে নিয়ে এল।

লোকজনের মুখে সব কথা শুনে প্রধান পূজারী চমকে উঠলেন। কি সর্বনাশ! টাইরা যোদ্ধাদের আত্মা তাড়া করে বেড়াচ্ছে বেচারা অন্ধ হোইচিকে। এবার হয়তো মারা পড়বে বেচারা।

হোইচির সঙ্গে কথা বলে প্রধান পূজারী বুঝলেন, তাঁর অনুমান সত্যি। আর তাঁর মুখ থেকে সব কথা শুনে বেজায় ভয় পেয়ে গেল হোইচি। 'তাহলে কি হবে আমার? আবার যদি কাল ওরা নিতে আসে আমাকে!' কেঁদেই ফেলল সে।

'তোমার কোনো ভয় নেই', পূজারী হোইচিকে আশ্বস্ত করে বললেন, 'তোমাকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করব আমরা।'

পরের দিন মন্দিরের এক পূজারীকে ডেকে প্রধান পূজারী বলে দিলেন—'হোইচির সারা শরীরে, মাথার চুল থেকে পায়ের তলা পর্যন্ত, সব জায়গায় মন্ত্র পড়ে দিতে। তাহলে ভূতেরা আর হোইচিকে দেখতে পাবে না, কোনো ক্ষতিও করতে পারবে না।' তারপর হোইচিকে ডেকে বলে দিলেন, 'দেখ হোইচি, মন্ত্র পড়ে দিলে তোমাকে আর আত্মারা দেখতে পাবে না। তুমি সন্ধ্যাবেলায় যেমন মন্দিরে বসে থাক, তেমনি বসে থাকবে। তোমাকে আত্মাদের কেউ ডাকতে এলে সাড়া দেবে না, কোনো শব্দও করবে না, তাহলে রেহাই পাবে তুমি।'

হোইচির সারা শরীরে মন্ত্র পড়ে দিলেন এক পূজারী। তারপর তারের যন্ত্রটা হাতে নিয়ে হোইচি বসে রইল মন্দিরের চাতালে। সন্ধ্যাবেলায়, তার কানে এল সেই ভূতুড়ে সৈনিকের পায়ের শব্দ। হোইচি শুনতে পেল তার নাম ধরে সে ডাকছে। 'হোইচি, কোথায় গেলে তুমি?'

ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে বসে রইল হোইচি। সাড়াশব্দ দিল না। বার কয়েক ডাকাডাকি করে যখন কোনো সাড়া মিলল না, তখন সেই সৈনিকের আত্মা রেগে গিয়ে বলে উঠল, 'হোইচিকে দেখতে পাচ্ছি না, কেবল তার তারের যন্ত্রটা পড়ে আছে দেখতে পাচ্ছি। আর দেখতে পাচ্ছি হাওয়ার মধ্যে ভাসছে হোইচির দুটো কান। তাহলে এই কান দুটোই আমি আমার প্রভুর কাছে নিয়ে যাই। আমি যে হোইচিকে ডাকতে এসেছিলাম, এটাই হবে তার প্রমাণ।' এই কথা বলে সৈনিকের আত্মা হোইচির কান দুটো কেটে নিয়ে চলে গেল।

বেচারা অন্ধ গাইয়ে সব যন্ত্রণা সহ্য করল মুখ বুজে। ভয়ে কোনো শব্দ বেরোল না মুখ দিয়ে। শেষে কানকাটার যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল মন্দিরের চাতালে।

মন্দিরের পূজারীরা আর লোকজনেরা এসে দেখতে পেল হোইচি জ্ঞান হারিয়ে পড়ে আছে মন্দিরের চাতালে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে তার মুখ। তাই দুটি কানই কেটে নিয়ে গেছে যেন কেউ।

প্রধান পূজারী খুব বকলেন সেই পূজারীকে, যাকে তিনি হোইচির শরীরে মন্ত্র পড়ে দিতে বলেছিলেন। সেই পূজারী হোইচির সারা শরীরে মন্ত্র পড়ে দিলেও, দুটি কানে মন্ত্র পড়তে ভুলে গিয়েছিলেন। তাই সৈনিকের আত্মা কেবল হোইচির কান দুটিই দেখতে পেয়েছিল। পূজারীর গাফিলতির জন্য কান দুটি হারাল বেচারি হোইচি।

অনেক সেবাযত্নের পর হোইচি সুস্থ হয়ে উঠল। তার ক্ষতও শুকিয়ে গেল। কিন্তু সেই থেকে লোকে আড়াল থেকে তাকে ডাকত 'কানকাটা হোইচি'।

প্রাচীন জাপানের গল্প

কার্ত্তিক ১৩৯৭

ভূতুড়ে বিজ্ঞাপন

কল্যাণ মৈত্র

কলকাতার খুব বড় একটি বাংলা কাগজের সাতের পাতায় নীচের দিকে বেরিয়েছিল বিজ্ঞাপনটা। বয়ানটাও ছিল চমৎকার। তবে সাতের পাতায় হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশের টুকরো টুকরো বিজ্ঞাপনের ভিড়ে হারিয়ে গিয়েছিল।

ভূত গবেষণা কেন্দ্র

গবেষক, লেখক, আর্টিস্ট, ভ্যাগাবন্ড, বেকার (পুরুষ ও মহিলা) চাই। ফ্রিলান্স ক্যামেরাম্যান, লাইটম্যান, মেকাপম্যান যোগাযোগ করুন। ৯৮৩০০১০০০

পচাদা খেয়াল করেছিল প্রথম। হারানের সেলুনে কাগজ পড়তে গিয়ে। তারপর একপ্রকার ছুটতে ছুটতে ঘর্মাক্ত অবস্থায় হাজির হল ক্লাবে।

রবিবার। সাতসকালে চাঁদের হাট বসেছে। পচাদাকে ছুটে আসতে দেখে ভজা ক্যারামবোর্ডে স্ট্রাইকারটা কোনোরকমে হিট করেই উঠে দাঁড়ায়, আরে পচাদা যে, কি ব্যাপার? বিপদ নাকি?

হোয়্যার ইজ ব্রজ, কল হিম। আই ওয়ান্ট হিম ইমিডিয়েটলি—পচাদা উত্তেজিত। ব্রজ এই মুহূর্তে নেই। তিনু, পিন্টু ছুট দিল।

ভজা বলল, পচাদা, সকাল সকাল পণ্ডিতকে কি দরকার? কোনো খাস খবর, টিউশনি আছে? ভজার কৌতূহলের সীমা নেই। একের পর এক প্রশ্ন করে চলেছে।

পচাদা বরং স্বভাববিরুদ্ধভাবে আজ বেশি গম্ভীর। বলে, একটা রেড ডটপেন দে।

টেবিলের উপর পচাদা কাগজটা মেলে ধরে। তারপর লালকালিতে মার্ক করল বিজ্ঞাপনটা। ভজাও মার্ক করছে পচাদাকে।

ইতিমধ্যে দেখা গেল তিনু, পিন্টু হন্তদন্ত হয়ে ব্রজকে নিয়ে আসছে। ঠিক যেন পুলিশে চোর ধরেছে।

বিজ্ঞাপনটা পড়!

ভজা পড়ে বলল, তা না হয় হল। কিন্তু ঠিকানা কই?

তুই একটা গাধা। ঠিকানাটা ওতেই আছে। তোকে কি ক্যাওড়াতলা বা নিমতলায় ইন্টারভিউ নিতে ডাকবে?

নীচের সংখ্যাগুলো আসলে মোবাইল নাম্বার—ব্রজ কথাটা শেষ করতে পারলে না।

দ্যাটস রাইট। দশটা সংখ্যা। ওখানে যোগাযোগ করতে হবে।

ব্রজ বুঝতে পারছে না ওই বিজ্ঞাপনের সঙ্গে তার কি সম্পর্ক। ভূত গবেষণা কেন্দ্রের কি উপকারে সে লাগতে পারে, বিজ্ঞাপনে যা যা চাওয়া হয়েছে তার কোনোটাই সে নয়। লেখা-টেখার একটু অভ্যাস আছে যা এই মাত্র।

ভজা বলল, ইনটারেস্টিং কেস। ভূত নিয়ে গবেষণা। আগে তেমন শুনিনি। ঘোস্ট রিসার্চ সেন্টার। অভিনব।

পচাদা হঠাৎ হঠাৎ চটে যায়। চেঁচিয়ে বলল, শাট আপ। কাজের সময় আজেবাজে কথা পছন্দ করি না। দেখছিস একটা সিরিয়াস ব্যাপার নিয়ে ডিল করছি। পেটে এখনও দানাপানি পড়েনি।

এবার ভজা বলল, তিনু, মেজদার দোকানে আটটা হাফ বলে আয়। সঙ্গে নোনতা। না, পচাদার জন্য ফুল। আমাদের হাফ, লিকার। আমার অ্যাকাউন্টে।

পচাদা একটা সংশোধনী দিল, আমার জন্য তার আগে চারটে লাল-লাল জিলিপি—বড্ড খিদে পেয়েছে রে—

সকলে আবার বিজ্ঞাপনটা নিয়ে পড়ল।

ব্রজ তুই যাবি। তুই লেখকও বটে, আবার ভূত-টুত নিয়ে তোর পড়াশোনাও আছে। আমার মনে হয় তোর থেকে ভালো ক্যানডিডেট আর হয় না। যোগাযোগ কর। চাকরিটা হয়ে যাবে, বসে থাকার চেয়ে একটা অভিজ্ঞতা হয়ে থাকা ভালো। ভালো না লাগলে ছেড়ে দিতে কতক্ষণ।

ব্রজ কিংকর্তব্যবিমূঢ়। বাড়িতে লুচি-পায়েস হচ্ছিল, তা ছেড়ে এখানে—পচাদার পাল্লায়! আজ কার মুখ দেখে যে উঠেছিল!

ভজা অনেকক্ষণ চুপচাপ ছিল। এবার সে বলল, পচাদা, 'ভ্যাগাবন্ড চাই'—তা না হয় হল—ওরা ক্যামেরাম্যান, লাইটম্যান নিতে চাইছে কেন?

ছবি-টবি করবে বোধহয়।

ইতিমধ্যে আরও দশ-বারোজন জুটে গেছে। ভিড় জমছে। তিনু জিলিপির ঠোঙা থেকে রস চাটতে চাটতে বলল, সেই সত্যজিৎ রায় ছবি করেছিলেন—গুপী গাইন বাঘা বাইন—তারপর ভূতের আর ভালো ছবি হল কই।

তিনু বলল, এটা মনে হচ্ছে লাইভ হবে। মানে টাটকা ভূতের ছবি।

ভজা বলল, আমার ঠাকুরদা দু'চারটে ছবিতে কাজ করেছিলেন। বাড়িতে একটা ছবির পরিবেশ ছিল, আমি আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা না হোক, বংশপরম্পরা থেকে বলতে পারি—কী হতে চলছে।

কী যেন ভাবছে পচাদা। ব্রজ চুপচাপ। ভজা বলে চলেছে, তিনুর কাঁধে তার হাত, যেমন ধর একটা পুরোনো রাজবাড়ি দুশো বছরের বেশি—বাঁশঝাড়, ভাঙা ঘাট। পুরোনো আসবাবপত্র, মাকড়সার জাল, ঝুল—স্যাঁতস্যাঁতে পরিবেশ—ভূত-ভূত গন্ধ, শ্যাওড়া গাছ—এই ধরনের একটা সেট—নকল বা বানানো নয়, আসল। ক্যামেরাম্যান গোপন জায়গা থেকে শট নিচ্ছে—ভূতের কাহিনি—জ্যান্ত ভূত নড়ছে-চড়ছে। তারপর সেটা সিনেমা হলে, দূরদর্শনের মাধ্যমে ঘরে ঘরে দেখানো হচ্ছে। একটা সিরিয়াল হলে সোনায় সোহাগা। ভাবতে পারছিস কি থ্রিলিং হবে ব্যাপারটা। যে বা যারা বিজ্ঞাপন দিয়েছে তারা সত্যিই বুদ্ধিমান। ব্যাপারটা নামাতে পারলে যা মুনাফা হবে, যা পপুলারিটি পাবে তা ভাবতে পারছি না। ইংরিজিতে সাব-টাইটেল দিয়ে 'কান' চলচ্চিত্র উৎসবে আসল ভূতের ছবি দেখানো। ইন্টারন্যাশনাল পুরস্কার—একে একে সব হয়ে যাবে। স্বপ্নে বিভোর হয়ে ওঠে ভজার চোখ। যেন সে-ই ছবির প্রযোজক-পরিচালক।

পচাদা বলল, ব্রজ, তুই তোর ভূতের গল্পগুলোও নিয়ে যাস। রিসার্চের কাজে লাগবে। তৈরি হ্ ইন্টারভিউয়ের জন্য। আমি দেখি মোবাইলে যোগাযোগ করতে পারি কিনা! লেট আস গেট ক্র্যাকিং—যে যার বাড়ি চলে যাও। 'সন্ধে সাত ঘটিকায় পুনরায় হাজিরা'।

মুড ভালো থাকলে পচাদা ইংরেজি এবং সাধু বাংলায় কথা বলে।

পচাদা চলে গেল।

ভজার হাতে এবার লিডারশিপ। কেউই আর বাড়ি যাবার নাম করে না।

ব্রজর দিকে তাকিয়ে ভজা বলল, তোর ইন্টারভিউ হবে এখনই—মহড়া দে। একটু ঝালিয়ে নে। এই যেমন ধর গিয়ে—গুপি ও বাঘার আসল নাম কি ছিল?

তিনু বলল, গুপী গাইন, বাঘা বাইন।

রাসকেল। কিছু জানো না। কানু কাইনের ছেলে গুপী কাইন, পরে গুপী গায়েন—সে গান গাইতে পারত। আর পাঁচু পাইনের ছেলে বাঘা। সে ঢোলক বাজাত, তার নাম হল বাঘা বায়েন। গল্পটা উপেন্দ্রকিশোরের।

এই ভাবে চলতে লাগল ব্রজর ওপর দ্বিপ্রাহরিক প্রহার। সকলেই নিজ নিজ বিদ্যে ফলাতে ব্যস্ত।

তিনু বলল, ভূতের ছায়াছবি করার মতলবটা কার উর্বর মস্তিষ্ক থেকে বের হল সেটাও জানার বিষয়। যেই হোক, লোকটা গ্রেট। বাণিজ্য ভালো বোঝে। যা খাবে না বাজারে!

ভজা তিনুকে সেখানেই থামাতে বলল, এই তুই, তুই বল দেখি রবীন্দ্রনাথের একটা ভূতের গল্পের নাম—

তিনু বলল, মণিহার।

ইডিয়েট। অনেকটা কাছাকাছি বলেছিস তাই তোকে ছেড়ে দিলাম। রেগেমেগে ভজা বলল।

ব্রজ বলল, ওটা 'মণিহারা' হবে।

ব্যাপারটা বেশ জমে উঠেছে। নানারকম গল্পের সঙ্গে চলেছে প্রশ্ন-উত্তর পর্বও। পচাদা ব্রজকে সিলেক্ট করেছে। বাংলা সাহিত্যের ছেলে ব্রজ। এই পরিস্থিতিতে সে কিছুটা বেমানান। কিন্তু উপায় নেই।

পিন্টু এতক্ষণ তেমন কোনো কথা বলেনি। সে ফুট কাটল, ভূতের দফা গয়া। এসবই ভূতের ভবিষ্যৎ বাঁচানোর চেষ্টা। বিদেশ থেকে এবার ভূত-প্রেত রপ্তানিও করা হবে দেখে নিও। বিজ্ঞাপনটা দেখে মনে হচ্ছে পেছনে একটা গভীর ষড়যন্ত্র আছে। ভূত-টুত বলে আমাদের খেপিয়ে তোলার চেষ্টা। এমনিতেই বাঙালি এইসব ভূত-প্রেত ভালোবাসে। ভয়ও পায় আবার বিশ্বাসও করে না। বাংলাদেশে ভূতের আকাল পড়েছে। কোথায় ভূত! রাতের অন্ধকার নেই। গলির মোড়ে মোড়ে আলো। বনবাদাড়ে বাঁশঝাড় নেই। খোলা মাঠ নেই। জলাভূমি শেষ হয়ে যাচ্ছে। পুরোনো বাড়ি প্রোমোটাররা খেয়ে ফেলছে। ভূতগুলো আর যায় কোথায়, তবে যদি ছবি-টবিতে সুযোগ পায়। ওদের দর বাড়ে। বড় কষ্টে আছে বেচারিরা।

পচাদা সন্ধের আসরে আসতে পারেনি। খবর পাঠিয়েছে, সামনের শনিবার পাথুরেঘাটায় ব্রজকে যেতে হবে। দুটোর সময়। সে যেন তৈরি থাকে।

শনিবার বারবেলায়! ব্রজ কিঞ্চিৎ ভয় পেল। ভজা বলল, ভালো তো ইন্টারভিউটা জমবে।

কয়েকশো লোকের কালো মাথার ভিড়ে ব্রজেন রায় ওরফে চড়কডাঙার ব্রজ আজ আর হারিয়ে যায়নি। এই মুহূর্তে তার কোনো টেনশন নেই। অনেক কষ্টে বাড়িটা খুঁজে পেয়েছে সে। গলির এক কোণে পুরোনো সেকেলে বাড়ি। জীর্ণ, পরিত্যক্ত। ভেতরটা কেমন ভ্যাপসা, গুমোট।

দরজার বাইরে লাল আলো জ্বলছে। ইন্টারভিউ চলছে বোধহয়। সে ভাবল। একটি লোক অনেকক্ষণ বাদে বেরিয়ে এসে বলল, এখানে অপেক্ষা করুন। সময় হলেই ডাকা হবে।

কাল রাতেও ব্রজেন ভেবেছিল আসবে না। কিন্তু গোলমাল পাকালো ওই পিন্টু। চড়কডাঙার মোড়ে হারুদের বাড়ির লেট নাইট আড্ডায় বসার পর থেকে তার সব কিছু গোলমাল পাকিয়ে গেল। শুভানুধ্যায়ীর ভঙ্গিতে বলল, শোন ব্রজ, তুই একটা অভিজ্ঞ লোক। কালকের ইন্টারভিউটা তুই দিয়ে আয়। আর কিছু না হোক তোর রেকর্ডটা হয়ে যাবে। এক হাজার বার ইন্টারভিউ দেওয়া মুখের কথা! অন্য দেশের সরকার হলে লজ্জায় তোকে চাকরি দিত। বলা কি যায় 'গিনিস বুক'-এ তোর নামও উঠতে পারে।

ব্রজেনের ডাক আর আসে না। উসখুস করছে সে। উঠে চলে যেতেও পারছে না। দিনকাল যা পড়েছে সামান্য চাকরির জন্য পি এইচ ডি ডিগ্রিধারীও এসে হাজির হয়। এবারটায় তেমন ভিড় নেই। পচাদার প্রতি সে মনে মনে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল।

এবার আলো নিভল। একমাথা টাক, সাদা উর্দি পরা একজন দারোয়ান ব্রজেনকে ইশারায় ডাকল। সবই কেমন নিঃশব্দে হচ্ছে। থমথমে ভাব। নিস্তব্ধ চারপাশ। বাইরে জাম গাছের ওপর কতগুলো কাক ঝগড়া করছে। একটা কালো বেড়াল ব্রজেনকে দেখে যেন কি ভাবল, তারপর সেও চলে গেল তিনতলার সিঁড়ির দিকে। এই ভরদুপুরেও বাড়ির ভেতরটা কেমন মৃদু আলো আর অন্ধকারে ডুবে রয়েছে। প্রথম দিকে ব্রজর এতটা খেয়াল হয়নি। দেওয়ালে বড় বড় টিকটিকি ছুটোছুটি করছে। বাড়িটা সত্যিই ঠিক ভূতের বাড়ির মতো।

আসুন স্যার এই দিকে। দরজাটা ঠেলুন।

দরজা ঠেলে ভেতরে মুখ বাড়িয়ে ব্রজেন একটু দেখে নিল। না, কেউ তাকে আসতে অনুরোধ করল না। ঢুকেই পড়ল সে। ঘরের কোণে একটা আলো জ্বলছে। স্যাঁতস্যাঁতে চারপাশ। চল্লিশ ইঞ্চির দেয়াল। ঘরের মাঝখানে একটা বড় টেবিল। তার ওপর একটা ফোন। কালো রঙের। ফোনের রিসিভারটা শূন্যে ঝুলছে।

টেবিলের কাছেই একটা চেয়ার। ব্রজেন ঠায় দাঁড়িয়ে। ওপ্রান্তে একজন বসে। বেঢপ মোটা। ঘাড়ে গর্দানে। মনে হচ্ছে মাথাটা কেটে কেউ যেন বুকের ওপরে বসিয়ে দিয়েছে। তার গায়ের রঙ কয়লার মতো কালো। শ্বেতশুভ্র দাঁতের ফাঁকে হাসির ঝিলিক। ব্রজেনের দিকে চাইলেন তিনি। কে যেন তার কানে কানে বলল, ইনি গবেষণা কেন্দ্রের ডিরেক্টার, ওমপ্রকাশ তামাকুওয়ালা। ব্রজেন জোড় হাতে বাঙালি কায়দায় নমস্কার জানাল। ওমপ্রকাশ বসতে বললেন।

এবার তার চোখ পড়ল আরেক জনের ওপর—শিবেন বিশ্বাস। এক সময় তার প্রাইভেট টিউটর ছিলেন। নামকরা ঔপন্যাসিক ছিলেন।

শিবেনবাবু পান চিবুতে চিবুতে বললেন, আজও চাকরি পাসনি। তোকে তখনই বলেছিলাম কিস্যু হবে না। কী হল অত পড়াশোনা করে।

ব্রজেনের মনে পড়ে গেল 'রামেরা তিন ভাই' ট্রানস্লেশন না পারার জন্য শিবেনবাবু একবার তাকে রামদাওয়াই দিয়েছিলেন।

তামাকুওয়ালা বললেন, উনি আমাদের লেখক। নামজাদা স্ক্রিপট্‌রাইটার। চেনেন নিশ্চয়ই। ভূতের কাহিনি নিয়ে আমরা যে ছবি আর সিরিয়াল করব উনি তার চিত্রনাট্য লিখবেন। আমাদের একজন কপিরাইটার মানে লেখকই ধরুন, আর তথ্য অনুসন্ধানের লোক চাই। আপনি রাজি থাকলে বলুন। কত মাইনে চান তাও বলুন। প্রথমে আমরা কুড়ি-পঁচিশ জনের একটা ইউনিট করে এ বাড়িতেই কাজ চালাব। শূটিং-টুটিং সব এখানেই হবে। নায়ক-নায়িকাদের খোঁজখবর চলছে, বুঝলেন না। মানুষ দিয়ে তো আর ভূতের অভিনয় করানো চলে না। আমরা সত্যি ভূতেদের নিয়ে কিছু করতে চাই। তাদের দিয়েই অভিনয় করাব। আমাদের কনসেপ্টটা আলাদা। মানুষ দিয়ে ভূতের ছবি বোগাস। ভূতের ছবিতে ভূতেরাই অভিনয় করবে। আপনি টাইটানিক দেখেছেন? না দেখলে আমাদের স্টুডিওতে দেখে নেবেন। ওই রকম কায়দায় আমরাও একটা সেনসেটিভ ছবি করব। মানে প্ল্যানিংটা তাই-ই।

....আপনি জানতে চাইছেন তাহলে আপনাকে দরকার কেন? তাইতো? আমরা আপনাকে দিয়ে গবেষণার কাজটা, তথ্য অনুসন্ধানের কাজটা করাতে চাই। আপনি পয়সা পাবেন। আপনার বায়োডাটা যা দেখলাম তাতে আপনি ওই কাজ পারবেন বলেই আমাদের বিশ্বাস। এবার ভেবে দেখুন কি করবেন। আমরা যে দু'চারজন জ্যান্ত মানুষ নেব তাদেরকে কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত এখানেই আমাদের সঙ্গে থাকতে হবে। আমাদের কাজটা শুরু হবে রাতের বেলা।

....ছবি রিলিজ করলে টাকাপয়সা মিটিয়ে ছুটি করে দেব।

....হ্যাঁ, আর একটা কথা। বাইরের কিছু কাজ আপনাকে করে দিতে হবে। সঙ্গে একজন অ্যাসিস্টেন্ট পাবেন। তিনি অবশ্য আমাদের লোক।

ব্রজেনের মনে পড়ল, শিবেনবাবু বছর দশেক আগে দার্জিলিং-এ পাহাড়ের ধসে প্রাণ হারিয়েছিলেন। কাগজে সে খবর ছাপাও হয়েছিল। তিনি ভূত হয়েও তাঁর সেই নেশা ছাড়তে পারেননি। আশ্চর্য! ব্রজেনের হাত-পা ক্রমশ ঠান্ডা হতে থাকে। সে ঘামতে শুরু করেছে। ভয়ে সে কাঠ হয়ে গেছে।

এরপর শিবেনবাবু বললেন, ওর আর কি। বেকার। কাজ নেই। থাকুক আমার সঙ্গে। ভালো টাকা পাবে। ওর লেখা-টেখার রোগ আছে। অভিজ্ঞতা হলে পরে কাজে দেবে।

রাতে কাজ যথারীতি শুরু হল। প্রথম পর্ব—ভূতের জন্ম। পুরাকালের ভূত। পর্বের নামকরণ

তখনও হয়নি। ওমপ্রকাশ বললেন, এটা হচ্ছে মহড়া। আসল শূটিং আর কিছুদিন পরে হবে। আজ রাতটা আপনি দেখুন। আরও অনেকে এসে পড়ল বলে। আমরা যতদিন না ক্যামেরাম্যান পাচ্ছি ততদিন এদিকের কাজটা চলুক।

এবার খেয়াল হল ব্রজেনের। তার চোখ দুটো বন্ধ। চোখে হাত দিয়ে সে দেখল—হ্যাঁ তাই। তাহলে সে দেখছে কি করে?

চড়কডাঙার মোড়ে পুলিশের গাড়ি। ব্রজেনের বাবা-মা-দিদি কাঁদছে।

পাথুরেঘাটার একটি বাড়িতে তাকে অচৈতন্য অবস্থায় পাওয়া গেছে।

হঠাৎ বাইরে পচাদার গলা। মাসিমা, ও মাসিমা! জানলার বাইরে থেকে ডাকছে সে।—ব্রজ ফিরেছে? ওর না আজ কলকাতায় যাবার কথা ছিল। ইন্টারভিউ.....

ও তো বাড়িতেই। সেই দুপুর থেকে ঘুমোচ্ছে। দেখ না সন্ধে হয়ে এল। এ ছেলের যে কি হবে!! বড্ড ঘুমকাতুরে।

আধো ঘুমের ভেতর ব্রজ পচাদার গলা শুনতে পেল। এতক্ষণ তা হলে সে কী দেখল? উঃ কি ভয়ই সে পেয়েছিল!

ব্রজ ওপাশ ফিরে ফের ঘুমোতে চেষ্টা করল। আজ সে পচাদার মুখোমুখি কিছুতেই হবে না।

অগ্রহায়ণ ১৪০৮

পাহাড়ী জোছন

মনতোষ মিশ্র

ঠুক-ঠুক-ঠুক, ঠুক-ঠুক, ঠুক.........

শব্দটা ভেসে আসছে ঘন গাছগাছালি ঘেরা পুকুরের কাছ থেকে! কেউ যেন জোরে জোরে টোকা মারছে। আরো জোরে! তিনবার দু-বার একবার। তিন-দুই-এক, তিন-দুই-এক...কোনো সংকেত মনে হচ্ছে! যদি সংকেতই হয় তবে কিসের? কেন?

দোলপূর্ণিমার ধপধপে জোছনার আঁকি-বুকি মিতুনের আমকাঠের চৌকির বিছানায়। আম-জাম-তাল-খেজুর-নিমগাছে ঘেরা মাটির বাড়ির দোতলায় টিনের ছাউনিতে মশার গান, নাম-না-জানা পাখিদের কিচির-মিচির মিলেমিশে এক আলাদা অনুভূতি। আমকাঠের চৌকির বিছানায় ঘুম আসছে মিতুনের আর তখুনিই ঐ শব্দটা! কেউ বোধহয় মাটিতে কিছু পুঁতছে! আবার কাঠঠোকরাও হতে পারে। কিন্তু এই মাঝরাতে এতজোরে কাঠঠোকরা! অসম্ভব!

চৌকি ছেড়ে জানালার ধারে এসে দাঁড়ায় সে। জানালার নীচে দিয়ে কাঁকুরে রাস্তাটা এঁকেবেঁকে পুকুরের কাছে গিয়ে ঘন গাছের ছায়ায় অস্পষ্ট। শব্দটা কিন্তু স্পষ্ট! ছন্দময়। তিন-দুই-এক....

দরজা খুলে বেরিয়ে পড়ে মিতুন। একবার মনাকে ডাকবে কি-না ভাবে। দোলপূর্ণিমাটা শুশুনিয়া পাহাড়ে কাটানোর জন্যই মনার বাড়িতে এসেছে। ট্রেন লেট হওয়ার জন্য দোলপূর্ণিমার দিন যাওয়া হল না, কাল সকালেই মনা তাকে ও বন্ধুদের নিয়ে পাহাড়ে যাবে ঠিক হয়েছে। পূর্ণিমায় শুশুনিয়া পাহাড়ের ওপর জ্যোৎস্না যে কত সুন্দর লাগে তা বোঝাতে গিয়ে মনার সঙ্গে বন্ধুদের ঝগড়া প্রায় হাতাহাতি হওয়ার উপক্রম। শেষটায় মিতুনই সবাইকে থামায়। হস্টেলের সেই ঝগড়ার কথা বন্ধুরা মনে রেখেছে এখনও।

বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ হলেই মনার সেদিনের ঐ ঝগড়ার কথা ওঠে। রাতারাতি হস্টেলে ওর নাম হয়ে গেল 'পাহাড়ী জোছন'। প্রথমটায় ওকে পাহাড়ী জোছন বললে ভীষণ ক্ষেপে যেত। কিন্তু পরে বুঝেছিল, স্কুল-কলেজ জীবনে কাউকে ক্ষেপাতে পারলে দারুণ আনন্দ। তাই সে আর বন্ধুদের কথা গায়ে মাখত না, উল্টে বলত, যা মনে আসে তাই বল। বিনি পয়সায় আনন্দ করতে আর দিচ্ছি না তোদের। তবে হ্যাঁ, একদিন না একদিন তোদের পাহাড়ে নিয়ে যাবই, তখন বুঝবি।

মনার কাছেই মিতুনরা শুনেছে বাঁকুড়ার শুশুনিয়া পাহাড়ের ইতিহাস। পুষ্কণ-রাজ চন্দ্রবর্মার একটি শিলালিপি আছে এখানে। সময় খ্রিস্টিয় চতুর্থ শতক। লিপির ওপরে আছে একটি বিষ্ণুচক্র। চক্রের মধ্যে দীপশিখা। পরিধি পর্যন্ত আছে আটচল্লিশটি রেখা। চৌদ্দটি ফুলের পাপড়ি ও চৌদ্দটি দীপশিখা। শিলালিপিতে পাওয়া গেছে চন্দ্রবর্মার পিতা মহারাজা সিংহবর্মার কিছু কিছু বিবরণ। প্রাগৈতিহাসিক উপাদানে ঘেরা ১৪৪২ ফুট উঁচু এই পাহাড়ে আছে পুরোনো পালাইয়োলোকেডন নমডিকাস হাতির জীবাশ্ম। এশিয়া, ইউরোপ এবং আফ্রিকার কোয়াটেরনারি যুগের জীবনধারার সঙ্গে মিল খুঁজে পাওয়া যায় এই পাহাড়ের চারদিকে বাঁকাজোড়, হাড়োকা, ধনকোড়া ও গন্ধেশ্বরীর তীরে পাওয়া প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনে। মহারাজ চন্দ্রবর্মার শিলালিপির ভাষা সংস্কৃত কিন্তু হরফ ব্রাহ্মী।

আঁকাবাঁকা কাঁকুরে রাস্তাটায় পা দিয়েই গাটা কেমন ছমছম করে মিতুনের। আর একবার মনে হয় পাহাড়ী জোছনকে সঙ্গে নিলেই হত। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে মনা বিকেলে চলে গেছে তার এক আত্মীয়ের বাড়ি। কাল দুপুরের আগেই ফিরে আসবে। তারপর বন্ধুদের নিয়ে সবাই মিলে যাবে পাহাড়ে। দোলপূর্ণিমার পরের দিনও পাহাড়ের আলো-আঁধারি জ্যোৎস্না তাদের মন ভরিয়ে দেবে।

গা ছমছম করছে মিতুনের! মনার বাড়ির কাউকে কিছু না বলে একাই পুকুরের দিকে এগিয়ে যায়। সামনেই তিলতড়ার মাঠ, সরষের চাষ হয়। ছোট ছোট হলুদ ফুলে ভরে যায় মাঠ। মাঠ শেষ হলেই এক বিশাল তেঁতুল গাছ। অন্ধকার। ছোট ছোট তেঁতুল পাতার আঁটোসাটো ফিল্ডিং-এ পাতা ভেদ করে চাঁদের আলোর নীচে নামা মানা। আলো-আঁধার। উপর-নীচ।

মিতুন বাংলার শিক্ষক হলেও বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসা তার চিরদিনের। ছাত্রদেরও বিজ্ঞানচর্চা করতে বলে। ভূত-প্রেত, অশরীরী, অলৌকিক এ সব মিথ্যে। বিজ্ঞানমনস্কতায় এইসব কুসংস্কার দূর হয়। বাংলার ক্লাসে ছাত্রদের শোনায় বিজ্ঞানের আশ্চর্য সব ঘটনা। কিন্তু সেই বিজ্ঞানমনস্ক বাংলার শিক্ষক তেঁতুল গাছের তলায় সত্যিই ভয় পায়। মনাদের বাড়ির দিকে তাকায়—আবছা তেঁতুল গাছের তলায় এসে তার মনে পড়ে, মনা গল্প করত আশেপাশের গাঁয়ের লোকেরা এই গাছের ডালেই নাকি গলায় দড়ি দিয়ে মরে। আত্মা অবিনশ্বর। অতৃপ্ত আত্মারা আজো ঘুরে বেড়ায়। মনার সেই সব ভূতুড়ে গল্প মিতুনকে আরো ভয় পাইয়ে দেয়। যত চেষ্টা করে সহজ হওয়ার, পেরে ওঠে না।

আবার সেই শব্দটা! ঠুক-ঠুক-ঠুক, ঠুক-ঠুক, ঠুক.....তিনবার, দু-বার, একবার, তিন-দুই-এক, তিন-দুই-এক, ছন্দময়! না, ভয় পেলেও এগিয়ে যেতে হবে সামনের দ্বারকেশ্বর নদীর যে বাঁক থেকে আসছে শব্দটা সেই দিকে! কাঁকুরে রাস্তা থেকে নেমে এবড়ো-খেবড়ো মেঠো পথ দিয়ে নদীর বাঁকের দিকে এগিয়ে যায়। দূরে একটা বাস দেখা যাচ্ছে! উল্টে পড়েছে মনে হচ্ছে। নিশাচর পাখিগুলো জোরে ডানা মেলে উড়ে যাচ্ছে। এইবার বাসটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কাত হয়ে পড়ে গেছে বাঁকে। লোকজন বাসটাকে খাল থেকে তোলার ব্যর্থ চেষ্টা করছে। হাতুড়ি দিয়ে ঘা মারছে, ওখান থেকেই শব্দটা হচ্ছে। দ্বারকেশ্বরের জলে জ্যোৎস্নার ঝিকিমিকি। দূরে শ্মশান কালী মন্দিরের চূড়ায় আবছা ত্রিশূল। বৈশাখে মেলা হয়। এই নদী, মন্দির, মেলার কথাও খুব বলত মনা।

এই মিথুন শুনছিস!

কে?

আমি মনা! তোদের পাহাড়ী জোছন।

মিতুন পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখে হাত-পা কিচ্ছু নেই, শুধু মনার কাটা মুন্ডুটা হাসছে!

চিৎকার করে ওঠে সে, থরথর করে ভয়ে কাঁপছে মিতুন!

আবার হাসছে মনার কাটা মুন্ডুটা!

দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করে, কিন্তু দুটো পা কে যেন আটকে দিয়েছে মিতুনের! কিছুতেই ছুটতে পারছে না। মনার কাটা মন্ডুটা বলে, কিরে মিতুন, ভয় পেয়েছিস? কিন্তু তোর তো ভয় পাওয়ার কথা নয়। আত্মীয়ের বাড়ি থেকে আর ফেরা হল না রে, বাস দুর্ঘটনায় তোদের পাহাড়ী জোছন এবার সত্যি সত্যিই জ্যোৎস্না হয়ে পথ-ঘাট-মাঠ, গাছ-গাছালি, ঘর-উঠোন, পুকুর-নদী, শুশুনিয়া পাহাড়ের চুড়ো ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাবে, কোথাও থামবে না, শুধু এগিয়ে যাওয়া দূর থেকে আরো দূরে। সকালের আগুন আলো ফুটে ওঠার আগেই মেঘের কোণে লুকিয়ে থাকবে তোদের হোস্টেলের পাহাড়ী জোছন...

আমকাঠের চৌকির বিছানা থেকে গোঁ গোঁ শব্দ করে মুখ থুবড়ে মেঝেতে পড়ে যায় মিতুন! কী ভয়ংকর স্বপ্নটা! মাথা ঝিমঝিম করে ওঠে।

ঠুক-ঠুক-ঠুক.....দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ। মেঝে থেকে উঠে দরজাটা খুলে দিতেই মনার বাড়ির সবাই একসঙ্গে কেঁদে ওঠে। মিতুন কী বলবে বুঝতে পারে না, কোনোরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, ভোরে এমন একটা বাজে স্বপ্ন দেখছিলাম! কিন্তু আপনারা সবাই কাঁদছেন কেন?

মনার ভাই কাঁদো কাঁদো গলায় বলে, মনাদা আত্মীয়র বাড়ি থেকে ফেরার পথে দ্বারকেশ্বর নদীর বাঁকে বাস দুর্ঘটনায়.....। চোখের জল বোধহয় সমুদ্রের জলের মতো অফুরন্ত—শুধু ঝরতেই থাকে।

নিমগাছের ওপরে মেঘের কোলে চোখ রাখে মিতুন! একরাশ তুলো মেঘ সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনা, হাসি-কান্না ফেলে দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে শুশুনিয়া পাহাড়ের চুড়োর দিকে।

—

শ্রাবণ ১৪১০

বিরামপুরের ওয়েটিং রুমে

রাহুল মজুমদার

সাত ঘণ্টা লেটে রাত সাড়ে দশটায় ট্রেনটা যখন বিরামপুর স্টেশনে এসে থামল, বৃষ্টি তখন বেশ জোরে পড়ছে। বিরামপুর স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম বলতে নিচু কাঁকর-বিছানো একফালি জমি, রেলিং দিয়ে ঘেরা। দুটো ল্যাম্পপোস্ট, শুদ্ধ ভাষায় যাকে বলে আলোকস্তম্ভ; তাতে টিমটিম করে কেরোসিনের লম্ফ জ্বলছে। এদিকে এখনো ইলেকট্রিক আসেনি। এক দঙ্গল ঝুপসি গাছের মাঝে একটুকরো স্টেশনঘর, মাথায় টিনের চাল। ট্রেন এখানে বেশিক্ষণ থামে না। কোনোরকমে ট্রেন থেকে নেমে স্টেশনঘরের চালাটার দিকে ছুট লাগাল অজয়। শেডের তলায় পৌঁছে রুমাল দিয়ে হাত-মাথা মুছতে মুছতে দেখল আরো দুজন ওরই মতো এসে আশ্রয় নিয়েছে সেখানে।

বেশ অবাক হল অজয়। বিরামপুর এমন কিছু আহামরি জায়গা নয় যে লোকে এখানে বেড়াতে আসবে! জঙ্গল ছাড়া কিচ্ছু নেই এখানে। এই স্টেশনঘরটুকু বাদ দিলে এ জায়গাটাও জঙ্গলই। নেহাৎ বনবিভাগে চাকরি করে, জঙ্গলে থাকাই ওর কাজ, তাই বাধ্য হয়ে এখানে পড়ে আছে অজয়। স্টেশন থেকে সাত কিলোমিটার জঙ্গল ঠেঙিয়ে তবে পৌঁছতে হয় ওর আস্তানায়। বেলাবেলি এসে পৌঁছলে জোরে পা চালিয়ে চেষ্টা করা যেত। এখন এই গভীর রাতে! এই বৃষ্টির মধ্যে! অজয় আর যাই হোক, পাগল নয়।

এহেন পাণ্ডববর্জিত জায়গায় দু-দুজন আগন্তুক! কৌতূহল হল অজয়ের। কিন্তু কোনো প্রশ্ন করার আগেই সবুজ লণ্ঠনটা দোলাতে দোলাতে রামভরোসে এসে হাজির। আর ঐ একই ছাতার তলায় স্টেশনমাস্টার তিওয়ারিজীও। অজয়কে দেখেই তিওয়ারিজী একগাল হেসে বললেন, 'কী বোসবাবু, দেখলেন তো আমাদের রেল কোম্পানির এফিসিয়েন্সি! কেমোন আপনাকে আপনার ডেস্টিনেশনে পৌঁছে দিলো।'

রাগ করবে কি, অজয় হেসে ফেলল। আসলে তিওয়ারিজীর ওপর রাগ করার চেষ্টাটাই বোকামি। ভদ্রলোক সমস্ত রকম দুঃখ-কষ্টকে যেন 'দূর যা' বলে তাড়িয়ে দিয়ে বসে আছেন। বাড়িঘর-পরিবার-পরিজন ছেড়ে এই পাণ্ডববর্জিত জায়গায় পড়ে আছেন, অথচ কোনো অভিযোগ নেই। হাসিমুখে ডিউটি করে যান। দেখা হলেই হাসিঠাট্টা করেন, যেন কত আনন্দে আছেন।

অজয় বলল, 'কিন্তু তিওয়ারিজী, এখন সারারাত কাটাব কোথায়? আপনার স্টেশনঘরে তো আপনার আর রামভরোসেরই জায়গা হয় না।'

'আরে ঘাবড়াচ্ছেন কেন? তার বন্দোবস্ত ভী রেল কোম্পানি করে রেখেছে,' তিওয়ারিজী হাসতে হাসতে বললেন, 'আসুন আপনাদের দিয়েই বিরামপুর স্টেশনের ওয়েটিং রুমের ওপেনিং হোয়ে যাক।'

ওয়েটিং রুম! বিরামপুর স্টেশনে! অজয় বুঝতে পারল না তিওয়ারিজী ঠাট্টা করছেন কিনা। বেশ কয়েকবার ওকে এই স্টেশনে আসতে হয়েছে, কিন্তু ওয়েটিং রুম তো চোখে পড়েনি কখনো! অবশ্য প্রয়োজনও হয়নি।

অজয় দেখল আশ্রয়ের আশ্বাস পেয়ে বাকি দুজন যাত্রীর চোখ-মুখও বেশ চকচক করে উঠেছে।

স্টেশনমাস্টারের ঘরের পাশেই আরেকটা তালামারা দরজা ছিল, রামভরোসে সেটা খুলে দিল। ওরা ঢুকতে যেতেই তিওয়ারিজী বলে উঠলেন, 'রুকে যান। এ রামভরোসে, তনিক বাত্তি তো লে আ। ইস অন্ধেরেমে বাবুলোক অন্দর কেইসে ঘুসি?'

রামভরোসে তিন মিনিটে আরেকটা বাতি জ্বালিয়ে নিয়ে এল। দরজা খুলে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে

তিওয়ারিজী বললেন, 'জেন্টলমেন, আই কর্ডিয়ালি ইনভাইট ইউ টু ইনঅ্যাগুরেট দ্য ওয়েটিং রুম অব দ্য ফেমাস বিরামপুর স্টেশন। ওয়েলকাম জেন্টলমেন।' হাসতে হাসতে সবাই ঘরে ঢুকল। কথাগুলো না বুঝলেও রসিকতাটা বুঝতে পেরে রামভরোসেও দাঁত বার করে হাসল।

অজয় লক্ষ করল, ছোট হলেও ঘরটা রাত কাটাবার পক্ষে যথেষ্ট। এমন একটা আশ্রয় এই জঙ্গলের মধ্যে এই ঘোর দুর্যোগে জুটে যাবে কল্পনাও করা যায়নি।

সবাই হাত-পা ছড়িয়ে বসে পড়ল। তিওয়ারিজী বললেন, 'রাতমে তো ঔর কোনো ট্রেন নেই। আমি ভী আপনাদের সঙ্গেই রাত কাটাবো। এ রামভরোসে, যা, যাকে স্টেশনঘর বন্দ্ করকে তুভী ইঁয়হী আ যা। সাথমে বিস্কিটকা টিনাভী লেকে আনা।'

রামভরোসে যখন বিস্কুটের টিন নিয়ে এসে দরজাটা বন্ধ করল, বৃষ্টির জোর তখন আরো বেড়েছে। ঘরটা ছোট বলে একটা আলোতেই মোটামুটি আলো হয়েছে। তিওয়ারিজী বিস্কুটের টিনটা খুলতেই অন্য দুজন আগন্তুকের একজন বলে উঠল, 'আমাদের সঙ্গেও খাবার আছে। আসুন সবাই মিলে ভাগ করে খাই।'

এতক্ষণে দুই সহযাত্রীর দিকে ভালো করে তাকাল অজয়। দুজনেই অল্পবয়সী। বড় জোর বাইশ-তেইশ বছর বয়স হবে। একজন রোগা, ফর্সা, অন্যজনও রোগা, তবে গায়ের রঙটা চাপা, চোখে চশমা।

তিওয়ারিজী আগন্তুকদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনারা বোসবাবুকা সাথমে এসেছেন? জঙ্গল দেখবেন?'

'জঙ্গল দেখতেই এসেছি,' ফর্সা জন জবাব দিল, 'তবে ওঁর সঙ্গে আসিনি আমরা।'

'ও। বিলকুল অন্জন আদমী!' তিওয়ারিজী বললেন, 'কোই বাত নেহি। জান পহেচান হয়ে যাক। আমি রামদাস তিওয়ারি, এই স্টেশনকা স্টেশনমাস্টার। আর ইনি হোচ্ছেন বোসবাবু, অজয় বোস। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট কা অফিসার।'

'আমার নাম অঞ্জন লাহিড়ী।' ফর্সা জন পরিচয় দিল।

'আমি গৌতম কুণ্ডু। আমরা ছোটবেলার বন্ধু।' চশমাপরা জন বলল, 'এই অঞ্চলে একটা বহু পুরোনো মন্দির আছে না, সেটা দেখতেই আসা।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আছে বটে একটা মন্দির,' অজয় বলল, 'কিন্তু সে তো গভীর জঙ্গলে! আমার আস্তানা থেকেও প্রায় আট ন' কিলোমিটার ভিতরে। আর তাছাড়া, সে তো এখন ধ্বংসস্তূপ। যা অবস্থা, মন্দির বলে চেনাই মুশকিল।'

দু'বন্ধুতে চোখাচোখি হল একবার। তারপর অঞ্জন বলল, 'যতদূর শুনেছি, ওখানে আগে বেশ সমৃদ্ধ এক শহর ছিল। পাশেই ছিল নদী। তারপর একরাত্রের ভূমিকম্পে পুরো শহরটা ধ্বংস হয়ে যায়, নদীও সরে যায়। কিন্তু আশ্চর্যভাবে মন্দিরটা বেঁচে যায়। ক্রমশ জঙ্গলে ঢাকা পড়ে যায় জায়গাটা। তবে অনেকদিন পর্যন্ত ঐ মন্দিরে লোকে পুজো দিতে আসত। তা সে-ও বহু বছর বন্ধ হয়ে গেছে,' বলে থেমে সবার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে থেমে থেমে বলল অঞ্জন, 'শুনেছি, বিশেষ বিশেষ রাতে শহরটা আবার জেগে ওঠে। সেটা দেখতেই আসা আমাদের।'

কী বিদ্‌কুটে শখ রে বাবা! অজয় নিজেও বেশ ডানপিটে। ভাবল, এদের সঙ্গে ভিড়ে পড়লে কেমন হয়!

'তাহলে আপনাদের শওক ভূত দেখার,' তিওয়ারিজী বললেন, 'তো, কভী ভূত-উত দেখেছেন?'

'আজ্ঞে না।' দুজনেই হাসল।

গৌতম বলল, 'আজ অবধি ভূত দর্শনের সৌভাগ্য ঘটেনি। অনেক জায়গায় গিয়েছি। বেশিরভাগই ধাপ্পা, নয় গুজব, বাকিগুলো চোখের ভুল।'

'এবারে আর আপনাদের ঠকতে হবে না।'

কে? কে বলল কথাগুলো? সবাই চমকে উঠল। অজয় দেখল, একটা চেয়ারের আড়ালে দেয়াল

ঘেঁষে এক ভদ্রলোক বসে আছেন। ছোট্টখাট্ট চেহারা, খুব সাধারণ পোশাক। মুখটাও মনে রাখার মতো নয়। কিন্তু ভদ্রলোক এলেন কোত্থেকে? নাকি প্রথম থেকেই ছিলেন! তা-ই হবে, অজয় ভাবল। আধো অন্ধকারে বুঝতেই পারেনি, দুজন নয় তিনজন ছিল ওর পাশে।

'আপ কওন?' তিওয়ারিজীর গলায় সন্দেহের সুর।

'আমি জীবন দত্ত।'

'আপনি বলছেন আমরা ওখানে ভূত দেখতে পাব?' গৌতম অবিশ্বাসী গলায় বলল।

'পাবে।'

'আপনি কী করে এত শিওর হচ্ছেন?' ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করল অজয়, 'আপনি গিয়েছেন ওখানে? দেখেছেন ভূত?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' ঘাড় নাড়লেন ভদ্রলোক, 'গিয়েছিলাম। বছর পাঁচেক আগে। ওদের দেখতেও পেয়েছিলাম। কিন্তু সে ঐ একবারই, এক মুহূর্তের জন্য।'

'কেন? এক মুহূর্তের জন্য কেন?' অঞ্জনের গলায় কৌতূহল আর উত্তেজনা ফেটে পড়ছে।

ভদ্রলোক কিছু বললেন না। শুধু মাথা নেড়ে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বেরিয়ে গেলেন ঘর ছেড়ে—দরজাটা না খুলেই।

'রাম রাম' বলে রামভরোসে মূর্ছা গেল।

চৈত্র ১৩৯৫

প্রাণদাতা

তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাড়িটা দেখেই বুকের মধ্যে কেমন ছ্যাঁৎ করে উঠেছিল। জরাজীর্ণ অবস্থা। সামনের গেটটা কেউ খুলে নিয়ে গেছে। চারিদিকে আগাছার জঙ্গল। এই বাড়িতে থাকতে হবে? মনটা কিরকম কু গেয়ে উঠল। কিন্তু কী-ই বা করব! প্রাইভেট ফার্মে চাকরি করি। আমার পছন্দের থোড়াই পরোয়া করেন মালিকরা। এই বাড়ি ভেঙে কারখানা তৈরি হবে। আপাতত বাড়ি ভাঙার তদারকি করাই আমার কাজ। সেইজন্যই এখানে আসা। অবশ্য একা নই। সঙ্গে এসেছে আমার বেয়ারা-কাম-কুক রামদেও। শক্তিমান এক ভোজপুরী।

একটা ঘর পছন্দ করে সংসার পাতলাম। রামদেও গেল রান্নাবান্নার ব্যবস্থা করতে। আমি হাত লাগালাম খাট, চেয়ার-টেবিল ইত্যাদি সাজাতে-গোছাতে। জায়গাটার নাম কির্নাহার, রামপুরহাটে নেমে চোদ্দ কিলোমিটার বাসে যেতে হয়। লাল মাটির দেশ।

সব সাজিয়ে-গুছিয়ে দোতলার বারান্দায় সবে চেয়ার পেতে বসেছি, এমন সময় রামদেও হাজির। কাঁচুমাচু মুখে কী যেন বলতে চায়।

‘কিরে রামদেও, কিছু বলবি?’

রামদেও বলে, ‘জী হাঁ বাবু, ইয়ে মোকান ঠিক নেহি হ্যায়। ও লোগ বিগড় যায়েগা।’

হো হো করে আমি হেসে উঠি, ‘ও লোগ? তার মানে ভূত? তা বেশ তো, টিভি-ফিভি নেই, নাহয় ফ্রিতে কিছু ভূতই দেখা যাবে। কি বলিস?’

আমার কথাটা বোধহয় রামদেওর পছন্দ হল না। মুখ ভার করে চা আনতে চলে গেল।

চা খাওয়া তখন আমাদের শেষ হয়নি, হঠাৎ রান্নাঘরের দিক থেকে বিকট ঝনঝন আওয়াজ। চায়ের কাপ হাতেই রামদেও ছুটল, পিছনে পিছনে আমি। গিয়ে দেখি বাসনপত্র সব ছত্রাকার। রামদেওকে ধমক দিয়ে বললাম, ‘এত অসাবধান কেন তুই? নিশ্চয়ই বেড়াল ঢুকে এই কাণ্ড করেছে।’

‘বিল্লি! লেকিন ঘুষেগা ক্যায়সে? খিড়কি-কেওয়াড়ি হমনে খুদ লগা দিয়া।’ বিস্মিত রামদেও বলে।

‘তবে কি ভূত?’ আবার একটু ধমক দিই, ‘যা, সব উঠিয়ে রেখে রাতের রান্নাটা চাপিয়ে দে।’

সময়টা শীতকাল। রাতের খাওয়া সেরে একটা আলোয়ান নিয়ে ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়েছি। চাদর মুড়ি দিয়ে রামদেও পাশেই বসে আছে। একথা-ওকথার পর ঠাট্টার সুরে বলি, ‘কিরে রামদেও, তোর ভূতগুলো গেল কোথায়? ডাক। কমসে কম একটাকে তো দেখে যাই।’

রামদেও বলে, ‘মজাক কা বাত নেহি হ্যায় বাবু। জরুর কুছ হ্যায় ইসি মোকানমে। আপ বিসোয়াস করে ইয়া নেহি, লেকিন এহি সাচ হ্যায়।’ সে আরও বলে, ‘হামি কুছ প্রেত-বিদ্যা জানি। হামার গলায় এই যে তাবিজ আছে, ইস লিয়ে কোই আমাকে কুছু করতে পারবে না। লেকিন আপকে লিয়ে হামার বহুৎ ডর লাগছে। এক কাম করে, আজ রাত হামলোগ একহি কামরামে শো যায়?’

প্রথমে ভাবলাম রাজি হয়ে যাই ওর প্রস্তাবে। পরে মনে হল, ভয়কে প্রশ্রয় দিলে আমি হয়তো ছোট হয়ে যাব ওর চোখে। তাই বললাম, 'না না, তার দরকার হবে না। তুই এক কাজ করিস, রাতে একটু সজাগ থাকিস। তাহলেই হবে। তারপর কাল সকাল থেকেই তো এই বাড়ি ভাঙার কাজ শুরু হবে। তখন না হয় ডেরাডাণ্ডা উঠিয়ে....'

আমার মুখের কথা তখনও ফুরোয়নি, বাড়ি কাঁপিয়ে কে যেন হো হো করে হেসে উঠল। অনেকক্ষণ ধরে গোটা বাড়ির দেওয়ালে দেওয়ালে প্রতিধ্বনিত হতে থাকল সেই হাসি। আমার হাত-পা পাথরের মতো ঠান্ডা আর ভারী হয়ে উঠল। কোনোরকমে ভয় কাটিয়ে রামদেওকে বললাম, 'কোনো পাগল-টাগল ঘুরে বেড়াচ্ছে বোধহয় আশেপাশে।'

রাত কত কে জানে। হঠাৎ একটা ঝাঁকানিতে ঘুম ভেঙে গেল। মনে হল কে যেন খাটটাকে ধরে প্রচণ্ড জোরে নাড়াচ্ছে। চোখ খুলে হ্যারিকেনের অল্প আলোয় দেখি খাটের পাশে দাঁড়িয়ে আছে অল্পবয়সী একটি মেয়ে। ধড়মড় করে উঠে বসলাম। মেয়েটি ইশারায় দরজা দেখাচ্ছে। মন্ত্রমুগ্ধের মতো দরজার দিকে এগোলাম। চমক ভাঙল খিলে হাত পড়তেই। একি! খিল তো বন্ধই রয়েছে, তাহলে মেয়েটি বন্ধ ঘরে ঢুকল কি করে! দড়াম করে দরজা খুলেই চেঁচিয়ে উঠি, 'রামদেও! রামদেও!' রামদেও সজাগই ছিল। আমার আর্ত চিৎকার শুনে ও লাফিয়ে বেরিয়ে এল নিজের ঘর থেকে। দেখলাম ওর হাতে একটা কাগজের মোড়ক। চেঁচিয়ে উঠল রামদেও, 'বাবুজী, আগে মাৎ বাঢ়না। এ লোগ প্রেত আছে।' সামনে তাকিয়ে দেখি মেয়েটির সঙ্গে একজন লোকও রয়েছে, ধুতি-পাঞ্জাবি পরা ভারিক্কি চেহারার। আমাদের দেখে লোকটা দাঁতে দাঁত চেপে গজরাল, 'বাড়ি ভাঙবি? এত সাহস! আয়, আজ তোদেরই ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো করি।'

মুহূর্তের মধ্যে রামদেও তার মোড়ক থেকে মুঠো করে ধুলোর মতো কি যেন নিয়ে বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়তে পড়তে ওদের দিকে ছুঁড়ে দিল। ওদের চেহারাটা ঝাপ্‌সা দেখাল। পরক্ষণেই মেয়েটির তীক্ষ্ণ চিৎকার, 'বাণ মারবি? আয়, আয় দেখি তোদের কত শক্তি!'

আমার কেমন সব গুলিয়ে যাচ্ছে। কি দেখছি, কি শুনছি, কিচ্ছু বুঝতে পারছি না। রামদেও আমার অবস্থা বুঝতে পেরে আমাকে ঠেলতে থাকে, 'হোস মাৎ খো না বাবুজী। গেটকা তরফ ভাগিয়ে। নেহি তো এ লোগ হামে মার ডালে গা।'

ছুটতে ছুটতে যখন বাড়ি থেকে মাঠে নেমেছি, তখন ওরা ওদের কৌশল বদলাল। দেখি দুজনের শরীর থেকে দুটো সাদা কঙ্কাল বেরিয়ে এল। হি হি করে হাসতে হাসতে কঙ্কাল দুটো আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। রামদেও আবার তার মন্ত্রপূত ধুলো ছুঁড়ল। এবার একটা কঙ্কাল চার-পাঁচটা হয়ে রামদেওকে পাশ কাটিয়ে আমাকে ঘিরে ধরল। রামদেও তখন একটানে নিজের গলা থেকে তাবিজটা ছিঁড়ে নিয়ে আমার হাতে দিয়ে বলে উঠল, 'বাবু, ইয়ে মুঠঠিমে পাকড়কে রাখনা। ভাগিয়ে বড়া মন্দির কা তরফ, জলদি ভাগিয়ে।'

কতক্ষণ দৌড়েছি মনে নেই। একটা বাড়ির আলো দেখে তাদের দরজার ওপর আছড়ে পড়লাম। জ্ঞান হতে দেখি আমাকে ঘিরে চার-পাঁচটা উদ্বিগ্ন মুখ। এক বৃদ্ধা স্নেহভরা স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ঠিক আছ তো বাবা?' মাথা নাড়ি, জল চাই। জল খাবার পরে সব কথা খুলে বলি ওঁদের। বৃদ্ধা শুনে চমকে ওঠেন, 'কী সর্বনাশ! তুমি সরকার বাড়িতে রাত কাটাতে গেছ? এ বুদ্ধি তোমায় কে দিল? জান, সন্ধের পর ঐ বাড়ির কাছের রাস্তা দিয়ে কোনো লোক চলে না? যাঁকে তুমি দেখেছ, উনি হচ্ছেন শিবশঙ্কর সরকার। তান্ত্রিক ছিলেন। একবার তন্ত্রসাধনা করতে গিয়ে ঐ মেয়েটা সমেত অপঘাতে মারা যান। সেই থেকে ঐ বাড়ি মানুষের বসবাসের অযোগ্য হয়ে গেছে।'

হঠাৎ হাতের মুঠোর মধ্যে কবচের কথাটা মনে পড়ে, মনে পড়ে রামদেওর কথা। ওঁদের বলি, 'দয়া করে আমার সঙ্গে একটু চলুন। আমার এক সঙ্গী ওখানে আটকা পড়ে গেছে।'

বৃদ্ধা বললেন, 'যদি এই গাঁয়ের সব মানুষ একসঙ্গে গেলেও ওকে উদ্ধার করা যেত, তাহলে আমি আমার ছেলেকে সবার আগে যেতে বলতুম। কিন্তু তা কিছুতেই হবে না, হওয়া সম্ভব নয়। মাঝখান থেকে গোঁয়ার্তুমি করতে গেলে আরও দু-চার জনের প্রাণ যাবে। তার চেয়ে সকাল হোক। তখন সবাই তোমার সঙ্গে যাব। তখন নিশাচরদের ক্ষমতা কমে যায়। তুমি এখন একটু বিশ্রাম কর।'

সকাল হতে অনেক লোকজন এসে গেলেন। বুঝলাম এরই মধ্যে মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছে কাল রাতের ঘটনার কথা। সবাইকে সঙ্গে নিয়ে ঐ বাড়িতে গেলাম। ভেতরে আর ঢুকতে হল না। দেখি গেটের সামনেই পড়ে রয়েছে রামদেওর প্রাণহীন দেহ। মাথাটা ঘুরে গেল। অসহায় কান্নায় ভেঙে পড়লাম আমার প্রাণদাতার নিষ্প্রাণ বুকের ওপর।

আর ঠিক তখনই হঠাৎ বাড়ির ভেতর থেকে কে যেন আমাকে ব্যঙ্গ করে হেসে উঠল—হো—হো—হো—হো—হা—হা.....

ও কে?....কে ও?......কে?

আষাঢ় ১৪০৪

কথা রেখেছিল যুধিষ্ঠির

সৈয়দ রেজাউল করিম

কথাটা এমন জায়গায় পৌঁছল সেখান থেকে পিছু হটবার উপায় ছিল না। সবার সামনে ভাবলেশহীনভাবে তনু বলে বসল—'ঘাড়ে মাথা থাকলে রাত কাটিয়ে আয়, তারপর বুকের পাটা দেখাস।' এ কথা শুনে কার না রক্ত গরম হয়?

সেই গরমেই গোসাবার উদ্দেশে বেরিয়ে পড়েছি ওদের সঙ্গে। আনন্দে ভাসছে আমার মন, আমার প্রাণ। মনে হচ্ছে, যেন নতুন দেশ আবিষ্কার করতে চলেছি। চারিদিকে শুধু জল আর জল। ভরা জোয়ারে মাতালের মতো মাতামাতি করছে মাতলা নদী। সেই উচ্ছ্বাসে দুলছে ভটভটি, দুলছে আমার মন।

বার বার মনে পড়ছিল যুধিষ্ঠিরের কথা। ব্যাটা দাদুর কথা বলে খুব ফাঁকি মারল। হাতির সামনে বন্ধুকে ফেলে গাছে চড়ে বসল নির্দ্বিধায়।

ঠিক ছিল একসঙ্গে দুজনেই থাকব, একে অন্যের অন্ধের যষ্টি হয়ে। কিন্তু সকালে বেরোবার সময় ফোন করে বলে বসল—'মাফ করিস বন্ধু, তোর সঙ্গে যেতে পারছি না বলে। দাদু ছাড়ছেই না, দাদুর সঙ্গে গঙ্গাস্নানে যেতেই হবে।' কথাটা শুনে অভিমান হয়েছিল খুব। রাগ করে দুটো কথা শুনিয়ে দেবার আগেই যুধিষ্ঠির বলল, 'স্নান সেরে, ঠিক সময়ে, ঠিক জায়গায় হাজির হয়ে যাব। একদম চিন্তা করবি না। এ যুধিষ্ঠির কি বাত, হাতি কা দাঁত।'

যুধিষ্ঠির তো বলেই খালাস। কিন্তু মাঠে যারা যুদ্ধ করে, তারা তো জানে বিপদটা আসলে কোনখানে? উপায় ছিল না, বার হতে হল ওদের সঙ্গে। পথে আসতে আসতে অনেক টিপ্পুনি শুনতে হল। চোখ ট্যারা করে রাজু শোনাল, 'সংস্কৃতে তোরা নিশ্চয়ই পড়েছিস—'য পলায়তি স জীবতি।' তা বাপু! যুধিষ্ঠির তো মানে মানে কেটে পড়ল, স্পটে গিয়ে তুমি আবার ফিট হয়ে যাবে না তো? আগেভাগে ঝেড়ে কাশো, তাহলে চাঁদি আর পণ্ডশ্রম দুটোই বাঁচবে।'

মৃত্যুর মুখে পড়ে যেভাবে অহিংস প্রাণীও রুখে দাঁড়ায়, আমিও তাই করলাম। বেশ জোরের সঙ্গেই বললাম, 'পাঞ্জা কষতে চ্যালেঞ্জ করেছি, এখন তোদের ঘুঁটি সামলা।'

দীনু উসকে দিতে ভণিতা করে বলল, 'রাজু, ওর সঙ্গে লাগিস না ভাই। বিষ না থাক, কুলোর মতো ফণা আছে।'

পথে এরকম আরও অনেক তির্যক মন্তব্য শুনতে হল। ঠিক দুপুর একটা নাগাদ আমরা পৌঁছলাম কুমিরমারিতে। অভিজিৎ পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল ওর মামার বাড়িতে। একসঙ্গে সাতজনকে দেখে অবাক হয়েছিলেন ওর মামারা, তারপর পুকুর থেকে মাছ ধরা, বাগান থেকে আনাজ তোলা, রান্নাবান্না করা, সে এক এলাহি কাণ্ড। সঙ্গে থেকে সব কিছু উপভোগ করলাম আমরা। তারপর কবজি ডুবিয়ে খেলাম।

অভিজিতের কাছে আমাদের আগমনের কারণ শুনে ওর মামা তো হতবাক। আমাকে উদ্দেশ করেই তিনি বললেন, 'শোনো বাবা, গুরুজনের কথা শোনো। ওখানে তুমি থাকতে যেও না। ওটা জন সাহেবের বাংলো নয়, ভূতুড়ে আবাস। তর্ক করে যে ওখানে রাত কাটাতে গেছে সে-ই মরেছে, ফিরে আসেনি কেউ। রেঞ্জার সাহেব তাদের গলা টিপে মেরে নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়েছে। আমার কথা রাখো বাবা, ওখানে যেও না। তর্কের টাকাটা আমিই দিয়ে দেব ওদের।'

বন্ধুরা বুঁদ হয়ে শুনছিল মামার কথা। রাজু শুধাল, 'জন সাহেব কে, মামা?'

মামা বললেন, 'জন সাহেব হলেন এক ইংরেজ সাহেব। আমাদের দেশ তখন পরাধীন। ইংরেজ সরকার তাঁকে ফরেস্ট রেঞ্জার হিসাবে এখানে পাঠিয়েছিল। সেই থেকে তিনি এখানে, ফিরতে পারেননি স্বদেশে। তাঁর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে স্বদেশীরা কেটে নিয়েছিল তাঁর মাথা। তারপর দেশ স্বাধীন হল, ইংরেজরা সব চলে গেল দেশ ছেড়ে। কিন্তু জন সাহেবের প্রেতাত্মা রয়ে গেল ওই বাংলোতে। রাতের অন্ধকারে বাংলো থেকে বার হয় সেই প্রেতাত্মা। যাকে হাতের কাছে পায় তাকেই শেষ করে। বাঘ, ছাগল, মানুষ, গরু—কাউকে রেহাই দেয় না সাহেব।'

গল্প শুনে ওদের গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। আমি কিন্তু ভোলানাথের মতো নির্বিকার। মনে মনে ভাবি, ভূত না ছাই। যতসব আজগুবি মনগড়া কল্পকাহিনি। সেই কাহিনি শুনে আমি কুপোকাৎ হয়ে যাব? ভেবেছে কি মামা, এতই দুর্বল আমার হৃদয়?

রাতের খাওয়া-দাওয়া শেষে ওরা আমাকে পানসি করে পৌঁছে দিল। জায়গাটা কুমিরমারি দ্বীপ থেকে কিছুটা উত্তরে। আধঘণ্টা লাগল পৌঁছতে। নির্জন বলেই বোধ হল জায়গাটা। যদিও অন্ধকারে বোঝার উপায় ছিল না। এপাশে-ওপাশে শুধু গাছপালায় ভর্তি। রাজু বলল, 'এ দ্বীপে কেউ থাকে না। থাকার মধ্যে থাকে ভূত আর অশরীরী আত্মারা। ভালো করে দোর-জানলা বন্ধ করে দিস। বেঁচে থাকলে কাল সকালে এসে নিয়ে যাব।'

বাংলোতে ঢুকে বুঝে নিলাম প্রয়োজনীয় হাতিয়ার। দেখে নিলাম দরজা-জানালা সহ অন্যান্য জিনিসপত্র। পেতে নিলাম বিছানা। জ্বেলে নিলাম হ্যারিকেন। হাতে নিলাম দেশলাই, টর্চলাইটসহ অন্যান্য টুকিটাকি জিনিস।

সবকিছু বুঝিয়ে দিয়ে ওরা চলে গেল। দোর-জানালা বন্ধ করে আমিও শুয়ে পড়লাম। কিন্তু ঘুম এল না চোখে। একে নতুন জায়গা, তার উপরে অদ্ভুত এক ক্যাঁচক্যাঁচ আওয়াজ। ঘুমটা আসবে কোত্থেকে?

আওয়াজটা যে কাঠের তা বুঝতে পারছিলাম, কিন্তু কিছু করার উপায় ছিল না। পুরোনো আমলের কাঠের বাড়ি। এখন কলকব্জা সব ঢিলেঢালা হয়ে গেছে। পাশ ফিরলেই মচমচ আওয়াজ। হোক গে, মনকে সান্ত্বনা দিলাম। এরকম একটু-আধটু আওয়াজ হওয়াই ভালো। চোর-ডাকাতরা ভাববে জেগে আছি। আর ঘুমটাও বেশি গাঢ় হবে না। আধো ঘুম আধো জাগা থাকলে জ্যান্ত ভূতেও ছায়া মাড়াতে ভয় পাবে।

রাত তখন বারোটা। খটখট করে দু'বার আওয়াজ হল। আওয়াজটা ক্যাঁচক্যাঁচ, মচমচ নয় তা বুঝলেও বুঝতে পারলাম না তার উৎপত্তিস্থলটা আসলে কোথায়। কান খাড়া করে চুপচাপ শুয়ে থাকলাম।

হঠাৎ শুনলাম কে যেন চিৎকার করে বলছে—'দরজা খোল।' গলাটা চেনা চেনা বোধ হল। তবুও মনে সন্দেহ। সেই সন্দেহ নিরসন করতে জানতে চাইলাম, 'কে? কে ডাকছে?'

দরজার ওপার থেকে জবাব এল, 'আমি যুধিষ্ঠির।'

গলাটা এবার চিনতে পারলাম। কিন্তু সন্দেহ গেল না। তাই দরজাটা না খুলেই বললাম, 'জানালার এদিকটায় আয়, তোকে দেখি।'

হি হি করে অদ্ভুত হাসি হাসল যুধিষ্ঠির। জিজ্ঞাসা করল, 'ভয় পেয়ে গেলি নাকি?' তারপর একটু থেমে টিপ্পনি কেটে বলল, 'ঠিক আছে, জানালাটাই খোল। তবে হাতে হ্যারিকেনটাও নিয়ে আসিস।'

টাকাপয়সা গোনার মতো ভালো করে পরখ করে তবেই দরজাটা খুললাম। যুধিষ্ঠিরকে কাছে পেয়ে আমার সাহস হাজার গুণ বেড়ে গেল। সত্যই যুধিষ্ঠির তার কথা রেখেছে। এই না হলে সত্যবাদী যুধিষ্ঠির! ও বলল, 'কিছু মনে করিস না ভাই, একটু দেরি হয়ে গেল। কী করব, উপায় ছিল না। গঙ্গাপাড়ের লোকেরা ছাড়ল না, মাথায় তুলে নাচানাচি করল। গলায় ফুলের মালা দিল। এই দ্যাখ, সেই মালা।'

যুধিষ্ঠিরের গলায় রজনীগন্ধার মালাটা দেখলাম বটে, কিন্তু কে মালা দিল, কারা মাথায় তুলে নাচানাচি করল, তা জানার এতটুকু উৎসাহ ছিল না আমার। কেবলই মনে হল, এত রাতে ও ব্যাটা এখানে এল কীভাবে? আমার মনের কথা যুধিষ্ঠির বোধহয় আন্দাজ করেছিল, তাই স্বগতোক্তি করার মতো বলল, 'ক্যানিং ঘাটে পানসি বাঁধা ছিল, সেই পানসি বেয়েই চলে এলাম, শুধু তোকে কথা দিয়েছি বলে।'

যুধিষ্ঠির বরাবরই একটু ডাকাবুকো টাইপের। ওর অভিধানে 'পারব না' বলে কোনো কথা নেই। তা সে যতই কঠিনতম কাজ হোক। পানসি বেয়ে এখানে চলে আসা এমন কিছু দুঃসাধ্য কাজ নয় ওর পক্ষে। মনকে প্রবোধ দিলাম। ও বলল—'ভোর হবার আগেই আমাকে ছেড়ে দিস। যার পানসি যেখান থেকে নিয়ে এসেছি, সেখানে রেখে দেব।'

আমি কোনো প্রতিবাদ করলাম না।

বিছানা একটাই ছিল। সেটাতে দুজন জড়াজড়ি করে শুয়ে পড়লাম। আমার চিবুকে হাত দিয়ে যুধিষ্ঠির আস্তে করে জিজ্ঞাসা করল, 'কিরে, আমি আসব না ভেবে ভয় পেয়েছিলিস নাকি?'

যুধিষ্ঠির আসাতে বুকের বল গিয়েছিল বেড়ে। তাই গর্বের সঙ্গে বললাম, 'কীসের ভয়?'

বড়াই করে কথাটা বললাম বটে, কিন্তু সত্যই একটু ভয় পেয়েছিলাম। ভয়ের কারণ ভূত নয়, ভয়ের কারণ স্বয়ং যুধিষ্ঠির। কী অসম্ভব ঠান্ডা ওর গা, হাত, পা। ঠিক সাপের মতো। কিছু বলার আগেই যুধিষ্ঠির বলল, 'সারাটা দিন জলে ছিলাম তো, তাই এত ঠান্ডা।'

স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম আমি। তারপর গল্প করতে করতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়লাম টেরই পাইনি।

ঘুম ভাঙল যুধিষ্ঠিরের গুঁতোগুঁতিতে। কাঁচা ঘুম, তাই বিরক্তিতে মাথাটা গেল বিগড়ে। দুটো কথা শুনিয়ে দেওয়ার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু তা আর হল না। দেখি ওর হাতটা আমার মুখে। কানের কাছে মুখটা এনে চুপিচুপি বলল, 'কথা বলিস না, চুপচাপ শোন। বাইরের আওয়াজ শুনছিস? মনে হয় ঘরে কেউ ঢোকার চেষ্টা করছে।'

দম বন্ধ করে কান পাতলাম। মনে হল জানালার গরাদগুলো ভাঙার চেষ্টা করছে কেউ। যুধিষ্ঠির বলল, 'একদম ভয় পাবি না। ওরা ভূত নয়, চোর-ডাকাত হবে।' বলে হ্যারিকেনের বাতিটা আরও কম করে দিল।

যুধিষ্ঠিরের ইঙ্গিতে চুপচাপ বিছানা ছেড়ে উঠলাম। যেভাবে আমরা শুয়েছিলাম, সেইভাবে কোলবালিশ দুটো রেখে চাদর ঢেকে দিলাম। তারপর বিড়াল পায়ে গিয়ে জানালার দু'পাশে বসলাম। আমার হাতে দড়ি, ওর হাতে লাঠি। অজানা আশঙ্কায় তখন দুরু দুরু করছে বুক। বিদেশ-বিভুঁয়ে এসে এভাবে যদি...। গলাটা শুকিয়ে ওঠে তেষ্টায়।

খুট করে একটা শব্দ হল। দেখলাম আমাদের ঘরের দরজাটা হাটের মতো খুলে গেল। হ্যারিকেনের অস্পষ্ট আলোতে দেখলাম দুটো ভূত। একটা বড়ো, আরেকটা ছোট। দেহে তাদের মাংস বলে কিছু নেই, শুধু হাড় আর হাড়। সেই হাড়ের ঠকঠকানি আওয়াজ এল কানে। তারপর আর কিছু মনে নেই। জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেলাম আমি।

জলের ঝাপটায় জ্ঞান ফিরল। চোখ মেলে তাকিয়ে দেখলাম যুধিষ্ঠিরের মুখ। এক হাতে তার জলের মগ, অন্য হাতটা জলে ডোবানো—'ভিতু কোথাকার,' যুধিষ্ঠির বলল—'বলেছিলাম না, ওরা ভূত নয়। এখন দেখে বল, ওরা ভূত না মানুষ?'

আমি তাকিয়ে দেখলাম। ভূত সেজে আসা মানুষ দুজন ঘরের এক কোনায় বসেছিল। তাদের হাত-পা দড়ি দিয়ে ভালো করে বাঁধা। নড়াচড়া করার শক্তি নেই। ওদের মধ্যে বড়োটা বলল—'না বাবু, আমরা ভূত নই, মানুষ। আমাদের ক্ষমা করে দেও বাবু। আর কখনও এমন হবে না।'

যুধিষ্ঠির বলল, 'সকাল হতে আর বাকি নেই। চারটে প্রায় বাজতে চলল। থানাতে খবর দিয়ে আমি চলে যাব। বাড়িতে আমার অপেক্ষায় আছে সবাই। তাছাড়া ক্যানিং ঘাট থেকে যার পানসিটা নিয়ে এসেছিলাম, যথাস্থানে রেখে দিতে হবে সেটা। না হলে ভাববে চুরি গেছে।'

আমি আর না করতে পারলাম না। যুধিষ্ঠির চলে গেল।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই গোসাবা থানার বড়বাবুসহ চার বন্দুকধারী পুলিশ চলে এল। আর তার পিছনে পিছনে চলে এল আমার বন্ধুবান্ধবরা। পুলিশ দেখে তাজ্জব সবাই। সাতসকালে এখানে এত পুলিশ কেন, ব্যাপার কী? জানার আগ্রহে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে সবাই। থানার বড়বাবু আমাকে দেখিয়ে বললেন, 'তোমাদের বন্ধুর জন্য আজ আমরা দুই কুখ্যাত চোরা-শিকারিকে পেলাম। এমনকি দশখানা বাঘের চামড়া, অজস্র হরিণের শিং, গুলি-বন্দুকসহ অন্যান্য জিনিসপত্র পেলাম। যা ওরা ওই দুটো বাক্সের মধ্যে রেখেছিল।'

একটু দম নিয়ে বড়বাবু আবার বলতে শুরু করলেন, 'যাতে এই অঞ্চলে কেউ না আসে, তারজন্য ওরা এদের দলবল নিয়ে ভূত সেজে ভয় দেখাত। গরু, ছাগল, বাঘ, হরিণ মেরে, চামড়া ছাড়িয়ে ফেলে রাখত লোকালয়ে। এইভাবে একটা ভৌতিক পরিবেশ সৃষ্টি করে রেখেছিল সাধারণ মানুষের মনে। বহুদিন চেষ্টা করেও এদের ধরতে পারছিলাম না। তোমাদের বন্ধু সেই কাজটা করে দিল। তাই সরকারি তরফ থেকে পাঁচশো টাকা পুরস্কার দেব বলে ঠিক করেছি। এতে তোমাদের কারও আপত্তি নেই তো?'

বন্ধুরা সমস্বরে বলল, 'না স্যার, এতে আপত্তির কী আছে? বন্ধু আমাদের পুরস্কার পাবে, এতে আমরা খুব খুশি।'

আমি বলতে গেলাম যুধিষ্ঠিরের কথা। কিন্তু সে কথায় কেউ কর্ণপাত করল না। হিপ হিপ হুররে বলে সবাই চিৎকার শুরু করে দিল। কাঁধে তুলে নাচতে শুরু করল। বড়বাবু বললেন, 'তোমরা তো সবাই কলকাতা থেকে এসেছ। ইচ্ছে করলে আমার সঙ্গে ফিরতে পার। পুরস্কারের টাকাটা দিয়ে দিতে পারলে আমিও দায়মুক্ত হই।'

এককথায় আমরা সবাই রাজি হয়ে গেলাম। বড়বাবুর সঙ্গে আমরাও উঠলাম লঞ্চে। আসামি, মালপত্তর নিয়ে বাকি পুলিশরা উঠল। থানাতে গিয়ে আমাদেরকে অনেক কিছু খাওয়ালেন বড়বাবু। আমার হাতে গুঁজে দিলেন পাঁচশো টাকা। এমনকি লঞ্চ দিয়ে আমাদেরকে ক্যানিং-এ পৌঁছেও দিলেন। ওখান থেকে ট্রেনে চেপে সোজা শিয়ালদা।

স্টেশনে নেমে ওরা যে যার বাড়ির দিকে রওনা দিল। যাবার সময় অভিজিৎ বলল, 'টাকাটা সযত্নে রাখিস। ভালো একটা দিন দেখে ফিস্ট লাগিয়ে দেব।'

অভিজিতের কথার কোনো জবাব দিলাম না। আমার কেবলই মনে হচ্ছিল—এ টাকার হকদার আমি নই। এ টাকা যার প্রাপ্য, তাকেই দেওয়া উচিত।

কর্তব্যের খাতিরে বাড়িতে না গিয়ে বাস ধরে পৌঁছে গেলাম ঝামাপুকুর লেনে। শুকতারা অফিসের পিছন দিকটায় ওদের বাড়ি। দ্রুত পা চালালাম সেদিকে।

যুধিষ্ঠিরদের বাড়ির সামনে ভিড় ছিল বিস্তর। আমাকে দেখে ওর দাদু ভারাক্রান্ত গলায় বললেন, 'তুমি এসে গেছ দাদু, তোমার জন্যই সবাই অপেক্ষা করে আছে।' বলে হাত ধরে আমাকে নিয়ে গেলেন যুধিষ্ঠিরের ঘরে।

ঘরে ঢুকে পাথরের মতো স্তব্ধ হয়ে গেলাম আমি। বুকের মধ্যে গুমরে উঠল একরাশ কান্না। নিঃশব্দে বেরিয়ে এল চোখের জল হয়ে। অথচ কেমন নিশ্চিন্ত মনে বাঁশের খাটিয়ার উপর ঘুমিয়ে আছে যুধিষ্ঠির। মাথার ধারে জ্বলছে ধূপ, ধুনো, বাতি। গলায় আছে সেই রজনীগন্ধার মালা। যুধিষ্ঠির যেন বলতে চাইছে, 'দূর বোকা! কাঁদছিস কেন? আমি তো আছি তোর সঙ্গে।'

আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে মাসিমা সজল নয়নে বললেন, 'গতকাল তোর বন্ধু গঙ্গাতে ডুবে মরেছে ঠিক কথা, কিন্তু একটা অসহায় ছেলেকে তার মায়ের বুকে ফেরত দিয়ে যেতে পেরেছে, এটা কি বড় কথা নয়?' বলে কান্নায় ভেঙে পড়লেন তিনি। তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার মতো ভাষা আমি খুঁজে পেলাম না।

—

অগ্রহায়ণ ১৪১৫

সত্যিভূতের গল্প

শ্যামাপদ কর্মকার

ভূত আছে কি নেই—দীর্ঘদিন ধরে এ নিয়ে তর্কবিতর্ক চলছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত এর কোনো সমাধান হয়নি।

আজ এমন একটা ভূতের গল্প বলব যেটাকে সরকারি ভাবে সত্যি বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল।

আমাদের দেশ থেকে যাকে বলে সাত সমুদ্র তের নদীর পারে ইউরোপের উত্তর দিকে বাল্টিক সাগর। এখানের একটা দ্বীপের নাম ওয়েসেল। এই দ্বীপের একটা ছোট্ট শহরের নাম আহেবার্গ। কার্ল আর অটো নামে দুই খুড়তুতো-জ্যাঠতুতো ভাই সেখানে বাস করত। তারা বেশ বড়লোক। কিন্তু দু'ভায়ের মধ্যে দীর্ঘদিনের শত্রুতা।

সেবার বড়দিনের আগে আগে হঠাৎ দু'ভায়ের মধ্যে প্রচণ্ড ঝগড়া বেধে গেল। অটোর কাছে ভীষণভাবে অপমানিত হয়ে রাগে-দুঃখে আত্মহত্যা করল কার্ল।

কিন্তু এ নিয়ে বিশেষ হৈচৈ করা হল না। কারণ আত্মহত্যার খবর পুলিশের কাছে পৌঁছালে দুই পরিবারকেই বিশেষ ঝামেলায় পড়তে হবে। তাই এক বয়স্ক প্রতিবেশী পরামর্শ দিলেন যে, কার্ল হার্ট ফেল করে মারা গেছে এই কথা প্রচার করে তাড়াতাড়ি ওকে সমাধিস্থ করা হোক।

কার্ল ও অটোদের পারিবারিক গির্জা ছিল বাড়ি থেকে বেশ খানিকটা দূরে। তার পাশেই একটা কবরস্থান। সেটা সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্যে। কিন্তু কার্ল-অটো পরিবারের সমাধিক্ষেত্র হচ্ছে গির্জাঘরের নীচে বিরাট এক পাতালঘরে। সেখানে কফিনে করে রাখা হত ওদের পরিবারের লোকজনের মৃতদেহ।

যেদিন কার্লের মৃতদেহ পাতালঘরে রেখে আসা হয়েছিল, তার ঠিক দু'দিন পরের এক সন্ধ্যাবেলা। সাধারণের কবরখানার পাশে একটা ঘোড়ার গাড়ি এসে থামল। মিসেস রোজি নামে এক ভদ্রমহিলা নামলেন গাড়ি থেকে।

গাড়িটা মাঠের পাশে দাঁড় করিয়ে রেখে তিনি তাঁর বড় ছেলেকে বললেন, টম, ভাইদের নিয়ে তুমি গাড়িতে থাক। আমি তোমার মামার কবরে ফুল ক'টা দিয়ে এখুনি ফিরে আসব।

মেজ ছেলে ডিক বলল, আমরা চুপ করে বসে থাকব, কিন্তু তুমি তাড়াতাড়ি ফিরে এসো মা।

তিন ভাই গাড়িতে বসে গল্প করছিল। হঠাৎ একসময় গাড়িটা ভীষণভাবে নড়ে উঠল। ডিক চেঁচিয়ে বলল, দ্যাখ দাদা, ঘোড়াটা কেমন লাফালাফি করছে।

হ্যাঁরে, চল চল, আমরা গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়াই।

ছোট ভাইকে নিয়ে ওরা তিনজনেই গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়াল।

দ্যাখ ভাই, ঘোড়াটার নাক-মুখ দিয়ে ফেনা বার হচ্ছে, টম বলল।

ওরা দেখল ঘোড়াটা যেন ভয়ে হাঁফাচ্ছে। ছোট ভাই ভয়ে আঁকড়ে ধরল দাদাকে।

চ' ডিক, আমরা মায়ের কাছে যাই। হাত ধরাধরি করে তিন ভাই মাকে ডাকতে গেল।

ছেলেদের কথায় হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন মিসেস রোজি। ঘোড়ার অবস্থা দেখে ভয় পেলেন তিনি। অনেক ডাকাডাকি করার পর গাড়ির কোচোয়ানকে পাওয়া গেল। কিন্তু ছেলেদের নিয়ে অসুস্থ ঘোড়ার গাড়িতে চাপতে সাহস পেলেন না মিসেস রোজি। কোচোয়ানকে গাড়ির কাছে থাকতে বলে ছেলেদের নিয়ে হেঁটেই বাড়ি ফিরলেন।

ঘণ্টাখানেক পর জনাকয়েক লোক নিয়ে কবরস্থানে গেলেন মিসেস রোজি। সঙ্গে ছিলেন এক পশুচিকিৎসক। তিনি ঘোড়াকে ভালোভাবে পরীক্ষা করে বললেন, এর কোনো রোগ দেখছি না। মনে হচ্ছে হঠাৎ প্রচণ্ড ভয় পেয়ে এই অবস্থা হয়েছে।

তা হলে এখন উপায়? প্রশ্ন করলেন মিসেস রোজি।

কোনোরকমে ধরে ধরে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে ঘোড়াটাকে।

মিসেস রোজির পর থেকে যারাই ঐ গির্জার পথ দিয়ে যেত তারাই পাতালঘর থেকে ভীষণ শব্দ শুনতে পেত। হাডসন নামে এক যুবকের সাহসী বলে খুব খ্যাতি ছিল। সেই হাডসন একদিন যখন ভয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে গির্জার পাশ থেকে ছুটে বাড়ি এল, সেই থেকে সন্ধ্যার পর আর কেউ একা একা ঐ গির্জার পথে যেত না।

দেখতে দেখতে খবরটা ছড়িয়ে পড়ল সারা শহরে। সেই সঙ্গে নানা গুজব। অনেকে বিশ্বাস করল, আবার বিশ্বাস করল না কেউ কেউ।

ব্যাপারটা দেখার জন্যে পরের রবিবার বহুলোক গেল কবরস্থানে। তাদের মধ্যে রবার্ট সাহেব একজন পুলিশ অফিসার। সকলেই গির্জার মাঠে তাঁদের ঘোড়াগুলোকে বেঁধে রেখে গিয়েছিলেন। হঠাৎ পাতালঘরে ভীষণ শব্দ আরম্ভ হল। ঘোড়াগুলো ভয়ে কাঁপতে লাগল। দু'একটা ঘোড়া চিঁ-হিঁ শব্দে বিকট চিৎকার আরম্ভ করল। তার মধ্যে তিনটে ঘোড়া মাটিতে পড়ে হাত-পা ছুঁড়তে লাগল। সেই সময় ক'জন লোক রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। ঘোড়াগুলোর অবস্থা দেখে, তাদের একজন ছুটে গিয়ে ঘোড়ার মালিকদের খবর দিলে। তারা এসে দেখল ঘোড়াগুলো একেবারে আধমরা হয়ে পড়েছে। পুলিশ অফিসার রবার্ট সাহেবের ঘোড়াটা ছিল বেশ তেজি আর বিরাট আকারের। সেটাও মাটিতে শুয়ে পড়েছে। অনেক কষ্টে ঘোড়াগুলোকে বাড়ি নিয়ে গেল সকলে। দু'তিন দিন পরে কয়েকটা ঘোড়া মরে গেল। বাকিগুলো বহুদিন পর্যন্ত অকর্মণ্য হয়ে রইল। রবার্ট সাহেব ব্যাপারটা সরকারের কর্ণগোচর করলেন। কথাটা শুনে তাঁর অফিসার বললেন, বলেন কি মিঃ রবার্ট, ভূতের গল্পও বিশ্বাস করতে হবে?

না করে তো উপায় দেখছি না। নিজের চোখকে কেমন করে অবিশ্বাস করি বলুন? রবার্ট সাহেব বললেন তাঁর অফিসারকে।

তা হলে তো এ বিষয়ে তদন্ত করা দরকার, অফিসার বললেন।

দেখুন না স্যার। আমার অমন তাগড়াই ঘোড়াটা অকেজো হয়ে গেল।

দেখছি তবে তার আগে আপনি একটা লিখিত বিবৃতি দিন। তার উপর ভিত্তি করেই তদন্তের আদেশ দেওয়া হবে।

আচ্ছা স্যার, কালই আপনাকে লিখিত বিবৃতি দেব।

দেখতে দেখতে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল সারা ওয়েসেল দ্বীপে। সরকারি তরফে তদন্ত আরম্ভ হওয়ার কথা শোনা যাচ্ছে, ঠিক সেই সময়ে অন্য ভাই অটো মারা গেল। তার আত্মীয়-স্বজন মৃতদেহ কফিনে করে নিয়ে গির্জাঘরের দিকে যাত্রা করল।

গির্জার মধ্যে প্রবেশ করতেই পাতালঘর থেকে ভীষণ গোঁ গোঁ আওয়াজ শোনা যেতে লাগল।

একি! পাতালঘরের মধ্যে কেউ আটকা পড়েছে নাকি? ভয়ে বলে উঠল একজন।

জীবন্ত মানুষ কি কবরের মধ্যে বেঁচে থাকে? ওই শোন—আর একজনের কথা শেষ হল না, মনে হল কারা যেন ভীষণ ভারী একটা জিনিস টেনে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। ভয়ে-আতঙ্কে সকলে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটল। সঙ্গের ধর্মযাজক বললেন, এমনভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে তো কাজ হবে না। আসুন আমরা মৃতের উদ্দেশে প্রার্থনা করি।

যেই প্রার্থনা আরম্ভ হল সঙ্গে সঙ্গে আরও ভীষণভাবে আওয়াজ শোনা যেতে লাগল। কখনও হাঃ হাঃ করে অট্টহাসি, কখনও আবার করুণ কান্নার সুর। মাঝে মাঝে ভীষণ দাপাদাপির শব্দ শোনা যেতে লাগল। ভয়ে সকলের মুখ শুকিয়ে গেল। তারা ঘেঁষাঘেঁষি করে প্রার্থনা শেষ হওয়ার অপেক্ষায় রইল। কোনোরকমে কাজ শেষ করে ঘরের বাইরে পালাতে পারলে বাঁচে।

কিন্তু আশ্চর্য কাণ্ড! যে মুহূর্তে প্রার্থনা শেষ হল, ঠিক সেই সঙ্গেই সমস্ত উপদ্রব বন্ধ হয়ে গেল। আর কোথাও কোনো শব্দ নেই। ভীষণ নিস্তব্ধতা নেমে এল গির্জাঘরে। সে আবার আর এক আশঙ্কা।

কী করা যাবে? কবর দিতে নিয়ে এসে মৃতদেহ তো আর ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় না। যে কোনো প্রকারে পাতালঘরে রেখে যেতেই হবে। ভয়ে ভয়ে গিয়ে দরজার চাবি খোলা হল। তখন কোনো সাড়াশব্দ ছিল না ঘরের মধ্যে। কিন্তু দরজা খুলেই আতঙ্কে শিউরে উঠল সকলে।

ঘরের মধ্যে তিনটি কফিন কেবল যথাস্থানে আছে। বাকি আর সব কফিনগুলো সারা ঘরময় তছনছ করে ছড়ানো। বিরাট ভারী কফিনগুলোর অনেক কটা দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে দাঁড় করানো। কয়েকটা ঘরের একপাশে গাদা করে রাখা। সে এক বীভৎস দৃশ্য! যে তিনটি কফিন যথাস্থানে আছে—তার মধ্যে দুটি শিশুর, আর এক বৃদ্ধার। খুব সৎ আর ধার্মিক বলে খ্যাতি ছিল ভদ্রমহিলার।

যাই হোক সকলে পরামর্শ করে শ্রদ্ধাভরে সমস্ত কফিনগুলোকে যথাস্থানে সাজিয়ে রেখে পাতালঘরে চাবি দিয়ে গেল।

পুলিশের কাছে এই খবর পৌঁছানোর পর রবার্ট সাহেব সক্রিয় হলেন। এবার প্রকৃত ব্যাপার জানার জন্যে একজন ব্যারনের উপর তদন্তের ভার পড়ল। তিনি রবার্ট সাহেব ও অন্যান্য লোকজন সঙ্গে নিয়ে পাতালঘরে গেলেন। ঘর খুলে দেখেন ঠিক আগের মতো ব্যাপার। তিনটি কফিন ছাড়া বাকিগুলো যা-তা ভাবে ছড়ানো আর দেওয়ালে ঠেসান দেওয়া। কী আর করা যাবে? ব্যারনের আদেশে কফিনগুলোকে আবার ঠিক ভাবে সাজিয়ে রাখা হল। তারপর ঘরে তালা দিয়ে চলে এলেন সকলে। এবার চাবিটি রইল ব্যারনের নিজের কাছে।

একজন ডাক্তার ও কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে নিয়ে ব্যারন এক উপদেষ্টা সমিতি গঠন করলেন। তারপর সকলে মিলে একদিন পাতালঘরে গিয়ে উপস্থিত হলেন। এবারও সেই বীভৎস দৃশ্য!

তখনকার দিনে কফিনের মধ্যে টাকাকড়ি ও নানারকম ধনরত্ন দেওয়া হত। তাই চিন্তা করা হল—সেই ধনরত্ন চুরি করার জন্যে কোনোরকমে চাবি খুলে চোর ঢুকে ঐ অবস্থা করে যায়। সেজন্যে তিন-চারটি কফিনের ঢাকনা খুলে দেখা হল। কিন্তু কোনো কিছুই খোয়া যায়নি। ডাক্তারবাবু বললেন, হয়তো শত্রুপক্ষের কেউ কেবল অপমান করে অসম্মান করার জন্যেই কফিনগুলোকে এইরকমভাবে রেখে গেছে।

ঠিক বলেছেন ডাক্তারবাবু, ব্যারন বললেন, চারিদিক একটু ভালোভাবে দেখা যাক।

ঘরের চারদিক ভালোভাবে পরীক্ষা করে দেখা হল, কিন্তু কোথাও কোনো ফাঁক-ফোকর দেখা গেল না—যেখান দিয়ে কেউ ঘরে ঢুকতে পারে। অনেক ভেবে-চিন্তে ব্যারন একজনকে বললেন, আমি লিখে দিচ্ছি, এই চিঠি নিয়ে দোকানে গিয়ে এক বস্তা চুন ও দুটো নতুন তালা নিয়ে এসো।

কি করবেন চুন দিয়ে? রবার্ট জিজ্ঞাসা করলেন।

চুন আনা হলেই দেখতে পাবেন, কী করি। জবাব দিলেন ব্যারন।

চুন আর তালা আনা হল। প্রথমে কফিনগুলোকে যথাস্থানে সাজিয়ে রাখা হল। তারপর চুন নিয়ে ভালোভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হল সারা ঘরময়। কেউ ঘরে ঢুকলেই চুনের ওপর তার পায়ের ছাপ পড়বে। নতুন তালা দেওয়া হল, যাতে কারও কাছে তার নকল চাবি না থাকে। তারপর গির্জার

মেঝেতেও পুরু করে চুন ছড়িয়ে দিয়ে চাবি দেওয়া হল। তিন দিন তিন রাত গির্জার চারপাশে পাহারা দেবার জন্যে লোকের ব্যবস্থা করা হল। যাতে কোনোরকমে কারও যোগসাজশ না থাকে তার জন্যে দূর গ্রাম থেকে পাহারাদার আনা হল। কিন্তু সেই তিন দিন তিন রাত পাতালঘরে যে কী ভীষণ ব্যাপার হল তা মুখে বলার কথা নয়। দিনের বেলাও ভয়ে পাহারাদারদের প্রাণ যায় যায় অবস্থা।

শেষে ব্যারন লোকজন নিয়ে এসে পাহারাদারদের কাছে সমস্ত কথা শুনলেন। কিন্তু গির্জাঘরের তালায় চাবি দিয়ে যেমন সিল করা ছিল ঠিক তেমনই আছে দেখলেন। ঘর খুলে চুনের উপর কোনো পায়ের ছাপও দেখা গেল না। তখন পাতালঘরের চাবি খোলা হল। ভিতরে সেই বীভৎস দৃশ্য! কফিনগুলো অশ্রদ্ধাভরে যেখানে-সেখানে ওলট-পালট করা।

হঠাৎ রবার্ট চেঁচিয়ে বললেন, দেখুন কার্লের কফিন থেকে একটা হাতের কঙ্কাল বার হয়ে রয়েছে।

সত্যি তো! কিন্তু আগের মতো তিনটে কফিন যথাস্থানেই রয়েছে। বললেন ব্যারন।

কিন্তু ঘরে তো মানুষ ঢোকার কোনো চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। ভয়ে ভয়ে বলল একজন।

তাই তো ভাই, আমার ভালো ঠেকছে না। শেষে না আমাদের ওপর কোপদৃষ্টি পড়ে। আর একজন চুপিচুপি বলল।

ভয়ে ভয়ে নানারকম আলোচনা করলেন সকলে। ডাক্তারবাবুটি ভূতে বিশ্বাস করতেন না। কিন্তু তিনি কার্লের আত্মহত্যার ব্যাপারটা জানতেন। স্বচক্ষে সব ব্যাপার দেখে তিনিও ভীত হলেন। শেষে আত্মহত্যাকারী কার্লের কফিনটা পাতালঘর থেকে সরিয়ে অন্যত্র কবর দেওয়ার জন্যে ব্যারনকে অনুরোধ করলেন তিনি। কিংকর্তব্যবিমূঢ় ব্যারন অগত্যা সেই ব্যবস্থাই করলেন। তারপর থেকে কিন্তু গির্জা বা পাতালঘরে আর কোনো উপদ্রবের খবর শোনা যায়নি। সরকারি রিপোর্ট প্রকাশিত হলে ওয়েসেল দ্বীপের সকলেই বিশ্বাস করেছিলেন ঐ ভূতুড়ে কাহিনিকে।

কার্তিক ১৪১০

ছায়ায় মায়ায়

সঞ্জীব কুমার দে

অফিসের গাড়ি যখন বাড়ির গেটে এসে আমাকে নামিয়ে দিয়ে গেল তখন রাত্রি শেষের দিকে। ঘড়িতে সময় দেখলাম—দুটো বেজে কুড়ি।

তবুও তো আজ তাড়াতাড়ি ফিরতে পেরেছি। সংবাদপত্র অফিসের সাব-এডিটরের কাজ। শহর সংস্করণ অর্থাৎ শেষ সংস্করণের প্রিন্ট-অর্ডার হয় সাধারণত রাত দুটোয়। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে আরও পরে। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত চলে সম্পাদনার কাজ। সম্পাদন সহযোগী হিসেবে এই সময়ে আমার মতো সাব-এডিটরদের ব্যস্ততার শেষ নেই। বার্তা সম্পাদকের টেবিলে প্রিন্ট-প্রোপোজাল দাখিল করে তাঁর অনুমোদন পেলে তবেই আমাদের ছুটি।

দীর্ঘ আট মাস পর বদলি হয়ে ফিরে আজই প্রথম কলকাতায় প্রধান দফতরে কাজে যোগ দিয়েছি। মাত্র গতকাল বিকেলেই ফিরেছি নয়াদিল্লি থেকে। ক'দিন তল্পিতল্পা বাঁধাবাঁধি, ট্রেনযাত্রার ধকল, আবার বাড়ি ফিরে এসে নতুন করে গোছগাছ ইত্যাদির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অফিসের প্রথমদিনের পরিশ্রমের ক্লান্তি।

তবুও সমস্ত অগ্রাহ্য করে অদম্য আগ্রহে বাড়ির সদর দরজার বেল বাজাই। ন'টা নাগাদ বাড়ি থেকে মায়ের ফোন গিয়েছিল অফিসে। শুনেছিলাম মায়ের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর—'খোকা, জানিস, সে এসেছে!....'

সে মানে পিঙ্কি! আমাদের ছোট্ট অশরীরী বন্ধু। ভুল লিখলাম। মায়ের ছায়াসঙ্গিনী কন্যা। আমার চপলা-চঞ্চলা ভগ্নী। পুরোনো দিল্লির পাহাড়গঞ্জের ভাড়া বাড়ি থেকে মায়ের অপত্য স্নেহ যাকে টেনে এনেছে এখানে। সেই পিঙ্কি, যার অকালমৃত্যুতে ভয় পেয়ে তার মা-বাবা-বোনেরা পালিয়ে গেছে বাড়ি ছেড়ে, এমন কি শহর ছেড়েও। পরিত্যাগ করে গেছে তাকে। দিনের পর দিন অসহায়, একা, যে নীরবে গুমরে মরেছে পরিত্যক্ত অন্ধকার বাড়িতে। আর যার অস্তিত্ব আবিষ্কার করে মা একদিন আঁকড়ে বুকে তুলে নিয়েছেন যাকে।

কীভাবে পিঙ্কি এখানে এসে পৌঁছেছে জানি না। তবে সে এসেছে নাকি আমাদের সঙ্গেই। আমাদের অজান্তে।

মায়ের ফোন পাওয়া মাত্রই বিস্ময়ে আবিষ্ট হয়ে পড়েছি। খুশিতে প্লাবিত হয়ে চলেছি। কোনোমতে চেপে রেখেছি উচ্ছ্বাস। হোক অশরীরী! পিঙ্কি আমাদের অজ্ঞাতেই হয়ে উঠেছে আমাদেরই একজন।

দরজা খুলতে বেশ দেরি করছেন মা। বুঝতে পারছি—আজ আর আমার অপেক্ষায় একতলায় বসে নেই তিনি। নিশ্চয় পিঙ্কিকে নিয়ে ব্যস্ত দোতলায় তাঁর ঘরে। তাই নামতে দেরি হচ্ছে।

দরজা খোলা মাত্র-ই কৌতূহল প্রকাশ হয়ে পড়ল আমার—'মা, কী করছে পিঙ্কি? কোথায় সে?'

মায়ের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল। আঙুল ঠোঁটে চেপে চাপা গলায় তিনি বললেন—'জোরে কথা বলিস না খোকা, ও জেগে উঠবে। ও খুব ক্লান্ত রে! ঘুমোচ্ছে!'

ওপরে উঠে মা তাঁর ঘরের দিকে ইশারা করলেন। ঘরে আলো জ্বলছে। পাখা ঘুরছে দু-দুটো—একটা সিলিং, একটা পেডিস্টাল। মশারি খাটানো বিছানায় পাশাপাশি দুটো বালিশ।

যেমন থাকত পাহাড়গঞ্জের বাড়িতে। অনুমান করলাম পিঙ্কি ঘুমোচ্ছে, কিন্তু তাকে দেখতে পেলাম না।

হতাশ চোখে তাকালাম মায়ের দিকে।

মা আশ্বস্ত করলেন—'এখন কাপড়-জামা বদলে হাত-মুখ ধুয়ে নে। আমি খাবার গরম করি। সময়ে ঠিক দেখা পাবি।'

কোনোদিনই সকালে ঘুম ভেঙে উঠতে পারি না আমি। সম্ভবও নয়। রাত তিনটে নাগাদ তো বিছানায় যাই। অন্তত ঘণ্টা ছয়েক না ঘুমোলে চলে? তাই বিছানা ছাড়তে ছাড়তে ন'টা, সাড়ে ন'টা তো বাজেই। কোনো কোনোদিন দশটা, সাড়ে দশটাও!

আজ ঘুম ভাঙল সমস্ত রেকর্ড অতিক্রম করে দশটা চল্লিশে। চোখ খুলে টেবিল ঘড়িতে সময় দেখে ধড়ফড় করে উঠে বসলাম।

বাথরুমে গিয়ে দাঁত ব্রাশ করে চায়ের প্রতীক্ষায় টেবিলে এসে বসেছি, মা রান্নাঘর থেকে জানান দিলেন—'খোকা বোস, এক্ষুনি চা নিয়ে যাচ্ছি।'

টেবিলের ওপর খবরের কাগজ। অভ্যাসবশে একবার স্পর্শ করলাম। পড়তে ইচ্ছে হল না। আমাদেরই কাগজ। সম্পাদনার কাজে মোটামুটি পুরোটাই পড়া হয়ে যায় পূর্বরাতে। তাই আমাদের কাছে পরদিন সকালে এসব সংবাদের আর কোনো আকর্ষণ-ই থাকে না। পরিবর্তে প্রস্তুত হতে হয় নতুন সংবাদ পরিবেশনের উদ্দেশ্যে।

টিভি খুলতে গিয়ে থমকাতে হল। যাঃ কেবল্ অপারেটরকে তো খবর দেওয়া হয়নি। আর অ্যানটেনার পাট চুকিয়ে ফেলেছি তো বছর পাঁচেক আগেই। অগত্যা কাগজটা খুলতেই হল। আর খুলেই স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। একী! এটা কেমন করে হল? আর এ অবস্থায় কাগজটা বেরল-ই বা কী করে? এটা কি শেষ মুহূর্তের সম্পাদকীয় কোনো সিদ্ধান্ত? নাকি মুদ্রণের ভুল? এই কাগজের ইতিহাসে তো এমন কোনোদিন ঘটেনি! শুধু এই কাগজ কেন, কোনো কাগজের কোনো সংস্করণেই আদৌ এমন ঘটেছে কি?

প্রথম পাতায় কাগজের টাইটেল-ব্লকের পরের অংশ, দিনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ পরিবেশিত হয় যেখানে—বোল্ড-লেটার হেডিংয়ে, প্রায় অর্ধেক পাতা জুড়ে—সেই অংশটা একেবারে সাদা! কিচ্ছুটি নেই? আশ্চর্য!

অথচ, আমার বেশ মনে আছে গতরাতের বিষয়টা। রাষ্ট্রপতি নির্বাচন সংক্রান্ত। হ্যাঁ, হেডিংটা-ও স্মরণে আছে স্পষ্ট। আমিই লিখেছিলাম সেটা—'রাষ্ট্রপতি পদ-প্রার্থী হলেন লক্ষ্মী সায়গল।' হেডিং সমেত পুরো নিউজটাই উধাও!

এমন অবশ্য বহুবার ঘটেছে যে শেষ সংস্করণের প্রিন্ট-অর্ডার হয়ে যাবার পরও গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ এসে পৌঁছেছে। মুহূর্তে বদলে গেছে বিষয়। তা-ই যদি ঘটে থাকে তো অন্য কথা। কিন্তু পাতা সাদা থাকার কথা নয়!

তড়িৎগতিতে উঠে গিয়ে টেলিফোনের রিসিভার তুলে নিলাম। ডায়াল করলাম আমাদের চিফ সাব-এডিটর শশাঙ্কদাকে। লাইন এনগেজড। হবেই তো, এমন একটা ব্যাপার! ওঁরা কি আর চুপ করে বসে থাকবেন?

একটু অপেক্ষা করে, সাহস করে ডায়াল করলাম নিউজ-এডিটর প্রভাতদার বাড়িতে। লাইন পাওয়া গেল, তাঁকে পেলাম না। স্ত্রী-কে ডাক্তার দেখাতে নিয়ে গেছেন প্রভাতদা। ফিরতে দেরি হবে। জানাল বাড়ির কাজের লোক।

আরও দু-চার জায়গায় ফোন করা যেত, কিন্তু ইচ্ছে হল না। কেমন তিক্ত হয়ে গেল মেজাজটা। আবার এসে বসে পড়লাম টেবিলে।

ততক্ষণে মা চায়ের কাপ হাতে হাজির—'খোকা, উঠতে অনেক দেরি করে ফেলেছিস আজ। অনেকগুলো কাজ আজই করতে হবে তোকে। প্রথম কাজ, মমতাকে খবর পাঠাবি—আমরা ফিরেছি।

কাল থেকেই যেন কাজে আসে। দ্বিতীয় কাজ, দুধের দোকানে বলবি আজ বিকেলেই দুধ দিতে। কাল থেকে সকালে। যেমন দিত রোজ হাফ লিটারের প্যাকেট, একটা করে। মা গো! দুধ ছাড়া চা তুই খেতে পারিস ঠিক কথা, আমি একেবারে পারছি না।'

আমি মৃদু হেসে কাপে চুমুক দিলাম।

'আর হ্যাঁ, সবচেয়ে বড় কাজ—কেবল্ কানেকশান। আজ-ই বলে করিয়ে দিস।' মা বলে চলেন—'নইলে মেয়েটাকে সামলানো যাবে না।'

মুহূর্তে মনে পড়ে গেল পিঙ্কির কথা। ভুলে গিয়েছিলাম। জিজ্ঞাসা করে উঠলাম—'কোথায় সে?'

'সেকি আর এক জায়গায় স্থির হয়ে বসে আছে? লাট্টুর মতো সারা বাড়ি পাক খেয়ে বেড়াচ্ছে। নতুন বাড়ি, নতুন পরিবেশ—ওর এখন উৎসাহের ঘাটতি নেই। কোন ভোরে উঠেছে জানিস?'—

মায়ের সেই অত্যধিক কথা বলার প্রবণতা, যা কয়েকদিন অন্তর্হিত ছিল, তা আবার ফিরে এসেছে লক্ষ করলাম।

'আর দৌরাত্ম্যও করছে খুব।' মা বলে যান—'ছাদে উঠে পাশের বাড়ির কুকুরটাকে রাগিয়েছে খুব। একবার গিয়ে দেখি রাস্তায় গাছে আটকে থাকা একটা ঘুড়ি পাড়ার জন্য কার্নিশে নেমেছে! ধমকে এনেছি। তোর ঘুম ভাঙাবার চেষ্টাও করেছে এ ঘরে ঢুকে কয়েকবার। আমি আগলে আগলে নিয়ে গেছি।'

মনের কোণে সন্দেহ দেখা দিল, পিঙ্কির বিরহে মা প্রলাপ বকছেন না তো! সত্যিই পিঙ্কি এসেছে—নাকি এ সব মায়ের বিকার!

নিরাসক্ত গলায় জিজ্ঞাসা করলাম—'এখন কী করছে সে?'

'এই তো আমাকে রান্নাঘরে লুচি বেলে দেবার চেষ্টা করছিল। দেখি গিয়ে আবার কি কাণ্ড করেছে!' মা ঘর ছেড়ে বেরোতে গিয়েও আবার ফিরে আসেন।—'হ্যাঁ রে, তোর শরীরটা কি খারাপ লাগছে?'

'না তো!' আমি জোরাল গলায় বলি।

মা বিশ্বাস করলেন বলে মনে হল না। বললেন—'কেমন যেন মনে হচ্ছে তোকে। কিছু যেন ভাবছিস, কথাগুলো শুনতে চাইছিস না। কেমন অন্যমনস্ক।'

'আসলে কী হয়েছে জানো মা—'

কাগজের ঘটনাটা জানাতে চাইলাম মাকে।—'একটা বিশ্রী ব্যাপার হয়েছে। আমাদের আজকের কাগজের শেষ সংস্করণে—'

বলতে বলতে মুহূর্তে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। মাকে দেখাব বলে কাগজটার ভাঁজ খুলছিলাম। চোখ পড়তেই স্তব্ধ হতে হল বিস্ময়ে। কোথায় সাদা অংশ! বোল্ড-লেটারে জ্বলজ্বল করছে গতরাতের ঠিক হওয়া সেই হেডলাইন, অবিকল। নিজের অজ্ঞাতে আমার গলা দিয়ে অস্ফুটে উচ্চারিত হয়ে পড়ল—'অদ্ভুত!'

মা কিছুই বুঝলেন না। আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করলেন—'কী অদ্ভুত? তুই কিসের কথা বলছিস খোকা?'

'আজকের কাগজের এই অংশটা।' মায়ের দিকে কাগজটা মেলে ধরে আমি উত্তেজিত গলায় বলতে থাকি—'একটু আগেই এই অংশটা আমি দেখেছি শূন্য, একেবারে সাদা! এই জন্য একে-ওকে আমি ফোনও করে ফেললাম কয়েকটা। ধর—মিনিট দশেকের ব্যবধান। এখন দেখছি সব ঠিক আছে!—মানে, যা থাকার কথা তাই!'

ভেবেছিলাম মা-ও আমাকে অবিশ্বাস করবেন। তা না করে তিনি ভয়ে ভয়ে শুধোলেন—'হ্যাঁ রে, পিঙ্কির কোনো কারসাজি নয় তো? কাগজটা কিন্তু সদর দরজা থেকে তুলে এনে ওই তোর ঘরে রেখে গেছে।'

কাগজটা হাতে ধরে আমি নির্বাক হয়ে রইলাম। বুঝতে পারছি না কী করব? মাকে অবিশ্বাস করব, না নিজেকে?

তখনই দরজার বাইরে থেকে অস্পষ্ট একটা চাপা হাসির শব্দ ভেসে এল যেন।

সম্বিৎ ফিরে পেয়ে আমি শব্দের উৎসের দিকে ছুটে গেলাম—'কে? কে ওখানে?'

কাউকেই দেখতে পেলাম না ঠিক, তবে আমার সমুখ দিয়েই দুটি চপল পায়ের ছুটে যাওয়ার শব্দ সিঁড়ি ভেঙে ছাদে উঠে গেল।

সেদিন রাতে বাড়ি ফিরতেই একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেল। গেটে বেল বাজানো মাত্রই গেট খুলে গেল 'খুট্' শব্দে। ভেতরে ঢুকে অবাক হতে হল। আশেপাশে কেউ নেই তো! তবে কি দরজা খোলা ছিল? অসাবধানে মা খোলা রেখে গেছেন?

নিঃশব্দে দরজার খিল এঁটে, ছিটকিনি এঁটে, পকেটের ডুপ্লিকেট চাবি বের করে কড়ার গায়ে আটকে রাখা তালা-ও এঁটে দিলাম ভেতর থেকে।

সতর্কতার জন্য একতলার ঘরগুলো, বারান্দা, বাথরুম একবার করে দেখে নিলাম ভালো করে। অযথা অনেকগুলো আলো জ্বলছে। বারান্দা আর সিঁড়ির আলো ছাড়া বাকি আলোগুলো নিভিয়ে দোতলার সিঁড়িতে পা রেখেছি—শুনতে পেলাম পেছনে কারও পায়ের শব্দ।

ঘাড় ঘোরালাম, না কেউ নেই!

আবার ওপরে উঠছি—মনে হচ্ছে কেউ যেন উঠছে পিছু পিছু।

থমকে গেলাম। শব্দও থেমে গেল তৎক্ষণাৎ।

আবার সামনের দিকে এগোতে শুরু করা মাত্রই পায়ের শব্দও এগোতে শুরু করল। অবশ্যই লঘু পা-য়। আর এই সময় হঠাৎ করেই বিদ্যুৎ চলে গেল। লোডশেডিং!

মুহূর্তে তীক্ষ্ণ সুরেলা শিশু-কণ্ঠের ভয়ার্ত চিৎকারে কেঁপে উঠল সমস্ত বাড়ি। চিৎকারে হতচকিত আমি দাঁড়িয়ে কাঁপতে থাকলাম ঠকঠক। চিৎকারটা উঠছে আমার পেছন দিক থেকেই।

মাত্র কয়েকটা সেকেন্ড। পড়িমরি করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছেন মা। ঘুটঘুটে অন্ধকারে তাঁকে অনুমান করতে পারছি তাঁর উদ্বেগ ভরা কণ্ঠস্বরে—'কী হয়েছে? কী ব্যাপার? পিঙ্কি কী হল তোর! আমি আসছি, ভয় নেই দাঁড়া!'

বুঝতে পারলাম ভয়ার্ত কণ্ঠটি পিঙ্কির। ভয় পেয়েছে হঠাৎ অন্ধকারে।

আমাকে অন্ধকারে ধাক্কা দিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে কোনোমতে সামলে নিয়ে নীচে নেমে গেলেন মা।

তাঁর কণ্ঠ তখনও ব্যাকুল—'দাঁড়িয়ে থাকিস না খোকা, ঝটপট একটা কিছু অন্তত জ্বালা।'

কী জ্বালাব? আমি সিগারেট খাই না। সঙ্গে দেশলাই, লাইটার কিচ্ছু নেই। কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা কাটিয়ে মায়ের ঘরে এদিক-সেদিক হাতড়ে টর্চটা খুঁজে পেলাম। ওপর থেকে সিঁড়িতে ফোকাস ফেললাম। আর তখনই দেখতে পেলাম পিঙ্কিকে। কলকাতায় এসে এই প্রথম এবং সাকুল্যে দু'বার।

মায়ের পেটের কাছটায় মুখ গুঁজে সে। মাথায় সেই নীল ফিতে, বিনুনি বাঁধা চুল। পরনে সেই ধূসর ফ্রক। প্রথমবার যেমন দেখেছিলাম—পাহাড়গঞ্জের বাড়ির ছাদে, জোছনার মৃদু আলোয়—আজও তেমনই দেখতে পেলাম টর্চের স্বল্প আলোয় তার আবছা অবয়ব। একে অপরকে আঁকড়ে ধরে সিঁড়ি-পথে উঠে আসছে দুজন—মা আর পিঙ্কি!

'জানিস, কিছুতেই ঘুমোবে না!' মা জানালেন—'ঠায় জেগে রয়েছে। কী—? না, তুই এলে গেট খুলবে। তোর অফিসের গাড়ির আওয়াজ পেতেই নেমে এসেছে। আমাকে মোটেই নামতে দিল না। আর দেখলি তো, গেট খুলতে এসে কি বিপত্তি!'

'কাল একবার এমারজেন্সি লাইটটার কথা মনে করিও তো মা!' বলি আমি—'চার্জে দিয়ে দেখতে হবে ঠিক আছে কিনা। বহুদিন তো ব্যবহার হয়নি—।'

মা ঘাড় কাত করে সম্মতি জানালেন।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙল আরও এক চিৎকারে।

বিছানা থেকে ধড়ফড় করে উঠে বারান্দায় বেরিয়ে দেখি মমতা। আমাদের বাড়ির দীর্ঘদিনের ঠিকে কাজের লোক। গতকাল ওকে খবর দিয়ে এসেছিলাম। কাজ শুরু করার কথা ছিল আজ সকাল থেকে। শুরুও করেছে দেখলাম। হাতে ফুলঝাড়ু। তা নিয়ে দোতলার বারান্দা প্রান্তে, নীচতলায় নামার সিঁড়ির কাছে থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে সে। চিৎকারটা তারই।

অজানা আশঙ্কায় জিজ্ঞাসা করে উঠলাম—'কী রে মমতা, কী ব্যাপার?'

মমতা সম্ভবত আচমকা চেঁচিয়ে ফেলে একটু বিব্রত। বুঝতে পেরেছে ওরই চিৎকারে ঘুম ভেঙেছে আমার। অপ্রস্তুত মুখে তাই নালিশ জানাল—'দ্যাখো না দাদা, আমি বারান্দা ঝাঁট দিচ্ছিলাম, হঠাৎ কি একটা আমাকে ধাক্কা দিয়ে নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে। আর একটু হলেই সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে পড়তাম।'

ততক্ষণে মা-ও ছুটে এসেছেন। বোধহয় বাথরুমে স্নান করছিলেন। মাথাও মুছতে পারেননি ভালো করে।

আমি ও মা নীরবে নিজেদের দৃষ্টি বিনিময় করলাম।

'কি একটা ধাক্কা দিয়ে নীচে নেমে গেল, মানে?' মা জিজ্ঞাসা করলেন—'দেখতে পাসনি?'

'না গো মাসিমা।' মমতা জানাল—'আমি তো সামনে ঝুঁকে ঝাঁট দিচ্ছিলাম। মনে হল তোমাদের বড় ঘরটা থেকে কিছু একটা আমাকে ধাক্কা মেরে বেরিয়ে গেল।'

'তবে বেড়াল-কুকুর হবে বোধহয়।' চুল ঝাড়তে ঝাড়তে মা ব্যাপারটা ম্যানেজ দেবার চেষ্টা করলেন—'দ্যাখ, নীচে সদর দরজা খোলা পেয়ে কখন ঢুকে বসেছিল।'

'না না, এ বেড়াল-কুকুরের ধাক্কা নয় মাসিমা।' মমতা জোর দিয়ে বলে—'ঠিক আমার কোমরের কাছটায় কেমন যেন দু'হাতে ঠেলে দেওয়ার মতো কেউ ধাক্কা দিয়ে গেল।'

আমি 'হুট্' 'হাট্' শব্দ করতে করতে সিঁড়ি ভেঙে নীচতলায় নেমে এলাম। সত্যি বলতে কি—পালিয়ে বাঁচলাম।

সদর দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। নীচতলার সমস্ত ঘরগুলো দেখলাম। একবার শুধু চাপা কিন্তু স্পষ্ট কথায় পিঙ্কির উদ্দেশে বললাম—'পিঙ্কি, সামলে চল। জানাজানি হয়ে গেলে তোরই বিপদ। সাবধান।'

তারপর মমতাকে উদ্দেশ করে নীচে থেকে চেঁচালাম—'ওই দ্যাখ, বেড়ালই ঢুকেছিল রে মমতা, বেরিয়ে গেল।'

তখনকার মতো ব্যাপারটা চাপা পড়ল বটে, কিন্তু মিনিট পনেরো পর আবার চেঁচাল মমতা।

এবারও আমরা হাজির হলাম।

মমতা দোতলার বারান্দা মোছা শেষ করে সিঁড়ি মোছার জন্য বালতির জল বদল করতে ঢুকেছিল বাথরুমে। সেখান থেকে বেরিয়েই সে আবিষ্কার করেছে ভেজা মেঝে দিয়ে হেঁটে যাওয়া কার ছোট ছোট পায়ের ছাপ।

সেদিকে আঙুল নির্দেশ করে সে বলল—'আমি বলছি দাদা, নিশ্চয়ই তোমাদের বাড়িতে কেউ ঢুকেছে। তোমরা আমার কথা গেরায্য করছ না!'

এবার হাতে-নাতে প্রমাণ দেখিয়েছে মমতা, খণ্ডন করার সাধ্যি নেই। বাধ্য হয়ে আমরা এঘর-সেঘর খোঁজার ভান করলাম। সঙ্গে মমতা।

শেষে মমতাই আবিষ্কার করল পায়ের ছাপ দোতলার সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেছে ছাদে।

ভাগ্যিস ছাদের দরজা খোলা ছিল। বেঁচে গেলাম সেই জন্যই।

গায়ে গায়ে সব বাড়ি। মমতাকে বোঝানো গেল—যে ঢুকেছে সে পালিয়েও গেছে ছাদ টপকে অন্য বাড়িতে।

সেই মুহূর্তেই পাশের বাড়ির অ্যালসেশিয়ানটা তারস্বরে চিৎকার শুরু করল।

মমতা আমাকে ঝাঁঝিয়ে উঠল—'তোমার জন্যই মাসিমা ফাঁকা বাড়িতে খুন হয়ে পড়ে থাকবে কোনোদিন।'

আমি বোকা বোকা মুখে জিজ্ঞাসা করলাম—'কেন রে—!'

'আর ঢঙ করো না।' মমতা মুখ ভ্যাঙচাল—'বিয়ে যদি করতে তবুও তো মাসিমা বাড়িতে একজনকে পেত। বাড়ি থাকো কতক্ষণ? আর ওই তো ডিউটির ছিরি!'

দুপুরে অফিস বেরোবার জন্য তৈরি হচ্ছি, এমন সময় নিউদিল্লি থেকে বিপ্রদাসের ফোন পেলাম। বিপ্রদাস, আমাদের রাজধানীর চিত্র-সাংবাদিক।

'অঞ্জনদা, কেমন আছেন?'

'ভালো আছি ভাই। তোমাদের খবর বলো।'

'আমরা সবাই ভালো আছি। মাসিমার খবর কী?'

'মা-ও ভালো আছেন।'

'আপনাদের পৌঁছনোর খবরও পেয়েছি ঠিক সময়ে। আপনার বন্ধু দীপক শর্মা আমাদের জানিয়ে দিয়েছিলেন। আপনি তো হাওড়ায় পৌঁছেই ওঁকে ফোন করেছিলেন। উনি বলেছেন সে কথা।'

'গাড়ি একদম রাইট টাইমে পৌঁছেছে, জানো!' হেসে বললাম—'আর রাস্তায় কোনো ট্রাবলও ফেস করতে হয়নি।'

'থ্যাঙ্ক গড।' বিপ্রদাস খুশি—'গতকাল সন্ধেতে কলকাতা দফতরে ফোন করেছিলাম। ইচ্ছে করেই আপনাকে চাইনি। ঠিক করেছিলাম বাড়িতে ধরব। ওদের কাছ থেকেই আপনার ফোন নম্বর নিয়েছি। তবে ফোন করেছি কিন্তু খুব ভয়ে ভয়ে।'

বিপ্রদাসের রসিকতা বুঝতে পেরে জিজ্ঞাসা করি—'কেন? যদি পিঙ্কি ফোন রিসিভ করে?'

'একজ্যাক্টলি।' বিপ্রদাস উচ্চস্বরে হেসে ওঠে।

'সেই ভয় কিন্তু দূর হয়নি ভাই, দুঃখিত!' আমি হাসতে হাসতে বলি—'তুমি চাইলে এক্ষুনি আমি পিঙ্কির হাতে রিসিভার তুলে দিতে পারি।'

'তার মানে!' বিপ্রদাসের গলায় উৎকণ্ঠা।

'হ্যাঁ ভাই, পিঙ্কি এখানে চলে এসেছে।'

'অসম্ভব!' বিপ্রদাস চেঁচিয়ে ওঠে—'এ হতে পারে নাকি!'

'কিন্তু তাই যে হয়েছে ভাই।' এরপর বিপ্রদাসকে সমস্ত ঘটনা পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করি। এখানে ফেরার পর থেকে যা যা ঘটেছে তা। এমন কি একটু আগে কী ঘটেছে—তাও।

বিপ্রদাস অবিশ্বাস করে না। সে জানে। সে তো আমারও আগে, নিজেই প্রত্যক্ষ করেছিল পিঙ্কিকে পাহাড়গঞ্জের বাড়িতে, সেই দোলনা চেয়ারে, ক্যামেরার লেন্সে চোখ ঠেকিয়ে!

সব শুনে বিপ্রদাস প্রশ্ন করে—'অঞ্জনদা কাউকে, মানে আমাদের দফতরের কাউকে এ সব জানিয়েছ নাকি?'

'না ভাই, কাউকে নয়! এসব বলতে যাই আর লোকে আমাকে পাগল ভাবুক আর কি!'

'আমি কি সুমিত্রদাকে জানাতে পারি?'

'নিশ্চয়!' জোরের সঙ্গে বলি।—'তুমি আর সুমিত্র ওখানে আমাকে যে সহযোগিতা করেছ তা কি করে ভুলি? তোমরা আমার বিপদের বন্ধু। তোমাদের না জানিয়ে পারি?'

'ধন্যবাদ অঞ্জনদা,' বিপ্রদাস বলে—'আপনার প্রশংসায় আমরা গর্বিত।'

'আর ভাই, দীপককেও ব্যাপারটা জানিও এবং সঙ্গে আমার ফোন নাম্বারটাও।'

'অবশ্যই জানাব।' বিপ্রদাস ফোন রেখে দেয়।

সেদিন অফিসে ঢুকেই হইহই ব্যাপার। এখানে-ওখানে জটলা, গুঞ্জন। সম্পাদকের চেম্বারে ঢোকার দরজার মাথায় জ্বলছে লাল জরুরি আলোর সংকেত। ছোটাছুটি করছেন প্রসেসিং, প্রিন্টিং, সার্কুলেশান বিভাগের কর্তাব্যক্তিরা। সকলের জরুরি তলব।

সকালেও নাকি জরুরি মিটিং হয়ে গেছে জি. এম-এর চেম্বারে। এসেছিলেন কাগজের ডিরেক্টর বোর্ডের সদস্যরাও।

কারণ জিজ্ঞাসা করতেই ভূত দেখার মতো অবাক হয়ে আমাকে জরিপ করল সহকর্মী অবনীশ— 'সে কি! এত বড় ঘটনা আর আপনি জানেন না? সারা শহরে হইহই!—'

আমি হাঁ করে থাকি।

'আজ সকালে কাগজ দেখেননি?'

'আমি না-সূচক মাথা নাড়ি।

'তবে কি আপনাকে কাগজ দেয়নি? অনেক জায়গায় অবশ্য ডেলিভেরিম্যানরা গোলমাল বুঝতে পেরে কাগজ বিলি বন্ধ করে দিয়েছে। তাই হয়তো আপনাকে দেয়নি।'

'দিয়েছে কি-না তাও বলতে পারব না।' আমি ইতস্তত করে বলি—'আসলে সকাল থেকে আজ এত ব্যস্ত ছিলাম, মনটা এত বিক্ষিপ্ত ছিল কয়েকটা ঘটনায়, যে কাগজ দেখার অবকাশই পাইনি।'

'সত্যি এত বড় একটা ভুল আমাদের মতো এত বড় একটা কাগজের পক্ষে খুবই লজ্জার। পাড়ায়, বাজারে, রাস্তায় লোককে কৈফিয়েৎ দিতে দিতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে গেছে প্রায়।' বলে চলে অবনীশ—'আপনাকে কেউ জিজ্ঞাসা করেনি?'

'আমার আজ দোকান-বাজার কোথাও বেরোবারই ফুরসৎ হয়নি। অফিস আসবার জন্যই প্রথম বেরিয়েছি। কিন্তু কী হয়েছে? কী ব্যাপার?'

'আমাদের কাগজের শহর সংস্করণ আজ মেইন নিউজটাকে মিস করে ছেপে বেরিয়ে গেছে। ফ্রন্ট-পেজের অর্ধেকটাই সাদা, একেবারে শূন্য।'

শূন্যদৃষ্টিতে অবনীশের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে আমি ধপাস করে চেয়ারে বসে পড়ি।

আশ্চর্য হয় না অবনীশ। ওরা জানে আমার এমন প্রতিক্রিয়া হওয়াটাই স্বাভাবিক। কারণ, চিফ সাব-এডিটরের বদান্যতায় ওই অংশটিরও দায়িত্বপ্রাপ্ত আমি। প্রতিক্রিয়ার প্রকৃত কারণ ওদের জানা নেই।

গতকাল সকালের সেই অদ্ভুত ঘটনাটাকে আমি তখন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। মা ভয়ার্ত কণ্ঠে আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন—'হ্যাঁরে, পিঙ্কির কোনো কারসাজি নয় তো?'

তবে কি আজকের ঘটনাটিই আগাম দেখতে পেয়েছিলাম আমি? আমাকে কি সতর্ক করতে চেয়েছিল পিঙ্কি?

এদিক-সেদিক চেয়ে দেখলাম কেউ আমাকে সেভাবে লক্ষ করছে কিনা! করছে না, নিশ্চিত হয়ে ফোনের কাছে উঠে গেলাম। ডায়াল করলাম বাড়িতে। মা ফোন ধরলেন।

'মা—?' এ প্রান্ত থেকে জিজ্ঞাসা করি।

'হ্যাঁ, বল।'

'মা দেখ তো আজকের কাগজটা। কাগজটা কোথায়?'

'দেখছি, একটু ধর।'

ফোন ধরে থাকি।

একটু পরে আবার মায়ের কণ্ঠস্বর—'খোকা, কাগজটা তো দেখতে পাচ্ছি না। কোথায় রেখেছিস?'

'কোথাও রাখিনি?' চাপা অথচ উত্তেজিত কণ্ঠে বলি—'আজকের কাগজ চোখেই দেখিনি আমি।'

'তোর টেবিলে এই তো কালকেরটা দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু আজকেরটা—'

'দেখ, দেখ। ভালো করে খুঁজে দেখ।'

ফোন ধরে রাখি।

মিনিট দুই পরে মা জানান আবার—'না রে খোকা, দেখতে পাচ্ছি না। একতলায়ও খুঁজে এলাম। পেলাম না।'

'তবে কি কাগজ দেয়নি?'

মা একটু ভাবলেন মনে হল। তারপরই জোর গলায় বললেন—'না, আজ কাগজ দিয়েছে। মমতা দোতলায় কাগজ নিয়ে এসেছে, আমি দেখেছি।'

'মমতা এ বেলা এসেছে?'

'না, আসবে। দেরি আছে।' বলেই পালটা প্রশ্ন করেন মা—'হ্যাঁ রে, আবার কী হল? আবার কিছু ঘটেছে কাগজে?'

সে কথার উত্তর না দিয়ে আমি বলি—'মমতা এলে কাগজটা কোথায় রেখেছে জেনে তুমি আমাকে ফোন করো। আর শোন, কাগজটা ফোনের সামনে রাখবে। আমি যা জানতে চাইব তার উত্তর দেবে।'

মা ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন—'আচ্ছা।'

সন্ধ্যা অতিক্রান্ত। ঘণ্টা দুয়েক কেটে গেছে মাকে ফোন করার পর। এখনও মায়ের ফোন পাইনি। মমতা কি তবে বিকেলে আসেনি?

আর অপেক্ষা না করতে পেরে আবার ফোন করলাম বাড়িতে।

'মা—! কী ব্যাপার!'

'কাগজটা কোথাও নেই খোকা।' মায়ের কণ্ঠ ভীত, কম্পিত।

বিরক্ত গলায় জিজ্ঞাসা করি—'মমতা এসেছিল?'

'হ্যাঁ, ও বলেছে ও তোরই টেবিলের ওপর রেখেছিল—এ ঘরে।'

'তবে সেটা গেল কোথায়?'

'জানি না।' মায়ের গলা বাষ্পসিক্ত মনে হল।—'ও আর আমি অনেক খুঁজেছি।'

'তোমার মেয়েকে জিজ্ঞাসা করেছ?'

উত্তর দিতে গিয়ে হু হু করে কেঁদে ফেললেন মা—'পিঙ্কিকে খুঁজে পাচ্ছি না খোকা, কোথাও না!'

অগ্রহায়ণ ১৪১১

ভূতের চর

শিশির বিশ্বাস

বাদাবনের এই গল্প শুনে কেউ মুখ বাঁকাতেও পারে। কিন্তু আমি নিরুপায়। আসলে রায়দিঘি ঘাটের সেই মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে আর দেখা হয়নি আমার। আর দেখা হলেও যে সুরাহা কিছু হবে সে সম্ভাবনাও কম। গোড়া থেকে খুলেই বলি ব্যাপারটা।

ছোটোখাটো এক কোম্পানির সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ। কাজের খাতিরে তাই ছুটোছুটি করে বেড়াতে হয় নানা জায়গায়। এমনই এক প্রয়োজনে গিয়েছিলাম বাদার ওদিকে সীতারামপুর গ্রামে। ফেরার দিন লঞ্চের গোলমালে দেরি হয়ে গেল বেশ। রায়দিঘি যখন পৌঁছোলাম তখন বেরিয়ে গেছে কলকাতার বাস। পরের বাস ঘণ্টা দুয়েক পরে। অনেকটাই সময়। কী করি। পায়ে পায়ে এসে বসলাম জেটিঘাটের অদূরে কদম গাছের তলায় বাঁধানো এক চাতালের ওপর। বেসরকারি অফিসের সামান্য মাইনের ছা-পোষা কর্মচারী। অফিসের কাজ আর সংসারের হিসেব ছাড়া মাথায় অন্য কিছুর জায়গা নেই' তবু মন্দ লাগছিল না। শেষ বিকেল। নদীর ওপারের আকাশে ছেঁড়া মেঘের গায়ে আবির ছড়াতে শুরু করেছে। নদীর জলে সেই আভা আরও মায়াময়। বড় একটা পাখির ঝাঁক নদীর ওপর দিয়ে উড়ে চলেছে কোথায়। নীচে শান বাঁধানো ঘাটে ছলাৎ ছলাৎ শব্দে ঢেউ আছড়ে এসে পড়ছে। অদূরে জেটিঘাটে ঝুড়ি ভরতি মাছ নামছে ট্রলার থেকে। হইহই চিৎকার। তার বাইরে এ এক অন্য অনুভূতির জগৎ।

মিনিটকয়েকের জন্য তন্ময় হয়ে গিয়েছিলাম বোধহয়। হঠাৎ দেখি আমার সামান্য দূরে সেই চাতালের ওপর বসে মাঝবয়েসি এক বাউণ্ডুলে গোছের মানুষ। হালকা চেহারা। আধ-ময়লা ধুতির ওপর একটা বেঢপ শার্ট। নাকের নীচে বেশ ভারী একজোড়া কাঁচা-পাকা গোঁফ। আমাকে তাকাতে দেখে বললেন, 'কিছু মনে করবেন না, স্যার। আমরা দু'চারজন বিকেলে খানিক বসি এখানে। বাকিরা আজ দেখছি আসেননি এখনও। তা আপনি বাস ফেল করেছেন বুঝি?'

বুঝতে বাকি রইল না জায়গাটা বিকেলে এদের কয়েকজনের আড্ডার আসর। অজান্তে অনধিকার প্রবেশ করে ফেলেছি। তাড়াতাড়ি মাথা নেড়ে বললাম, 'হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন। গিয়েছিলাম সীতারামপুর। একটুর জন্য বাসটা ফেল হয়ে গেল।'

আমাকে ব্যস্ত হয়ে উঠতে দেখে বললেন, 'আরে তাতে কী হয়েছে! বসুন না। কেউ যখন এখনও আসেনি তখন আপনার সঙ্গেই গল্প করা যাক খানিক।'

কথাবার্তা সামান্য অসংলগ্ন হলেও ভদ্রলোক কিন্তু জমিয়ে ফেললেন বেশ। নাম বললেন অভয় চক্রবর্তী। কাছেই এক স্কুলে মাস্টারি করেন। কথায় কথায় বললেন, 'সীতারামপুর আমিও গেছি একবার। কাছারি-বাড়িতে ছিলাম। ম্যানেজার নিতাই তালুকদার মানুষটা বড় চমৎকার।'

কাজের প্রয়োজনে আমিও গিয়েছিলাম ওই নিতাই তালুকদারের কাছেই। রাতে কাছারি-বাড়িতেই ছিলাম। বললাম সেকথা। শুনে উনি বললেন, 'ওই কাছারি-বাড়ির কাছে ডাকসাইটে মাঝি আছে একজন। জগন্নাথ সর্দার। তার নৌকোয় সুন্দরবনে ঘুরতে গিয়েছিলাম একবার। তারপর সে এক ব্যাপার হয়েছিল মশাই।'

হাতে সময় প্রচুর। এসব বাদা অঞ্চলে গল্প মানেই বাঘ নয়তো ডাকাতির রোমহর্ষক কাহিনি। গত রাত্তিরে নিতাই তালুকদারের কাছেও শুনেছি গোটা কয়েক। মন্দ লাগেনি। নতুন আর একটা গল্পের গন্ধে তাই নড়েচড়ে বসলাম। ততক্ষণে উনি বলতে শুরু করেছেন, 'সে বছর দুই আগের কথা। রায়দিঘিতে মাস্টারি করলেও বাদার ওদিকে আর যাওয়া হয়ে ওঠেনি কখনও। সেবার স্কুলের কয়েকজন হঠাৎ ঠিক করল বেড়াতে যাবে বাদার ওদিকে। আমাকেও সঙ্গে জুটিয়ে নিল। জুটে গেল আশপাশের দু'তিনটে স্কুলের আরও কয়েকজন। এই রায়দিঘির ঘাট থেকে বড় একটা ভটভটি নৌকোয় রওনা হয়েছিলাম ঠিক পূর্ণিমার পরের দিন। দিন চারেকের ট্যুর। চাঁদনি রাতে জল আর জঙ্গল দেখার সুযোগ যাতে ভালো করে মেলে তাই বাছা হয়েছিল সময়টা। কিন্তু এ দুনিয়ায় সবকিছু ঠিকমতো কবে আর হয়েছে। তাই গোলমাল হয়ে গেল একদম গোড়াতেই। বিকেলে ভগবতপুর কুমির প্রকল্প দেখে রাতটা কাটানো হল সীতারামপুরের কাছে। পরদিন সকাল সকাল ছেড়ে দেওয়া হল নৌকো। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে এসে পড়লাম বিশাল ঠাকুরান নদীতে। কী বলব। নদী তো নয় যেন সমুদ্র। চারপাশে দিগন্তবিস্তৃত শুধু জল আর জল। চারপাশে তাকিয়ে কোথাও কূলের খোঁজ মেলে না। আর সে কী ঢেউ! ব্যাপারটা বুঝেছিলাম পরে।

সুবিশাল ঠাকুরান নদীতে ঢেউয়ের তেজ এমনিতেই ভয়ানক। তার ওপর তখন সবে জোয়ার শুরু হয়েছে। ঢেউয়ের তেজ তাই আরও বেশি। বিশাল বিশাল ঢেউ আছড়ে এসে পড়ছে ভটভটির গায়ে। অত বড় নৌকো প্রায় মোচার খোলার মতো ঠেলে উঠছে উপরে। তারপর নাগরদোলার মতো মুহূর্তে নেমে আসছে গোঁত্তা খেয়ে। সে এক ভয়ানক অবস্থা। দেখতে না দেখতে হাউমাউ শুরু হয়ে গেল সারা নৌকো জুড়ে। আনন্দ করতে এসে এভাবে প্রাণের ঝুঁকি নিতে রাজি নয় কেউ। কয়েকজন তো রীতিমতো কান্নাকাটি জুড়ে দিল। এক্ষুনি ফিরে যাবে সবাই। বাঘ বা বাদার জঙ্গল কোনোটাই দেখার দরকার নেই আর। সাধ মিটে গেছে। সুতরাং ঘোরানো হল নৌকোর মুখ। ভটভটি ফিরে চলল ফের রায়দিঘির দিকে।

ব্যাপারটা আমার কিন্তু ঠিক মনঃপূত হল না। বেড়াতে বেরিয়ে এভাবে পালিয়ে যাওয়ার মানে হয় না। অবস্থাটা হয়তো কিছু বিপজ্জনক, কিন্তু এই বিপদ মাথায় করেই তো বেঁচে রয়েছে বাদার হাজারো মানুষ। তবু হয়তো মেনেই নিতাম। কিন্তু সাহস জোগালেন রমেনবাবু। ভদ্রলোকের বয়স কম। নতুন যোগ দিয়েছেন আমাদের স্কুলে। গোড়ায় বোঝাবার চেষ্টা করলেন সবাইকে। কিন্তু তাতে যখন কোনও কাজ হল না তখন বললেন, তাঁকে সীতারামপুরে নামিয়ে দেওয়া হোক। ব্যবস্থাপত্র করে তিনি একাই যাবেন। তাই হল, রমেনবাবুকে নামিয়ে দেওয়া হল সীতারামপুরের ঘাটে। নেমে পড়লাম আমিও।

অজানা অচেনা জায়গা। কিন্তু কাজের মানুষ রমেনবাবু মুশকিল আসান করে ফেললেন কিছুক্ষণের মধ্যেই। ঘাটেই আলাপ হয়ে গেল কাছারি-বাড়ির নিতাই তালুকদারের সঙ্গে। খাস কলকাতার মানুষ। চাকরির দায়ে পড়ে আছেন এই পাণ্ডববর্জিত স্থানে। প্রায় জোর করেই ধরে নিয়ে গেলেন তাঁর ওখানে। গল্প হল অনেক। ভেড়ির টাটকা মাছ দিয়ে ভূরিভোজ। বললেন, 'সুন্দরবন বেড়াতে যাবেন, সেজন্য ভাবনা কী? জগন্নাথ সর্দারকে খবর পাঠাচ্ছি। অমন অভিজ্ঞ মাঝি এ তল্লাটে আর দ্বিতীয়টি পাবেন না। বাদার বন ওর নখদর্পণে। নিজের নৌকোও রয়েছে। যে কয়দিন ইচ্ছে হয় নিশ্চিন্তে ঘুরুন।'

খবর পেয়ে মাঝি জগন্নাথ সর্দার এসে হাজির হল খানিক বাদেই। মাঝবয়সি মানুষ। ছিপছিপে পাকানো শরীর। কিন্তু ওর নৌকো দেখে ভরসা হল না বিশেষ। ভটভটি নয়। মামুলি দাঁড়ে-টানা নৌকো। এতে কত আর ঘোরা যাবে? আশঙ্কায় বলেই ফেললাম সেকথা। ব্যাপারটা জগন্নাথ সর্দারকে

যে এতটা আঘাত করবে ভাবিনি। প্রায় দপ করে জ্বলে উঠল তার চোখ দুটো। বলল, 'ভটভটিতে ক'দিনের জন্য বেড়াতে বেরিয়েছিলেন, বাবু?'

দিনচারেকের জন্য বেরিয়েছিলাম। বললাম সেকথা। লোকটা বলল, 'ওই চারদিনই আমাকে সময় দেবেন। কথা দিচ্ছি বাদার এ দিকটা গুলে খাওয়াব আপনাদের। ঘুরিয়ে নিয়ে আসব ভূতের চর পর্যন্ত।'

নিতাইবাবু পাশেই ছিলেন। বললেন, 'জগন্নাথকে খ্যাপাবেন না মাস্টারমশাই। ওর পক্ষে সব সম্ভব। তাছাড়া ব্যাপারটা কী জানেন? ভটভটিতে কিছুটা তাড়াতাড়ি হয় ঠিকই। তবে মাঝি যদি পাকা হয়। বাদায় জোয়ার-ভাটার হিসেবটা যদি ঠিকমতো বোঝে, তবে দাঁড়ে-টানা নৌকোও কিছু কম যায় না। দিন দুই ঘুরে এলেই বুঝবেন। তবে একটা কথা। ভূতের চরের ওদিকে না যাওয়াই ভালো।'

ভূতের চর। অদ্ভুত নামটা গোড়ায় জগন্নাথের মুখে শুনেও তেমন কৌতূহল হয়নি। কিন্তু এবার হল। বললাম, 'কেন বলুন তো?'

প্রত্যুত্তরে ভদ্রলোক পাশে জগন্নাথের ওপর একটু চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, 'সে অনেক কথা মাস্টারমশাই। জগন্নাথেরাই জানে ভালো। তবে এটুকু বলতে পারি, জায়গাটা অনেক দূরে। আর বেশ নির্জনও বটে। ডাকাতের ভয় রয়েছে যথেষ্ট।'

এর বেশি নিতাইবাবু তখন আর কিছু বলেননি। আমরাও আর জিজ্ঞাসা করিনি কিছু। সেই রাত্তিরেই হাট-বাজার সব সেরে পরদিন ভোরেই বেরিয়ে পড়লাম। নৌকোয় সওয়ার আমরা দুজন। এছাড়া জগন্নাথ নিজে আর ওরই সমবয়সি একজন দাঁড়ি, নরেন মণ্ডল।

নদীতে তখন ভাটার টান। তার ওপর বাতাস অনুকূলে দেখে পাল তুলে দিল জগন্নাথ। দাঁড় ছাড়াই প্রায় তীরবেগে ছুটল নৌকো। ঘণ্টাদুয়েকের মধ্যে এসে পড়ল সেই ঠাকুরান নদীতে। নৌকোর পেছনে পাকা হাতে হাল ধরে আছে জগন্নাথ। কূলকিনারাহীন সেই জলরাশির মাঝে আমাদের নৌকো কোনাকুনি পাড়ি দিতে লাগল। ঢেউয়ের তেজ আজ কিছু কম। তবু তাতেই আমাদের সেই ছোটো নৌকো থেকে থেকেই প্রায় খোলায় খই ভাজার মতো লাফালাফি করছিল। অবিরাম ছলাৎ ছলাৎ করে নৌকোয় লাফিয়ে উঠছিল জল। ছেঁচে ফেলা হচ্ছিল তৎক্ষণাৎ। আমাদের বুকের ভেতর অবশ্য আশঙ্কার চাইতে রোমাঞ্চের ছোঁয়া ছিল বেশি। একে তো এ অভিজ্ঞতা বার বার আসে না। তার ওপর নৌকোর পেছনে বসে পাকা হাতে জগন্নাথ মাঝি যেভাবে নিশ্চিন্তে হাল সামলাচ্ছিল তাতে মানুষটার ওপর যে ভরসা করা যায় সেটা ততক্ষণে বুঝে ফেলেছি। ওরই ভেতর লোকটা আমাদের সঙ্গে নানা গল্পও করে যাচ্ছিল সমানে। ইতিমধ্যে নামিয়ে ফেলা হয়েছে পাল। দাঁড়ি নরেন মণ্ডলের দু'হাতে এক জোড়া দাঁড় চলছে সামনে। জল ছেঁচতে ছেঁচতে আমরা গল্প জুড়লাম জগন্নাথের সঙ্গে। ভেতরে কৌতূহলটা ছিলই। সুযোগ পেতে ভূতের চর-এর প্রসঙ্গটা তুললাম এক ফাঁকে। আমার মনের ভাব আঁচ করে জগন্নাথ বলল, 'ম্যানেজারবাবুর কাছে তো শুনেছেন কিছু। তবে সেটাই সব নয়। ভূতের চরের বদনাম অন্য কারণে। বাদায় যাদের নিয়মিত যাওয়া-আসা রয়েছে তাদের অনেকেই ওখানে অনেক কিছু দেখছে। ভূত-প্রেত। নানা অপদেবতা।'

রমেনবাবু একমনে শুনছিলেন। প্রায় লুফে নিয়ে বললেন, 'তার এক-আধটা শোনাও দেখি জগন্নাথ। নৌকোয় এমন চমৎকার নাগরদোলার দোল খেতে খেতে ব্যাপারটা মন্দ লাগবে না বোধহয়।'

রমেনবাবুর কথা জগন্নাথের পছন্দ হল না তেমন, 'সে যাই বলুন বাবু, আমাদের এই বাদার মানুষের কাছে ব্যাপারটা সহজ নয় অত। শুনতে চাইলেন যখন বলি একটা। সেবার মরশুমে

সাতজেলিয়ার জনাকয়েক মানুষ বেরিয়েছিল গোলপাতা কাটতে। গোলপাতা চেনেন তো? কতকটা চারা নারকেল গাছের মতো দেখতে। পাতায় ঘরের ছাউনি হয় ভালো। তাই কদর আছে খুব। তা ভালো গোলঝাড়ের খোঁজে ঘুরতে ঘুরতে ওরা এক সময় এসে হাজির হল ভূতের চরে। নদীর ধারেই বড় বড় গোলপাতার জঙ্গল। দেখে নৌকো ভিড়িয়ে বনবিবির নাম নিয়ে নেমে পড়ল সবাই। টানা দুটো দিন গোলপাতা কাটা হল। বড় নৌকো নিয়ে আসা হয়েছে। সঙ্গে লোকজনও অনেক। তবু গোড়ায় ভয় একটু ছিলই। কিন্তু দু'দিনেও যখন কিছু ঘটল না তখন খানিকটা সাহস বাড়ল সবার। তৃতীয় দিন বনের একটু ভেতরে ঢুকে পড়ল ওরা। জোর কদমে পাতা কাটার কাজ চলছে, একদল অল্পবয়েসি ছোকরার সাধ হল তাড়িফল খাওয়ার। তাড়িফল শুনে ঘাবড়ে যাবেন না বাবু। ওটা গোলপাতার ফল। দেখতে ছোটো নারকেলের মুছির মতো। নারকেলের মতোই কাঁদি হয়। এক এক কাঁদিতে জন্মায় প্রায় এক-দেড়শো। পুরুষ্টু হলে চমৎকার শাঁস হয় ভেতরে। তা সামান্য খোঁজাখুঁজি করতেই অদূরে জঙ্গলের ভেতর এক মস্ত গোলঝাড়ে পুরুষ্টু তাড়িফলের খোঁজ পেয়ে গেল ওরা। বড় বড় গোটা কয়েক কাঁদি কেটে নামিয়ে পাশেই একটু পরিষ্কার জায়গায় বসে সেগুলোর সদ্‌গতি করতে বসল সবাই। নারকেলের মুছির মতো ছোটো ফল। ধারালো দায়ের কোপে মাঝ বরাবর ফেড়ে শাঁস বার করা হয়। তাই সময় লাগে একটু। ওরা দু'চারটে করে ফল সবে খেয়েছে; দেখে অদূরে গরান গাছের ডালে বসে এক বাঁদর। জুলজুল করে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে।

বাদার বাঁদর গাছের ফল-পাতা খেয়েই বেঁচে থাকে। তাড়িফলও বড় প্রিয় ওদের। কিন্তু দুর্ভাগ্য, শক্ত মুছি ফাটিয়ে ভেতরের শাঁস খাওয়া ওদের সাধ্যের বাইরে। কাউকে তাই তাড়ি ফল কেটে খেতে দেখলেই এসে ভিড় জমায় কাছে। বাদার মানুষের বড় বন্ধু এই বাঁদরের পাল। গাছের ডালে বসে নজর রাখে চারপাশে। দুশমন বড় শেয়ালকে (বাঘ) দেখতে পেলেই হুঁশিয়ার করে দেয়। এদিকে বাঁদরকে তাই একটু প্রশ্রয় দেয় সবাই। এক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম হল না। একজন একটা শাঁসের টুকরো ছুঁড়ে দিল বানরটার দিকে। দিব্যি হাত বাড়িয়ে সেটা লুফে নিল প্রাণীটা। নিমেষে পেটে চালান করে দিয়ে ফের হাপুস নয়নে তাকিয়ে রইল ওদের পানে। এরপর খাওয়ার ফাঁকে একটা-দুটো করে শাঁস ছুঁড়ে দেওয়া হতে থাকল বানরটাকে। খানিক এভাবে চলার পর ওদের খেয়াল হল ব্যাপারটা। কী কাণ্ড! ওইটুকু এক প্রাণী যে খেয়েই চলেছে সমানে। এমনটা দেখা যায় না বিশেষ। অল্প কয়েকটা খেয়েই সাধারণত সরে পড়ে। নয়তো পাশেই পড়ে থাকে। ছুঁয়েও দেখে না। এ যে সমানে খেয়েই চলেছে! পেটে কত জায়গা আছে ওইটুকু এক পুঁচকে বাঁদরের! মজা পেয়ে ওরা এবার খাওয়া বন্ধ করে তাড়িফল কেটে সমানে ছুঁড়ে দিতে লাগল বাঁদরটার দিকে। আর সে-ও হাত বাড়িয়ে সেগুলো টপাটপ লুফে নিয়ে সমানে চালান করে দিতে লাগল পেটে। এভাবে গোটা পাঁচেক কাঁদি যখন বাঁদরটার পেটে চলে গেছে তখন হুঁশ হল একজনের। কী সর্বনাশ! এ তো বাঁদর নয়। অন্য কিছু। সঙ্গীদের কাছে কিছু না ভেঙে সে ইশারায় সরে পড়তে বলল সবাইকে। ব্যাপারটা বুঝতে তখন আর বাকি নেই কারও। যে যার দা হাতে উঠে পালাতে যাবে, অন্তত হাত পনেরো লম্বা বিশাল একটা রোমশ হাত সামনে এসে পথ আগলে দাঁড়াল। গাছের ডালে বসে সেই বাঁদরটাই ওই বিপুল আকারের হাতটা বাড়িয়ে দিয়েছে। আর কী সর্বনাশ! বানরের সেই ধড়ের ওপর মস্ত এক মানুষের মাথা। মুলোর মতো একরাশ দাঁত বার করে হাসছে। এরপর—'

জগন্নাথের জমাট গল্পটা শেষ হতে পেল না, বিশাল ঠাকুরান নদীতে উলটো দিক থেকে জোয়ারের টান শুরু হয়ে গেল হঠাৎ। মস্ত ঢেউয়ের মাথায় মোচার খোলার মতো লাফিয়ে উঠল নৌকো। শক্ত হাতে নৌকো সামলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল জগন্নাথ। গল্পে মজে খেয়াল ছিল না এতক্ষণ। তাকিয়ে দেখি সেই বিশাল জলরাশির ওপারে বহু দূরে হালকা একটা ডাঙার রেখা সবে দেখা যাচ্ছে। ঠাকুরান

নদীতে পড়ার পর প্রায় ঘণ্টা দুয়েকের ওপর চলা হয়েছে। ওপারে ডাঙা আর কতদূর জিজ্ঞাসা করতে জগন্নাথ জানাল আরও প্রায় ঘণ্টা তিনেকের পথ।

লাগল অবশ্য আরও বেশি। সন্ধের মুখে নৌকো এসে পৌঁছল ওপারে শেয়ালফেলি জঙ্গলের কাছে এক ফোড়ন খালের ভেতর। দু'ধারে ঝিমঝিম করছে জঙ্গল। বড় নদীতে তবু মাঝে-মধ্যে দু'একটা নৌকো নজরে পড়েছে। এখানে এই সন্ধ্যায় জনমানুষের চিহ্নমাত্র নেই কোথাও। নিস্তব্ধ নিঝুম। ইতিমধ্যে আকাশে বড় চাঁদ উঠেছে একটা। মায়াবী আলোয় ম-ম করছে চারপাশ। নিঝুম বনের ভেতর থেকে ভীত একটা হরিণ টাঁউ—টাঁউ শব্দে ডেকে উঠল হঠাৎ। জগন্নাথ বলল, 'জায়গাটা গরম আছে বাবু। রাত্তিরটা সাবধানে থাকতে হবে একটু।'

গরম মানে বাঘ রয়েছে জঙ্গলে। তারই গন্ধ পেয়ে হরিণটা ডেকে উঠল হঠাৎ। শুনে ভেতরে কিছুটা রোমাঞ্চ জাগলেও অন্য ব্যাপারটাও এল প্রায় হাত ধরে। এমন কিছু চওড়া নয় খালটা। রাত্তিরে সাঁতরে এই ছোটো নৌকোয় ওঠা বাঘের পক্ষে কিছুই নয়। রমেনবাবু প্রস্তাব করলেন, নৌকো ফাঁকায় বড় নদীতে নিয়ে নোঙর করতে। শুনে জগন্নাথ ফিক করে হেসে বলল, 'সে তো আরও বিপদ বাবু। এদিকে ডাকাতের বড় রমরমা। রাত্তিরে বড় নদীতে কেউ তাই নৌকো গেরাপি (নোঙর) করে না। সব ঢুকে পড়ে জঙ্গলে খালের ভেতর। তাতেও অবশ্য রেহাই মেলে না সব সময়। তবে জগন্নাথ যখন রয়েছে ঘাবড়াবেন না কেউ। রাত্তিরে বড় শেয়াল (বাঘ) যদি হানা দেয় ডেকে দেব আপনাদের। চাঁদনি রাত আছে দেখতে পাবেন। নিশ্চিন্তে শুয়ে পড়ুন।'

বাদার বন কী জিনিস সেই প্রথম রাত্তিরেই মালুম পেলাম। বেশ নিশ্চিন্তেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম দুজন। জগন্নাথের ডাকে ভেঙে গেল হঠাৎ। কানের কাছে মুখ নিয়ে চাপা গলায় ডাকছে আমাদের। আমরা জেগে উঠতেই ফিসফিস করে বলল, 'সাবধান বাবুরা। ডাকাতের নৌকো মনে হচ্ছে। তবে ঘাবড়ে যাবেন না। কাছে এলেই হাঁক দেব। আপনারা শুধু তাল দিয়ে যাবেন। বলবেন বনদপ্তরের বাবু। টহলে বেরিয়েছেন। বাকিটুকু সামলে নেব আমি। হুঁশিয়ার।'

বলেই প্রায় হুড়মুড় করে ছইয়ের ভেতর থেকে বেরিয়ে গেল জগন্নাথ। ঘাবড়ে গেলেও ওরই ভেতর দ্রুত তৈরি হয়ে নিলাম যথাসম্ভব। ভেতর থেকে তাকিয়ে দেখি জ্যোৎস্নার আলোয় অদূরে লম্বামতো একটা নৌকো আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। কাছাকাছি আসতেই প্রায় বাঘের মতো গলায় গর্জে উঠল জগন্নাথ, 'কাদের নৌকো যায়? এই রাত্তিরে!'

নৌকোটা ততক্ষণে প্রায় আমাদের গায়ের কাছে এসে পড়েছে। ওদিক থেকে খরখরে গলায় উত্তর এলো, 'কিন্তু তোমরা কারা? কোন গাঁয়ের?'

'কোনও গাঁয়ের নই গো। বনদপ্তরের। বাবুরা রয়েছেন ভেতরে। টহলে বেরিয়েছেন। কিন্তু তোমাদের জবাব পাইনি এখনও।' ফের হাঁক পাড়ল জগন্নাথ।

মিনিট খানেক ও-তরফে কোনও সাড়াশব্দ নেই। চুপচাপ। এই সময় জবর খেল দেখালেন রমেনবাবু। ভদ্রলোকের বুকের পাটা আছে বটে! লুঙ্গির ওপর ধপধপে শার্টটা চাপিয়ে হঠাৎ গটমট করে বাইরে বার হয়ে বললেন, 'কে রে? কুমিরমারির তমিজদ্দি নাকি? এত রাতে নৌকো বেয়ে চলেছিস কোথায়?'

উত্তরে ছইয়ের ভেতর থেকে হাত কচলাতে কচলাতে একজন বেরিয়ে এল। লম্বা-চওড়া মজবুত শরীর। থুতনির নীচে খানিকটা ছাগল-দাড়ি, 'আজ্ঞে না কত্তা। আমি মোল্লাখালির রমজান। বেড়জাল পেতে সুঁতিখালে মাছ ধরতে বেরিয়েচি।'

'তা পাস আছে তো? নাকি বে-পাসেই বেরিয়েছিস?' ফের হাঁক পাড়লেন রমেনবাবু।

'আজ্ঞে আছে কত্তা।' হাত কচলাতে কচলাতে বলল লোকটা।

'ঠিক আছে যা।'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দু'জোড়া দাঁড়ের টানে বেরিয়ে গেল নৌকোটা। রায়দিঘির স্কুলে মাস্টারি করি। আবাদের অনেক খবরই কানে আসে। কুমিরমারির তমিজদ্দি ডাকাতের নাম শুনেছি বার কয়েক। বড় চমৎকারভাবে সেটা কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন রমেনবাবু। শুধু আমিই নই খোদ জগন্নাথও হাঁ করে তাকিয়ে ছিল এতক্ষণ। রমেনবাবু এভাবে একাই ব্যাপারটা সামলাবে ভাবতেই পারেনি সে। নৌকোটা বাঁকের মুখে অদৃশ্য হয়ে যেতে একগাল হেসে বলল, 'দারুণ সামলেছেন বাবু। কোনও সন্দেহ নেই এরা ডাকাত। যেভাবে তমিজদ্দির নামটা করলেন তাতেই কাত হয়ে গেছে একেবারে। আমার তো মনে হয় এরা তমিজদ্দির দলেরই লোক।'

রমেনবাবু শুধু একটু মুচকি হাসলেন, 'ভূতের চরে তাহলে কিন্তু যাচ্ছি আমরা। তোমার ওই গপ্পের শেষটুকুও পাওনা হয়ে রয়েছে।'

প্রত্যুত্তরে জগন্নাথ কপালে একবার হাত ঠেকিয়ে বলল, 'সেজন্য চিন্তা করবেন না বাবু। শুয়ে পড়েন এবার। খানিক বাদে ভাটা শুরু হলেই ছেড়ে দেব নৌকো।'

শেষ রাতে ভাটার টান শুরু হতেই ছেড়ে দেওয়া হল নৌকো। সারাদিন হরেক নদী আর খাল পাড়ি দিয়ে বিকেলের দিকে এসে পৌঁছলাম ছাইমারির কাছে। জঙ্গল এদিকে আরও গভীর। আরও নির্জন। তবে এই একদিনে সাহস অনেকটাই বেড়ে গেছে আমাদের। আসার পথে দেখেওছি কম নয়। নদীর চড়ায় ঘাস খেতে আসা হরিণ, শুয়োর। এমনকি মাঝারি আকারের একটা কুমির পর্যন্ত। এক ফোড়ন খালের ধারে দিব্যি রোদ পোয়াচ্ছে। পেল্লায় সাইজের পায়রাচাঁদা আর বাদার বাঘা কাঁকড়া দিয়ে দুপুরের ভোজটাও হয়েছে জমজমাট। তাই বাঘের দেখা এ পর্যন্ত না মিললেও আফসোস নেই কারও। ঠিক হল রাতে ভাটার টান যতক্ষণ রয়েছে নৌকো বাওয়া হবে। সম্ভব হলে আজ রাতেই পৌঁছে যাওয়া হবে কেঁদোখালির কাছে। ভূতের চর তারপর আর বেশি দূরে নয়। যাই হোক বিকেলের মরা আলোয় দুজনে বসে আছি নৌকোর ওপর। নদীর জলে লালচে আভা। দাঁড় টানার একটানা ছপছপ শব্দ। হঠাৎ একটা বাঁক ঘুরতেই দেখি মস্ত একপাল হরিণ নদীর চড়ায় বড় বড় ধানী আর মুথোঘাস দিয়ে রাতের ডিনার সারতে ব্যস্ত। চমৎকার ওই দৃশ্য দেখে প্রায় নিঃশব্দে নৌকো খানিকটা তীরের দিকে এগিয়ে আনা হল। হরিণের পাল কিন্তু নড়ল না বিশেষ। জগন্নাথ বলল, 'এ জিনিস বাবু দাঁড়ে টানা নৌকো থেকেই দেখা সম্ভব। ভটভটি হলে আওয়াজে দূর থেকেই পালাত সব।'

এমন দৃশ্য, একসঙ্গে এত হরিণ বড় একটা দেখা যায় না বিশেষ। হাঁ করে তাকিয়ে আছি। হঠাৎ সতর্ক হয়ে উঠল প্রাণীগুলো। মুহূর্তে মুখ তুলে ছুটে পালিয়ে গেল জঙ্গলের গভীরে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অদূরে একটা ঝোপ নড়ে উঠল সামান্য। ব্যাপারটা কী বোঝার জন্য রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছি, গাছপালা ঠেলে বেরিয়ে এল একটা মাঝবয়সি মানুষ। ছোটোখাটো শরীর। হাঁটুর ওপর ভাঁজ করে পরা একটা লুঙ্গি। খালি গা। মাথার ওপর একটা গামছা শুধু ঘোমটার মতো জড়ানো। মুখভর্তি ক'দিনের না-কামানো দাড়ি। হাতে ছোটো একটা হেতালের লাঠি। এই ভয়ানক অরণ্যের ভেতর লোকটা এই অসময়ে হঠাৎ কোথা থেকে এল যখন ভাবছি, ততক্ষণে লোকটা কাছে এগিয়ে এসেছে আরও। হাত তুলে বলল, 'আমি ঝড়খালির গণেশ ঢালি। বড্ড বিপদে পড়েছি বাবু। বাঁচান।'

বিস্ময়ের ঘোর তখনও কাটেনি। হাঁ করে তাকিয়ে আছি দুজন। ওদিক থেকে জগন্নাথ বলল, 'ব্যাপার কী বলো দেখি?'

'সে অনেক কথা মাঝিদা। ক'দিন আগে দুজন বেরিয়েছিলাম চোরাই হরিণ শিকারে। কপাল মন্দ। পড়ে গেলাম পিটেল বোটের (পেট্রলিং বোট) খপ্পরে। শেষে নৌকো ফেলে জঙ্গলে গা-ঢাকা দিতে হল। পিটেলের বাবুরা তুলে নিয়ে গেল নৌকো। দিন তিনেক জঙ্গলে আটকে থেকেও যখন কোনও নৌকোর খোঁজ মিলল না তখন সাঁতরে নদী পার হতে গিয়েছিলাম। চোখের সামনে

সঙ্গীকে টেনে নিয়ে গেল কুমিরে। সেই থেকে আটকে আছি এখানে। ক'দিনে গোটা কয়েক কেওড়া ফল ছাড়া পেটে আর কিছু পড়েনি।'

জগন্নাথ বলল, 'আমরা কিন্তু বাপু ভূতের চরের দিকে যাচ্ছি। আবাদে ফিরতে দিন কয়েক লাগবে আরও।'

লোকটা শশব্যস্তে বলল, 'তা লাগুক মাঝিদা।'

লোকটাকে নৌকোয় তুলে নেওয়া হল এরপর। গোড়ায় কিছুটা আড়ষ্ট মনে হলেও কিছুক্ষণের মধ্যেই কিন্তু সে মানিয়ে ফেলল বেশ। ছোটোখাটো চেহারার মানুষটা বেশ কাজেরও বটে। ক'দিনের না-খাওয়া শরীর। কিন্তু একরকম জোর করেই নরেনের হাত থেকে দাঁড় জোড়া টেনে নিয়ে যেভাবে উৎসাহে টানতে লাগল তা দেখবার মতো। দেখে জগন্নাথও বেজায় খুশি। এক ফাঁকে বলেই ফেলল, 'এ ভাবে চলতে পারলে কাল দুপুরের অনেক আগে ভূতের চর পৌঁছে যেতে পারব।'

কিন্তু দিনটা সেদিন বোধ হয় ভালো ছিল না একেবারেই। খানিক বাদেই কী ঘটতে চলেছে স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি তখন।

রাত তখন গোটা আষ্টেক। জোয়ার শুরু হয়ে গেল। আগন্তুক গণেশ ঢালির ইচ্ছে ছিল আরও খানিক এগিয়ে যাওয়ার। কিন্তু জগন্নাথ রাজি হল না। এক টেঁকের মুখে ফোড়ন খালের ভেতর রাতের মতো নোঙর করতে চাইল। জায়গাটা ওর পরিচিত।

জ্যোৎস্নার আলোয় আজও ভেসে যাচ্ছে চারপাশ। কলকল করে স্রোত বইছে ফোড়ন খালে। চাঁদের আলো পড়ে ঝিকমিক করছে। নৌকো তখন নোঙর করার তোড়জোড় চলছে। হঠাৎ অদূরে খালের পাড়ে জলের ওপর ঝপাং করে প্রবল শব্দে কী একটা আছড়ে পড়ল। গোড়ায় মনে হয়েছিল পাড়ের মাটি ভেঙে পড়ল বুঝি। কিন্তু ভুল ভাঙতে দেরি হল না। মস্ত এক নোনা জলের কুমির। সম্ভবত বিশ্রাম করছিল পাড়ের ওপর। আমাদের সাড়া পেয়ে নেমে পড়েছে জলে। অভিজ্ঞ জগন্নাথ জানাল, কুমিরটা মানুষখেকো এবং ক্ষুধার্তও বটে। আমাদের সাড়া পেয়ে জলে নেমে পড়ল। শিকারের আশায় কাছেই কোথাও ওৎ পেতে থাকবে সারা রাত।

যাই হোক ব্যাপারটা নিয়ে ওরা অবশ্য মাথা ঘামাল না বেশি। রাতের রান্নার তোড়জোড় শুরু হল একটু বাদেই। সন্ধে রাত্তিরে হালকা হিমেল ভাব। গায়ে ভালো করে জামাকাপড় জড়িয়ে রমেনবাবু আর আমি বাইরে ছইয়ের ওপর বসে চাঁদের আলোর অপরূপ শোভার দিকে তাকিয়ে রয়েছি। আগুনের আলো যাতে বাইরে না যায় তাই ছইয়ের নীচে নৌকোর খোলের ভেতর উনুন জ্বেলেছে নরেন। জগন্নাথ তদারক করছে পাশে বসে। আগন্তুক গণেশ ঢালি আমাদের মতোই বাইরে নৌকোর গলুইয়ের কাছে বসে ঢুলছে। মাথাটা সেই একই রকম গামছায় ঢাকা। এর মধ্যে বারেকের জন্যও নামেনি সেটা। সামনে ফাঁক দিয়ে মুখটা দেখা যাচ্ছে শুধু। এমন সময় দেখি দূরে একটা নৌকো আসছে আমাদের দিকে। পরিষ্কার চাঁদের আলোয় দূর থেকে হলেও চিনতে ভুল হল না। কী সর্বনাশ! গত রাত্তিরের সেই ডাকাতের নৌকোটা। বুঝতে বাকি রইল না, যে কোনও ভাবেই হোক আমাদের ফাঁকিটা ধরে ফেলেছে ওরা। আর সেই থেকে আড়ালে পিছু নিয়েছে। সারা দিনে টেরটিও পাইনি কেউ।

ততক্ষণে জগন্নাথের চোখেও পড়েছে ব্যাপারটা। দাঁড়িয়েছে বাইরে এসে। হতাশ হয়ে বলল, 'আর রেহাই নেই বাবুরা। কপালটাই খারাপ দেখছি এবার।'

দেখতে দেখতে সেই নৌকো এসে থামল আমাদের পাশে। গটমট করে ভেতর থেকে বেরিয়ে এল সেই দাড়িওয়ালা লোকটা। হাতে বন্দুক। পাশে আরও দুজন। 'কই গো পিটেল বোটের বাবুরা। চাঁদ বদন দেখাও দিনি একবার।'

জগন্নাথ বলল, 'যা আছে বার করে দিচ্ছি। অযথা হেনেস্তা করো না বাপু।'

খ্যা—খ্যা করে হাসল লোকটা, 'সে আর বলতে! সারা দিন যা ভোগানটা ভুইগেচো। দাঁইড়ে

দেখছিস কী আসগর! দুই বাবুর একটারে বেঁধে আন দিনি। জামিনদারের ব্যবস্থাটা হোক আগে। তারপর কী মেলে দেখি।'

শুনে পা থেকে মাথা পর্যন্ত শিউরে উঠল। কী ভয়ানক কথা! আমাদের কাউকে আটকে রেখে মোটা টাকা আদায় করতে চায় এরা। শখ করে বেড়াতে এসে এ কী বিপদে পড়লাম। ইতিমধ্যে আসগর নামে লোকটা লাফিয়ে পড়েছে আমাদের নৌকোয়। অজান্তেই ইষ্টনাম জপতে শুরু করেছি। অদ্ভুত ব্যাপারটা ঘটল সেই সময়। আগন্তুক গণেশ ঢালি বসে ছিল নৌকোর পেছন দিকে। কখন যে সে পায়ে পায়ে আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে খেয়াল করিনি কেউ। মাথার ওপর সেই একই রকম গামছার ঘোমটা। আসগর আর এক পা এগিয়ে আসতেই সে বলল, 'কে রে তোরা?'

'ইয়া আল্লা!' পরিত্রাহি চিৎকারে আসগরই শুধু নয়, ওদের নৌকোর সব কয়টি প্রাণী মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে। প্রবল স্রোতে কে যে কোথায় ছিটকে গেল খোঁজ মিলল না কোনও। শুধু বার দুয়েক 'বাঁচাও—বাঁচাও' আর্ত চিৎকারে বোঝা গেল কুমিরের শিকার হল কেউ। দাঁড়ি-মাঝি বিহীন ডাকাতের নৌকোটা ততক্ষণে স্রোতের টানে ভেসে গেছে অনেক দূরে।

অকস্মাৎ এই ব্যাপারে সবাই যখন প্রায় হতভম্ব, তখন কাঁচুমাচু মুখে ঘাড় ফেরাল গণেশ। লোকটার মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল সে নিজেও বেশ অপ্রস্তুত।

খানিক হাঁ করে তাকিয়ে থেকে জগন্নাথ বলল, 'ব্যাপারটা কী হল বাপু? তুমি মন্তর-তন্তর জানো নাকি?'

একগাল হাসল লোকটা, 'কী যে বলেন মাঝিদা। ব্যাপারটা আমিও তো বুঝলাম না তেমন। তা যাকগে, এ ভালোই হল একরকম। কি বলেন? তা আমি বলি কী এই যখন ব্যাপার, এখানে আর দেরি না করে রওনা হয়ে পড়াই ভালো।'

পরামর্শটা যুক্তিসংগত। জগন্নাথ বলল, 'তা ঠিক। তবে জোয়ার ঠেলে এত রাতে দাঁড় টানা, সে যে বড় শক্ত ব্যাপার বাপু।'

'সে ভাববেন না। আমি যখন আছি চালিয়ে নিতে পারব। এই দাঁড় টানাই তো কাজ ছিল গো আমার।'

দেরি না করে এরপর নৌকো ছেড়ে দেওয়া হল একটু পরেই। প্রবল জোয়ারের টান ভেঙে নৌকো ছুটল আরও দক্ষিণে। রান্নার কাজ মুলতুবি রইল সাময়িক। তিনজনই নৌকো টানার কাজে ব্যস্ত। জগন্নাথ হাল ধরে রয়েছে। এক সময় দুজন ছইয়ের ওপর থেকে নেমে এলাম নীচে। তারপর কখন ঝিমুনি মতো এসে গিয়েছে, ঘুমিয়ে পড়েছি খেয়াল নেই একেবারে।

ঘুম যখন ভাঙল রাত তখন অনেক। জোয়ার শেষ হয়নি। তবু সেই জোয়ার ভেঙে নৌকো ছুটেছে প্রায় তীরবেগে। মামুলি দাঁড়ে-টানা নৌকো জোয়ার ঠেলে এত জোরে ছোটার কথা নয়। তাড়াতাড়ি সামনের দিকে তাকালাম। আগা-নৌকোয় বসে দাঁড় টানছিল নরেন। কেউ নেই সেখানে। তাড়াতাড়ি উল্টো দিকে তাকালাম। পেছন ফিরে দাঁড় টানছে গণেশ। কিন্তু জগন্নাথ কোথায়? দ্রুত চারপাশে চোখ ঘোরালাম একবার। না, দুজনের কেউ নেই কোথাও। শুধু গণেশ ঢালি দাঁড় টেনে চলেছে নিঃশব্দে। মাথার ওপর গামছার সেই ঘোমটাটা তেমনই রয়েছে।

ততক্ষণে রমেনবাবুও উঠে বসেছেন। বললেন, 'জগন্নাথদের দেখছি না যে গণেশ! গেল কোথায় ওরা!'

'কী জানি। কোন চুলোয় গেছে সে দুজন।' দাঁড় টানতে টানতেই বলল গণেশ, 'ভূঁতের চঁর কিঁন্তু আঁমরা এঁসে গেঁছি বাঁবুরা। আঁপনাদের দেঁখার এঁত ইঁচ্ছে! চঁলেন ঘুঁইরে নেঁ আঁসি।' বলতে বলতে হঠাৎ ঘাড় ফেরাল সে। পা থেকে মাথা পর্যন্ত শিউরে উঠল মুহূর্তে। গামছার ঘোমটার ভেতর গণেশের মুখে রক্ত-মাংসের চিহ্নমাত্র নেই কোথাও। ঝকঝকে একরাশ দাঁত বার করা একটা নরকঙ্কাল।

পোঁ—পোঁ করে অদূরে কলকাতা যাওয়ার বাসটা হর্ন দিয়ে উঠল ওই সময়। একেবারে গল্পের ক্লাইম্যাক্সে এসে ছন্দপতন যাকে বলে। ভদ্রলোক বললেন, 'ওই যাঃ! আপনার কলকাতার বাসের ছাড়ার সময় হয়ে গেল দেখছি।'

কলকাতা যাওয়ার শেষ বাস। দেরি করবার উপায় নেই আর। দারুণ গল্পটার শেষটুকু তাই শোনা হল না আর। ছুটলাম বাস ধরতে।

মাস তিনেক পরের কথা। অপিসের কাজে সীতারামপুরে নিতাইবাবুর কাছে গেছি আবার। কথায় কথায় অভয় চক্রবর্তীর কথা তুলতেই ভদ্রলোক চমকে উঠলেন একটু, 'কেন, চেনেন নাকি ওনাকে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। রায়দিঘির ঘাটে পরিচয় হয়েছিল একবার। স্কুল মাস্টার।'

'ওঃ! সে এক ব্যাপার মশাই। বছর দুই আগে আমারই ঠিক করে দেওয়া নৌকো আর মাঝি নিয়ে সুন্দরবনে বেড়াতে গিয়েছিলেন ওঁরা। ঠিক তিন দিনের মাথায় এক সকালে সেই নৌকোর খোঁজ মিলল ওই রায়দিঘির ঘাটে। ভেতরে সমানে বিড়বিড় করছে দুজন। চিনতে পারছেন না কাউকেই। রীতিমতো পাগলামির লক্ষণ। মাঝিরাও নিখোঁজ। সারা রায়দিঘিতে সে এক হুলুস্থূল কাণ্ড! তবে খবর পেয়েছি ইদানিং নাকি কিছু সুস্থ হয়েছেন ওঁরা।'

'আর মাঝি দুজন?' ভেতরের উত্তেজনা দমন করে কোনওমতে বললাম আমি।

'সে তো আরও রহস্যজনক ব্যাপার মশাই! এর দিন কয়েক পরে গ্রামের এক জেলেদের নৌকোয় ফিরে এল দুই মাঝি। জগন্নাথ আর নরেন। ভাটির এক জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। বদ্ধ উন্মাদ।'

আশ্বিন ১৪১২

কালো কুকুর

অশোক সী

ভুজঙ্গবাবু গাড়ির গতিবেগটা বাড়িয়ে দিলেন। স্টিয়ারিংয়ের ওপর হাতের আঙুলগুলো কামড়ে বসল তাঁর। দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁট কামড়ে চোখের দৃষ্টিটা তীক্ষ্ণ করে সামনে চেয়ে রইলেন।

গাড়ির হেডলাইটের আলো, দুটো বাতিস্তম্ভের মতো দু'পাশ থেকে ঠিকরে পড়ে সূচীভেদ্য অন্ধকারের বুক চিরে ছুটে চলেছে। আর বৃষ্টির জলকণাগুলো সে আলোয় চিকচিক করে জ্বলে জ্বলে উঠছে। আকাশে ঘন মেঘের আনাগোনা।

ভুজঙ্গবাবু মনে মনে অস্থির হয়ে উঠলেন। আচ্ছা জ্বালাতন তো! কালো কুকুরটা সমানে ছুটে চলেছে তাঁর গাড়ির আগে আগে। হর্ন বাজিয়েছেন কতবার। কিন্তু তাতে কোনো কাজই হয়নি। কুকুরটা যেন সেই শব্দকে ব্যঙ্গ করেই পাল্লা রেখে সমানে ছুটে চলেছে।

সত্যি খুবই বিরক্তিকর ব্যাপারটা। এ আবার কী? অথচ প্রথমে ঘটনাটা তিনি আমলই দেননি। খুব সহজভাবেই নিয়েছিলেন। যেমন নিয়েছিলেন এই মাছ আনতে যাবার ব্যাপারটা।

দিদির নতুন বিয়ে হয়েছে। জামাইবাবু চাকরি করেন এক নামী কোম্পানিতে। তারই সুবাদে জুটে গিয়েছিল একটি সাজানো-গোছানো ফ্ল্যাট। দিদি-জামাইবাবুর সংসারে আর কেউ থাকেন না। কাজের কোনো লোক রাখা হয়নি এখনও। তাই জামাইবাবুই ভুজঙ্গবাবুকে কোনো একদিন বলেছিলেন, ওহে ভুজঙ্গ, মাঝে মাঝে এসো আমাদের সঙ্গ দিতে, নইলে আমরা একলা থাকতে থাকতে হাঁফিয়ে উঠব।

ভুজঙ্গবাবুরও কোনো আপত্তি ছিল না এতে। তাঁর নিজেরও তেমন কোনো বন্ধুবান্ধব নেই। তাই ব্যবসার নানান কাজের ফাঁকে ছুটি-ছাটার দিনগুলোয় গাড়ি নিয়ে চলে আসেন দিদি-জামাইবাবুর কাছে। গল্প-গুজবে, হাসি-ঠাট্টায় সময় উড়ে যায় একঝলক দমকা হাওয়ার মতো। সারা সপ্তাহের মনের গুমোট কেটে যায় একঝাঁক খুশির বাতাসে। তারপর রাতের খাওয়া-দাওয়ার পাট দিদির কাছে সেরে গভীর রাতে বাড়ি ফেরা—এই-ই ভুজঙ্গবাবুর রুটিনমাফিক কাজ।

আজও এসেছেন দিদি-জামাইবাবুর কাছে। গাড়ি নিয়ে যখন পৌঁছুলেন ওঁদের ফ্ল্যাটবাড়ির সামনে, বর্ষাকাল হলেও আকাশে নেই তখন মেঘের ছিটেফোঁটা। পড়ন্ত রোদের সোনালি আলোয় সারা আকাশ উঠেছে হেসে। সেই হাসির ছোঁয়া লেগেছে ভুজঙ্গবাবুর মনেও।

ভুজঙ্গবাবুকে দেখেই জামাইবাবু হাসতে হাসতে বললেন, আরে এসো এসো, তোমার জন্যেই আমরা অপেক্ষা করছি, চা-টা শুরু করতে পারছি না। আজ এত দেরি কিসের?

ভুজঙ্গবাবু বসতে বসতে বললেন, একটু বাজার ঘুরে এলাম, তাই—

দিদি সকৌতুকে জিগ্যেস করলেন, বাজার গেছলি, কেন রে? তারপর একটু হেসে দুষ্টুমি করে বললেন, কিরে, আমাদের জন্যে ইলিশ মাছ কিনতে গেছলি নাকি?

ইলিশ মাছ! ইস্—ভুজঙ্গবাবু ককিয়ে উঠলেন, বড্ড ভুল করেছি তো! বাজারে ঢুকলাম, এক বাজার ইলিশ নজরে পড়ল অথচ মনেই এল না কিছুটা নিয়ে নিই। দাঁড়াও, আমি এখনি আনছি। ভুজঙ্গবাবু তড়িঘড়ি উঠে পড়েন চেয়ার ছেড়ে।

জামাইবাবু বাধা দিয়ে বলেন, আরে রোসো রোসো। এখনি উঠলে কি? তোমার দিদির ঠাট্টাটা বুঝলে না?

দিদি হাসতে হাসতে বললেন, তোর সবেতেই তাড়া। বোস, চা খেয়ে নে। তোর জন্যে গরম গরম পকৌড়া ভেজে রেখেছি।

ভুজঙ্গবাবু তাড়া দিয়ে বললেন, জলদি চা-টা দাও দিদি। মাছের কথাই যখন উঠল তখন লোকাল বাজার থেকে না এনে ওটা খাস কোলাঘাট থেকে আনা যাক, ভালো হবে।

জামাইবাবু আর দিদি দুজনেই চমকে উঠলেন। দিদি বললেন, সে কি রে, তুই কোলাঘাটে যাবি? সে তো অনেক দূর এখান থেকে!

জামাইবাবু মৃদু বাধা দিলেন, থাক ব্রাদার, আজ আর কষ্ট করে কাজ নেই, বেলা পড়ে আসছে।

ভুজঙ্গবাবু হাসতে হাসতে সহজ কণ্ঠে বললেন, থাকবে কেন? কথা যখন উঠল, তখন নিয়েই আসি। গাড়িতে যাব, আসব—কতক্ষণই বা লাগবে। তাছাড়া এখনো সন্ধ্যা নামেনি, আকাশও ভালো।

জামাইবাবু বললেন, তা বেশ, তাহলে চলো আমিও তোমার সঙ্গে যাই।

ভুজঙ্গবাবু হাঁ হাঁ করে উঠলেন, আরে না না, আপনি আবার কষ্ট করতে যাবেন কেন? বরং দিদির রান্নার ব্যবস্থায় সাহায্য করুন।

জামাইবাবু বললেন, ঠিক আছে! তাই সই, তুমি একাই যাও।

দিদির বাড়িতে চায়ের পাট সেরে ভুজঙ্গবাবু বেরিয়েছিলেন সন্ধ্যার প্রাক মুহূর্তে। হাইওয়ে ধরে সোজা গাড়ি চালিয়ে কোলাঘাটে যখন এসে পৌঁছুলেন তখন সন্ধ্যারাত।

প্রশস্ত রূপনারায়ণের পাড়ে মাছধরা জেলে ডিঙিগুলো এখানে-ওখানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। ক্রেতা আর বিক্রেতাদের শোরগোলে কানপাতা দায়। ভুজঙ্গবাবু গাড়িটাকে কিছুদূরে রেখে এসে সেই ভিড়ে মিশে গেলেন।

বর্ষার খেয়ালি আকাশে কখন যে ঘন মেঘের আনাগোনা শুরু হয়েছে তা তিনি জানতে পারলেন না। দরদাম করে বড় দেখে একটা মাছ কিনে হাতে ঝুলিয়ে খুশি মনে ভুজঙ্গবাবু গাড়িতে যখন উঠতে যাবেন, তখন গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি শুরু হয়েছে। মেঘে ছাওয়া থমথমে আকাশের দিকে তাকিয়ে ভুজঙ্গবাবুর ভ্রূ কুঁচকে উঠল। বুঝলেন ভারী বর্ষণ আসন্ন। দুরন্ত ঝড়ও আসতে পারে। ফিরে যাবার পথ কম নয়। ভুজঙ্গবাবু চিন্তিত হলেন।

একমুহূর্ত, তারপরই সব চিন্তা দূরে ঠেলে ফেলে দরজা খুলে উঠে বসলেন ভুজঙ্গবাবু। পাশের আসনে মাছের থলেটি রেখে গাড়িতে স্টার্ট দিলেন। কিন্তু কই গাড়ি তো স্টার্ট নিচ্ছে না! ভুজঙ্গবাবু বিরক্ত হলেন।

বার দুয়েক চেষ্টা করে তিনি গাড়ি থেকে নামলেন ঝিরঝিরে বৃষ্টি মাথায় নিয়ে। বনেট খুলে সবকিছু যন্ত্রপাতি পরীক্ষা করলেন। আশ্চর্য, ঠিকই তো রয়েছে। হঠাৎই তাঁর দৃষ্টি আটকে গেল গাড়ির বাঁ দিকের দরজার পাশে। অবাক চোখে দেখলেন, কিছুক্ষণ আগে যে আসনে তিনি মাছের থলেটি রেখেছেন, গাড়ির সেই দিকে ডিঙি মেরে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে একটা কালো কুকুর!

মাছের গন্ধেই ওটা এসেছে। একটা রাস্তার কুকুর। কী সাহস ওটার! ভুজঙ্গবাবুর মাথাটা দপদপ করে উঠল রাগে। রাস্তা থেকে একটা ঢিল খুঁজে তুলে নিয়ে সজোরে সেটা কুকুরটার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে চিৎকার করে উঠলেন, যা, পালা, ভাগ!

ঢিলটা গিয়ে লাগল সরাসরি কুকুরটার গায়ে। কুকুরটা একলাফে সরে গিয়ে ভুজঙ্গবাবুর দিকে তাকাল। কী হিংস্র দৃষ্টি সে চোখ দুটোর! ভুজঙ্গবাবু দেখলেন। পাগলা কুকুর নাকি? কুকুরটা কিন্তু আস্তে সরে গিয়ে রাস্তার পাশে অন্ধকারের মাঝে কোথায় যেন চলে গেল।

ভুজঙ্গবাবু হাঁফ ছাড়লেন। হাত দুটো ঘষে নিয়ে ঢিলের নোংরাগুলো ঝেড়ে ফেলে গাড়িতে উঠলেন। পকেট থেকে রুমাল বার করে মাথার জল পুঁছে রিস্টওয়াচ দেখলেন, মাত্র সাড়ে সাতটা বাজে। কিছু নয়, গাড়ি ঠিকঠাক চললে এক ঘণ্টা কি কিছু বেশি সময়ে পৌঁছে যাবেন দিদির বাড়ি। কিন্তু গাড়িটা গোলমাল করছে কেন? এরকম তো হয় না! চিন্তিত ভুজঙ্গবাবু আবার চেষ্টা করলেন গাড়ি চালাতে।

আশ্চর্য! সত্যিই আশ্চর্য, গাড়ির ইঞ্জিনটা গর্জন করে উঠল পলকে। ভুজঙ্গবাবুর থমথমে

মুখটা খুশির হাসিতে ঝিলিক দিয়ে উঠল। নিশ্চিন্ত অনায়াস-ভঙ্গিতে গাড়িটা ছুটিয়ে দিলেন গন্তব্যস্থলের দিকে।

বাঁক ঘুরে হাইওয়েতে গাড়িটা তুলেই তিনি চমকে উঠলেন। আরে! সেই কালো কুকুরটা না? হেডলাইটের আলোয় স্পষ্ট দেখতে পেলেন, গাড়িটার আগে আগে কুকুরটা দৌড়ে চলেছে। যেন গাড়িটাকে রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সে।

ভুজঙ্গবাবু বিরক্তবোধ করলেন। কুকুরটা গাড়ি চাপা পড়বে নাকি? হর্নে আঙুল ছোঁয়ালেন। নিমেষে চারিদিক কাঁপিয়ে বেজে উঠল হর্নের শব্দ। কিন্তু কুকুরটার যেন ভ্রূক্ষেপ নেই তাতে। আবার, আবার বাজালেন হর্ন। বারে বারে বাজালেন তিনি। কিন্তু তাতে কোনো কাজ হল না। যেমন দুলকিচালে ছুটছিল কুকুরটা, তেমনই ছুটতে লাগল গাড়ির আগে আগে।

ভুজঙ্গবাবুর মাথায় খুন চেপে গেল। এ আচ্ছা জ্বালাতন তো! গাড়ির গতিবেগ তিনি বাড়াতে পারছেন না ঐ কুকুরটার জন্যে। দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁট কামড়ে চোখের দৃষ্টিটা তীক্ষ্ণ করে সামনে চেয়ে রইলেন তিনি।

আকাশে তখন বাদলের মেঘ আরও ঘন হয়ে এসেছে। মেঘে মেঘে বিদ্যুতের ঝলক মাঝে মাঝে জেগে উঠছে। সে আলোয় পৃথিবী যেন ভয়ে নীল হয়ে উঠছে। এই দুর্যোগে হাইওয়েতে গাড়ি চলাচলও কমে গিয়েছে।

দূরে কোথায় যেন বাজ পড়ল। সেই কড়-কড়-কড়াৎ শব্দে ভুজঙ্গবাবু সম্বিত ফিরে পেলেন। বিড়বিড় করে উঠলেন, না, আর নয়, আর সহ্য করা যাচ্ছে না! স্টিয়ারিংয়ের ওপর হাতের আঙুলগুলো কামড়ে বসল ভুজঙ্গবাবুর। এক্সিলেটারের ওপর পায়ের চাপ ক্রমেই বেড়ে চলল। বর্ষণসিক্ত পথে গাড়িটা যে পিছলে যেতে পারে, সে চিন্তা মাথায় না রেখে তিনি গাড়ির গতিবেগ বাড়িয়ে দিলেন সহসা চরমে। গাড়িটা একবার থরথর করে কেঁপে উঠে উল্কার বেগে ধাওয়া করল কুকুরটার পিছনে।

ভেবেছিলেন কুকুরটা হয় চাপা পড়বে নয় সরে যাবে গাড়ির রাস্তা থেকে। কিন্তু স্তব্ধ বিস্ময়ে অবাক চোখে দেখলেন, গাড়ির গতিবেগ বাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে কুকুরটাও সেই গতিবেগের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সমান তালে ছুটতে লাগল আগে আগে। পাশেও সরে যাওয়ার চেষ্টা করল না বা পিছনে ফিরেও দেখল না। গাড়িটাকে কিছুমাত্র আমল না দিয়ে, একটা আধুনিক মটরগাড়ির গতিবেগের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অনায়াস ভঙ্গিমায় ছুটে চলল ঐ কালো কুকুরটা।

এই অভাবনীয় ঘটনা চোখে দেখেও বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল ভুজঙ্গবাবুর। বিস্ময়ে তিনি কয়েক সেকেন্ডের জন্যে কুকুরটার ছুটে চলার দিকে তাকিয়ে রইলেন উইন্ড স্ক্রিনের কাচের মধ্যে দিয়ে। বৃষ্টির জল ফোয়ারার মতো ঝরে পড়ছে হেডলাইটের আলোর মাঝে। রাস্তার দু'পাশের বর্ষণসিক্ত গাছপালা অন্ধকারের মাঝ থেকে সহসা আলোর বৃত্তে ফুটে উঠে চকিতে সরে সরে যাচ্ছে দু'পাশ দিয়ে পিছনে। বিদ্যুৎচমকের উজ্জ্বল ক্ষণিক নীলাভ আলোয় পার্থিব যা কিছু তা অপার্থিব হয়ে উঠছে ক্ষণে ক্ষণে! সেই মুহূর্তে ভুজঙ্গবাবু মনস্থির করে ফেললেন—যা হয় হোক, এর শেষ তিনি দেখবেন। ঐ কুকুরটাকে এই অকল্পনীয় দৌড়ে হয় তিনি ধরে ফেলবেন নয় তাঁর কপালে যা আছে তা ঘটুক।

কুকুরটাকে লক্ষ রেখে তার পেছনে ছুটে চলল দুরন্ত গতিতে ভুজঙ্গবাবুর গাড়ি। এই সময়ে চারিদিক কাঁপিয়ে এতক্ষণের অপেক্ষমান ঝড় আছড়ে পড়ল। গাছপালাগুলোকে তার মুঠিতে ধরে টেনে নামিয়ে দিতে চাইল মাটিতে। বাতাস উল্লাসে হাসতে লাগল হা-হা রবে। সেই ঝড়ের ধাক্কায় গাড়িটা ক্ষণিক কেঁপে উঠে তার চলার পথে যেন সামান্য মাত্র বিভ্রান্ত হয়ে উঠল। কিন্তু সুদক্ষ চালকের সতর্কতায় মুহূর্তে গাড়ি তার আপন পথে উড়ে চলল কুকুরটার পেছনে।

ভুজঙ্গবাবু লক্ষ্য স্থির রেখে স্টিয়ারিংয়ের ওপর ঝুঁকে রইলেন। তাঁর কেমন যেন একটা ঘোর এসে গেছে। কেমন যেন একটা নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে আছেন। ঐ কুকুরটার সঙ্গে তাঁর গাড়ির একটা যা হয় কিছু বোঝাপড়া হোক, এই মুহূর্তে তিনি তা কামনা করছেন নিজের সমস্ত সত্তা দিয়ে। কিন্তু

সবিস্ময়ে তিনি লক্ষ করলেন কুকুরটার সঙ্গে তাঁর গাড়ির দূরত্ব কিছুতেই, কোনোভাবেই কমাতে পারছেন না। এ তো সত্যিই অবিশ্বাস্য! নিজের মাথা ঝাঁকুনি দিলেন ভুজঙ্গবাবু। তিনি কি স্বপ্ন দেখছেন?....না তো।

বাইরে প্রাকৃতিক দুর্যোগ। কুকুরটা সেই দুর্যোগকে উপেক্ষা করে ছুটছে তাঁর গাড়ির সামনে। ঐ তো, সেটাকে তিনি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন....চার পায়ের সমান ছন্দে সেটা দৌড়ে চলেছে। একটা জীবন্ত অশুভের মতো! এ তো স্বপ্ন নয়। সত্যি!

মনের এমনি অবস্থায় কুকুরটা হঠাৎই হাইওয়ে ছেড়ে বাঁ দিকে ঘুরে অপেক্ষাকৃত চওড়া একটা কাঁচা রাস্তায় ঢুকে পড়ল। ভুজঙ্গবাবুও গাড়ি নিয়ে সেই রাস্তা ধরলেন কুকুরটাকে অনুসরণ করে।

এবড়ো-খেবড়ো কাঁচা রাস্তা। বৃষ্টির জল জমেছে সেই রাস্তার এখানে-ওখানে। বুনো আগাছা আর নানান গাছের ডালপালা, বাঁশবনের ডগালি—ঝড়ের তাণ্ডবে মেতে উঠে, বৃষ্টিঝরার আকুল ডাকে শিউরে উঠে কেমন এক অস্বাভাবিক শব্দ তুলে তারা মাথা ঝাঁকিয়ে যেন রাস্তাকে ভয় দেখাতে চাইছে।

চরম গতিবেগ নিয়ে কাঁচা রাস্তায় পড়েই ভুজঙ্গবাবুর গাড়ি ঝাঁকুনি দিয়ে ককিয়ে উঠল। চাকার আঘাতে রাস্তার জমে থাকা জল ফোয়ারার মতো দু'পাশে ছিটকোতে লাগল মাঝে মাঝে। সর-র-র শব্দ তুলে কোনো গাছের ডাল কি বাঁশের ডগা পিছলে গেল গাড়ির গায়ে আঘাত তুলে। যেন ওরা বাধা দিয়ে বলছে, ওরে যাসনি....আর যাসনি....আর এগোসনি! ওরে ক্ষ্যাপা....ওরে ক্ষ্যাপা....এবার থাম!

কিন্তু ভুজঙ্গবাবু কোনো কিছুতেই এখন দৃকপাত করছেন না। কোনো ভয়-ভীতি তাঁর মনকে আচ্ছন্ন করে তুলতে পারছে না। তাঁর সকল চিন্তার কেন্দ্রবিন্দুতে এখন ঐ সামনের ছুটে চলা কালো কুকুরটা! মন জুড়ে রয়েছে—শেষ তিনি দেখবেনই!

হঠাৎ তাঁর চোখ আটকে গেল। এই কাঁচা রাস্তাটার বেশ খানিকটা দূরে চলন্ত জমাটবাঁধা অন্ধকারের মতো কি যেন একটা তাঁর গাড়ির দিকেই এগিয়ে আসছে। কী ওটা? তিনি নড়েচড়ে আসনে সোজা হয়ে বসতে না বসতেই হেডলাইটের আলোয় দেখতে পেলেন একটা গরুর গাড়ি এই রাস্তা ধরেই এগিয়ে আসছে। আরও দেখলেন, কুকুরটা ঐ গরুর গাড়িটাকে পাশ কাটিয়ে ওপাশের বর্ষণসিক্ত অন্ধকারের মাঝে দ্রুত কোথায় মিলিয়ে গেল।

তখন আর কোনোদিকে চোখ দেবার ফুরসত নেই ভুজঙ্গবাবুর। গরুর গাড়িটা সোজা তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে। গাড়োয়ান উঠে দাঁড়িয়েছে, ছিপটি তুলে হাত-মুখ নাড়িয়ে কি যেন বলছে চিৎকার করে। হেডলাইটের চড়া আলোয় তার মুখ দেখাচ্ছে মড়ার মুখের মতো ফ্যাকাশে। একটা নিশ্চিত দুর্ঘটনা ঘটতে চলেছে মটরগাড়ির সঙ্গে গরুর গাড়িটার। চোখ-মুখ বুজে প্রাণপণে ব্রেক চাপলেন ভুজঙ্গবাবু। কান-ফাটানো যান্ত্রিক ক্যাঁ-অ্যা-চ শব্দের সঙ্গে সঙ্গে মটরগাড়িটা কাঁচা রাস্তায় থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে কিছুটা ঘষড়ে গিয়ে, গরুর গাড়িটার মাত্র কয়েক হাত দূরে একটা গর্তে মুখ থুবড়ে থেমে রইল।

গাড়ির ইঞ্জিন থামিয়ে দিয়েছেন ভুজঙ্গবাবু। হেডলাইট দুটো জ্বলছে। মুহূর্তে ঝটকা দিয়ে তিনি গাড়ির দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এলেন সেই আলোয়। দেখলেন গাড়োয়ান তার গাড়ি থেকে নেমে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। ভীত-বিস্মিত গাড়োয়ান তাঁকে দেখে জিগ্যেস করল, এই বিষ্টি-বাদলার রেতে অ্যাতো জোরে গাড়ি চাইলে আপনি কোতায় যাচ্চিলেন, বাবু?

গাড়োয়ানের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে ভুজঙ্গবাবু সামনের রাস্তার দিকে অপলকে চেয়ে থেকে প্রশ্ন করলেন, সেই কালো কুকুরটা কোথায়? কোথায় গেল ওটা?

গাড়োয়ান বিস্ময়ে ভুজঙ্গবাবুর দিকে চেয়ে থেকে বলল, কুকুর? সে কি বাবু, কোনো কুকুর তো মোর নজরে আসে নাই!

ভুজঙ্গবাবু বললেন, সে কি! এইমাত্র একটা কালো কুকুর তোমার গাড়ির পাশ দিয়ে ঐ অন্ধকারে কোথায় চলে গেল, তুমি দেখনি?

কথা শুনে গাড়োয়ান কেমন যেন শিউরে উঠল। দু'চোখ বড় বড় করে একদৃষ্টিতে ভুজঙ্গবাবুর মুখের দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। পরে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে থেমে থেমে বলল, বাবু গো, আজ আপনি খুব যা হোক বেঁচে গেচেন! ওটা কুকুর লয়,—মোরা বুলি, শয়তান! ওটাকে এর আগে কেউ কেউ দেকতে পেয়েচে, তার ফল কিন্তুক ভালো হয়নি, বাবু! ঐ শয়তানটা কোতায় থাকে কোতায় যায়, কেউ জানে না। তবে সত্যি সত্যি ওটার পাল্লায় পড়ে কেউ কেউ মারাও গ্যাচে এর আগে!

ভুজঙ্গবাবু চুপচাপ শুনছিলেন গাড়োয়ানের কথা। স্তম্ভিত হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন তিনি। গাড়োয়ান বলতে লাগল, যা হোক বাবু, আজ আপনি কিন্তুক খু-ব বেঁচে গ্যাচেন, যা জোর গাড়ি চাইলেচিলেন! একটু আগেই তো সেই ভাঙা কেঠো পোলটা, আমি তার এপাশ থেকেই আসচি। যদি মোর সঙ্গে দেখা না হোতো....যদি আপনি ঐ রকম জোরে গাড়িটা চাইলে ঐ ভাঙা পোলটায় উঠে পোড়তেন....তাইলে বাবুমশাই গো, আজ এক্কুনি কী যে ঘটতো আপনার ভাগ্যে!

না, আর শুনতে চান না ভুজঙ্গবাবু। হাড়-হিমকরা ভয়ের স্রোত মাথা থেকে পা বেয়ে নামতে থাকে তাঁর। মুখটা শুকিয়ে ওঠে। বুকের মাঝে শব্দ জাগে ধক...ধক...ধক! উফ্! খুব বাঁচা বেঁচেছেন আজ!

গাড়োয়ানের কথা কানে আসে, খুব ফাঁড়া কেটে গ্যাচে আপনার। আর এখেনে থাকবেননি, গাড়ি ঘুইরে নিয়ে বাড়ি যান।

গাড়োয়ানকে ধন্যবাদ জানাতেও ভুলে যান ভুজঙ্গবাবু। অনেক প্রশ্ন জাগে, তাও করেন না—তখন এমনি মনের অবস্থা তাঁর। ভীষণ ভয়ে সর্বশরীর শিউরে উঠছে।

ঝড় তার চিহ্ন রেখে সরে গিয়েছে দূরে। ঝিরঝিরে বৃষ্টিভেজা গাছেরা যেন এই ঘটনার সাক্ষী হয়ে ভয়ে নিথর, নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে দূরে ও কাছে।

ভুজঙ্গবাবু ধীরে ধীরে গাড়িতে উঠে বসে ইঞ্জিন চালু করে গাড়িটা ঘুরিয়ে নিলেন হাইওয়ের দিকে। ঠিক তখনই যেন তাঁর কানে ভেসে এল অনেক দূরে, ঝিরঝিরে বৃষ্টিভেজা চাপ চাপ অন্ধকারের মাঝে একটা কুকুরের অস্পষ্ট হিংস্র ডাকের শব্দ—ঘেউ....ঘেউ....ঘেউ!

শিকার হাত ছেড়ে চলে যাচ্ছে বলেই কি ওটা অমনভাবে ডেকে উঠছে! চলন্ত গাড়িতে বসেই শিউরে উঠলেন ভুজঙ্গবাবু!

রাত হল ফিরতে ভুজঙ্গবাবুর। তাঁর ফেরার দেরি দেখে উৎকণ্ঠায় দিদি ও জামাইবাবু ঘর-বার করছিলেন। বিধ্বস্ত ভুজঙ্গবাবুকে দেখে তাঁরা বিস্ময়ে হতবাক হলেন।

সব ঘটনা ভুজঙ্গবাবুর মুখে শুনে আতঙ্কে শিউরে উঠলেন তাঁরা। দিদি ডুকরে কেঁদে উঠলেন। কাঁদতে কাঁদতে বললেন, তুই কী রে, এমনভাবে বিপদের মুখে যায় কেউ?

ভুজঙ্গবাবু বিড়বিড় করে বললেন, কেমন যেন ঝোঁক এসে গেছল, মাথা কাজ করছিল না, তাই—

সে রাতে দিদি ও জামাইবাবু, ভুজঙ্গবাবুকে বাড়ি ফিরতে দিলেন না।

গোটা ইলিশ মাছটা পড়ে রইল রান্নাঘরের মেঝেয়। ওটা খাওয়ার কারুরই তখন প্রবৃত্তি ছিল না। বেশ অনেক রাতে জামাইবাবু চুপি চুপি গিয়ে সেই মাছটাকে বাড়ির পিছনের বড় নর্দমায় ফেলে দিয়ে এলেন।

———

বৈশাখ ১৪০৩

অসীম সব জানে

ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায়

কালকের কী প্রোগ্রাম? কিছু ঠিক করেছিস?

নারে। ঠিক করে ফ্যাল। আমি আছি।

আজ?

কিচ্ছু না। বিন্দাস রেস্ট। প্রচুর ম্যাগাজিন জমে গেছে। মা অ্যাদ্দিন ছুঁতে দেয়নি। আজ সেগুলো গিলব।

জানিস, আজ রাতে মেগা-চ্যানেলে র‍্যাম্বো দেখাবে।

র‍্যাম্বো? সিলভেস্টার স্ট্যালোন?

ইয়েস। মিস করিস না।

ক্লাস এইটের শেষ পরীক্ষা দিয়ে উড়তে-উড়তে বাড়ি ফিরল রণিত। আঃ! এ বছরের মতো মুক্তি। আর ওই চ্যাপ্টারগুলো পড়তে হবে না। রেজাল্ট বেরোনো পর্যন্ত এনতার ছুটি। মা-বাবার প্যানপ্যানানি নেই। এ ক'দিন শুধু জমিয়ে আড্ডা, বেড়ানো, সিনেমা আর গল্পের বই।

কীভাবে যে রণিত পরীক্ষা দিল এ বছর! পরীক্ষায় আদৌ বসতে পারবে কিনা, সিওর ছিল না। অ্যানুয়ালের মাস দুয়েক আগে আচমকা ঘটে গেল ঘটনাটা। দুঃস্বপ্নেও ভাবেনি। দিন পনেরো বই নিয়ে বসতেই পারেনি। বন্ধুদের মধ্যে ওর অবস্থাই সবচেয়ে খারাপ ছিল। হাত-পা কাঁপত, মাথা ঝিমঝিম করত।

বাবা ওকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেছিলেন। একসপ্তাহ টানা কাউন্সেলিং করতে হয়েছে। শেষ পর্যন্ত অনেক চেষ্টায় মানসিক বিপর্যয় থেকে বেরোতে পেরেছে রণিত। পড়ার চাপ তাতে সাহায্যই করেছে।

কিন্তু এখন গুছিয়ে বসে পত্রিকার পৃষ্ঠা ওলটাতেই সেই ঘটনাটা এসে হাজির হল। গল্পে মন বসাতে খুব চেষ্টা করল রণিত। হল না। বারবার দৃশ্যটা চোখের সামনে ভেসে উঠছে। ছটফট করতে-করতে উঠে পড়ল।

ড্রইংরুমে টিভি চলছে। কী হচ্ছে? মা দেখছে।

সোফায় গিয়ে বসে পড়ল। রিয়্যালিটি গানের শো। সারা ভারত থেকে বাছাই করে নতুন গায়ক-গায়িকা হাজির করানো হয়েছে। তারা পরপর স্টেজে উঠে গান গেয়ে যাচ্ছে। একদিকে বিখ্যাত বিচারকরা কানে হেডফোন লাগিয়ে বসে আছেন। মাথা দোলাচ্ছেন গানের তালে। শেষে প্রচুর হাততালি দর্শকদের। বিচারকরা নাম্বার দিচ্ছেন।

এখন সন্ধে গড়িয়ে গেলেই প্রায় সব চ্যানেলে একরকম শো। গান, নাচ। কোথাও আবার জোক্‌স, অ্যাকটিং। প্রচুর প্রাইজ মানি।

ভারতে যে এত প্রতিভা লুকিয়ে ছিল, জানা যায়নি আগে। এদের মধ্যে কয়েকজন বেশ ভালো গাইছে।

ফোন বেজে উঠল। ও ধরল।

হ্যালো, রণিত? পিনাকী বলছি।

হ্যাঁ, বল।

কাল বারোটায় স্টেশনে মিট করছি। তুই, আমি, শৌভিক আর রূপ। শিয়ালদা থেকে নন্দন।

সিনেমা?

হ্যাঁ। চলো, লেটস গো। বাংলা বই। একদম নাকি অন্যরকম। দিদিরা দেখে এসেছে। বলল।... ঠিক হ্যায়?

ঠিক হ্যায়।

র‍্যাম্বো মনে আছে তো? এগারোটায়।

অবশ্যই। থ্যাঙ্কস।

দশটা বাজে। মা উঠে পড়ল। রান্নাঘরের দিকে এগোল। ফ্রিজ থেকে বের করে খাবার গরম করবে। ভাত বসাবে। বাবা একটু আগে চেম্বার থেকে ফিরেছেন। চান করে সোফায় এলিয়ে খবরের কাগজ পড়ছেন।

বাবা, র‍্যাম্বো দেখেছ?

হ্যাঁ, স্ট্যালোন। অ্যাবসর্বিং মুভি।

আজ মেগা-টিভিতে এগারোটায় দেখাচ্ছে। দেখবে?

নারে! পারব না। কাল ফার্স্ট আওয়ারে হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে ইমপরট্যান্ট মামলা আছে। ন'টায় বেরিয়ে পড়তে হবে। তুই দ্যাখ। এনজয় কর।....

পৌনে এগারোটায় রিয়্যালিটি শো শেষ হয়ে গেল। খাওয়া শেষ। মা থালা তুলে উঠে পড়ল।

রণিত রিমোট নিয়ে সেন্টার টেবিলে পা ছড়িয়ে আয়েশ করে বসল।

প্রায় আরম্ভ থেকেই ঝড়। র‍্যাম্বো—সিলভেস্টার স্ট্যালোন। দেবদূতের মতো নিষ্পাপ, পবিত্র মুখ। শরীর যেন গ্রিক ভাস্কর্য। যখন অ্যাকশনে তখন ক্রোধ কাঠিন্য ফুটে বেরোচ্ছে পেশিতে। অন্যসময় কোমল, মায়াবি।

চ্যানেলে সিনেমা দেখায় একটাই বিরক্তিকর ব্যাপার। পনেরো মিনিট পরপর বিজ্ঞাপনের বিরতি। যখন চরম রুদ্ধশ্বাস মুহূর্ত, কী হয়-কী হয়, ঠিক সেইসময় ইরফান পাঠান বাইক চড়ে হাজির। বাইকের বিজ্ঞাপন। বা শাহরুখ। কিংবা বচ্চন রঙের বিজ্ঞাপনে। মনোসংযোগ পুরো নষ্ট করে দেয়।

কোয়ার্টজ ক্লকে টুংটাং....বারোটা বাজল। চারিদিক নিস্তব্ধ হয়ে এসেছে। মফঃস্বল শহর ঘুমিয়ে পড়েছে। বাবা-মার ঘর অন্ধকার।

আবার বিজ্ঞাপনের বিরতি চলছে। ঘুম-ঘুম পাচ্ছে রণিতের। বেসিনে গিয়ে চোখে-মুখে জল ছিটিয়ে এল। যত রাত হোক, পুরো সিনেমাটা দেখতে হবে। কাল সকালে ওঠার কোনও তাড়া নেই।

টিভি জুড়ে স্ট্যালোনের মুখ। মুখের প্রতিটি পেশিতে ঢেউ খেলছে, তীক্ষ্ণ চোখ সতর্ক দৃষ্টি ফেলছে।

হঠাৎ—হঠাৎ—

রণিত শিউরে উঠল।

এ তো স্ট্যালোন নয়। পরদায় আর স্ট্যালোন নেই। তার বদলে...তার বদলে...

অসীম তাকিয়ে আছে।

অসীম? অসীম আসবে কোত্থেকে? মনের ভুল। হতেই পারে না।

চোখ মুছে তড়াক করে সোজা হয়ে বসল রণিত।

না—হ্যাঁ, এ তো অসীম! অসীমের মুখ।

সেই ফরসা টুলটুলে মুখে পরিচিত হাসি। একদৃষ্টে দেখছে রণিতকে।

কুলকুল করে ঘাম বেরুচ্ছে শরীর দিয়ে। কী দেখছে ও? অসম্ভব, অবিশ্বাস্য।

তাড়াতাড়ি রিমোট নিয়ে চ্যানেল পালটে দিল।

এ কী! এখানেও অসীম!

পাগলের মতো পটপট করে চ্যানেল পালটাচ্ছে রণিত।

সব চ্যানেলের সব প্রোগ্রাম বন্ধ হয়ে গেছে? অসীম! সবখানেই অসীম।

অসীমের ছবি এবার আর স্থির নয়। অসীম হাসছে। হাসির শব্দ শুনতে পাচ্ছে রণিত।

কীরে রণিত, আমায় দেখতে চাইছিস না?

অসীম কথা বলছে? হাত-পা জমে গেছে রণিতের। নড়াচড়ার ক্ষমতা নেই।

আমি না তোর বেস্ট ফ্রেন্ড? সবাই তো সেরকমই জানে। বন্ধুকে দেখে খুশি হচ্ছিস না?

রণিত পাথরের মতো নিথর!

আমার যে তোকে ভীষণ দরকার বন্ধু। পরীক্ষা চলছিল বলে তোকে বলতে আসিনি। এমনিতেই তুই যা ভেঙে পড়েছিলি! সবসময় কাঁদতিস, পড়তে পারতিস না। সবটাই আমার জন্যে। আমি শুধু দেখেছি, কষ্ট পেয়েছিস। কিছু করার ছিল না।

রণিতের দু-চোখ বিস্ফারিত, বাকশক্তিরহিত।

কীরে, কথা বল? অ্যাই রণিত, আমায় ভয় পাচ্ছিস কেন রে? তোর বন্ধুত্বের টানই তো ফিরিয়ে এনেছে আমাকে। যেতে গিয়েও যেতে পারিনি। তুই আমায় একটু হেল্প করবি না, রণিত? একটু হেল্প? কীরে, বল?

আ-আমি...ত্-তোকে...ত্-তুই...

হ্যাঁ, আমি আর বেঁচে নেই রে। আমার কোনও শরীর নেই। সেইজন্যেই আমি কিছু করতে পারছি না। তোকে চাইছি। তুই আমায় ভয় পাচ্ছিস! প্লিজ, রণিত, একটু হেল্প কর।

হ্-হেল্প?

হ্যাঁ, হেল্প। তাহলেই সত্যিটা প্রকাশ পাবে। সেদিন কী ঘটেছিল, কেউ জানে না। সবাই জানে, পুকুরে ডুবে আমি আত্মহত্যা করেছি।

ত্-তুই সুইসাইড করিসনি?

নাঃ! কেন করব? শেষ পর্যন্ত তোর সঙ্গেই তো ছিলাম। মনে নেই? মিশন থেকে বেরিয়ে মিশনপাড়া দিয়ে দুজনে হাঁটছিলাম। গল্প করতে-করতে।

হ্যাঁ...মনে আছে। হঠাৎ আকাশ কালো হয়ে এল। ঝড় উঠল।

ঠিক বলেছিস। কালবৈশাখী। তারপরেই শুরু হল বড়-বড় ফোঁটায় বৃষ্টি। তুই বাঁ-দিকের রাস্তা ধরে ছুট দিলি। ছুটতে-ছুটতে বললি, 'কাল স্কুলে দেখা হবে, টা-টা।' মনে আছে?

হ্যাঁ।

তোর বাড়ি কাছেই। মিশনপাড়ার শেষে। আমার বাড়ি সেই উত্তরপাড়া। অনেকখানি দূর। ভাবলাম, কাছে কাকুর বাড়ি। সেখানে একটু থাকি। বৃষ্টি ধরলে বাড়ি ফিরব। ওখান থেকে বাড়িতে ফোন করে জানিয়ে দেব।

কাকু মানে রামুকাকু?

হ্যাঁ। কাকুর বাড়ি ঢুকতে গিয়ে থমকে গেলাম। বাইরে একটা কালো বড় গাড়ি দাঁড়িয়েছিল। ভিতরে অনেকের কথা শুনতে পাচ্ছিলাম। দরজা বন্ধ। জানলা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখি, বসার ঘরে কয়েকজন ষণ্ডামতন লোক কাকুর সঙ্গে কথা বলছে। টেবিলের ওপর একটা সুটকেসে অনেক-অনেক টাকা ভরতি! কালো, মোটা একজন হঠাৎ কোমর থেকে একটা পিস্তল বের করে বলল, 'তুমি ও নিয়ে ভেবো না, রামুদা। একটু বেচাল করলেই চালিয়ে দেব। খাল্লাস।' পিস্তল দেখে আমি আঁতকে উঠেছি। মুখ দিয়ে আওয়াজ বেরিয়ে গেছে। অমনি—

অমনি?

অমনি ওরা মুখ ফিরিয়ে চেঁচিয়ে উঠেছে, 'কে—কেরে?' আমি কী করব, বুঝতে না পেরে ছুটে পালাতে গেছি। বারান্দাটা জলে ছপছপ করছিল। পিছলে পড়ে গেলাম। ওঠার আগেই ওরা বেরিয়ে এসে আমায় ধরে ফেলল।

তারপর...?

কাকু বারবার কাকুতি-মিনতি করছিল, 'ওকে ছেড়ে দাও। ও কাউকে কিচ্ছু বলবে না। ও আমার

একমাত্র ভাইপো।' ওদের সর্দার মোটাটা উড়িয়ে দিল, 'তোমার মাথা খারাপ হয়েছে রামুদা? সাক্ষীর শেষ রাখতে নেই। তুমি নিজে মরবে, আমাদেরও মারবে!'

তারপর...?

আর শুনে কী করবি, রণিত? তখনও মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছিল। সন্ধে হয়ে গেছিল। রাস্তাঘাটে একটাও লোক ছিল না। চ্যাংদোলা করে ওরা আমায় টানতে-টানতে নিয়ে গেল মিশনের পুকুরে।...উঃ, জলে দম আটকে মরতে কী কষ্ট রে! উঃ, এতটুকু বাতাসের জন্যে খাবি খাচ্ছিলাম...ওরা আমায় জলে ঠেসে ধরছিল...

ত্-তুই থাম! আর শুনতে পারছি না।

এইজন্যেই তো এতদিন আসিনি। তোকে বলিনি। তুই এত ভেঙে পড়েছিলি! আগে জানলে তুই পরীক্ষাই দিতে পারতিস না।

দু-হাতে মুখ ঢেকে ফেলেছে রণিত। কান্নার প্রবল বেগ ঠেলে আসছে বুক থেকে। আবার সেই ছবিটা! অসীমের জলে ডোবা ফুলো-ফুলো নিস্পন্দ শরীর খাটে শোয়ানো। ওর মা আছাড়ি-পিছাড়ি কাঁদছেন।

শোন রণিত, কাঁদিস না রে। কেঁদে কী লাভ? আমি তো আর ফিরে আসতে পারব না। শুধু একটা কাজ কর ভাই। ওদের মুখোশ খুলে দে। সত্যিটা সবাই জানুক।

কী করতে হবে?

কাল সকালেই তুই মেসোমশাইকে নিয়ে থানায় গিয়ে এই ঘটনাটা বল। কাকুকে পুলিশ কড়া করে জেরা করলেই সব বলে ফেলবে। আমি সিওর, কাকু কোনও খারাপ দলের সঙ্গে যুক্ত। অত টাকা...পিস্তল...অতগুলো খুনি, গুন্ডা...আমি চাই সবক'টা ধরা পড়ুক। তবেই আমার শান্তি হবে।

যাব, নিশ্চয়ই যাব। কিন্তু পুলিশ কি আমার কথা বিশ্বাস করবে?

করবে। বলবি, যদি মিথ্যে হয়, তুই দায়ী থাকবি। আমি মারা যাওয়ার পরে তোকে তো অনেকবার থানায় ডেকেছিল। ডাকেনি?

হ্যাঁ।

তাহলে? সবাই জানে, তুই আমার বেস্ট ফ্রেন্ড। প্রাণের বন্ধু। তুই আমার সব জানিস।

যন্ত্রের মতো ঘাড় নাড়ল রণিত।

চলি রে। আর বোধহয় দেখা হবে না। এই কথাগুলো বলার জন্যেই আমায় আটকে থাকতে হয়েছিল।...

বাবিন, ন'টা বাজে। আমি বেরোচ্ছি। উঠবি না?

রণিত ধড়মড় করে উঠে বসল। ফ্যালফ্যাল করে তাকাচ্ছে। সামনে বাবা। হাসছেন।

বাব্বা! রাম্বো দেখতে-দেখতেই ঘুমিয়ে পড়েছিলি! টিভিটাও বন্ধ করতে পারিসনি। মা সকালে সুইচ অফ করেছে। তোকে নিয়ে আর পারা গেল না।

বাবা! বাবা! তোমায় এখনি আমার সঙ্গে যেতে হবে।

যেতে হবে? কোথায়?

থানায়।

থানায়? কী বলছিস পাগলের মতো? আমি এখনই কোর্টে বেরোচ্ছি।

না, বাবা। তোমায় যেতেই হবে। আমি একা গেলে কেউ বিশ্বাস করবে না। তুমি, প্লিজ, জানিয়ে দাও, কোর্টে যেতে তোমার দেরি হবে। প্লিজ বাবা!

আরে! কী হয়েছে, বলবি তো?

বলব, সব বলব। তোমায় বিশ্বাস করতেই হবে। অসীম সুইসাইড করেনি। ওকে খুন করা হয়েছে। থানায় গিয়ে এটা আমায় বলতেই হবে।

কার্ত্তিক ১৪১৫

প্রেতাত্মা

জাহান আরা সিদ্দিকী

খাতুর্মে প্লেনটা অবতরণের উদ্যোগ নিতেই বেশ কিছু যাত্রী হঠাৎ বিড়বিড় করে কী সব বলতে আরম্ভ করল। আর প্লেনটা মাটি স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে করতালির শব্দে মুখরিত হয়ে উঠল চারিদিক। আরিফ বুঝল প্লেনটা যাতে নিরাপদে অবতরণ করতে পারে সে জন্য প্রার্থনা হচ্ছিল এতক্ষণ। প্লেনের যাত্রীদের প্রায় সবাই কালো, অর্থাৎ কালোদের দেশে সে এসে পড়েছে। একটা লোক মাটিতে নেমেই মাটি স্পর্শ করে চুমু খেল। বহুদিন পর দেশে ফিরেছে। এদের দেশপ্রেম দেখে মুগ্ধ হল সে। এয়ারপোর্টে তাকে রিসিভ করার জন্য স্থানীয় এক ব্যবসায়ী বন্ধু অপেক্ষা করছিল। লোকটা বেশ ধনী ও শিক্ষিত। কিন্তু পরনে স্রেফ সাদাসিধে আলখেল্লা আর টুপি।

এয়ারপোর্ট ছাড়িয়ে গাড়ি যতই শহরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে লাগল, ততই স্থানীয় লোকজনদের দেখতে পাওয়া গেল। অধিকাংশই লম্বা, কালো। সবাই সাদা রঙের আলখেল্লা আর মাথায় টুপি পরে আছে। মেয়েদের মাথায় কাপড় দেওয়া। অধিকাংশ মেয়ে অদ্ভুত ঢঙে মাথা ঢেকে শাড়ির মতো পোশাক পরে আছে।

যে স্থানীয় ব্যবসায়ীটি আরিফকে এয়ারপোর্ট থেকে আনছিল, তার সঙ্গে সহজেই তার আলাপ জমে উঠল। কথায় কথায় তাকে সে জিগ্যেস করল, এখানে দেখার কী আছে? সে একটু অবাক হল, এ ধরনের প্রশ্ন সম্ভবত সে আগে কখনও শোনেনি। অনেক ভেবেচিন্তে বলল, নীল নদ।

ব্যস, এই!

আসার পথেই আরিফ বুঝেছিল দর্শনীয় কিছু থাকার কথা নয়। চারিদিকে ধু ধু মরুভূমি। শুধু নীল নদের দু-পাশ ঘিরে গড়ে উঠেছে জনপদ। বিশাল শহর, কিন্তু গাছপালা একেবারে কম থাকায় শুধু কংক্রিটের বাড়িগুলোই প্রকট হয়ে চোখে পড়ছে।

আরিফের বন্ধুটি তাকে শহরের শেষ প্রান্তে তার বাগানবাড়িতে নিয়ে গেল। বাংলোটা নীল নদের বাঁধের কাছে নির্জন জায়গায়। নদীটা এখানে বাঁধ দেবার ফলে বেশ বিস্তৃত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। পাশে ছোট টিলা। আশ্চর্যজনকভাবে তীরে তেমন গাছপালা নেই। শুধু কিছু কাঁটাওয়ালা গাছ আর ঝোপ-ঝাড়। বেশ কিছু পাখি নদীর জলে ভেসে বেড়াচ্ছে। বেশ কিছু লোক ছিপ ফেলে নদীতে মাছ ধরছে। আরিফ জিগ্যেস করল, এই নির্জন জায়গায় তুমি বাড়ি বানালে কেন?

কী করব বল, শহরে জমির দাম প্রচণ্ড। অথচ আমার পশু-পাখি পোষবার খুব শখ।

আরিফ বলল, তুমি এখানে প্রায়ই আসো?

সে বলল, হ্যাঁ, খুব ভালো লাগে। যাক গে এই খামারবাড়িতে তুমি থাকবে। চারজন ভৃত্য আছে এখানে, ওরাই তোমার দেখাশোনা করবে।

সন্ধ্যার দিকে আরিফ ঘর থেকে বের হয়ে খামার ঘুরে ফিরে দেখতে লাগল। দুটো ঘোড়া, দুটো উটপাখি, কয়েকটা টার্কি আর ময়ূর আছে এখানে। লোকজন যারা কাজকর্ম করছিল তাদের মধ্যে থেকে একজন এগিয়ে এসে একগাল হেসে বলল, স্যার, আপনি রাতে কী খাবেন?

আরবিটা আরিফের জানা থাকায় এদের সঙ্গে কথা বলতে অসুবিধা হচ্ছিল না। বলল, কী খাও তোমরা?

আমরা তো ডাল আর রুটি খাই, আপনি কি ওসব খেতে পারবেন?

তুমি যা রাঁধতে পারবে তাই দিও।

রাতে খাবার টেবিলে ফিশ ফ্রাই, রাজমার চাইতেও বড় এক ধরনের রান্না-ডাল আর ডিমের কাটলেট বাবুর্চি আরিফের সামনে হাজির করল। খেতে কোনোটাই মন্দ না। খেয়ে-দেয়ে আরিফ টিভি দেখতে বসল। তন্ময় হয়ে সে টিভি দেখছে, এমন সময় লম্বা কালো একজন ভৃত্যের মুখ উঁকি দিল। লোকটার মুখের হাসি বেশ বন্ধুসুলভ। ইশারায় আরিফ তাকে কাছে ডেকে জিগ্যেস করল, এ বাড়িটা কি এরকম খালিই থাকে, না কেউ বাস করে?

প্রশ্নটা শুনেই ভৃত্যটার চোখে ক্ষণিকের জন্য একটা ভয়ার্ত ভাব দেখা দিল। প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে সে কী যেন চিন্তা করতে থাকল। ওর আচরণে বিস্মিত হয়ে আরিফ আবার জিগ্যেস করল, কেউ থাকত বুঝি?

কী করে বুঝলেন?

একজন লোকের ব্যবহারের সব জিনিসই যে সাজানো রয়েছে দেখছি।

মাথা হেলিয়ে সে উত্তর দিল, হ্যাঁ।

কী করত সে?

সাহেবের ম্যানেজার ছিলেন।

আমি এসে তার বাড়িটা যে দখল করে নিলাম, সে কোথায় থাকবে?

তিনি আর নেই।

মারা গেছে বুঝি?

সে উত্তর দিল, হ্যাঁ।

ওর ভাবসাব দেখে আরিফের মনে হল মৃত্যুটা বোধহয় স্বাভাবিক নয়। সে জিগ্যেস করল, কীভাবে সে মারা গেছে?

আপনি যেভাবে বসে টেলিভিশন দেখছেন, ঠিক ওভাবে ঐখানে বসে প্রতিদিনের মতো টেলিভিশন দেখছিলেন তিনি। শেষ রাতের দিকে ঘরে আলো জ্বলতে দেখে আমরা কৌতূহলী হয়ে ঘরে ধাক্কা দিলাম, কোনো সাড়া নেই। শেষ পর্যন্ত আমি জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখি উনি বসে টিভির দিকে তাকিয়ে আছেন। তাঁর ভাবভঙ্গি দেখে আমাদের সন্দেহ হল। সবাই মিলে দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকলাম, ততক্ষণে তিনি মারা গেছেন।

হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল বুঝি?

ঠিক ধরেছেন।

কবে মারা গেছে?

এক সপ্তাহও হয়নি।

বল কী!

রাতে বহুক্ষণ তার চোখে ঘুম এল না। কেবলই মনে হতে লাগল এই বিছানায় যে মানুষটি শুয়েছিল সে এখন মাটির নীচে। তার দেহটা এখন কী অবস্থায় আছে কে জানে। কথাটা মনে হতেই তার বুকের ভেতরটা কেমন যেন করতে থাকল।

এপাশ-ওপাশ করতে করতে কখন যে সে গভীর ঘুমে তলিয়ে গিয়েছিল নিজেই জানে না। ঘুম ভাঙল দরজায় করাঘাতের শব্দে। প্রথমে আরিফ ঠিক বুঝে উঠতে পারল না কীসের শব্দ। একটু পরই আবার শব্দটা ভেসে এল। তার ঘরে টোকা দিচ্ছে কেউ একজন। এত রাতে কে দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে? আর কেনই বা দিচ্ছে? তবে কি কারো কোনো বিপদ হয়েছে?

ধড়মড় করে বিছানা ছেড়ে নামছে, ঠিক তক্ষুনি আবার টোকাটা পড়ল, খুব অস্থির হাতের টোকা। দরজা খোলার জন্য ছিটকিনিতে হাত দিয়েই আরিফের মনে হল বাতিটা জ্বালানো প্রয়োজন। এই বিদেশ-বিভুঁয়ে অন্ধকারের মধ্যে দরজা খোলাটা ঠিক হবে না।

বাতিটা জ্বালাল সে, উজ্জ্বল আলোয় ঘর ভরে উঠল। এগিয়ে গিয়ে দরজাটা খুলল। কী আশ্চর্য,

কেউ নেই! আরিফ অবাক। তবে কি সে ভুল শুনল? অসম্ভব। একবার নয়, তিন তিনবার কী করে সে ভুল শুনবে?

সে রাতে ভালো ঘুম হল না তার, তবে ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়ল। পরদিন ভৃত্যদের ডেকে জিগ্যেস করতে তারা অবাক হয়ে গেল। তাদের কেউই তার ঘরের ধারে-কাছে আসেনি। দিব্যি সারারাত ঘুমিয়েছিল তারা। মনের ভেতরটা খচখচ করতে থাকলেও আরিফ নিজেকে বোঝাতে থাকল, রাতে ঘুমের আগে মৃত মানুষটার কথা মনে করেছিল বলেই হয়তো অবচেতন মনে তার প্রভাব পড়েছিল।

তারপরও খানিকটা কৌতূহলী হয়েই ভৃত্যকে সে জিগ্যেস করল, তোমাদের ম্যানেজারকে কোথায় কবর দিয়েছ?

এইতো পাশেই। হাত উঁচিয়ে সামনের দিকে ইঙ্গিত করল সে। কবরটা বাড়ি সংলগ্ন। আরিফের মনের মধ্যে অস্বস্তি ভাবটা আবার ফিরে এল। কিন্তু সেটা খুবই ক্ষণস্থায়ী। সারাদিন অফিসের কাজকর্মে সে এতই ব্যস্ত রইল যে রাতের তুচ্ছ ঘটনাটা ভুলে গেল। বরং রাতে ঘুমোতে যাবার আগে কথাটা স্মরণ হতে খানিকটা লজ্জাও পেল।

কিন্তু মাঝরাতে আবার আরিফের ঘুমটা ভেঙে গেল। বিছানায় উঠে বসল সে। না, দরজায় কোনো টোকার শব্দ নেই, চারিদিক নিস্তব্ধ। কিন্তু কোথাও যেন কিছু একটা ঘটছে। তার অনুভূতি দিয়ে সে সেটা বুঝতে পারছে। অথচ দেখতে পাচ্ছে না। মনের চিন্তাধারাকে জোর করে সরিয়ে দিয়ে সবে মাত্র সে চোখ বন্ধ করেছে, রাতের নীরবতা ভঙ্গ করে অস্ফুট গোঙানির আওয়াজ ভেসে এল। কীসের আওয়াজ সেটা সে বুঝতে পারল না। কী করণীয় তাও বুঝে উঠতে পারল না। মিনিট পাঁচেক ধরে এরকম চলল, তারপর সবকিছু আগের মতোই চুপচাপ।

খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে আরিফ ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙল লোকজনের উত্তেজিত কথাবার্তা শুনে। আরিফকে দেখে একজন ভৃত্য এগিয়ে এসে বলল, দেখুন কী কাণ্ড! উটপাখিটা মরে গেছে, স্যারের খুব প্রিয় পাখি।

সে কী! অসুখ-বিসুখ হয়েছিল নাকি?

গতরাতেও দিব্যি সুস্থ ছিল, সকালে দেখছি মরে পড়ে আছে।

আর একটি ভৃত্য ভয়ার্ত মুখে বলল, আপনি কি একবার পাখিটাকে দেখতে যাবেন?

কেন?

মনে হচ্ছে পাখিটাকে কেউ মেরে ফেলেছে।

আরিফ ওদের সঙ্গে পাখিটার কাছে গেল। গতকাল বিকেলে যে পাখিটা দিব্যি বিচরণ করছিল, আজ সেটা নিথর হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আছে। ভৃত্যটা বলল, গলার দিকটা দেখেছেন?

সেদিকে তাকিয়ে আরিফ চমকে উঠল। পাখিটার গলা মুচড়ে দিয়েছে কেউ। সে বলল, একাজ করল কে? তোমরা কেউ—

আমরা কেন করতে যাব বলুন, আমরা তো ওর দেখাশোনা করি, ওর উপর কত মায়া পড়ে গেছে।

বাড়ির মালিক খবর পেয়ে ছুটে এলেন। তাঁর মনটা বিষণ্ণ। এত সাধের দামি পাখি, কিন্তু তিনি ভৃত্যদের কাউকে দোষ দিতে চাইলেন না। বললেন, ওরা দীর্ঘদিন ধরে আমার সঙ্গে কাজ করছে, কখনও খারাপ কিছু করতে দেখিনি, তাছাড়া ওরা কেনই বা একাজ করতে যাবে?

পরদিন শহরের অফিস সেরে বিকেলে ফার্ম হাউসে ফিরে এল আরিফ। ভৃত্যরা ফুলগাছগুলোতে জল দিচ্ছিল, তাকে দেখে এগিয়ে এসে বলল, স্যার, আপনার সঙ্গে কথা ছিল।

কী কথা?

ম্যানেজার সাহেবকে যেখানে কবর দেওয়া হয়েছিল, সেখানে......এটুকু বলেই সে থেমে গেল।

আরিফ জিগ্যেস করল, কী হয়েছে সেখানে?

সে-প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে সে বলল, আপনি কি একবার সেখানে যাবেন?

আরিফ তার প্রস্তাবে আশ্চর্য হয়ে গেল। হঠাৎ সে তাকে ঐ কবরের কাছে নিয়ে যেতে চাইছে কেন বুঝতে পারল না। জিগ্যেস করল, কেন?

আপনি একবার গিয়ে নিজের চোখে দেখুন।

কিছুটা কৌতূহলী হয়েই ভৃত্যের সঙ্গে রওনা দিল আরিফ। ফার্ম হাউস পেরিয়ে সামান্য একটু যেতেই কবরটা তার চোখে পড়ল। কিন্তু এটা দেখানোর জন্য ভৃত্যটা তাকে টেনে এনেছে কেন, সে প্রশ্নের উত্তর সে পেল না। জিগ্যেস করার জন্য মুখ খোলার আগেই ভৃত্যটি ঝুঁকে পড়ে তাকে কবরের একটা অংশের দিকে আঙুল দিয়ে দেখাল। সে কাছে গিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সেদিকটায় তাকাল, আশ্চর্য, কবরের একটা অংশে বড়সড় ফুটো। যে-কেউ সে ফুটো দিয়ে সোজা ভেতরে যেতে বা বাইরে বেরুতে পারবে। কে অমনভাবে কবরটা ফুটো করল? সম্ভবত কোনো জীবজন্তু বালিমাটি সরিয়ে কবরের ভেতরে আশ্রয় নিয়েছে বা লাশটা খেয়েছে। কিন্তু এর মধ্যে দেখার কী আছে যে সে তাকে এভাবে ধরে এনেছে! বিরক্তি প্রকাশ না করে সে সংক্ষেপে বলল, জায়গাটা বালি দিয়ে ঢেকে দাও।

রাতে খেয়ে-দেয়ে ভৃত্যদের সঙ্গে খানিক গল্পগুজব করে আরিফ ঘুমোতে গেল। কিন্তু ঘুম এল না। কবরের বিশাল ফুটোটা তার চোখের সামনে ভাসতে থাকল। যদিও সে সাহসী, কুসংস্কার-টার মানে না, তবু উটপাখির মুচড়ে যাওয়া গলার ব্যাপারটা আর কবরের ওই ফুটোটা তার স্বাভাবিক বলে মনে হল না। কিন্তু ভেবে-চিন্তে এ রহস্যের কিনারাও সে করতে পারল না।

এপাশ-ওপাশ করতে করতে কখন যে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল নিজেও জানে না। হঠাৎ তার ঘুম ভেঙে গেল। নিস্তব্ধ অন্ধকার চিরে ঘোড়ার ডাক শোনা যাচ্ছে। তারপর আরও কোনো প্রাণীর ভয়ার্ত ডাক। আরিফের বুকের ভেতরটা ধক করে উঠল। বিছানা ছেড়ে উঠে সে জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। অন্ধকারে কিছুই চোখে পড়ল না। হঠাৎ একটা পায়ের আওয়াজ তার ঘরের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। শব্দটা থামল বন্ধ দরজার অপর প্রান্তে। খানিকক্ষণ সব চুপচাপ। দূরে কোথাও একটা জন্তু বিকট স্বরে ডেকে উঠল। তারপর দরজায় টোকা পড়ল। খুব মৃদু ভাবে। ভয়ে আরিফের বুকটা শুকিয়ে গেল। পরক্ষণেই সে ভাবল ভৃত্যদের কেউ হবে-টবে। যদিও ওদের থাকার জায়গাটা বেশ দূরে তবু পশুদের চেঁচামেচি শুনে এগিয়ে এসেছে। বুকে সাহস সঞ্চয় করে সে জানতে চাইল, কে?

উত্তর নেই, তবে দরজায় আবার টোকা পড়ল, এবার আর একটু জোরে।

নিশ্চিত না হয়ে দরজাটা খোলা ঠিক হবে না ভেবে সে গলা চড়িয়ে আবার বলল, কে? উত্তর দাও।

উত্তর এল না। আবার দরজায় টোকা পড়ল। এবার তার বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল। চেঁচিয়ে বলল, সাহস থাকে তো উত্তর দাও, কে তুমি?

দরজার অপর প্রান্ত থেকে হিস হিস শব্দে উত্তর এল, আমার ঘরটা দখল করেছ কেন?

কাঁপা কাঁপা গলায় আরিফ বলল, তুমি কি তবে..............

তার কথা শেষ হবার আগেই দরজার অপর প্রান্ত থেকে কথা ভেসে এল, আমি কবরের মাটিতে শুয়ে থাকব আর তুমি আমার বিছানায় আরাম করে—

কথাগুলো শেষ হবার আগেই আরিফ দৌড়ে গিয়ে ঘরের সব আলো জ্বালিয়ে দিল। তারপর টর্চটা জ্বেলে জানালার বাইরে আলো ফেলল। কাউকে দেখতে পেল না।

সে আর বিছানায় শুতে যেতে পারল না। সারারাত আলো জ্বালিয়ে বসে রইল। একবার মনে হল সবই কি কল্পনা, সে কি হ্যালুসিনেশনে ভুগছে? কিন্তু ঐ উটপাখির গলাটা, সেটা তো তার কল্পনা নয়।

সকালে দরজা খুলতেই ভৃত্যরা পাংশু মুখে এগিয়ে এল, স্যার এসব কী ঘটছে কিছুই যে বুঝতে পারছি না।

কী হয়েছে?

একটা ময়ূর মরে পড়ে আছে।

ওটার গলা কি কেউ মটকে দিয়েছে?

ঠিক ধরেছেন।

আরিফ চিন্তায় পড়ে গেল। মালিক নেই যে তাকে সব কথা জানাবে। তাছাড়া তার মনে ভয় ঢুকে গেছে। আরও একটা রাত এই বাংলোয় কাটাতে হবে ভাবতেই তার গা শিউরে উঠছে। ভৃত্যরা এতদূরে থাকে যে বিপদ হলে তার চিৎকার তারা শুনতে পাবে না। শহরে গিয়ে কোনো হোটেলে উঠবে কিনা তাও বুঝতে পারছে না। দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মাঝে দুলতে দুলতে দিনের কাজের শেষে সন্ধ্যার পর ভয়কে সে আর উপেক্ষা করতে পারল না। লাজ-লজ্জা বিসর্জন দিয়ে একজন ভৃত্যকে ডেকে সে বলল, তুমি কি আজ আমার রুমের সামনে বারান্দায় ঘুমোবে?

আমিও তাই ভাবছিলাম, রাতে কী হচ্ছে, কে এভাবে পাখিগুলোকে মেরে ফেলছে দেখা দরকার।

তোমার ভয় লাগলে আমার ঘরের মধ্যেই থাকতে পার, ওরা চেঁচামেচি করতে শুরু করলে দুজনে একসঙ্গে বের হব।

ভৃত্য একটু সঙ্কোচ বোধ করল। ইতস্তত করে বলল, আমার ভয় করছে না, আমি অন্ধকার বারান্দায় বসে যা দেখছি সেটা তো আর কেউ জানছে না।

বাইরে একজন জেগে পাহারা দিচ্ছে কথাটা ভাবতেই আরিফের মনে সাহস ফিরে এল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমে ঢলে পড়ল সে।

ঘুম ভাঙল কারো আর্ত চিৎকারে। ভালোমতো কান খাড়া করতেই আবার যে চিৎকারটা ভেসে এল সে তীক্ষ্ণ চিৎকারে আরিফের বুকের রক্ত যেন জমে গেল। মনে হল ভৃত্যটার গলা। বেশি কিছু ভাবার আগেই ধস্তাধস্তির শব্দ শুনতে পেল সে। সেই সঙ্গে গোঙানির আওয়াজ।

ভয়ের স্রোত আরিফের শরীরে প্রবাহিত হল। বুকের ভেতরটাতে এত জোরে শব্দ হচ্ছে যে মনে হচ্ছে হৃদপিণ্ডটা বুঝি ফেটে যাবে। সে ভৃত্যটাকে সাহায্য করার জন্য দরজা খুলে এগুতে চাইছে অথচ পা দুটো পাথরের মতো জমে গেছে। সমস্ত শরীর ভারী হয়ে উঠেছে। মাথাটা এমনভাবে ঘুরছে যে মনে হচ্ছে সে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলবে।

ঠিক সে সময়েই গোঙানির শব্দটা হঠাৎ থেমে গেল। নৈঃশব্দ্য গ্রাস করল চারিদিক। তার মনে হল কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। আর তা ঘটতে দেরি হল না। দরজায় করাঘাত, কেউ একজন অস্থির হাতে দরজা ধাক্কাচ্ছে, আজকে আর টোকা নয়, প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা।

দরজার পাল্লাটাও কেঁপে উঠল। আরিফ থরথর করে কাঁপতে থাকল। উঠে আলো জ্বালানোর ক্ষমতা সে হারিয়ে ফেলেছে। তারপরও এক অদৃশ্য শক্তির টানে দরজার দিক থেকে সে চোখ ফেরাতে পারল না, দরজায় আবারও এত জোরে ধাক্কা পড়ল, যে মড়মড় করে দরজাটা ভেঙে পড়ল।

আবছা অন্ধকারে দরজার সামনে একটা ছায়ামূর্তি আরিফের চোখে পড়ল। মূর্তিটা তার বিছানার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। বাথরুম থেকে ক্ষীণ আলোর রশ্মি মূর্তিটার উপর পড়তেই আরিফ শিউরে উঠল। কফিনে পচে থাকা একটা দেহ। শুধু মুখটা দেখা যাচ্ছে। সে মুখেও খানিকটা পচন ধরেছে, বীভৎস সে চেহারা। চোখ দুটো গলিত, খুলে খুলে এসেছে। ভয়ে আরিফ বিকট স্বরে চেঁচিয়ে উঠল। মূর্তিটা দু-হাত বাড়িয়ে তার দিকে এগিয়ে আসছে। আতঙ্কে চিৎকার করে চোখ বন্ধ করতে যাচ্ছে, ঠিক সেই সময় দরজার কাছ থেকে কে যেন চিৎকার করে বলল, খবরদার—

মূর্তিটা সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়াল। পরমুহূর্তে একটা বড়সড় পাথর এসে পড়ল মূর্তিটার গায়ে। বিকট চিৎকার করে মূর্তিটা বসে পড়ল। দরজার কাছ থেকে যে লোকটি চিৎকার করে উঠেছিল সে এসে ঘরে প্রবেশ করল। মূর্তিটা চকিতে লাফ দিয়ে উঠে খোঁড়াতে খোঁড়াতে দৌড়াতে শুরু

করল। যে লোকটি ঘরে ঢুকেছিল সে লাইটটা জ্বালাল। আরিফের সর্বাঙ্গ তখনও থরথর করে কাঁপছিল, কাঁপাকাঁপা গলায় শুধু বলল, জল।

ভৃত্যটা আরিফকে জল খাওয়াতে খাওয়াতে নিজে থেকেই বলল, শয়তানটা আমার সঙ্গে ধস্তাধস্তি করার সময় আমি ইচ্ছে করে মরার ভান করে শুয়ে পড়লাম। ভাবলাম, দেখি ও কী করে। আমাকে মৃত ভেবে আপনার ঘরে ঢুকতেই পেছন থেকে—

এতক্ষণে কথা ফুটল আরিফের মুখে, তোমার ভয় করেনি?

গর্বের সঙ্গে ভৃত্যটা উত্তর দিল, আমার সঙ্গে শক্তিতে এ এলাকার কেউ কুলিয়ে উঠতে পারবে না।

কিন্তু ও তো মানুষ নয়, প্রেতাত্মা।

হ্যাঁ, কবর থেকে উঠে এসে হামলা চালাচ্ছে, চলুন তো ওর কবরের কাছে।

আমার সাহস নেই।

ঠিক আছে এখন না, ফর্সা হোক।

সকালের আলো ফুটে উঠতে ওরা দুজনে মিলে ওর কবরের কাছে গেল। ভৃত্যটা বলল, গতকাল তো কবরটা ঢেকে দিয়েছিলাম, এখন দেখছি আবার বিশাল গর্ত। আরিফের চোখে পড়ল সদ্য বালিমাটির উপরে পায়ের ছাপ—কেমন যেন টানা টানা, স্পষ্ট বোঝা যায় খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে কেউ ওর উপর দিয়ে হেঁটে গেছে।

বেলা হলে বাকি ভৃত্যের দল, আশপাশের লোকজন সবাই কবরের পাশে জড় হল। দেহটাকে নিয়ে কী করা যাবে, ধর্মীয় মতে কী ব্যবস্থা নিলে মৃতদেহটা উপরে উঠে আর উপদ্রব করবে না সে সব নিয়ে তারা আলোচনা করছিল। আরিফ অপেক্ষা না করে সোজা গিয়ে একটা বড়সড় হোটেলে উঠল। সে রাতের ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার পর সে আর এই বাংলো বাড়িতে এতটুকু সময় কাটাতেও রাজি নয়।

——

আশ্বিন ১৪১৩

গুপ্তবাড়ির গুপ্তরহস্য

রূপক চট্টরাজ

গুপ্তবাবুর বাড়ির একতলাটা অনেকদিন খালি পড়ে ছিল। কোনও ভাড়াটে এলে কয়েকদিনের মধ্যেই জমার টাকা ফেরত নিয়ে অন্য বাড়িতে উঠে যেত। ঘনঘন ভাড়াটে বদল হলে পাড়ায় এমনিতেই বাড়ির মালিকের বদনাম হয়। তখন কানাঘুষোয় সবাই বলতে থাকে এ বাড়িতে নিশ্চয় কোনও গণ্ডগোল আছে। হয় এ বাড়িতে ভূতের উপদ্রব আছে, তা না হলে গুপ্তবাবুর স্ত্রী ভাড়াটেদের পিছনে লাগেন।

গুপ্তবাবুর স্ত্রী অবশ্য বলতেন, 'ভূত-টুত কিচ্ছু নয়। আসলে যারা এ বাড়িতে ভাড়াটে হয়ে এসে কিছুদিন বসবাস করে, তাদের কপালে ঠিক একটা নিজস্ব ফ্ল্যাট বা বাড়ি জুটে যায়।' তাই তো সব ভাড়াটেকে তিনি প্রথম দিনেই বড় মুখ করে বলে দিতেন, 'এ বাড়িতে ভাড়া এসেছ, দেখবে তোমার নিজস্ব বাড়ি-জমি হবে। এ বাড়িতে আগে যারা ভাড়াটে হয়ে এসেছে তাদের প্রত্যেকেরই এখন নিজের নিজের বাড়ি বা ফ্ল্যাট হয়েছে। এ বাড়ি বড় পয়মন্ত বাবা। যে ক'দিন এখানে থাকবে একটু ভালোভাবে থেকো। বাড়িটাকে একটু যত্ন কোরো। আমার স্বামী খুব কষ্ট করে এ বাড়ি তৈরি করিয়েছিলেন। উনি গত হওয়ার পর আমার সংসার চালাতে বড্ড কষ্ট হয়। সামান্য কটা পেনশেনের টাকা, তাতে কী আর সংসার চলে বাবা। তাছাড়া একতলাটা বড্ড ফাঁকা লাগে। তাই তো ওই তলাটা ভাড়া দিই। নইলে এ বাড়ি ভাড়া দিতে আমার এতটুকু ইচ্ছে ছিল না।'

অনেক খোঁজাখুঁজির পর মামলুদা যখন এ বাড়িতে ভাড়া এলেন তখনও মাসিমা মানে গুপ্তবাবুর স্ত্রী এ কথাগুলো বলেছিলেন। শুনে মামলুদা একটু অবাক হয়েছিলেন। পরে দু'এক দিন মাসিমার সঙ্গে মেলামেশায় সবকিছু জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল।

এ বাড়িটা দোতলা। একতলায় বড় বড় তিনটে ঘর। খাবার জায়গা বলতে ছিল এক ফালি লম্বা ঘেরা বারান্দা। রান্নাঘরটা বারান্দার ওপাশে। সবই ঘেরা এক ছাদের নীচে। ঠিক যেন একেবারে আধুনিক ফ্ল্যাটবাড়ি। আর ছিল মস্ত একটা উঠোন। উঠোনে ছিল একটা বিশাল গন্ধরাজ ফুলের গাছ আর কুয়োতলা। ঘরগুলোয় মস্ত মস্ত জানলা ছিল। জানলাগুলো দক্ষিণমুখো। সেজন্য কখনও আলো-বাতাসের ঘাটতি হত না।

মামলুদার ছিল লেখালিখির শখ। সারাদিন অফিসে হাড়ভাঙা খাটুনির পর বাড়ি ফিরে রাতে বসে যা একটু-আধটু সাহিত্যচর্চা।

নতুন ভাড়া বাড়িতে হপ্তাখানেক কাটার পর একটু গুছিয়ে নিয়ে একদিন লেখার টেবিলে বসলেন। রাত তখন সাড়ে এগারোটা হবে। একে একে আশপাশের বাড়ির সব আলো নিভে গেল। মামলুদা টেবিল-লাইট জ্বেলে আপনমনে লিখেই চলেছেন। বাড়ির সকলে শুয়ে পড়েছে। রাত যত বাড়ছে জানলার বাইরে অন্ধকার ততই ঘুরঘুট্টি হচ্ছে। বাইরে কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে কৃষ্ণপক্ষ। বাড়ির দক্ষিণদিকে সরকারবাবুর বাগান। বাগানে গাছপালা অল্প থাকলেও বাগানটা বেশ বড়। বাগানটা পেরোলেই হাইওয়ে। যত রাত বাড়ে ততই হাইওয়েতে যানবাহন দ্রুত চলাচল করে। বিশেষ করে মালপত্তর বোঝাই করা লরিগুলো হেডলাইট জ্বেলে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে ছুটে যায় ওসময়।

মামলুদা তখনও বেশ মন দিয়েই লিখছিলেন। এমন সময় সদর দরজায় খট করে একটা আওয়াজ হল। আওয়াজটা উঠল অবশ্য ঘরের ভেতর দিক থেকেই। মামলুদা ঠিক বুঝে উঠতে পারলেন না হঠাৎ দরজায় এমন আওয়াজ কেন? কিছুক্ষণ লেখাটা বন্ধ রাখলেন। ভাবলেন, মনের ভুল নয়

তো! এ বাড়িতে তো কয়েকদিন কেটে গেল কিন্তু এমন আওয়াজ তো কখনও কানে আসেনি। তাছাড়া মাসিমা অত কথার মাঝে তো এসব কিছু বলেননি।

চিন্তাটা ফিকে হয়ে এলে মামলুদা আবার আস্তে আস্তে লেখার মধ্যে ডুবে গেলেন। আধঘণ্টা কেটে যাওয়ার পর মামলুদা ফের শুনতে পেলেন দরজায় ওই আওয়াজটা। এবার সত্যি-সত্যিই মামলুদা ধন্ধে পড়ে গেলেন। নানা রকম এলোমেলো উদ্ভট চিন্তা মাথায় এসে ভিড় করল। বাধ্য হয়েই সে-রাতের মতো লেখালেখি বন্ধ করে শুতে গেলেন মামলুদা। কিন্তু শুতে যাওয়ার আগে ভালো করে ঘাড়ে-হাতে-মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে নিলেন। তারপর আলো নিভিয়ে শুতে যাবেন, এমন সময় হঠাৎ একটা আলোর ঝলকানি দেওয়ালে পড়তে দেখে চমকে উঠলেন। মামলুদা বুঝে উঠতে পারলেন না হঠাৎ আলোটা এল কোত্থেকে! চারদিক তো ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। বাইরে থেকে টর্চের ফোকাস বলেও তো মনে হল না। নিছক একটা আলো হঠাৎ এসে দেওয়ালে পড়ে আবার সঙ্গে সঙ্গেই সরে গেল।

মামলুদার কাছে ঘটনাটা কেমন যেন রহস্য মনে হল। সে রাতে তারপর কিন্তু এরকম ঘটনা আর ঘটেনি। মামলুদা বিছানায় শুয়ে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছেন তা নিজে টেরও পাননি।

পরদিন সাতসকালে ডোরবেলের আওয়াজে মামলুদার ঘুম ভেঙে গেল। বিছানা থেকে উঠে সদর দরজা খুলেই দেখলেন একজন সাইকেল নিয়ে দাঁড়িয়ে। বয়েস বড়জোর বছর পঁচিশ হবে। যুবকটি বলল, 'গুপ্তবাবুকে একবার ডেকে দেবেন?'

মামলুদা বললেন, 'গুপ্তবাবু তো বেশ কয়েকদিন হল মারা গেছেন। ওনার স্ত্রী আছেন, আমি ডেকে দিচ্ছি। একটু দাঁড়ান।'

'না, না, ওনাকে আর ডাকতে হবে না। আমার গুপ্তবাবুর সঙ্গেই দরকার ছিল। আপনি বুঝি এ বাড়ির ভাড়াটে? তা, কবে এসেছেন?'

'খুব বেশিদিন নয়, হপ্তাখানেক হল এসেছি।'

'ও তাই বুঝি?'

মামলুদা জিগ্যেস করেন, 'আপনাকে ঠিক চিনতে পারলাম না তো! কোথায় থাকেন?'

যুবকটি উত্তর দেয়, 'আপনি আর আমাকে চিনবেন কি করে! আমি এখন এ তল্লাটেই থাকি না। আগে এ বাড়িতে অনেকদিন ভাড়া ছিলাম। অবশ্য একখানা ঘর নিয়ে। এই বাইরের ঘরটা। আর গুপ্তবাবুরাও নীচেই থাকতেন পাশাপাশি দুটো ঘরে। তখন তো দোতলা হয়নি। গুপ্তবাবু খুব ভালো লোক ছিলেন। কিন্তু ভীষণ ভীতু।'

মামলুদা বলেন, 'আমি তো গুপ্তবাবুকে চোখেই দেখিনি। যেটুকু জেনেছি মাসিমার মুখে শুনে।'

যুবকটি বলে, 'তবে, একটা কথা, আপনি ভাড়াটে বলেই বলছি। যেন সাতকান করবেন না।'

'আরে না, না, বলুন!'

'ওই যে বাড়ির বাইরে যাওয়ার দরজাটা, দেখবেন রাতবিরেতে খট-খট আওয়াজ করবে। আর সারা বাড়ি রাতে অন্ধকার হলেই একটা আবছা আলোর ঝলক মাঝে মাঝে দেওয়ালে খেলে বেড়াবে। ভয় পাবেন না যেন।'

অবাক হয়ে মামলুদা বলেন, 'আরে! গত রাতেই তো এসব ঘটেছে। আসুন না বাড়ির ভিতর। ঘরে বসেই বলবেন। আর একসঙ্গে একটু চাও খাওয়া যাবে। আমারও তো এখনও চা খাওয়া হয়নি।'

আপত্তি তোলে যুবকটি, 'না, না, আজকে নয়। অন্য একদিন খেয়ে যাব। আজ একটু তাড়া আছে।'

'আরে মশাই, আলাপ যখন হল তখন আর আপত্তি কিসের! কতক্ষণ-ই বা লাগবে!'

'তারচেয়ে বরং আপনি আমাকে এক গ্লাস জল খাওয়ান,' বলল যুবকটি, 'যা গরম পড়েছে। যান, আমি দাঁড়িয়ে আছি।'

মামলুদা ভেতরে গিয়ে যুবকটির জন্য এক গ্লাস জল এনে দেখেন বাইরে কেউ নেই। হন্তদন্ত

হয়ে জলের গ্লাস হাতে নিয়ে উঁকিঝুঁকি মারলেন। কিন্তু কোথাও কাউকে দেখতে পেলেন না। সদর দরজা বন্ধ করে ভেতরে এলেন। ততক্ষণে বৌদির ঘুম ভেঙে গেছে। মামলুদাকে এক গ্লাস জল হাতে নিয়ে ঢুকতে দেখে একটু অবাক হয়ে জিগ্যেস করলেন, 'কী হল, সাতসকালে এক গ্লাস জল হাতে নিয়ে কোথায় গিয়েছিলে?'

'কোথায় আবার যাব। একজন জল চাইল তাই দিতে গিয়েছিলাম। কিন্তু দিতে গিয়ে দেখি বাইরে কেউ নেই। চলে গেছে।'

'ওসব তোমার মনের ভুল। সব সময় নিজের লেখার মধ্যে ডুবে থাক তো তাই উটকো চিন্তা মাথায় এসে ভিড় করে। কোথাও কিছু নেই সাতসকালে কে তোমার কাছে এসে জল চাইবে? কারো আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই। তাছাড়া এমন কিছু গরমও পড়েনি।'

'বারে, আমি মিথ্যে বলছি নাকি? ডোরবেলের আওয়াজ শুনেই তো গিয়ে দরজা খুললাম। দেখলাম একজন চব্বিশ-পঁচিশ বছরের যুবক সাইকেল নিয়ে দাঁড়িয়ে। আমার সঙ্গে ওর কথা হল। গুপ্তবাবুর কথা বলল। এ বাড়িতে ভাড়া ছিল আরও অনেক কথা বলল। যেমন রাতবিরেতে সদর দরজাটায় খট-খট করে আওয়াজ হবে, অন্ধকার ঘরে রাতে দেওয়াল জুড়ে আবছা আলোর ঝলক খেলে বেড়াবে ইত্যাদি।'

'রাতে মাঝে মাঝে এরকম আলোর ঝলকানি আমিও দেখেছি। দরজাতে খট-খট আওয়াজ সে তো হামেশাই হয়। কে অত কান খাড়া করে বসে থাকবে বলো। আর তুমি বলছ গুপ্তবাবুর কথা। তা গুপ্তবাবুর মৃত্যুর পরই তো মাসিমা এ বাড়ি ভাড়া দিয়েছেন। উনিই বা গুপ্তবাবুকে দেখবেন কী করে?'

'তাই তো! তবে কি আমি ভুল দেখলাম! এতসব কথা, সব মিথ্যে! কিন্তু যুবকটি যা যা বলল সবই তো গত রাতে আমি দেখেছি।'

'আমার মনে হয় কী জানো, এটা একটা ভূতুড়ে বাড়ি। তাই খালি পড়ে ছিল।'

'বেশ তো, ওপরের মাসিমাকে একবার জিগ্যেস করে দেখ না, উনি কি বলেন।'

'উনি আবার কি বলবেন! কেউ কি বলে নিজের বাড়িতে ভূত আছে! তুমি যাই বলো, এ বাড়িতে থাকা সম্ভব নয়।'

'কী আর বলব! একে বাড়ি ভাড়া পাচ্ছিলাম না। যাও বা একটা পেলাম তাও তুমি এসব বলছ।'

'বাড়ি পাচ্ছিলাম না বলে একটা ভূতুড়ে বাড়িতে থাকব নাকি?'

ভূতুড়ে বাড়ি তোমায় কে বলল?

'ভূতুড়ে বাড়ি না তো কি? এত ঘটনা শোনার পর তুমি বলছ ভূত-টুত নেই এ বাড়িতে। তুমি এ বাড়িতে থাকবে তো থাক, আমি আর একরাত্তিরও থাকব না এখানে।'

'ওসব বাজে কথা ছাড়। চলো মাসিমার কাছে গিয়ে ঘটনাটা বলি।'

মাসিমা একটা গণ্ডগোলের আভাস পেয়ে ওপর থেকে নেমে এলেন। মামলুদা পুরো ঘটনাটা মাসিমাকে বললেন। শুনে মাসিমা একটু অবাক হয়ে জিগ্যেস করলেন, 'তোমরা ভয় পেয়েছ নাকি? এ ঘটনাটা অনেকদিনের পুরোনো। তখন তোমাদের মেসোমশাই বেঁচে ছিলেন। আমরা যখন এ জমিটা কিনে একটা ঘর তুলে বসবাস করছি, তখন সমাজবিরোধীদের দৌরাত্ম্যে এ তল্লাটে টেঁকা যেত না। একবার রাত দুটো নাগাদ পুলিশের তাড়া খেয়ে একজন সমাজবিরোধী যুবক এসে আমাদের দরজায় টোকা মারে। বেশ কয়েকবার টোকা মারা সত্ত্বেও আমরা ভয়ে দরজা খুলিনি। পরদিন সকালে হাইওয়ের ধারে একটা অল্পবয়েসি ছেলের লাশ পড়ে থাকতে দেখে পাড়ার লোকেরা ভিড় করেছিল। সকলের সঙ্গে তোমাদের মেসোমশাইও ওই লাশ দেখে এসে ভীষণ মনমরা হয়ে পড়েছিলেন। আমাকে বারবার বলতেন, দরজায় টোকা দেওয়ার শব্দ শুনে তখন দরজাটা খুলে দিলে হয়তো ওই ছেলেটি মারা যেত না। তবে একটা কথা, ছেলেটি কিন্তু পুলিশের হাতে মারা যায়নি। ও মারা গিয়েছিল

পথদুর্ঘটনায়। পুলিশের তাড়া খেয়ে ও ছুটে পালাচ্ছিল। হাইওয়ের সামনে এসে দ্যাখে হেডলাইট জ্বেলে একটা লরি গাঁক গাঁক করে ধেয়ে আসছে। ও ভেবেছিল হয়তো রাস্তা পেরিয়ে পালিয়ে যেতে পারবে। কিন্তু একদমই অনুমান করতে পারেনি মালবোঝাই লরিটা কত দ্রুত আসছে।

ছেলেটি তো মারা গেল, কিন্তু তোমাদের মেসোমশাই-এর ঘাড় থেকে নামল না। প্রায়ই এসে এসে সদর দরজার সামনে দাঁড়াত ওনাকে দেখলে। অবশ্য উনি মারা যাওয়ার পর আর কারও কাছে শুনিনি যে ছেলেটি এসেছে। তবে আগের ভাড়াটেদের বলতে শুনেছি যে আঁধার রাতে একটা আলোর ঝলকানি ঘরের দেওয়ালে পড়েই সরে যায়। আমি তখন খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। সকলে বলছে একই কথা। ভাবলাম এ বাড়িতে আবার ভূতের উপদ্রব শুরু হল নাকি! কিন্তু ওসব কিচ্ছু না। তোমাদের আগের ভাড়াটে ছিলেন পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক। ওনার বিষয় ছিল আলো। তিনি এই আলোর রহস্যটা উদ্‌ঘাটন করলেন। দেখালেন সকলেই মিছিমিছি ভয় পেয়েছে। ব্যাপারটা হচ্ছে, হাইওয়েতে হেডলাইট জ্বেলে দ্রুত ছুটে আসা লরিগুলো চকিতে বাঁক নিলেই ওই আলোর তীক্ষ্ণ রশ্মি সরাসরি জানলা দিয়ে ঘরে ঢুকে এক সেকেন্ডের ভগ্নাংশে সরে যায়। আসলে বেশি রাতেই এটা দেখা যায়। তোমরা যেন এতে ভয় পেও না বাপু। যাই, অনেক দেরি হয়ে গেল। গিয়ে জলখাবারের ব্যবস্থা করি গে।'

মাসিমার কথাগুলো চুপচাপ শুনলেন মামলুদা। কিন্তু সকালে যে যুবকটিকে দেখেছিলেন তার ছবি মন থেকে মুছে ফেলতে পারলেন না। যতদিন ওই বাড়িতে ভাড়া ছিলেন ততদিন দরজার খট-খট আওয়াজ আর আঁধার রাতের আলোর ঝলকানি মামলুদার পিছু ছাড়েনি।

অগ্রহায়ণ ১৪০৮

বন-কলমীর বিলে

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুন্সী

বন-কলমীর বিল। জল টলমলে, ঝলমলে। শুধু ধূ-ধূ করে জল আর জল! অনেক দূরে দেখা যায় ধূসর রেখার মতো তীর। দূরে দূরে গাঁ, আর গাছ আর অন্য কিছু। তীরে কাছ ঘেঁষে কোথাও বা কিছু নেই, কোথাও বা কলমীশাকের বন হয়ে রয়েছে। হেঁটে গেলেও যাওয়া যায় বোধকরি, এত ঘন হয়ে থাকে কলমীর বন।

সবচেয়ে ভালো লাগে বন-কলমীর বিল জ্যোৎস্নারাতে। চাঁদের আলোয় যখন আকাশ ধুয়ে রুপোর ধারা নামে পৃথিবীর উপর তখন বন-কলমীর বিলকে মনে হয় স্বপ্নলোক বুঝি! ছোট ছোট ঢেউয়ের নীচে বেড়ায় যেন হাজার হাজার পরীর দল, তাদের নূপুরের শব্দও শোনা যায় খুব ভালো করে কান পেতে শুনলে।

যখনই দিদির বাড়ি গিয়েছি, বন-কলমীর বিলের ধারে বসে থেকেছি ঘণ্টার পর ঘণ্টা। কী ভালো যে লাগত, বলে বোঝাতে পারব না। কিন্তু আর কখনও বিলের বুকের উপর বেড়াইনি। জামাইবাবু, জামাইবাবুর ভাই বহুবার বলেছেন, 'চলো বেড়িয়ে আসি নৌকো নিয়ে, চমৎকার লাগবে!'

প্রতিবারই প্রত্যাখ্যান করেছি। কারণ জিগ্যেস করায় বলেছি, 'ভালো লাগে না', বা 'শরীরটা ভালো নয়' বা অন্যকিছু। কিন্তু ঠিক কি তাই? তা নয়। এর পিছনে আছে একটা কারণ যা আমি আজ পর্যন্ত কারু কাছে প্রকাশ করিনি, প্রকাশ করতে পারিনি।

কিন্তু আজ তা প্রকাশ করব। আজ আমার সে কথা বলতে ভালো লাগছে। এই তো ফিরলাম বন-কলমীর বিলের পার হতে। চাঁদ উঠেছিল আজ, বহুক্ষণ বসেছিলাম, বিলের ধারে। কিন্তু যে জন্যে গিয়েছিলাম, যা দেখতে গিয়েছিলাম, তা দেখতে পাইনি। সেই একটি দিনের পর আজ পর্যন্ত বহুবার গিয়েছি বন-কলমীর বিলে কিন্তু তাকে আর কোনোদিন দেখতে পাইনি। প্রতিবারই নিরাশ হয়েছি।

দিদির বিয়ে হয় যখন তখন আমার বয়স কতই বা, চোদ্দ কি পনেরো! স্কুলে পড়ি। শ্বশুরবাড়ি যাবার সময় দিদি বললে, 'সামনের পুজোর ছুটিতে বেড়াতে যাস ভাই আমার ওখানে।'

বললাম, 'সে বিষয়ে তুই নিশ্চিন্ত থাক ফুলদি। কিন্তু খ্যাঁটের বহরটা যেন বেশ জোরালো হয়, নইলে—'

ফুলদি কপট ক্রোধান্বিত স্বরে বললে, 'এখনো তুই আমাকে তুই-তোকারি করবি?'

বললাম, 'কেন, হঠাৎ কি এমন ল্যাজ গজাল যে 'তুমি' 'আপনি' বলতে হবে?'

ফুলদি গম্ভীর স্বরে বললে, 'জানিস, আমি এখন মিসেস রায়!'

বললাম, 'যা যা, অমন অনেক মিসেস রায় দেখেছি। আচ্ছা বেশ, সবার সামনে 'তুমি' বলব কিন্তু আড়ালে কিছুতেই 'তুই' ছাড়া বলব না, কেমন?'

ফুলদি আর আমি দু'বছরের ছোট-বড়।

পুজোর ছুটিতে গেলাম ফুলদির শ্বশুরবাড়ি। আর তখনি দেখলাম বন-কলমীর বিল। আমার চোদ্দ-পনেরো বছরের কবি-মনকে মুগ্ধ করে দিলে বন-কলমীর বিলের অপরূপ সৌন্দর্য!

রোজই যেতাম বিলের ধারে। চুপ করে বসে দেখতাম বন-কলমীর বিলে পানকৌড়ির খেলা। সাদা ডানা মেলে আসত বকের দল, রাঙা ডানা ঝিলমিলিয়ে আসত মাছরাঙারা, আর আসত বালি-

হাঁস। চুপ করে বসে থাকতাম। ধীরে ধীরে সূর্য মিলিয়ে যেত পশ্চিমের ওই দূরের গাঁয়ের গাছপালার আড়ালে। ধীরে ধীরে নেমে আসত বিলের বুকে সন্ধ্যা। তখন উঠতাম।

সেদিন বোধহয় পূর্ণিমা। ডান দিকে পশ্চিম আকাশে সোনার থালার মতো সূর্য ডুবে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই বাঁ-দিকে রুপোর থালার মতো চাঁদ উঠল হাসতে হাসতে। মুগ্ধের মতো চেয়ে রইলাম বিলের বুকে, রুপো ছড়িয়ে পড়ছে যেন জলের উপর রাশি রাশি!

কতক্ষণ বসে ছিলাম জানি না। চাঁদ আরো উজ্জ্বল হয়েছে, আরো উপরে উঠেছে। হঠাৎ দেখি নির্জন বিলের বুক বেয়ে তরতর করে বেয়ে আসছে একটা ছোট ডিঙি নৌকো। নৌকোর ধাক্কা লেগে জলে জেগে উঠছে আর ভেঙে যাচ্ছে ছোট ছোট ঢেউ, আর সেই ভাঙা ঢেউয়ে চাঁদের আলো পড়ে জ্বলে উঠছে হীরে-মানিক।

আরে, ডিঙিটা আসছে যে আমার দিকেই! আর কি আশ্চর্য, ডিঙিটা চালাচ্ছে আমারই বয়সের ছোট একটা মেয়ে!

আমার অবাক দৃষ্টির উপর দিয়েই নৌকোটা একেবারে আমার সামনে এসে থামল। সেই ছোট মেয়েটা চেঁচিয়ে জিগ্যেস করলে, 'কে বসে ওখানে?'

এরকম হঠাৎ প্রশ্নে আমি একটু থতমত খেয়ে গেলাম। একবার ভাবলাম উত্তর দেব না—শেষে সাত-পাঁচ ভেবে বললাম, 'আমি—অরু।'

মেয়েটি বইঠা তুলে কয়েক সেকেন্ড কি ভাবলে, তারপর বললে, 'অরু! না, চিনি না। নতুন মানুষ নিশ্চয়ই, কোথায় এসেছ? কাদের বাড়ি?'

বললাম।

শুয়ে মেয়েটি বললে, 'ও শৈলেশ কাকার বাড়িতে এসেছ? তা হলে তো চেনা হয়ে গেল! বেড়াতে যাবে?'

বললাম, 'কোথায়?'

মেয়েটি বললে, 'তুমি তো বড্ড বোকা। নৌকোয় বসে বললুম, বেড়াতে যাবে, তাতে বলো, কোথায়? নৌকো কি ডাঙায় চলে না আকাশে ওড়ে? বিলে—মশায় বিলে, যাবে বেড়াতে?'

ও বাবা! মেয়েটি যে পয়লা নম্বরের কথার জাহাজ, আর ডানপিটেও বটে, নইলে একা একা নৌকো নিয়ে রাত্রে বিলে ঘুরে বেড়ায়? কী মেয়েরে বাবা!

ফোঁস করে মেয়েটি বললে, 'কই উত্তর নেই যে? ভয় হচ্ছে বুঝি? যাবে তো চলে এসো। নইলে চলি, আমার দাঁড়াবার সময় নেই, সাধবারও দরকার নেই।'

বলে ফেললাম, 'দাঁড়াও, যাব।'

কাদা ভেঙে ডিঙিতে উঠলাম গিয়ে। মেয়েটি বইঠা বাইতে শুরু করলে। বললে, 'চুপ করে বসো। বেশি ঝুঁকো-টুকো না জলের দিকে, নৌকো টলবে।'

বললাম, 'আমাকে দাও না, আমি বাই।'

ফোঁস করে মেয়েটি বললে, 'থাক থাক, ঢের হয়েছে। শেষকালে ডিঙি উলটে দাও আর কি! তোমাকে দেখেই বুঝিচি ও তোমার কম্ম নয়।'

বলে আমার দিকে একবার অবহেলার দৃষ্টিতে চেয়ে নৌকো বেয়ে চলল।

এতক্ষণে মেয়েটিকে ভালো করে দেখলাম। চাঁদের আলো ওর মুখে, ওর সারা দেহে ছড়িয়ে পড়েছে। কী সুন্দর দেখতে ওকে! ঠিক যেন মা দুগ্‌গার পাশে যে লক্ষ্মী প্রতিমা থাকে, তার মতো। যেমন মুখ, তেমনি চোখ আর তেমনি টকটকে রঙ আর মেঘের মতো কালো চুল। পরেছে একটা নীল রঙের শাড়ি, শাড়ির আঁচলটা কোমরে ঘুরিয়ে গাছকোমর করে বাঁধা। কী ভালো যে লাগল মেয়েটিকে দেখে, কি বলব! ঠিক যেন দিদিমার কাছে শোনা সেই রূপকথার রাজকন্যা মধুমালা। তার দিকে অবাক হয়ে হাঁ করে চেয়ে আছি।

সে বলে উঠল, 'কি দেখছ অমন হাঁ করে?'

বলে ফেললাম, 'তোমায় কি সুন্দর দেখতে!'

বোধহয় সে লজ্জা পেল, বললে, 'যাঃ, আমায় নাকি আবার সুন্দর দেখতে! মা-বাবা সক্কলেই তো আমাকে গাল দেয়, বকে; বলে, দস্যি মেয়ে, হাড়-জ্বালানি মেয়ে, আরো কত কি বলে!'

বললাম, 'পাগল নাকি! কক্খোনো তা বলতে পারে না।'

মেয়েটি বইঠা তুলে হাঁ করে বলে, 'আরে এ ছেলেটা পাগল না মাথা খারাপ! আমি বলছি বলে, তবু বিশ্বাস করে না? আমায় মিথ্যেবাদী বলতে চাও? দোব বোঠের বাড়ি এক ঘা, তখন বিশ্বাস করবে।'

তাড়াতাড়ি বললাম, 'থাক, বিশ্বাস করেচি। এর পরেও বিশ্বাস না করে পারি যে তুমি দস্যি মেয়ে? কিন্তু দস্যি বলুক, হাড়-জ্বালানি বলুক, পেঁচার মতো দেখতে তো আর বলে না।'

হেসে ফেললে মেয়েটি, বললে, 'তুমি বড় ফাজিল।'

বলে ফেললাম, 'তুমি কম কিসে?'

'আবার আমার নিন্দে! তা করো, সকলেই নিন্দে করে, তুমিই বা ছাড়বে কেন?'

বললাম, 'না না, সত্যি আমি তোমার নিন্দে করতে চাই না।'

বিলের বুকের উপর দিয়ে ভেসে ভেসে যাচ্ছে আমাদের ডিঙি। ভীষণ ভালো লাগছে। হঠাৎ মেয়েটি বললে, 'তুমি আমায় নাম জিগ্যেস করলে না?'

বললাম, 'তুমিই বলবে বলে অপেক্ষা করছিলুম।'

মেয়েটি হেসে বললে, 'ও বাবা, তুমি যে একটি মাস্টারমশাই, বেশ গুছিয়ে কথা বলো তো!'

প্রতিবাদ করে বললাম, 'দ্যাখো, আর যাই বলো, মাস্টারমশাই বলো না। মাস্টারমশাইদের আমি মোটেই ভালোবাসি না।'

মেয়েটি হেসে ফেললে, বললে, 'ঠিক বলেছ তো। আমিও মাস্টারমশাইদের একদম ভালোবাসি না। তোমার সঙ্গে আমার বেশ মিল আছে তো! তবে শোন, আমার নাম কমলা, ঠাকুর্দা ডাকে কমলমণি, মা-বাবা-দাদারা ডাকে কম্‌লি বলে, আর পণ্ডিতমশাই ডাকে 'মা কমলা' বলে। আর জানো মজা, নানকু আমার ছোট ভাই, এই এট্টুখানি, এখনো ভালো কথা বলতে পারে না, ডাকে তমল্‌দি আর তম্‌লি, এত হাসি পায়!'

বলেই কমলা হেসে ফেললে। কি সুন্দর হাসে মেয়েটি! ঠিক মুক্তোর মতো দাঁত চাঁদের আলোয় ঝিকমিক করে ওঠে।

বললাম, 'আচ্ছা তোমার ভয় করে না?'

অবাক হয়ে সে বললে, 'ভয়? কিসের ভয়?'

'এই একা একা নৌকো বেয়ে যেতে?'

খিলখিল করে হেসে উঠল কমলা। যেন একটা ভয়ানক মজার কথা বলেছি! বললে, 'ভয়? তুমি হাসালে দেখছি! নৌকো বাইতে ভয়? সে তোমরা করোগে। কমলা কখনো নৌকো বাইতে ভয় করে না, বুঝলে বোক্‌চন্দর! বন-কমলীর বিলের ধারে বাড়ি আর গোবিন্দ জেলের কাছে শিখেচি ডিঙি বাইতে,—আমি করব ভয়? আর একা একা নৌকো বাইতেই মজা, তার উপর এমন চাঁদের রাতে তো কথাই নেই!'

হঠাৎ কথা থামিয়ে কমলা আবার বললে, 'তুমি রাগ করলে না তো?'

বললাম, 'কেন?'

'তোমায় বোক্‌চন্দর বললুম বলে!'

রাগ সত্যিই একটু হয়েছিল। এরকম হেসে উড়িয়ে দিয়ে বোক্‌চন্দর বললে কার না রাগ হয়? কিন্তু ওর কথায় সব রাগ মুছে গেল মন থেকে। সত্যিই এ মেয়েটার উপর রাগ করা যায় না কোনোমতেই। বললাম, 'না না, রাগ করব কেন?'

কিছুক্ষণ চুপচাপ। শুধু বইঠার শব্দ জলের উপর, ছপাৎ ছপাৎ। বন-কলমীর বিলের জলে হাজারখানা হয়ে চাঁদ নেচে বেড়াচ্ছে।

কমলা মুখ খুললে—জানি ও মেয়ে কতক্ষণ আর মুখ বুজে বসে থাকবে! বললে, 'জানো, আমি জল ভীষণ ভালোবাসি। আর ভীষণ ভালোবাসি নৌকো বাইতে, এইরকম নৌকো বেয়ে ভেসে যেতে। প্রায় সারাদিনই—যখনই সুবিধে পাই আমার এই ডিঙিটা নিয়ে ভেসে পড়ি। এ ডিঙিটা আমি আদায় করেছিলুম দাদুর কাছে আবদার করে। জ্যোচ্ছনা-রাত হলে তো আমি সত্যি বলছি, ঘরে থাকতে পারি না।

এই যে ঢেউগুলো দেখছ না, এরা হল পরী, জ্যোচ্ছনা-রাতে এরা আমায় ডাকে। আমি যতক্ষণ পারি ওদের সঙ্গে কথা বলি, গান গাই। আমি গান গাই আর ওরা নাচে। এত ভালো লাগে যে কি বলব! আর যেদিন আসতে পারি না, সেদিন আমার মন ভীষণ খারাপ হয়ে যায়, সেদিন আমি কেঁদে ফেলি। মা-বাবা কত বকে, গাল দেয়, সময় সময় ঘরে বন্ধ করেও রাখে। কিন্তু আমি তবু বন-কলমীর বিলকে ভুলতে পারি না। এ যে আমার সই, ফাঁক পেলেই সই-এর কাছে চলে আসি।'

এক মুহূর্তের জন্য চুপ করে থেকে আবার বলতে শুরু করলে কমলা, 'আর জানো, ঠাকুর্দা কিন্তু আমায় ভীষণ ভালোবাসে। আমায় কি বলে জানো? বলে, আমি নাকি পাতালপুরীর রাজকন্যা ছিলুম আগের জন্মে। সত্যি, দাদু আমায় খুউব ভালোবাসে। মা কিন্তু আমায় একদম ভালোবাসে না। বলে, আমি জলের রাক্ষসী ছিলুম, আমি হাড়-জ্বালানি মেয়ে, এমনি কত কি! আমার কচুটা! বয়েই গেল গাল দিলে তো! বল তো, তুমিই বল না, বন-কলমীর বিলকে আমি যদি ভালোবাসি তো অপরের তাতে বলবার কি আছে?'

এতক্ষণ পরে কথা বলতে পেরে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম, বললাম, 'সত্যি কথা। কিন্তু বাপ-মায়ের মনে কষ্ট দিয়ে বন-কলমীর বিলকে ভালোবাসাটা কি ভালো?'

মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল কমলার, বললে, 'কি করব, তারা যদি ইচ্ছে করে কষ্ট পায়! ও আমার সই, সইয়ের কাছে আসব না তা বলে? বা রে!'

একটু আগেই তাকে গুরুজন-সুলভ কথা বলেছি, কিন্তু তবু তার মতো অদ্ভুত এবং এক সাহসী মেয়ের সঙ্গে ভাব হওয়ায় মনে মনে গর্ব অনুভব করছি।

বললাম, 'আজ তুমি এলে কি করে?'

'এলুম—এখন আর আমাকে আটকায় কে?'

'মানে?'

দুষ্টুর মতো হেসে কমলা উত্তর দিলে, 'উঁহু, তা কেন বলব!'

'না বলো তো, বয়েই গেল আমার।' আমিও উদাসীন হতে ছাড়ি না!

আমার দিকে চেয়ে কমলা বললে, 'আচ্ছা আচ্ছা বলছি, একদিন কি মজা হয়েছিল শোন। সেইদিন থেকেই তো আর কেউ আমাকে আটকায় না। যখন খুশি বিলের বুকে ইচ্ছামতো ভেসে বেড়াই, অবিশ্যি ঠিক এমনি জ্যোচ্ছনা-রাতে।'

শোনবার আগ্রহ খুবই ছিল, তবু আগের মতো উদাসীন সুরে বললাম, 'শুনি তবু কি হয়েছিল!'

কমলা বলতে লাগল, 'সেদিনও ঠিক এমনি জ্যোচ্ছনা-রাত, বোধ হয় পূন্নিমে। রাত তখন অনেক হবে, সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। মা আমাকে পাশে নিয়ে শুয়েছিল। আমি কিন্তু ঘুমুইনি, মনে মনে আগেই যে ভেবে রেখেছি বিলে যাব। ভালো করে দেখলুম, মা অঘোরে ঘুমুচ্ছে। সাবধানে মায়ের পাশ থেকে উঠে আস্তে আস্তে খিল খুলে একেবারে বিলে এসে হাজির।

আঃ, কি আরাম যে লাগল! আমার ডিঙিটা বাঁধা থাকত ওই ওদিকের একটা সজনে-গাছের গোড়ায়। তখনি ডিঙি খুলে ভাসিয়ে দিয়ে বেয়ে চললুম।

সই যে ডাকছে! চাঁদের আলোয় চারদিক ধবধব করছে আর আমি একা বিলের বুকে ডিঙি বেয়ে চলেছি, আমার সই বন-কলমীর বিলে। যেতে যেতে অনেক দূর গিয়ে পড়লুম, ঐ যে দূরে গাঁটা দেখচ প্রায় ওইখানে। ফিরব ফিরব ভাবছি, হঠাৎ দেখি চাঁদের আলো কমে আসছে। কি ব্যাপার?

কখন যে আকাশের কোণে কোণে মেঘ জমে উঠেছে তা লক্ষই করিনি। ভয় হয়ে গেল। একবার

ভাবলুম, ঐ কাছের গাঁটায় ডিঙি ভিড়িয়ে দেই। কিন্তু আর একবার ভাবলুম, যাকগে, খুব জোরে বেয়ে গেলে মেঘ ভালো করে জমবার আগেই বোধহয় পৌঁছে যাব নিজের গাঁয়ে।

তাই করলুম। প্রাণপণে 'বোঠে' ঠেলে ফিরতে লাগলুম। কিছুদূর এসেছি আর ঝড় উঠল। উঃ, কী ভীষণ হাওয়া! শাঁ-শাঁ করে এগিয়ে আসছে কালো দত্যির মতো ঝড়। অন্ধকার হয়ে গেছে চারদিক। না পারি দিক ঠিক করতে, না পারি ডিঙি সামলাতে! আমার যে তখন কি হতে লাগল, কি বলব! ভয়ও পাচ্ছে খুব, মজাও লাগছে বেশ। আকাশের দিকে চেয়ে দেখলুম, সব অন্ধকার! বিলের দিকে চেয়ে দেখি সে যেন রাগে ফুলছে! সেই রাগের হাত থেকে ডিঙি রাখবার অনেক চেষ্টা করলুম, শেষকালে আর রাখতে পারলুম না। এমন একটা দমকা ঝড় এল যে আমার ছোট্ট ডিঙিটা উলটে গেল।'

আমি মুগ্ধ বিস্ময়ে তার কথা শুনছিলাম, এখন থাকতে না পেরে বলে ফেললাম, 'অ্যাঁ, বল কি?'

সে বললে, 'হাঁ, শোন না! আমার ডিঙিটা গেল উলটে আর সেখানকার জলে কি যেন হল, আমি সাঁতার কাটতে পারলুম না, ডুবে গেলাম। একবার ওঠবার চেষ্টা করেছিলুম প্রাণপণে, কিন্তু মনে হল জলের নীচে থেকে কে যেন আমার পা জোর করে আঁকড়ে ধরে আরো নীচে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।'

বিস্ময় কেটে গিয়ে আমার যেন ভয় করতে লাগল! বুকটা টিপটিপ করছে। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে বললাম, 'বল কি! তারপর?'

'তারপর আর কি? আর উঠতে পারলুম না।'

আমার গলা বুজে আসছে, স্বর বেরুতে চায় না। কোনোমতে বললাম, 'কি বললে? আর—'

কমলা বললে, 'হাঁ, আমি ক্রমশ নীচের দিকে নেমে গেলুম, আর উঠতে পারলুম না।'

আমার চোখের সামনে থেকে সব মুছে যাচ্ছে। কমলার মুখ, বিলের জল, আকাশের চাঁদ, তারা, সব—সব যেন অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে! চিৎকার করবার চেষ্টা করলাম, বলতে চেষ্টা করলাম, 'তুমি কি মানুষ নও?' কিন্তু গলা দিয়ে স্বর বেরুল না কোনো। একবার শুধু কানে এল কমলার খিলখিল করে হাসি আর শুনলুম সে যেন বলছে, 'ও কি হল! যাঃ ভীতু কোথাকার, সব সমান রে!'

তারপর আর কিছু মনে নেই।

যখন আবার বোধ-শক্তি ফিরে পেলাম, দেখি, বিলের ধারে মাটিতে মুখ গুঁজে পড়ে আছি। আশেপাশে কেউ কোথাও নেই।

উঠলাম। শরীর ভীষণ দুর্বল ঠেকছে। মনে হল যেন মাসখানেক রোগশয্যায় থেকে এই সেরে উঠেছি। কোনোরকমে বাড়ি ফিরলাম।

ফুলদি জিগ্যেস করলে, 'এত রাত পর্যন্ত ছিলি কোথায়?'

বললুম, 'খেতে দাও আগে, বলছি।'

জামাইবাবু আর আমি একসঙ্গে খেতে বসলাম। জামাইবাবু বললেন, 'কি হে, এতক্ষণ ছিলে কোথায়? আর একটু দেরি হলেই আমরা লাঠিসোঁটা নিয়ে তোমাকে শিকার করতে বেরোতুম। তা ছিলে কোথায়?'

বললাম, 'বন-কলমীর বিলের ধারে।'

দিদি আর জামাইবাবু একটু চমকে উঠেই সামলে নিলেন। জামাইবাবু বললেন, 'না না, রাত্রে ওদিকে একা একা আর কখনো যেও না।'

আমি বললাম, 'কেন? বলুন তো!'

জামাইবাবু আমার দিকে একবার চেয়ে বললেন, 'না, এমন কিছু নয়। তবে বছর-পাঁচেক আগে ওই বিলে চৌধুরীদের কমলা বলে চোদ্দ-পনেরো বছরের একটি অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে ডুবে মারা যায়। মেয়েটার মাথায় অবশ্য একটুখানি—মানে সামান্য একটু গোলমাল ছিল। সে বড় করুণ ব্যাপার, বলতে ইচ্ছে যায় না।'

আমি তাড়াতাড়ি বললাম, 'থাক, তবে আর বলবেন না।'

সেবারে যতদিন দিদির বাড়ি ছিলাম, আর কোনোদিন বন-কলমীর বিলের ধারে যাইনি!

মাঘ ১৩৫৫

সমাপ্ত

শুকতারা পত্রিকায় বছরে নিয়মিত দু'বার করা হয় ভৌতিক সংখ্যা, এছাড়া শারদীয়া সংখ্যায় ভূতের গল্প তো কিছু থাকেই। কাজেই এই পত্রিকায় দীর্ঘ তেষট্টি বছর ধরে কত শত ভূতের গল্প প্রকাশিত হয়েছে সেটা তো সহজেই বোঝা যায়। নামকরা লেখকরা লিখেছেন, ভূতের গল্পবিশারদরা লিখেছেন, বিচিত্র ধরনের সব ভূতেরা পত্রিকার পাতায় ভিড় জমিয়েছে। এই এত সব গল্পের মধ্যে থেকে মাত্র একশো একটি গল্প বেছে নেওয়া মোটেই সহজ কাজ নয়। নামী লেখকদের গল্প বাছতে হবে, তাঁরা অনেকেই এতদিনে বহু গল্প লিখেছেন—তার মধ্যে সেরা লেখাটি বেছে নিতে হবে; ততটা নামী না হলেও গায়ের লোম খাড়া করা কিছু গল্প যাঁরা লিখেছেন, তাঁদের গল্পও নিতে হবে; আর সবচেয়ে বড়ো কথা হল, একই রকম না হয়ে যায়, প্রত্যেকটা গল্প যেন আলাদা রকমের হয়, প্রত্যেক গল্পে যেন অন্যরকম চমক থাকে, সেটাও দেখতে হবে। নইলে সে গল্প তোমাদের ভালো লাগবে কেন! পড়তে গেলে একঘেয়ে মনে হবে যে!

এই সব কথা মনে রেখে, অত্যন্ত খুঁটিয়ে বিচার করে এই বইয়ের প্রত্যেকটি গল্প নির্বাচন করা হয়েছে যাতে একটি গল্পও পড়ে মনে না হয় ঠিক জমল না। প্রত্যেকটি গল্পই রোমহর্ষক, উত্তেজনায় ঠাসা, শুরু করলে আর শেষ না করে ওঠা যায় না। কে কতটা সাহসী সে প্রমাণ যদি পেতে হয়, এক্ষুনি এই বই নিয়ে বসে পড়তে হবে।

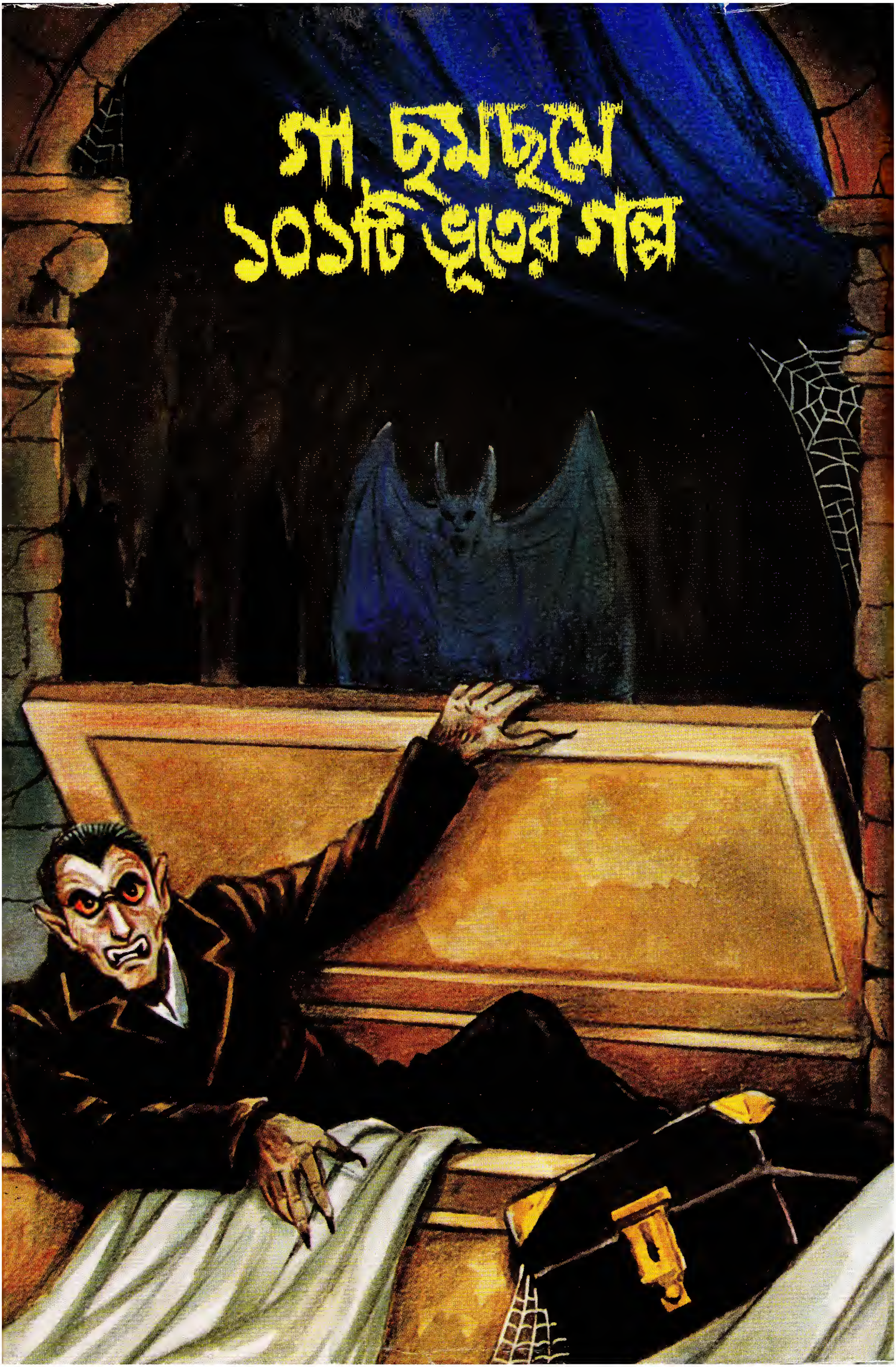
গা ছমছমে
১০১টি ভূতের গল্প